সমকালীন : প্রবন্ধের মাসি

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

চতুর্দশ বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৭৩

অতিথি-নিয়ন্ত্রণ বিধি

লঙ্ঘন করে
অতিথিদের আপ্যায়ন করলে
আপনার অহমিকা হয়ত তৃপ্ত হতে পারে
কিন্তু তার ফলে
হাজার হাজার লোক
দৈনন্দিন খাদ্যে বঞ্চিত হয়

অতএব

অতিথি-নিয়ন্ত্রণ বিধি মেনে চলুন

যাঁদের নিমন্ত্রণ না করলে নয়, শুধু তাঁদের
নিমন্ত্রণ করুন।
আর যে-সব খাদ্য পরিবেশন
আইন সম্মত
শুধু তাই খাওয়ান

ROHTAS INDUSTRIES LTD.
ASHOKA CEMENT LTD.
ROHTAS
SONE VALLEY PORTLAND CEMENT CO., LTD.
JAIPUR UDYOG LTD.
SAHU CEMENT for good construction

লিপটন
ইয়েলো
লেবেল
লিপটন ইয়েলো লেবেল বিশেষভাবে তাঁদেরই জন্যে ব্লেণ্ড করা—যাঁরা পছন্দ করেন ভালো কড়া চা। যেমন গাঢ় এর লিকার তেমনি অপূর্ব এর স্বাদ আর গন্ধ।
LIPTON
লিপটন
বলতেই
ভালো চা
LIPTON'S
YELLOW LABEL TEA
LIPTON'S
LYC-37 BEN

হাওয়ায় হাওয়ায় চলা
যেন মুক্ত হাওয়ায় পা বাড়িয়ে চলা। আরামে চলা হালকা পায়ে। চলনে পরম তৃপ্তি বাটার স্যান্ডালে। বাটার স্যান্ডাল পায়ে দিয়েই আপনি খুশি হবেন। পলকে জানতে পারবেন এদের বৈশিষ্ট্য কী। এমন আরামদায়ক উপকরণ, নির্মাণশৈলী আর মৌসুমী নকশার সমাবেশ দুর্লভ বলা যেতে পারে। স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। বাটার স্যান্ডাল পায়ে দিয়ে আপনি যত ইচ্ছে চলুন। গঠন অটুট থাকবে। নতুনের মতো দীর্ঘদিন এর টিকে থাকবার মেয়াদ।
পাপিয়া ৯.৯৫
মিনতি ৯.৯৫
Bata
প্রদীপ ১৮.৯৫
তপন ১৫.৯৫

চতুর্দশ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ তেরশ' তিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বৈশাখ
তের'শ তিয়াত্তর

সমকালীন

চতুর্দশ বর্ষ
১ম সংখ্যা

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

বাংলা দেশের মন্দির রচনার ইতিহাস, ধরিতে গেলে, দেড় সহস্র বৎসরেরও অধিক। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক উত্থান পতন ঘটিয়াছে—ভাঙ্গিয়াছে গড়িয়াছে। জাতীয় জীবনের সামগ্রিক কর্মপ্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল, তাই বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের অনেক সাক্ষ্যই বাংলার মন্দিরগুলির অঙ্গে লিপ্ত হইয়া আছে। কিন্তু এই অমূল্য সাক্ষ্য-সম্পদ বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই। সে সব সময়ের দলিল পত্র তো সব সময় পাওয়া যায় না—ভাবগুলি হয়ত মরিয়া গিয়াছে অথবা নবতর আন্দোলনের স্পর্শ আসিয়া এমনভাবেই চাপা পড়িয়া বা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যে আজ তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কিন্তু সে দিনের মন্দিরগুলি আজও দাঁড়াইয়া আছে—জন্মকালের যে পরিচয় তাহাদের অঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে সে যদি প্রতিধ্বনিও হয়, তবুও তথ্য হিসাবে তাহা মূল্যবান, উপাদান হিসাবে অপরিত্যাজ্য।

আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বেও এদেশের জাতীয় জীবনে মন্দির নির্মাণ একটা বিশেষ ঘটনা ছিল। সৌভাগ্যশালী লোকেরাই স্থায়ী কীর্তি অর্জনের আশায় মন্দির, অতিথিশালা নির্মাণ করিতেন, জলাশয় খনন করিতেন, পথ বাঁধাইয়া দিতেন। মন্দির তাই নির্মাতার ঐশ্বর্য ও সামাজিক প্রতিপত্তির নিদর্শন। এমনতর ক্ষেত্রে মন্দিরের কথা বলিতে গেলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক পরিবেশ সব কিছুর কথা আসিয়া পড়িবে। এছাড়া, মন্দিরগুলিকে অবলম্বন করিয়া জাতীয় জীবনে যে আলোড়ন ঘটিয়া গিয়াছে, আজও যাহার তমসাচ্ছন্ন পরিচয় অসংখ্য লোককথা ও কাহিনীর মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার মূল্যও কম নয়। কিন্তু এ সবই অনেকটা

বাহিরের ব্যাপার—দেবালয়ের চারপাশে যে অগণিত মানুষের ভিড় এ তাহাদেরই কথা। শুধুমাত্র মন্দিরের নিজের কথা যেখানে, সেখানে শিল্পকীর্তি হিসাবে প্রথমেই ইহাদের মূল্যায়ন হইবে, তার পরে আসিবে সুবিস্তৃত অলঙ্করণের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে জন-জীবন ও জন-চিত্তের কোন পরিচয় ইহারা তুলিয়া ধরিয়াছে।

মুসলমান অধিকারের পূর্বে বাংলা দেশে যে সমস্ত মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, বৃহত্তর ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তাহাদের একাংশের বিচার কিছুটা হয়ত হইয়াছে কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যেগুলি নিমিত হইয়াছে তাহাদের প্রকৃত মূল্যায়ন আজও হয় নাই। সামগ্রিক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের বিবেচনায় বাংলার মন্দিরগুলির সত্যকার পরিচয় বাঙ্গালীর ইতিবৃত্ত রচনায় একটা সম্পূর্ণ নূতন দিকের সন্ধান দিতে পারে।

একটু খুলিয়া বলি। একেবারে প্রথম হইতেই ধরা যাক। দেবালয় (চন্দ্রকেতুগড ; চব্বিশপরগণা) মহাস্থান (বগুড়া, পূর্ব পাকিস্থান) গোকুল (পূর্বপাকিস্থান) প্রভৃতি স্থানে খনন করিয়া যে সমস্ত সুবৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের পৃষ্ঠপোষক, স্থপতি বা শিল্পীদের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের সুমহৎ কীর্তি ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াও আজও একটি বিশেষ সময়ে বিধৃত জাতির পরিচয়কে তুলিয়া ধরিয়াছে। আধুনিক বাঁকুড়া জেলার দ্বারকেশ্বর ও কংসাবতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রাক মুসলমান যুগে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার কোন বিবরণ কেহ লিখিয়া রাখিয়া যায় নাই। শুধুমাত্র এই নদী দুইটির তীরবর্তী অঞ্চলের কতকগুলি প্রাচীন মন্দির, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও অসংখ্য মূর্তির উপর নির্ভর করিয়া সে দিনের অবস্থাটা অনুমান করিয়া নিতে পারা যায়। তে-দেউলি, লয়ের, রাধানগর, রাউতোড়া, পরেশনাথ প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দাঁড়াইয়া আছে শুধু বহুলাড়া, সোনাতপাল ও ডিহরের মন্দির কয়েকটি। সোনাতপালের দেবমাহাত্ম্য লুপ্ত হইয়াছে মন্দিরটিও পরিত্যক্ত, কিন্তু বহুলাড়া ও ডিহরের মন্দিরগুলি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আজ পর্যন্ত বহু ভাবান্দোলনের কেন্দ্রভূমি হইয়া ভক্ত চিত্তে জাগ্রত রহিয়াছে। যেগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অথবা পরিত্যক্ত হইয়াছে সেগুলিও যে একদিন ভাবান্দোলনের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল এমন বিশ্বাস করিবার মত প্রমাণের অভাব নাই। যেদিন মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল সেদিনের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, রাজনৈতিক স্থৈর্য, শিল্পকর্মের মানদণ্ড এবং সুদীর্ঘকালের জনচিত্তের ধর্মচিন্তার প্রতীক এই মন্দিরগুলি যে অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঁকুড়ার কথা তো উদাহরণস্বরূপ বলিলাম, বর্ধমান জেলার বরাকরে, চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবনে, পুরুলিয়া জেলার বোরাম, ছোটবলরামপুর, পারা, তেলকুপি, দেউলঘাট—এই সমস্ত অঞ্চলের প্রাচীন মন্দিরগুলি সম্পর্কে ঠিক একই কথা বলা যায়।

উপরে যে মন্দিরগুলির কথা বলা হইল সেগুলি সবই প্রাক-মুসলমান যুগে নির্মিত। মুসলমান আক্রমণের পরে কয়েকশত বৎসর অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের কয়েকটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও মন্দির বিশেষ একটা নির্মিত হয় নাই—অন্তত এখন পর্যন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে নবতর আন্দোলনের উন্মেষ দেখা দিল। বস্তুত মন্দির স্থাপত্যের এক নূতন যুগ

আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত সারা দেশ জুড়িয়া অসংখ্য মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী ভাবধারা ও বাংলার নিজস্ব শিল্পচিন্তাকে অবলম্বন করিয়া, মধ্যপ্রাচ্য হইতে আগত বিজয়ীদের গৃহ নির্মাণ পদ্ধতিকে তাহার সহিত একাঙ্গীভূত করিয়া নূতন পদ্ধতিতে মন্দির নির্মাণ শুরু হইল। যে সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা এবং ধর্মীয় ভাবানুভূতি ও শিল্পচর্চার যে মানসিকতা নবপর্যায়ের এই আন্দোলনের ভূমিকা গড়িয়া তুলিয়াছিল সেগুলিকে বাদ দিয়া বাংলার জাতীয় ইতিহাস কখনই রচিত হইতে পারিবে না। ক্রমাগত আলোচনায় দেখা যাইবে নব-পর্যায়ের এই আন্দোলনের দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিয়াছে, মন্দিরের আকৃতি ও অলঙ্করণের শিল্পাদর্শের ক্রমবিবর্তন ঘটিয়াছে। বস্তুত সচল জীবন প্রবাহ না থাকিলে কোন জাতির পক্ষেই ইহা সম্ভব হইত না। এই দিক দিয়া ভাবিলে দেখা যাইবে যে বিভিন্ন সময়ের ঘটনাবর্ত, জাতীয় চিন্তা ও কর্ম এই সব মিলিয়া যে জীবনপ্রবাহ গড়িয়া ওঠে তাহারই মধ্যে মন্দিরগুলির স্থান নির্দেশ করিতে হইবে ; তাহাই হইবে প্রকৃত মূল্যায়ন।

একয়টি কথা ভূমিকাস্বরূপ বলিলাম। ভূমিকায় যাহার আভাস আছে সেটা পরিস্কার করিয়া বলা প্রয়োজন, কথাটা উদ্দেশ্য সম্পর্কে। জাতীয় কর্মপ্রচেষ্টা ও ভাবনা-কল্পনার মাঝখানে বাংলার মন্দিরগুলির যথার্থ স্থান নির্দেশ করাই আলোচনার উদ্দেশ্য—কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নয়।

বাংলার মন্দিরের কথা আরম্ভ করিতে গেলে প্রথমেই দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাটার কথা কিছু বলিয়া নিতে হয় ; মানুষগুলিকে তাহাদের মত করিয়া একবার দেখিয়া নিতে হয়। প্রাকৃতিক অবস্থার প্রসঙ্গ মন্দিরের ক্ষেত্রে একটু বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার। কারণ, মন্দির নির্মাণের উপকরণ, তাহার আকৃতি, স্থায়িত্ব এমন অনেক কিছুই প্রকৃতির প্রভাবে নির্দিষ্ট বা সীমিত হইয়াছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশটাই নদীবাহিত পলিমাটিতে সৃষ্ট। ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে শুধু পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে। পশ্চিমে, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূমের পশ্চিমাংশে মাটি কঠিন, স্থানে স্থানে প্রস্তরসঙ্কুল, বায়ু কিছু শুষ্ক এবং নদী জলশূন্য। ছোটনাগপুরের মালভূমি বাংলার এই ক্ষয়ীভূত উচ্চাবচ সমভূমিতে নামিয়া আসিয়া কতকগুলি অনতিউচ্চ পাহাড় ও কঠিন মৃত্তিকার সহিত শেষ হইয়া গিয়াছে। আর একটু পশ্চিমে, প্রকৃতপক্ষে বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা ছোটনাগপুর মালভূমির সানুদেশ বলিয়া অনেকটা বেশী পার্বত্য ভাবাপন্ন। পশ্চিমবঙ্গের এই অংশে ভূমি উচ্চাবচ, লৌহচূর্ণের আধিত্যকায় মাটি রক্তাভ এবং অঞ্চল বিশেষ শালবনে আচ্ছন্ন। তিনদিকের এই সুনির্দিষ্ট পার্বত্য বলয়ের বাহিরে সর্বক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ নদীর দুইতীরে দিগন্তবিস্তৃত সমভূমি। শালবন আর বেশী আগাইতে পারিল না—অশক্ত বৃক্ষ ও পরিপুষ্ট লতাগুল্মের আচ্ছাদন ক্রমশই ব্যাপক হইয়া আসিরাছে।

পলিমাটির এই দেশে পাথরের ব্যবহার বিশেষ হইবার সুযোগ নাই। তাই গৃহ-নির্মাণের উপকরণ হিসাবে 'ইঁটের ব্যবহারই বেশী হইবার সম্ভাবনা। পাথর এখানে আমদানী করিতে হয় তাই, পাথরের মূর্তি অসংখ্য হইলেও পাথরের মন্দির কিন্তু খুব অল্পই নির্মাণ করা সম্ভব হইয়াছিল—তাও আবার গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলেই একরকম সীমাবদ্ধ। কারণ, রাজমহল হইতে গঙ্গায় পাথর ভাসাইয়া আনা অনেকটা সহজসাধ্য। ইঁটের তৈরী মন্দিরে কারুকার্য ও অলঙ্করণও

হইল ইটের। শিল্পকর্মের উপকরণ হিসাবে মাটির ব্যবহার ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকালের সন্দেহ নাই কিন্তু বাংলাদেশের মত পোড়ামাটি-শিল্পের ব্যাপক প্রচলন ভারতবর্ষের আর কোথাও ছিল না। ভাসাইয়া আনা পাথরে দেবতার মূর্তি গঠন করিয়া পূজা করা হইয়াছে কিন্তু মন্দির নির্মাণ ও সজ্জায় পাথরের ব্যবহার বড় একটা সম্ভব হয় নাই। এই কারণেই ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলাদেশে মন্দির নির্মাণের নবপর্য্যায় পোড়ামাটি শিল্পের যে ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল ভারতবর্ষে অন্য কোথাও তাহার তুলনীয় কিছু নাই।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমানে ও বীরভূম জেলায় কতকগুলি অঞ্চলে। বর্ধমান জেলার বরাকর, গাড়ুই, দেবস্থান এইসব স্থানে মন্দির নির্মাণের জন্য পাথর নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আর বর্ধমানের দাঁইহাট ও হুগলী জেলার ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম ও পাণ্ডুয়াতে, মালদহ জেলার পাণ্ডুয়াতে এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার শিববাটীতে মন্দিরের জন্য পাথর ভাসাইয়া আনা হইয়াছিল, ইহাই সম্ভব। বীরভূম জেলায় ফুলপাথর নামে একরকম অত্যন্ত নরম পাথর পাওয়া যায়। বীরভূমের একটা বিস্তৃত অংশ জুড়িয়া ইটের মন্দিরে ফুল-পাথর কাটিয়া সজ্জা রচনা করা হইয়াছে।

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া পুরুলিয়ার ও বীরভূমের কতকগুলি অঞ্চলে মাকরা পাথর নামে একপ্রকার অত্যন্ত কঠিন বস্তু পাওয়া যায়। পাথর নামে পরিচিত হইলেও মাকরা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাথর নয়—মাটি। অবস্থা বৈগুণ্যে লোহা, এ্যালুমিনিয়াম, টিটানিয়াম ও ম্যাঙ্গানীজ অক্সাইডের সহিত মিশিয়া মাটি একটি বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বায়ুর সংস্পর্শে এই মিশ্রগুণসম্পন্ন মাটিই পাথরের মত শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হইয়া ওঠে। মন্দির নির্মাণে পোড়া ইটের সহিত একই দৃঢ়ীভূত মৃত্তিকার ব্যবহার যথেষ্টই ঘটিয়াছে। পুরুলিয়া জেলায় অবশ্য মাকরাপাথরের ব্যবহার বিশেষ হয় নাই।

ভূপ্রাকৃতিক অবস্থার জন্য যেমন মন্দির নির্মাণের প্রধান উপকরণ হইল ইঁট, তেমনি বৃষ্টিবহুল আর্দ্র জলবায়ু ও নরম পলিমাটি মন্দিরের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার দিক দিয়া বিপদজনক হইয়া উঠিতে পারে। ইটে নোনা লাগিয়া যায়, মন্দিরশীর্ষে সতেজ অশ্বত্থ শিশু অল্পদিনেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া ফাটল ধরাইয়া দেয়—বাধা না পাইলে তো মন্দিরটিকে ভূমিসাৎ করিয়া ছাড়ে। ক্ষেত্র বিশেষে আবার বহুবিস্তৃত অশ্বত্থ শিকড়ই মন্দিরের রক্ষাকর্তা। মন্দিরদেহের সর্বত্র বলিষ্ঠ শিকড় চালনা করিয়া বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে এমন ভাবে ধরিয়া রাখে যে তাহার আর পড়িয়া যাইবার উপায় থাকে না। নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নিকটে বাঘআঁচড়া গ্রামে চাঁদ রায়ের মন্দির বলিয়া একটি সপ্তদশ শতাব্দীর অলঙ্কৃত মন্দির আছে। একটি বটগাছ তাহার উর্দ্ধাংশকে এমনভাবে ফাটাইয়া দিয়াছে যে মন্দিরটি যে কোন প্রকরণের ছিল সে আজ আর বুঝিয়া উঠিবার উপায় নাই। কিন্তু সেই বটেরই শিকড়গুলি মন্দিরের অলঙ্কৃত দেওয়ালগুলিকে এমনভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে সেগুলির পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। জলবায়ুর এই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এমন মন্দিরের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। বাঁকুড়া জেলার বোলাড়া (বহুলাড়া) গ্রামের সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দির, সোনাতপালের সূর্য মন্দির, বর্ধমান জেলার দেউলিয়া গ্রামের শিবের মন্দির, সুন্দরবনের জটার দেউল এ সব কয়টিই ইটের তৈরী, বয়সও হইল

প্রায় হাজার বৎসর। এতসত্ত্বেও কিন্তু এগুলি ভাঙিয়া পড়ে নাই। ষোড়শ শতাব্দীর পরে নির্মিত অনেক মন্দিরই অক্ষত রহিয়াছে। স্থানীয় লোকেরা অবশ্য বলেন ইট ঘি দিয়া ভাজা হইত বলিয়াই বাঁচিয়া গিয়াছে। ঘি দিয়া ভাজা হইত কি না কে জানে তবে ইটের ক্ষয় রোধের জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইত এরূপ হওয়াই সম্ভব।

বৃষ্টি বাহুল্যের কথা একটু আগেই বলিয়া আসিয়াছি। এ বাহুল্যের কারণ প্রবল মৌসুমী বৃষ্টিপাত। বৃষ্টিপাতের এই প্রাবল্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এদেশের সাধারণ লোক বসবাসের জন্য ঢালু ছাদ সম্বলিত চালাঘর নির্মাণ করিয়াছিল। পশ্চিম বাংলার রীতি হইল চালকে হস্তিপৃষ্ঠের মত বক্রাকৃতি করা। ইহাকে চালে 'রাগ' দেওয়া বা 'কোর' দেওয়া বলে। চারচালা ছাদের কোনাচগুলিও সোজা হইতে পারে। কিন্তু চালে রাগ দেওয়া হইলে কোনাচগুলিও বাঁকান হইয়া যাইবে। রাগ দেওয়া বক্রাকৃতি চালা পশ্চিম বাংলার সর্বত্রই যে প্রচলিত তাহা নয়—সোজা চালযুক্ত চালাও বহুক্ষেত্রে নির্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু তবুও যে কি কারণে 'রাগ' দেওয়া চালা ছাদই বাংলার নিজস্ব রীতির মন্দিরে সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিল তাহা আজ আর নির্দেশ করিয়া বলা সম্ভব নয়। হয়ত, ইহার নমনীয় ভাবটি সুন্দর বোধ হইয়া থাকিবে।

মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে সাধারণের বাসগৃহের রূপটাই যে আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইল কেন তাহার কারণ খুঁজিতে গেলে বাঙ্গালীর স্বতসিদ্ধ ভাবপ্রেরণার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। দেবালয় নির্মাণ করিতে গিয়া সুউচ্চ সৌধের কথা ভাবাই স্বাভাবিক। সেই সৌধ আবার সাধারণের বাসগৃহ হইতে অত্যন্ত পৃথক করিয়া নির্মাণ করাই প্রথা। ভারতবর্ষের সর্বত্র সুউচ্চ শিখর সম্বলিত প্রশস্ত দেবায়তন মন্দির সম্পর্কে একটা বিশেষ মানসিকতা জন্মাইয়া দেয়। ইওরোপে, যেখানে গির্জাগুলি ঈশ্বরের দেহ ও মন বলিয়া সর্বজনশ্রদ্ধায় গৃহীত, সেখানেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রশস্ত অঙ্গন জুড়িয়া বহুবিস্তৃত কক্ষ তাহারই মধ্যে সুউচ্চ সুগম্ভীর শিখরটি বোধকরি ঈশ্বরের মহিমাকে মানুষের মনে জাগাইয়া দিয়া তাহারই ভাবে হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রতি বিস্মিত পুলকে অগ্রসর করিয়া দেয়। কিন্তু বাংলাদেশে এমন ঘটনা খুব একটা ঘটিল না। উত্তর ভারতের উচ্চ শিখর সম্বলিত বা বিস্তৃত মন্দির কিছু নির্মিত হইয়াছিল বটে কিন্তু যেদিন হইতে বাঙ্গালী তাহার নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে সেইদিন হইতেই সে বিস্তারের মোহ ও উচ্চতার আকর্ষণ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া আপন বাসগৃহের সঙ্গে সমান করিয়া দেবালয় নির্মাণ করিতে পারিয়াছে। এমন কি উত্তর ভারতীয় রীতি অনুকরণ করিবার সময়ও মন্দিরের বিস্তৃতি বা উচ্চতা এ কোনটারই আকর্ষণ বিশেষ বোধ করে নাই। বস্তুত দেবতাকে, তাঁহার মহিমাকে উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহাকে রাজরাজেশ্বর সম্রাট বলিয়া ভাবিবার প্রয়োজন হয় নাই—আপন গৃহকোণে পরিবার পরিজনদের মধ্যেই বাঙ্গালী তাঁহার সন্ধান পাইয়াছে, পূজা করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে। এই ভালবাসার আকর্ষণ এত ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল যে গৃহদেবতা প্রতিগৃহে অতি আদরণীয় পরিজনের স্থান লাভ করিয়া নিলেন। গোকুল, বৃন্দাবনের কথা, সে তো পুঁথিতেই রহিয়া গেল—কিশোর গোপাল আমাদেরই গৃহপ্রাঙ্গণে খেলিয়া বেড়াইয়াছে, মাতার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়াছে, আবার ক্রীড়াক্লান্ত দেহখানি পর্ণকুটীরের শয্যাতেই মেলিয়া ধরিয়াছে। অজয়-ভাগীরথীর গৈরিক জলে যে

দেশের ছায়া পড়ে তাহারই গৃহপ্রাঙ্গণে লালিত দেবতা জনপদবাসীকে ছাড়িয়া বৃন্দাবনমুখে একপাও অগ্রসর হন নাই। তাঁহার অস্তিত্বের এই আনন্দকে প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই রাঙ্গালী তাহার গৃহদেবতাকে প্রতিদিন শয্যা হইতে তুলিয়াছে, স্নান করাইয়াছে, আহার করাইয়াছে পূজা শেষ হইলে বিশ্রামের আয়োজন করিয়া দিয়াছে। এই সুতীব্র নৈকট্যবোধের জন্যই এমন যে ভয়ঙ্করী কালী প্রতিমা তাঁহাকেও কন্যা বলিয়া, মাতা বলিয়া কল্পনা করিতে বাধে নাই। আর শিবের তো কথাই নাই—নেশাভাঙ করিয়া, স্থানে-অস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া স্ত্রীর সহিত কলহ করিয়া দরিদ্রগৃহের কর্তা সাজিয়া বসিয়া আছেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। হালিশহরের নন্দগোপাল জিউর সেবায়েৎ ছিলেন এক সহায়সম্বলহীন বিধবা রমণী। কষ্টিপাথরের ঐ মূর্তি ও তাহার মন্দির ইহাই লইয়া ছিল তাঁহার সংসার। একরকম ভিক্ষা করিয়াই তাঁহার সেবা চলিত। একদিন দুপুরে মন্দিরে গিয়া দেখি, বৃদ্ধা তাঁহার বিগ্রহকে স্নান করাইরা আহারে বসাইয়াছেন। বৃদ্ধা স্নানের বা ভোগের মন্ত্র জানিতেন না কিন্তু তাহাতে তাঁহার সেবার কোন ব্যাঘাত হয় নাই। আহারের পর গোপালকে শয়ন করাইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। আমরা মন্দিরের ছবি তুলিতে আসিয়াছি শুনিয়া তাঁহার গোপালের একটি ছবি তুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ছবি তুলিবার জন্য গোপালকে বাহিরে আনিতে হইবে কিন্তু সে তো ইতিমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা মন্দিরের ভিতরে গিয়া অতি যত্নে আদরের স্বরে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে লাগিল। ঘুম ভাঙ্গিলে মূর্তিকে যখন বাহিরে আনিয়া বসান হইল তখন তাহার গায়ে রৌদ্র পড়িতেছে। ফোকাস করিতে অসুবিধা হইতেছিল তাই কিছুটা দেরী হইয়া গেল, কিন্তু এই রৌদ্রে তো গোপালের কষ্ট হইবে—বৃদ্ধা তাই তাঁহার অঞ্চল প্রসারিত করিয়া ছায়া করিয়া দাঁড়াইলেন। যথাসময়ে ছবি উঠিল। বৃদ্ধা তখন তাঁহার গোপালকে কোলে তুলিয়া নিয়া বস্ত্রাঞ্চলে রৌদ্রতপ্ত মুখখানি সযত্নে মুছাইয়া দিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন—গোপালের আমার কপাল দেখ। গোপাল আমার ভিক্ষে করে খায়! আমি গেলে কপালে আরও কত কি আছে?" এখানে আমি ঘটনাটি শুধু বর্ণনা করিলাম মাত্র। কিন্তু যে অকৃত্রিম আবেগ ও স্নেহে বৃদ্ধা তাঁহার এই চিরশিশু গোপালকে আহার করাইলেন, শয়ন করাইলেন, উঠাইয়া আনিলেন এবং অবশেষে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছাইয়া দিয়া আদর করিতে লাগিলেন তাহার উষ্ণতাটুকু ধরিয়া দেওয়া সম্ভব হইল না। এই নিঃসন্তান বিধবা রমণী তাঁহার নিঃসহায় জীবনের সবটুকু বেদনা ও অবরুদ্ধ মাতৃহৃদয়ের সবটুকু স্নেহ এই পাথরের বিগ্রহের উপর আরোপ করিয়া যেভাবে তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা শুধু হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া লইবার; নিঃসন্তান নিঃসম্বল বলিয়া হয়ত বৃদ্ধার আবেগ অত্যন্তিক হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু যে আন্তরিকতা হইতে ইহার জন্ম তাহার শত শত দৃষ্টান্ত বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে দেখিয়াছি।

এই প্রাণের দেবতাকে বাঙ্গালী তাহার বাসগৃহের মধ্যেই স্থাপন করিল, রাঢ় অঞ্চলের রাগ দেওয়া কমনীয় বক্ররেখায় বিধৃত চালা ঘরই বাংলার নিজস্ব রীতির মন্দির নির্মাণের সর্বপ্রধান প্রকরণ হইয়া দেখা দিল। বাংলার অপর একটি নিজস্ব মন্দির প্রকরণ রত্ন মন্দিরের চালার বক্রাকৃতি কার্নিস ও ঢালুছাদ গর্ভগৃহের মূল আচ্ছাদন ভাগ রচনা করিয়াছে।

উত্তর-রাঢ়ের লোক সংগীত

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

আমার লোকসংগীত সংগ্রহ মূলতঃ উত্তররাঢ়েই সীমাবদ্ধ। উত্তররাঢ় বলতে বুঝি বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কাঁন্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম (সাঁওতালভূমি সহ) আর বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ। মোটামুটি অজয় নদী এই উত্তররাঢ়ের দক্ষিণ সীমা।

এই উত্তররাঢ় সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়েছেন তা হচ্ছে—উত্তররাঢ়ের প্রথম উল্লেখ পাইতেছি আনুমানিক নবম শতকের গঙ্গরাজ দেবেন্দ্র বর্মনের এক লিপিতে এবং তারপর একাদশ শতকের রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে।……রাজা ভোজ বর্মণের বেলাব লিপিতে উত্তররাঢ় ও তদন্তর্গত সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ আছে। সিদ্ধল গ্রাম বর্তমান বীরভূমের অন্তর্গত সিধল গ্রাম। এই সিদ্ধল গ্রামই পণ্ডিতমন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের জন্মভূমি। তথাকথিত ভুবনেশ্বর লিপিতে ভবদেব ভট্ট তাঁহার জন্মভূমি সিদ্ধল গ্রামের কথা বলিয়াছেন এবং রাঢ়ের এই অঞ্চল যে অজলা ও জঙ্গলময় তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন। বল্লাল সেনের নৈহাটি লিপি অনুসারে উত্তররাঢ় বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। কিন্তু লক্ষণ সেনের আমলে দেখিতেছি উত্তর রাঢ়মণ্ডল গ্রামভুক্তির অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। ……ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড অধ্যায়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে রাঢ়ীখণ্ড জাঙ্গল নামে এক জনপদ এবং তদন্তর্গত বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর, বীরভূম প্রভৃতি স্থান এবং অজয় প্রভৃতি নদ-নদীর উল্লেখ আছে।

পশ্চিম বাঙলার উত্তররাঢ়ে লোকসংগীতে যে প্রাচুর্য আর বৈচিত্র্য আছে তা বোধকরি অন্য কোন অংশে দেখা যাবে না। একথা ঠিক যে বিশেষ কোন লোকসংগীত বাঙলা দেশের বিশেষ কোন কোন জনপদ জুড়ে সুদীর্ঘকাল ধরে আপন মহিমায় পরিব্যাপ্ত। নিজস্ব সম্পদ আর ঐতিহ্যের কৌলীন্যে সেই জনপদের গণজীবনের চেতনায় ও সংস্কৃতিতে হয়তো বা প্রাধান্যলাভ করেছে। কিন্তু উত্তররাঢ়ের লোকসংগীতের যে বহুবিধ ধারা—সারা বৎসর জুড়ে বৃহত্তর গণজীবনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, সামাজিক উৎসবে বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বিস্তারলাভ করেছে তা' অন্যত্র দুর্লভ।

এই বৈচিত্র্যের কারণস্বরূপ মূলতঃ বলা যেতে পারে—এর ভৌগলিক অবস্থিতি আর বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনের প্রসার। ঐতিহাসিক কারণে বিভিন্ন কালে প্রশাসনিক পরিবর্তনের সাথে ধর্মীয় মতবাদের যে পরিবর্তন ঘটেছে তার সবকিছুই গ্রহণ করেছে এই জনপদ। নিপীড়িত ধর্মমতে বিশ্বাসী সম্প্রদায় কালবিশেষে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে তাদের প্রাণের ঠাকুরকে টিকিয়ে রেখেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের সমষ্টি চেতনার যত্নপুষ্ট ধর্মচেতনা। এই চেতনা শুধু পূজা-প্রকরণ আর আচারকৌশলেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। কখনও সহজ, সরল মধুরভাবের লোকসংগীত আর নৃত্যে কখনও নিষ্ঠাচারের বিধিবদ্ধতায়, কখনও ভয়াবহ বীভৎতায় স্বকীয় মহিমা প্রচার করে জাতীয় সংস্কৃতিতে এসে প্রবেশ করেছে।

এই এলেকার গণজীবনে ধর্ম শুধু একটি আচারানুষ্ঠান বা সাধনপ্রক্রিয়া নয়। দেবতার

সাধনায় মন্দির মসজিদে নিষ্ঠাচার ও মন্ত্রোচ্চারণেই এই ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম এখানে একটি স্থির বিশ্বাস—জীবনের সব সুখদুঃখের দিশারী। এই ধর্মচেতনা বিশেষ কোন শ্রেণী বা কালের পরিমাপে আবদ্ধ নয় বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনবোধে প্রসারিত। বিভিন্ন শ্রেণী বা সমাজচেতনায় ধর্মবোধ ঐক্যের উপাদান সংগ্রহ করেছে কাল হতে কালান্তরে। বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান নিয়ে মতবিরোধ ঘটেছে কিন্তু পাপপুণ্যবোধ, মানবতাবোধ সর্বোপরি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবে যে অপরিসীম বিশ্বাস তা নিয়ে মতবিরোধ ঘটেছে সামান্যই। মানবধর্মের এই উদারবিস্তৃত আধারেই লোকসংগীতের প্রকাশ ও বিকাশ—তাই লোকসংগীতে ধর্মের গান, জীবনের গান। শুধু বিশ্বাস আর সংস্কারেরই মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব। ধর্ম আর জীবন এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধর্ম ছাড়া জীবনের কোন উৎসবই এই অঞ্চলে কল্পনা করা যায় না। আর উৎসবে আছে নৃত্যগীত, হাস্যপরিহাস আর আচার অনুষ্ঠান। সর্বত্রই ধর্মের মহিমা। ধর্ম এখানে নিষ্ঠুর বিধিবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে জীবনের উৎসবকে গ্রহণ করে সর্বজনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। ধর্ম তাই সমাজের ধারক ও বাহক।

এই বিস্তৃত জনপদে বোধকরি এমন কোন গ্রাম নাই—সেখানে কোন লোকসংগীতের চর্চা নাই। প্রায় সারা বৎসর জুড়ে কোন না কোন পূজা বা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মাঝে কোন আখড়ায় ঝিঁ ঝিঁ ডাকা সন্ধ্যা হতে সুরু করে নিঝুম নিশীথ পর্যন্ত এই আসর বসে। কোথাও বা যাত্রাগান, আলকাপ, লোটো, মনসামঙ্গল বা পালাবন্দী বোলানের মহড়া—কোথাও ভাঁজো বা ভাদুর পূর্বপ্রস্তুতি। পীরের আস্তানা নেই, ফকিরের দরগা নেই, বাউল-বৈষ্ণবের আখড়া নেই, যাত্রা বা আলকাপের দল নেই—এ অঞ্চলে এমন গ্রাম কোথায়? শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব আর বাউল ফকিরের বিচিত্র চারণভূমি এই দেশ। লোকালয় হতে দূরে নদীর ধারে জঙ্গলের মাঝে বা পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠেছে কত সিদ্ধপীঠ। গাঙ্গেয় সভ্যতার ক্রমবর্ধমান আলোকচ্ছটা এখানে প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত, পরোক্ষভাবে যা সামান্য এসেছে তা শুধু ধর্মান্ধতাকে কিছু পরিমাণে সংযত করেছে কিন্তু কোন যুক্তিবিশ্বাসই এদের সযত্ন পোষিত প্রাচীন ধর্মাবেগকে মুছে ফেলতে পারে নি। তাই প্রতিটি মেলা আর উৎসবের সাথে জড়িয়ে আছে কুলদেবতা অথবা গ্রামদেবতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ। আর এই মেলা আর উৎসবই লোকসংগীতের সার্থক অভিব্যক্তি। সমষ্টিজীবনের যে চিরন্তন আশা আকাঙ্ক্ষা, সমসাময়িক যে সমস্যা লোকসংগীতে তারই রূপ ভেসে ওঠে।

সারা বৎসর জুড়ে উত্তররাঢ়ে লেগেই আছে মেলাখেলা। একথা অনস্বীকার্য্য উত্তররাঢ়ের মত এত মেলা বাঙ্গলাদেশে আর কোথাও নেই। কুলদেবতার উপাসনায় যে উৎসব তার সাথে লোকসংস্কৃতির যোগাযোগ নেই বললেই চলে। কিন্তু গ্রাম্যদেবতার পূজার্চনায় যে আনন্দোৎসব তার সাথে গ্রামের কোমজীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। গ্রামের বাইরে গ্রামদেবতার আশ্রয়ে আপন বৈশিষ্টে একক এক সমাজজীবন গড়ে উঠেছে। যে কোন সামাজিক উৎসবেও এই গ্রামদেবতার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

লোকসংগীত আর লোকনৃত্যেই এই জনপদের বৃহত্তর গণজীবনের আনন্দের অভিষেক।

কারণ সঙ্গীত ও নৃত্য ব্যতীত আনন্দপ্রকাশের আর কোন উপায় এদের জানা নেই। কোন একটি পরিবারের বা গোষ্ঠীর সে আনন্দ তা' বৃহত্তর সমাজীবনে ছড়িয়ে পড়ে লোকসংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে। আনন্দে উদ্বেল আর নেশায় বিভোর যেন সম্পূর্ণ সমাজই সঙ্গীত আর নৃত্যে মেতে ওঠে। বুদ্ধিজীবীর মোহ বা অহঙ্কার নেই দেবতাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য, আপন করে পাওয়ার জন্য সমষ্টিগত সঙ্গীত ও নৃত্য একটি আবশ্যিক অনুষ্ঠান। এরই মাধ্যমে আবহমান কালের লোকসংস্কৃতির সুপ্রাচীন ও আদিমরূপটি নানা রূপান্তরের মাঝেও উত্তরকালের লোকচর্চার মধ্যে প্রবহমান।

সাঁওতালভূমির একাংশ উত্তররাঢ়ের সমতলভূমি স্পর্শ করায় আদিবাসীর সমাজজীবনের অবিশ্বাস্য সারল্য আর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে গৌরবান্বিত যে লোকসংগীতের ধারা—তা' উত্তররাঢ়ের লোকসংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে। বীরভূম জেলার পশ্চিমে ও উত্তরপশ্চিমে খণ্ড খণ্ড উপজাতির বসবাস যারা মূলতঃ দ্রাবিড়ভাষী বা কোলমুণ্ডা ভাষী—উত্তররাঢ়ের লোকসংগীতে এদের বিস্ময়কর অবদান আছে। এদেশীয় লোকসংগীত তার বৈচিত্র্য আর সমৃদ্ধির প্রয়োজনে এদের লোকসংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নিয়েছে।

ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার—ঐ অঞ্চলে লোকসংগীতের প্রসারে বাধার সৃষ্টি করেছে। নিষ্ঠাচারের নিষ্ঠুর চাপে লোকসংগীতের স্বচ্ছন্দ গতি সেখানে ব্যাহত। শিক্ষাভিমানীর রুচিশীল দাবী মেটাতে গিয়ে লোকসংগীত কৃত্রিম—জীবনীরস গেছে শুকিয়ে। কিন্তু ভাগীরথী হ'তে দূরস্থ এই উত্তররাঢ়ের মুষ্টিমেয়র মধ্যে সীমাবদ্ধ ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি অর্থনৈতিক অধিকারকে কুক্ষিগত করলেও সমষ্টির সংস্কৃতিচেতনাকে গ্রাস করতে পারে নি বরং কোথাও কোথাও বা কোমসংস্কৃতিতেই ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। ভূমি ও শস্যবণ্টনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য, তারই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে এসেছে অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা। এই দেউলিয়া অর্থনীতি শ্রমনির্ভর মানুষের সমাজজীবনে যে মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে লোকসংগীতের স্বাভাবিক প্রসারলাভে তা' এক প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। শুধু ধর্মবোধে তথা মানবিকতায় অপরিসীম বিশ্বাসই এই অঞ্চলের লোকসংগীতের অস্তিত্ব রক্ষায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

এই জনপদেই বাঙলাদেশের বৈষ্ণব ও বাউল ধর্মের ও গীতির সমধিক চর্চা—তাই এই অঞ্চলের লোকসংগীতের সুরে বাউল ও কীর্ত্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

আঞ্চলিক চেতনা

কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক চেতনাকে সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক চেতনা কিয়দংশে প্রভাবিত করবে একথা স্বাভাবিক। উত্তররাঢ়ের সংস্কৃতি চর্চা-ও আঞ্চলিক চেতনার প্রভাবমুক্ত হ'তে পারে নি।

আজ আমরা বাঙালী জাতি ব'লতে যা বুঝি-তা বহু বিচিত্র গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ। এক কোমের সাথে অন্য কোমের যোগাযোগ ব্যবস্থা শিথিল ছিল বিধিনিষেধও ছিল প্রচুর। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে সভ্যতার আদান প্রদানের সাথে এই বিধিনিষেধ শিথিল হ'য়ে যায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে বৃহত্তর কোমজীবন গড়ে উঠে। আত্মরক্ষার তাগিদে পরস্পর

পরস্পরের সাথে ভাবের আদানপ্রদান করতে থাকে। বিভিন্ন বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এক বিশেষ জনপদের সৃষ্টি হয় আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌমচেতনার অবলুপ্তি ঘটে। রাঢ় অঞ্চলকে অবলম্বন করেই রাঢ়োঃ জনপদের জীবনধারা আবর্তিত হয়।

আঞ্চলিক চেতনা ধনোৎপাদন পদ্ধতির জন্যই বিশেষভাবে প্রসারলাভ করেছে। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে মাঝে কয়েকটি শতাব্দীতে বাণিজ্য নির্ভরতায় সাময়িক পরিবর্ত্তন ছাড়া সৃষ্টির সুরু হ'তে আজ পর্য্যন্ত গ্রামজীবনে কৃষিনির্ভরতা কখনও ম্লান হয়ে যায় নি। যে ভূমিকে কেন্দ্র করে এই কৃষিনির্ভরতা সেই ভূমি নিশ্চল, অনড। যে কোন অঞ্চলের অধিবাসী সেই অঞ্চলের ভূমিও তার উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। তাই এই নির্দিষ্ট ভূমিকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক চেতনা যে সংস্কৃতি তাতে আঞ্চলিকতা থাকবেই। উত্তররাঢ়ের গোষ্ঠী বা জনের মাঝেই উত্তররাঢ়ের লোকসংস্কৃতি আবর্তিত। যদিও একথা সত্য—যে কোন আঞ্চলিক চেতনাই সামগ্রিক কৌমচেতনায় অবলুপ্ত। প্রাচীন যুগ হ'তে সুরু করে মধ্যপূর্ব যুগ পর্য্যন্ত দেশের সর্বত্রই কৌমচেতনার একক প্রসার দেশের সাংস্কৃতিক আন্দলোনকে সমান গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছে। পরবর্তীকালে শ্রেণী ও বর্ণবিন্যাস, নগর ও পল্লীবিন্যাস সর্বোপরি রাষ্ট্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে কৌমচেতনার প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হ'লেও কখনও একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায় নি। রাষ্ট্রবিন্যাস আঞ্চলিক চেতনাকে পরিস্ফুট করলেও আদিম কৌমচেতনা এক অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনধারার সাথে অন্য অঞ্চলের জীবনধারার যোগসাধনে সহায়তা করেছিল।

তাই উত্তররাঢ়ের লোকসংগীত বিশ্লেষণে যদি সমগ্র বাঙালী জাতির কৌমচেতনার আনুপূর্বিক ধারাটি ইতিহাসের সাথে সঙ্গতি রেখে আলোচনা করা যায় তাহ'লে কোন অসুবিধা হ'বে না ব'লেই মনে হয়। ইতিহাস আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে—উত্তররাঢ় তথা রাঢ়ের আঞ্চলিক চেতনা বাঙলা দেশের বৃহত্তর কৌমচেতনায় অবলুপ্ত। সারা বাঙলা দেশের লোকসংগীতে তথা সাংস্কৃতিক জীবনে একটি মূলগত ঐক্য আছে। বিশেষ করে ভূমি ব্যবস্থা—যার উপর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা--অনেকাংশে নির্ভরশীল—তা' বাঙলা দেশের প্রায় সর্বত্র সমান। তাই ভূমিব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রায় সুখদুঃখের যে অনিবার্য ইঙ্গিত তা' বাঙলা দেশের প্রায় সর্বত্রই সমানভাবে নাড়া দিয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই ভাষা, সুর, ছন্দবৈচিত্র্য, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদিতে আঞ্চলিকতা থাকলেও ভাবের ক্ষেত্রে সুদূর উত্তর অথবা পূর্ববঙ্গের লোকসংগীতের সাথে এই উত্তররাঢ়ের লোকসংগীতের মূলতঃ কোন বিভেদ নাই। উত্তররাঢ়ের হাটে-মাঠে-ঘাটে আর মেলা খেলায় লোকসংগীতের সুরে প্রণয়ীর যে প্রাণের ব্যথা ভেসে উঠে তা' সারা বাঙলা দেশের বিরহ কাতর দয়িত মনকেই স্পর্শ করে।

ইতিহাস

উত্তররাঢ়ের লোকসংগীতের নিজস্ব কোন ইতিহাস নাই। এই জনপদের একটি বিশেষ ভৌগলিক সত্ত্বা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তদনুযায়ী সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে

লোকসংগীতের নিজস্ব একটি রূপ, পরিবেশনের নিজস্ব একটি ভঙ্গী ফুটে উঠেছে—একথা সত্যি কিন্তু ইতিহাস বিচার বিশ্লেষণে সারা বাঙলার লোকসংগীতের ঐতিহাসিক রূপটিরই সাহায্য নিতে হ'বে।

বাঙলার লোকসংগীত বাঙলার লোক চর্চার একটি বিশেষ অঙ্গ। এই লোকসংগীতকে হৃদয় ও বুদ্ধির সাথে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হ'লে সমগ্র বাঙালী জীবনের আদিমরূপটি ও তার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস অনুধাবন করা প্রয়োজন, কারণ কোন জাতির জীবনপ্রবাহ আর গতিপ্রকৃতির পরিচিতি ছাড়া সেই জাতির লোকচর্চাকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সমতলভূমির নিস্তরঙ্গ নদীতটে ব'সে প্রবহমানা নদীর অখণ্ড জীবনবৃত্ত উপলব্ধি করা যায় না। সারি সারি পর্বতমালার মাঝে তার উৎসটিকে অনুসন্ধান করতে হ'বে। আজকের সমাজ উচ্চকোটির মানবজীবনের ভোগসুখের স্বার্থে বহুধাবিভক্ত। মধ্যযুগ হ'তে সুরু ক'রে বাঙলার জীবনে যে রাষ্ট্রবিন্যাস তা' ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মর্য্যাদারক্ষার ও প্রসারলাভে যে আনুগত্য দেখিয়েছে তার সামান্যতম অংশও লোকসংস্কৃতিরক্ষায় দেখানো হয় নি। বুদ্ধিজীবীর কূটকৌশলে পরবর্তীকালে সে বর্ণ বা শ্রেণীবিন্যাস তার ফলে অর্থনৈতিক মূলধন কেন্দ্রীভূত হ'য়েছে যেখানে—সেখানে লোকসংস্কৃতি অনুকম্পার বিষয়বস্তু। উৎপাদনের অসম বণ্টনব্যবস্থায় ও বিকল্প জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধ্য প্রতিকূলতায় আজকের সমাজজীবন বহুধা বিভক্ত। বেঁচে থাকার চিরন্তন দাবীতে একে অপরের অধিকারকে দাবিয়ে রাখছে। এহেন পটভূমিকায় লোকসংগীতের ইতিহাস বিচার নিরর্থক। গণচেতনায় সমৃদ্ধ ধর্ম ও হৃদয়ভিত্তিক সেই অবিভক্ত আদিম সমাজের মাঝেই লুকিয়ে আছে লোকসংগীতের প্রাণপ্রবাহিনী উৎসধারা। একথা ঠিক যে দেড় শত হ'তে দু' শত বৎসর পূর্বের লোকসংগীত সংগ্রহ করা সম্ভব নয় বললেই চলে। এই সংগৃহীত লোকগীত ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতাকে কতখানি অক্ষুণ্ণ রেখেছে তা নিঃসন্দেহে বিচার্য। এবং লোকসংগীতের এই সংস্করিত বা পরিবর্তিত রূপ ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখেই হ'য়েছে কিনা তাও আলোচনার বিষয়বস্তু। তবে একথা অনস্বীকার্য যে উত্তররাঢ় তথা বাঙলাদেশের লোকসংস্কৃতি ইতিহাসের সাথে কৌমজীবন তথা বাঙালীজীবনের ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে।

এই দেশের লোকসংস্কৃতির ইতিহাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশের ভৌগলিক অবস্থান একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাঙলাদেশ সমগ্র ভারতের উত্তর-পূর্বপ্রান্ত দেশ। যখন সারা ভারত জুড়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল উন্মাদনা তখন এই দেশের প্রাচীন আর্য্যেতর সভ্যতা আপন গৌরবে উজ্জ্বল। বাঙলাদেশে আর্যীকরণ সুরু হয় সবশেষে। আর্য সংস্কৃতির তরঙ্গ বিক্ষোভ যখন বাঙলাদেশের তটভূমিতে এসে ধাক্কা দিয়েছে তখন উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশে এই ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত। বাঙলাদেশ তখন আর্যপূর্ব কৌমসভ্যতা সংহতি ও আত্মবিশ্বাসের বলে একটি নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। উত্তর ভারতের আর্য্যভাষাভাষী সম্প্রদায় বাঙলাদেশে শিকারজীবী ও অরণ্যচারী কোমদের বলতো 'ম্লেচ্ছ' 'দস্যু' আর এদের ভাষাকে বলতো 'অসুরের ভাষা', উচ্চকোটির মানুষ এদের দেখতো ঘৃণার চোখে, এরাও আর্য্যসম্প্রদায়কে দেখতো অশ্রদ্ধা

আর সন্দেহের চোখে। তাই প্রবল বিরোধ আর সংঘর্ষের মাঝেই এই আর্যীকরণ সুরু হয়। আর্য্যপূর্ব সংস্কৃতি ছিল তখন গভীর ও ব্যাপক। জাতির অন্তরের সাথে ছিল নিবিড় যোগাযোগ। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সংঘর্ষ চলেছে। গুপ্ত যুগের পূর্ব পর্যন্ত আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার বা বর্ণবিন্যাস এ দেশের সমাজে তেমন স্বীকৃতি লাভ করে নি। এ দেশের মানুষ তখনও তার নিজস্ব লোকসংস্কৃতি নিয়ে কালাতিপাত করছিল। একাদশ দ্বাদশ শতকে এসে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কার বাঙালী সমাজজীবনের শুধু উচ্চকোটিতেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ফলে রাষ্ট্র সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক অসম বিন্যাস দেখা দিয়েছে। সমাজের এক অংশে যখন উপনিষদ আর ব্রহ্মবাদের প্রচলন, উচ্চতর মননশক্তির চর্চা, যাগযজ্ঞ ও আহুতির প্রচলন—অন্য অংশে তখনও আধিভৌতিক মতবাদ, বৃক্ষপূজা আর যাদুশক্তিতে অকৃত্রিম বিশ্বাস। 'ইতিহাসের এই অসম গতি' বাঙালীজীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

বাঙলার লোকচর্চার যে বিভিন্ন ধারা যথা ব্রত, ছড়া, গাথা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি আজও প্রবহমান তা মূলতঃ সমাজের অন্দর মহলে ও নিম্নকোটির সমাজজীবনে সীমাবদ্ধ। উচ্চকোটির পুরুষজীবনে লোকসংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরাভব ঘটলেও উপরিউক্ত দুই স্তরের ব্যবহারিক জীবনের আচারে, ধর্মে, ভাবনা কল্পনায় সেই আর্য্যপূর্ব সংস্কৃতিও ধ্যান ধারণার চর্চা চলেছে। লোক-সংস্কৃতির অন্যতম শাখা লোকসংগীতেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখা দেয় নি।

বাঙলার উচ্চবর্ণের সমাজজীবনে সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা হ'য়েছে, বিজ্ঞানের প্রসারলাভ ঘটেছে জীবনধারণের কৌশল হ'য়েছে অনেক উন্নত। কিন্তু এর কোন প্রভাবই লোকসংস্কৃতির গতিকে রুদ্ধ করে দিতে পারে নি। বরং কখনও কখনও আপন সমাজ ও ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে কিছু কিছু গ্রহণ করেছে। বাঙালীর ইতিহাসের বৈচিত্র্যই এই যে—সংস্কৃতির এই দুই ধারা প্রায় গুপ্তযুগ হ'তে আজ পর্যন্ত সমান্তরালভাবে প্রবহমান। রাষ্ট্রীয় বা উচ্চকোটির সমাজের আনুকূল্যে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির ধারা ক্রমশঃ স্ফীত হ'য়েছে একথা সত্য কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির সাথে লোকচর্চার মাঝে পরিস্ফুট যে গণচেতনা তার একাঙ্গীকরণ সম্ভবপর হয় নি। লৌকিক দেবদেবী, ভূতপ্রেত, গাছপাথর আর যাদুতে বিশ্বাস-ই প্রতিফলিত হ'য়েছে লোকসংগীত ও নৃত্যে। পালাপার্বণে সেই আদিম কোমবদ্ধ মানবজীবনের ধ্যানধারণা। পরবর্তীকালে সমাজের এলেকা বৃদ্ধির সাথে জীবিকার এলেকাও সম্প্রসারিত হ'য়েছে কিন্তু সম্প্রসারিত জীবিকার কোনক্ষেত্রেই গণজীবনের সেই আদিম সংস্কারটিকে অবহেলা করতে পারে নি।

বাঙালীজীবনে ধর্মবিশ্বাসের সংস্কৃতির যোগ নিগূঢ়। যে হেতু আর্যব্রাহ্মণ্যধর্ম সমাজের উচ্চতম স্তর ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—শত শত বছরের প্রচেষ্টাসত্ত্বেও এ ধর্ম তার মূল সমাজের অন্তরে শ্রেণীর মধ্যে প্রসার লাভ করতে পারে নি ঠিক সেই কারণেই বাঙলার লোকসংগীত তথা লোকসংস্কৃতি শিক্ষিত ও সংস্কৃত মানুষ সহৃদয়চিত্তে ও অন্তরের সাথে গ্রহণ করতে পারে নি। মাঝে মাঝে অনুকম্পার দৃষ্টি হেনেছে মাত্র কিন্তু কখনও তাদের নিষিদ্ধ এলেকায় প্রবেশাধিকার দেয় নি। ইতিহাসের ধারা আজও এখানে অব্যাহত।

মূলতঃ যে কারণগুলির জন্য এই দুই সংস্কৃতির সমীকরণ সম্ভবপর হয় নি—তা হ'চ্ছে :—

প্রথমতঃ বাঙলাদেশে আর্য্যধর্মের প্রভাব এসেছে সবশেষে। দ্বিতীয়তঃ—আর্যসভ্যতার যে প্রবাহটি এসেছে—তা' শক্তির দিক হ'তে তৎকালীন কৌমসভ্যতার শক্তির তুলনায় অনেকাংশে ক্ষীণ। তৃতীয়তঃ—উভয় সংস্কৃতি পরস্পরকে সংশয় ও অবিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করছে। আর্যমানসের শিক্ষাভিমান ও উন্নাসিকতা, আর্য্যেতর সম্প্রদায়ের আর্যধর্মে শ্রদ্ধার অভাব উভয়কেই দূরে সরিয়ে রেখেছে। সংকীর্ণ গণ্ডির মাঝে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সুচিতারক্ষা আর তার মাঝেই প্রসার সমাজের বৃহত্তর গণজীবন সম্পর্কে কোনদিনই উদার মনোভাব গ্রহণে সহায়তা করে নি। চতুর্থতঃ—বাঙলাদেশে নানা বর্ণ মিশ্রণের ফলে ও নানা ঐতিহাসিক কারণে জাতিভেদ আর্যভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় শিথিল। সমাজবদ্ধতার সুরু হ'তেই শূদ্রদেরই সংখ্যাধিক্য। আর্য-ভারত সনাতনত্বের আদর্শে স্থির। সামাজিক বিধিবদ্ধতা ও কঠোর নিষ্ঠাচার হ'তে আর্যভারতের কখনও বিচ্যুতি ঘটে নি। বাঙলার ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভিন্ন সময়ে ঐতিহাসিক কারণেই নানা ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে—মাঝে মাঝে বৈপ্লবিক আলোড়নের ফলে নানা বিপরীতধর্মী মতবাদের সহাবস্থান সম্ভব হয়েছে। উত্তররাঢ় জনপদের গ্রামে গ্রামে এর প্রমাণ ছড়িয়ে র'য়েছে। বাঙলার লোকসংগীত তথা লোকসংস্কৃতি সকলকে গ্রহণ করে নিজের ভাব মনের মত গড়ে নিয়েছে। কৌমজীবনের লোকসংস্কৃতির সুপ্রাচীন ধারাটিই বাঙালীকে সেই দুর্মদ প্রাণশক্তি জুগিয়েছে। পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব সাধনায় ও বাউলের সহজিয়াতত্ত্বে যে প্রাণবন্ত হৃদয়াবেগ—তা এই আদিপর্বেরই উত্তরাধিকার। সংগীতে, নৃত্যে, ভাবে কল্পনায় আর্য্যেতর ধ্যানধারণা আজকের বাঙালীসমাজকে আরও দিয়েছে—মানবতাবাদ—ভালবাসার আর বিশ্বাসের অধিকার।

ইতিহাসের সত্যই এই যে পৃথিবীর সব শিক্ষিত, সভ্য ও সংস্কৃত সম্প্রদায়ই তাদের নিজ স্বধর্ম, মতামত অনুন্নত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাঝে নানা কলাকৌশলে চালিয়ে দিতে চায় ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতিকে একেবারে নিঃশেষ করে দিতে চায় কিন্তু বাঙালীর কৌমসংস্কৃতি চরম ঔদাসীন্যে অস্বীকার করেছে আর্য্যসংস্কৃতিকে। তাই আজও বাঙলার লোকসংস্কৃতি অর্থনীতির দুঃসহ চাপকে উপেক্ষা করে টিকে রয়েছে। আজও লোকসংস্কৃতি প্রবহমান।

শরচ্চন্দ্র দাশ

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ জুলাই (২রা শ্রাবণ, ১২৫৫ বঙ্গাব্দ) চট্টগ্রাম শহরে শরচ্চন্দ্র দাশের জন্ম হয়। শরচ্চন্দ্রের পিতা দীনদয়াল ওরফে মাগন দাশ চট্টগ্রাম কালেক্টরী অপিসে কর্ম করিতেন। এই পরিবারের বাসস্থান ছিল চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত চক্রশালা পরগণার আলামপুর গ্রাম। মোগল-শাসন কালে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল হইতে এই বৈদ্য পরিবার চট্টগ্রামে গিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। শরচ্চন্দ্রের পিতামহ ত্রিপুরা রাজসরকারের কর্মচারী ছিলেন। ইনি একজন অতিশয় ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। ইনি পদব্রজে কৈলাশ ও মানস সরোবর দর্শন করেন। শরচ্চন্দ্রের পিতা মাগন দাশও একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি স্বীয় বাসগৃহের নিকট "ক্রমদীশ্বর" নামে একটি শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

গ্রামস্থ পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া শরৎচন্দ্র চট্টগ্রাম স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর এল. এ. (Lower Arts) পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্ত বিভাগে অধ্যয়নের জন্য প্রবিষ্ট হন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি পূর্তশিক্ষা কলেজ (Civil Engineering College) প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই কলেজটি প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তর্ভুক্ত এই পূর্ত বিভাগের বিলোপ সাধন করা হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে পূর্ত বিভাগে অধ্যয়নকালে শরচ্চন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ Sir Alfred Croft এর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র যখন পূর্ত বিভাগের অন্তিম শ্রেণীর ছাত্র তখন সিকিমের সম্ভ্রান্ত বংশীয় বালকদের ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য বাঙ্গালার তদানীন্তন লেপ্টন্যান্ট গভর্ণর সার জর্জ ক্যাম্পবেল দার্জিলিং শহরে ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে শরচ্চন্দ্র স্বাস্থ্যলাভার্থ দার্জিলিংএ বাস করিতেছিলেন। হিতৈষী অধ্যাপক আলফ্রেড্ ক্রফ্টের অনুরোধে শরচ্চন্দ্র এই নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণের পর শরচ্চন্দ্র অতি যত্নসহকারে তিব্বতীয় ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। সুদূর অতীতে ভারতীয় পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ তিব্বতে গিয়া কি ভাবে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার ও প্রচার করেন তাহার বিবরণ সর্বপ্রথম তিব্বতীয় গ্রন্থাদিতে পাঠ করিয়া তিব্বত ভ্রমণের জন্য শরচ্চন্দ্রের মনে প্রবল আগ্রহ জাগরিত হয়। ভুটিয়া আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে শরচ্চন্দ্র সিকিমের মহারাজা ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত পরিচিত হন। ইহারা শরচ্চন্দ্রের তিব্বতীয়, পালি ও সংস্কৃত ভাষা-জ্ঞান এবং বৌদ্ধ ধর্মানুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। শরচ্চন্দ্রের অধীনে তাঁহার বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন উগায়েন গিয়াৎস্থ নামে একজন সিকিমবাসী লামা। এই তিব্বত বংশীয় লামা ভুটিয়া বিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে সিকিমের পেমাইয়াংসি মঠের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এই মঠের পক্ষ হইতে ধর্মীয় ব্যাপারে উগায়েন গিয়াৎস্থ তিব্বতে পাঞ্চেন

লামার রাজধানী তাসি লুনপো ও লাসায় প্রেরিত হন। শরচ্চন্দ্র যে তিব্বত ভ্রমণে অত্যন্ত আগ্রহী উগায়েন গিয়াৎসুর ইহা অজ্ঞাত ছিল না। উগায়েন গিয়াৎসুর নিকট শরচ্চন্দ্রের সংস্কৃত-জ্ঞান, বৌদ্ধ ধর্মানুরাগ এবং তিব্বতী ভাষা ও সংস্কৃতি প্রীতির কথা জানিতে পারিয়া পাঞ্চেনলামার প্রধানমন্ত্রী ও গুরু সেঙ্গ্ছেন দর্জিছেন্ (Songchen Darjechan) শরচ্চন্দ্রের তিব্বত ভ্রমণের 'ছাড়পত্র' মঞ্জুর করাইয়া দেন। এই সময় তিব্বতে কোন বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ ছিল, বিদেশী মাত্রকেই গভীর সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ভ্রমণকারীর প্রাণ বধ করা হইত। এদিকে কোন বৃটিশ প্রজাকে তিব্বত যাত্রার অনুমতি দিতেন না। যাহা হউক উভয় দিক হইতেই তিব্বত ভ্রমণের অনুমতি সংগ্রহ করিয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে শরচ্চন্দ্র উগায়েন গিয়াৎসু সহ পদব্রজে তিব্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই ভ্রমণকালে শরচ্চন্দ্র একটি ক্যামেরা, দিগ্দর্শনযন্ত্র দূরবীক্ষণ ও তাপমাপক যন্ত্র, পরিমাপক যন্ত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি জরীপ (survey) সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই অভিজ্ঞতা তিব্বত ভ্রমণ কালে ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

সিকিমের জঙ্গরি নামক স্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া শরচ্চন্দ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করতঃ নেপাল রাজ্যের ইয়াম পাঠশাল নামক স্থানে আসেন। এই স্থান হইতে তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চিমপার্শ্বস্থ গিরিসঙ্কট ধরিয়া তাসিচোডিং নামক স্থানে পৌছেন। তাসিচোডিং হইতে তিব্বত সীমান্তের চাংখালা গিরিপথ দিয়া তিনি জেমু নদীর অববাহিকায় উপনীত হন এবং এই স্থান হইতে তিব্বতের তানিলুনপো মঠে উপস্থিত হন। ছয়মাসকাল এই মঠের ছাত্ররূপে শরচ্চন্দ্র বহু দুর্লভ বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার পূর্ব অধীত তিব্বতীয় ভাষা-জ্ঞান বিশেষ কাজে আসিয়াছিল। তিব্বতে অবস্থান কালে পাঞ্চেনলামার প্রধানমন্ত্রী শরচ্চন্দ্রের বিদ্যাবত্তা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। ছয় মাস পর প্রত্যাবর্তন কালে শরচ্চন্দ্র তিব্বত হইতে বহু পুঁথি, পট প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া আসেন। তিব্বত ভ্রমণ ও যাত্রাপথের বিবরণ সম্বন্ধে শরচ্চন্দ্র স্বদেশে ফিরিয়া যে পুস্তক রচনা করেন, বেঙ্গলগভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাহা প্রকাশিত হয়। বাঙ্গলা সরকারের তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগীয় অধিকর্তা Sir Alfred Croft স্বয়ং এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দেন (১) এই পুস্তকটিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশৃঙ্গের উত্তর ও উত্তরপূর্বাঞ্চলের যে ভূবৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট আছে তাহা এখনও অতিশয় মুল্যবান ও তথ্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। পাঞ্চেন লামার প্রধানমন্ত্রী গুরু সেঙ্গ্ছেন দর্জিছেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে আগ্রহান্বিত ছিলেন। শরচ্চন্দ্রের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় প্রকার বিদ্যাবত্তার দ্বারা তাঁহার ও তিব্বতবাসীর উপকার হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি শরচ্চন্দ্রকে পুনরায় তিব্বত ভ্রমণের আমন্ত্রণ পাঠান। এই আমন্ত্রণ পাইয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র পুনরায় তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করেন। তিব্বত সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ ভৌগলিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভ ও বৌদ্ধগ্রন্থাদি উদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে শরচ্চন্দ্রের চেষ্টায় প্রীত হইয়া বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে দ্বিতীয়বার তিব্বত যাত্রায় উৎসাহিত করেন।

এই যাত্রায় শরচ্চন্দ্র কিছুদিন তাসিলুনপো মঠে ও কিছুদিন নিষিদ্ধ নগরী লাসায় অতিবাহিত করেন। শরচ্চন্দ্রের পূর্বে নয়ন সিং ও কিসেন সিং নামে আর দুইজন মাত্র ভারতীয় যথাক্রমে ১৮৬৬ ও ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লাসায় গিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় তিব্বত ভ্রমণ করিয়াছেন

বলিয়া জনশ্রুতি আছে কিন্তু ইহার কোন অকাট্য প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যতদিন পর্যন্ত রাজা রামমোহনের তিব্বত যাত্রার ঘটনা অবিসংবাদীরূপে প্রমাণিত না হয় ততদিন ইহা বলা যাইতে পারে যে বৃটিশ শাসনকালে শরচ্চন্দ্রই তিব্বত ভ্রমণকারী প্রথম বাঙ্গালী সন্তান।

সুদীর্ঘ চৌদ্দমাসকাল তিব্বত বাস করিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র বহু পুঁথি সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শরচ্চন্দ্র দ্বিতীয়বার তিব্বত ভ্রমণ সম্বন্ধে দুইখানি বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন একটি লামা ভ্রমণের বিবরণী অপরটি পল্‌তি হ্রদ, লোকো, ইয়ালুং এবং সাকিয়ার বিবরণী বা জরীপ প্রতিবেদন (survey)। বই দুইখানি যথাক্রমে ১৮৮৫ ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মুদ্রিত হইলেও জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই। গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া এই বিবরণী দুইটির কিছু অংশ ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ Cotemporary Review (July, 1890) ও Nineteenth Century (August 1895) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই বিবরণী দুইটির বহু অজ্ঞাত ভৌগোলিক তথ্য সমন্বিত সারভাগ ইংল্যাণ্ড হইতে প্রকাশিত হইয়া ভৌগোলিক রূপে শরচ্চন্দ্রের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করে (২)।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রথমবার তিব্বত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট তিব্বতীয় অনুবাদক (Tibetan Translator) নামে একটি পদের সৃষ্টি করিয়া শরচ্চন্দ্রকে এই পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক প্রয়োজনে শরচ্চন্দ্রকে চীফ্-সেক্রেটারী কোলম্যান মেকলের সহিত সিকিম প্রেরণ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক প্রয়োজনের জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট তিব্বতে একদল কর্মচারী প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। এই সময় তিব্বত চীনের অধীন ছিল এবং সরাসরি এক বা একাধিক ইংরাজ কর্মচারীর পক্ষে তিব্বত প্রবেশ অসম্ভব ছিল। এই জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের চীফ্সেক্রেটারী কোলম্যান মেকলেকে এই অনুমতি সংগ্রহের জন্য পিকিঙ প্রেরণ করেন। শরচ্চন্দ্রের প্রগাঢ় সংস্কৃত ও বৌদ্ধশাস্ত্রাভিজ্ঞতার জন্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চীনে তাঁহার সহায়তা বিশেষ কার্যকারী হইবে মনে করিয়া গভর্ণমেণ্ট শরচ্চন্দ্রকেও কোলম্যান মেকলের সহিত চীনে প্রেরণ করেন। চীনে বাসকালে অল্পদিনের মধ্যেই শরচ্চন্দ্র তথাকার লামা বা বৌদ্ধপণ্ডিত সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তথাকার বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণ তাঁহার বৌদ্ধধর্মানুরাগ ও বৌদ্ধশাস্ত্র পারঙ্গমতার জন্য তাঁহাকে "কাচেন লামা" অর্থাৎ কাশ্মীর হইতে আগত লামা নামে অভিহিত করিতেন। ইতিপূর্বে তিব্বতে বাস কালে তিব্বতীয় লামারা তাঁহাকে 'খেনছেন' বা মহোপাধ্যায় উপাধি দান করেন।

রাজনৈতিক কারণে চীন সরকার ইংরাজ রাজকর্মচারীদের তিব্বত প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলে শরচ্চন্দ্র, কোলম্যান মেকলে সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইংরাজ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল না হইলেও ব্যক্তিগতভাবে শরচ্চন্দ্রের এই চীন ভ্রমণ ব্যর্থ হয় নাই। চীনে অবস্থানকালে বহু চৈনিক বৌদ্ধ পণ্ডিতের বিশেষতঃ চীনের প্রধান লামা চাং চিয়া হুতুকেতুর সহিত তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। ইহাদের সাহচর্যে শরচ্চন্দ্রের বৌদ্ধশাস্ত্র জ্ঞান বিশেষ পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ভৌগলিক তথ্য আবিষ্কার, তিব্বত হইতে বৌদ্ধশাস্ত্রাদি উদ্ধার ও তিব্বতীয় ভাষাচর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ শরচ্চন্দ্রকে C. I. E. উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার দশ বৎসর পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন।

দুইবার তিব্বত ও একবার চীন ভ্রমণ করিয়া শরচ্চন্দ্র ভারতে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম এই দুই দেশে কিভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা অধ্যয়নের সুযোগ পান কিন্তু ইহাতেও তাঁহার জ্ঞান-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় নাই। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য শরচ্চন্দ্র শ্যামদেশে (Thailand) গমন করেন। এই স্থানে কিছুকাল ধরিয়া তিনি রাজকুলজাত বৌদ্ধপণ্ডিত বজ্রজ্ঞান বরোরসের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শরচ্চন্দ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া শ্যামদেশের অধিপতি তাঁহাকে "তুষিতমত" পদক দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন।

দুইবার তিব্বত ভ্রমণ করিয়া এই দেশ ও সন্নিহিত অঞ্চল সম্বন্ধে শরচ্চন্দ্র ইংরেজী ভাষায় যে সমস্ত প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনা করেন উহা বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারের নিমিত্ত তাঁহাকে একটি পারিতোষিক (Back Premium) প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।

দুইবার তিব্বত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় শরচ্চন্দ্র দুই শতকেরও অধিক পুঁথি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় ও সংগ্রহ করিয়া আনেন। এই পুঁথিগুলির মধ্যে বেশির ভাগ ছিল সংস্কৃত গ্রন্থ অথবা সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ। এই সব গ্রন্থগুলির মধ্যে ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র রচিত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা নামীয় সংস্কৃত গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতায় ভগবান বুদ্ধ পূর্ব পূর্ব জন্মে কি রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিরূপে বোধিলাভ করিয়াছেন তাহা বিবৃত আছে, প্রসঙ্গক্রমে নানাবিধ ধর্মমূলক উপদেশও ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র দশম শতাব্দীর শেষে বা একাদশ শতাব্দীর শেষে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। ১২০২ খৃষ্টাব্দে ক্ষেমেন্দ্র রচিত এই সংস্কৃত কাব্যের একটি পুঁথি তিব্বতে নীত হয়। লক্ষ্মীশ্বর নামক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে লোচবা নামক এক পণ্ডিত তিব্বতীয় ভাষায় এই গ্রন্থটি অনুদিত করেন। পরবর্তীকালে এই পুস্তকের তিব্বতীয় অনুবাদ ও সংস্কৃত মূল (তিব্বতী অক্ষরে) কাষ্ঠ খোদাই হইয়া তিব্বতীয় পণ্ডিতদের পঠিত হইত। উনবিংশ শতাব্দীতে কাষ্ঠখোদাই এই পুস্তকের একটি খণ্ড (Xylograph) শরচ্চন্দ্র তিব্বত হইতে সংগ্রহ করিয়া আনেন। ইতিপূর্বে নেপাল হইতে এই পুস্তকের সংস্কৃত ভাগের একাংশ মাত্র সংগৃহীত হইয়া কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হইয়াছিল। ভারতীয় মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের সম্পূর্ণ রচনাটি শরচ্চন্দ্র কর্তৃক তিব্বত হইতে আনীত হওয়ার সংবাদ পাইয়া কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি শরচ্চন্দ্রকে উহা প্রকাশের ভারার্পণ করেন। সোসাইটির অনুরোধে শরচ্চন্দ্র ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের একটি খণ্ড সোসাইটিতে রক্ষিত নেপালে প্রাপ্ত পুঁথির সহায়তায় মিলাইয়া সম্পাদন ও প্রকাশ করেন (৩)। পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুরোধে শরচ্চন্দ্র চারিখণ্ডে এই মহাগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করেন (৪)।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচিত "অভিসার" কবিতাটির (কথা ও কাহিনী) সহিত বাঙ্গালী পাঠক

পাঠিকা মাত্রেরই পরিচয় আছে। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ক্ষেমেন্দ্র রচিত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতাই এই কবিতাটির উৎস। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক এই গ্রন্থটি শরচ্চন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশের পর ১৩০৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীমূলক অনুপম কবিতাটি রচনা করেন। শরচ্চন্দ্র সম্পাদিত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা পাঠ করিয়াই যে রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীটির সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহা অনুমান করা সম্ভবতঃ অসঙ্গত হইবে না।

শরচ্চন্দ্র অনেকগুলি বাঙ্গলা ও ইংরাজী সাময়িক পত্রের লেখক ছিলেন এবং কলিকাতার দুইটি বিশিষ্ট সংস্কৃত কেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৮১ হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে (জার্ণালে) ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, বৌদ্ধধর্ম, লোক-যান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার ৩২টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সোসাইটির সম্মানিত সহযোগী সদস্য (Associate Member) শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই শরচ্চন্দ্র ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্রকে পরিষদের 'বিশিষ্ট সদস্য' শ্রেণীভুক্ত করা হয়। শরচ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর পরিষদ ভবনে তাঁহার একটি তৈলচিত্রও রক্ষিত করা হয়।

নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া শরচ্চন্দ্র মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দান করিতেন। নানাস্থানে তাঁহার দ্বারা প্রদত্ত ভাষণগুলি একত্রিত করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (৫)। "তুষার দেশে ভারতীয় পণ্ডিত" নামে এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া জানা যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় পণ্ডিতগণ তিব্বতে যাইয়া কিভাবে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য প্রচার করিয়াছিলেন। ভারত সভ্যতার তিব্বত জয়ের বিস্মৃত অধ্যায়টি ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে শরচ্চন্দ্রই সর্বপ্রথম তিব্বতীয় ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে অবগত হইয়া বিশ্বসমাজে তাহা প্রচার করেন। এ বিষয়ে তাঁহাকেই পথিকৃত বলা যাইতে পারে।

তিব্বতীয় ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে গিয়া শরচ্চন্দ্র আবিষ্কার করেন যে খৃষ্টিয় ৭ম শতাব্দী হইতে তিব্বতীয় সাহিত্যের যে বিবর্তন হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে একান্তভাবে ভারতীয় সাহিত্য। এবং তিব্বতীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করিলে ভারতীয় সাহিত্যের লুপ্ত অংশোদ্ধারও সম্ভব। বঙ্গীয় সরকারের তিব্বতীয় ভাষানুবাদক রূপে তিনি গভর্ণমেণ্টকে একটি তিব্বতী-ইংরাজী-সংস্কৃত অভিধান সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করাইতে সমর্থ হন। অতঃপর সরকারের অনুমতি লইয়া তিনি সুদীর্ঘকালের চেষ্টায় একটি তিব্বতী-ইংরাজী অভিধান (সংস্কৃত সমার্থক শব্দ সহ) সঙ্কলন কার্য সম্পন্ন করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সুবৃহৎ আকারে ১৩৫০ পৃষ্ঠাযুক্ত এই অভিধানটি প্রকাশিত হয় (৬) ইতিপূর্বে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে Cosma de Cros ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে Jaschke রচিত তিব্বতী অভিধানদ্বয়ের অপেক্ষা শরচ্চন্দ্র সঙ্কলিত অভিধানটির শব্দ সংগ্রহের ক্ষেত্র বহু ব্যাপকতর। ভারতবিদ্যাচর্চার পূর্ণাঙ্গতা সাধনে অধুনা তিব্বতীয় ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। শরচ্চন্দ্রের অভিধান দ্বারা তিব্বতীয় ভাষা চর্চার পথ কতদূর সুগম হইয়াছে যাহারা তিব্বতীয় ভাষা চর্চা করেন তাঁহারাই ইহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিব্বতীয় ভাষা চর্চার সুবিধার জন্য এই গ্রন্থটি অবিকল পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। এই অভিধান ব্যতীত তিব্বতী ভাষা শিক্ষার জন্য শরচ্চন্দ্র আরও কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন; ইহার মধ্যে একটি তিব্বতীয় ব্যাকরণ পাঠ্যপুস্তকের নাম উল্লেখযোগ্য (৭)।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্ত শরচ্চন্দ্র কলিকাতায় Boddhist Text Society নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন ও নিজে ইহার পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধদেশগুলিতে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতি অনুসন্ধান ও এই সব দেশে প্রাপ্ত অপ্রকাশিত সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকাশ ছিল এই সংস্থার উদ্দেশ্য। এই সংস্থার উদ্যোগে শরচ্চন্দ্র কর্তৃক অনেকগুলি দুর্লভ সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। এই সমিতির মুখপত্রটির (Journal of the Buddhist Text Society) সম্পাদন কার্যও শরচ্চন্দ্র সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পরিচালনা করেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শরচ্চন্দ্র নিরলসভাবে নিজেকে সাহিত্য চর্চায় ও Buddhist Text Society এর সেবায় নিযুক্ত করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র রচিত অপর একটি পুস্তক "চারুচর্যা শনক"এর একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ক্ষেমেন্দ্র রচিত এই সংস্কৃত কাব্যটিও তিনি তিব্বত হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। এই গ্রন্থে রামায়ণ মহাভারতের উপদেশগুলি পদ্যাকারে সংগৃহীত হইয়াছে (৮)।

পরিণত বয়স পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও জ্ঞানান্বেষণ স্পৃহা এতদূর বলবতী ছিল যে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে একজন জাপানদেশীয় বৌদ্ধপণ্ডিতের সহিত বৌদ্ধশাস্ত্রাধ্যায়নের জন্য তিনি জাপান যাত্রা করেন। দেশে ফিরিয়া এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশ করেন। জাপানে বৌদ্ধধর্মাচার্যেরা শরচ্চন্দ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রচুর সম্মান জ্ঞাপন করেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট তিব্বত ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের ভৌগোলিক তথ্যানুসন্ধানের পুরস্কার স্বরূপ শরচ্চন্দ্রকে চট্টগ্রাম জেলায় পুরুষানুক্রমে ভোগের জন্য ১৪০০ শত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। শরচ্চন্দ্র এই সম্পত্তি নিজে ভোগ না করিয়া তাঁহার পিতৃ প্রতিষ্ঠিত ক্রমদীশ্বর শিবের সেবায় অর্পণ করেন। লুপ্ত বৌদ্ধগ্রন্থ উদ্ধার ও প্রচার কার্যে আজীবন ব্যয়িত করিলেও আনুষ্ঠানিক ভাবে শরচ্চন্দ্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ভগবান বুদ্ধ প্রচারিত সদ্ধর্মের লক্ষ্য হইল মানুষের শিক্ষা ও আত্মার পবিত্রতা সাধন। বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম যে সনাতন হিন্দু ধর্ম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে শরচ্চন্দ্র দৃঢ়ভাবে এই মতই পোষণ করিতেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারী (২১শে পৌষ, ১৩২৩) চট্টগ্রাম শহরের অদূরবর্তী দেবপাহাড় নামক স্থানে শরচ্চন্দ্র পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বিধবা পত্নী, পাঁচ পুত্র ও সাতটি কন্যা রাখিয়া যান। শরচ্চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র দাশও (১৮৫৩-১৯১৪) একজন শক্তিশালী কবি ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি কয়েকটি সংস্কৃত কাব্য অপূর্ব দক্ষতার সহিত বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন। শরচ্চন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বেই নবীনচন্দ্রের দেহান্ত হয়।

শরচ্চন্দ্রের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু, উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নিষিদ্ধ দেশ তিব্বত এবং সন্নিহিত অঞ্চল সম্বন্ধে তিনি যেসব ভৌগোলিক সামাজিক,

ধার্মিক ও নৃতাত্ত্বিক তথ্য আহরণ করিয়াছেন তাহা বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তিব্বত হইতে লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থাদি উদ্ধার ও তাহার প্রচার এবং তিব্বতী ভাষার অভিধান রচনা দ্বারাও বিশ্বের পণ্ডিত সমাজে তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে শরচ্চন্দ্র বৃটিশ সরকারের গুপ্তচর রূপে তিব্বতে গিয়াছিলেন এবং বৃটিশ ঔপন্যাসিক কিপলিঙের 'Kim' উপন্যাসের বাঙ্গালী গুপ্তচর চরিত্রটি তাঁহাকে আদর্শ করিয়াই অঙ্কিত হইয়াছে। শরচ্চন্দ্র যে বৃটিশের গুপ্তচর রূপে তিব্বত ভ্রমণে যান নাই, এ কথা নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে। তিনি নিজের আত্মবিবরণীতে লিখিয়াছেন যে অতীতে ভারতীয় পণ্ডিতদের তিব্বত ভ্রমণ ও জ্ঞান প্রচারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই পবিত্র দেশের অনুপম সৌন্দর্য দেখিতে ও জ্ঞানসঞ্চয় করিতেই তিনি সে দেশে যান, কোন বৈষয়িক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাঁহার ছিলনা। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারত-তিব্বত সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের প্রতিষ্ঠাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। শরচ্চন্দ্র নিজের সাধনা দ্বারা এই মৈত্রী প্রতিষ্ঠার সূত্রপাতও করিয়া গিয়াছেন। যে কোন দেশের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক তথ্য আহরণের অধিকার যে কোনও মানুষেরই আছে। সভ্য রাষ্ট্র মাত্রই এই অধিকার বিদেশীকেও দিয়া থাকেন। তিব্বত ভ্রমণ করিয়া নানা তথ্য আহরণের পর পুস্তকাদি প্রণয়ন ও প্রচার দ্বারা শরচ্চন্দ্র তিব্বত রাষ্ট্র বা তিব্বতের জনসাধারণের প্রতি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। শরচ্চন্দ্রের তিব্বত ত্যাগের পর তিব্বত সরকার শরচ্চন্দ্রের আশ্রয়দাতা পাঞ্চেনলামার প্রধানমন্ত্রীকে নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতন করিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মধ্যযুগীয় মনোভাব সম্পন্ন কয়েকজন ক্ষমতান্ধ রাষ্ট্রনিয়ন্তা অমূলক সন্দেহ বশে শরচ্চন্দ্রের আশ্রয়দাতা বন্ধুকে হত্যা করিয়াছিলেন এই ঘটনা হইতেই শরচ্চন্দ্র যে বৃটিশচর রূপে তিব্বতে গিয়াছিলেন ইহা প্রমাণিত হয় না।

শরচ্চন্দ্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন ভৌগোলিক বা অন্যবিধ তথ্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তিব্বতের প্রতি কোন আক্রমণ মূলক কার্যে ব্যবহার করিয়াছে শরচ্চন্দ্রের তিব্বত ভ্রমণোত্তর কালীন ইতিহাসে তাহার কোন সাক্ষ্য নাই। তিব্বত আক্রমণের কোনও পরিকল্পনা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কোন দিনও ছিল না অন্ততঃ এ পর্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যখন তিব্বতের কোনও অনিষ্ট কোনও দিনও করেন নাই, তখন শরচ্চন্দ্রকে ইংরাজের গুপ্তচর বলিয়া ভাবিলে এই স্বাধীনচেতা, তেজস্বী, ধর্মনিষ্ঠ, বন্ধু-বৎসল জ্ঞান ভিক্ষু পরিব্রাজকের উপর ঘোরতর অবিচার করা হইবে। কল্পনা-কুশলী ঔপন্যাসিকের অলস কল্পনা জৃম্ভন দ্বারা শরচ্চন্দ্রের চরিত্র হনন কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

গুপ্তচর বৃত্তির সহিত যে বিশ্বাসঘাতক প্রবণতা ওতোপ্রোত রূপে জড়িত থাকা প্রয়োজন শরচ্চন্দ্রের চরিত্রে তাহার লেশমাত্রও ছিল না। শরচ্চন্দ্রের তিব্বত ভ্রমণ দ্বারা তিব্বতবাসী ও তিব্বত রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হইয়াছিল উত্তরকালের ইতিহাসে তাহার সামান্য মাত্রও পরিচয় পাওয়া গেলে তাঁহাকে বৃটিশের গুপ্তচর বলা চলিত। পরন্তু তিব্বতের ধ্যানগম্ভীর সৌন্দর্য ও তাহার সুমহান সংস্কৃতির প্রচার দ্বারা শরচ্চন্দ্রই সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি তিব্বতের দিকে আকৃষ্ট করেন। তিব্বত

ও তিব্বতবাসীর তিনি অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তিব্বত হইতে লুপ্ত ভারতীয়শাস্ত্র সাহিত্য উদ্ধারও তাঁহার জীবনের অন্যতম কীর্তি।

(১) Narative of a journey to Tashinumpo in Tibet in 1879, Calcutta, 1881,

(২) Journey to Lhasa and Central Tibet Ed. by W. W. Rockhill, London 1902

(৩) Avadana Kalpalata (Bibliotheca Indi Ca) Calcutta, 1888

(৪) বোধসত্ত্বাবদান কল্পলতা (১-৪ খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৯—১৩২২

(৫) Indian pandits In the Land of snow, Calcutta, 1893

(৬) Tibetan English Dictionary with Sanskrit synonyms (Calcutta 1902, Reprinted 1960)

(9) An introduction to the grammer of Tibetan language Darjeeling, 1915.

(৮) চারুচর্যাশতক—কলিকাতা, ১৯১০

মালিনী

সোমেন্দ্রনাথ বসু

রীতিমতো নাটক রচনার আগে গীতিনাট্যের রূপে রবীন্দ্রনাথ হাত পাকিয়েছিলেন—বাল্মীকি প্রতিভা (১২৮৭), কালমৃগয়া (১২৮৯), প্রকৃতির পরিশোধ (১২৯১), মায়ার খেলা (১২৯৫) গীতিনাট্যের যুগ। এই রচনাগুলি প্রধানতঃ সঙ্গীতপ্রধান—নাটকীয় সংঘাত ও তজ্জনিত জটিল পরিস্থিতি বিশেষ কিছু নেই।

নাটকরচনার জগতে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ আবির্ভাব রাজা ও রাণী (১২৯৬) নিয়ে। এই নাটকের বহুবিধ দুর্বলতা শুধু সমালোচকদের চোখে নয় কবির নিজের চোখেও ধরা পড়েছিল। তাই পরবর্তীকালে তপতী, ভৈরবের বলি প্রভৃতি নামে একে সংস্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তবু একথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে অন্তর্জগতের বা ভাবজগতের দ্বন্দ্ব রাজারাণীতেই প্রথম দেখা দিল। ভালবাসার ধনকে হাতের মুঠোয় পাবার কামনা একদিকে আর অন্যদিকে ভালবাসার দ্বারা কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হবার চেষ্টা এই দুয়ের দ্বন্দ্ব। এ রাজত্ব নিয়ে লড়াই নয়, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, দুটি চরিত্রের সংঘাত নয়—এই প্রথম বাংলা নাটকে দেখা গেল ভাবের সঙ্গে ভাবেরই সংঘাত। স্বভাবতঃই এই ভাবগত লড়াই তখনই নাটকে সার্থক হয় যখন নাটকের চরিত্রগুলি ঐ ভাবের বাহন বলে স্পষ্ট প্রতীত হয় না। তারা তাদের নিজেদের হাসিকান্না সুখদুঃখ মান অভিমানের জগতে থাকবে অথচ তাদের মধ্যে দিয়ে কবির ভাবের সংঘাত চলবে এইটেই কাম্য। রাজারাণীতে চরিত্রগুলির নিজস্ব দোষত্রুটি তাদের একটা রূপ দিয়েছে যার ফলে তারা কেবলমাত্র ভাবের বৈচিত্র্যহীন বাহন নয়।

১২৯৭ সালে এলো বিসর্জন। নাটক হিসাবে আমি এই নাটককেই রবীন্দ্রনাথের তথা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে মনে করি। অভিনয়ের দিক থেকে ও লিরিকের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও দর্শকচিত্ত সবচেয়ে বেশি আলোড়িত হয়েছে বিসর্জন দেখে। রবীন্দ্রনাথ নিজে জয়সিংহ রঘুপতি উভয় ভূমিকাই করেছেন। বিসর্জন নাটকে প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দ্ব আছে একথা রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন। কিন্তু নাটক পড়তে পড়তে বা দেখতে দেখতে সেই তত্ত্বের চেয়ে মনে বড় করে যে কথা বেজেছে তা হলো একদিকে রঘুপতি প্রবল পরাক্রান্ত, কৌশলপরায়ণ, কূটবুদ্ধি ষড়যন্ত্রী অন্যদিকে আত্মবিশ্বস্ত রাজা গোবিন্দমাণিক্য এ দুয়ের মাঝখানে সংশয় দোলায়িত জয়সিংহ। বিসর্জন নাটক জয়সিংহ নামক একটি মানবের ছবি যেমন রক্তকরবী নন্দিনী নামে একটি মানবীর ছবি। যাই হোক বিসর্জন নাটকে যে দ্বন্দ্ব যে ট্রাজেডি তার তুল্য ট্রাজেডী আর কোন বাংলা নাটকে পাই নি—সে কথায় পরে আসছি। বিসর্জনের পর দুটি নাট্যরসাশ্রিত কাব্য চিত্রাঙ্গদা আর বিদায় অভিশাপ। তারপর ১৩০৩ সালে বেরুলো মালিনী। মালিনীতে গদ্য ব্যবহার নেই—আগাগোড়াই অন্ত্যানুপ্রাস সমন্বিত কাব্য। তবু যে অর্থে চিত্রাঙ্গদা আর বিদায় অভিশাপে কাব্যই প্রধান নাটক নয় মালিনী সে অর্থে নিছক নাট্যকাব্য নয়। তাতে

নাটক আছে, অন্ততঃ নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ একটি কাহিনীকে কতদূর নাটকীয় করা গেছে।

১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ রচনাবলীতে মালিনীর ভূমিকা লিখিতে গিয়ে তিনটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। প্রথম কথা এ নাটিকার উৎপত্তি স্বপ্নঘটিত, দ্বিতীয়তঃ এই নাটকের রূপ গ্রীক নাটকের আদর্শের কাছাকাছি, তৃতীয়তঃ মৈত্রী ও মঙ্গলরূপী ধর্মবোধ নাটকের প্রতিষ্ঠা ভূমি।

এই তিনটি প্রসঙ্গের একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিয়ে সুরু করা অবান্তর হবে না।

উৎপত্তি স্বপ্নঘটিত হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নকে 'ঘুমন্ত বুদ্ধি'র লীলা বলে অভিহিত করেছেন। এ দৈব স্বপ্ন নয় যা মঙ্গল কাব্যে নিত্য দেখি। যখন মনের একটা অংশ নিশ্চেষ্ট তখন মনের আর একটা অংশ নাটক বুনে চলেছে। রাজর্ষির ভূমিকায় ঠিক এই কথাই আছে। ট্রেণে ঘুমাবার আগে গল্প ভাববার চেষ্টা করছেন—ঘুমানো মাত্রই প্লট এলো মনে। প্রকৃতপক্ষে জাগৃত অবস্থায় যে ঘটনার টুকরো টুকরো কণিকা মনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে স্বপ্নাবস্থায় যা হঠাৎ একটা কাহিনীর কাঠামোর রূপ নিচ্ছে। ঐ অর্ধজাগ্রত ধ্যানের ছবির সঙ্গে এসে মিলছে ধর্মবোধ, মানবতার বেদনা আর অন্য উৎস থেকে পাওয়া কাহিনী।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আছে গ্রীক নাটকের আদর্শ। ১৩৪৭ সালে কবি ভূমিকায় এই বিষয়ের উল্লেখ করলেন। তার আগে যে সব সমালোচনা হয়েছে তার কোনটিতেই এই বিষয়ের কোন আলোচনা নেই। ডক্টর নীহার রায় তাঁর মালিনী আলোচনায় এ বিষয়ের অবতারণা করেন নি। শুধু তিনি কেন ঐ সময়ের পূর্বে আর কেউ করেন নি। ডক্টর শান্তিকুমার দাশগুপ্ত তাঁর রবীন্দ্রনাট্যপরিচয়ে এবং অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রবীন্দ্র প্রসঙ্গের ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উৎসাহী পাঠকেরা এই দুটি আলোচনা দেখবেন। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য যা তা হলো এই যে নাটকের সরলতা এবং জটিলতার অভাব কবি ট্রাভেলিয়নের মধ্যে একটি সাদৃশ্যের ধারণা এনেছিল। গতির অভাব, ঘটনার স্থূলতা, দীর্ঘ বক্তৃতামূলক কথোপকথন গ্রীক নাটকের রূপের বৈশিষ্ট্য। প্রফেসার মূল্টন তাঁর The Ancient Classical Dramaতে বলেছেন—"The acting of an ancient scene is best regarded as a passage from one piece of statuesque grouping to another, in which motion is reduced to a minimum and positions of rest expanded to a maximum—a view which accounts for the great length of speeches in Greek Drama." আমার মনে হয় কর্মে বা action-এর অভাব, চরিত্রগুলিতে দ্বন্দ্বের সামান্য অবকাশ এই নাটিকায় দীর্ঘবিবৃত্তি মূলক কথোপকথনের অবতারণা করিয়েছে। কাহিনীর মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই, কোথাও কোথাও তা অবিশ্বাস্যভাবে সরল। এই সারল্যই গ্রীক নাটকের আবহাওয়ার ছোঁওয়া লাগায় 'মালিনী'তে। এতদতিরিক্ত গ্রীক নাটকীয় কৌশলের সাদৃশ্য সন্ধানের চেষ্টা করা খুব সার্থক হবে না কারণ রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই প্রমাণ করেছে যে গ্রীক নাট্যকলার সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় ছিলনা। ডক্টর দাশগুপ্ত তাঁর আলোচনায় এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আমার মনে হয়েছে যে এই সাদৃশ্য সন্ধানের চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে অতিবিস্তৃত হয়েছে। তিনি দৈবের ক্রিয়া, ভবিষ্যৎ বাণীর গুরুত্ব,

সংক্ষিপ্ততা, মহিষীর কথায় কোরাসের কর্মের প্রতিফলন, তিনটি প্রধান চরিত্রে হার্মাসিয়া বা ভ্রান্তির সন্ধান, এরিষ্টটলীয় মতানুযায়ী ভয় ও করুণা জাগ্রত করার চেষ্টা এবং দেশকালের ঐক্য বজায় রাখার বিষয়ে গ্রীক নাটকের সঙ্গে মালিনীর সাদৃশ্য দেখাতে চেষ্টা করেন। এর অধিকাংশই সূক্ষ্ম বিচারে কতদূর টিঁকবে বলা শক্ত। তবে এতগুলি বিষয় একত্র করে ডক্টর দাশগুপ্ত পাঠকদের স্বকীয় বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের সুযোগ করে দিয়েছেন।

কিন্তু এই আলোচনার একটি বিশেষ স্ববিরোধী মতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গ্রীক নাটকের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে ডক্টর দাশগুপ্ত 'ত্রয়ী ঐক্যে'র বিষয়ে বলেছেন 'রবীন্দ্রনাথও দেশকালের ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য গ্রীক নাট্যকারদের কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।' 'ক্ষেমংকরের বিদেশ যাত্রা এবং সৈন্যসহ আগমনের সংবাদ মালিনী নাটকের দেশকালের ঐক্য নষ্ট করিয়াছে বলা যায় না।' কিন্তু সেকস্‌পীয়রের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলছেন 'সেক্সপীয়ারে unity of place and time নাই—কাহারও কাহারও মতে মালিনী নাটকেও সেই unity মানা হয় নাই, সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভাবে এবং রীতির কোন কোন ক্ষেত্রে 'মালিনী' নাটকে সেক্সপীয়রের আদর্শ তাহার প্রভাব ফেলিয়াছে।' Unity সম্পর্কে ডঃ দাশগুপ্তর বক্তব্য আমার অত্যন্ত স্ববিরোধী বলে মনে হয়েছে। আমার নিজের মত এই যে মালিনী নাটকে unity of time নেই—যে কোন পাঠকেই বুঝবেন যে unity of timeটা অত্যন্ত Mathematical ব্যাপার—সেটা রক্ষিত হলো কি না বোঝা কঠিন নয়।

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার তৃতীয় প্রসঙ্গে আমরা এবার আসি। সে প্রসঙ্গ হলো বিগলিত ধর্মপ্রেরণা যা মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে। আনুষ্ঠানিক এবং পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে মানুষের অন্তরের ধর্মের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'এই ভাবের উপর মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে; এরই যা দুঃখ এরই যা মহিমা সেইটেতেই এর কাব্যরস।' ভাবের যে প্রকাশে কাব্যরস উছলে ওঠে সেই প্রকাশকে কর্মের রূপে আঘাতে সংঘাতে জটিল করতে পারলে নাট্যরস জমবে। আমাদের বিচার্য বিষয় মালিনী কাব্য হিসাবে কতদূর সার্থক তা নয়; নাট্যগত সার্থকতাই বিচার্য, অবশ্য তার সঙ্গে এইটুকু বুঝতে হবে কাব্যরস নাটকীয় সার্থকতা লাভের পথে কতদূর সহায় হয়েছে।

নাট্যবিচারে আমরা চলিত ধারণা অনুযায়ী কতকগুলি বিষয়কে মেনেই আলোচনার পথে নামবো। নাটকের একটি সূত্রপাত থাকবে, বা ঘটনার একটি বীজ থাকবে যা থেকে নাটকীয় সংঘাত জন্মাতে পারে, দ্বিতীয় স্তরে সেই বীজ থেকে জাত কার্যের বৃদ্ধি যাকে বলা হয় rising action, তৃতীয় স্তরে climax বা চূড়ান্ত অবস্থা, চতুর্থ স্তরে তৎপরবর্তী অবস্থা ইংরাজীতে যাকে বলি falling action, পঞ্চম স্তরে সমাপ্তি যেখানে সংঘাতের শেষ বা শান্তি।

মালিনী নাটকে তৃতীয় স্তর পর্যন্ত ভাগ পাই—falling action বা conclusion বলে চিহ্নিত করার কিছু নেই। climaxটাই conclusion.

এখন দেখা যাক মালিনী নাটকের সংঘাতের বীজ কোথায়। কিসের দ্বন্দ্ব নাটকে চলছে তা আমরা জানি, কবি বলেছেন আনুষ্ঠানিক ও পৌরাণিক ধর্মজটিলতা একদিকে অন্য

দিকে মানুষের অপরিমেয় করুণার ধর্ম। নাটকের ঘটনায় সেই দ্বন্দ্ব কোথায়। মালিনীর নবধর্ম ঘোষণা একদিকে অন্যদিকে ব্রাহ্মণ এবং সৈন্যদলের বিদ্রোহ ঘোষণা—যখন নাটক সুরু হলো তখন দেখি ব্রাহ্মণেরা উত্তেজিত, মালিনীর নির্বাসন জনতার দাবী, রাজা চিন্তিত, রাজপুত্র বিচলিত। আমার প্রশ্ন এই যে বিপদের আশঙ্কা এত প্রবল হয়ে দেখা দিল কি করে। মালিনীকে হঠাৎ সকলের এত বড় শত্রু মনে হল কেন? মালিনী তো নিজেই এখনো দুর্বল সংশয় বিক্ষিপ্ত চিত্ত, রাজঅন্তঃপুর ছেড়ে সে বাইরে যায়নি কখনো। তার ধর্মবোধ নিজের মনেই এখনো স্পষ্ট রূপ ধারণ করে নি—সে একটা রোমাণ্টিক বেদনা মাত্র—

ব্যথাসম
কী যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম
বারম্বার—কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে

এই অবস্থায় রাজা বলছেন 'উপরে আসিছে নেমে ঝটিকার মেঘ' 'প্রজাগণ ক্ষুব্ধ অতিশয়। চাহে তারা বিসর্জন মালিনীর।' কোন ক্রিয়ার বিরুদ্ধে এত বড় প্রতিক্রিয়া—এ যেন হাওয়ায় তলোয়ার ঘোরানো হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মালিনীর নবধর্ম কোন বিশেষ movement-এর আকার নিতে পারেনি, মালিনী নিজেও একটা trance-এর মধ্যে রয়েছে—তার কথার তাৎপর্য বা অর্থ কিছুই বাইরে বিদ্রোহ জাগাবার মত গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাশ্যপের বাণীতেও যে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তা মালিনীর ব্যক্তিগত মুক্তির ইঙ্গিত করে, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। তাঁর আশীর্বাদে তিনি বলছেন 'শুভলগ্নে সুপ্রভাতে হবে উদ্ঘাটন পুষ্পকারাগার তব।'

এই নাটকে আমার মনে হয় নাট্যকৌশলের প্রথম ত্রুটি হলো ক্রিয়াহীন প্রতিক্রিয়ার বাড়াবাড়ি। এই প্রসঙ্গে Hamlet নাটকের আলোচনা করতে গিয়ে T. S. Eliot যে objective Correlative-এর কথা বলেছেন সেটার উল্লেখ করলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে। নাটকে যে পরিমাণ ভাবের আমদানী হবে সেই পরিমাণ কাজ বা action থাকা নয়। নাটক তো গীতিকাব্য নয় যে শুধু ভাবের লীলায়িত বিস্তার থাকলে চলবে। যেখানে কর্ম যৎপরিমাণ নেই অথচ ভাব আছে সেখানেই নাটকের কাব্যাংশ মাত্রাহীনভাবে বেড়ে ওঠে। Eliot বলেছেন—"The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an 'objective correlative', in other words, a set of objects, a Situation, a chain of events which shall be the the formula of that particular emotion.' আমি তত্ত্বের গুরুত্ব মানি শুধু eliot বলেছেন বলে নয় আমার মনের জিজ্ঞাসা এই তত্ত্বে তৃপ্ত হয় বলে। যে chain of events বা situation বিশেষ emotionকে প্রকাশ করবে, মালিনীতে সে সব situation বা chain of events কই। এত যে ক্ষিপ্ততা, এত আক্রোশ, নির্বাসনের দাবী সে কোন ঘটনার ফলে—রবীন্দ্রনাথ সেই মূল ঘটনাটিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত করতে পারেন নি Eliot-এর ভাষায়—he caunot objectify it এবং an experience which in the mannar indicated, exceeded the facts.

এই সঙ্গে যদি বিসর্জন নাটকের গোড়ার ঘটনাটা সন্ধান করি দেখি তাহলে বালিকা অপর্ণা তার ছাগশিশুকে খুঁজতে এসে গোবিন্দমাণিক্যের মনে একটি ব্যথার সৃষ্টি করেছেন—অপর্ণা কাতর আবেদনে বলেছে— রাজা যদি চুরি

করে, শুনিয়াছি নাকি আছে

জগতের রাজা …মহারাজ বলো তুমি

সৎবুদ্ধি সম্পন্ন গোবিন্দমাণিক্যের মনে ধাক্কা লেগেছে—গোবিন্দমাণিক্য শুধু কেন রঘুপতির হাতে গড়া জয়সিংহ পর্যন্ত বলছে— তোমার মন্দিরে একী নূতন সঙ্গীত

ধ্বনিয়া উঠিল আজি যে গিরিনন্দিনী,

করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে। ভক্তহৃদি

অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি।

ঘটনার একটা সূত্রপাত হলো। গোবিন্দমাণিক্য এক আদর্শে নিজের বিশ্বাস সবলে স্থাপন করলেন, জয়সিংহের মনে দোলা সুরু হলো। গোবিন্দমাণিক্য রাজসভায় বলছেন—

'বালিকার মূর্তি ধরে

স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন

জীবরক্ত সহে না তাঁহার।'

এ তো একটা ঘটনা পাওয়া গেল—ইলিয়টের ভাষায় emotion objectified হলো।

প্রথম দৃশ্যে মালিনীতে দেখি মালিনী একটা আত্মবিস্মৃত বা আত্মমুগ্ধ ভাবলোক থেকে কথা বলছে—তার 'অন্তর চঞ্চল, যেন বারিবিন্দু সম করে টলমল', 'আমি স্বপ্ন দেখি জেগে শুনি নিদ্রাঘোরে যেন বায়ু বহে বেগে।' এ অংশের কাব্যসৌন্দর্য যাই হোক তাতে নাটকের সূত্রপাত আচ্ছন্ন হয়েছে দুর্বল হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রথম দৃশ্যের ধারা অনুসরণ করেই অবাস্তব কল্পকথার সুর বেজেছে। ক্ষেমংকর মালিনীকে শক্ত বলছেন, এখানেও সেই প্রশ্ন, কেন? কেন তাকে এত বড করে দেখা, এত ভয় পাওয়া? বড়ো বড়ো কথা আছে 'মহারাজ আর্যধর্মে করিতেছে লক্ষ্য তব নীড় হতে সর্প', 'ব্রাহ্মণ সমাজে একত্রে মিলছি সবে ধর্মরক্ষাকাজে।' এই দৃশ্যের ব্রাহ্মণদের বাদানুবাদ মোটামুটি জীবন্ত, নাটকীয়। মানবীয় শঙ্কা, সংশয়, হতাশা প্রভৃতি ভাবের লীলা নাটকীয় ঔচিত্য রক্ষা করেছে। ভাষা কাব্যোচ্ছ্বসিত হলেও নাটকোচিত।

কিন্তু মালিনীর আবির্ভাব কি দুর্বল, কি অতিনাটকীয়। অবাক হয়েছি যখন দেখেছি এই আবির্ভাবের কি উদার প্রশংসা করেছেন সমালোচকরা। ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর আলোচনায় 'এই বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ মালিনীকে ব্রাহ্মণদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ওলোটপালোট হইয়া গেল। একান্ত বিশ্বাসে ব্রাহ্মণরা যখন দেবীকে আহ্বান করিয়াছে ঠিক সেই মুহূর্তে মালিনী উপস্থিত হওয়ায় বিশ্বাসীর দল তাহাকেই দেবী বলিয়া গ্রহণ করিল।' মালিনীকে দেবী বলে ভুল করা খুবই স্বাভাবিক ব্রাহ্মণদের বিশ্বাসী হৃদয়ের পক্ষে এই কথাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন যে

ব্রাহ্মণরা সকলেই দেবী বলে প্রমাণ করল ভ্রমবশতঃ। আমার প্রশ্ন এই যে এই ভ্রম কি এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক। ক্ষেমংকর যখন রাজকন্যা বলে চিনেছে তারপরেও ব্রাহ্মণদের আচরণ কি স্বাভাবিক। এত বিক্ষোভ এত বিরূপতা ক্ষুদ্র বস্তুর উপর দাঁড়িয়েছিল তাহলে। ক্ষেমংকর কেন ব্রাহ্মণদের মন জয় করতে একটি কথাও বললেন না—যিনি এক মুহূর্ত আগে সুপ্রিয়কে জয় করবার জন্যে দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন তিনি এমন শান্ত প্রশান্ত মূরতি হলেন কি করে। এই অতিনাটকীয় দেবীভ্রমকে কি দিয়ে ব্যাখ্যা করবো—রোমান্টিকদের সেই কথা মনে পড়ছে Wilful Suspension of disbelief,—তা দিয়েও তো ব্যাখ্যা করা যাচ্ছেনা। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার এই আবির্ভাবের, ব্রাহ্মণদের এই দলবদ্ধ আত্মসমর্পণের কোন নাটকীয় propriety নেই।

এই দৃশ্যেই দেখা গেল ক্ষেমংকর স্থির করে ফেললেন বিদেশ থেকে সৈন্য আনতে হবে। এখানকার ব্রাহ্মণ আর সৈন্যদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস নেই। বিসর্জনের রঘুপতি দেশের ভিতরেই নানাভাবে বিরুদ্ধতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে—তার ফলে অনেক নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি করা গেছে, অনেক উত্তেজিত মুহূর্তের স্বাদ পেয়েছে দর্শক, রঘুপতির চরিত্র উজ্জ্বল হয়েছে। ক্ষেমংকর যে রঘুপতির মত ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করতে ইচ্ছুক নয় বা তার চেয়ে চরিত্রগত আদর্শে উন্নততর এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। তিনি স্পষ্টতই সুপ্রিয়কে গুপ্তচরের কাজ করতে বলেছেন—

সকল সংবাদ রেখো
রাজভবনের। লিখো পত্র।

ক্ষেমংকরের এই বিদেশ গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে সব নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে গৃহীত হতে পারতো নাট্যকার সেই পরিস্থিতিগুলির গুরুত্ব স্বীকার করেন নি। ঘটনা ধাপে ধাপে এগোয় নি—নাটকের গতির পথে যাকে বলা হচ্ছে rising action বা complication তার কিছুই নেই। তৃতীয় দৃশ্যে দেখি মালিনীর জয়যাত্রা সম্পূর্ণ হয়েছে। মশাল ও সমারোহ সহকারে সৈন্যরা এসেছে মালিনীকে নিয়ে। মালিনীর কথাবার্তায় নবধর্মের গভীরতার কোন লক্ষণ নেই। এ যেন লোকধর্মের বিলাস, সাধনা নয়— প্রতিদিন

রাজপুরে দেখা দিয়ে যেয়ো। সকলেরে এনো ডাকি
সবারে দেখিতে চাহি আমি।

মার কোলে আশ্রয় প্রার্থনা মালিনীর বালিকাসুলভ আচরণ; তার প্রথম লোকমাতা মূর্তির গাম্ভীর্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেনা। এই দৃশ্যের আর এক অসঙ্গতি মহিষীর আচরণ। মহিষী যে এতক্ষণ কন্যার গর্বে গর্বিতা, সৈন্যদলের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দৃপ্তা ফণিনীর মত, তিনি বলছেন নবধর্ম কিছু নয় স্বয়ংবর সভা ডাকো, যোগ্য পাত্রে মালিনীর বিয়ে হোক চরিত্রে ভালমন্দ থাকবে না হলে তা স্বাভাবিক হয়না কিন্তু মহিষীর চরিত্রে যে এত বড় ছলনার বীজ লুকানো ছিল তার ইঙ্গিত কোথাও নেই।

চতুর্থ দৃশ্য নাট্যকৌশলের দিক থেকে পূর্বতর দৃশ্যগুলির চেয়ে উন্নততর। সুপ্রিয়র মালিনীর প্রতি নবজাত দুর্বলতার ইঙ্গিত আছে, ব্যক্ত প্রকাশ নেই; আত্মবিশ্লেষণের চেষ্টায় নিজের প্রতি ধিক্কার আছে অনুতাপ আছে; মধ্যবর্তী কাহিনীর সূত্রটি সুকৌশলে ব্যক্ত করা আছে।

রাজকুমারীর প্রাণদণ্ডের চেষ্টাই যে তাকে পূর্বজীবনের থেকে নবজীবনের কূলে এনেছে সে কথা স্বীকার করে সুপ্রিয় বলছে—'আপনার মর্মে ফুটাতেছি দন্ত আপনার।' মালিনীর প্রতি আকর্ষণ এবং বন্ধুর প্রতি নরম স্নেহ এই দুই আকর্ষণের মধ্যে পড়ে সুপ্রিয় পীড়িত হলেও তার কর্তব্য নির্ণয়ে ত্রুটি হয়নি। সে রাজাকে ক্ষেমংকরের ষড়যন্ত্রের কথা বলেছে এবং মনে মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থেকেছে। তার এই অন্তর্দাহ রবীন্দ্রনাথ আরও প্রবল করে তুলেছেন রাজার ব্যবহার দিয়ে—রাজত্বের লোভ, রাজকন্যার লোভ দেখিয়ে তার ইচ্ছা জাগ্রত করার নানা সূক্ষ্ম আভাসের মধ্যে তার মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সুপ্রিয় পরম বেদনায় বলেছে—

'বন্ধুর বিশ্বাস ভাঙি সপ্ত স্বর্গলোক
চাহি না লভিতে—

মালিনীর চরিত্রেও এই প্রথম প্রাণের ছোঁওয়া লেগেছে ধর্ম নয়, নির্বিশেষ বিশ্বানুভূতির বাঁধাবুলি নয় প্রাণের জাগরণ দেখলুম এই প্রথম— ওরে রমণীর মন
কোথা বক্ষোমাঝে বসে করিস ক্রন্দন
মধ্যাহ্নে নির্জন নীড়ে প্রিয় বিরহিতা
কপোতীর প্রায়'—'

নাটকের শেষে নাটকীয় রস কিয়ৎপরিমাণে ঘনীভূত—কারণ দর্শক ও পাঠকচিত্তে suspense-এর রোমাঞ্চ অনুভূত হচ্ছে। ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে হত্যা করেছে—এই হত্যার নাটকীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ক্ষেমংকরের পক্ষে এই একমাত্র কাজ যা তার পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারতো। শেষ ঘটনাটুকুতে নাটকীয় সংযম দেখা গেছে—ক্ষেমংকর সুপ্রিয়ের বাক্যালাপ আসন্ন আঘাতের স্তম্ভিত পটভূমি হিসাবে কাজ করেছে। মালিনীর মতো কর্মযোগহীন নাটকের শেষরক্ষা হয়েছে তার শেষ দৃশ্যে।

মালিনী বলেছে ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে, তার দিক থেকে হয়তো ধর্ম রক্ষা হলো, কিন্তু ক্ষেমংকরের পক্ষে সুপ্রিয়-হত্যার পর জীবিত থাকার চেয়ে বড় শাস্তি কি হতে পারে। এই ইঙ্গিতটুকুর মধ্যেই ক্ষেমংকরের ট্রাজেডি লুকোনো রইলো।

বিসর্জন নাটকের সঙ্গে তুলনা করে কেউ কেউ বলেছেন নাট্যকৌশলে মালিনী উন্নততর—এ প্রশ্নে যাবার আগে বুঝে নেওয়া দরকার এইটুকু যে ভাবগত একটা মিল থাকলেও চরিত্রের সংখ্যাধিক্য, ঘটনার ব্যাপ্তি ও বিস্তারে, কার্যপরম্পরায় বিসর্জন মালিনীর চেয়ে ব্যাপক স্থান কাল ও পাত্র নিয়ে ব্যাপৃত। বিসর্জনের কার্যসূত্র, কার্যের বিস্তার, পরিণতির suspense, ঘটনার আকস্মিকতা, জনসাধারণের প্রয়োজনা সবই নিখুঁত পারস্পরিক যোগের শৃঙ্খলে বাঁধা। রঘুপতির চরিত্রের চেয়ে ক্ষেমংকর চরিত্র অনেকের কাছে চরিত্রগুণে মহৎ বলে প্রতিভাত হয়েছে। বলা বাহুল্য সাহিত্যে চরিত্র বিচারের মানদণ্ড চরিত্রের মহত্ব নয় চরিত্রের দীপ্তি ও পরিস্ফুটতা। রঘুপতির চরিত্রে ডঃ নীহার রায় শক্তির অভাব দেখেছেন এই কারণে যে শেষ দৃশ্যে জয়সিংহের মৃত্যুর পর তার রিক্ততা তাকে দুর্বল করে কিন্তু ক্ষেমংকর আপন অহংকারে অটুট প্রোজ্জ্বল দীপশিখার মত। চরিত্রের মধ্যে দুর্বলতা আছে বলেই সাহিত্য সৃষ্টি হিসাবে রঘুপতির চরিত্র

ক্ষেমংকর-তুল্য সার্থকতা লাভ করেনি এ অভিযোগ গ্রাহ্য নয়।

ডক্টর রায় আরও একটি কথা তুলনামূলক আলোচনায় বলেছেন যে 'বিসর্জনে লিরিকের স্বাদ প্রবল, 'মালিনী'তে লিরিকলক্ষণ অনুপস্থিত বলিলেই চলে।' আমার সিদ্ধান্ত এর ঠিক বিপরীত, বিসর্জনে লিরিকধর্মীতা তার নাটকীয়তাকে স্ফুটতর হতে সাহায্য করে, মালিনীতে প্রথম তিন দৃশ্যে লিরিকেরই প্রাবল্য নাটকীয়তা প্রায় অনুপস্থিত।

মালিনী কেন ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে বলছেন এ নিয়ে অনেক মতামত আছে—প্রশান্ত মহলানবীশ প্রশ্নচ্ছলে বললেন—ক্ষেমংকরের প্রতি কি মালিনীর ভালবাসা ছিল। এ কথা নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। আমার মনে হয় সহজ কথা বোধহয় এই যে সুপ্রিয় জীবিত কালে রাজদ্রোহী বন্ধুর জন্যও রাজার পদপ্রান্তে বসে ক্ষমা চেয়েছে--সুপ্রিয়ের প্রতি ভালবাসাই মালিনীকে ক্ষেমংকরের জন্য ক্ষমাভিক্ষায় উৎসাহিত করেছে। সুপ্রিয় যে প্রেম ধর্মের সাধক সেই প্রেমধর্মের জয় মালিনীর কাম্য—তাই এতবড় আঘাতের মুহূর্তেও মালিনীর সমস্ত সত্তা সুপ্রিয়ের বন্ধুর প্রতি নির্মম হতে পারেনি।

মালিনী সম্বন্ধে টমসন সাহেব অভিযোগ করেছিলেন এই বলে যে Malini is a very unconvincing figure fill towords the end...When I spoke of the play as sketchy, I was thinking of the way in which Rabindranath in Malini herself, suggests question for whose solution he provides no data. He has drawn the lines of her figure so tennously that her thought and sactions are seen as if moving through a mist of dreams.···The poet has given us no means of judging, but has left Malini a beautiful but faintly drawn outline.'

টমসন সাহেবের লেখা যথেষ্ট স্বচ্ছ—তবু যদি মানতে অসুবিধা হয় তবে ইলিয়টের Oljective Correlative-এর কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখলে বোধহয় ধারণা বদলাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শেষ দৃশ্যটি না থাকলে মালিনীকে রাজা ও রাণী, বিসর্জনের ধারায় না ফেলে চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় অভিশাপের দলেই ফেলা যেতো।

অপরিচিতের পরিচয়

নবেন্দু সেন

ভাষার রাজ্যে সাহিত্যের রাজা আর যাতে আত্মগোপন করে থাকতে না পারেন তার জন্য ভাবনা ও চিন্তার, বিচার ও বিশ্লেষণের অন্ত নেই। সমস্ত বিশ্বজুড়ে চলছে তার গবেষণা। সম্প্রতি Rev. A. Q. Morton এ সম্পর্কে এক বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য উপস্থিতও করেছিলেন। মর্টন মনে করেন 'অজ্ঞাত', বা 'অপরিচিত' লেখকের পরিচয় নিয়ে বিশ্বের সকল সাহিত্যেরই যে, সমস্যা তার সমাধানের সুযোগ আসন্ন।[১] কিছু অঙ্ক, আর কিছু রেখাচিত্র এই বৃহৎ সমস্যার সমাধানে অত্যাবশ্যক বস্তু। যে কোন ছদ্মনামের লেখক, বা সন্দেহভাজন লেখক ওই অঙ্ক, ও রেখাচিত্রের আদালতে নিজেদের আসল পরিচয় দিতে বাধ্য থাকবেন। অর্থাৎ চণ্ডীদাস কতজন? বিদ্যাপতির ক'টি পদ সত্যই বিদ্যাপতির রচিত, অথবা 'তত্ত্ববোধিনী'র বেনামী রচনাগুলির লেখক রাজনারায়ণ বসু, না অক্ষয়কুমার দত্ত না দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; অথবা কেরীর 'কথোপকথনে'র সবগুলি নাহলে, ক'টি রচনা কেরীর নিজের, এসমস্ত সমস্যার পূর্ণ সমাধান মর্টনের দেওয়া তথ্যের সাহায্যে হওয়া উচিত। অবশ্য এই বিচারপদ্ধতিটি ভাষাতত্ত্বের 'স্টাইলিস্টিক্‌সে'র অন্তর্ভুক্ত।

এযাবৎ সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে ভাষার স্বভাব নির্ধারিত হয়ে আসছিল ; যথা :—

(১) শব্দ ব্যবহারের লেখক স্বভাবের 'প্যাটার্ণ' বিচার করা, (যেমন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রূপ' 'অরূপ' 'অসীম' 'ছোট আমি', 'বড় আমি', রৌদ্রময়ী রাতি ; 'প্রদোষ', 'বিবশ', 'আলোকরেণু' প্রভৃতি শব্দ) ;

(২) সর্বনাম, এবং 'শব্দ সাযুজ্যর ব্যবহার স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ (যেমন, রবীন্দ্রগদ্যে 'জল চিক্ চিক্ ; 'শ্রবণ পেতে, বা বিণ্-কে কর্তারূপে ব্যবহার যেমন, ('সেই বৃহৎটাই মানুষের দুর্বলতা') ;

(৩) বাক্য সংযোজক শব্দর ব্যবহার অব্যয় জাতীয় শব্দর ব্যবহার বিচার (যেমন, রবীন্দ্রগদ্যে 'না', 'নাই', 'নাহি' প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার)।—কিন্তু প্রধানতঃ দুটি কারণে ভাষা বিশ্লেষণের এই তিনটি প্রচলিত নিয়ম সুনিরূপিত সিদ্ধান্ত উপস্থিত করতে পারে না। প্রথম কারণ, এই রীতিতে সমগ্র গ্রন্থের বিশ্লেষণ করা হয় না গড়পড়তা হিসাব করা হয় মাত্র ; ফলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের অবকাশ থেকে যায় তাতে। দ্বিতীয়তঃ এই আনুমানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিটিও যথেষ্ট ব্যাপক নয়। ভাষার শব্দসজ্জা (word order) বাক্যবিন্যাস, পদগুচ্ছ বা phrase প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিক, অপরিহার্য বিষয়গুলি, এবং ভাষার অলঙ্কার (Rhetoric Qualities of the Langnage) সর্বদা উক্ত পদ্ধতিতে গৃহীতও হয়না ; ফলে ভাষার পূর্ণ পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত হয় না। সেক্ষেত্রে ভাষা বিচারের এই প্রচলিত তিনটি সূত্র যথেষ্ট নয়। আরো দরকার।

১ : **MORTON., A., Q., Graphs to detect the identity of classical authors. Statesman 2 December 1965.**

এই 'আরো দরকারটা' মর্টনের তথ্যে পাওয়া যায় কিনা দেখা যেতে পারে। সংখ্যাতাত্ত্বিক কতকগুলি চার্টের সাহায্যে মর্টন যে বিশ্লেষণ পদ্ধতির কথা বলেছেন তাকে Cumulative sum charts method বলা হয়। রীতি অনুসারে এপদ্ধতির সুবিধা হল রচনাগত কোন ব্যতিক্রম হলেই নজরে পড়বে। অর্থাৎ ধরা যাক, রামমোহনের যে সকল গ্রন্থে প্রথমে তাঁর নাম অপ্রকাশিত ছিল, সেই সকল গ্রন্থগুলি অন্য কারো রচিত, এরূপ সন্দেহ করা হলে, সেই সন্দেহাকীর্ণ রচনাগুলি, আর নিঃসন্দিগ্ধভাবে রামমোহন রচিত গ্রন্থগুলির রচনার ভাষা যদি এই Cumulative sum charts method' সাহায্যে বিচার করা যায়, তবে ভাষাগত পার্থক্য আদৌ থাকলে তা ধরা পড়বেই। এবং সেই পার্থক্যই রামমোহনের রচনার আসল পরিচয় দিতে পারবে।

বাক্যর দৈর্ঘ্য ইত্যাদি নিয়ে বিশ্লেষণের এই পদ্ধতিটি খুব জটিলও নয়। যেমন :—

(১) যে রচনা নিয়ে সংশয় তার প্রতিটি বাক্যর শব্দসংখ্যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ বইর, বা রচনার বাঁদিক থেকে ডান দিকে (বাঁ→ডান) গুণতে হবে।

(২) রচনাটির গড়পড়তা বাক্যপ্রতি শব্দসংখ্যা নির্ধারণ করা। (অর্থাৎ, ধরা যাক অপরিচিত, অজ্ঞাত একজন লেখকের একটি রচনাগ্রন্থ পেয়ে ভাষা দেখে মনে হল গ্রন্থটি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। যখন এই 'মনে হওয়ার' সঙ্গে প্রকৃত সত্য মিলিয়ে নিতে হলে ঐ গ্রন্থটির সমস্ত বাক্যর (ধরা যাক, ২৫,০০০ বাক্য) প্রতিটি শব্দের গড়পড়তা হিসাব করা আবশ্যক। ধরা যাক, কোন বাক্যতে ৫টি শব্দ, কোন বাক্যতে ১০টি শব্দ, কোন বাক্যতে ১৫টি শব্দ আছে ; তাহলে গড়পড়তা শব্দর সংখ্যা হবে মোট শব্দ সংখ্যা ÷ ২৫,০০০, বা প্রতি বাক্যর গড়পড়তা শব্দ সংখ্যা = মোট শব্দ সংখ্যা ÷ ২৫,০০০। এবার নূতন কাজ।

(৩) প্রকৃত শব্দ সংখ্যা (গড়পড়তা শব্দ সংখ্যা, নয়) প্রতি বাক্যে যতগুলি আছে তার সঙ্গে ঐ গড়পড়তা শব্দ সংখ্যার হিসাব করতে হবে ; অর্থাৎ গড়পড়তা শব্দ সংখ্যা যত হবে বাক্যগুলির শব্দ সংখ্যাও তত করতে হবে ; (প্রয়োজনে যোগ বা বিয়োগও করে)।

ধরা যাক ১নং বাক্যে ১০টি শব্দ আছে। ২নং বাক্যে ৫টি ও ৩নং বাক্যে ২ টি শব্দ আছে। এবং গড়পড়তা বাক্য প্রতি শব্দ সংখ্যা ১৫টি। এক্ষেত্রে বাক্যের :৫—৫ = ১০ = (—১০) ; এবং ৩নং বাক্যের ২০—১৫ = ৫ = (+৫)।

(৪) হিসাবের এই অঙ্কটি যে রেখাচিত্রে (groph) প্রকাশিত হবে তার দুটি সরলরেখা থাকবে, একটি সমান্তরাল, অন্যটি লম্ব (Horizontal × vertical)। সমান্তরাল রেখার রচনার বাক্য সংখ্যা থাকবে, এবং লম্বের উপর থাকবে স্বতন্ত্র, বাক্যের শব্দ সংখ্যা, ও গড়পড়তা বাক্যর শব্দ সংখ্যার পার্থক্যজনিত হিসাব।

এর ফলে যখন কোন লেখক গড়পড়তা বাক্যর দৈর্ঘ্যর (শব্দ সংখ্যানুযায়ী) ব্যতিক্রম করে যদি কিছু সংখ্যক বাক্যের দৈর্ঘ্য আরও বিস্তৃততর করেন, তবে তাও রেখাচিত্রে ধরা পড়তে পারে। বাক্যর দৈর্ঘ্যসূচক রেখা সমান্তরাল রেখার উপরে ডান দিকে বাঁক নেবে তখন। আবার কোন রচনার এই দৈর্ঘ্যর হিসাবে, বাক্য যদি গড়পড়তা হিসাবে ক্ষুদ্র হয়, তবে বাক্যর দৈর্ঘ্য সূচিত রেখা নীচে বাঁক নেবে। আর স্বাভাবিক, গড়পড়তা বাক্যর দৈর্ঘ্যানুযায়ী বাক্য, সে রচনায় থাকলে

সমান্তরাল রেখার সমান্তরালে রেখা অঙ্কিত হবে।

আমাদের দেশে এ বিষয়ে এখনও উল্লেখযোগ্য কোন কাজই হচ্ছে না। লণ্ডনে, বৃটিশ এ্যাকাডেমী থেকে গ্রীকৃগদ্যর কিছু নিদর্শন নিয়ে ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। ব্রিক্‌বেক্‌ কলেজের কম্প্যুটর বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রস্তুত করে দিচ্ছেন। 'K. D. F. I' যন্ত্র বসেছে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৩৫টি পাঠ নাকি সেখানে ৫১ সেকেণ্ডে বিশ্লেষিত হবে।

বিষয়টি গুরুত্বপুর্ণ সন্দেহ নেই। তবে, আমাদের বাংলাভাষার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কতটা কি করা সম্ভব সেটা বিবেচনার বিষয়। ভাষার স্বভাব আমাদের স্বতন্ত্র। ইংরেজী ভাষার বাক্যর 'Norm' S. O. V (কর্তা, ক্রিয়া কর্ম); আমাদের S. O. V. (কর্তা, কর্ম ক্রিয়া)। বাক্য সংযোজক (Copula) ইংরেজীর 'And'; আমাদের 'এবং' (সংস্কৃতর 'চ'); আমাদের 'এবং'র সমার্থক সংযোজক শব্দ 'আর' 'ও'র (ইংরেজীর also নয়) ব্যবহারও স্বতন্ত্র। বাক্যের দৈর্ঘ্য প্রধানত: যে তিন প্রকারে ঘটে (যথা, পরপর বিশেষণ, বা বিশেষ্য বাচক শব্দ বসিয়ে; অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে, এবং বাক্য সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করে) তাতেও বাংলা ভাষার স্বভাব স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। (যেমন : ঘন কাল, নিস্তব্ধ নিশীথিনীর বুক চিরে একমুহূর্তে যে অত্যুজ্জ্বল আলোকের সুতীব্র ঝলক দেখা দিল অশ্বারোহী পুরুষ তাতে দেখতে পেল, নিকটে দাঁড়িয়ে আছে এক পরমা সুন্দরী রমণী)। অথবা (আমি পথ চলিতে চলিতে তাঁহারই সততার উৎস কিভাবে, কতদুর, কাহাকে, কেমন করিয়া পথ দেখাইয়া, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আলো দিয়াছেন এবং যুগ যুগ ধরিয়া, লোকে কেমন করিয়া, কিসের নেশায় তাহার সম্পর্কে ভাবিতেছিল তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আত্মরচিত্ত হইয়া উঠিতেছিলাম)। ইংরেজীতে while walking…I was thinking to become irresistable to know the origin of his truth which…how… in what way and to whom for several ages custing light etc. ধরনের বাক্য বিস্তৃতি সাধারণত: চোখে পড়ে না; বাক্যসংযোজক অব্যয় 'and', 'but' দিয়েই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে *'বিশেষ্য' ও 'বিণ'-এর বিস্তারে বাক্য বিন্যাস করা হয়।* শুধু তাই নয়, বাংলা বাক্যর বিন্যাসে দৈর্ঘ্য নিরূপণ করতে বিরাম চিহ্নের ব্যবহারের মুল্যও কম নয়। বহু রচনায় একটি বাক্যের মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি বাক্যের সন্নিবেশও লক্ষিত হয়। যেমন : আজ সকাল থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। সামনের খোলা মাঠটার ঘাসগুলো ভিজে গেছে, একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ আসছে, মাঝে মাঝে দমকা বাতাস দিচ্ছে, ছাট আসছে, আমার ঘরের পূবদিকের জানলাটার পর্দাটার একটা পাশ সে জলে ভিজে যাচ্ছে; হাওয়ায় কখনো কখনো পর্দাটা উড়ে জলের ছাটের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, ফাঁক দিয়ে মেঘলা আলো দেখা যাচ্ছে, চোখে মুখে বৃষ্টির ঝাপটাও লাগছে।

কখনও ক্রিয়াবিহীন বাক্যও ব্যবহৃত হয়। (যেমন, আজ কলকাতা জুড়ে হরতাল)। *বাংলা গদ্যর বাক্য বিচার করতে হলে তাই অন্য বহুবিধ বিষয়েরও বিচার আবশ্যক।* কেবল বাক্যর *দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে অপরিচিত লেখকের পরিচয় আবিষ্কার করা বোধহয় সম্ভব নয়।* 'colligation' *বা শব্দ সামীপ্য, বা collocation বা শব্দসাযুজ্য ও (যেমন রাম ভাত খায় = কর্তা, কর্ম, ক্রিয়ার স্বাভাবিক ক্রমে শব্দসামীপ্য হয়; এবং 'ভাত খায়' হয় না, 'ভাতের সাযুজ্যশব্দ' খায় = শব্দ*

সাযুজ্য, ভাষার অন্যান্য শৃঙ্খলার (যেমন, Phrase, Compound, Rhetoric qualities) পরিপূর্ণ আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই অজ্ঞাত, অপরিচিত লেখকের পরিচয় ও জ্ঞাতব্য তথ্যাদি উপস্থিত করা যেতে পারে। মর্টনের ঐ 'Cumulative sum charts method' এ ক্ষেত্রে ভাষাপরিচিতির অন্যতম মাধ্যম, একটি, বা একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম নয় বলেই মনে হয়। বিশেষত বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে অপরিচিত, বা সন্দেহভাজন কবির সমস্যা এ রীতিতে সমাধান করা বিশেষ সুবিধাজনক হবে বলে মনে হয় না। কারণ, প্রত্যেক কবিতারই ছন্দ থাকে, এবং সে ছন্দ নিরূপিত। অনুকারক যদি প্রকৃত রচয়িতার ছন্দবন্ধটি পর্যন্ত অনুকরণ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আসল, ও নকলের পার্থক্য নির্ণয় করা Cumulative sum chartএ বিশেষ কঠিন, প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ চণ্ডীদাসের যে সমস্যা আমাদের কাব্যসাহিত্যে এখনও প্রায় অমীমাংসিত, তার পূর্ণ সমাধান এই রীতিতে সম্ভব নয়। বিদ্যাপতির পদ, ও "কবিবল্লভ"র পদ একজনের, না পৃথক দুজনের রচিত, এ সকল সমস্যা এই বাক্যর দৈর্ঘ্য মেপে করা সম্ভব নয়। ছন্দের কলামাত্রার এক পরিমাপ পার্থক্য সূচিত করেনা এখানে। এবং এ সকল ক্ষেত্রে Stephen Ulmann'র 'Adjective-pattern',১ বা Sayce'র 'Individual Style'র Wordpattern,২ বা Lenneberg' "An experimental approach to Psycholinguistic Problems"র৩ সাহায্য নিয়ে বাংলা কবিতার এই লেখক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বিচার, ও বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে কবিতা আবৃত্তি, বা পদ গান করে সন্দেহভাজন লেখকের পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারার যে, 'Pause and measurement'র রীতি Lenneberg বলতে চেয়েছেন সেটি আলোচ্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। 'উচ্চারণ কলা' (Speech time) নির্ধারণ করে তার উপর এই রীতিটির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তিনি। Lenneberg'র মতে : উচ্চারণ কলা = একটি অনধিক ত্রিশব্দের পদগুচ্ছ ("One phasase no longer that three words"); এবং এক উচ্চারণ কলার ৩ ভাগ = অল্প কম ৫ শব্দ। গড়পড়তা হিসাবে, সাধারণভাবে যে উচ্চারণ বিরতি আমরা এ সব ক্ষেত্রে নিয়ে থাকি তাতে ৪০% থেকে ৫০% ভাগ উচ্চারণ আমরা করতে পারি, অর্থাৎ ১০০ ভাগের মধ্যে আমরা ৪০% থেকে ৫০% ভাগ সময় উচ্চারণের বিরতি নি; এবং ৬০% থেকে ৫০% ভাগ সময় আমরা উচ্চারণ করি। গানের সময় এই গড়পড়তা হিসাব আরো সুনিরূপিত হয়, কারণ তাল, লয়, ও ছন্দে সঙ্গীতের মাত্রা নির্ধারিত হয়; তাই বিশেষণ, বিশেষ্য, সংযোজক অব্যয়, শব্দসাযুজ্য প্রভৃতির স্বল্পতম *পার্থক্যেও এই উচ্চারণের সময়ের মাত্রার পার্থক্য হয়। যেমন, "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" বাক্যটির পরিবর্তে 'সই কেবা শুনাইল হরিনাম" ব্যবহৃত হলে 'উচ্চারণ কলা' (Speech time) পরিবর্তিত হতে বাধ্য। এই ভাবে যে পদটি, ধরা যাক চণ্ডীদাসের বলে মনে হয়, অথচ, ধরা যাক ভণিতা নেই,* অথবা অন্য কারো নাম রয়েছে, সে পদটির ভাষা উক্ত উপায়ে বিশ্লেষিত করে, চণ্ডীদাসের সন্দেহাতীত পদগুলির (বা কতকগুলির) ভাষা বিশ্লেষণ করে যদি উভয় বিশ্লেষণের সাদৃশ্য খুবই চোখে পড়ে, তবে অন্য কারো নামাঙ্কিত যে পদটী বিশ্লেষণ করা হল সেই পদের, সেই নামের লেখকের অন্য সন্দেহাতীত পদ থাকলে তার ভাষার বিশ্লেষণও করে দেখা যেতে পারে। এবং দেখলে

দেখা যাবে চণ্ডীদাসের পদগুলির সাধারণ ভাষা, বৈশিষ্ট্য আর ঐ সন্দেহভাজন পদকর্তার পদের ভাষা বৈশিষ্ট্য এক নয় ; পার্থক্য আছে। একজনের পার্থক্য হয়তো অন্য জনের ভাষার বৈশিষ্ট্য। অপরিচিতের পরিচয় আবিষ্কার করা নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার আর থাকেনা। অবশ্য বাংলাগদ্যর ক্ষেত্রে এই অপরিচিতের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন করা অপেক্ষাকৃত সুযোগবহুল, সম্ভাবনাপূর্ণ। ব্যক্তি মাত্রেই তার যে রচনারীতির স্বাতন্ত্র্য থাকে, তা পূর্বে আলোচিত ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানগুলির ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে মর্টন বর্ণিত, বৃটিশ নাইলন-বিশেষজ্ঞ Dr. W. C. Wake আবিষ্কৃত এই Cumulative snm charts-র রীতিটির মূল্য অস্বীকার করা যায়না। তবে এই পদ্ধতিটি একটি, বা একমাত্র পদ্ধতি নয়, বরং বহু, এবং নানা পদ্ধতির একটি অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি।

---

১ : Umann, Stephen—Style in the French novel (1957) London.

২ : Sayce, R. A.—Style in French Prose (1953) London.

৩ : Lenneberg, Eric H.—New directions in the Study of language (I964) America.

সাম্প্রতিক বাংলা নাটক প্রসঙ্গে

সমকালীনের গত ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রবি মিত্র ইদানীংকালের রচিত বাংলা নাটকগুলির ভবিষ্যত ও-নাট্যমূল্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে এক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং তাঁর এই সংশয় যথার্থ কিনা জানতে চেয়েছেন ; আর সেই সূত্রে, সমকালীনের পাঠকদের সামনে এক প্রশ্নও তুলে ধরেছেন : 'প্রতিটি পত্র পত্রিকায় নাট্য সমালোচকরা যে-সব যুগান্তরকারী নাট্যসৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করেন, আমাদের চোখে তা ধরা পড়েনা কেন ? কেন সে-সব নাটক আমাদের কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর বা অর্থহীন প্রলাপ বলে মনে হয় ?' সমকালীনের রসিক পাঠকবর্গের কাছেই তিনি প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন। নাটকের যে যে গুণ থাকলে নাটক সার্থক ও রসোত্তীর্ণ হয়, সেই সব ধ্রুপদী গুণাগুণ সম্বন্ধে যদিও আমি খুব ওয়াকিবহাল নই, তবু, সাধারণ রসাগ্রাহী দর্শক হিসাবে অধুনা সৃষ্ট নাটকগুলির সার্থকতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে যা মনে হয়েছে তাই লিখছি।

এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, মঞ্চ সাফল্যেই নাটকের চূড়ান্ত মূল্যায়ণ হয় না। কোন নাটকের মঞ্চে সাফল্য দেখে বা টিকিট বিক্রির পয়সা গুণে, সেই নাটকের মূল্য বিচার করতে গেলে নিশ্চয়ই ভুল হবে। মঞ্চে সাফল্য ও টিকিট বিক্রীর হার ছাড়াও অভিনীত নাটকে এমন কিছু থাকা চাই, যা নাকি নাটকের অভিজ্ঞান। এই অভিজ্ঞান না-থাকলে, কোন নাটকই সাহিত্যের আম-দরবারে তথা নাট্যসাহিত্যের আমদরবারে প্রবেশাধিকার পায় না। যে-হেতু নাটকও সাহিত্যের অংশীদার, সেই হেতু তার এই ছাড়পত্র চাইই চাই। সার্থক নাট্যকার এই ছাড়পত্র নাট্যরসিকদের কাছ থেকে আদায় করে নেন তাঁর সৃষ্ট নাটকের সাহিত্য মূল্যের বোধবুদ্ধি ও অনুভাবনার বলে। আধুনিক নাটকের সমালোচকরা মঞ্চস্থ নাটকের সাময়িক জনপ্রিয়তা ও টিকিটের পয়সার হিসেব দেখেই উল্লসিত হয়ে নিতান্ত সাধারণ ছাত্রকেও 'Distinction' দিয়ে বসেন। ভেবে দেখেন না, বাংলা নাট্য সাহিত্যের কোন শ্রেণীতেই সেই নাটকের বস্‌বার আদৌ যোগ্যতা আছে কি না। আধুনিক নাটকের কতকগুলো যদিও ইদানীং বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বলে দেখা গেছে, তবু সেই জনপ্রিয়তা কোন দিনই ভবিষ্যত নাট্যরসিকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না বলেই মনে হয়। এটা আমার নিজের রায় নয়, এর গূঢ় কারণ সাহিত্যের তথ্য ও ধর্মের মধ্যে নিহিত। কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, এই আধুনিক নাটকগুলির আবেদন সরাসরি প্রচারধর্মী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের দেশে কিছু রাজনৈতিক আবহাওয়ার প্রভাব দেখা যায়, এবং আতঙ্কিত হ'বার কিছু নেই, সেই সময় থেকেই বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের খাতিরেই প্রচারধর্মী নাটকের রচনা ও অভিনয় শুরু হয়। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ বামপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছিল, একথা

কে না জানে? 'একাঙ্কিকা,' 'উলুখাগড়া,' 'জবানবন্দী' থেকে এগিয়ে এসেই পূর্ণাঙ্গ 'নবান্ন'তে এসে উপস্থিত হল। এগুলো বিশেষ একটি মতবাদের handout। এই নাটকগুলি মঞ্চে অভাবিত সাফল্য লাভ করলেও দর্শক মনে কিংবা নাট্যসাহিত্যের অঙ্গনে স্থায়ী আসন গাড়তে পারেনি। ঠিক এই সময়েই যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশ বিভাগ প্রভৃতির অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। একে রোধ করতে নতুন একটা রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন অনিবার্যরূপে দেখা দিল। অতএব দেখা দিল, শিল্পীপরিষদ, আনন্দম, দক্ষিণপরিষদ. রূপকার, শৌভনিক এবং আরও অনেক অনেক প্রতিষ্ঠান।

এই সব দলগুলির দ্বারা অভিনীত নাটকগুলির বেশিরভাগের উপজীব্য হচ্ছে বঞ্চিতদের কাহিনী ও সেকস্ সাইকোলজি। গ্রীক দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ এরিষ্টটলের রাজনীতির তত্ত্বে 'Cycle of States'-এর সূত্র মতে, কোন রাজনৈতিক মতবাদই চিরস্থায়ী নয়। কালে কালে, স্থানে স্থানে, তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কথাটা যে অতি বড় সত্য তা বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। ইদানীং কালের আফ্রিকার রাজ্যগুলির দিকে চাইলেই আমরা এরিষ্টটলের সূত্রের যথার্থ অনুধাবন করতে পারবো। কাজে কাজেই বোঝা যাচ্ছে, এই প্রচারধর্মী নাটকগুলির impact ও স্থায়ী নয়। এরা কোন দিনই কালাতিক্রমণের স্বীকৃতি পাবে না। নাটকের অবলম্বন যদি অস্থায়ী হয়, তা হলে সেই নাটক স্থায়ী হবে, এ আশা করাও ভুল। ১৯৩২ সালে এম্পায়ার নাট্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করেন। এই নাটকের অভিনয় দেখে, চমৎকৃত হয়ে নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু সে যুগের 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' নামক পত্রিকায় একটি উচ্ছ্বসিত সমালোচনা লিখেছিলেন: 'An Appreciation'—By An Old stage horse। বাংলা নাটকের ইতিহাসে বিসর্জন নাটক থেকেই একটা নতুন কালপর্যায়ের শুরু বললে বোধ হয় ভুল হবে না। গিরিশচন্দ্র, মাইকেল, ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকগুলোর সঙ্গে তুলনায় বিসর্জন কত বিভিন্ন তা রসজ্ঞ মাত্রই জানেন। অথচ বিসর্জন নাটকখানি "সে-কালের আধুনিক" হওয়া সত্ত্বেও কালজয়ী হয়েছে বলে স্বীকার করতেই হবে। তার কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ কোন নাটকেই কোন 'ইসম্'এর প্রশ্রয় দেননি। সেই জন্যেই 'বিসর্জন' নতুন বা আধুনিক হলেও, 'হাল ফিল নতুনদের' নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকের পার্থক্য স্পষ্ট লক্ষণীয় এবং পারস্পরিক নাট্যমূল্যও প্রণিধান-যোগ্য। তথাকথিত আধুনিক নাটকগুলির সঙ্গে, প্রফুল্ল, বিশ্বমঙ্গল, শাস্তি কি শাস্তি, জনা, সাজাহান, কণ্ঠহার, আবুহোসেন, দেবলা দেবী, বিসর্জন, রক্ত করবীর মূল্যের তারতম্য আছে বলেই, আজও এই নাটকগুলি অজস্র দর্শক সমাগমে সাগ্রহে অভিনীত হয়। আরো কারণ খুঁজলে দেখা যাবে, এই নাটকগুলির আবেদন কোন কালের বা পরিস্থিতির মধ্যে আবদ্ধ নয়। এই সব নাটক আজও আগামীকালের মধ্যে একটা অলক্ষ্য সেতুবন্ধন করে কালের দর্শক হৃদয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ করে নিয়েছে—নাটকের সঙ্গে, নাট্যকারের সঙ্গে, দর্শকের একটা সুদৃঢ় আত্মিক যোগবন্ধন করেছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। এই যোগবন্ধন যত দৃঢ় হবে, নাটকের ভাবধারণা তত সর্বাত্মক হবে এবং নাটক তখনই হবে নিঃসন্দেহে সাহিত্য রসোত্তীর্ণ। অন্ততঃ নাট্য সাহিত্য রসিক পণ্ডিতেরা সার্থক নাটকের এই রকম মানই নির্ধারণ করে থাকেন বলে জানি। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসুর

সমালোচনা অযথা বলে কেউ মনে করবেন না আশা করি। মনে রাখবেন, তিনি কিন্তু old Stagehorse। অতএব আধুনিক নাটকগুলি সম্বন্ধে সমালোচকদের ওকালতি নিরর্থক কিংবা কিছুটা স্বার্থপ্রণোদিত বললে খুব অন্যায় হয় না। আধুনিক বাংলা নাটকের ঘাড় থেকে এই 'ইসম্' এর ভূত না-নামলে, এই সব নাটকের নাট্যসাহিত্য সদ্গতি আশা করা যায় না। এই গেল মৌলিক নাটক রচনা সম্বন্ধে যা কিছু বক্তব্য। এর পর আছে আধুনিক নাট্যকারের মেম্‌কে সাড়ী পরানোর প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রকট হওয়ায় serious নাটকেরও প্রায় সময় প্রহসনে পরিণত হওয়া। এই রকম নাটক জনমনে রেখাপাত করবে বলে আশা করা উচিত নয়। কোন বিদেশী নাটকের, তা যত রসোত্তীর্ণ নাটকই হোক না কেন ছায়া অবলম্বনে রচিত হলে তা বাংলা রঙ্গমঞ্চে কোন কালেই কায়া পায় না। ছায়া কোনদিনই স্পষ্ট নয়, তাই বাঙালী দর্শকের মনে অস্পষ্টই থেকে যায়। বলা বাহুল্য অস্পষ্টতা কোন নাটকের গুণ হতে পারে না। মৌলিক নাটক রচনার অক্ষমতা ঢাকতে গিয়ে অনেক নাট্যকারেরা এই লুকোচুরির আশ্রয় নেন। আধুনিক অনেক নাট্যকারের মধ্যে এই অভ্যাস বড়ই প্রকট। ফল যা দেখেছি তা আগেই বলেছি।

এখন সরাসরি ভাষান্তরিত নাটকের কথায় আসা যাক। বিদেশী অনেক বিখ্যাত নাটকের বাংলায় অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করার প্রচেষ্টা অনেক নাট্যকারের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। অনুবাদক নাট্যকার হিসেবে এক একজন বেশ নামও করেছেন অথচ এঁরাই মৌলিক নাটক রচনার ব্যাপারে আশ্চর্য রকম ব্যর্থ। এই শ্রেণীর নাট্যকারেরা তাঁদের নাট্যকৃতির জন্যে যেটুকু প্রশংসা অর্জন করেন, তা ক্ষমতাশালী অভিনেতাদের সাহায্যেই করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। এই সব বিদেশী চারাগুলো যে বাঙালী মনের মাটিতে কিছুতেই শেকড় গাড়তে পারবে না এ-কথা অনুবাদক নাট্যকারেরা বুঝেও বোঝেন না। ফলে এমন অনেক বাংলা নাটক আমাদের এ-কালে মঞ্চস্থ হতে হতে দেখা যাচ্ছে, যার আবেদন সর্বৈব বিদেশী। পরদেশী পথিক আমাদের সহরের অলি-ঘুঁজিতে অযথা পথ হাতড়ে হয়রান হচ্ছে। নাট্যকারের কিছুটা রচনা বা অনুবাদ কৃতিত্ব থাকা সত্ত্বেও সবটাই পণ্ডশ্রম হচ্ছে। বিদেশী নাটকের অনুবাদ পঠনের জন্যেই রাখা ভাল, তাকে মঞ্চস্থ করলে তার রসগ্রহণের যে খুব সুবিধে হয় বলে মনে হয় না।

আর এক কথা, সার্থক নাট্য রচয়িতা হতে হলে, নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় থাকা চাই। বিভিন্ন নাট্য সাহিত্য শৈলীর, দেশী ও বিদেশী, বৈশিষ্ট, ধরণ ও গতিপ্রকৃতির কিছুটা জ্ঞান না থাকলে, কোন নাট্যকারই দর্শক মনের আবহাওয়ার হদিশ পান না; তখন তাঁদের অবস্থা হয় নোঙ্গর ছেঁড়া নৌকার মত। দর্শক মনের বিশেষ ঘাটটি খুঁজে না পেয়ে, মাঝ দরিয়ায় ভরাডুবি হন। নির্ভয়ে বলতে পারি, আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে এই 'হঠাৎ বিজ্ঞ মনোভাবের' সংখ্যা খুবই বেশী। শস্যক্ষেত্রের মধ্যে আগাছার মতই এঁরা বিরক্তিকর বললে কি অন্যায় হয়? তারপর, হাল আমলের লেখা নাটকগুলি, যেগুলিকে মৌলিক ও 'দিকদর্শী' নাটক বলে ঢাক পেটানো হয়, বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, সেগুলির অনেক ক'খানাই মঞ্চ যোগ্যই নয়। তার কারণ নাট্যকারের মঞ্চপ্রযুক্তিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব। বিশেষ একটি দৃশ্য যে মঞ্চে মূর্ত করা সম্ভব নয় আর তা জোর করে করতে গেলে নাটকের রস ব্যাহত হতে বাধ্য,

নাট্যকারের সে সম্বন্ধে কোন হুস-বোধ নেই দেখা গেছে। কতকগুলি অবাস্তব দৃশ্য পরিকল্পনা করে, তাকে জোর করে মঞ্চস্থ করে, দর্শকদের রসবোধকে অযথা উত্ত্যক্ত করাই যেন এই সব নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই রকম সব নাটককে, 'দিকদর্শী নতুন নাটক' বলে জাহির করা হয়। আর আপত্তি করলে তখনি দর্শকদের বুদ্ধি ও রসবোধের অভাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। অথচ তথা প্রতিষ্ঠিত সমালোচকেরা এই সব অবাস্তব নাটককেই অভিজ্ঞান পত্র দিয়ে নিজেদের অদ্বিতীয় নাট্যরসবেত্তা বলে ঢাক পেটান। বাংলা নাটকের হালফিল অবস্থা এই।

বিদ্যুৎ মৈত্র

বি দে শী সা হি ত্য

ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিদেশীয় গবেষকমহলের উৎসাহ সম্প্রতিকালে যে ভাবে উদ্‌ভাসিত তাতে আমাদের পর্যাপ্ত উৎসাহিত হবার কারণ রয়েছে। বিগত দু'দশকের মধ্যেই বিদেশে বিশেষত সোভিয়েত যুক্তরাজ্যে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা তথা ভারতবিদ্যার যে প্রসারতা বেড়ে চলেছে তা নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সোভিয়েত জনমানসের আগ্রহ সাম্প্রতিককালে সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ ইতোপূর্বে ওই দেশে নানাভাবে পঠিত, আলোচিত ও অনূদিত হয়েছে। বর্তমানে সেইসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রেরও সাহিত্যকর্ম অনূদিত ও পঠিত হচ্ছে। ঐ দেশে ভারত সংক্রান্ত, ভারতীয় সাহিত্য সংক্রান্ত গবেষণা গ্রন্থাদির প্রকাশ ও প্রসারের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ অন্যতর এক সাংস্কৃতিক সংযোগ।

সোভিয়েত যুক্তরাজ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে দুটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা হলো যথাক্রমে 'রবীন্দ্রনাথের সৃজনী পদ্ধতি' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোভিয়েত ভ্রমণ-প্রসঙ্গে'। প্রথম গ্রন্থটির রচয়িতা ইয়েভগেনি চেলিশেফ এবং অন্যটির রচয়িতা ডি. ভ্যাসিলিয়েভ। ইয়েভগেনি চেলিশেফ একজন বিশিষ্ট ভারতবিদ। বিশ্বদৃষ্টির আলোকে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তব ও রোমান্টিকতাবাদের বিভিন্ন শৈলীর ব্যবহারই যে বিশ্বকবির সৃজনীধারার জটিল জট উন্মোচিত করেছে, বর্তমান গ্রন্থে সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। ভারতীয় কথাসাহিত্য বিকাশে রবীন্দ্রনাথের অবদান ও ভূমিকা এবং রবীন্দ্রনাথের সেই প্রভাবের অন্যতর ফলশ্রুতি আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে 'ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম'এর সূত্রপাত, এতদ্‌সম্পর্কিত এক বিদগ্ধ আলোচনায়ও বর্তমান গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। ডি. ভ্যাসিলিয়েভ তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোভিয়েত ভ্রমণ প্রসঙ্গে' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত পরিক্রমণ সম্পর্কে তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত দেশ সফর করেন। এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সোভিয়েত সফরের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথের পর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম সোভিয়েত দেশে সম্প্রতি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ইতিমধ্যে শরৎসাহিত্য সোভিয়েত যুক্তরাজ্যে অনূদিত হয়ে পাঠকমনে সাড়া জাগাতে শুরু করেছে। ১৯৫৭ সালে রুশ ভাষায় শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' প্রথম অনূদিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রুশ পাঠকমহল শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আরো আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯৬০ সালে চার পর্ব সমন্বিত 'শ্রীকান্ত' মুদ্রিত হয়ে একটি খণ্ডে প্রকাশিত হলে রুশ-সাহিত্য পাঠক তাতে আরো সাড়া দেন। সংবাদে জানা যায়, 'গৃহদাহ' প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নাকি একলক্ষ পঁচিশ হাজার কপি নিঃশেষিত হয়ে যায়। সোভিয়েত যুক্তরাজ্যে সাহিত্য পাঠকের নিকট শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এ থেকেও সহজে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

সোভিয়েত যুক্তরাজ্যে শুধুমাত্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ নয় সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্বমূলক আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন উৎসাহী সোভিয়েত সাহিত্য-সমালোচক মহল। গবেষণার ক্ষেত্রেও অনেকে অগ্রসর হয়েছেন। বিখ্যাত গবেষক-সমালোচক ও সোভিয়েত ভারতবিদ শ্রীমতী লিডিয়া স্ত্রিস্কায়া এই পর্যায়ে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এক মূল্যবান গবেষণায় রত। শরৎসাহিত্যে নারীর স্থান তাঁর গবেষণার কেন্দ্র। সোভিয়েত যুক্তরাজ্য শরৎচন্দ্রের এক নির্বাচিত গল্প সংকলন তৎসহ শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত একটি আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশেও উদ্যোগী হয়েছেন জানা গেছে। ইতোপূর্বে প্রকাশিত এক ভারতীয় কথাসাহিত্য সম্ভারে শরৎচন্দ্রের দু'টি ছোট গল্পও পাঠকমহলে প্রচুর সাড়া তুলেছে। গল্প দু'টি যথাক্রমে 'মহেশ' ও 'আঁধারে আলো'।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'এশিয়ার জনগণের ইনষ্টিটিউটের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণী' ভারত-সম্পর্কিত আরো একখানি উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন। এই সঙ্কলনটি মূলত ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কিত। ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশে বাংলার মনীষী-লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখের ভূমিকা তৎসহ প্রভাব সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ বর্তমান সংকলনের সম্পদ। গ্রন্থটির রচয়িতা প্রখ্যাত সোভিয়েত ভারতবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক এন. গাব্রুসিনা। উর্দু ও হিন্দি সাহিত্য সম্পর্কেও মনোজ্ঞ আলোচনা স্থানলাভ করেছে বর্তমান গ্রন্থে।

সোভিয়েত যুক্তরাজ্য থেকে একটি বিশদ রুশ-বাংলা অভিধান বর্তমানে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে ; অভিধানখানি সম্পাদনার দায়িত্বভার পালন করছেন প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বাংলাসাহিত্য বিশেষজ্ঞ ডঃ জ্যাক লিটন।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

বিশ্বদর্শন

কুর্-আণ অনুসারে মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ প্রথম, দক্ষিণ হস্তের অনুচর অর্থাৎ যাঁরা ঈশ্বরের নির্দেশে সৎপথে চলেন ; দ্বিতীয়, বাম হস্তের অনুচর অর্থাৎ যাঁরা ঈশ্বরের নির্দিষ্ট পথ পরিহার করে চলেন , তৃতীয়, ঈশ্বরদর্শী অর্থাৎ যাঁরা পরম সত্য সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করেছেন।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' * পড়তে পড়তে মনে হয় বহু বিচিত্র দার্শনিক চিন্তার মধ্যেও অনুরূপ ত্রিমুখী প্রবণতা আছে। এ কথা বলা অসংগত হবে না যে, ব্যাপকতম অর্থে দর্শনেও মূলত তিনটি দৃষ্টিকোণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়ঃ দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী ও বোধিপন্থী।

আমাদের জানাশোনা জগৎ, আমাদের জীবন—তারা নানা প্রশ্ন জাগায় মনে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, প্রশ্নগুলির উত্তর এমন আর কি কঠিন। কিন্তু যখন আমাদের জাগতিক ধারণাগুলিকে বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করি, তখন সব কিছুই যেন অসম্পূর্ণ বোধ হয়, সঠিক তাৎপর্য খুঁজে পাই না। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে সুসংগত সামঞ্জস্যপূর্ণ তাৎপর্যময় ক'রে তুলবার জন্যই দর্শনের আবির্ভাব। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ভাষায়ঃ 'জীবন ও সত্তার তাৎপর্য উপলব্ধিই দর্শনের লক্ষ্য।' (ইতিহাস ১ম খণ্ড সূচনা)

জগৎ ও জীবনের পূর্ণতা, তথা তাৎপর্য অন্বেষণ করতে করতে দক্ষিণপন্থী দর্শন এক অনন্ত স্বয়ম্ভূ স্বয়ংসম্পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ পরম সত্তার ধারণায় পৌঁছয়। ধর্মে এই পরম সত্তাই ঈশ্বর নামে পরিচিত। অসীম সত্তার সঙ্গে সসীম সৃষ্টির কি সম্পর্ক তাই নিয়ে দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে নানা মত। কেউ বলেন, পরম সত্তা (যাকে ব্রহ্ম বা Absolute বলা হয়) এবং বিশ্বজগৎ মূলত এক ; অদ্বিতীয় সত্তাই বৈচিত্র্যময় জগৎ ও বহুজীবনরূপে প্রতিভাত হয়। কেউ বলেন, ব্রহ্ম বিশ্বচরাচর ব্যপ্ত হয়ে আছে বটে, কিন্তু আবার বিশ্বাতীত ; প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যস্বরূপ পরম সত্তাই বৈচিত্র্যময় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে আপনাকে চরিতার্থ করছে। কেউ বা মনে করেন, ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা এবং সত্য, আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জগৎ অবভাসমাত্র অর্থাৎ তার ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে কিন্তু পারমার্থিক সত্যতা নেই।

দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারার একটা প্রধান সমস্যা হ'ল কেমন ক'রে অসীমের সঙ্গে সসীমের, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা বা চৈতন্যের সঙ্গে অচিৎ পদার্থের সমন্বয় সাধন করা যায়। অসীম সত্তা এক, সর্বতোভাবে পূর্ণ, শুদ্ধ চৈতন্যময়, নির্গুণ প্রজ্ঞাস্বরূপ। এমন এক সত্তা হ'তে কেমন ক'রে অসম্পূর্ণ ত্রুটিকীর্ণ

* 'প্রাচ্য ও পশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' : ভারতসরকারের শিক্ষাধিকারিক বিভাগের উদ্যোগে লিখিত ও প্রকাশিত। প্রকাশকঃ এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা। মূল্য ১ম খণ্ড ১ম ভাগঃ ৭ টাকা, ১ম খণ্ড ২য় ভাগঃ ৮ টাকা, ২য় খণ্ড ১৫ টাকা।

বিরোধবিক্ষুব্ধ বস্তু ও জীব জগৎ উদ্ভূত হতে পারে? সুতরাং ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্য হয়, তবে যা-কিছু জাগতিক, হয় তা মায়া নয় তা আংশিক সত্য; কারণ পরিবর্তনশীল জগতের সত্যতা কখনই অপরিবর্তনীয় পরম সত্তার সমগোত্রীয় হ'তে পারে না। তাই দক্ষিণপন্থী দর্শনে 'বহু'-র পারমার্থিক তাৎপর্য 'এক'-এর তুলনায় নেই অথবা ন্যূন।

কিন্তু এটা যেন আত্মঘাতী ব্যাপার। মানবজীবনের তাৎপর্য খুঁজতে গিয়ে তাৎপর্যহীনতার অনিবার্য ধারণায় পৌঁছুতে হয়। এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে দক্ষিণপন্থী দর্শন নানাভাবে নিজেকে এবং মানুষকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছে। বলেছে: মানুষ পরম চৈতন্যের অংশ, এই চৈতন্যস্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারলেই মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজে পাবে। দক্ষিণপন্থীর মতে, পূর্ণ চৈতন্যের উপলব্ধিই একমাত্র মানবীয় লক্ষ্য। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে, মানুষ যদি পরম চৈতন্যের অংশ বা পরম চৈতন্য স্বরূপই হয়, তা হ'লে কেন সে অসম্পূর্ণ হয়ে রইল, তার এই অসম্পূর্ণতার সার্থকতাই বা কি? এই প্রশ্নের স্বাভাবিক উত্তর পাওয়া যায় না। পাওয়া যাবেও না, যতক্ষণ পর্যন্ত দক্ষিণপন্থী দর্শন পরম ব্রহ্মের ধারণাকে Premise বা আশ্রয়বাক্য হিসাবে আঁকড়ে থাকবে। এই আশ্রয়বাক্য থেকে একটি মাত্র যুক্তি গ্রাহ্য সিদ্ধান্ত হ'তে পারে, তা হ'ল: পরম ব্রহ্মই পরম সত্য আর এই সত্যতার মানদণ্ডে বিচার করলে অন্য সবকিছুই অসম্পূর্ণ অসত্য, দার্শনিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় মায়া। দেশকালাতীত 'এক' যদি সত্য হয়, তবে দেশকালাশ্রয়ী 'বহু' অবভাস মাত্র।

বোধিপন্থী দর্শন-হ'ল দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। বুদ্ধি দিয়ে 'এক'-এবং 'বহু'র সম্পর্ক নির্ধারণ করা অসম্ভব। বুদ্ধির দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, এটা হ'ল বোধিপন্থী দর্শনের গোড়ার কথা। বুদ্ধির কাজ খণ্ডবিখণ্ড ক'রে জানা। কিন্তু যে-সত্য অনন্ত চৈতন্য স্বরূপ তাকে তো আর খণ্ড বিখণ্ড ক'রে জানা যায় না। তাই সেই সত্য কখনো আমাদের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা-নির্ভর জ্ঞানের বিষয়বস্তু হ'তে পারে না। তার সমগ্রতার উপলব্ধি একমাত্র বোধির সাহায্যেই লাভ করা যায়। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো পরমেশ্বর মানুষের অনুভূতিলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। এই বোধিজ্ঞান যিনি লাভ করেন তাঁর কাছে 'দৈনন্দিন জীবনের কর্মগুলিই অসীম ও নিত্যজগতের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়।' (ইতিহাস: ২য় খণ্ড, ২৬৭ পৃ:) সুফী কবি জালালউদ্দীন রুমীর ভাষায়: 'সূর্য যখন পূর্বে উদিত হয়, তখন রাত্রির বা তারকারাজির চিহ্ন থাকে না। যাঁহারা ঈশ্বরের সন্নিধি কামনা করেন, তাঁহাদের অবস্থাও অনুরূপ। যখন ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়, প্রার্থীর অস্তিত্ব তখন লুপ্ত হইয়া যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিলে ব্যক্তিত্বের মৃত্যু ঘটে—অর্থাৎ তিনি আছেন আবার নাই। অনস্তিত্বের মধ্যে অস্তিত্ব সত্যই এক আশ্চর্য ঘটনা।' (ইতিহাস: ২য় খণ্ড, ২৪৫ পৃ:)

দক্ষিণপন্থী দর্শনের মূল ধারণা যেমন ঈশ্বর বা ব্রহ্ম, বামপন্থী দর্শনে মানুষ তেমনি মধ্যমণি। বামপন্থী দর্শন কখনো বা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ পরিহার করেছে, বলেছে: 'জগতের বিষয় বৈচিত্র্য বস্তুনিচয়ের স্বভাবের তাড়নায় সংঘটিত হইতেছে; ঈশ্বর বলিয়া অতি প্রাকৃত কোনো স্থষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নাই।' (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ ১'৮ পৃ:) কিংবা, 'যেহেতু মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং তাহার প্রকৃত স্বভাব সে নিজেই সৃষ্টি করে, অতএব তাহার অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের কোনো আবশ্যকতা নাই।' (২য় খণ্ড ৩৫৬ পৃ:) আবার, কখনো বা ঈশ্বর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা জীবনযাত্রার পথে অপ্রয়োজনীয়

বলে মনে করা হয়েছে : 'ন্যায্যতা-ধর্ম গ্রহণ করিবে জনসাধারণের হিতার্থে। স্বর্গীয় ও পার্থিব দেবতাদের সম্মান করিবে, কিন্তু দূরে রাখিবে।' (১ম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, ৪র্থ খণ্ড—১২ পৃঃ)

বামপন্থীর প্রশ্ন হল, কেমন ক'রে মানুষ আপন স্বভাবের উৎকর্ষ সাধন করবে, কেমন ক'রে মানুষ তার সমাজে সামগ্রিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করবে। চিন্তার সার্থকতা মানব কেন্দ্রিকতায়। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে উনবিংশ শতকের বামপন্থী দর্শনে দাবী উঠেছে : 'The philosophers have interpreted the world ; in various ways ; the point is to change it." সনাতনী দার্শনিকদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে : "You stand there respectable, stiff and with a straight back, you famous philosophers ! no strong wind or will propels you." মানুষের আত্মশক্তির উপরে আস্থাই হ'ল বামপন্থী দর্শনের প্রথম স্বীকার্য। ব্যক্তিমানসের দিক থেকে এই শক্তি মানুষকে অর্থহীন স্বার্থমগ্ন সুখলোলুপ সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হ'তে বলে। সমষ্টি-মানসের দিক থেকে এই শক্তি মানুষকে বিভেদবিহীন কল্যাণময় সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করবার প্রেরণা জোগায়।

ব্রহ্মবাদী ও মানববাদী দর্শনের মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট। কিন্তু তবু একটা জায়গায় মিল খুঁজে পাওয়া যায়। Existential men বা অস্তিমান মানুষটি যে অসম্পূর্ণ একথা উভয়েই স্বীকার করে। মানুষ যদি মূলত অসম্পূর্ণই হয়, তবে একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, সকলের আগে অসম্পূর্ণ মানুষটাকেই বোঝা উচিৎ, জানা উচিৎ, কোথায় তার অসম্পূর্ণতা, কেনই বা সে অসম্পূর্ণ। দর্শন স্বভাবতই অনৈসর্গিক। সম্পূর্ণতার অন্বেষণে সে ঘুরে বেড়ায় ভাবের নন্দন কাননে, মাটি পাথরের পৃথিবীতে যেন তার পা পড়ে না। তাই তার হাতে পড়ে মানুষ একটা বিদেহী ধারণায় পর্যবসিত হয়। এই ধারণাটি আর যাই হোক, রক্তে-মাংসে গড়া জৈবিক অস্তিমান ব্যক্তি পুরুষটির প্রতিকৃতি নয়।

মানুষের আত্ম-অনুভূতি প্রথম প্রকাশ পায় তার অস্তিত্বের অনুভূতিতে : আমি আছি। মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে জড় পদার্থের অস্তিত্বের তফাৎ কোথায় ? যে-কোনো একটা বস্তু সম্বন্ধেও তো আমরা বলি, বস্তুটা আছে। কিন্তু মানুষের 'আছি'-বোধ সেই অর্থ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, মানুষের 'আছি'-বোধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার 'কিছু-একটা-হয়ে-ওঠা'র সম্ভাবনা। প্রত্যেক মানুষকেই কিছু না কিছু একটা হয়ে উঠতে হয়। এই 'হয়ে-ওঠা' হ'ল মানুষের নিজেকে সৃষ্টি করা। এইভাবেই সে তার স্বরূপকে সৃষ্টি করে। স্বরূপ সৃষ্টির প্রয়াসকে বাদ দিলে 'আছি' শব্দটা নিরর্থক হয়ে পড়ে। সার্ত্রের ভাষায় : 'Man is nothing else but that which he makes of himself.' যেখানে এই স্বরূপ সৃষ্টির আকৃতি নেই, সেখানে মানুষ অনাস্তিত্বের বেদনায় আর্ত, কার্ল য্যাসপার্স যাকে বলেছেন despair of non-entity—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, 'শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি'।

মানুষের স্বরূপ কি ? এই প্রশ্নের কোনো পূর্ব নির্ধারিত উত্তর সম্ভব নয়। মানুষের মাঝে আছে অসংখ্য সম্ভাবনার সমাবেশ। তার মধ্য দিয়ে তাকে বেছে নিতে হবে যা সে হ'তে চায়। নির্বাচনের কাজটি সহজ নয়। নির্বাচনের দায়িত্ব তার সম্পূর্ণ নিজের ; সে-দায়িত্ব আর কারুর

উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না। আর, নির্বাচনের অর্থই হ'ল, যে-সম্ভাবনাকে ব্যক্তিবিশেষ নির্বাচন করল সেটাই তার স্বরূপের প্রতিশ্রুতি ; তাকে মূর্ত ক'রে তোলাই তার একমাত্র ধর্ম। নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাধীনতাবোধ ব্যক্ত হয়। যে ব্যক্তি নির্বাচনের দায়িত্ব এড়াতে চায়, স্বাধীন হ'তে তার ভয়। ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা—এরা অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। দায়-এড়ানো প্রবৃত্তি স্বাধীনতা-বোধের পরিপন্থী, সুতরাং স্বরূপ-সৃষ্টিরও পরিপন্থী।

যেখানে দায়িত্ব এবং যেখানে সেই দায়িত্বের ভার মানুষকে একা বইতে হয়, সেখানে অনিশ্চয়তার বেদনাবোধ অবশ্যম্ভাবী। তাই বেদনাবোধেই ব্যক্তি-চেতনার বিকাশ। অতীত অব্যক্ত ; ভবিষ্যত অব্যক্ত ; শুধু এক সীমিত ব্যক্ত বর্তমানের মধ্যে মানুষ তার হয়ে-ওঠার সাধনায় রত। মৃত্যু এসে কখন তাকে হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, সাধনাকে নিশ্চল ক'রে দেবে তা সে জানে না। এমনি এক দুঃসহ অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়েই মানুষকে তার স্বরূপ-সৃষ্টির সাধনায় মগ্ন হতে হবে। কিন্তু কেন? 'আমি আছি'—এটাই কি যথেষ্ট নয়? না, যথেষ্ট নয়। কারণ 'আমি আছি' এই বোধটাই যে স্পষ্ট হয়ে উঠবে ব্যক্তি-পুরুষের স্বরূপ-সৃষ্টির সাধনায়। তাছাড়া এই সাধনা হ'ল জনমানসের প্রতি ব্যক্তি-মানসের কর্তব্য। ব্যক্তিপুরুষের স্বরূপসৃষ্টির প্রয়াসের সাহায্যেই সর্বজনীন স্বরূপ-সৃষ্টির পথ হবে নির্মিত। সার্ত্রের ভাষায় : 'In fashioning myself, I fashion man,'

রক্ত-মাংসে-গড়া অস্তিমান মানুষকে খুঁজতে-খুঁজতে এমন এক মানুষের সাক্ষাৎ মিলল, অসম্পূর্ণতাই যার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য, অন্তহীন আত্মসৃষ্টিই যার প্রকৃত পরিচয়। দার্শনিক লেসিঙ্-এর উক্তি উদ্ধৃত করে অস্তিবাদী চিন্তানায়ক ক্যর্কিগার্ড প্রায়ই নাকি বলতেন, যদি ঈশ্বরের দুই হাতে দুটি উপহার থাকে—দক্ষিণে সিদ্ধি ও ঋদ্ধির পূর্ণ তৃপ্তি আর বাঁয়ে অন্তহীন প্রয়াসের বেদনা—এবং ঈশ্বর যদি তাঁকে যে-কোনো একটা বেছে নিতে বলেন, তিনি নিঃসংকোচে বাঁ হাতের উপহারটাই বেছে নেবেন। প্রকৃত অস্তিমান মানুষের আদর্শ ব'লে যদি কিছু থাকে তবে তা হ'ল এই আত্মসৃষ্টির অশ্রান্ত প্রয়াস। এই আদর্শের কাছে মানুষ হিসেবে সে বাগ্‌দত্ত।

যে দার্শনিক সমস্যাগুলি এতক্ষণ আলোচিত হ'ল, সেগুলিকে মানবভিত্তিক দর্শনের প্রধান সমস্যা বলা যেতে পারে। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, এই সমস্যাগুলির কোনো ভৌগলিক পরিচয় নেই। জীবনজিজ্ঞাসার উপর ভারতীয়, চৈনিক, জার্মান, মার্কিন ইত্যাদি ছাপ বসালে তার সর্বজনীন সার্থকতা নষ্ট হয়ে যায়। এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, ভৌগলিক-ঐতিহাসিক পরিস্থিতি দার্শনিক প্রশ্ন ও মীমাংসার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। আসল কথা, মানবমনীষাকে যদি সেই পরিস্থিতির স্বাজাতিক দেওয়াল-ঘেরা সংকীর্ণতার মধ্যে বন্দী করে রাখি, তবে তার মানবিক আবেদন হারিয়ে যাবে। সংকীর্ণ ভৌগলিক-ঐতিহাসিক গণ্ডী থেকে মুক্ত হোক মানবমণীষা। এই মুক্ত মণীষাই যথার্থ বৈশ্বমানবিক দর্শন রচনার পথে নির্ভীক যাত্রা শুরু করতে পারবে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' প্রমাণ করেছে, বিশ্বদর্শনের আদর্শ দুরূহ হ'তে পারে

কিন্তু অসম্ভাব্য নয়। আরও প্রমাণ করেছে, দর্শন-আলোচনা সামগ্রিকভাবে করা সম্ভব এবং এই সামগ্রিক আলোচনায় কি পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য, কি দক্ষিণপন্থী কি বামপন্থী, কোনো দর্শনই কম মূল্যবান নয়।

এযুগের মানুষের সামনে দুটি সম্ভাবনা : একদিকে পারমাণবিক ধ্বংসের লীলা, আর-একদিকে বৈশ্বমানবিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠা। কোন্ পথ বেছে নেবে, সেই দায়িত্ব একমাত্র মানুষেরই। ব্যষ্টিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে সেই দায়িত্ব মানুষকেই পালন করতে হবে। এমন একটি গুরুদায়িত্ব পালনে তাকে যদি কেউ সাহায্য করতে পারে তা হ'ল তার বিশ্বদর্শন। বিশ্বদর্শনের কাছে জাতি থাকবে না, গোষ্ঠী থাকবে না, থাকবে না স্বদেশী উন্নাসিকতা এবং ধর্মের বিভ্রান্তিকর বিভেদ। এই দর্শনের কর্তব্য হবে মানবচেতনাকে গভীর হতে গভীরতর ক'রে তোলা, জীবনের উদ্দেশ্যকে নূতন পরিবেশে সৃষ্টি করা। এই আদর্শের উল্লেখ ক'রে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ইতিহাসখানির উপসংহারে যথার্থই বলেছেন : 'প্রকৃত দর্শন আমাদিগকে এমন এক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করিবে যাহা দ্বারা আমরা নূতন জগৎকে পতন হইতে রক্ষা করিতে পারিব। যে দর্শনের লক্ষ্য সার্বিক নহে, তাহা দর্শনই নহে।' (২য় খণ্ড, ৩৭৮ পৃঃ) এই গভীর প্রতীতি আজাদ সাহেবের সূচনাতেও প্রকাশ পেয়েছে : 'বিশ্বদর্শনের বিকাশ আজ কেবলমাত্র জ্ঞানসাধনার দাবী নয়, মানুষের সম্মিলিত জীবনের জন্য আজ তা অপরিহার্য।'

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, আলোচ্য গ্রন্থখানি ভাবী কালের বিশ্বদর্শন রচনার প্রথম উপাদান। বাংলা সংস্করণের 'নিবেদন'-এ শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যা দাবী করেছেন, সেটা ন্যায্য : 'বিভিন্ন দেশ ও যুগের দর্শনের এ রকম সমাবেশ পূর্বে বোধ হয় কোনোদিন হয় নি—সেদিক থেকে এ গ্রন্থখানি বিশ্বদর্শনের প্রথম ইতিহাস ব'লে দাবী করতে পারে।'

কিন্তু সবচেয়ে আনন্দের কথা হ'ল, এমন একখানি মূল্যবান গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। দর্শন রচনায় বাংলা ভাষার মৌলিক অবদান উল্লেখযোগ্য বলা চলে না। কয়েকজন মুষ্টিমেয় মনীষীর রচনা ছাড়া দার্শনিক গ্রন্থ বলতে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কিছুই নেই। কবীর সাহেব বলেছেন :—'বর্তমানে গ্রন্থখানি যদি বিশ্বের দর্শনচিন্তায় বিপুল ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকমনে কৌতূহল ও আগ্রহ জাগায় তবেই আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করব।' বাংলা সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলীর অভিলাষ পূর্ণ হোক। যদি না হয়, তবে লজ্জার এবং দুঃখের কথা।

অনুবাদ, বিশেষ ক'রে দর্শন সাহিত্য, অত্যন্ত কঠিন কাজ। সুতরাং অনুবাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব সত্যিই গুরু। অসংখ্য পরিভাষার প্রয়োজন। এদিক থেকে বাংলা ভাষা বড়ই দীন। তাছাড়া, দার্শনিক ভাষার একটা ভাবগত বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলা ভাষায় সে বৈশিষ্ট্য আজও বিবর্তিত হয় নি। এত অসুবিধা থাকা স্বত্ত্বেও অনুবাদকমণ্ডলী যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে তাঁদের প্রচেষ্টা অনেকটা সফল হয়েছে। তবে এটাও সত্য যে, অনুবাদ অনেক জায়গায় বড় বেশী যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে, যেন ভাষার আপন সতেজ সাবলীল গতি নেই ; কে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এটার কারণ, আক্ষরিক অনুবাদের স্পৃহা। (উদাহরণ : Spinozaর 'intellectual love of God' বাংলায় হয়েছে 'ঈশ্বরবিষয়ক বৌদ্ধিক প্রেম' ; 'Aristotetian

School' হয়েছে 'য়্যারিষ্টটলের বিত্যালয়' ইত্যাদি!) আক্ষরিক অনুবাদ কখনই অর্থবহ হয় না বা সাহিত্য পর্যায়ে ওঠে না। আর একটা কথা। গ্রন্থতালিকায় কোথাও ইংরেজী কোথাও বাংলাভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। একটা পদ্ধতি অনুসরণ করলেই ভালো হ'ত। গ্রন্থতালিকায় ইংরেজীর ব্যবহার কি দোষাবহ, বিশেষ করে বইগুলির যখন কোনো বাংলা অনুবাদ নেই?

পরিভাষা সম্বন্ধে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত। কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিভাষা সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মনে হয় না। একই শব্দের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন Rationalism কোথাও বুদ্ধিবাদ, কোথাও প্রজ্ঞাবাদ কোথাও যুক্তিবাদ; Empiricism কোথাও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদ, কোথাও দৃষ্টিবাদ কোথাও ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞানবাদ। অনেক ক্ষেত্রে পরিভাষার সঙ্গে আদিম শব্দটি দেওয়া হয় নি, ফলে অর্থ বোঝা কষ্টসাধ্য। আর-একটা কথা অনুবাদকমণ্ডলী কেন একটা পরিভাষার তালিকা রচনা করলেন না? হয় তো সেটা খুবই শ্রম-সাপেক্ষ কাজ, তবু এজাতীয় অনুবাদ গ্রন্থে পারিভাষিক শব্দের তালিকা অপরিহার্য।

সম্পাদনার কাজে ত্রুটি আছে সেগুলি অনবধানতার ফল বলেই মনে হয়। একবার খণ্ড অনুযায়ী সূচীপত্র ও পৃষ্ঠাক্রম বিশ্লেষণ করলেই অমনোযোগীতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। নামের বাংলাতে একধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নি; ফলে Fichte কোথাও করেছে ফিক্‌টে, কোথাও ফিশটে; Manicean কোথাও ম্যানিসীয় কোথাও ম্যানিকীয়। সম্পাদকমণ্ডলী একটু ধৈর্যশীল শ্রমসহিষ্ণু ও মনোযোগী হলেই এই ধরণের ত্রুটি (এবং অসংখ্য বানান ভুল) ঘটত না।

কিন্তু এসব হ'ল 'এহ বাহ্য'। প্রথম চেষ্টায় এই ধরণের ত্রুটি থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। গ্রন্থখানির মূল্য এতে হ্রাস পাবে না। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই স্বনামধন্য দার্শনিকের লেখা, প্রত্যেকটিই ভাবগর্ভ রচনা, যদিও দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিপত্তি সুস্পষ্ট। তবে কয়েক জায়গায় চিন্তাধারা যেন অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে মনে হয়। যেমন, নীটশে সম্বন্ধে যেথানেই কোনো মন্তব্য করা হয়েছে সেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে প্রচলিত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ডাঃ শিশিরকুমার মিত্রের প্রবন্ধটিও তাঁর 'Neo-Romantic Movement in Contemporary Philosophy' বইখানির ভিত্তিতে লেখা। বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। অথচ, যুদ্ধোত্তর ইউরোপে নীটশে সম্বন্ধে চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আর-একটি প্রবন্ধে ইকবাল ও গ্যেটের সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক মন্তব্য করা হয়েছে যার অর্থ গ্যেটে সেই পরিমাণ জার্মান চিত্তের অংশ হয়ে উঠতে পারেন নি যে পরিমাণে ইকবাল ভারতীয় মুস্‌লিম চেতনার অঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন। (১ম খণ্ড, ২য় ভাগ পৃঃ ১৬২) লেখক একথা একেবারেই ভুলে গেলেন যে, গ্যেটের লোকোত্তর প্রতিভার কারণই হ'ল সেইটা।

তবে আনন্দের কথা এই যে, এধরণের উদাহরণ বেশী নেই। সমগ্রভাবে দেখলে, তথ্যসম্ভারে ভাবের গভীরতায় বিষয়বস্তুর ব্যাপকতায় আলোচ্য ইতিহাসখানি দর্শন সাহিত্যের চিরসম্পদ হয়ে রইবে। সত্যসত্যই একে দর্শনের 'মধুচক্র' বলা চলে। আশা করি বাংলাদেশের সুধীসমাজ এই মধুচক্র হতে নিরবধি আনন্দে সুধাপান করবেন।

শুভব্রত রায়চৌধুরী

সমালোচনা

রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা ॥ প্রথম খণ্ড ১৯৬৫। প্রকাশক: বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন পক্ষে গ্রন্থবিভাগ। মূল্য ১৫·০০।

রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক রবীন্দ্রানুশীলন পত্রিকা। শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ মহাশয়ের ভূমিকা থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসবের সময় বিশ্বভারতীর তদানীন্তন আচার্য শ্রীজহরলাল নেহেরুর অভিপ্রায় অনুসারে এই পত্রিকা প্রকাশের ভার বিশ্বভারতী গ্রহণ করেন। সম্পাদনা করেছেন শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য। সম্পাদকের নিবেদনে তিনি বলেছেন 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং তাঁর বিচিত্র এবং বহুমুখী সাধনা সম্পর্কে উন্নততর আলোচনার বাহনরূপে এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠা।' এই পত্রিকায় কি কি প্রকাশিত হবে তার তালিকারূপে তিনি বলছেন (১) রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা (২) সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত গ্রন্থান্তর্ভুক্ত নয় এমন রচনা (৩) রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির বিবরণ (৪) সংবাদপত্র আহৃত তথ্যাবলী (৫) রচনাপঞ্জী (৬) রবীন্দ্রসম্পর্কিত গ্রন্থ পরিচিতি (৭) রবীন্দ্র চিত্র মুদ্রণ (৮) অপ্রকাশিত স্বরলিপির মুদ্রণ। সম্পাদক আরও জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ এতে বেশি প্রকাশ করা হবে না, 'তবে বিশেষজ্ঞের লেখা নূতন তত্ত্বভূয়িষ্ঠ ও মৌলিক চিন্তাসমৃদ্ধ রচনা এই পত্রিকায় সাদরে গৃহীত হবে।'

বর্তমান সংখ্যা রবীন্দ্র জিজ্ঞাসার প্রধান ও মূল আকর্ষণ মালতী পুঁথির সম্পূর্ণ মুদ্রণ এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের পাণ্ডুলিপি পরিচয়। ঐ পাণ্ডুলিপি অংশ থেকে জানা যাচ্ছে যে কবির অতি কিশোরকালের এই লেখা জমানো খাতাটি ১৯৪৩ সালে শ্রীমতী মালতী সেন রবীন্দ্রভবনকে উপহার দেন। তাঁর দাদা সুধীন্দ্রকুমার সেনের সংগ্রহে এই পুঁথিটি ছিল। তিনি কি করে এই পুঁথি পান তার কোন সূত্র জানা যায় নি। এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে সব রচনা পাওয়া গেছে তার মধ্যে প্রাচীনতম লেখা এই মালতীপুঁথিতেই রক্ষিত হয়েছে। শুধু কাব্যচর্চার প্রথম দলিলই নয়, খাতাটির মধ্যে কবির তখনকার বিদ্যাচর্চার সাক্ষ্যও কিছু কিছু আছে। কবির জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত নীলখাতা, লেটসডায়েরীর অনুসরণ করে তৃতীয় 'সহোদরা' মালতী পুঁথির আগমন। প্রথম দুটি খাতার চিহ্ন নেই, তাই তৃতীয়টির গুরুত্ব আরো বেড়ে গেল।

রবীন্দ্র জিজ্ঞাসায় মালতী পুথির সযত্ন পুনর্মুদ্রণ হয়েছে, তবে প্রত্যেক পাতায় যে সব ছবি ও হিজিবিজি লেখাজোকা আছে তা থেকে বোঝা যায় যে কবিতা ছাড়াও মনের নানা বিচিত্র প্রকাশ ঐ পাতাগুলির মধ্যে রক্ষিত হয়েছে। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এবং শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য মালতীপুঁথির নব পত্রাঙ্ক বিন্যাস করেছেন, টীকায় যাবতীয় তথ্যের সঞ্চয় ধরে দিয়েছেন, কালঘটিত কিছু কিছু সমস্যার সমাধান করেছেন। যদিও মালতী পুঁথি নিয়ে গবেষণার আরও অবকাশ

থাকবে, তবুও একথা সহজেই বলা যায় যে পরবর্তী এতৎসংক্রান্ত সহজ গবেষণার ভিত্তি রচনা রবীন্দ্র জিজ্ঞাসাতেই হয়ে গেছে।

মালতী পুঁথির প্রসঙ্গ ছাড়া রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার আর দুটি আকর্ষণ হলো শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার এবং শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : কালানুক্রমিক বিচার।

রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার প্রবন্ধে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী কথা ও কাহিনী কাব্যের মূল কাহিনীগুলি সন্ধান করেছেন এবং কবির হাতে তার কি পরিমাণ ও ধরনের পরিবর্তন ঘটলো তার আলোচনা করেছেন। উপনিষদ, পুরাণ ও ইতিহাস থেকে সংগৃহীত কবিতাগুলির বিষয়বস্তু মূল গ্রন্থে কি ছিল তা লেখক বিস্তৃত উদ্ধৃতির দ্বারা দেখিয়েছেন। একাজ ইতিপূর্বেই শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য এবং স্বর্গতঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সুরু করেছিলেন। বিশী মহাশয় কথা ও কাহিনীর প্রায় সকল কবিতার মূল সূত্র আদি গ্রন্থ থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতির দ্বারা পাঠকদের দৃষ্টিগোচর করেছেন।

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার একটি তালিকা দিয়েছেন। বিভিন্ন রচনার তারিখ, বা প্রকাশকাল এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যের দ্বারা এই তালিকার মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে।

সম্পাদনা, মুদ্রণকর্ম ও সুসজ্জিত পরিকল্পনায় রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ ঐতিহ্যের ধারা রক্ষা করেছে। যদিও আমরা এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ কল্পনার প্রশংসা করতে পারছিনা তবু সমগ্রভাবে প্রকাশনাটি যে ভিতরে বাহিরে একটি উচ্চমান রক্ষা করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

QUALITY RUBBER PRODUCTS .....
OUR SPECIALITY
PATHASATHI & PATHABIR
CYCLE TYRE & TUBE
A.R.P
1 INSERTION SHEET
2 RUBBER TUBE & HOSE
3 V BELT
4 HORN-BULB
5 SOLE-HEEL
6 TRI-CYCLE RUBBER PARTS
7 SPONGE PAD
8 PEDAL
9 SADDLE-TOP
10 BRAKE-RUBBER
11 PLAY BALL
12 BLADDER
13 HOT-BAG
14 RUBBER CLOTH
15 ERASER
STOCKISTS ALL OVER INDIA
ASSOCIATED RUBBER & PLASTIC WORKS
CALCUTTA • DUM-DUM
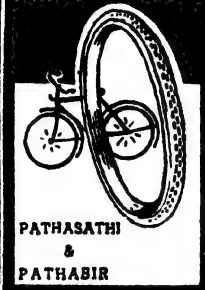
সর্ব্ব ঋতুতে ঘড়ির কাঁটার নিয়মে কাজ

দিনে, রাত্রিতে, ঝড়, বৃষ্টি, রোদে শ্যামলালের কাজে কামাই নেই। অবশ্য নামে কি এসে যায়। আমাদের শ্যামলাল ডাক পিওন হতে পারেন, টেলিগ্রাফ পিওন, লাইনম্যান, রেলের ডাকগাড়ীতে চিঠি বাছাইকারী, টেলিফোন অপারেটার, টেলিগ্রাফিষ্ট, কেরাণী অথবা ডাক ও তার বিভাগের সাড়ে চার লক্ষ কর্মীর যে কোন একজন হতে পারেন, তবে তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঘড়ির কাঁটার নিয়মে কাজ করেন।

৯৭ হাজার পোষ্ট অফিস, ৮৫০০ টেলিগ্রাফ অফিস, ২৫০০টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ (৮ লক্ষেরও বেশী টেলিফোন) এবং আরও অনেক বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ জাতির সেবা করছে। প্রতিদিন যে কাজ হয় তা হ'ল ১৮০ লক্ষ চিঠিপত্র, পার্শেল, মনিঅর্ডার ইত্যাদি, ১.৫ লক্ষ টেলিগ্রাম এবং ২ লক্ষ (কার্য্যকরী) ট্রাঙ্ক কল। এছাড়াও আরও নানা রকম কাজ করতে হয়।

এগুলি সব দৈনন্দিন কাজ হলেও শ্যামলাল তাঁর কাজ বেশ যত্নের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা সম্পর্কে শ্যামলাল উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। কিন্তু আপনাদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা থাকলে এই কাজ আরও ভালোভাবে করা যায়।

আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন।

ডাক ও তার বিভাগ

নিয়মাবলী

সমকালীন

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও কাব্য গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

Regd. No. C-315 Phone: 23-5155 May'66 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

চতুর্দশ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩

অতিথি-নিয়ন্ত্রণ বিধি

লঙ্ঘন করে
অতিথিদের আপ্যায়ন করলে
আপনার অহমিকা হয়ত তৃপ্ত হতে পারে
কিন্তু তার ফলে
হাজার হাজার লোক
দৈনন্দিন খাদ্যে বঞ্চিত হয়

অতএব

অতিথি-নিয়ন্ত্রণ বিধি মেনে চলুন

যাঁদের নিমন্ত্রণ না করলে নয়, শুধু তাঁদের
নিমন্ত্রণ করুন।
আর যে-সব খাদ্য পরিবেশন
আইন সম্মত
শুধু তাই খাওয়ান

BRING YOU PEACE OF MIND

Whether you wish to start a SAVINGS, CURRENT, FIXED or RECURRING DEPOSIT ACCOUNT or open Letters of Credit or undertake any kind of banking transaction, leave it in the safe hands of Experience—the UCO Bank, which has a net-work of branches throughout India and in foreign countries, and Agents throughout the world.

I. P. GOENKA
Chairman

R. B. SHAH
General Manager

HEAD OFFICE: CALCUTTA

নিয়মাবলী

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

চতুর্দশ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ তেরশ' তিয়াত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

জ্যৈষ্ঠ
তের'শ তিয়াত্তর

সমকালীন

চতুর্দশ বর্ষ
২য় সংখ্যা

উত্তর রাঢ়ের লোকসংগীত

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

লোকসংগীতের রূপ

লোকসংগীত মূলতঃ গ্রামদেশেই সীমাবদ্ধ। গ্রাম জীবনের ভাবভাবনাই এই সঙ্গীতে ফুটে উঠে। গ্রামদেশের সহজ সরল অর্ধশিক্ষিত আর অশিক্ষিত মানুষই এর দরদী শ্রোতা। লোকসংগীত এদের পরম প্রিয় সম্পদ। সভ্যতার আদিপর্বে যখন লোকসংগীতের সৃষ্টি—তখন বাঙালীর জীবন ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। এই গ্রামেরই পথে প্রান্তরে বাঙালী জীবনের আশা আকাঙ্খা, ধ্যান ধারণা রূপ পরিগ্রহ করতো। তাই বাঙালীর সংস্কৃতির একটি অন্যতম শাখা লোকসংগীতের রূপ গ্রামীণ। কৌমজীবনের গোষ্ঠীবদ্ধতা এই গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। লোক-সংগীতের ধারক ও বাহক যে কৌমসংস্কৃতি—তা মূলতঃ গ্রামভিত্তিক—তাই লোকসংগীতের উৎস বা আধার গ্রামজীবনের মাঝেই দেখা যায়।

এই গ্রামকেন্দ্রিকতার মুলকারণ আর্যপূর্ব সমাজজীবনে ধনোৎপাদনের ও বণ্টনের পদ্ধতি। মূলতঃ কৃষি ও অবসর সময়ে শিকার ও কুটিরশিল্পই ছিল একমাত্র উপজীবিকা। যারা কুটিরশিল্পে আত্মনিয়োগ করেছে তারাও মূলতঃ কৃষক। আর এই শিকারের জন্য খালবিল, নদীনালা, ঝোপজঙ্গল ও কৃষির জন্য মাঠ নিয়েই কোমবদ্ধ জীবনধারা ছিল ক্রমপ্রসারিত। কৃষিকার্য মূলতঃ ভূমি নির্ভর। এই ভূমি অনড় ও নিশ্চল অবস্থায় গ্রামদেশেই সীমাবদ্ধ—তাই কৃষিনির্ভরতা ভূমি নির্ভরতায় বা গ্রামনির্ভরতায় পর্যবসিত হ'য়েছে। বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া গ্রামের বাইরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না কারণ গ্রামেই ছিল জীবিকা ও জীবনধারণের সামগ্রিক উপাদান। গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। পরবর্তীকালে মধ্যযুগে বা আধুনিকযুগে বাণিজ্যবুদ্ধির প্রসারলাভ ঘটেছে

কৃষিপদ্ধতি হ'য়েছে অনেক উন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। যন্ত্রশিল্পের ব্যাপকতা কৃষিনির্ভরতাকে অনেকাংশে সঙ্কুচিত করেছে একথা সত্যি—কিন্তু কৌমসংস্কৃতির সেই আদিমধারাটি আজও সমাজ সভ্যতায় প্রসারিত। আজও বাঙালী সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষিনির্ভর।

সমাজ বা রাষ্ট্রবিন্যাসে বর্ণ বা শ্রেণীবিন্যাস প্রাধান্যলাভ করেছে। দেশের সম্পদের অধিকাংশ পরিমাণ যে শ্রেণীর সাহায্যে সঞ্চিত হ'ত—রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক অধিকারে তাদের ভূমিকা ছিল সামান্যই। তাই রাষ্ট্রানুগত্যের অভাব না থাকা সত্ত্বেও এই লোকসংস্কৃতির চর্চা বা ক্রমপ্রসারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অবদান নিতান্ত অল্প। উপরন্তু সমাজের উচ্চবর্ণের এক অহেতুক ও ঔদাসীন্যের ফলে লোকচর্চা ক্রমাবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া-কৌশলকে মেনে নিয়ে আজও সেই কোমজীবনের ধারা অব্যাহত। লোকচর্চার জন্য যে পরিবেশ, সময় ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন তার থেকে এদের সুকৌশলে বঞ্চিত করা হ'য়েছে। তবু প্রাণের যে দুর্বার আবেগ, দুর্মদ প্রাণশক্তি তাই উচ্চবর্ণের অসহযোগিতাকে উপেক্ষা করে লোকসংগীত তথা লোকচর্চাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে উৎসাহ জুগিয়েছে। কোন অর্থ নৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য বা সামাজিক অবহেলা এই গণজীবনের আনন্দোৎসব ও বিশ্বাসের সেই অফুরন্ত শক্তির উৎসটিকে শুকিয়ে যেতে দেয় নি। বাহিরের কোন সংগ্রাম বা বিপ্লব এদের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে কোন রেখাপাত করে নি পরোক্ষভাবে যা করেছে তা' সংস্কৃতিকে স্পর্শ করে নি। লোক-সংগীতের আদিপর্বে যে গ্রামকেন্দ্রিকতা—আজও সেই ধারা অব্যাহত—গতিবেগ শুধু ক্ষীণ হ'য়েছে মাত্র। যদি দেশের আগামীদিনের সমাজজীবন উত্তরকালের স্বার্থে ও অতীতের প্রতি শ্রদ্ধায় লোকসংগীতের নদীগর্ভ হ'তে মৃত্তিকা সংস্কার করে যদি উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার আশ্বাস দেন—তাহ'লেই লোকসংগীতের গতিবেগ আবার স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হ'তে পারবে—পরিধি হ'বে বিস্তৃত—ভাব ও রূপের দৈন্য যাবে ঘুচে।

লোকসংগীতের উৎস

প্রাচীন কোমজীবনের বেঁচে থাকার কৌশল ও জীবনদর্শনেই লোকসংগীতের উৎস। বেঁচে থাকার মূলে ছিল সন্তান ও শস্যকামনা আর জীবনদর্শনেই ছিল অপরিসীম যাদুবিশ্বাস। উৎসবে, সঙ্গীতে, নৃত্যে তারই বিচিত্র প্রকাশ। শুধু অলস অবসর বিনোদনের জন্য লোকসংগীত তথা লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি হয় নি—সৃষ্টি হ'য়েছে অস্তিত্বরক্ষার আদিম আগ্রহে। লোকসংগীত তাই নিছক শিল্পচর্চার দাবী নিয়ে জন্মলাভ ক'রে নি। একথা ঠিক যে লোকসংগীত পরবর্তীকালে অধিকাংশক্ষেত্রেই গ্রামজীবনের গতানুগতিকতা হ'তে বৈচিত্র্যের আনন্দলোকে সাময়িক মানসিক উত্তরণে সাহায্য করেছে—উপলক্ষ্য শুধু যে কোন পূজা বা উৎসব।

সৃষ্টিকামনার অন্যতম দাবী নিয়ে লোকসংস্কৃতির স্বীকৃতি। লোকসংগীতের মূলেও রয়েছে সৃষ্টির কামনা ও অকৃত্রিম যাদুবিশ্বাস। যাদুবিশ্বাসের জন্মও হ'য়েছে কামনার দুর্মদ আবেগ হ'তে। লোকসংগীতে ছিল সেই কামনা সফল করার স্বপ্ন। আজকের এই উন্নত ও শিক্ষিত মানসিকতায় যদি এই যাদুবিশ্বাসকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচারবিশ্লেষণ করি—তাহ'লে অবশ্যই এই জাতীয়

বিশ্বাসকে মূর্খ ও অন্ধ সংস্কার ব'লেই গণ্য করা হ'বে। একথা সকল সময়েই স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে অনার্য সংস্কৃতি উন্নত মানসিকতায় উজ্জ্বল নয় কিন্তু তাদের এই অন্ধধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার তাদের মনে এক অকল্পনীয় দৃঢ়তা এনে দিয়েছিল। লোকসংগীত ও নৃত্যে এই বিশ্বাসের প্রভাব ছড়িয়ে আছে। সভ্যতার সেই আদিপর্বে শস্যোৎপাদনের বৈজ্ঞানিক কৌশল ছিল অনায়ত্ত, যন্ত্রের ব্যবহার ছিল সীমিত আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার কৌশল ছিল অজ্ঞাত। তখন যে কোন শস্যোউৎপাদককেই ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় জীবনধারণের ক্ষেত্রে যে অসহায়তা—তাই তৎকালীন বাঙালীজীবনকে যাদুবিশ্বাসের আশ্রয়ে নিয়ে গিয়েছিল। শস্যোৎপাদনের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম—তার সার্থক পরিণতির জন্য স্বপ্নের প্রয়োজন ছিল। এই স্বপ্নসাফল্যই মানুষকে অধিকতর পরিশ্রমে উৎসাহ জোগায়। এ স্বপ্ন কামনায় থরোথরো। সিদ্ধিলাভই কামনার অন্যতম ফলশ্রুতি। কোন কারণেই মানুষ তার সাধের স্বপ্নকে নষ্ট হ'তে দিতে চায় না। কোন মানুষই চায় না—বর্তমানের সমস্ত পরিশ্রম কোন অজ্ঞাত অন্ধকারের গর্ভে বিলীন হ'য়ে যাক্। এই সমস্ত কামনাকে স্বপ্নকল্পনায় ফুটিয়ে তুলতো নৃত্যগীতের মাধ্যমে।

কোমজীবনের কামনা ছিল মূলতঃ দুই—একটি সন্তান, দ্বিতীয়টি শস্য। এই দুই কামনাই লোকসংস্কৃতিকে আদিপর্বে পরিচালিত করেছে। যাদুবিশ্বাস একের কামনা অন্যকে প্রভাবিত করেছে। কৌম সভ্যতায় যাবতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও উৎসবে সেই কামনারই অভিব্যক্তি। বিভিন্ন পূজাপার্বণ উদ্‌যাপনের আনন্দেও সেই কামনারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিফলন।

পরবর্তীকালে আর্য্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশীর্বাদধন্য উচ্চতর মানব সমাজ এই কামনা আর যাদু বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ করেছে—তাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও বস্তুনিষ্ঠা দিয়ে। লোক চর্চার সাথে কোন সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন বোধ করে নি। মানুষের প্রকৃতিগত গুণই এই যে—তার নিজস্ব বিশ্বাস ও সংস্কারকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকা। তাই আর্য্যধর্ম প্রসারলাভের পরও লোকায়ত আচার অনুষ্ঠান নৃত্যগীত কোন কিছুই লুপ্ত হয়ে যায় নি।

প্রাচীন সমাজজীবন প্রাকৃতিক নিয়মের মাত্রাহীন ক্ষমতায় বিশ্বাসী। স্থির বিশ্বাস ছিল—মানুষের ক্ষমতায় এই শক্তিকে রোধ করা সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কোন দৈবদুর্য্যোগকে দেবতার রোষ বা অভিশাপ বলেই মেনে নেওয়া হত। বিশ্বাস করতো নৃত্যগীতের মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্তার মনোরঞ্জন করা হবে। ঈশ্বর তুষ্ট হ'লেই আসবে ফসলের প্রাচুর্য্য। তাই নৃত্যগীতের মাঝেই ফুল ফোটানোর আর ফসল ফলানোর ইঙ্গিত। যদি নৃত্যগীত না হয় —কিংবা অনুষ্ঠানে আন্তরিকতা বা শুচিতার অভাব ঘটে—তা'হলে বিধাতার রোষ নেমে আসবে। ব্যর্থ হবে শস্য আর সন্তানকামনা। দেশ জুড়ে নেমে আসবে দুর্ভিক্ষ আর হাহাকার। এ এক দুঃস্বপ্ন।

প্রাকৃতিক উক্তির কাছে অসহায়, দুর্বল মানুষের মন চায় কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে। যাদু বিশ্বাসই সেই আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শক্তির অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই যাদু বিশ্বাসের প্রভাব সমাজ হতে মুছে তো যায় নি বরং ব্রতে, সঙ্গীতে, নৃত্যে আচার অনুষ্ঠানে

আজও এর প্রভাব রয়েছে কারণ কোন একটি আন্তরিক বিশ্বাস জাতির জীবন হতে মুছে যেতে সুদীর্ঘ সময় লাগে—তা যতই ভ্রান্ত হোক না কেন। নৃত্যগীতের মাঝেও সেই যাদু বিশ্বাস কামনা সফল হওয়ার স্বপ্ন। সাফল্যের আনন্দ যাদু বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করতো। তাই লোকসংগীত ও নৃত্যের সমস্ত প্রেরণা মূলতঃ এসেছে যাদু বিশ্বাস আর বেঁচে থাকার কামনা হ'তে।

'ম্যাজিকের মূলে মনের ভাবানুসঙ্গের ক্ষমতা। এই মতবাদ হাতেকলমে পরীক্ষিত ও সমর্থিত হয়েছে আদিম অধিবাসীদের জীবন হ'তে। মানবসংস্কৃতির বস্তুগত দিক হতে যেমন একটা প্রস্তর যুগ আছে তেমনি মনীষার (intellect) দিকে রয়েছে একটি ম্যাজিক যুগ।

ম্যাজিকের নেতিবাচক দিকটাকে বিকশিত করলো ধর্ম আর ইতিবাচক দিকটাকে বিজ্ঞান। আদি বিজ্ঞানীরা সকলেই পুরোহিত। তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়েছিল ম্যাজিকের চিন্তাধারায়।'

লোকসঙ্গীত বা নৃত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একক নয়, যৌথ। এ অনুষ্ঠানে ব্যষ্টিসত্তার কোন মূল্য নাই। সমষ্টিগতভাবে নৃত্যগীত করবে জানাবে তাদের মনের কামনা। সমগ্র গোষ্ঠীর একটি সামগ্রিকরূপ ফুটে উঠে। সারা গোষ্ঠী বা জনপদের জন্য সকলে মেতে উঠে—নৃত্যগীতে। সকলের প্রাণের স্পর্শ পেয়ে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। সকলে একই কামনার কথা ভাবছে—একই কামনার কথা গাইছে।

প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করার বৃথা চেষ্টায় জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হবে—এই ছিল বিশ্বাস। নৃত, গীত আর ম্যাজিকের ক্ষমতায় প্রাকৃতিক শক্তিকে তুষ্ট করে বশে আনতে পারলেই জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রকৃতির অন্যতম উপাদান বৃক্ষকে কেন্দ্র করেই অধিকাংশ অনুষ্ঠান। বৃক্ষ অনেকক্ষেত্রে লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তু। বীজবপনের সময় হতে ফসল উঠার সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন পর্য্যায়ে যে অনুষ্ঠান—তাকে কেন্দ্র করেই আদিম লোকসংগীত। বৃষ্টির অনুকরণে ঘড়া করে জল ছিটিয়ে দিলেই ফসলের প্রাচুর্য্য আসবে এই ধারণা। 'ভাঁজো লো কলকলানী মাটি লো সরা—' ভাঁজো উৎসবে মেয়েরা মেতে উঠে নিছক আনন্দের প্রকাশে নয়। তাদের বিশ্বাস এই গানের মাধ্যমেই ভাঁজো সত্যিই কলকলিয়ে উঠবে—সারা মাঠ জুড়ে দেখা দেবে অফুরন্ত ফসল।

লোকসংগীতের পরিধি

লোকসংগীতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এই সঙ্গীত আদিপর্বে কৌমচেতনায় মধ্য ও আধুনিক পর্বে শুধুমাত্র অন্ত্যজ শ্রেণী ও সর্বশ্রেণীর অন্দরমহলে সীমাবদ্ধ। ব্রত ও বরণ দুটি অনুষ্ঠানই মেয়েদের। দুটিতেই যাদু বিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রভাব। আদিপর্বের যাবতীয় অনুষ্ঠানে —যা' আধুনিকালেও প্রবহমান শুধু ছড়া গীত আর নৃত্য। কোন পুরোহিত নাই। মূলতঃ মেয়েরাই এই অনুষ্ঠানের পুরোহিত। এরাই সমষ্টিগতভাবে তাদের সন্তান কামনা ও শস্য কামনার কথা নৃত্যগীত আর ছড়ার মাধ্যমে ব্যক্ত করে। চরম শুচিতার সাথে অনুষ্ঠানের প্রতিটি অঙ্গ পরিচালনা করে। বয়োজ্যেষ্ঠরাই মূলদায়িত্ব গ্রহণ করে এবং মূলগায়েনের ভূমিকা নেয়। গ্রামের বাইরে কোন বৃক্ষতলে বা উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, ঈষৎ ঘন জঙ্গলের মাঝে, পাহাড়ের কোলে বা নদীর ধারে মিলিত

হয় মেয়েরা। সমস্ত সমাজের কামনাবাসনার কথা গানের ভাষায় জানিয়ে দেন।

মেয়েদের এই অধিকারের মূল কারণ হল প্রজননের ক্ষেত্রে মেয়েদের মূল ভূমিকা। শস্য ও সন্তান কামনায় এদের প্রচেষ্টাই কার্য্যকরী ছিল। আদিপর্বে কৃষিকার্য্যে মেয়েদেরই প্রধান অধিকার ছিল। যন্ত্র কৌশল আয়ত্তে আসার পূর্ব পর্য্যন্ত মেয়েরাই কৃষিকার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। কৃষিকার্যের আবিষ্কার মেয়েরাই প্রথম ক'রে সভ্যতার অভিবাদন গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে উন্নত কৌশলের ফলে কৃষিকার্য মেয়েদের হাত হ'তে পুরুষদের হাতে চলে গেলেও সেই নৃত্যগীত মুখরিত আদিম অনুষ্ঠান ও যাদুবিশ্বাস আজও সমানে চলেছে। শত শত কামনা-বাসনার সাথে মেয়েরা এই দুই প্রধান কামনার কথা তাদের ব্রতে, অনুষ্ঠানে, নৃত্যগীতের মাঝে নব নব রূপে জন্ম দিয়েছে। পুরুষের কোন অভিভাবকত্বকেই তারা মেনে নেয় নি। যুক্তিনিষ্ঠ পুরুষ কখনও এদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে নি বা অহেতুক যুক্তিজাল বিস্তার করে এদের হৃদয়াবেগকে ক্ষান্ত করে নি। বিবাহের রাত্রে বা পরদিন নব বরবধূকে বৈদিকমতে মন্ত্রোচ্চারণ করায় শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠান এতেই সাঙ্গ হয় না। মেয়েদের হাতেই ছেড়ে দিতে হয়—বরবধূকে। অন্দরমহলে মন্ত্রবিহীন মেয়েলী অনুষ্ঠান চলে। শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মেয়েদের বিচিত্র রীতিনীতি। কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি হ'লে চলবে না। পুরুষের কোন অনুশাসন নিষিদ্ধ। ছড়া, গীত আর হাস্যপরিহাসই এদের মন্ত্র—এর মাঝেই আছে অকৃত্রিম যাদুবিশ্বাস আর কামনা।

আদিম সেই মাতৃপ্রাধান্য সভ্যতায় কৃষিকার্যে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে মেয়েদের একমাত্র অধিকার পরবর্তীকালেও অন্দরমহলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছে। বাঙলাদেশে দেবের চেয়ে দেবীর প্রাধান্য বেশী। অধিকাংশ দেবীর ক্ষেত্রেই ভয়ভক্তির প্রশ্ন বিজড়িত। এই মাতৃকাতন্ত্রের প্রাধান্য সেই কোমবদ্ধ জীবনাদর্শ হ'তেই সৃষ্ট।

'আর্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম আজও লোকায়ত অনার্য ধর্ম-কর্মের অনেক আচার অনুষ্ঠান, দেবদেবী ধীরে ধীরে নিজের কুক্ষিগত করছে—কোথাও তাহাদের চেহারায় আমূল পরিবর্তন করিয়া—কোথাও একেবারে অবিকৃতরূপে। বাঙালীর ধর্ম-কর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে রাঢ়, পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের এক কথায় বাঙলার আদিবাসীদেরই পূজা ও আচার, ভয় সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস।······যে ধর্ম-কর্মময়—সাংস্কৃতিক জীবন বাঙালীর গভীরে বিস্তৃত, যে জীবন নগরের সীমা অতিক্রম করিয়া গ্রামে কুটিরের কোনে, চাষীর মাঠে, গৃহস্থের আঙ্গিনায় ফসলের ক্ষেতে, গ্রাম্যসমাজে চণ্ডীমণ্ডপে, বারোয়ারী তলায়, নদীর পারে, বটের ছায়ায়, জনহীন অন্ধকার অরণ্যে, নৃত্য সংগীতে পূজা আরাধনার বিচিত্র আনন্দে, দুঃখ শোক মৃত্যুর বিচিত্র লীলায় বিস্তৃত।'

লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ

শ্রুতি ও স্মৃতি লোকসংগীতের অন্যতম সম্পদ। সিনেমা বা গ্রামাফোনের গান গ্রামিক জনসাধারণের শ্রুতি বা স্মৃতিকে বর্তমানে অনেকাংশে যে সংক্রামিত করেছে—একথা আর বলার অপেক্ষা

রাখে না। সম্ভবতঃ এই কারণেই লোকসংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শ্রুতিনির্ভরশীলতার বিরুদ্ধে পুঁথির ব্যবহার চলেছে। যুগের পর যুগ শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্য দিয়ে পরিবাহিত ও পরিবর্তিত হয় বলেই লোকসংগীত অবিনাশী। কিন্তু বর্তমানে গায়েনদের পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি ব্যবহারের মোহ লোকসংগীতে ক্ষীয়মাণ অবস্থারই স্মরণিক।

লোকসংগীত মূলতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা হ'লেও কালক্রমে লোকের মুখে মুখে প্রচারের ফলে এই সংগীত সমষ্টির বিষয়বস্তু হ'য়ে উঠে। সমসাময়িক কালের রুচি ও পরিবেশ বুঝে গায়ক এই গান রচনা করেন কিন্তু কালের ব্যবধানে ও মৌখিক প্রচারের ফলে এর যে পরিবর্তিত নতুনরূপ তাই লোকসংগীত। আজকের যুগে শিক্ষিত ও উন্নত মানসিকতার বিচারে লোকসংগীতে পরিবেশনের ভঙ্গী ও ভাষা খুব স্থূল মনে হ'তে পারে কিন্তু এই সংগীতের মাঝে যে অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা যা অগণিত সরল শ্রোতৃমণ্ডলীকে অবিশ্বাস্যভাবে পুলকিত করে তা নিশ্চয়ই স্থূল নয়। কালের পরিমাপে লোকসংগীতের বিচার নিরর্থক। সমাসাময়িক ঘটনার প্রভাব ও পরিবর্তিত ভাষার রূপ কালের ব্যবধানে লোকসংগীতের বহিরঙ্গ রূপে পরিবর্তন আনে একথা সত্য কিন্তু ভাগবত বিষয়ে যে কেন্দ্রীয় ঐক্য তা' কাল হ'তে কালান্তরে প্রবহমান। নিরক্ষর অশিক্ষিত, সহজ সরল গ্রাম্য শ্রোতা সংগীতের তথ্য ও তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য বৃথা চেষ্টা করে না কিন্তু এই অনুপলব্ধি তাদের রসগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

শিক্ষার প্রসারের সাথে লোকসংগীতের লিখিত রূপের প্রচলন অসম্ভব নয়। লোকসংগীত লিখিত হলেই যে তার বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হবে একথা সত্য নয়। এই লিখিত রূপের সুবিধের দিক হল যে—মৌখিক প্রচারের মধ্যে যে বিকৃতি বা অবলুপ্তির সম্ভাবনা থাকে—তা রোধ হয়। কিন্তু অসুবিধের দিক হল এই যে এর ফলে লিখিত গান নিয়েই গায়কসম্প্রদায় তৃপ্ত থাকবে—নতুন কিছু সৃষ্টি করার উৎসাহ পাবে না এবং সম্পদের প্রসারলাভ ঘটবে না। দ্বিতীয়তঃ কোনও গায়ক এই গানের ক্রমোন্নতি সাধনের সুযোগ পাবে না। মৌলিক রূপের ক্ষেত্রে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি স্বাধীনতা তা লিখিত রূপের ক্ষেত্রে থাকে না। সমষ্টির আবেগে রসসিক্ত যে রূপ, সমষ্টির চেতনায় উদ্বুদ্ধ যে সত্ত্বা, সমষ্টির আনন্দের অনুকূলে তার সৃষ্টি যে বৈচিত্র্য অন্য কোন জাতীয় সংগীতে দুর্লভ। পরিবর্তনশীল বলেই লোকসংগীত চিরনতুন।

লোকসংগীতের 'ধারক ও বাহক বাঙলার প্রাকৃত জন—তারা জাতি হিসাবে মূলতঃ সেই হিন্দ আর্যগোষ্ঠীর নয়। অবশ্য হিন্দ আর্যভাষা তারা গ্রহণ করেছে কিন্তু সেই সংস্কৃতি উচ্চকোটির চিন্তায় বা আচার নিয়মে তাদের অধিকারও ছিল না। বাহ্যতঃ অবশ্য সেই হিন্দ আর্য সংস্কৃতিকে তারাও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বাংলার এই জনশ্রেণী জীবনযাত্রায়, আচারে নিয়মে, ভাবনায় কল্পনায় নিজেদের প্রাচীনতর ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যথেষ্টই বহন করে চলেছিল…এইটিই অন্-আর্য বাঙালীর নিজস্ব বস্তু—বাঙালীর খাঁটি জিনিষ।…কিন্তু সেই প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের যুগে এই লৌকিক উত্তরাধিকার সাহিত্যে সদুন্নিত হয় নি। লোকগীতি, লোককাহিনী হিসাবে তা ছিল বাঙলার জনগণের মুখেই নিবদ্ধ। উচ্চকোটি শিক্ষিতেরা তা লিপিবদ্ধ করেন নি।'

পরবর্তীকালে শিক্ষিত সমাজের বিশেষ লোকসংগীতের ক্ষেত্রে যে অনুরাগ দেখা দিয়েছে

তার মাঝে হৃদয়াবেগের চেয়ে বুদ্ধিগত বিচারবিশ্লেষণই বেশী প্রাধান্য পাওয়ায় অধিকাংশক্ষেত্রেই দৃষ্টিভঙ্গীতে শুধু অনুকম্পাই দেখা গিয়েছে। একাত্ম হওয়ার আগ্রহ কম। একথা সত্য লোকসংগীত পল্লীজীবনের ঐতিহ্যানুসারী হওয়ায় নাগরিক জীবনের সাথে পরিচিত সম্প্রদায়ের এই সংগীতের রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে একটি মূলগত বাধা আছে। পল্লীজীবনের বহুধা বিচিত্র উপকরণের সবই সাঙ্গীকরণ করে নিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখে এই লোকসংগীত। লোকসংগীতে গুরুবাদের প্রচলন নেই। সকলের গান গাওয়ার সমান অধিকার। এ গান শেখার জন্যে বিশেষ কোন রীতিনীতি নাই। কণ্ঠস্বর মিষ্টি না হওয়ার জন্য কিংবা সুর বা তালজ্ঞান না থাকার জন্যে কারও লজ্জা বা ভয় নেই যে কোন আসরে মিলিত কণ্ঠের সুরের যে ঐক্যতান লোকসংগীতের তাই সম্পদ। শ্রোতার ইচ্ছা অনুযায়ী, তৃপ্তি অনুযাযী সুর বা পরিবেশনের ভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। চর্চা বা সাধণার দ্বারা এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা দুঃসাধ্য।

লোকসংগীতে বাধ্যযন্ত্রের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। বর্তমানে বাদ্যযন্ত্রের প্রভাব অনুভূত হ'লেও কোনদিনই এই বাদ্যযন্ত্রকে লোকসংগীতের অপরিহার্য অঙ্গ ব'লে মনে হয় নি। অতীতে লোকসংগীতের ক্ষেত্রে মহড়ার প্রচলন ছিল না বলেই চলে। কিন্তু বর্তমানে অনুষ্ঠানে বা উৎসবে স্বগ্রামে বা ভিন্নগ্রামের ভিন্নগোষ্ঠীর সাথে প্রতিযোগিতাভিত্তিক হওয়ায় লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও মহড়ায় প্রচলন দেখা দিয়েছে। আর্থিল অসংগতি উপেক্ষা করে উৎসবের আনন্দকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রলোভন এর অন্যতম কারণ।

লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য বিচার করে ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসংগীতকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন :

১। আঞ্চলিক—এই জাতীয় লোকসংগীত বিশেষ কোন অঞ্চলের মাঝেই সীমাবদ্ধ। যেমন পটুয়া, ভাদু, ঝুমুর (পশ্চিমবঙ্গ) গম্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়া (উত্তরবঙ্গ) জারি, ঘাটু, (পূর্ববঙ্গ)

২। পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত—Functional বা মেয়েলী সঙ্গীত।—সব মেয়েলী সঙ্গীত ব্যবহারিক সঙ্গীত নয়। পরিবারের সীমানার মধ্যেই এই গান গীত এবং পরিবারস্থ ব্যক্তির সাথে এর নিগূঢ় সম্পর্ক। পরিবারের বাইরের যে বৃহত্তর জীবন তার সাথে এর সম্পর্ক নাই। বিবাহ, সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, অন্নপ্রাসন ইত্যাদি উপলক্ষ্যে মেয়েরা যে গান গায় তাই পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত। আচার অনুষ্ঠানের সাথে বিশেষ উদ্দেশ্যেই এই গান গীত হয়। এই গীত সর্বাপেক্ষা নিরাভরণ, ভাবের কোন গভীরতা নাই।

৩। আনুষ্ঠানিক বা পার্বণ সঙ্গীত প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিবসে কোন পূজাপার্বণ উপলক্ষ্যে যে লোকসঙ্গীত গীত হয় সে গুলিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। এ জাতীয় সঙ্গীত মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পুরুষ ও বালকবালিকাদের অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

৪। কৃষিসঙ্গীত—Work song কর্মবিষয়ক লোকসংগীত।

উত্তররাঢ়ে বিবাহ ব্যতীত পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত প্রচলন নেই বললেই চলে। কৃষিবিষয়ক সঙ্গীতের প্রচনও খুব কম। এই জনপদের লোকসংগীতের ধারা বিশ্লেষণ করলে এই সঙ্গীতকে মোটামুটি নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১। জীবিকাশ্রয়ী—জীবিকা অর্জনের জন্য বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী লোকসংগীতের আশ্রয় গ্রহণ করে। জীবিকা অর্জনের জন্য গায়কের যে ক্লান্তি, যে বেদনা গানে রুক্ষতা এনে দেয়।—শ্রোতার রস গ্রহণে তাতে কোন অসুবিধা হয় না। এই গান উত্তরাধিকারসূত্রে অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করে। গানের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিই গায়ককে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়। গায়কের ব্যষ্টিচেতনা শ্রোতৃমণ্ডলীর সমষ্টিচেতনার সাথে যুক্ত হ'য়ে জীবিকার স্থূল বাস্তবতাকে বিস্মৃত হ'য়ে উভয়ের মাঝে একটি রসঘন ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি করে। যেমন পটুয়া, বেদের গান, ছাদ পেটানোর গান। ডাঃ আশুতোষ ভট্টচার্য্য মহাশয় এদের Professional song-এর পর্য্যায়ভূক্ত করেছেন। এই গান একটি সম্পূর্ণ জাতি বা গোষ্ঠীকে এই অলস অর্থনীতির চাপের মাঝেও অস্তিত্বরক্ষার অনুপ্রেরণা দিচ্ছে নতুনতর শক্তির সঞ্চার করছে।

২। পূজাশ্রয়ী—বিশেষ কোন দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে যৌথভাবে যে গান গাওয়া হয়—যেমন গাজন, বোলান, ভাঁজো-ভাদু। এগুলি 'পার্বণ সঙ্গীতের'ও পর্য্যায়ভূক্ত। দেবদেবীর পূজাকে অবলম্বন করে যেহেতু এই গীত—সেহেতু এক্ষেত্রে ধর্মীয় চেতনা পুরোপুরিভাবেই দেখা যায়। লোকসংগীতের দেবদেবী অন্ত্যজ পরিবারের আপনজন। এই দেবদেবীকে কেন্দ্র করেই বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের অপত্যস্নেহ, দয়িতের প্রেমসুধা, অন্তরের সাথীর প্রীতি সবই ভাষায় ও ভাবে ব্যক্ত হয়—লোকসংগীতের মাধ্যমে। সংসারের যত অতৃপ্ত কামনাবাসনা পরিতৃপ্ত হয় দেবদেবীর লীলাখেলায়।

৩। পরিবারশ্রয়ী বা উৎসবাশ্রয়ী—পারিবারিক কোন উৎসব বা সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে যে গান গাওয়া হয় সেইগুলিকে এই পর্য্যায়ভূক্ত করা যেতে পারে। যেমন বিয়ের গান, ঝুমুর ইত্যাদি।

৪। বিবিধ—লোকসংগীতের যে সমস্ত শাখাকে উপরিউক্ত তিন পর্য্যায়ের অন্তর্ভূক্ত করা যায় না—তাদেরকেই বিবিধ শ্রেণীর পর্য্যায়ভূক্ত করা যেতে পারে।

লোকসঙ্গীতের মূলগত যে ভাব—যে ধর্মীয় চেতনার দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব উত্তররাঢ়ের লোকসঙ্গীতের সাথে বাঙলার অন্যান্য প্রান্তের লোকসঙ্গীতের ঐক্য রচনা করেছে—সেই ধর্মীয় চেতনাই উত্তররাঢ়ের উপরিউক্ত শ্রেণীবিভক্ত লোকসংগীতের মাঝে এক ভাবগত সংহতি রচনা করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রামায়নের কাহিনী ও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিস্তার করেছে।

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

প্রাচীন পরিচয়

প্রাক মুসলমান যুগের বাংলার মন্দির নির্মাণের ইতিবৃত্ত রচনা করিতে গেলে আলোচনা যে অঙ্গহীন হইয়া পড়িবে একথাটা আগেই বলিয়া রাখা ভাল। উপাদানের অভাবটাই বড় হইয়া দেখা দেয়। জলবায়ুর প্রভাবে তো অনেক মন্দিরই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই চলিয়াছে নবাগত বিজেতাদের নির্বিচার ধ্বংসলীলা। প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ের হাত এড়াইয়া আজ পর্যন্ত যাহা টিকিয়া আছে সেটুকুই সম্বলমাত্র। এ সম্বল এতই স্বল্প যে ক্রমবিবর্তনের কোন নির্দিষ্ট ধারা ধরিয়া দেওয়া সম্ভব হয় না।

আর্য সভ্যতার প্রভাবে আসিবার আগে বাংলা দেশে ধর্মীয় স্থাপত্যের রূপ যে কি ছিল সে কথা জানিবার আজ আর কোন উপায় নাই। আর্য ভাবধারা প্রকাশের সঙ্গে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম বাংলাদেশে আসিয়া সমগ্র প্রদেশটিকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। ভাবের দিক দিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম স্থানীয় ধর্মচিন্তার সহিত আপোষ করিয়া নিয়া যে বিস্তৃত ও উদার পরিবেশ রচনা করিয়াছিল তাহার প্রভাব প্রাথমিক অবস্থায় কিভাবে এবং কতটা বাংলার মন্দির রচনা রীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল সে কথাও আজ অজ্ঞাত।

প্রাচীনতম যে মন্দিরগুলির সন্ধান মিলিয়াছে তাহার একটিও কিন্তু কালজয়ী হইয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাই। লুপ্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মাটি খুঁড়িয়া আবিষ্কার করিতে হইয়াছে অথবা পুঁথির উপর চিত্রিত প্রতিকৃতি দেখিয়া বুঝিয়া নিতে হইয়াছে সে কালের দেবালয়ের রূপরেখা কি ছিল। আবরণ উন্মোচন করিয়া যেগুলিকে আবিষ্কার করা হইয়াছে তাহাদের চূড়া, শিখর, আচ্ছাদন অঙ্গসজ্জা সবকিছুই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ধূলায় মিশিয়া আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। মন্দিরদেহ বলিতে অবশিষ্ট আর কিছুই নাই। যেটুকু আছে সে মন্দিরের অধিষ্ঠান কিংবা আসনের ভগ্নাবশেষ কোথাও হয় তো বা দেওয়ালের একটা অংশ। মহাস্থান, বৈগ্রাম, ও দেবালয়ে মাটি খুঁড়িয়া ইহার বেশী কিছুই পাওয়া যায় নাই। পাহাড়পুরের কথা কিছুটা স্বতন্ত্র। দেওয়ালের অনেকটাই এখানে মাটীর নীচে চাপা পড়িয়াছিল। উপাদানের এই অবস্থায় মন্দিরের আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না—বিবরণ অনেকটাই ধ্বংসাবশেষের হইয়া যায়। এই অসম্পূর্ণ বিবরণের জন্যও আবার পূর্বসূরীদের অনুকরণ অনেকটাই করিতে হইবে, কারণ, ইহাদের অধিকাংশই আজ পূর্বপাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র দেবালয় গ্রামের সুবৃহৎ ধ্বংসাবশেষটি পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে। তবে ইহার সম্বন্ধেও পূর্ণ বিবরণী লিখিবার সময় হয় নাই—খননকার্য এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। তথ্য সমৃদ্ধ উপাদানের অভাব রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তবুও প্রাচীনতম মন্দিরগুলি বর্তমান আলোচনায় অপরিহার্য— ধ্বংসাবশেষ হইতেই সূত্র খুঁজিয়া নিয়া উত্তরকালের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

খননাবিষ্কারের ফলে দিনাজপুর জেলার বৈগ্রামে একটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়।

দেখিয়া মনে হয় মন্দিরটির চতুরস্র গর্ভগৃহের চারিদিক ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ পথের জন্য পরিবেষ্টিত কক্ষ ছিল। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী, ঐদিকেই একমাত্র প্রবেশ পথের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আসন ও নির্মাণ পরিকল্পনার যতটুকু পরিচয় রহিয়াছে তাহাতে গুপ্তযুগের প্রথম দিকে নির্মিত দ্বিতল মন্দিরগুলির সহিত একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার মত। তবে গুপ্ত মন্দিরের মত একটা ছাদ—সমতল ছিল কিনা সে কথা জানিবার সম্ভাবনা নাই। বৈগ্রামে প্রাপ্ত ১২৮ গুপ্তাব্দে (৪৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) অঙ্কিত একটি পট্টোলীতে শিব নন্দীর মন্দিরের উল্লেখ রহিয়াছে। প্রাথমিক গুপ্ত মন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এ মন্দিরটি পট্টোলী-কথিত শিবনন্দীর মন্দির যে হইতে পারে এ সম্ভাবনা প্রবল।

পূর্ব পাকিস্থানে বগুড়া জেলার মহাস্থানই হইল প্রাচীন পুণ্ড্রনগর—পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির 'স্থানীয়' অর্থাৎ প্রধান শাসনকেন্দ্র। মৌর্যযুগ হইতে শুরু করিয়া হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ত ইহার গুরুত্ব ও খ্যাতি যে অক্ষুণ্ণ ছিল এ তথ্য আজ সুপরিজ্ঞাত। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে মহাস্থান গড়ের ভিতরে ও বাহিরে অনেকগুলি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৌর্যযুগ হইতে বর্তমান থাকিলেও মৌর্য, শুঙ্গ বা কুষাণ আমলের কোন মন্দিরের সন্ধান কিন্তু এখানে পাওয়া যায় নাই। দুর্গ প্রাকারের বাহিরে করোতোয়া নদীর তীরভূমির ঠিক উপরে গোবিন্দ ভিটা নামে একটি ঢিবির উপরের আবরণ উন্মোচন করিয়া একই স্থানে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত কয়েকটি মন্দিরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা হইয়াছে। ইহাদের কোনটি সম্পর্কেই পরিষ্কার ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। একটিমাত্র স্থানে বিভিন্ন সময়ে একটির উপর আরএকটি মন্দির নির্মাণের ফলে পূর্ববর্তী মন্দিরের ভিত্তি ও মেঝের বেশ কিছুটা অংশ পরবর্তীটির নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সর্বপ্রথম স্তরের মন্দিরটি সম্ভবত পরবর্তী গুপ্তযুগের সৃষ্টি। একটি আলোকচিত্রে দেখা যাইতেছে একটি দেওয়ালের নিম্নাংশে আয়তাকার ছোট ছোট কুলুঙ্গির সারি দেওয়াল বাহিয়া টানা চলিয়া গিয়াছে। গুপ্ত ও পাল যুগে ইঁটের মন্দিরে দেওয়ালের নিম্নভাগে কুলুঙ্গি কাটিয়া পোড়ামাটির মূর্তি-ফলক বসাইয়া অঙ্গসজ্জা রচনা করা হইত। বর্তমান ক্ষেত্রেও যে কুলুঙ্গিগুলি একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল এমনটা অনুমান করা যায়। ধ্বংসাবশেষ হইতে কতকগুলি পোড়ামাটির মূর্তিও কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল। দুর্গপ্রাকারের ভিতরে বৈরাগীর ভিটাতে অনুরূপ অবস্থার দুইটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এখানেও প্রথমটির অবশেষ দ্বিতীয়টির নীচে আংশিকভাবে প্রচ্ছন্ন একই স্থানে একটু এদিক ওদিক করিয়া পরবর্তী মন্দিরটি নির্মাণ করিবার ফলেই প্রথমটির এই অবস্থা। প্রথমটি সম্পর্কে এইটুকু মাত্র বলা যায় ইহার আসন ছিল যোগচিহ্নাকৃত। দুইটি মন্দিরই সম্ভবত পালযুগের। প্রথমটি পালযুগের প্রথমদিকে আর দ্বিতীয়টি পরবর্তী পালযুগে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান।

মহাস্থান ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলের বৃহত্তম এবং একটি অতি অভিনব মন্দিরের সন্ধান মিলিল গোকুলের মেঢ়স্তূপ খনন করিবার সময়। এখানেও অধিষ্ঠান ও মন্দিরের মেঝে ছাড়া আর কিছুই রক্ষা পায় নাই। সামান্যাধিক ত্রিশ ফিট উচ্চ একটি বিশালায়তন ভিত্তি অধিষ্ঠানের উপর মন্দিরের অবস্থান। বর্গাকার মূল অধিষ্ঠানের চারদিকের সুপ্রশস্ত দেওয়াল ও কেন্দ্রস্থিত চব্বিশটি বাহুবিশিষ্ট মন্দিরের মধ্যবর্তী অংশ কতকগুলি বিপরীতমুখী বিভাজক প্রাচীরের সমাবেশে বহুসংখ্যক কোষকক্ষে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। কোষকক্ষগুলি মাটি দিয়া ভরাট করা। চারি দিকের সুদৃঢ় দেওয়াল

ও ভিতরের কোষ কক্ষগুলি একটি শক্তিশালী ভিত্তিভাগ রচনা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। অধিষ্ঠানের প্রত্যেকটি বাহুর সম্মুখে অনুরূপ কক্ষ সমন্বিত একটি করিয়া উদ্গত আয়তক্ষেত্র। এই উদ্গত আয়ত ক্ষেত্রগুলির বহির্মুখে আবার দেওয়াল তুলিয়া তাহার অভ্যন্তরভাগে বিপরীতমুখী প্রাচীর তুলিয়া কোষ-কক্ষ সৃষ্টি করা হইয়াছে। সর্বশেষ পর্যায়ের দেওয়ালগুলি এবং ফলতঃ আভ্যন্তরীণ কোষ-কক্ষগুলি নীচের দিকে ক্রমশঃ ঢালু ও সংকীর্ণ হইয়া মাটির দিকে নামিয়া আসিয়াছে। পশ্চিম দিকের উদ্গত অংশের আয়তন অন্যগুলির তুলনায় বিস্তৃততর এবং এই দিকে সোপানাবলীর চিহ্ন দেখিয়া মনে হয় মন্দিরটি ছিল পশ্চিমমুখী। মূল অধিষ্ঠানের চতুর্দিকে ক্রমপর্য্যায়ে নির্মিত উদ্গত অংশগুলি বিস্তৃত করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল অধিষ্ঠানটিকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তোলা। এই সুদৃঢ় ভিত্তিভাগ যে মন্দিরের জন্য গঠিত হইয়াছিল তাহার গঠন ও বিন্যাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। অবশিষ্ট হইতে বুঝা যায় মন্দিরটির আসন ছিল চব্বিশটি বাহু ও উপযুক্ত সংখ্যক কোণ বিশিষ্ট। মেঝের ঠিক মাঝখানে রহিয়াছে বৃত্তাকার একটি কক্ষ। এই বৃত্তের মধ্যে উপবিষ্ট বৃষের মূর্তি খোদিত একটি সোনার পাত পওয়া গিয়াছিল।

বাংলার প্রাচীনতম মন্দিরের একটিমাত্র পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে। চব্বিশ পরগণা জেলার দেবালয় গ্রামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে খননকার্যের ফলে একটি বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হইয়াছে। খননকার্য এখনও শেষ হয় নাই তবে মূল মন্দির এবং তাহার আশেপাশের কতকগুলি মন্দির ও প্রকোষ্ঠের অস্তিত্ব আজ দৃষ্টিগোচর। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে মূল মন্দিরকে ঘিরিয়া যে ক্রমাগত সংযোজন ও পরিবর্ধন চলিয়াছিল তাহার চিহ্ন সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। মূল মন্দিরটির আসন ত্রিরথ। ত্রিরথ কথাটা ব্যাখ্যা করিয়া বলা প্রয়োজন। বর্গাকার মূল আসনের প্রত্যেক বাহুর দুই দিকে খানিকটা ছাড়িয়া দিয়া ঠিক মাঝখানে একটি উদ্গত অংশ কিছুটা আগাইয়া থাকিলে এক একটি বাহু তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। রথ বিন্যাসের এই পরিকল্পনায় সমগ্র আসনটির ধার ঘেঁষিয়া কতকগুলি বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী কোণ গড়িয়া উঠে। চতুরস্র ক্ষেত্রের এই বিস্তৃতি হইতেই ত্রিরথ পরিকল্পনার উদ্ভব, বর্তমান মন্দিরের আসন ত্রিরথ। মূল চতুষ্কোণের প্রতিটি বাহুর মাঝখানে একটি করিয়া উদ্গত অংশ, শুধুমাত্র উত্তরদিকে কিছু ব্যতিক্রম। সম্ভবতঃ এই দিকেই ছিল প্রবেশ দ্বার। আসনের বর্গাকার পাটাতনের ঠিক মাঝখানে একটি বর্গাকার কূপ। কূপটি ক্রমান্বয়ে কাটনি ছাড়িয়া ক্রমহ্রস্বায়মান আকৃতিতে নীচের দিকে নামিয়া গিয়া একটি ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রে শেষ হইয়াছে। ক্রমহ্রস্বায়মান কূপটির স্থাপত্যগত বা ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। পরবর্তীকালে দেখা যাইতেছে, মূল ত্রিরথ আসনটিকে ঘিরিয়া অনুরূপ আকৃতির একটি বৃহদায়তন আসন বিস্তৃত করা হইয়াছে। এই পর্যায়ের দেওয়ালের একটি অংশ যথাস্থানে রহিয়া গিয়াছে। এই সঙ্গেই কিংবা কিছু পরে সুরু হইয়াছে ক্রমান্বয় সংযোজন। আগেই বলিয়াছি মন্দিরটি উত্তরমুখী, ফলে সংযোজিত প্রকোষ্ঠগুলি উত্তরদিকেই বাড়িয়া চলিয়াছে, মন্দির সংস্থানটিও হইয়াছে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। পরিবর্ধিত মূল মন্দিরের সম্মুখস্থ ক্ষেত্রটির বিন্যাস অভিনব। সম্ভবত ইহা পরিবেষ্টিত কক্ষের মত কিছু ছিল। বেষ্টনী দেওয়ালের অভ্যন্তরস্থ ক্ষেত্র উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত

তিনটি ও পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত একটি ইটের প্রশস্ত রেখা দিয়া কয়েকটি অংশে বিভক্ত। পূর্ব-পশ্চিমের রেখাটি কক্ষের উত্তর প্রান্তিক দেওয়ালের সমান্তরালে গঠিত এবং মধ্যস্থিত একটি অপ্রশস্ত পাটাতনের সাহায্যে উহার সঙ্গে যুক্ত। অপর তিনটি রেখা পরিবর্ধিত মূল মন্দিরের প্রান্ত হইতে আসিয়া পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত রেখায় গিয়া শেষ হইয়াছে। গোকুলের মন্দিরের অধিষ্ঠানের মত ভিত্তি-ভাগের কোষ কক্ষ সৃষ্টি করিবার জন্য এগুলির প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; সম্ভবত গৃহে প্রবেশের সুনির্দিষ্ট পথরূপেই ইহারা ব্যবহৃত হইত। এই অভিনব কক্ষটির সম্মুখে রহিয়াছে একটি স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপের অবশেষ। দেখিয়া মনে হয়, ইহার পরেও উত্তরদিকে আরও দুই একটি কক্ষ থাকিয়া থাকিবে। মূল মন্দিরের দক্ষিণ দিকেও একটা কক্ষের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত এই মন্দির সংস্থানের উত্তর-পশ্চিমে পৃথক একটি মন্দিরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দিরদেহের নীচের দিকের একটা অংশ ছাড়া ইহার কিছুই আর রক্ষা পায় নাই। সমগ্র অংশটি কতকগুলি আনুভূমিক উদ্গত রেখা ও লম্বমান বৃথাস্তম্ভের সুপরিমিত সমাবেশে বৈচিত্র্যান্বিত। নীচের দিকে আনুভূমিক উদ্গত রেখাগুলি বৃথাস্তম্ভসমূহের উপর দিয়া বাহিয়া চলিয়াছে। সমপরিমাণ ব্যবধানে প্রতিষ্ঠিত বৃথাস্তম্ভগুলি আবার উপরের দিকে মূর্তিসজ্জার কুলুঙ্গিগুলির বন্ধনী। সৌধটির বর্তমান অংশের পরিকল্পনার লালিত্য ও গাম্ভীর্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে ইহার বৈচিত্র্যপূর্ণ নির্মাণে, সুনির্দিষ্ট পরিমাণজ্ঞানে, বর্তুলায়িত আনুভূমিক উদ্গত রেখাসমুহের ক্রমবিন্যাসে। মন্দিরটি আজ লুপ্ত কিন্তু তাহার সামান্য যেটুকু দেখা যাইতেছে তাহাতেই স্থপতির পরিণত জ্ঞান ও শিল্পসচেতনতার পরিচয় পাইতে অসুবিধা হয় না।

ইহার ঠিক উত্তর-পশ্চিমে আর একটি মন্দিরের অবস্থান নির্দেশ করা যায়। মূল মন্দিরের মত এটিও ত্রিরথ আসনযুক্ত এবং কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে বর্গাকার ক্রমহ্রস্বায়মান কূপ। আকৃতিতে অবশ্য এটি মূল মন্দির অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। দেবালয়ের খনামিহিরের ঢিবিতে খননকার্য এখনও শেষ হয় নাই। সবটুকু উন্মোচিত হইলেই দেবালয়ের মন্দিরগুলি সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ রচনা করা সম্ভব হইবে।

রাজসাহী জেলার (পূর্ব পাকিস্থান) পাহাড়পুর গ্রামে গোয়ালভিটার পাহাড়ের আবরণ উন্মোচিত করিয়া একটি বিশালায়তন বিহার ও একটি অভিনব আকৃতির মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিহারটি যে পালবংশের সম্রাট ধর্মপালের (৭৭০—৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ) পোষকতায় নির্মিত শ্রীধর্মপাল মহাবিহার সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। প্রায় বর্গাকার বিহারটির উত্তর দক্ষিণ ৯২২ ফিট ও পূর্ব পশ্চিমে ৯১৯ বিস্তৃত ক্ষেত্রের চারিদিক ঘিরিয়া ১৭৭টি কক্ষ, আর ঠিক মধ্যস্থলে রহিয়াছে সুবিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মন্দিরটি আসন ও বিন্যাসের যোগচিহ্নাকৃতি বিস্তার, বাহুগুলির মধ্যস্থিত বহুসংখ্যক বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী কোণ, স্তরে স্তরে ক্রমহ্রস্বায়মান আকৃতিতে উর্ধ্বগমন, সবটা মিলিয়া মন্দিরের প্রকৃতি ও বিন্যাস সম্পর্কে একটা জটিল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়, রাও বাহাদুর কাশীনাথ দীক্ষিত কিন্তু গঠন প্রণালী অত্যন্ত সহজভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। দীক্ষিতের নির্দেশ অনুসারে নীচ হইতে ক্রম বিয়োগ না করিয়া উপর হইতে ক্রমশ যোগ করিয়া নীচের দিকে নামিলে আপাত-জটিল পরিকল্পনাটি অনুধাবন করিতে আর অসুবিধা হয় না।

মন্দিরটির আসন বিন্যাসের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি বর্গক্ষেত্র। ক্ষেত্রটির সমগ্র ভূমির উপর শূন্যগর্ভ একটি বিশালাকায় স্তম্ভ সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। শূন্যগর্ভ বর্গাকার স্তম্ভটির দেওয়াল অতি প্রশস্ত এবং দৃঢ়। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই সমগ্র মন্দিরটি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং চার দিকের সমান্তরাল প্রসারের চাপ ও ভার অনেকটাই ইহার উপর আসিয়া পড়িতেছে। ভিত্তিস্তর ছাড়া মন্দির দেহটি বর্তমানে দুইটি স্তরে বিভক্ত। দ্বিতীয় স্তরে চতুঃসংস্থান সংস্থিত (বর্গাকার) স্তম্ভটির প্রত্যেক বাহুর ঠিক মাঝখানে অর্থাৎ দুই প্রান্তেই কিছুটা অংশ ছাড়িয়া একটি করিয়া আয়তাকার কক্ষ। আয়তাকার কক্ষের সম্মুখের অংশ মণ্ডপ আর পশ্চাতের অংশে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। কক্ষ সংযোজনের ফলে দ্বিতীয় স্তরটিই যোগচিহ্নাকৃতি হইয়া উঠিয়াছে আর মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী কোণ। আকৃতির দিক দিয়া ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি ত্রিরথ আসন। এই বিন্যাসকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া একটি প্রদক্ষিণ পথ সবটুকু ঘুরিয়া আসিয়াছে; পথটির প্রান্ত বাহিয়া একটি বেষ্টনী প্রাচীর। প্রথম স্তরে এই যোগচিহ্নাকৃতি আকারের প্রত্যেকটি বাহুর সম্মুখে আর একটি করিয়া সঙ্কীর্ণ আকারের আয়ত কক্ষ এবং তাহার সবটুকু ঘিরিয়া টানা প্রদক্ষিণ পথ ও বেষ্টনী প্রাচীর। প্রথম স্তরে পরিলক্ষিত আসনটিকে অনুকরণ করিয়া প্রশস্ত ভিত্তি অধিষ্ঠানটি গঠিত। এইবার মন্দিরের সামগ্রিক রূপটি ধরা পড়ে। চারিদিকে প্রসারিত প্রশস্ত বাহু, মধ্যে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী কোণের বিচিত্র সমাবেশ, স্তরে স্তরে উর্ধগমন সবকিছু মিলিয়া মন্দিরের বিন্যাস পরিকল্পনা, তাহার রূপলেখা। পাহাড়পুর মন্দিরের বিন্যাস ও পরিকল্পনাসম্পর্কে দীক্ষিত বলিয়াছিলেন—the plan of the Paharpur temple was the result of a premeditated development of a single central unit, in which future expansion was, in a sense, predetermined in a Vertical direction, that is in the setting up of new floors etc., but not laterally.

পাহাড়পুর মন্দিরের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের বিন্যাস দেখিয়া মনে হয় মন্দিরের বিভিন্ন অংশের আচ্ছাদনও কয়েকটি ক্রমহ্রস্বায়মান স্তরে উঠিয়াছিল, তবে আচ্ছাদনগুলির আকৃতির রূপ কি ছিল বা কেন্দ্রীয় স্তম্ভটির উপরেই বা মন্দির শীর্ষ কি ভাবে রচিত হইয়াছিল সে এখন অনুমানের বিষয়। ব্রহ্মদেশের পাগান নগরীর একাদশ-দ্বাদশ শতকের এক শ্রেণীর মন্দিরের আসন ও বিন্যাসের সহিত পাহাড়পুর-মন্দিরের একাত্মতা লক্ষ্য করিবার মত। পাগানের মন্দিরেও সমগ্র বিন্যাসের কেন্দ্রস্থল হইল একটি বর্গাকার বিরাট স্তম্ভ। স্তম্ভটি সোজা উপরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। স্তম্ভের চারিমুখে প্রত্যেকটি তলে চারিটি কুলুঙ্গি কাটিয়া প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করিয়া বুদ্ধপ্রতিমা স্থাপন করা হইয়াছে। প্রত্যেক দিকের তোরণ দ্বার হইতে তিনটি অলিন্দপথ সমান্তরালভাবে চলিয়া গিয়াছে একেবারে বিগ্রহের সম্মুখ পর্যন্ত। চারিদিকের এই অলিন্দশ্রেণী ভেদ করিয়া, কেন্দ্রীয় স্তম্ভটিকে বেষ্টন করিয়া একাধিক প্রদক্ষিণ পথ চতুর্দিক ঘুরিয়া আসিয়াছে। পাহাড়পুরের সহিত এই জাতীয় বিন্যাসের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার নয়। পাগানের এই জাতীয় মন্দিরের আচ্ছাদন কক্ষ বিন্যাসের তলবিভাগ অনুযায়ী স্তরে স্তরে ক্রমহ্রস্বায়মান আকৃতিতে উপরের দিকে উঠিয়াছে আর সর্বোপরি রহিয়াছে মূল স্তম্ভকে আচ্ছাদন করিয়া একটি বক্ররেখায় বিধৃত

শিখর, পাগানের মন্দিরসমূহের এই জাতীয় আচ্ছাদনের সহিত পূর্বভারতে প্রাপ্ত কতকগুলি বৌদ্ধ-পুঁথিতে অঙ্কিত বাংলা ও বিহারের একশ্রেণীর মন্দিরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার মত। মন্দিরগুলির আচ্ছাদন কতকগুলি উপর্যুপরি এবং ক্রমহ্রস্বায়মান স্তরে উঠিয়া গিয়াছে আর শীর্ষ রচনা করিয়াছে একটি বক্ররেখ শিখর অথবা একটি স্তূপ। পাহারপুর মন্দিরের স্তরে বিভক্ত দেহের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মনে রাখিয়া পাগান-মন্দিরের আচ্ছাদন ও পুঁথিচিত্রের প্রতিকৃতির কথা ভাবিলে অনুমান হয় পাহাড়পুরের মন্দিরটির আচ্ছাদনও ক্রমহ্রস্বায়মান স্তরে উঠিয়া গিয়াছিল এবং সর্বশেষ স্তরে উপরের কেন্দ্রীয় স্তম্ভকে আবৃত করিয়া উঠিয়াছিল একটি স্তূপ বা বক্ররেখ শিখর।

ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে পাহাড়পুর মন্দিরের তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বাংলা দেশেও এই ধরনের মন্দির খুব যে নির্মিত হইত এমন মনে হয় না। এযাবৎ আর মাত্র তিনটির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। একটি পাহাড়পুরেই, মূল মন্দিরের খুব নিকটে শ্রীধর্মপাল মহাবিহারের আঙ্গিনার মধ্যে। অপর দুইটিও পূর্বপাকিস্থান পড়িয়াছে—একটি রংপুর জেলার বিরাট গ্রামে, অপরটি ময়নামতীতে। পাহাড়পুর-রীতির মন্দিরের দৃষ্টান্ত হয় তো বিরল কিন্তু উত্তরভারতের মন্দিরকলার সহিত ইহার যে কোন সংযোগ ছিল না এমন নয়, ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের জ্ঞাত ইতিহাসে দেখা যায় চতুরস্র গর্ভগৃহ ও তাহার সম্মুখে একটি সংকীর্ণ বারান্দা ইহাই ছিল প্রথমতম পর্যায়ের আসন রচনা। ক্রমে চতুরস্র মূল অংশকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে উদ্গত অংশের সমাবেশ ঘটিয়াছে এবং এইরূপ অংশের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। পাহাড়পুরের মূল বিষয়বস্তু একটি চতুঃসংস্থান সংস্থিত স্তম্ভ। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে আয়তাকার কক্ষ ও প্রদক্ষিণ পথের বিস্তৃতি। উভয় ক্ষেত্রেই উদ্গত অংশ বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুর দুই প্রান্তে কিছুটা ছাড়িয়া মধ্যের অংশটুকু জুড়িয়া আছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই পরিণতি ঘটিয়াছে যোগচিহ্নাকৃতি আসনে, বিস্তৃত বাহু ও বিপরীতমুখী কোণসমূহের অবস্থানে উদ্ভূত রূপরেখায়, তবে এ শুধু প্রারম্ভের সূচনামাত্র। পাহাড়পুর মন্দিরের চতুর্বাহুর বিপুল বিস্তারের মধ্যে স্বকীয়তার লক্ষণ অত্যন্ত পরিস্ফুট।

ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রে সর্বতোভদ্র নামে এক প্রকার মন্দিরের উল্লেখ আছে। বর্ণনায় বলা হইয়াছে এ-ধরণের মন্দির ষোলটি কোণ বিশিষ্ট এবং চতুঃশালগৃহ অর্থাৎ বর্গাকার গর্ভগৃহের থাকিবে চরিটি প্রবেশ পথ। প্রত্যেক দ্বারের সম্মুখে একটি করিয়া অন্তরাল কক্ষ। আর সবটুকুকে ঘিরিয়া প্রদক্ষিণপথ। সর্বতোভদ্র মন্দির হইবে পঞ্চতল এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর ও চূড়ার সমাবেশে সুসজ্জিত। পাহাড়পুর-মন্দিরের গর্ভগৃহটি কোথায় ছিল সে কথা নির্দিষ্ট করিয়া বলিবারমত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু গর্ভগৃহের অবস্থান প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া যদি শুধু বিন্যাস পরিকল্পনার কথা ধরা যায় তবে মূল চতুষ্কোণের চারিদিকে কক্ষ সংস্থাপন ও সবটিকে ঘিরিয়া টানা প্রদক্ষিণ পথ এ বৈশিষ্ট্য পাহাড়পুরে বিদ্যমান। এদিক দিয়া সাদৃশ্যগুলি পরিষ্কার সন্দেহ নাই কিন্তু তবুও পাহাড়পুরকে সর্বতোভদ্র মন্দির বলিতে সঙ্কোচ থাকিয়া যায়। কারণ পাহাড়পুর মন্দির বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তাহার উপর আর কি ছিল, থাকিলে তাহার বিন্যাসই বা কিরূপ ছিল তাহা জানা নাই; আবার অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর ও চূড়া দিয়া মন্দিরটি সুসজ্জিত

ছিল কি না তাহাও নির্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই অন্ততঃ পাগানের মন্দিরসমূহ বা পুঁথিচিত্রের দৃষ্টান্তে তেমন কিছু ভাবিয়া নেওয়ার সুযোগ কম। অধিকন্তু সর্বতোভদ্র মন্দিরের যে আসন-বিন্যাসের কথা বলা আছে তাহাতে ষোলটি কোণের উদ্ভব হওয়া দুষ্কর। কিন্তু সাদৃশ্যের কথা চিন্তা করিয়া বলা যায় চতুর্দিকে দ্বারসম্পন্ন বর্গাকার গর্ভগৃহ, তাহার প্রত্যেক দিকের অন্তরাল ও টানা প্রদক্ষিণ পথ একয়টি বৈশিষ্ট্য লইয়া যে পরিকল্পনা তাহার ভাববস্তু কিছুটা পরিবর্তিত হইয়া পরিবর্ধিত ও জটিলতররূপে পাহাডপুর মন্দিরের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পাহাড়পুর মন্দিরের গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে দীক্ষিত অনুমান করিয়াছিলেন যে জৈন চতুর্মুখ মন্দির ছিল মূল অনুপ্রেরণার বিষয়। এই অনুমানের পশ্চাতে যুক্তি আছে মনে হয়। ব্রহ্মদেশের পাগানের মন্দিরগুলির অনুপ্রেরণা যে জৈন চতুর্মুখ মন্দিরের দৃষ্টান্ত হইতে আসিয়াছিল এ কথা সত্য। পাগানের মন্দিরের সহিত পাহাড়পুরের সাদৃশ্যের কথা একটু আগেই বলিয়া আসিয়াছি। উভয়ক্ষেত্রেই মন্দিরের কক্ষ ও প্রদক্ষিণ পথের বিন্যাস সুরু হইয়াছে একটি কেন্দ্রস্থিত বর্গাকার স্তম্ভকে ঘিরিয়া এবং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া, মূল সমস্যা উভয় ক্ষেত্রেই এক; পার্থক্য যাহা যাহা ঘটিয়াছে সে দেশ-কালের ব্যবধানের জন্য। পাহাড়পুর মন্দিরে গর্ভগৃহ কোথায় ছিল তাহার নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অনেকে অনুমান করিয়াছেন দ্বিতীয় স্তম্ভটির চারিদিকের দেওয়ালের সম্মুখে প্রথম চারিটি কক্ষই মন্দিরের চতুর্মুখের চারিটি গর্ভগৃহ। এ অনুমান যদি সত্য হয় তবে চতুর্মুখ জৈন মন্দিরের সহিত পাহাডপুরের মন্দিরের সমগোত্রীয়তা আরও বেশী করিয়া ধরা পড়িবে।

পাহাড়পুরের সুবিশাল মন্দিরটির অঙ্গসজ্জার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল পাথরের মূর্তি ও পোড়ামাটির ফলক। অধিষ্ঠান ও প্রথম স্তরের প্রদক্ষিণ পথের প্রসারিত দেওয়ালে সারিবদ্ধভাবে মূর্তি ও ফলক সাজাইয়া ও অলঙ্কৃত ইঁট ও বৈচিত্র্যান্বিত উদ্গত রেখা বসাইয়া অঙ্গসজ্জা রচনা করা হইয়াছে। অধিষ্ঠানের নীচের দিকের কোণগুলিতে ও মধ্যবর্তী দেওয়ালে কুলুঙ্গি কাটিয়া পাথরের মূর্তি বসান। ইহার কিছু উপরে একসারি পোডামাটির মূর্তি সমন্বিত ফলক প্রসারিত দেওয়াল বাহিয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সারিটির উপরে ও নীচে অলঙ্কৃত উদ্গত রেখার সীমারেখা। অধিষ্ঠানের সর্বোচ্চ অংশে এবং প্রথমস্তরের প্রদক্ষিণ পথের দেওয়ালে আবার দুইসারি করিয়া পোড়ামাটির মূর্তি ফলক ও তাহাদের পূর্বানুরূপ সীমারেখা।

পাহাড়পুর মন্দিরটির নির্মাণোপকরণ ইট আর গাঁথনী হইল কাদার। এই সামান্য উপকরণে সুবিশাল মন্দিরটি যে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছিল ইহাই আশ্চর্য। মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ মাত্র আমরা পাইয়াছি—চাল নাই, চূড়া নাই দেওয়ালগুলি পড়িয়াছে ভাঙ্গিয়া, এই তো তাহার অবস্থা। কিন্তু তবুও, সুবিশাল ধ্বংসাবশেষটির দিকে চাহিলে সে যুগের বাঙালীর যে পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে কল্পনার প্রসারতায় ও সেই কল্পনাকে রূপবদ্ধ করিবার শক্তির মধ্যে তাহাকে চিনিয়া নিতে হইবে। পাহাড়পুরের মন্দির প্রাচীন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিস্ময়।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

উত্তর কলিকাতার ঝামাপুকুর অঞ্চলে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে (১২২১ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ) এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে কৃষ্ণমোহনের জন্ম হয়। কৃষ্ণমোহনের পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদি বাসস্থান ছিল ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুর মহকুমার অন্তর্গত নবগ্রাম। সঙ্গতিহীন জীবনকৃষ্ণ বিবাহের পর কলিকাতায় শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন, এইস্থানেই কৃষ্ণমোহনের জন্ম হয়। কৃষ্ণমোহন পিতার মধ্যমপুত্র। একে একে জীবনকৃষ্ণের তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মিলে তাঁহাকে শ্বশুরালয়ের আশ্রয় ত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর তিনি উত্তর কলিকাতার গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। জীবনকৃষ্ণ বিশেষ লেখাপড়া জানিতেন না, এই জন্য তিনি প্রয়োজনানুযায়ী অর্থোপার্জনও করিতে পারিতেন না, তাঁহার সাধ্বী পত্নী চরকায় সুতা কাটিয়া বা দড়ি পাকাইয়া সংসারের অভাব মিটাইতে চেষ্টা করিতেন। এই পরিবেশেই ডেভিড্ হেয়ার (David Hare 1775-1842) প্রবর্তিত স্কুল সোসাইটির দ্বারা পরিচালিত আরপুলি পল্লীতে অবস্থিত একটি পাঠশালায় অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে কৃষ্ণমোহনের বিদ্যারম্ভ হয়। হেয়ার মহোদয় বালক কৃষ্ণমোহনের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়া বিনা বেতনে তাঁহার উচ্চ শিক্ষা-লাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া কৃষ্ণমোহন স্কুল সোসাইটির বৃত্তি লাভ করিয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে অবৈতনিক ছাত্ররূপে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন।

হিন্দু কলেজে পাঠকালেও কৃষ্ণমোহন সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এখানেও তিনি মাসিক ষোল টাকার বৃত্তি লাভ করেন। স্কুল ও কলেজে পাঠকালে কৃষ্ণমোহন স্বেচ্ছায় গৃহে একবেলা সকলের জন্য রন্ধন করিতেন; রন্ধনশালার কাজ হইতে অব্যাহতি পাইয়া কৃষ্ণমোহনের মাতা এই সময়টুকু সুতা কাটা বা অন্য কাজে ব্যয় করিতেন, ইহাতে সংসারের উপার্জন বাড়িত।

হিন্দু কলেজে প্রথম শ্রেণীতে পাঠকালে কৃষ্ণমোহন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ ডিরোজিওর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ডিরোজিও (Henry Louis Vivian Derozio, 1809-1831) কৃষ্ণমোহনকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। হিন্দু কলেজে কৃষ্ণমোহনের সতীর্থমণ্ডলীর মধ্যে রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতী বঙ্গ সন্তানের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হিন্দু কলেজের শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার পর সহৃদয় ডেভিড হেয়ার মহোদয় কৃষ্ণমোহনকে নিজের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে কর্ম প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁহার পিতা ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে দারিদ্র্য-জর্জরিত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে হেনরি ডিরোজিওর নেতৃত্বে বিদ্যাচর্চার জন্য তাঁহার অনুগামী ছাত্রদের সহায়তায় Academic Association নামীয় যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় কৃষ্ণমোহন ইহার একজন অগ্রগণ্য ও সক্রিয় সদস্য হন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মে মাসে কৃষ্ণমোহন Inquirer নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রবর্তন করেন। এই পত্রে হিন্দু ধর্মের দোষ

ত্রুটিগুলি আলোচিত হইত এবং শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা থাকিত। নব্য ধরণের শিক্ষার প্রভাবে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার সতীর্থ 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর আস্থা ছিল না। ইহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দু সমাজকে নানাভাবে আক্রমণ ও উত্যক্ত করিত। একদিন কৃষ্ণমোহনের কতকগুলি বন্ধু তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষাকালে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর বাড়ীতে গোমাংস, অস্থি প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া নিজেরাই ইহার প্রতি গৃহস্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গৃহস্বামীকে বিব্রত ও অপদস্থ করাই ছিল এই নব্যযুবাদের উদ্দেশ্য। কৃষ্ণমোহনের বন্ধুদের এবম্বিধ অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত পল্লীবাসীগণ কৃষ্ণমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট কৃষ্ণমোহনকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবার দাবী জানায়। পল্লীস্থ ব্যক্তিদের চাপে পড়িয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভুবনমোহন অগত্যা কৃষ্ণমোহনকে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ দেন। গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াই পল্লীস্থ ব্যক্তিদের ক্রোধ শান্ত হয় নাই, ইহাদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য হেয়ার স্কুল হইতেও তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়।

গৃহ ও সমাজচ্যুত কৃষ্ণমোহন এই সময়ে খৃষ্টধর্ম প্রচারক আলেকজাণ্ডার ডাফের প্রভাবে খৃষ্টধর্মের অনুরাগী হইয়া পড়েন। গৃহচ্যুত কৃষ্ণমোহন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ডাফ কর্তৃক খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। খৃষ্টধর্ম অবলম্বনের পর কৃষ্ণমোহন চার্চ মিশনারী সোসাইটি পরিচালিত মধ্য কলিকাতায় অবস্থিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে Archdeacan Dealtry নামক পাদ্রীর সহায়তায় কৃষ্ণমোহন বিশ্‌পস কলেজে খৃষ্টিয় ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টিয় ধর্ম-যাজক শ্রেণীভুক্ত হন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন হেদুয়া পল্লীর নবনির্মিত গীর্জার পাদ্রীর পদ লাভ করেন। বেথুন কলেজের দক্ষিণে বর্তমান বিধান সরণির উপর অবস্থিত এই গীর্জাটি এখনও কৃষ্ণ বন্দ্যোর গীর্জা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাল্যকালেই কৃষ্ণমোহনের বিবাহ হয়। কৃষ্ণমোহন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে তাহার পত্নী বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পিতা বিন্ধ্যবাসিনীকে নিজ গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যান। বিন্ধ্যবাসিনীর ইচ্ছা সত্বেও তাঁহাকে স্বামীর সহিত মিলিত হইতে দেওয়া হয় নাই। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেও কৃষ্ণমোহন তাঁহার ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা ও পত্নীর প্রতি পূর্বের মতই অনুরাগ সম্পন্ন ছিলেন। গোপনে তিনি পরিবারের সকলের সংবাদ লইতেন এবং অর্থ সাহায্য করিতেন। নিরাপরাধা সাধ্বী পত্নীর সহিত সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি শ্বশুরের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া পত্নীকে পিতৃ-কবল হইতে উদ্ধার করেন ও ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পত্নীকে স্বয়ং খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দান করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীমোহনকেও তিনি খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ বর্ষের অধিককাল ধরিয়া হেদুয়া গীর্জার পাদ্রীরূপে কার্য করার পর কৃষ্ণমোহনকে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে হাওড়া শিবপুরস্থ বিশপস্ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। এই কলেজের সাধারণ বিভাগে ইংরাজী ও দেশীয় ভাষা পড়ান হইত। অপর একটি বিভাগে শুধু খৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র পড়ান হইত। কবি মধুসূদন ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৫ বৎসর কাল এই কলেজের অধ্যাপকরূপে কার্য করার পর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই কলেজ হইতে তাঁহাকে আজীবন উত্তম পেন্সন দানের ব্যবস্থা হয়। অবসর

গ্রহণকালে কৃষ্ণমোহন এই কলেজের দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার সুবিধার জন্য অষ্টসহস্র মুদ্রা দান করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই কৃষ্ণমোহন উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কর্মজীবনেও তিনি সংস্কৃত চর্চা অব্যাহত রাখেন। বিশপস্ কলেজে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর তাঁহাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক (বোডেন অধ্যাপক) পদে নিযুক্ত করার প্রস্তাব হয়। কৃষ্ণমোহন স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। ইংরাজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত হিন্দী, ওড়িয়া, তামিল, ফার্সী, উর্দ্দু, লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষাতেও কৃষ্ণমোহনের দক্ষতা ছিল। এই সময়ে তাঁহার ন্যায় বহু ভাষাবিৎ পণ্ডিত পৃথিবীতে অতি অল্পই ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর কৃষ্ণমোহন নিজেকে একান্ত ভাবে সাহিত্য সাধনায় ও সমাজ সেবায় নিযুক্ত করেন।

সাংবাদিকতা কৃষ্ণমোহনের অতিশয় প্রিয় ছিল। প্রথম যৌবনে তাঁহার Inquirer পত্রটি চারি বৎসরের অধিককাল ধরিয়া প্রচলিত ছিল (১৭ই মে ১৮৩১—১৮ই জুন ১৮৩৫)। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি সংবাদ সুধাংশু নামে একটি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রবর্তন করেন, ইহাও প্রায় এক বৎসর জীবিত ছিল। সংবাদপত্র সম্পাদনা ব্যতীত কৃষ্ণমোহন ক্যালকাটা রিভিউ, বেঙ্গল স্পেক্টেটর প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন।

খৃষ্টধর্ম প্রচারক ও বিশ্বাসী খৃষ্টানরূপে কৃষ্ণমোহন ইংরাজী ও বাঙ্গলায় অনেকগুলি ধর্মপুস্তক রচনা করেন। এই রচনাগুলি অধুনা বিস্মৃত হইলেও ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে রচনাগুলিই কৃষ্ণমোহনকে অমরত্ব দান করিয়াছে।

ধর্মে খৃষ্টান হইলেও কৃষ্ণমোহন কোনদিন অস্বীকার করেন নাই যে তিনি ভারতবাসী এবং আর্যবংশধর। আচার আচরণেও তিনি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়ই ছিলেন।

দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা প্রচার কৃষ্ণমোহনের জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। দেশের জনসাধারণ যাহাতে নানা বিষয়ে বিশেষতঃ সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম, ইতিহাস, ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন তাহার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণমোহন 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামে ১৩ খণ্ডে একটি কোষ-গ্রন্থ প্রকাশ করেন (১)। ইহাতে প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, জীবনী, ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন মার্কণ্ডেয় পুরাণের কতকাংশ (মূল) ইংরাজী অনুবাদসহ সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইহার শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। এই পুরাণ গ্রন্থটি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত Bibliotheca Indica গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত (২)।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন হিন্দুর ষড়দর্শন ও বেদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে Dialogues on Hindu Philosophy নামে ইংরাজীতে একটি সুবৃহৎ পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন (৩)। এই পুস্তকটি সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত Dr Hull এই মন্তব্য করেন যে উহা নির্ভরযোগ্য তথ্য সমৃদ্ধ (mine of new and authentic indications)। এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ষড়দর্শন সংগ্রহ নামে প্রকাশিত হয় (৪)। বাঙ্গলা ভাষায় ষড়দর্শনের এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আর কোন পণ্ডিতের লেখনী হইতে বাহির হয় নাই। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন শ্রীনারদপঞ্চরাত্র নামক সংস্কৃত

মূলগ্রন্থ, ইংরাজী অনুবাদসহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটিও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রবর্তিত Bibliotheca Indica গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত রূপে প্রকাশিত হয় (৫)।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যসহ বেদান্তীয় ব্রহ্ম সূত্রের একাংশের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন (৬)। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম অষ্টকের কতকাংশ মূল, স্বকৃত টিকা ও ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করেন, ইহার সহিত বেদপাঠ সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছিল (৭)। এই বৎসরই আর্যশাস্ত্রের সাক্ষ্য নামে ইংরেজী ভাষায় তাঁহার একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি বৈদিক সাহিত্যের উদ্ধৃতি সহকারে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে বাইবেলে যে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাই বীজাকারে বৈদিক সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট আছে (৮)।

ছাত্রদের সুবিধার নিমিত্ত কৃষ্ণমোহন কালিদাসের কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ এবং ভট্টি রচিত কাব্যের কতকাংশ স্বকৃত টিকা ও ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৮৬৭—১৮৭৪)।

কৃষ্ণমোহন কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি ও লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে কৃষ্ণমোহন নারদপঞ্চরাত্র ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ এই গ্রন্থ দুটি সম্পাদনা করেন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সোসাইটির পত্রিকাদিতে তাঁহার যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে মহিম্নস্তবের ইংরেজী অনুবাদ, পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ প্রণালী ও নরমেধ বিষয়ক প্রবন্ধের দাম উল্লেখযোগ্য (৯—১১)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই কৃষ্ণমোহন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। বহুকাল ধরিয়া তিনি বাংলা ও সংস্কৃতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা হইতে উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষকের কার্য করেন। কোন কোন সময়ে তিনি ওড়িয়া ও হিন্দী ভাষারও পরীক্ষকের কার্য করিতেন। পাঠসূচী, পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধেও তাঁহার পরামর্শ গৃহীত হইত।

কিছুকাল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের 'ডীন' (Dean of the Faculty of Arts) পদেও বৃত ছিলেন। ১৮৬৭—৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের Fellow নির্বাচিত হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক (Honorary) ডক্টর অফ্ ল (L.L. D) উপাধিতে ভূষিত করেন, তাঁহার সঙ্গে আর যে দুইজন মনীষীকে অনুরূপভাবে সম্মানিত করা হয় তাঁহাদের নাম—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ও ইংরাজ-সংস্কৃতজ্ঞ সার মনিয়র উইলিয়মস্। এই বৎসরেরই প্রথম দিকে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কৃষ্ণমোহনকে C. I. E উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করেন।

যৌবনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনান্তকাল পর্যন্ত বাঙ্গলা দেশে সামাজিক, শিক্ষামূলক অথবা রাজনৈতিক সকল আন্দোলনেই কৃষ্ণমোহন অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৩৪-৩৫ হইতেই তিনি শিক্ষাজগতে বাঙ্গলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য জনড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের (J. E. Drinkwater Bethune, 1801-1851) নাম চিরস্মরণীয়। এই বেথুন মহোদয়ের স্মৃতি রক্ষা কল্পে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষ্ণমোহন তাহার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য

জর্জ টমসন নামক ইংরাজ বাগ্মী কর্তৃক British India Society প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষ্ণমোহন ইহার একজন সক্রিয় সদস্য হন। এই সংস্থার উত্তরাধিকারী British Indian Association প্রথম দিকে ভারতবাসীর রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করিলেও শেষদিকে রাজা, মহারাজা ও ধনিক শ্রেণীর স্বার্থেই আত্ম নিয়োগ করে। জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য নাই দেখিয়া কৃষ্ণমোহন সেই সংস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া সাংবাদিক ও জনসেবক শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত Indian League-এ যোগদান করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইনি এই সংস্থার সভাপতি মনোনীত হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে দেশনায়ক আনন্দমোহন বসু ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারক ও বাহক হিসাবে Indian Association স্থাপন করেন তখন কৃষ্ণমোহনও ইহার অন্যতম নেতা হন। কিছুকাল তিনি এই সংস্থারও সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন (১৮৭৮)। এদেশে রাজনৈতিক জাগরণের উষাকালে চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, প্রজাদের অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার প্রভৃতি বিভিন্ন দাবী উত্থাপন করিয়া যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের সহিত অবিরত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন তাঁহাদের অন্যতম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কলিকাতায় রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত জনসভাগুলিতে প্রায়শঃই কৃষ্ণমোহনকে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে দেখা যাইত। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ (১৮৫৮-১৯২৫) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Nation is Making (1925) গ্রন্থে কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন—: "He was associated with the India League and became president of Indian Association. He was then past sixty, and though growing years had deprived him of alterness of youth, yet in keenness of his interest and in vigour and outspokenness of his utterances, he exhibited the ardour of the youngest to our ranks. Never was there a man more uncompromising in what he believed to be true and hardly was there such amiability combined with such strength and fairness." (P 61)

কলিকাতার প্রভাবশালী হিন্দুসমাজ ধর্মে খৃষ্টান এবং পেশায় খৃষ্টিয় ধর্মযাজক কৃষ্ণমোহনকে যে কুণ্ঠার সহিত দূরে সরাইয়া রাখেন নাই তাহার মূলে ছিল তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম, বিচার-বুদ্ধি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, নির্ভীকতা ও অন্যায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা। প্রধানতঃ India League এর অবিশ্রান্ত আন্দোলনের ফলে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালন ব্যবস্থায় নব বিধান প্রবর্তিত হয়। জনসাধারণের ভোটে কৃষ্ণমোহন নবগঠিত মিউনিসিপ্যালিটির 'কমিশনার' নির্বাচিত হন। কমিশনার রূপে করদাতাদের বিশেষতঃ ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষায় তিনি সর্বদাই তৎপর থাকিতেন।

বিশপ কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করার পর হইতে কৃষ্ণমোহন কলিকাতাতেই বাস করিতেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে (২৯শে বৈশাখ, ১২৯২)কৃষ্ণমোহন তাঁহার ৭নং চৌরঙ্গীলেনস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। এই দেশহিতৈষী ও পণ্ডিত পুরুষের পরলোক গমনে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন। হাওড়া শিবপুরস্থ বিশপস্ কলেজ সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে

কৃষ্ণমোহনের নশ্বর দেহ সমাহিত করা হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইলে এইখানেই তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহন মৃত্যুকালে দুইটি বিবাহিত কন্যা রাখিয়া যান। কলিকাতার স্বনামধন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রকুমার তাঁহার প্রথমা কন্যার কমলার পাণিগ্রহণ করেন। ইতি ইতিপূর্বেই পরলোক গমন করেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত দ্বিতীয় কন্যা দেবকীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, মধুসূদনের চপলমতিত্ব ও সুরাসক্তি লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণমোহন এই বিবাহে সম্মতি দান করেন নাই, পরে একজন বিদেশীয় ভদ্রলোকের সহিত (Mr Stuart) দেবকীর বিবাহ হয়। কৃষ্ণমোহনের তৃতীয়া কন্যা মনোমোহিনী মিঃ হুইলার নামে একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মনোমোহিনীর পুত্র Rev. E. M. Wheeler দীর্ঘকাল যাবৎ বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, কিছুকাল তিনি কলিকাতাতেই অধ্যাপনা করেন। ইংরেজী ভাষার নিপুণ অধ্যাপকরূপে কৃষ্ণমোহন-দৌহিত্র হুইলারের নাম তাঁহার জীবিত কৃতবিদ্য ছাত্রেরা এখনও স্মরণ করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণমোহনের মৃত্যুতে সুপ্রসিদ্ধ Hindu Patriot পত্রিকায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়—

"On Monday the 11th May, there passed away from this earthly scene the spirit of one of the foremost men in Bengal, the last of a goodly band of indigenous youths, who five and fifty years ago unlocked in this country the treasures of Western Knowledge and made themselves intellectually rich...His intellect was of a high order not of the philosophical kind, but clear, luminous and practical. He was a man of great force of character and of strong individuality....As a citizen and municipal Commissioner he rendered good service to the city Corporation, and as President of the Indian Association he endeavoured to do what he thought would promote the political and social ameliarotion of his country men." (18. 5. 1885)

---

(১) বিদ্যা কল্পদ্রুম (Encylopaedia Bengalensis)

১—১৩ খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৪৬—১৮৫১.

(২) Markandeya Puraua, Bibliotheca Indica, 1851—1862.

(৩) Dialogues on the Hindu Philosophy comprising Naya, Sankhya and Vedanta to which is added a discussion on the authority of the Vedas, Calutta 1861.

(৪) ষড় দর্শন সংগ্রহ, কলিকাতা, ১৮৬৭

(৫) নারদ পঞ্চরাত্র, Bibliotheca Indica, Calcutta.

(৬) Vedanta Brahma Sutras with commentary of Sankaracharya, Calcutta 1870,

(৭) Rigveda Samhita : The first and second Adhyas of the first Astaka with notes and explanation and an introductory essay on the study of the Vedas, Calcutta. 1875

(৮) Arian Witness or the testimony of the Arian Scriptures in Corroboration of Biblical history and rudiments of Christian doctrine including dissertation on the Original home and early adventure of Indo-Arians, Calcutta 1875

(৯) RahimnaStava or hymn to Siva with Eng. Trans, J. L (8) 1839

(১০) On translation of technical terms (Proceedings of Asiatic Soc. of Bengal), 1856.

(১১) On human sacrifices of India (Ibid, 1876)

ফ্রানজ্ কাফ্কা

প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায়

উনিশ শতকের মধ্যভাগে সোরেন কিরকিগেয়ার্ড ঘোষণা করলেন : যান্ত্রিক যুগসমস্যা মানুষকে হৃতসর্বস্ব করেছে। শতাব্দীর সংস্কার আর মিথ্যাচারে তার একান্ত সহজাত বিশ্বাসটি পর্যন্ত লুপ্তপ্রায়। এর জন্যে দায়ী কে? চার্চ দায়ী। মিশনারীদের লাম্পট্যে খৃষ্টধর্মের যে লঘুকরণ হয়েছে তার মধ্যে স্বয়ং পোপ দায়ী। আর দায়ী প্রগতিশীল যান্ত্রিক সভ্যতা। এদের হাত থেকে উত্তরণ নেই। যেদিকে চাও ধূসরতা পাবে। যে পথে যাও পথ হারাবে। তর্কে পথ ছাড়ো। তার্কিক পদ্ধতি বিশ্বাসের সূচ্যগ্র ভূমিও দখলে আনে না।

কিরকি গেয়ার্ডের মত আরেকজনও নৈরাশ্যবাদের কথা বলেছিলেন। তিনি ফ্রানজ্ কাফ্কা। দুজনেই যান্ত্রিক যুগসমস্যা সংস্পর্শে সংশয়বিদ্ধ। আশাহীনতা দুজনের কণ্ঠেই ধ্বনিত। মানুষ দুজনের কাছেই হৃতসর্বস্ব। তার প্রতিটি শারীরিক কাজকর্ম থেকে রাষ্ট্রিক, সামাজিক আন্দোলন পর্যন্ত তৃতীয় শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই তৃতীয় শক্তির পরোক্ষ প্রভাব সম্পর্কে কিরকিগেয়ার্ড ও কাফ্কা দুজনেই বিশ্বাসী।

যদি বলি কাফ্কার ওপর কিরকিগেয়ার্ডের প্রভাব ছিলো, আশাকরি পাঠক অপরাধ নেবেন না। কেননা প্রভাব কথাটির যে চালু অর্থ আছে, আমি তার অতিরিক্ত কিছু বুঝি। দুটি দেশের মধ্যে বিরাট ভৌগোলিক ব্যবধান। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক পার্থক্য বড়ো কম নয়। তবু কী আশ্চর্য এক দেশের পূর্বসূরীর পদসঞ্চার অন্যদেশের উত্তরসূরীর রচনায় কেমন করে শ্রুতিগোচর হলো! কী রহস্যময় কারণে এক দেশের দার্শনিকের মননশীলতার বীজ লুকানো রইলো অন্যদেশের শিল্পীর সত্তায়, কেমন করে সেই বীজের ফসল তুললাম কবির অভিব্যক্তিতে! কিরকিগেয়ার্ডের মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বছর বাদে কাফ্কার জন্ম। একজনের জন্ম কোপেনহাগেনে। অন্যজনের জন্ম চেকোস্লোভেকিয়ায়। দু'জনের চিন্তার কী মিল, আদর্শগত ঐক্য কতখানি ভাবলে অবাক হতে হয়।

এদের জীবনে প্রায় অনেক ঘটনাই এক ধরণের। প্রথমেই ধরা যাক, পরিবেশের কথা। দুজনের জন্মই এমন একটি পরিবেশে যেখানে স্বভাবসংশয়ী হবার প্রচুর সম্ভাবনা। কিরকিগেয়ার্ডের পরিবারে পাপের বিষাক্ত হাওয়া ছিলো। পিতা মাইকেল কিরকিগেয়ার্ড গোপনে ছিলেন ব্যভিচারী আর প্রকাশ্যে পুণ্যকামী খৃষ্টান। পিতাকর্তৃক পুত্র লাঞ্ছিত হয়েছেন বিস্তর। আর কাফ্কা? যুদ্ধোত্তর পৃথিবী যখন ঘৃণা আর অবিশ্বাসে কুটিল তখন সেই দ্বন্দ্ব রেখাপাত করলো কাফ্কার মনে। অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্যে চেক্-রা ছিলো সংখ্যালঘু। আবার চেক্দের মধ্যে ইহুদীরা ছিলেন মুষ্টিমেয়। কাফ্কার জন্ম এমনি এক ইহুদী পরিবারে। দুজনের কাছেই এদের পিতার ঘৃণিত অংশ জুড়ে আছেন। কিরকিগেয়ার্ড যখন বললেন যে তিনি কৈশোরেই বার্দ্ধক্যে উপনীত তখন পরোক্ষে পিতার প্রতি একটি আভিমানিক তির্যক নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। কাফ্কা কিন্তু

আরো দুঃসাহসিক স্পষ্টবক্তা। তিনি তার পুর্বসূরীর মত পরোক্ষ জিন্দাবাদ না দিয়ে প্রকাশ্যে পিতাকে দায়ী করেছিলেন। তাঁর 'LETTER TO MY FATHER' গ্রন্থে কাফ্‌কা পিতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। বলেছেন তাঁর জায়মান সংশয় ভীতি আর আত্মবিশ্বাসের জনক স্বয়ং হেরমান কাফ্‌কা। পুত্র ফ্রানজ্‌ পিতাকে লিখলেন 'আমি যে অটুট আত্মবিশ্বাসের বিনিময়ে অসংখ্য অপরাধ সচেতনতা অর্জন করেছি তার জন্যে তুমি দায়ী।' জগতের অপর কোনও কবি, শিল্পী, অথবা দার্শনিক এর চেয়ে বেশি পিতৃনিন্দায় মুখর হয়েছেন বলে আমি জানিনে।

প্রেমের ক্ষেত্রেও দুজনের কি মিল। দুজনেই ব্যর্থ প্রেমিক। অর্জিত পূর্ণতার মুহূর্তে দুজনেই আত্মপ্রত্যাহার করেছেন। যে গভীর বিষণ্ণতা, দাম্পত্য জীবনে ক্ষমতা পালনের অক্ষমতা, সর্বোপরি যে সংশয়াবিদ্ধ মন কিরকি গেয়ার্ডকে আত্মপ্রত্যাহারে বাধ্য করেছে, সেই সমস্ত কারণই কাফ্‌কার স্নায়বিক অবসাদের জন্য দায়ী। বার্লিন বান্ধবী ফিরে যাবার পর তিনি বন্ধু ম্যাক্সব্রডকে লিখলেন "মধুযামিনীর আনন্দ তাঁকে আতঙ্কে ভাসিয়ে দিলো!'

পরে অবশ্য তিনি আবার প্রেমে পড়লেন। তবে যক্ষ্মারোগের আতঙ্ক তাঁকে সুস্থির থাকতে দেয়নি। এই সময় বিভিন্ন স্যানাটোরিয়ামে থাকাকালীন কাফ্‌কা 'দি ট্রায়াল' এবং 'দি ক্যাস্‌ল' রচনা করেন।

কাফ্‌কার রচনা দুঃস্বপ্নের ইস্তাহার। এখানে আলো আর কালো পাশাপাশি বাসা বাঁধে। পাঠক এখানে পায় দারুণ দুঃস্বপ্ন। তবু কাফ্‌কার রচনায় একটি দ্বন্দ্ব আছে। অবলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হৃতবিশ্বাস পুনরুদ্ধারের প্রয়াস আছে। যান্ত্রিক সভ্যতার ষ্টিম্‌ রোলারের নীচে পড়ে স্বাধীনতা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তবু নিশ্চিহ্নতার সামনে দাঁড়িয়ে শিল্পী হৃতবিশ্বাস পুনরুদ্ধারের সংকল্প করছে। 'দি ট্রায়ালের' কেন্দ্রে এই দ্বন্দ্ব আছে "দি ট্রায়াল" ও "দি ক্যাসলের" নায়কেরা এক অজ্ঞাত অপরাধে অপরাধী। গুপ্ত আদালতের বিচারে একজন নিহত হলো, অন্যজন হলো নিষ্ফল মনস্তাপে মজ্জমান। 'দি ক্যাস্‌ল'এর নায়কের একটি কাজ পাবার কথা ছিলো একটি রহস্যময় দুর্গে। দুর্গটি পাহাড়ের ওপর নির্মিত। শুধু তাই নয়, দুর্গটি "Veiled in mist and darkness, lying in an illussory emptiness." নায়কটি কাজ পাবার বহু চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তাঁর সর্ব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো। কেন পেলো, কোন অপরাধে পাওয়া গেলো না, সেটি উপন্যাসে অজ্ঞাত।

এখন প্রশ্ন জাগে কিসের জন্যে এই অপরাধ সচেতনতা! কিসের জন্য সংশয় আর সংকোচ? প্রশ্নটি অনিবার্য হলেও নিষ্ফল। সচেতনস্তরে এর কোনও উত্তর মেলে না। অবচেতনে আছে এই অপরাধবোধ। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারার গ্লানি এই অপরাধবোধের জনক।

কাফ্‌কার শিল্পীমনন জটিল। শিল্পীর এই অপরাধ বোধ সম্পর্কে একদল সমালোচক বললেন, কাফ্‌কার কাছে ধরিত্রী বন্ধ্যা। এখানে কোনও ফসল তোলা যায় না। প্রস্তরাকীর্ণ এর রাজপথ জনপথ। সুতরাং জীবনের প্রশ্ন অবান্তর। এখানে যা আছে তা জীবনেরই নামান্তর তাই 'দি ট্রায়ালে' তিনি বললেন "Lie low never draw attention to yourself. Accept the prevailing condition." স্বাধীনতা চাইতে গেলে আর আশ্রয় মেলে না। তাই সমালোচকরা কাফ্‌কার শিল্পীমননে একটি বিশাল নিরাশ্রয়তা খুঁজে পেয়েছেন। নিরাশ্রয়তা আর নিঃসঙ্গতা

দুই তার রচনায় পাওয়া যায়।

"দি ট্রায়াল" ও ও "দি ক্যাসলের" মধ্যে সামাজিক আইন কানুন ও স্বর্গীয় বিধানের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের রূপক খুঁজে পাওয়া যায়। এই দ্বন্দ্বের ফলাফল নেতিবাচক। কাফ্কা তাঁর নোটবুকে লিখেছেন "I have absorbed all that is negetive in my own time...No share of the positive values of the age has been passed on to me." শিল্পীর নেতিবাচক মনোভঙ্গী বারবার নৈরাশ্যবাদের জায়মান বৃত্তে প্রবেশ করেছে। "মেটামরফোসিস" গল্পটি এই নৈরাশ্যবাদের চূড়ান্ত উদাহরণ। শিল্পী যেন বারবার বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে 'prevailing condition' কে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয়তার মধ্যে স্বাধীনতা কখনো সফল স্বপ্ন হতে পারে না। কিরকি গেয়ার্ড যেখানে খৃষ্টধর্মকে পুনর্জন্মকে অবলম্বন করে উদ্ধার পেলেন; সেখানে কাফ্কা আশ্রয় পাননি। এইখানেই দুজনের পার্থক্য। তাই কাফ্কা সহজেই উচ্চারণ করতে পারলেন "I am cithor and endor a begining."

এই হলো কাফ্কার শিল্পমনন। এর সঙ্গে টি. এস্. এলিয়টের মননের আদল আসে। কাফ্কার রচনায় উদ্ধার পাবার যে আকুলতা আছে তা যেন ডষ্টয়েভস্কির দগ্ধ নায়কদের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে যে হতাশ্বাস আছে তা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রশ্বাস ছাড়া কিছু নয়। কাফ্কাতে যা পেয়েছি, সমস্ত মহান। তাঁর বেদনা মহান, স্বপ্ন মহান। তাঁর নিঃসঙ্গতা বিশাল, নিরাশ্রয়তা বিশাল। তাই ওঅলডো ফ্রাংক বললেন, "When the history of novel of the past one hundred years is written, Kafka will be accepted as equal of Dostoevsky.

দ্বারকানাথের পরিবার

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

স্ত্রী ভাগ্যে ধন কথাটা মেনে নিলে দ্বারকানাথের বিপুল ঐশ্বর্যের জন্য তাঁর স্ত্রী দিগম্বরী দেবীর প্রশংসা অন্যায় নয়। অর্থভাগ্যের জন্য মেয়েদের অনেকেই তাঁকে বলতেন লক্ষ্মীর অবতার। তা' ছাড়া যখন শোনা গেল নরেন্দ্রপুরের মত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম—বছর দশেক ধরে যার সর্ববিধ উন্নতি হচ্ছিল—উনি ছেড়ে চলে আসার পর নানাকারণে ক্রমশঃ হতশ্রী হয়ে পড়ল, তখন আর সন্দেহই রইল না।

অর্থ ভাগ্যের জন্য তাকে বলা হ'ত লক্ষ্মী আর রূপে জগদ্ধাত্রী। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরাই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন—'তাঁর রূপের কি বর্ণনা করব? তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী।' সেই থেকেই প্রবাদ চালু হয় যে, ঠাকুরবাড়ীতে সেকালে যে জগদ্ধাত্রী মূর্তি গড়া হত তার মুখ নাকি হত দিগম্বরীদেবীর আদর্শে।

বিয়ের সময় তাঁর বয়স মাত্র নয়। যশোরের নরেন্দ্রপুর গ্রামের পিরালি রায় বংশের মেয়ে—বাপের নাম রামতনু রায়, মা আনন্দময়ী।

সেকালে বড়লোকের বাড়ীর ছেলের উপযুক্ত মেয়ে খুঁজে বার করবার ভার পড়ত সাধারণতঃ নায়েব গোমস্তাদের ওপর। তারা বংশের খোঁজ নিয়ে বাপের পয়সার ও মা দিদিমার রূপ সুনামের বিচার করে, মেয়ের গুণাগুণ বর্ণনা দিয়ে কর্তার কাছে জানাতেন। দ্বারকানাথের বাপ ছিলেন না, বড় ভাই রাধানাথই সব ব্যবস্থা করেন।

মেয়ের চেহারা সুশ্রী, চুল ঘন ও কোঁকড়ানো, রং দুধে আলতার মত, ত্বক মোমের মত স্বচ্ছ; হাতের আঙুলগুলি চাঁপার কলি; পা দুটি যেন প্রতিমার—এক কথায় খুব সুলক্ষণা। এই দেখে বেশ ধুমধামের সঙ্গে দ্বারকানাথের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হল। দ্বারকানাথের বয়স তখন সতেরো—শর্বোর্ণ সাহেবের (১) ইস্কুলে পড়া শেষ করেছেন।

বিয়ের পর দিগম্বরী দেবী এলেন নীলমণি ঠাকুরের একান্নবর্তী পরিবারে। সেখানেই হল তাঁর প্রকৃত শিক্ষা—শাশুড়ী অলকাসুন্দরী দেবীর হাতে, পরম বৈষ্ণব ভাবে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরগোষ্ঠী তখন খড়দহের গোস্বামীদের শিষ্য—এত গোঁড়া যে পাথুরিয়াঘাটার শাক্ত ঠাকুরগোষ্ঠী এঁদের উপহাস করে বলতেন, 'মেছোবাজারের গোঁড়া'। তখনো এ বাড়ীতে রামমোহন রায়ের প্রভাব পড়ে নি, বিলাতী হাওয়াও লাগে নি।

ধর্মে অলোকাসুন্দরী দেবীর অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ এঁদের সম্বন্ধেই বলেছেন, 'তাঁহার শরীর যেমন সুন্দর ছিল, কার্যেতে তেমনি তাঁহার পটুতা ছিল এবং ধর্মেতেও তাঁহার তেমনি আস্থা ছিল। তাঁহার ধর্মের অন্ধ বিশ্বাসের সহিত একটু স্বাধীনতাও ছিল।' এই ধর্মবিশ্বাস ও কার্যপটুতা তিনি তাঁর পুত্রবধূর মধ্যেও জাগাতে পেরেছিলেন।

পরে যখন তিনি গৃহের কর্ত্রী তখনও প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠে দিগম্বরী দেবী স্নান ইত্যাদি সেরে নীলাম্বরী শাড়ী পরে হরিনাম করতে বসতেন। তাঁর একটি লক্ষ হরিনামের মালা

ছিল তার অর্ধেক অংশ সকালে জপ করে দুধ ও ফল খেতেন। তারপর সংসারের তদারক সেরে দুপুরবেলায় রামপঞ্চধ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করতেন। বিকেলে মুখহাত ধুয়ে হরিনামের মালার বাকিটা জপ করে তারপর সংসারের তদারক করতেন। সন্ধ্যেবেলা প্রায়ই দয়া-বৈষ্ণবী এসে তাঁর ঘরে গ্রন্থ পাঠ করত। একাদশী ছাড়া অন্যদিন রাত্রে তিনি অন্নাহার করতেন। তাঁর পুজোর ফুল তোলা, ব্যবস্থা করা ও রান্নার ভার ছিল পরাণ ঠাকুরের ওপর। একাদশীর দিন তিনি ফল খেয়ে থাকতেন—শুধু পার্শ্ব, ভীম, শয়ন আর উত্থান এই চারটি একাদশীতে তিনি করতেন নিরম্বু উপবাস। এ নিয়ে অনেকে বলেছেন, বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, স্বামী বর্তমানে একাদশী করা অমঙ্গল। তিনি রীতিমত যুক্তি তর্ক দিয়ে, শাস্ত্রের অনুশাসন দেখিয়ে তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন যে, সে ধারণা ভুল।

এ হেন বাড়ীতে রামমোহন রায় ঘন ঘন আনাগোনা করতে লাগলেন এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রমশঃ দুই ভাই দ্বারকানাথ ও রমানাথ হলেন মাংসাহারী। রমানাথ ঠাকুরের স্ত্রীর কথায় জানা যায়, প্রথমবার মাংস মুখে দিয়ে দুই ভাইই বমি করে ফেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর বার বার চেষ্টা করে যখন প্রাথমিক ঘৃণা কেটে গেল, তখন বাড়ীর বাইরে একপ্রান্তে মাংস রাঁধার ব্যবস্থা হল। মাটির পাত্রে রান্না হত এবং তারপর ঐ পাত্র এলাকার বাইরে ফেলে দেওয়া হত। পরে যখন ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল তখন প্রকাশ্যেই তাঁরা তাঁদের সঙ্গে খেতে লাগলেন। আগে রামানন্দ ও আনন্দঠাকুর নামে দুই পাচক তাঁর খাবার তৈরী করত। এবার বহাল হল—রামমোহনের পছন্দমত মুসলমান বাবুর্চি। রামমোহনের কথা অনুযায়ী তিনি মদ্যপানেও পিছপা হলেন না—তবে খুব কম পরিমাণে। শোনা যায় খাবার সময় শুধু ছোট্ট একটি গ্লাসে কিছু sherry খেতেন। খাওয়াটা তাঁর মদ খাওয়ার আনন্দের জন্য নয়। শুধু পুরানো কুসংস্কার ভাঙার যে তখন একটা হুজুক উঠেছিল তারই অঙ্গ হিসাবে বোধ হয়। কারণ পরে তিনি মদ্যপ হয়ে পড়েননি, বরং যতদূর জানা যায় মদ শেষের দিকে সম্পূর্ণ ত্যাগই করেছিলেন।

বাড়ীর বাইরের মহলের এই সংস্কার ভাঙার হাওয়া কিন্তু অন্দর মহল পর্যন্ত পৌছল না। সেখানে কর্ত্রী এগুলোকে 'অনাচার' মনে করতেন। এসব আবহাওয়া থেকে দূরে থাকতে আকুতি মিনতি করতেন। একবার তিনি তিনদিন জলস্পর্শ না করে 'হত্যা' দিলেন—তবু কোন ফল হলো না। দ্বারকানাথ তখন দেশী বিদেশীর মিলন সাধনে উঠে পড়ে লেগেছেন। হিন্দুসমাজ যতই তাঁকে জাতিচ্যুত করবার ভয় দেখায়,—আত্মীয়গোষ্ঠী আকারে ইঙ্গিতে একঘরে করবার চেষ্টা করে, দ্বারকানাথ ততই আরও জেদের সঙ্গে মেলামেশা, আহার বিহার করতে থাকলেন।

বিপদ হল দিগম্বরী দেবীর। ধর্ম ও স্বামী—এই দুয়ের জন্যই নারী জীবন—এই সনাতন শিক্ষাই তিনি পেয়েছিলেন। এখন এই দুই অবলম্বন পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠায় এক বিরাট সমস্যা দেখা দিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও এর কোন নিষ্পত্তি দিয়ে সাহায্য করলেন না। তাঁরা ভেবেচিন্তে বিধান দিলেন যে, ম্লেচ্ছসংসর্গ দুষ্ট স্বামীর স্পর্শও অশুচিকর, তথাপি স্বামীকে সর্বাবস্থায় ভক্তি ও সেবা কর্তব্য।

তখন তিনি দুদিক বজায় রাখবার মত একটি রফা করলেন। সেটি তাঁর মনে শান্তি এনেছিল কিনা জানা নেই, তবে শরীরের পক্ষে যে খুবই অশুভ হয়েছিল তা' পরিষ্কার। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বামীকে প্রণাম করে সংসারের কাজে হাত দিতেন। এখনও তিনি প্রণাম করতেন, কিন্তু তারপরেই স্নান করে আবার শুদ্ধ হতেন।

দ্বারকানাথকে বলে কোন অভাব অভিযোগের ব্যবস্থা করবার জন্য আত্মীয় পরিচিতদের অনেকে এসে তাঁকে ধরতেন। তিনি কাউকেই বিমুখ করতেন না—নিজে দ্বারকানাথকে গিয়ে বলতেন। এছাড়াও সাংসারিক কাজকর্মের জন্য তাঁকে দৈনিক বহুবার দ্বারকানাথের সংস্পর্শে আসতে হত এবং দিবারাত্রি নির্বিশেষে প্রত্যেকবার সাত ঘড়া গঙ্গাজলে স্নান করে ম্লেচ্ছ সংসর্গঘটিত অশুচিতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতেন। এরূপ অত্যাচার তাঁর শরীরে বেশীদিন সইল না। জরবিকারে জীবনসংশয় দেখা দিল।

১৮৩৫ সালে দ্বারকানাথের মায়ের শেষ সময়ে তাঁকে গঙ্গাযাত্রা করানো হয়েছিল। দ্বারকানাথ তখন উপস্থিত ছিলেন না, পশ্চিমে গিয়েছিলেন। এবার দ্বারকানাথ উপস্থিত—গঙ্গাযাত্রার কথা কেউই সাহস করে বলতে পারলেন না, তার বদলে শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত এলো বড় বড় ইংরেজ ডাক্তাররা। কিন্তু কিছুতেই বাঁচান গেল না দিগম্বরী দেবীকে।

মৃত্যুর পর সেই মাঝারী লম্বা দোহারা চেহারা যেন রোগের সব ক্লেদ কাটিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাঁর পা দুটি থেকে যেন জ্যোতি বেরোতে লাগল। শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় তাই দেখতেও পথের ধারে লোক থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কাঙ্গালীরা ভীড় করে শবদেহের সঙ্গে ছুটল—দু'হাতে টাকা ছড়ানো হচ্ছিল তাই কুড়োতে। আত্মীয় স্বজনরা চোখ মুছলেন এই ভেবে যে, দ্বারকানাথের পাশ্চাত্যমুখী হবার শেষ বাধাটুকুও আর রইল না।

দিগম্বরী দেবীর ধর্ম্ম ও আচার নিয়ে শেষজীবনে মনোমালিন্য এবং কতটা সেই হেতুই তাঁর মৃত্যু দ্বারকানাথের মনে বড় আঘাত দেয়। প্রগতির পথ ধরায় পুরাতন বন্ধু-স্বজন-গোষ্ঠীর অধিকাংশই তাঁর সংসর্গ অনেকটা পরিহার করে চলতেন। নিজেদের আর্থিক বা অন্যবিধ দরকার ছাড়া দ্বারকানাথের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। পরিবারের মধ্যে যাঁরা তাঁর নিকটতম ছিলেন তাঁদের মধ্যে মা, স্ত্রী ও পুত্র (২) হারিয়ে তিনি সংসার সম্বন্ধে ক্রমশঃ উদাসীন হয়ে উঠলেন। অন্দরমহলে আসা ত' প্রায় উঠেই গেল। বৈঠকখানা বাড়ীতেও বিশেষ থাকতেন না—বেশীরভাগ সময় কাটতো বেলগাছিয়ার বাগানে। সেখানেও শান্তি পেলেন না, তাই সব স্মৃতি ও অশান্তি থেকে দূরে যাবার জন্যে বিলেতে যাওয়ার সঙ্কল্প করলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেবেন্দ্রনাথ যখন পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করবেন বলে ধর্মসংগ্রামে নামেন, যখন 'চিন্তাতে শোচনাতে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না।' তখন তিনি এই তেজস্বিনী ও লৌকিক ধর্মে দৃঢ় নিষ্ঠাবতী জননীকেই স্বপ্নে দেখেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বর্ণনা দিয়েছেন—'আমি সেই নিস্তব্ধ গৃহে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি; খানিক পরে দেখি যে, সেই ঘরের সম্মুখের একটি দরজার পর্দা খুলিয়া উপস্থিত হইলেন আমার মা। মৃত্যুর দিবস তাঁহার যেমন চুল এলানো দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ তাঁহার চুল এলানোই রহিয়াছে। আমি ত' তাঁর মৃত্যুর সময় মনে করিতে

পারি নাই যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অন্তেষ্টিক্রিয়ার পর যখন শ্মশান হইতে ফিরিয়া আইলাম, তখনো মনে করিতে পারি নাই যে তিনি মরিয়াছেন; আমার নিশ্চয় যে তিনি বাঁচিয়াই আছেন। এখন দেখিলাম, আমার সেই জীবন্ত মা আমার সম্মুখে। তিনি বলিলেন, 'তোকে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল, তাই তোকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তুই না ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিস? কুলং পবিত্র জননী কৃতার্থা!' তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার এই মিষ্টি কথা শুনিয়া, আনন্দপ্রবাহে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি যে আমি সেই বিছানাতেই ছটফট করিতেছি।

দেবেন্দ্রনাথের যখন জন্ম হয়, তখন দিগম্বরী দেবীর বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। তারপর তাঁর আরও চারপুত্র জন্মে—গিরীন্দ্র, ভূপেন্দ্র, নরেন্দ্র ও নগেন্দ্র। তন্মধ্যে নরেন্দ্র খুব অল্প বয়সে ও ভূপেন্দ্র বৎসর তের বয়সে মারা যায়।

'বৃহৎ পরিবারে শিশুরা একটু বড় হইলে প্রায়ই সংসার কার্য হইতে অবসরপ্রাপ্তা পিতামহীর কাছে প্রতিপালিত হয়। তাই আত্মজীবনীতে পিতামহীর উল্লেখ অধিক;' জননী বা পিতার উল্লেখ অত্যল্প।

পিতার সহিত দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধ বিষয়ে অজিত চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন, 'শুনিয়াছি যে দেবেন্দ্রনাথ কোনদিন তাঁর পিতার সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন না, একদিন শুধু বলিয়াছিলেন যে—পিতা ইংলণ্ডে থাকিতে তাঁর হাতখরচের জন্য মাসিক লাখ টাকা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইতে হইত সুতরাং লোকে যে তাঁকে 'প্রিন্স' বলিয়া ডাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?'

ছেলেবেলায় দেবেন্দ্রনাথ যে তাঁহার পিতার সঙ্গ খুব বেশি পাইতেন, তাহা মনে হয় না। তাহার সাতাত্তর বছর বয়সে তিনি স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে একদিন গল্প করিয়াছিলেন যে, ছেলেবেলায় ইস্কুল হইতে আসিয়া বাবার বৈঠকখানার চারিদিকে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বৈঠকখানায় ঢুকিতে ইচ্ছা হয়, অথচ সাহস হয় না। একদিন তাঁহার পিতা বলিলেন 'তুই ছুটে ছুটে বেড়াস কেন, বৈঠকখানার ভিতরে বসতে পারিস না।'' তবু তাঁহার ভরসা হয় না। তারপরে একসময় হঠাৎ গিয়ে দেখেন যে ভিতরে বেশ ফুলের তোড়া, বৈঠকখানাটি নানা সুন্দর জিনিষ দিয়া সাজানো। তখন হইতে বৈঠকখানায় বসিবার অধিকার হইল। সেখানে বসিয়া অভিধান দেখিয়া তিনি পড়া শিখিতে লাগিলেন।' এই সব থেকে ধারণা করা স্বাভাবিক যে, পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল না। পিতাপুত্রে ঘনিষ্ঠতা থাকাও সেকালের সাধারণ রীতি ছিল না। সেকালের হিসাবে দ্বারকানাথ অত্যন্ত পুত্রবৎসল পিতা ছিলেন। "কার্যবাহুল্য সত্ত্বেও তিনি শিশু দেবেন্দ্রনাথের প্রতি যৎপরোনাস্তি যত্ন ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন। দেবেন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চার জন্য এবং শরীরে স্বাস্থ্য ও আরামের জন্য দ্বারকানাথের ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল না। নিজেই দ্বারকানাথ এ সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন।"

এর পরে দ্বারকানাথ যখন কার ঠাকুর কোম্পানী খোলেন ত'ন স্বভাবতঃই আশা করেছিলেন যে অন্ততঃ জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঐ বিষয়সম্পদ দেখাশুনায় সাহায্য করবে। কিন্তু দ্বারকানাথের সে আশা পূর্ণ হল না। পিতার ঐশ্বর্য্যের প্রথম আস্বাদ পেয়ে দেবেন্দ্র কিছুকাল বিলাস আমোদে মগ্ন

হলেন। "সুরা, নাচ ও ধনীপুত্রদের কুসঙ্গ" কিছুকাল তাঁকে অধিকার করল। দ্বারকানাথ ব্যাপার দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বারবার ভর্ৎসনা ও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন কিন্তু পুত্রের অর্থব্যয়ের অধিকার সঙ্কুচিত করলেন না। অবশেষে দেবেন্দ্রকে কোন কাজে ব্যস্ত রাখলে তাঁর মতিগতি ফিরতে পারে এই ভেবে তাঁকে Union Bank-এর সহকারী কোষাধ্যক্ষ করে দিলেন এবং পরবৎসর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাবার সময় দেবেন্দ্রনাথের ওপর সংসারের কর্তৃত্বভার দিয়ে গেলেন। এতেও বিশেষ কোন সুফল লাভ করা গেল না।

যখন দ্বারকানাথের সম্পদসূর্য্য মধ্যাহ্নগগনে আরূঢ় (১৮৪০), যখন দ্বারকানাথ কলিকাতার সর্বপ্রধান দাতা, সর্বজন অন্বেষিত পরামর্শদাতা ও ভদ্রসমাজের প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি, যখন কলিকাতার সমুদয় দেশীয় ও য়ুরোপীয় সমাজ দ্বারকানাথের ঐশ্বর্যে ও বদান্যতায় মুগ্ধ, তাঁহার স্তুতিগানে মুখরিত ও তাঁহার প্রসাদ কণা লাভের জন্য লালায়িত, সেই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ পিতার ঐশ্বর্য্যে, পিতৃভবনের ও পিতার উদ্যানের বিলাসের আয়োজন ও লোকসমারোহে অস্থির হয়ে উঠছিলেন। আর ঐ সময়েই (১৮৩১) তত্ত্ববোধিনী সভার উৎসবে রাত দু'টা পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ মহা ধুমধাম করলেন। দ্বারকানাথ তাঁর বিপুল বিষয়-সম্পত্তি পরিচালনের কঠিন কাজে পুত্রের সম্পূর্ণ অসহযোগিতা ও অমনোযোগে রুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এ রাগের কারণ দেবেন্দ্রনাথের ধর্মভাব বা বিলাসবিমুখতা নহে; বিষয় দেখা শোনায় দেবেন্দ্রনাথের অমনোযোগ। এই সময় পিতাপুত্রে কিছুটা মনের বিচ্ছেদ ঘটেছিল সন্দেহ নেই।

দেবেন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন যে "তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না।" তাই বোধ হয় প্রথমবার বিলাত যাবার আগে দ্বারকানাথ deed of settlement করে নিজের সম্পত্তির ওপর কয়েকজন ট্রাষ্টি নিযুক্ত করে তা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা নিয়ে মত্ত। ১৮৪২ সালের আগষ্ট মাসে যখন দ্বারকানাথ প্রথমবার বিলাত থেকে ফিরে উইল করলেন, তখনও দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ও পত্রিকা নিয়ে মত্ত ছিলেন। পত্রিকা সেই মাসেই বের হল। এই সময়েই দ্বারকানাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ওপর একদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন যে "আমি ত বিদ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এখন দেখি যে, তিনি দেবেন্দ্রের কানে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া (তাহাকে) খারাপ করিতেছেন। একে তার বিষয়বুদ্ধি অল্প—এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর বিষয়কর্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না।" দ্বারকানাথ শেষবার বিলাতে থাকার কালে বিষয়কর্মে যেটুকু মন দিতে হয়েছিল. তাই দেবেন্দ্রনাথের অপ্রীতিকর বোধ হয়েছিল। বিষয়ে অমনোযোগ হেতু দেবেন্দ্রনাথকে ভর্ৎসনা করিয়া দ্বারকানাথ মৃত্যুর দুমাস আগেও চিঠি লেখেন। (৩)

"এই মাত্র তোমার ৮ই এপ্রিলের চিঠি পাইলাম। সাহস তালুক বিক্রয় সম্বন্ধে রাজা বরদাকান্ত ও তোমার নিজের মোক্তারদের গাফিলতির পরিচয় পাইয়া বিশেষ বিরক্ত হইয়াছি। রাজা বরদাকান্তের কথা ছাড়িয়া দিলাম, তিনি নিজের সম্পত্তি সম্বন্ধে তিলার্দ্ধ কেয়ার করেন না, কিন্তু তোমার লোকেদের খবরদারি করিতে এ রকম লজ্জাকর গাফিলতি আশ্চর্যের বিষয়। গর্ডন সাহেব তোমার আমলাদের সম্বন্ধে যা লিখেছেন এবং অন্যান্য সূত্রে যা শুনেছিলাম এখন প্রত্যয় হয় তার

সবই সত্যি। তোমার হাতে যে সব জরুরী কাজের ভার আছে, সে সমস্ত নিজে দেখাশুনা না করে আমলাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছ। সম্পত্তি রক্ষার বদলে খবরের কাগজে লেখালেখি আর মিশনারীদের সঙ্গে ঝগড়া করতেই তোমার সমুদয় সময় ব্যয় হয়। দেশের জলবায়ু সহ্য করবার মত সুস্থ থাকলে আমি নিজে দেখাশুনা করবার জন্য এই মুহূর্তে লণ্ডন থেকে রওনা দিতাম। কিন্তু সেই উপায় নেই। * * *

কিছু ঠিক মত চলছে বলে শুনি না। প্রত্যেকটি মকদ্দমায় আমাদের হার হচ্ছে। হুরবাসিনী ও রামেশ্বরপুরের অবস্থা ইতিমধ্যে জটিল হয়েছে, বাকীগুলির দেরী নাই। কাল সকালে ডাক যাবে বলে সব বিষয়ে ধীরে সুস্থে লেখা সম্ভব হল না।"

দেবেন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন—"আমি কোন কাজকর্ম ভাল করিয়া দেখিয়া উঠিতে পারিতাম না। কর্মচারীরাই সকল কাজ চালাইত, আমি কেবল বেদ বেদান্ত, ধর্ম ও ঈশ্বর ও চরম গতিরই অনুসন্ধানে থাকিতাম। বাড়ীতে যে একটু স্থির হইয়া বসিয়া থাকি, তাহাও পারিয়া উঠিতাম না। এত কর্ম কাজের প্রতিঘাতেতে আমার উদাসভাব আরও গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। এত ঐশ্বর্য্যের প্রভু হইয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা করিত না। সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া একা একা বেড়াইবার ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল।" তিনি কিছুকালের জন্য ঘোর বর্ষাতেই গঙ্গাতে নৌকায় বেড়াতে বেরুলেন। এই যাত্রার মধ্যেই ঝড় বৃষ্টির ভেতর তিনি পিতার মৃত্যুসংবাদ পান।

তাই বলে দ্বারকানাথের সঙ্গে ছেলের চরিত্রের কোন মিল নেই ভাবলে ভুল হবে। "দ্বারকানাথের কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সদাশয়তা ও দানে মুক্তহস্ততা তাঁর ক্ষুদ্রচিত্ততায় ঘৃণা ও জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহ, তাঁহার আত্মমর্য্যাদাবোধ সর্ব্বোপরি ধর্মকর্মে তাঁহার দৃঢ়নিষ্ঠা আমারা দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রেও দেখিতে পাই।"

---

(১) শবোর্ণ সাহেবের স্কুল ছিল বর্তমান আদি ব্রহ্মসমাজের বাড়ি আর তার পাশের বাড়ি (ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি)-তে। সে সময়কার গণ্যমান্য লোকদের শিক্ষা সুরু হ'ত ঐখানেই।

শবোর্ণ সাহেবের মা ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন বলে তাঁর খুবই গর্ব ছিল আর সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত সিধে আদায় করতেন।

দ্বারকানাথ তাঁকে খুব ভক্তি করতেন। গুরুর জন্য আজীবন বৃত্তির ব্যবস্থা করেন তিনি।

(২) A melancholy event has occured in the family of Dwarkanath Tagore, which has plunged him into the deepest affliction. His son, a promising lad about 13 years of age, died on the 12th instant last, and on following day the unfortunate father was doomed to still deeper suffering,—he was deprived of his wife—Monthly news. (Oriental Herald, Vol 3, No XVII.)

22 May

(৩) My dear Debender,

I have this moment received your letter of the 8th April and quite vexed with the negligence shown both on the part of Raja Raradakant and your own Mooktears about the sale of the Talooks Shahoosh. As for the formor he does not care a pice about his own affairs—but how your servants can shamefully neglect to report these matters is surprising to me. All that I have hitherto heard from other quarters, as well as what Mr. Gordon has written me about your Amlas now convinces me of the truth of their reports. It is only a source (of) wonder to me that all my estates are not mined ? Your time I am sure being more taken up in writing for the newspapers & in fighting with the missionaries than in watching over & protecting the important matters which you leave in the hands of your favourite Amlas—insted of attending to yourself most vigilently. If I was strong enough to bear the heat & climate of India, I should immediately leave London personally to superintend—as it is—my only alternative will be to write & authorize the House to get rid of the mortgaged properties & to dispose of as many of the Mofussil estates as they can as soon as possible.
I bear of nothing going right. We are losing every Law suit. Doorbasinee and Ramisserpore in confusion and others quickly becoming so. The mail tomorrow morning prevents my further writing on other matters quietly and at leisure. Tell Deby Roy, Greender & Ramchander that I have received their letters & postponod answering until the next mail, also Asutosh Dey.

I hope Gordon has been able to arrange about Rani Kattawaney's before this letter reaches. Also tell Deby Roy that if he could get a purchaser of Doorbassinee I shall have no objection to sell but not under Rs. 2,50,000—say two lacs fifty thousand Rupees. It is fully worth that sum to anyone who would properly manage it and yeild him 30 to 40,000 profit. The purchaser can easily get it sold through the collector's sale which would enable him to break off all the tenures on the estatas. To us the collector's sale and our purchase will always an appearance of a Benamee transaction. * * I see Mr. Elliot has left the Chowringhee House. Do try to sell, it always being difficult to get a tenant.

If the estate Shahoos and Mulloy have not yet been put into the charge of Mr, Mackinzie do so without a moment's delay, With my best regards to all at home.

Believe me
Yours affectionately

বি দে শী সা হি ত্য

বিপুল সুদূরে আজকের মানুষ পাড়ি জমাচ্ছে। জয় করছে দুর্গমকে। অজানা তথ্যকে আবিষ্কার করছে। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ কোথাও আর বাকি নেই—সর্বত্রই আজ মানুষের সহজ অধিকার। অবশ্য বিজ্ঞান আজ মানুষকে এই আশ্চর্য বিজয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিয়েছে।

পৃথিবীর নানা বিস্ময়কে মানুষ আজ জয় করেছে, করতে চলেছে। এই ব্যাপারে মানুষ আজ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ব্যাপকতর অভিযানে রত। চিরবরফের দেশ দক্ষিণমেরু ও উত্তরমেরু এমনই মহাবিস্ময়কর দুই বিপরীত বৃত্ত যে যুগে যুগে দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। সম্প্রতিকালে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে নানা অভিযান সংগঠিত হয়েছে এবং যার আলোকে উৎসাহী মানবজগৎ জানতে পেরেছে নতুনতর তথ্য, উদ্ঘাটিত হয়েছে নানা অজানা রহস্য। এ রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাহিনী যেমন আশ্চর্য তেমনি পরিমাপহীন রোমাঞ্চকর।

দক্ষিণমেরু আবিষ্কার সম্বন্ধে জর্জ জে ডুফেক লিখিত 'Through the Frozen Frontier' গ্রন্থটি অভিযানমূলক। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বৎসর (১৯৫৭-৫৮) উপলক্ষে বিশ্ববিজ্ঞানীদের মিলিত প্রচেষ্টায় চিরবরফের রাজ্য দক্ষিণমেরুতে যে অভিযান হয় তার কাহিনী এই গ্রন্থটি।

দক্ষিণমেরুর রহস্য উন্মোচনের জন্য বারোটি দেশের বৈজ্ঞানিকগণ মোট ছাপ্পান্নটি ঘাঁটিতে আঠারো মাসের এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে স্যর এডমণ্ড হিলারী, স্যর ভিভিয়ান ফুচ্‌, কার্ল একলুণ্ড প্রমুখ বিশিষ্ট অভিযাত্রী ও বিজ্ঞানীও ছিলেন। বর্তমান গ্রন্থটিতে উপরোক্ত অভিযানের সুন্দর বিবরণী লিপিবদ্ধ এবং চিরবরফের দেশ দক্ষিণমেরুর অনাবিষ্কৃত নানা তথ্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থের 'অপারেশন ডিপ ফ্রিজ' : পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি (১৯৫০-১৯৫৬), অপারেশন ডীপ ফ্রিজ : ২ (১৯৫৬-১৯৫৬) এবং অপারেশন ডীপ ফ্রিজ : ৩ (১৯৫৭-১৯৫৮) পর্যায়ের অভিযানসমূহ যুগপৎ বিস্ময় ও রোমাঞ্চের আস্বাদ বহন করে। 'Through the Frozen Frontier' গ্রন্থে অভিযানের দুঃসাহসিক পদক্ষেপের সঙ্গে দক্ষিণমেরুর ভৌগোলিক বিস্তৃতি, প্রাক্তন আবিষ্কার প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত যে মনোরম গদ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা পাঠককে বরফলোকের মানসরাজ্যে সহজেই হাতছানি দিয়ে আহ্বান করবে। গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদে দক্ষিণমেরুর নৈঃশব্দকে লেখক সহানুভূতির সঙ্গে বিজ্ঞানচেতনার আলোকে অঙ্কিত করেছেন। বলা বাহুল্য, প্রতিটি পদক্ষেপের আলোকচিত্র তুলে ধরেছেন লেখনীতে। পরিশিষ্টে, আগামী ২০০০ সালে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার তৎসহ পদচারণায় দক্ষিণমেরুর ভবিষ্যৎ, চিরবরফ সীমান্তে নব উপনিবেশ বিকাশ সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎ রূপরেখার খসড়া তিনি প্রণয়ন করেছেন সেটি এই মুহূর্তে কৌতুককর মনে হলেও বিজ্ঞানের বিজয়বৈজয়ন্তিতে পৃথিবীতে হয়তো সেই দিন খুব দূরের হবে না।

THRONGH THE FROZEN FRONTILR—By Harcourt, Brace and Co.

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

মুক্তধারা নাটকের গান

মুক্তধারা রবীন্দ্রনাথের একটি এমন ধরণের নাটক যাকে আমরা ঠিক পাত্র পাত্রীর সংলাপ এবং ঘটনা উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে অনুভব করতে পারি না। এর মধ্যে যে গভীর তাৎপর্য নিহিত আছে তা অনেক তর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, ফলে অর্থ থেকে যায় অস্বচ্ছ, ধূসর। মুক্তধারার ঝর্ণাকে বেধে যন্ত্ররাজ বিভূতি যে কি অভিলাষকে চরিতার্থ করতে চান এবং তাকে ভেঙে ফেলে অভিজিৎইবা কি এমন মহৎ কর্ম সম্পন্ন করছে তা তাদের কোনরকম ক্রিয়া কর্মের মধ্য দিয়েই খুব স্পষ্ট করে ধরতে পারা যায় না। তাছাড়া বিভূতি ও অভিজিতের কর্মপদ্ধতির মধ্যে যে একটা দ্বান্দ্বিক প্রবৃত্তি তা আমাদের এই নাটকটি সম্পর্কে কোন গভীর ধারণার ছায়া সঞ্চারিত করে দেয় না অনুভূতির মর্মলোকে। কেবল অভিজিৎ প্রেরিত দূতের সাথে বিভূতির কথোপোকথনের মধ্য দিয়ে আভাষ পাই যন্ত্রের নিদারুণ নিষ্পেষণে মহতী বিনষ্টির পথে চলেছে মানবকুল। বিভূতি বলছে,—"উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে?"

বিভূতির এ'কথার মধ্যদিয়ে তার অভিপ্রায়টাকে ঠিক বোঝা গেল বলতে পারি না। এটা যেন অনেকটা বিবৃতিমূলক। যাকে ইংরেজীতে বলে Statement। বিবৃতিকে বোঝাবার জন্য আবার ব্যাখ্যার প্রয়োজন। অনবরত বিবৃতি আর ব্যাখ্যাতে নাট্যরস কখনই ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে না। তাই যন্ত্ররাজ বিভূতির অভিপ্রায় বোঝাবার জন্যই তার দলের লোকেদের গান গাইতে হয়—

"নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখর মন্দ্রিত, তুমি বজ্রবহ্নি বন্দিত—
তব বস্তুবিশ্ব বক্ষোদংশ ধ্বংস বিকট দন্ত।
তব দীপ্ত অগ্নি শত-শতঘ্নী—বিঘ্ন হৃদয় পন্থ।
তব লৌহ গলন শৈলদলন অচল চলন মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠ লোষ্ট্র ইষ্টক দৃঢ় ঘনপিণদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-দল অন্তরীক্ষ লঙ্ঘন লঘু মায়া—
তব খনি খনিত্র নখ বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ অন্ত্র।
তব পঞ্চভূত বন্ধনতার ইন্দ্রজালতন্ত্র।

এই গানটির মধ্য দিয়ে যন্ত্রটির সম্পূর্ণরূপ যেন পরিষ্কার হয়ে উঠে আমাদের কাছে। আমরা

স্বচ্ছন্দে অনুভব করতে পারি যন্ত্রের প্রভাব ও প্রাধান্যের দিকটিকে। বুঝতে পারি এর শাসন চালনের ভয়াবহরূপটিকে। বুঝতে পারি এর ইন্দ্রজালতন্ত্র হচ্ছে পঞ্চভূতবন্ধনকারী। অর্থাৎ প্রকৃতির উদার উন্মুক্তিকে খর্বকায় করবার জন্যই যন্ত্রের এই বিশাল ও বিরাট আবির্ভাব।

বোধহয় সংলাপের আতিশয্যে যন্ত্রের এই ভয়াবহ দিকটিকে ইংগিত করতে পারতেন না গানের রাজা। সুমনের জন্য সুমনের মায়ের কান্না—"সুমন! আমার সুমন! (নাগরিকদের প্রতি) আমার সুমন এখনও ফিরল না! তোমরা তো সবাই ফিরেছ।" কিংবা, "…সেযে আমার চোখের আলো, আমার প্রাণের নিঃশ্বাস, আমার সুমন।" কেমন যেন সব নাকি কান্না বলেই মনে হয়, আমাদের চৈতন্যকে আলোড়িত করে না খুব একটা। যন্ত্রের পাশবিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে আমাদের মানবতা সংহত বিদ্রোহের রূপ নেয় না। তখন যেন বুঝতে পারি না মুক্তধারার বাঁধ বেধে কোথাও কোন অপকার সাধিত হয়েছে। মনে হয় যেন বিভূতির প্রবলতার প্রয়োজন ছিল খুবই। বুঝতে পারিনি একটিবারের জন্যও—"প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র।" (সাধনা, তপোবন)। কিন্তু সকলে যখন প্রথম গান গেয়ে উঠলো তখন যেন সব বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি কেবল যন্ত্রেরই উদ্বোধন সংগীত। মুক্তধারা নাটক এ গানের উপরে দাঁড়িয়ে নেই। মুক্তধারার গান জেগেছে অন্যত্র—শিবতরাইয়ের বৈরাগীর কণ্ঠে—

"আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয় ভাঙ্গা এই নায়ে।"

এই গানের মধ্যেই যেন সমস্ত নাটকটির বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। আঘাতের বিরুদ্ধে অবিচলিত থাকাটাই যে শক্তির পরিচায়ক একথা কেবল এই গানটির মধ্য দিয়েই অভিব্যক্ত করে দিয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগী। মুক্তধারা নাটকে শোষিত, নির্যাতিত মানবতার সোচ্চার ধ্বনি জেগে উঠেছে এই গানেই মধ্য থেকে। আর ধনঞ্জয় বৈরাগী সেই নির্যাতিত মানবতার, সেই গণজীবনেরই সুরকার। তাছাড়া নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন পরিষ্কার হয়েছে নীচের এই গানটিতে—

"আরো আরো প্রভু, আরো আরো।
এমনি করেই মারো মারো
…　　…　　…
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই—
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।
এবার যা করবার তা সারো সারো—
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি খেলা,

কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো।"

মুক্তধারা নাটকের গানের রাজা ধনঞ্জয় বৈরাগী। রক্তকরবীর ছিল বিশুপাগল। বিশু গান শুনিয়েছিল নন্দিনীকে। ধনঞ্জয় গান শুনিয়েছে জনগণকে। যাদের মঙ্গলের জন্যই মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে দিতে হবে। তাইতো ধনঞ্জয় গেয়েছে—

"আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন—
সে কি অমনি হবে?
আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন—
সে কি অমনি হবে?
... ...
আপনাকে সে করুক না বশ, মজুক প্রেমের রসে—
সে কি অমনি হবে?
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন—
সে কি অমনি হবে?"

এই গানের শেষ চরণটি লক্ষণীয়। এখানেই যেন মুক্তধারা নাটকের মূল বাণীটি দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ অমঙ্গলকে যে বহন করবে অমঙ্গল তাকেও ছাড়বে না। মুক্তধারা নাটকের মানবতাবাদের দিকটি ধনঞ্জয় বৈরাগীর এই গানটির মধ্যেই উচ্চারিত হয়েছে। ধনঞ্জয় আবার গেয়েছে—

"আমায় পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় কোন্
ক্ষেপা সে!
ওরে, আকাশ জুড়ে মোহন সুরে কী যে বাজায় কোন
বাতাসে!
গেলরে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা!
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।
তাকে কানন গিরি খুঁজে ফিরি, কেঁদে মরি কোন্
হুতাশে!

এই গানটির সুরের ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতা শোষিত জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলেছে। গানটির মধ্যে বাউল গানের ঢং রয়েছে। এমন কি বাউলিয়াদের মতন সন্ধানের প্রচেষ্টাও যেন ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে "তাকে কানন গিরি খুঁজে ফিরি, কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে" ছত্রটিতে।

ধনঞ্জয়ের মধ্যে যে বিদ্রোহ, রণজিতের মুখের উপরে যার জবাব—

রণজিৎ ॥ পাগলামি করে কথা চাপা দিতে পারবে না। খাজনা দিবে কিনা বলো।

ধনঞ্জয় ॥ না মহারাজ, দেব না।

রণজিৎ ॥ দেবে না ! এতোবড় আস্পর্দ্ধা !

ধনঞ্জয় ॥ যা তোমার নয়, তা তোমাকে দিতে পারব না।

রণজিৎ ॥ আমার নয় !

ধনঞ্জয় ॥ আমার উদ্‌বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

তা যেন ঠিক সংলাপের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎসঞ্চারী হয়ে দেখা দেয় নি। মানুষের মনের দরজায় ঢুকতে হলে কেবল মাত্র উচ্চ কণ্ঠ নিয়ে চলে না। তার জন্য দরকার সুর। সুর মানে সঙ্ঘ। সুর মানেই সংহতি। ধনঞ্জয় সেটা বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিল। আর এও বুঝেছিল যে গায়ের জোরে কখনও শেষ রক্ষা হয় না। কথাটা রণজিৎকে সে যদি জানাতো বক্তৃতার ঢং-এ তাহলে হয়তো রণজিতের হৃদয় দ্রবীভূত হত না। তাই সেখানেও তাকে গানের আশ্রয় নিতে হয়। ধনঞ্জয় গায়—

"যা-খুশি তাই করতে পারো, গায়ের জোরে রাখো যারে
যার গায়ে তার ব্যথা বাজে তিনি যা সন সেটাই সবে।

রণজিৎ তাতে আরও ক্ষুব্ধ হয়। ধনঞ্জয়কে বন্দী করার আদেশ দেয়। কিন্তু ধনঞ্জয় গায়—

তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।
তোর মারে মরণ মরবে না।

ধনঞ্জয়ের গানের আর শেষ নেই। অভিজিতের সাথে তার সম্পর্কটি পাকাপাকি হয়েছে। এই গানের মধ্য দিয়ে। অভিজিৎ বলেছে, "তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয়, এই কথাটি মনে রেখো।"

ধনঞ্জয়ের সমস্ত চলাটাই যেন এই গানের পাখায় ভর করে। কোনটাই বাঁধা পড়ে থাকাটা ঠিক নয়। চলাটাই সত্য। এই গভীর দার্শনিক বিষয়টাকে বোঝাবার জন্য ধনঞ্জয় গেয়ে উঠেছে—

"শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে
গুণী মোর, ও গুণী ?
বাঁধা বীণা রইবে পড়ে এমনিভাবে গুণী মোর, ও গুণী ?"

সত্যদ্রষ্টা ধনঞ্জয় গেয়েছে—

"ফেলে রাখলেই কি পরে রবে ও অবোধ !
যে তার দান জানে সে কুড়িয়ে লবে ও অবোধ।

যারে করলি হেলা সবাই মিলি আদর যে
তার বাড়িয়ে দিলি
যারে দরদ দিলি তার ব্যথা কি সেই
দরদীর প্রাণে সবে ?

মুক্তধারা নাটকের সমস্ত প্রতিক্রিয়াকে রবীন্দ্রনাথ যেন সুন্দর অভিব্যক্ত করে দিয়েছেন

ধনঞ্জয়েই গানগুলির মধ্য দিয়ে। মুক্তধারার বিরাট বাঁধ ভেঙে বিভূতির অন্যায় কর্মের উপরে যে মানবতার প্রতিষ্ঠা হল তা যেন এই গানের মধ্য দিয়েই হল। নাটকের শেষের দিকে ধনঞ্জয়ের গান—

বাজেরে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে!

তারপর—

নাচে রে নাচে চরণ নাচে
প্রাণের কাছে প্রাণের কাছে!

ইত্যাদি গানের মুখগুলিও গভীর তাৎপর্য বহন করে চলেছে।

কিন্তু মুক্তধারাতে কোন প্রকারের দ্বৈত সঙ্গীত নেই। এখানকার অধিকাংশ গানই ধনঞ্জয়ের একার কণ্ঠে গীত হয়েছে। এখানে তার ভূমিকাটি অনেকটা বিবেকের মতন। ইংরেজী নাটকের chorus এর মতন।

এ ছাড়াও আছে উত্তরপন্থীদের কিছু সমবেত সঙ্গীত। কিন্তু সেগুলি স্বাভাবিক অর্থে গান নয়। সেগুলি অনেকটা স্তোত্র জাতীয়। মঙ্গলাচরণের ন্যায়।

মুক্তধারার গান কোন পরিবেশকে তৈরী করে নি। তাই রক্তকরবীর মতন এখানে কোন দ্বৈত সঙ্গীত নেই। এখানকার গানগুলি এককণ্ঠে গীত—একজনেরই গাওয়া।

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

সমালোচনা

মৃত শিশুদের জন্য টফি—অমিতাভ দাশগুপ্ত। সাহিত্য, ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা-২০। দু'টাকা।

'সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর মতই একজন তরুণ কবির প্রচুর অস্ত্র-চিহ্ন-অস্তিত্বের একটি দলিল এই দীন কবি পত্র।' প্রায় আনুষ্ঠানিকভাবেই কবি এই গ্রন্থপরিচয়টি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। 'মৃত শিশুদের জন্য টফি' শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। মোট চল্লিশ পৃষ্ঠায় বিধৃত কবিতার সংখ্যা পঁয়ত্রিশ। দীর্ঘতম কবিতা তিন পৃষ্ঠার, 'স্বাস্থ্যনিবাসের কোল থেকে'।

নাম কবিতাটি ছোট ; আলম্বনঃ শিশু-শবের জন্য বেদনা। কবি স্পষ্টতই বলেছেন, বয়স্কের মৃত্যু কোন শোক | আনে না, হেমন্ত তুমি বাহুতে বালক | শবের বেদনা বহ, চিরদিন ধরে | তরল বারুণী জাগে তোমার তুতীরে হা হা করে।' গদ্য-লক্ষণাক্রান্ত এই প্রত্যক্ষ ভাষণ এখানে কাব্যের উদাহরণ হয়ে উঠতে পেরেছে শুধু 'বারুণী' শব্দের প্রয়োগে। এই রকমের অভিজ্ঞতা নির্বিচারে আরও কয়েকটি কবিতার ক্ষেত্রেই হতে পারে। শিশু-শবের কবরশায়ী করার বেদনায় লিখিত নাম কবিতাটি ছাড়া বয়স্কের শবদাহ অবলম্বনে রচিত আরেকটি কবিতা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, 'অসীমতা মনে হতে পারে।' এবং এই কবিতাটি সম্ভবতঃ সংকলিত কবিতাগুচ্ছের মধ্যে সবচেয়ে নিশ্চয়তার সঙ্গে রচিত, ফলে উৎকৃষ্ট। 'রাঙাকাকা পুড়ছেন'—এই অনুসঙ্গে শ্মশানভূমিতে যে একধরণের নিরশ্রু অ-শোক পরিবেশ গড়ে ওঠে, তার বিশ্বাসযোগ্য চিত্র উপস্থাপন করেছেন কবি, অথচ কোথাও অবনম্র গাম্ভীর্যের অভাব নেই। সম্পূর্ণ চলতি শব্দ ও চলতি ভাষাবিন্যাসে তিনি এই যে বেদনাকে গম্ভীর করে উপস্থিত করতে পেরেছেন, এখানেই বোধ হয় শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তর কবি-শক্তির পরীক্ষা হয়ে গেছে।

এবং কবির 'অস্ত্র-চিহ্ন-অস্তিত্বের' পরিচয় অনেকগুলি কবিতাতেই উপস্থিত। তিনি প্রায় সর্বত্রই নিজেকে অসুস্থ বলে মনে করেছেন। যন্ত্রণাবিদ্ধ বলেই তার এই অসুস্থতার বোধ, তবে এই যন্ত্রণার রূপ অনির্দিষ্ট। অবশ্য একটা সূত্র প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন তিনি,—বাসনা ও বাসনা পূরণের অক্ষমতাজনিত যন্ত্রণার বোধ, অর্থাৎ রোমান্টিক মেলাঙ্কলির সূত্র, যাকে রোমান্টিক কবিতার কুলক্ষণ বললে বোধ হয় অন্যায় হয় না। 'যে যায় সে যাক আমি জ্যোৎস্না বুকে করে শুয়ে রব। অভিমানি চন্দ্র হিমকরকার মত ঝরে। আমাকে ডেকো না।' (স্বাস্থ্যনিবাসের কোল থেকে)—এই জাতীয় পংক্তিতে উচ্চারিত বাসনা প্রথানুগ ও ব্যবহারে পঙ্গু বলে অনাকর্ষণীয়। ফলে কবির যন্ত্রণার রূপটি স্পষ্ট নয়, যা অনুভূতির বিশ্বাসযোগ্যতার পক্ষে হানিকর।

অনেকগুলি লৌকিক শব্দ ব্যবহার করেছেন কবি, অনেকগুলি প্রচলিত বিদেশী শব্দ ও আধুনিক প্রসঙ্গত। কোথাও কোথাও এসবের ব্যবহার খুবই উপযোগী হয়েছে, কিন্তু অত্যুৎসাহে

এ-বিষয়ে সতর্কতার সনদটি তিনি অনেক সময়ই উপেক্ষা করেছেন। কবিতাগুলির নামকরণে তিনি স্মার্ট, ও ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষায় অনাগ্রহী। অক্ষরবৃত্ত তার শোষণশক্তির গুণে আজকাল কবিতায় কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়, ফলে অক্ষরবৃত্তের প্রতি পক্ষপাত পরীক্ষাধর্মের দিক থেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাই বাঞ্ছনীয়। একথা স্পষ্ট করে বলাই ভালো যে, ছন্দ-ব্যবহারের উপযোগিতার প্রশ্নের জবাব কবিকেই দিতে হয়।

শক্তিব্রত ঘোষ

A R U N A

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 June '66 (0.50) Central Regd. No.

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সমকালীন

চতুর্দশ বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৭৩

ENGINEERED
TO OUTLAST
MANY MANY SUMMERS
Orient
CEILING FAN
GUARANTEED FOR TWO YEARS
ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD.
CALCUTTA-54
ASP/OGI-2/66

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতাকেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

নিয়মাবলী

সমকালীন

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

আমরা আমাদের দেশের নারী সমাজের জন্য গর্ব্ব অনুভব করি। পরিবারের অতি প্রিয়জন কেউ হয়তো বাড়ীতে নেই, তিনি আমাদের সীমান্ত রক্ষা করছেন। দেশ যে একটা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে তা জেনে আমাদের নারীগণ হাসিমুখে সব দুঃখ সহ্য করছেন। তাঁরা জানেন যে সব রকম অপচয় বন্ধ করে সঞ্চয় করা প্রয়োজন। যুদ্ধে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাঁদের সেবা শুশ্রূষায় সাহায্য করার জন্য তাঁরা হাসপাতালে, রক্তব্যাঙ্কে এবং স্বয়ংসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করছেন। হ্যাঁ, আমাদের দেশের নারীগণ দেশের সেবা করছেন! আপনি?

এক মহান দেশে:
এক মহান জনসমাজ

DA 65/F9 (Beng)

চতুর্দশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় তেরশ' তিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আষাঢ়
তেরশ' তিয়াত্তর

চতুর্দশ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীর শুঁড়া পল্লীর এক সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন কায়স্থ পরিবারে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম হয়। তাহার পিতা জন্মেজয় মিত্র একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন।

গৃহে বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল পাথুরিয়াঘাটার একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এখানে দুই বৎসরকাল অধ্যয়ন করিয়া আরও দুই বৎসরকাল তিনি হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। এখানকার পাঠ শেষ করিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্ররূপে যোগদান করেন। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররূপে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দেন, কিন্তু কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত মনান্তর হওয়ায় ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি মেডিক্যাল কলেজ পরিত্যাগ করেন।

মেডিক্যাল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া রাজেন্দ্রলাল কিছুদিন আইনও অধ্যয়ন করেন। ইহারপর তিন চার বৎসর তিনি স্বাধীনভাবে ভাষা চর্চায় মনোনিবেশ করেন ও ইংরাজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত নিজের চেষ্টায় তিনি ফরাসী, জার্মান, ল্যাটিন, গ্রীক, ফার্সী, হিন্দি, উড়িয়া ও উর্দু ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাজেন্দ্রলাল মাসিক ১০০৲ বেতনে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হন। দশবৎসরকাল তিনি এই পদে কার্য করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া রাজেন্দ্রলাল বহু খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ্যাবিদ পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসেন এবং সোসাইটির বিপুল গ্রন্থ-সংগ্রহ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে নাবালক জমিদারগণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক কলিকাতায় ওয়ার্ডস ইন্সটিটিউসন নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে এশিয়াটিক সোসাইটির কর্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজেন্দ্রলাল মাসিক ৩০০৲ বেতনে এই নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনের ডিরেক্টার বা পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং রাজেন্দ্রলাল এই পদ হইতে পেন্সনসহ অবসর গ্রহণ করেন।

প্রথম কর্মজীবনে দশবৎসর এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মচারী থাকিবার পর এই কর্ম ত্যাগ করিলেও আজীবন রাজেন্দ্রলাল এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সদস্য, সম্পাদক (১৮৫৭,১৮৬৫), সহ-সভাপতি, (১৮৬১—৬৫, ১৮৭০—৮৪, ১৮৮৬—১৮৯১) ভাষাতত্ত্ব বিভাগীয় সম্পাদক (১৮৬৬—৬৮) ও সভাপতি (১৮৮৫) রূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি পদে বৃত হন। ইহার শতাধিক বর্ষকাল পূর্বে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহার পূর্বে আর কোন ভারতীয় পণ্ডিতের ভাগ্যে এই সম্মান লাভ ঘটে নাই। দশ বৎসরকাল এশিয়াটিক সোসাইটির বেতনভুক কর্মী ও অবশিষ্ট জীবনে এশিয়াটিক সোসাইটির বিভিন্ন উচ্চপদাধিকারী রাজেন্দ্রলালের জীবনের মুখ্য সাধন-পীঠ ছিল এই এশিয়াটিক সোসাইটি। এশিয়াটিক সোসাইটির তথা প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার সহিত রাজেন্দ্রলালের নাম এমনই ওতপ্রোতরূপে জড়িত যে একের কথা বাদদিয়া অন্যের কথা ভাবা যায় না। রাজেন্দ্রলালের জীবনের কর্মক্ষেত্র ছিল বহু বিস্তৃত, এই বহু বিস্তৃত কর্মজীবনের মধ্যে প্রাচ্য বিদ্যা চর্চাই তাঁহারজীবনে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রাচ্য বিদ্যাবিদরূপে রাজেন্দ্রলালের সাধনা শুধুমাত্র কোন একটি বিশেষ বিভাগে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ইংরাজী ভাষায় রাজেন্দ্রলাল রচিত মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে উড়িষ্যার ইতিহাস, বুদ্ধগয়া ও ভারতীয় আর্য এই তিনখানি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১-৩) উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস ও বুদ্ধগয়ার ইতিহাস রচনাকালে রাজেন্দ্রলাল এই সব স্থান ফটোগ্রাফার এবং নক্সা অঙ্কনকারী সঙ্গে লইয়া বার বার পরিদর্শন করেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অধীত সংস্কৃত গ্রন্থাদির সাক্ষ্য সহকারে এই পুস্তক দুইটিতে তিনি তাঁহার অভিমতগুলি লিপিবদ্ধ করেন। শিলালেখাদির পাঠোদ্ধার দ্বারাও তাঁহার বক্তব্যগুলি দৃঢ়ীভূত করা হয়।

রাজেন্দ্রলাল তাঁহার 'ভারতীয় আর্য' নামক ইংরাজী পুস্তকটিতে ভারতীয় আর্যদের প্রথম হইতে মধ্যযুগ পর্যন্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করেন। ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, বস্ত্রালঙ্কার, গৃহসজ্জা, বাদ্য, যান-বাহন, আহার্য, গৃহপালিত পশু, রাজনীতি, পারলৌকিক কৃত্য, গ্রীক ও যবনের অভিন্নত্ব, উপভাষা, প্রাকৃত ভাষা, সম্রাট অশোক, আদিম আর্যজাতি, সংস্কৃত লিপির উৎপত্তি, বাঙ্গলার পাল ও সেন রাজবংশ প্রভৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়গুলি এই পুস্তকে পরিবেশিত হইয়াছে।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রবর্তিত Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় ১২ খানি প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক রাজেন্দ্রলাল কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকগুলির মধ্যে অধিকাংশই সর্ব প্রথম মুদ্রণ, ইহাদের অনেকগুলি একাধিক খণ্ডে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল (৪-১৫)। মূল পুস্তক সম্পাদন ব্যতীত রাজেন্দ্রলাল Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় ছান্দোগ্য উপনিষদ,

পতঞ্জলির যোগসূত্র ও ললিত বিস্তরের (আংশিক) ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। সংস্কৃত অনভিজ্ঞ বিশেষতঃ বিদেশী পণ্ডিতদের পক্ষে এই অনুবাদগুলি সবিশেষ উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হয় (১৬—১৮)। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল দ্বারা লিখিত ললিত বিস্তরের ভূমিকা নামীয় মৌলিক তথ্যবহুল রচনাটিও উল্লেখযোগ্য (১৯)।

এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মীরূপে রাজেন্দ্রলাল সোসাইটির মিউজিয়মে রক্ষিত প্রত্নদ্রব্যাদির একটি বিবরণীমূলক তালিকা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন (২০)। ইহার পর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (১—২৫ খণ্ড) প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন (২১)। এই বৎসর সোসাইটি পাঠাগারে রক্ষিত মানচিত্র ও পুস্তকাদির বিবরণও তৎকর্তৃক সংকলিত হয় (২২)।

এশিয়াটিক সোসাইটির শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সোসাইটির পক্ষ হইতে যে শতবর্ষ সমীক্ষা পুস্তক প্রকাশিত হয় রাজেন্দ্রলাল তাহার প্রথম খণ্ডটি প্রণয়ন করেন। এই খণ্ডে সোসাইটির শতবর্ষ ব্যাপী ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে (২৩)।

দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সমূহের বিবরণীমূলক তালিকাসংকলন রাজেন্দ্রলালের জীবনের একটি অবিনশ্বর কীর্তি। এই বিবরণীমূলক তালিকাগুলি (Descriptive catalogues) বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থকে চির বিস্মৃতির অতল গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছে, যে সমস্ত পুস্তকের অস্তিত্ব কাহারও জানা ছিল না, অথবা নাম মাত্র জ্ঞাত ছিল ঐগুলি রাজেন্দ্রলালের বিবরণী ভুক্ত হইয়া বিদ্যোৎসাহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উত্তরকালে পণ্ডিতেরা ঐগুলি ব্যবহার করিয়াছেন এবং কোন কোন পুস্তক পরে মুদ্রিত হইয়াছে। নেপালের বৌদ্ধসংস্কৃত সাহিত্য বিশেষভাবে রাজেন্দ্রলালের চেষ্টাতেই পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (২৪)

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে রাজেন্দ্রলাল নয়টি বৃহৎ খণ্ডে দেশের নানাস্থানে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণমূলক তালিকা সঙ্কলন করেন (২৫)।

পরবর্তীকালে এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে এই সিরিজে আরও ছয়খণ্ড সংস্কৃত পুঁথির বিবরণী রাজেন্দ্রলালের যোগ্য-উত্তর সাধক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দ্বারা সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রাপ্তব্য পুঁথি ও ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে সংগৃহীত শুধুমাত্র ব্যাকরণ বিষয়ক পুঁথিগুলির বিবরণী প্রকাশ করেন (২৬—২৭)।

প্রধানতঃ রাজেন্দ্রলাল ও এশিয়াটিক সোসাইটিস্থ তাঁহার সহকর্মিদের চেষ্টায় ভারত সরকার প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের জন্য ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কিছু অর্থ বরাদ্দ করেন। এই অর্থে এশিয়াটিক সোসাইটি ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ কার্য চলিতে থাকে। পরে প্রাদেশিক সরকারের অর্থ সাহায্যে মুখ্যতঃ রাজেন্দ্রলালের নির্দেশে এই পুঁথি সংগ্রহ কার্য চলিতে থাকে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল এই প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রকাশ করেন (২৮)। এই বৎসরই তিনি বিকানীর রাজদরবারে রক্ষিত পুঁথিগুলির ও তালিকা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন (২৯)।

প্রাচীন পুঁথি বিশেষতঃ সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ' বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম অগ্রগণ্য। ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ সঙ্কলন কার্যে স্বদেশীয় সকল শ্রেণীর পণ্ডিতদের মধ্যে রাজেন্দ্রলালই ছিলেন পথিকৃৎ। উনবিংশ শতাব্দীতে বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ থিওডোর আওফ্রেকট, সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত ব্যুল্যর, জার্মান অধ্যাপক ভেবর্, ইংরাজ পণ্ডিত সিসিল বেণ্ডেল প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ কৃত প্রাচীন পুঁথি তালিকা বা বিবরণগুলি প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় বহু সহায়তা দান করিয়াছে। এই সব বৈদেশিক প্রাচ্যবিদ্যা সাধকের বিবরণীগুলি প্রকাশিত হইবার পূর্বেই রাজেন্দ্রলাল এই কর্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

শুধু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ 'বিবরণী প্রণয়ন, মূল পুস্তক সম্পাদন ও তাহার ইংরাজী অথবা ইংরাজী ভাষায় প্রামাণ্য পুস্তক রচনাতেই রাজেন্দ্রলালের প্রাচ্যবিদ্যা সাধনা সীমিত হয় নাই। প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার ও মুদ্রাতত্ত্ব চর্চাতেও ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে রাজেন্দ্রলালকে পথিকৃৎ বলা যাইতে পারে। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ও কার্য বিবরণীতে (Proceedings) রাজেন্দ্রলালের শতাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

(জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ সূচীর জন্য, Index to Publications of Asiatic Society— S. Chowdury, Vol 1, P 1, PP 206—208 দ্রষ্টব্য; Proceedings বা কার্য বিবরণীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ সূচীর জন্য উক্ত পুস্তকের Vol 1, Part 11. PP 423—427 দ্রষ্টব্য)।

এই সব প্রবন্ধের মধ্যে ৫০টি প্রবন্ধ শিলালেখ, তাম্র-শাসন প্রভৃতি প্রাচীন লিপি সম্বন্ধীয় ও ১০টি প্রবন্ধ প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা বিষয়ক। বাকী নিবন্ধগুলি প্রাচীন চিত্র, মন্দির, ভাস্কর্য, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে লিখিত হইয়াছিল। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের নামানুসারে লক্ষ্মণাব্দ নামে যে একটি অব্দ প্রচলিত আছে রাজেন্দ্রলালের গবেষণাতেই তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের জন্য রাজেন্দ্রলাল বাঙ্গলা দেশসহ ভারতের নানা স্থানে বহুবার ভ্রমণ করেন।

ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক রীতিতে গবেষণার পদ্ধতি সর্বপ্রথম রাজেন্দ্রলাল কর্তৃকই অনুসৃত হয়। প্রাচীন প্রত্নবস্তু ও প্রাচীন সাহিত্যের সাক্ষ্য প্রমাণগুলির সম্যগ্ ব্যবহার তাঁহার গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম জীবনে রাজেন্দ্রলাল আইন ও চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আইন ও চিকিৎসা বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ না করিলেও আইনের যুক্তি ও বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠা তাঁহার গবেষণাগুলিকে যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। বহু ভাষা বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু দর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্যও রাজেন্দ্রলালের প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার বিভিন্ন প্রাঙ্গণে নিজ কীর্ত্তি চিহ্ন স্থাপন সম্ভবপর হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলালের সমসাময়িক কালে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্র ও উপকরণগুলি পর্যাপ্ত ছিল না, এতৎসত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল স্বীয় অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও প্রতিভা বলে বহু বিচিত্র বিষয়ে নূতন নূতন আলোক সম্পাত করিয়া গিয়াছেন। নূতন নূতন উপকরণ আবিষ্কারের জ্ঞান-সমৃদ্ধ পরবর্তী কালের পণ্ডিতগণ রাজেন্দ্রলাল পরিবেশিত তথ্য ও সিদ্ধান্তগুলিকে ক্বচিৎ নস্যাৎ করিতে পারিয়াছেন।

জীবদ্দশায় রাজেন্দ্রলাল দেশে ও বিদেশে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে মধ্যমণি স্বরূপ বিবেচিত

হইতেন। বহু বৈদেশিক প্রাচ্যবিদ্যাবিদের সহিত তিনি বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ভিয়েনার ইম্পিরিয়াল একাডেমি অফ্ সায়েন্সেস্, ইটালির এশিয়াটিক সোসাইটি, জার্মান ওরিয়েণ্টেল সোসাইটি, আমেরিকান ওরিয়েণ্টেল সোসাইটি, হাঙ্গেরীর রয়াল একাডেমি অফ সায়েন্স, ইথনোলজিক্যাল সোসাইটি অফ্ বার্লিন প্রভৃতি বিদেশীয় বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান-গুলি বিশিষ্ট সদস্য (Hony, Member, Corresponding Member, Fellow) রূপে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ অধ্যাপক ম্যাক্সমূল্যর ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কোলব্রুক, লাজেন ও বুর্নুফের ন্যায় বিচারশীল মণীষার অধিকারীরূপেও রাজেন্দ্রলালের প্রশস্তি করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন :—

"He is a Pandit by profession but he is at the same time, a scholar and critic in our sense of the word......his arguments would do credit to any Sanskrit scholar in England—our Sanskrit scholars in Europe will have to pull hard if with such men as Babu Rajendralala in the field, they are not to be destanced in the race of scholarship"

মাতৃভাষা বাঙ্গলার প্রতিও রাজেন্দ্রলালের সবিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান হইলে রাজেন্দ্রলাল এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হন। এই সমাজের আনুকুল্যে রাজেন্দ্রলাল "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। "পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাব সিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীব সংস্থার বিবরণ, বাণিজ্য দ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্য ব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচনা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায়" সমৃদ্ধ বিবিধার্থ-সংগ্রহ ছয় খণ্ড রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় (বাং ১২৫৮—৫৯ কার্তিক—আশ্বিন ; ১২৫৯—১২৬০, পৌষ—অগ্রহায়ণ ; ১২৬০—১২৬১ চৈত্র-ফাল্গুন ; ১২৬৪ বৈশাখ-চৈত্র ; ১২৬৫ বৈশাখ-চৈত্র ; ১২৬৬ বৈশাখ-চৈত্র)। বিবিধার্থ সংগ্রহের ৭ম ও শেষ খণ্ডের সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্রকৃত পক্ষে "বিবিধার্থ সংগ্রহ"ই বাঙ্গলা ভাষার প্রথম মাসিক পত্রিকা। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ এই মাসিক পত্রিকা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইতেন—তাঁহার "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

১২৬২ খৃষ্টাব্দে ভার্নাকুলার লিটারেচর্ সোসাইটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই সোসাইটির আনুকুল্যেও রাজেন্দ্রলাল রহস্য-সন্দর্ভ নামে একটি উৎকৃষ্ট সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই মাসিক পত্রের ৬৬টি সংখ্যা রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং সম্পাদনা করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য-সন্দর্ভে রাজেন্দ্রলালের বহু রচনা স্বনামে এবং বিনা নামে প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল বাঙ্গলা ভাষায়ও কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। (৩০—৩৫) এই পুস্তকগুলি শিক্ষার্থিদের উপযোগীরূপে লিখিত হইয়াছে ; সম্ভবতঃ বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষার্থিদের জন্য উপযুক্ত পুস্তকের অভাবের জন্যই মহাপণ্ডিত রাজেন্দ্রলালও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় পাঠ্য পুস্তক

রচনাতেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ছাত্র ও জনসাধারণের ভূগোল জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য রাজেন্দ্রলাল কয়েকটি মানচিত্র প্রস্তুত করেন। বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা ও অন্যান্য স্থানের মানচিত্র প্রকাশ বিষয়ে পথ-প্রদর্শকের কৃতিত্বও রাজেন্দ্রলালের প্রাপ্য। রাজেন্দ্রলাল অশৌচ ব্যবস্থা নামে বাঙ্গলায় একটি পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায়, এই পুস্তকটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

পুরাতাত্ত্বিকরূপে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তৎকালীন বাঙ্গলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতা ও নেতৃত্ব একরূপ অপরিহার্য ছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ মনস্বী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে সারস্বত সমাজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বিষয়ক পরিভাষা নির্দ্ধারণ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নির্বাচিত হন। রাজেন্দ্রলাল এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রলাল সভাপতি হিসাবে একক ভাবে কতকগুলি ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ধারণ করিয়া দেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সারস্বত সমাজ দীর্ঘায়ু হয় নাই। সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পূর্বে রাজেন্দ্রলাল ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন (৩৬) দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজেন্দ্রলাল কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হাণ্টার কমিশনের নিকট এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন (Report) পেশ করেন।

গবেষণা ও শিক্ষা প্রচার ব্যতীত রাজেন্দ্রলাল জনকল্যাণ মূলক কার্যেও অগ্রণী ছিলেন। ১৮৬৩ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতার পৌরকার্য একটি কমিটিদ্বারা চালিত হইত, এই কমিটির সদস্যদিগকে Justice of the peace বলা হইত। রাজেন্দ্রলাল প্রথম হইতে ১৫ বৎসর কাল এই কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে পুনর্গঠিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতেও তিনি করদাতাদের ভোটে নবগঠিত পৌর সভার সদস্য নিবাচিত হন। পৌরসভার সদস্যরূপে তিনি কলিকাতা নগরীর উন্নতি ও নাগরিকগণের আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন।

সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে British Indian Association নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, প্রতিষ্ঠাকাল হইতে নিজের মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি চারি বৎসর কাল এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি (১৮৭৮—৮০, ১৮৮৭-৮৮ ১৮৯০-৯১) ও চারিবৎসর কাল (১৮৮১-৮৪, ১৮৮৬-৮৭, ১৮৮৯-৯০) ইহার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কর্তাদের অনুগ্রহ ও প্রসাদলাভের আশায় দেশবাসীর স্বার্থ যাহারা বলি দেয় তাহাদের তীব্র বিরোধিতায় রাজেন্দ্রলাল সর্বদাই তৎপর ছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের অন্যতম নেতা হিসাবে রাজেন্দ্রলালের লক্ষ্য ছিল ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি ও দেশবাসীর স্বার্থ-রক্ষা। গবর্ণমেণ্টের দোষ ত্রুটির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া সকল অভাব অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনাও তাঁহার অভীষ্ট ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কলিকাতা টাউনহলে অনুষ্ঠিত হয়। রাজেন্দ্রলাল এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে বলেন যে জাতির বিক্ষিপ্ত

অংশগুলির মিলন সাধন তাঁহার বহুদিনের বাঞ্ছিত স্বপ্ন ছিল, এই অধিবেশনে সেই মিলনের সূত্রপাতে তিনি আনন্দিত ("It has been the dream of my life that the scattered units of my race may some day Coalesce and come together, that instead of living merely as individuals, we may some day so combine as to be able to live as a nation. In this meeting, I behold the commencement of such Coalescence......I behold in this Congress the dawn of a better and happier day for India···"

বিভিন্ন সভাসমিতিতে রাজেন্দ্রলাল প্রদত্ত ভাষণগুলি একত্রিত করিয়া একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (৩৭)। এই পুস্তকে মুদ্রিত ভাষাগুলি হইতে রাজেন্দ্রলালের মণীষা, দেশহিতৈষণা, নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবিধার্থ সংগ্রহ, রহস্য সন্দর্ভ, এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল ও প্রসিডিং ব্যতীত Journal of the Royal Asiatic Society (London) Transactions of the Anthropological Society, Journal of the Photographic Society of Bengal, the Calcutta Review, Mookherjee's Magazine, Englishman, Daily News, Statesman, Phoenix, Citizen, Friend of India, Indian Field, Hindu Partriot প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় রাজেন্দ্রলালের বহু প্রবন্ধ, পুস্তক সমালোচনা, পত্র ও মন্তব্যাদি প্রকাশিত হয়।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজেন্দ্রলালকে সম্মানসূচক L L. D উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায়বাহাদুর (১৮৭৭). সি আই, ই ১৮৭৬) ও পরিশেষে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে 'রাজা' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই রাজেন্দ্রলাল কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। রাজেন্দ্রলালের দুইটি পুত্র ছিল। ইহাঁদের বংশধরগণ এখনও কলিকাতার শুঁড়া পল্লীস্থ পৈত্রিক বাটীতে বাস করিতেছেন।

রাজেন্দ্রলালের ন্যায় বিচিত্র প্রতিভাধর পুরুষ আমাদের দেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে রাজেন্দ্রলালের বহু সদগুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। "বাংলা দেশের এই একজন অসামান্য মনস্বীপুরুষ মৃত্যুর পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোন সম্মান লাভ করেন নাই" বলিয়া কবি তাঁহার জীবন স্মৃতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন (জীবনস্মৃতি পৃঃ ১০৫—৭ রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)

---

(১) The Antiquities of Orissa in 2 Vols, Calcutta, 1875, 1880, Reprinted in 1961 in Indian Studies—Past and present.

(২) Buddha Gaya, the hermitage of Sakya Muni, Calcutta 1878.

(৩) Indo Aryans in 2 Vols, Calcutta, 1881.

(৪) কবি কর্ণপুর কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ১৮৫৩—৫৪

(৫) সায়ন ভাষ্যসহ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১—৩ খণ্ড, ১৮৫৯, ৬২—৯০

(৬ („ „ তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১৮৬৪—৭১

(৭) অথর্ববেদীয় গোপথ ব্রাহ্মণ, ১৮৭০—৭২ (৮) ত্রিভাষ্য রত্নটিকাসহ তৈত্তিরীয় প্রাতিশখ্য, ১৮৭২ (৯) অগ্নিপুরাণ, ১—৩ খণ্ড, ১৮৭৩—'৭৬—'৭৯ (১০) সায়ন ভাষ্যসহ ঐতরেয় আরণ্যক, ১৮৭৫—'৭৬ (১১) ললিত বিস্তর—১৮৫৩—১৮৭৭ (১২) বায়ুপুরাণ—১—২ খণ্ড, ১৮৮০—১৮৮৮ (১৩) কামন্দকীয় নীতিসার (অসম্পূর্ণ), ১৮৮৪ (১৪) অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা, ১৮৮৭—৮৮ (১৫) শৌনক কৃত বৃহদ্দেবতা ১৮৮৯—৯২

(১৬) (English Translation) Chandogya upanishad, 1854-1862

(১৭) Lalita Vistara (In complete)—Eng. Trans 1881-1886

(১৮) Joga Aphorisms of Patanjali—Eng. Trans, 1883.

(১৯) An introduction to the Lalit Bistara, 1877.

(২০) A descirptive catalogue of curiosities in the Musuem of the Asiatic Society of Bengal, 1849.

(২১) Index to Vol 1—XX1V of the Journal of the Asiatic Society 1856.

(২২) A Catalogue of Books and Maps in the Library of the Asiatic Society of Bengal—1856.

(২৩) Part 1 (History) of the Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal—(1784—1883) : 1885

(২৪) The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal 1882

(২৫) Notices of Sanskrit Manuscripts, Vols-1-1X, 1870—1888

(২৬) A report on Sanskrit Mss in Native Libraries 1875

(২৭) A descriptive Catalogue of Sans. Mss in the Library of the Asiatic Society of Bengal P I, Grammar—1877

(২৮) Report on the operations Carried on to the close of the official year 1879—80, for the discovery and preservation of Ancient Sanskrit Mss in the Bengal provinces—1880

(২৯) A catalogue of Sanskrit Mss in the library of the H. H. the Maharaja of Bikaner—1880

(৩০) প্রাকৃত ভূগোল (১৮৫৪); (৩১) শিল্পিক দর্শন (১৮৬০); (৩২) শিবাজীর চরিত্র, ১৮৬০ (৩৩) মেবারের রাজেতিবৃত্ত ১৮৬১ (৩৪) ব্যাকরণ প্রবেশ ১৮৬২ (৩৫) পত্রকৌমুদী—১৮৬৩

(৩৬) A Scheme for the rendering of European Scientific Terms into vernaculars of India, 1877

(৩৭) Speeches by Raja Rajendra Lal Mitra LL. D, C. I. E, (Ed by Raj Jogeshnr Mitra), Calcutta, 1892

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

প্রাচীন মন্দির পরিচয়

বাংলার প্রাচীনতম মন্দিরগুলির সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা তো আসন ছাড়িয়া অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। আসনমাত্র আশ্রয় করিয়া যে পরিচয় তাহা অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য। এই অসম্পূর্ণ পরিচয়কে দেশ ও কালের মধ্যে প্রসারিত করিয়া লুপ্ত-দেহ মন্দিরের বিস্মৃত রূপরেখা ফুটাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টা ও পদ্ধতির মধ্যে বিতর্কের অবকাশ থাকিতে পারে কিন্তু তাহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

অন্ততপক্ষে মৌর্যযুগ হইতে বাংলার শিষ্ট সমাজে উত্তর ভারতের প্রভাব যে গভীরভাবে বিস্তার লাভ করিতেছিল ইহা স্বীকার করিতে বাধা নাই। যদিও গুপ্ত যুগের পূর্বে বাংলাদেশ আর্যাবর্তে স্থান পায় নাই কিন্তু তাহার বহুপূর্বেই মৌর্যযুগ হইতেই—বাংলাদেশ সর্বভারতীয় শিল্পাদর্শ স্বীকার করিয়া তাহার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে যে ইহার ব্যতিক্রম হইবে এমন নহে। যে সামান্য ধ্বংসাবশেষমাত্র অবলম্বন করিয়া বাংলার প্রাচীনতম মন্দিরের ইতিবৃত্ত তাহার মধ্যেই সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের একটা অংশ পরিষ্কার হইয়া ধরা পরে। লুপ্তদেহ মন্দিরের রূপ কল্পনায় ইহাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

গুপ্তযুগের পূর্বে ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ স্থায়ী উপকরণে মন্দির নির্মিত হইত না। অন্ততঃ আজ পর্যন্ত তাহার কোন নিদর্শন হাতে আসিয়া পৌছায় নাই। সাহিত্য, চিত্রকলা ও মূর্তিশিল্পের ইতিহাসে গুপ্তযুগ ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগ, মন্দির স্থাপত্যের ইতিহাসে ঘটনা অনুরূপ। গুপ্তযুগে নির্মিত মন্দিরগুলিতেই ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের সূচনা—উত্তর ভারতীয় নাগর রীতি ও দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় রীতির বৈশিষ্ট্যগুলি এই যুগের নির্মাণ প্রচেষ্টার মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আরম্ভ হইয়াছিল একটি বর্গাকার গর্ভগৃহ ও তাহার সম্মুখস্থ একটি সংকীর্ণ বারান্দার উপরে প্রসারিত সমতল ছাদ লইয়া। সাঁচী (১৭ নং মন্দির), এরান, তিগাওয়া প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত প্রাথমিক পর্যায়ের মন্দিরগুলির আচ্ছাদন অতি সাধারণ এবং সমতল। পরবর্তী পর্যায়ে মূল বর্গাকার আসনের চারিধারে গর্ভগৃহটিকে ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ পথ রচিত হইল। উচ্চতা আরোপের আকাঙ্খায় মন্দিরদেহ হইল দ্বিতল। অবশ্য প্রথমতলের ছাদের সবটুকু ক্ষেত্র জুড়িয়া দ্বিতীয় তল উঠে নাই, ছাদের মধ্যস্থলবর্তী একটি অংশে ইহার অবস্থান। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত আইহোলের লাডখান মন্দির ও নাচনাকুঠারার পার্বতীমন্দিরে প্রাপ্ত আসনের এই বিন্যাস বাংলাদেশে আসিয়া গিয়াছে। দিনাজপুর জেলার বৈগ্রামে প্রাপ্ত মন্দিরাবশেষে বর্গাকার গর্ভগৃহকে ঘিরিয়া বৃহত্তর বর্গের প্রদক্ষিণ পথ নিঃসন্দেহে লাডখান ও পার্বতী মন্দিরে প্রাপ্ত আসনের সমগোত্রীয়। এই সমগোত্রীয়তার ভিত্তিতে আইহোল ও নাচনাকুঠারার মন্দিরদ্বয়ের মত বৈগ্রামের মন্দিরটিও দ্বিতল ছিল একথা অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হইবে না।

ক্রমবিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে গুপ্তমন্দিরে আসন হইতে আরম্ভ করিয়া দেহের সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া পরিবর্তন আসিয়া গেল। আসন হইল ত্রিরথ আর ক্ষুদ্রায়তন দ্বিতীয় তলের সমাবেশে সৃষ্ট মন্দিরের ঊর্ধ্বাংশ ধাপে ধাপে উঠিয়া যাওয়া পিরামিডাকৃতি শিখরে রূপান্তরিত হইল। পিরামিডাকৃতি বলিয়া শিখরের ঊর্ধ্বগতি ক্রমহ্রস্বায়মান। শিখরটি কয়েকটি স্তরে বিভক্ত, উপরিস্থিত স্তরটি নিম্নস্থ স্তরের তুলনায় সর্বক্ষেত্রেই কিছুটা হ্রস্ব ও ক্ষুদ্রায়তনের। প্রথম অবস্থায় শিখরের গতি শ্লথ এবং আড়ষ্ট, চূড়া পর্যন্ত বহিঃরেখাও খুব পরিকল্পিত নয়। প্রাথমিক অবস্থার দ্বিতল গৃহ ও পরিণত কল্পনার বক্র রেখায় বিধৃত শুকনাসশিখর, ইহাদের মধ্যবর্তী পর্যায়ে স্তরে বিভক্ত পিরামিডাকৃতি শিখর—শিখর রচনার প্রথম পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় দেওগড় ও বিটারগাঁওএর মন্দিরদ্বয়ে। উল্লিখিত মন্দির দুইটিরই শিখরে গতির আড়ষ্টতা যেমন রহিয়াছে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ না হইলেও একটা বহিঃরেখাকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইবার প্রচেষ্টাও তেমনি পরিস্ফুট। শিখরের আকৃতি কিছুটা হ্রস্ব এবং সংক্ষিপ্ত সীমার মধ্যে সংবদ্ধ হইবার ফলে শিখর গুরুভার হইয়া পড়িয়াছে। পিরামিডাকৃতি শিখর সম্বলিত মন্দির দুইটিরই আসন ত্রিরথ। আসনের ধার ঘেঁষিয়া উদ্ভুত বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী কোণগুলির তীক্ষ্ণতা ও আসনের ত্রিরথ রূপ রথাসন রচনার প্রথম প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বলিয়াই মনে হয়। কোণের এই তীক্ষ্ণতা বজায় রাখিয়া আসনের উদ্গত অংশটি ভিত্তি হইতে প্রলম্বভাবে মন্দির দেহের দেওয়াল ও শিখর বাহিয়া শেষ অবধি চলিয়া গিয়াছে। গাত্র ও শিখর সজ্জার শ্রেষ্ঠ অংশগুলি এই উদ্গত ক্ষেত্রটির উপর। চব্বিশ পরগণা জেলার দেবালয় গ্রামে যে সুবিশাল ধ্বংসাবশেষটি পাওয়া গিয়াছে তাহার মূল মন্দিরের ত্রিরথ আসনটির আকৃতি ও প্রকৃতিতে দেওগড় ও বিটারগাঁও-মন্দিরের আসনের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। দেওগড় ও বিটারগাঁও মন্দিরের সহিত দেবালয়ে আবিষ্কৃত আসনের সমগোত্রীয়তা দেখিয়া মনে হয় দেবালয়ের আদি মন্দিরেও স্তরে বিভক্ত হ্রস্বায়মান শিখর গর্ভগৃহ আবৃত করিয়া তুঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল।

দেবালয়ে মূল মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে যে ভিত্তি অধিষ্ঠানের অংশবিশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সহিত দেওগড় মন্দিরের বিস্তৃত ভিত্তি অধিষ্ঠানের নিকট সাদৃশ্য লক্ষ করিবার মত। উভয়ক্ষেত্রেই ভিত্তি-অধিষ্ঠানের গাত্র বাহিয়া আনুভূমিক উদ্গত রেখা প্রসারিত আর সেগুলিকে বিভক্ত করিয়া লম্বমান বৃথাস্তম্ভ। উভয় ক্ষেত্রেই বৃথাস্তম্ভগুলি আবার রেখাগুলির উপরস্থিত কুলুঙ্গীর বন্ধনী। এই বিন্যাস পরিকল্পনা কেবল দেওগড় বা দেবালয়ের বৈশিষ্ট্য নহে বস্তুত গুপ্তযুগের অধিষ্ঠান সজ্জায় ইহাই রীতি। কিন্তু শুধুমাত্র রীতির প্রশ্নেই নহে ইহাদের রূপগত বৈশিষ্টের মধ্যেও গুপ্ত স্থাপত্যকলার বিকাশ সহজেই চোখে পড়ে। বিটারগাঁও মন্দিরের নির্মাণকাল খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দী আর দেওগড় মন্দির নির্মিত হইয়াছিল খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকে। দেবালয়ের মন্দিরের সহিত উল্লিখিত গুপ্ত মন্দিরদ্বয়ের সমগোত্রীয়তা দেখিয়া মনে হয় কালের দিক দিয়া যদি কোন ব্যবধান থাকিয়াও থাকে ভাবের দিক দিয়াও শিখর মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের গুপ্ত মন্দিরের সহিত বৈগ্রাম ও দেবালয়ের মন্দির দুইটির সাদৃশ্যের ঘটনা দৃশ্যতঃ আসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বাকীটুকু অনুমান করিয়া

নিতে হইয়াছে। এ অনুমান কিন্তু গুপ্তযুগের বাংলাদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। সর্বভারতীয় শিল্পাদর্শ বাংলাদেশ বহু পূর্বেই স্বীকার করিয়া নিয়াছিল। গুপ্তসভ্যতার প্রভাব গুপ্তরাজনৈতিক আধিপত্যে বাংলাদেশ হইয়া উঠিল গুপ্তভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই পটভূমিকায় বৈগ্রাম ও দেবালয়ের মন্দির দুইটির আসন ও ভিত্তি অধিষ্ঠানের সহিত গুপ্ত মন্দিরের পর্যায়গুলির সাদৃশ্যের ইঙ্গিত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা অসঙ্গত হইবে না। মনে হয়, দ্বিতল মন্দির হইতে শুকনাস শিখরে যাত্রাপথে গুপ্তযুগের মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টার বিভিন্ন পর্যায়গুলি বাংলাদেশে যথানিয়মে আবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

গুপ্তযুগের অতুলনীয় উৎকর্ষের মধ্যে যে আঞ্চলিক প্রকৃতির আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহারই সুযোগে বাঙ্গালী তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিল। আয়োজন চলিয়াছিল সুদীর্ঘকাল ধরিয়া। শিল্পে ও সংস্কৃতিতে যাহা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিতেছিল রাজনৈতিক জীবনে তাহাই রূপ লাভ করিল শশাঙ্কের কীর্তিকলাপের মধ্য দিয়া। উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া শশাঙ্ক যে গৌড়তন্ত্রের সূচনা করিলেন তাহার মূল বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজনের মধ্যে। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে যে শক্তি জন্মলাভ করিয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল শশাঙ্কের মধ্যে যেন তাহারই একটা প্রকাশ ঘটিয়া গেল। শশাঙ্কের পরবর্তী প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা জীবনকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহার মধ্যেও কিন্তু বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনায় বাধা পড়ে নাই। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে এই আত্মপ্রতিষ্ঠার নিদর্শন রহিয়া গেল পাহাড়পুরের সুবিশাল মন্দির গাত্রে।

পাহাড়পুর রীতির মন্দির ভারতবর্ষে অন্য কোথাও পাওয়া যায় নাই। বাংলাদেশেও সম্ভবতঃ এ ধরণের মন্দির সীমিতই ছিল। দেশে যাহাই হোক, পাহাড়পুর রীতি কিন্তু বৃহত্তর ভারতের বিশেষ করিয়া, ব্রহ্মদেশের মন জয় করিয়া নিয়াছিল। পাহাড়পুর মন্দিরের গঠন রীতির সহিত পাগানের মন্দিরগুলির সমগোত্রীয়তার কথা আগের সংখ্যাতেই বলিয়াছি। পাগানের এই শ্রেণীর মন্দিরগুলি একটি কেন্দ্রিয় স্তম্ভকে অবলম্বন করিয়া গঠিত, ছাদ উঠিয়াছে উপর্যুপরি ক্রমহ্রস্বায়মান স্তরে। পাহাড়পুরের গঠন রীতিও তো তাহাই। পাগানের একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় স্তূপশীর্ষ অভয়দান ও পাটোথাম্মা এবং শিখরশীর্ষ আনন্দ, সর্বজ্ঞ, থিট্‌সোয়াদা, টিহ্‌-লো-মিন্‌হ্‌-লো মন্দির সবই পাহাড়পুরের অষ্টম শতকে নির্মিত মন্দিরে অনুসৃত রীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যযুক্ত। পাহাড়পুর-মন্দিরে শীর্ষ রচনা কি ভাবে হইয়াছিল সে তথ্য আজ অজ্ঞাত তবে ক্রমহ্রস্বায়মান উপর্যুপরি স্তরে উন্নীত আচ্ছাদনের উপর স্তূপ বা শিখর বসাইয়া শীর্ষ রচনা করিবার পদ্ধতি যে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ বৌদ্ধপুঁথিতে অঙ্কিত প্রাক্‌দশম শতকীয় নালেন্দ্রতে অবস্থিত স্তূপশীর্ষ লোকনাথ মন্দিরে ও পুণ্ড্রবর্ধনের শিখর-শীর্ষ বুদ্ধ মন্দিরে। যবদ্বীপে (জাভা, ইন্দোনেশিয়া) পাহাড়পুর রীতির প্রভাবের সাক্ষ্য রহিয়াছে প্রাম্বানামের লোরো-জোংরাং মন্দিরে ও শিব মন্দিরে।

রীতি প্রকরণ

সাধারণতঃ দেখা যায় মন্দিরের রূপরেখার অনেকটাই নির্ভর করে আচ্ছাদন রচনার বৈশিষ্ট্যের উপরে, মন্দিরদেহের যাহা কিছু সৌন্দর্য ও গৌরব সবটাই যেন আচ্ছাদনকে কেন্দ্র করিয়া জন্মলাভ

করে, তাহারই আশ্রয়ে বিকশিত হইয়া সমগ্র মন্দিরটির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। মন্দির রচনায় ভাব কল্পনার কেন্দ্রভূমি হিসাবে আচ্ছাদনকেই অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই কারণেই আচ্ছাদনের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করিয়া মন্দিরের প্রকার ভেদ। পাহাড়পুর-রীতির মন্দির অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম। আসন পরিকল্পনা হইতে শুরু করিয়া দেওয়াল, কক্ষবিন্যাস, তল বিভাগ সবকিছুর মধ্যেই ভাবকল্পনা এমনভাবেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে মন্দিরদেহের কোন একটি বিশেষ অংশ ভাবকল্পনার কেন্দ্রভূমিরূপে সার্বভৌমিক প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। আচ্ছাদনের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলার মন্দিরগুলি চারিটি সুনির্দিষ্ট রীতির মধ্যে বিভক্ত। রীতি চারিটি হইল শিখররীতি, ভদ্র বা পীড় রীতি, চালা রীতি ও রত্ন রীতি।

প্রথম রীতি দুইটি বাংলার বাহিরে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং সর্বভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে বাংলাদেশে গৃহীত হইয়াছিল। শিখর মন্দিরের আচ্ছাদন দেওয়ালের উপর হইতে ক্রমহ্রস্বায়মান আকৃতিতে সোজা উঠিয়া গিয়া একটা নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া শেষ হয়। সুউন্নত শিখরের বহিরেখা দু-এক ক্ষেত্রে সোজা ঢালের হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিখরটি বক্ররেখায় বিধৃত থাকিয়া ভিতরের দিকে খানিকটা ঝুঁকিয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়। ভদ্র বা পীড় নামটি ওড়িশা হইতে আসিয়াছে। পীড় আচ্ছাদন প্রস্তুত হয় দৃঢ়বদ্ধ একটা পিরামিডাকৃতি বহিরেখার ভিতর। এই সুনির্দিষ্ট বহিরেখার ভিতরে দেওয়ালের উপর হইতে কতকগুলি চাল উপর্যুপরি অবস্থায় উপরের দিকে উঠিয়া যায়। পিরামিডাকৃতি বহিরেখা সৃষ্টির জন্য চালাগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকৃতি হইতে থাকে। ভদ্র ও শিখর উভয় রীতির জন্মসূত্র একই। দ্বিতল মন্দির হইতে বক্ররেখ শুকনাসাকৃতি তুঙ্গশিখর কল্পনার যাত্রাপথে একটি পর্যায় ছিল ভদ্র রীতির আদিরূপ। এই রূপের কথা বিটারগাঁও ও দেওগড়ের মন্দিরের প্রসঙ্গে বলিয়া আসিয়াছি।

বাংলার নিজস্ব রীতি হইল চালা রীতি ও চালা ও শিখরের মিশ্রণে উদ্ভূত রত্নরীতি। ইহাদের লইয়াই বাংলার নিজস্ব মন্দিরস্থাপত্য। চালা রীতি যে বাংলার সর্বসাধারণের বাসগৃহের প্রত্যক্ষ অনুকরণ সে আলোচনা আগেই হইয়া গিয়াছে। বাসগৃহের চালা নির্মিত হয় বাঁশ, কাঠ এবং খড় দিয়া কিন্তু দেবগৃহ নির্মাণের উপকরণ ইঁট বা মাকরা পাথর; তাই নির্মাণকৌশলে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য ঘটিয়াছে। উপকরণ ও নির্মাণ কৌশল ভিন্ন হওয়ায় বহিরেখাতেও কিছু বৈষম্য ঘটিবার কথা। এই বৈষম্য যত বাড়িয়াছে চালা গৃহ হইতে চালা মন্দিরের দূরত্বও তত বাড়িয়া চলিয়াছে। চালার সর্বাপেক্ষা সহজ ও সংক্ষিপ্ত রূপ হইল একচালা। একটি উঁচু দেওয়াল হইতে ঢালু একটি চালা নামিয়া আসে। এই ধরণের আচ্ছাদন নিতান্তই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য—মন্দিরের রূপ-কল্পনায় ইহার স্থান হয় নাই। ইহার পরেই আসে দোচালা (বা একবাংলা)। আয়তাকার কক্ষের প্রধান দেওয়াল দুইটির উপর হইতে দুইটি আয়তাকার চালা ভিতরের দিকে ঝুঁকিয়া উপরে গিয়া পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়। চালা দুইটি সোজা ঢালের সহিত উঠিতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার রাগ দেওয়া বাঁকান চালার—অনুকরণে দোচালা মন্দিরের চালাগুলি হয় বক্রাকৃতি এবং চালার আকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য কার্নিসও হয় ধনুকের মত বাঁকান। উপরে, দুইটি চালার সংযোগস্থল চালার আকৃতিগুলি বাঁকিয়া গিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে কক্ষের

ঠিক মাঝখানের উপর দিয়া একদিক হইতে অন্যদিকে চলিয়া যায়। বক্ররেখার এই প্রাধান্য দোচালা আচ্ছাদনকে একেবারে হস্তিপৃষ্ঠের মত বাঁকান করিয়া তোলে। দুইটি দোচালা কক্ষ পাশাপাশি জুড়িয়া দিয়া জোড়বাংলা মন্দিরের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। দুইটি আয়তক্ষেত্রের সমান্তরাল অবস্থানে মন্দিরের আসন বর্গাকার হইয়া ওঠে। লব্ধ বর্গক্ষেত্রটি কিন্তু আসনের বহিরূপের একটি সাধারণ রেখা মাত্র—নির্মাণ পরিকল্পনায় ও কক্ষবিন্যাসে দুইটি স্বতন্ত্র কক্ষের অস্তিত্ব সাধারণতঃ লুপ্ত করিয়া দেওয়া হয় না। আচ্ছাদন রচনার সময় দুইটি দোচালার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তো রাখিতেই হইবে—ঢালু দুইটি চালা যখন নীচের দিকে পরস্পরের সহিত যুক্ত হইবে তখন স্বাতন্ত্র্য বিলোপের প্রশ্নই উঠে না।

দোচালা ছাদের স্বাভাবিক পরিণতি চারচালায়। দোচালা ঘরের আসন আয়ত হইবেই কিন্তু চারচালা কক্ষ সাধারণতঃ একটি বর্গক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া উঠিয়া যায়। অবশ্য আয়তাকার হইতে ইহার বাধা নাই। বসবাসের জন্য চারচাল ছাদের ব্যবহারই সর্বাধিক। বস্তুতঃ পরিণত ধারণার সংক্ষিপ্ত ও সহজরূপ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ইহার অনেক বেশী। চারিদিকের লম্বমান দেওয়ালের প্রত্যেকটির উপর হইতে একটি করিয়া সমত্রিভুজ চালা পরস্পরের দিকে ঝুঁকিয়া কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটি শীর্ষবিন্দুতে গিয়া মিলিত হয়। আকৃতিতে ছাদটি ক্রমহ্রস্বায়মান। রাগ দেওয়া চালার অনুকরণে ইহার বহিরেখা কার্নিস ধনুকের মত বাঁকান। লম্বমান অবস্থায় চালাগুলির সংযোগস্থলের বক্র রেখা যেন সমগ্র আচ্ছাদনটিকে ধারণ করিয়া থাকে। চালা মন্দির নির্মাণে বক্ররেখার প্রভাব এতই গভীর হইয়া উঠিয়াছে যে চালা মন্দিরের যাহা কিছু সৌন্দর্য ও গৌরব তাহার মূল নিহিত করিয়াছে সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া এই নমনীয় বক্র রেখার বন্ধনে।

চালা পরিকল্পনার চারচালার পরবর্তী পর্যায় হইল আটচালা। আটচালা করিতে গেলে ঘরকে করিতে হইবে দ্বিতল। নির্মাণের উপকরণ মাটি, তাই দ্বিতল গৃহের জন্য মাটির দৃঢ়তা থাকা চাই। শর্তসাপেক্ষ বলিয়া আটচালা পশ্চিমবঙ্গের কঠিন মৃত্তিকা অঞ্চলেই প্রচলিত। এই কারণে চারচালা অপেক্ষা আটচালা গৃহের সংখ্যা বাংলা দেশে অনেক কম; এমন কি পশ্চিমবঙ্গের কঠিন মৃত্তিকা-অঞ্চলেও তাহাই। কিন্তু মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে—আটচালা আকৃতি কিছুটা পরিবর্তিত রূপে বাংলার সাধারণ্যে মন্দিরের সর্বাধিক সমাদৃত রূপ বলিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। আটচালা গৃহে প্রকৃত আচ্ছাদনটা থাকে উপরের তলে। প্রথম তলের শেষে একটা সঙ্কীর্ণ আচ্ছাদন চারিদিক ঘুরিয়া আসে বটে কিন্তু প্রথম তলটিকে আচ্ছাদিত করিবার কাজে তাহার ব্যবহার নয়। প্রথম তলটি তো উপরের তলের মেঝের প্রসারতাতেই ঢাকা পড়িয়া যায়। তবুও যে একপ্রস্থ চাল প্রথমতলের দেওয়ালের উপরে থামিয়া চারিদিক ঘুরিয়া আসে তাহাতে বৃষ্টির ছাঁট হইতে নীচের দেওয়ালটি রক্ষা পায়; আর ভিত্তি হইতে দ্বিতল পর্যন্ত লম্বমান নিরাভরণ দেওয়ালের গাত্রে প্রসারিত রেখার বন্ধন একটা ছেদ টানিয়া দিয়া গৃহটিকে সুসমঞ্জস করিয়া তোলে। দ্বিতলটি উঠে প্রথমতলের উপরাংশের সবটুকু ক্ষেত্র জুড়িয়াই। মাটির দেওয়াল বলিয়া উপরের তলটিকে খুব বেশী উঁচু করা যায় না। নীচের দেওয়ালের ভার বহনের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা উপরের তলটিকে হ্রস্ব করিয়া তুলিয়াছে। আটচালা বাসগৃহের সহিত আটচালা মন্দিরের বৈষম্য ঘটিয়া গিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনা ও নির্মাণ কৌশলের দিক দিয়া আটচালা মন্দির চারচালারই অনুরূপ ব্যতিক্রম যাহাকিছু সে উর্ধাংশের বিন্যাসে। আটচালা মন্দির দ্বিতল করিয়া গঠিত নয়। গর্ভগৃহকে আবৃত করিয়া একটি চারচালাই গঠিত হয়—ইহাই মন্দিরের প্রকৃত আচ্ছাদন। আচ্ছাদনের চালা চারিটি অধিকদূর অগ্রসর হয় না ; খানিকটা পরেই একটা সমতল পাটাতন শেষ হইয়া যায়। পাটাতনটির উপরে একটি ক্ষুদ্রাকার চারচালা স্থাপন করিয়া চারচালাকে করিয়া তোলা হয় আটচালা। উপরের চারচালাটির সংযোজন নিতান্তই অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে, ব্যবহারিক কোন প্রয়োজন ইহার থাকে না। বাসগৃহের জন্য নির্মিত আটচালার সহিত আটচালা মন্দিরের সাদৃশ্য প্রকৃতপক্ষে ধারণাগত ; নির্মাণ কৌশল ও কক্ষ বিন্যাসে আটচালা মন্দিরের সহিত চারচালা মন্দিরের কোন পার্থক্যই নাই। আটচালা মন্দিরের উর্ধাংশে যে বিভাগ তাহাও চারচালার বহিরেখার মধ্যেই রচিত। বস্তুত ছন্দোবদ্ধ আটচালা মন্দির চারচালা মন্দিরেরই একটা দ্বিধাবিভক্ত রূপ মাত্র।

মন্দিরদেহে উচ্চতা আরোপের আশায় আটচালাকে বারচালা করা হইয়াছে। পদ্ধতি আটচালা নির্মাণের মতই। আটচালার দুইটি স্তরের মাঝখানে নীচের স্তরটির মত আর একটি স্তর সংযোজনের দ্বারা ইহার উদ্ভব। এতাবৎ আসনের কোন পরিবর্তন হয় নাই। মন্দির বর্গাকার বা আয়তাকার থাকিয়া গিয়াছে। আসনের পরিকল্পনা পরিবর্তিত করিয়া অষ্টকোণাকৃতি গর্ভগৃহের বাহুগুলিকে অবলম্বন করিয়া আটচালা নির্মাণ করিবার পরীক্ষাও হইয়াছিল। চালার মতই এক্ষেত্রেও আটটি দেওয়ালের প্রত্যেকটির উপর হইতে ত্রিভুজ চালা ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া উপরে গিয়া একটী বিন্দুতে শেষ হয়। আচ্ছাদনের এই পরিকল্পনাকে প্রচলিত আটচালার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া দুইটি স্তরে বিভক্ত করিলে আচ্ছাদনটি ষোলচালা হইয়া উঠে। অবশ্য এই ধরণের আটচালা বা ষোলচালার প্রচলন খুব বেশী নহে।

বাংলার একান্ত নিজস্ব মন্দির রীতি চালা মন্দিরের সহিত পূর্ব হইতে প্রচলিত শিখররীতির মিশ্রণ ঘটিল রত্ন মন্দিরে। চালা মন্দিরের আচ্ছাদন চালাগুলিকে খর্ব করিয়া দিয়া দেওয়ালের উপর ঈষৎ ঢালু ছাদের উপর হ্রস্বাকৃতি শিখর স্থাপনা রত্নরীতির মুল কথা। চালা আচ্ছাদনের উচ্চতা খর্ব হইল বটে কিন্তু ঈষৎ ঢালু ছাদ ও বক্রাকৃতি কার্নিসের মধ্যে তাহার মুল বৈশিষ্ট্যগুলি রহিয়া গেল। রত্ন নামটি ক্ষুদ্রাকৃতি শিখরটিকে বুঝাইবার জন্য। নামের মধ্যেই তাহার প্রয়োজনীয়তাও পরিস্ফুট। আচ্ছাদন রচনা করে ঢালু ছাদটি, রত্নগুলি আসে তাহার অলংকরণের জন্য। রত্ন-শিখরগুলি তাহাদের ক্ষুদ্র দেহের মধ্যেই শিখরমন্দিরের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ধারণ করিয়া মন্দিরের দেহটিকে শোভিত করিয়া তোলে। রত্ন মন্দিরের আদিরূপ একরত্ন মন্দির পরিকল্পনায়। বর্গাকার গর্ভগৃহের ঢালু ছাদের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র শিখর মন্দির, একরত্ন মন্দির নির্মাণের ইহাই বিষয়বস্তু। রত্ন মন্দিরে রূপের বিবর্তন ঘটিয়াছে রত্নের সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্য দিয়া। বিন্যাস পরিকল্পনা বিস্তারিত করিতে গিয়া ক্ষেত্র হিসাবে অবলম্বন করা হইয়াছে কার্নিশের সংযোগস্থলের উপরে অবস্থিত ছাদের চারিটি কোণকে। ফলে রত্নের সংখ্যা সর্বদাই চার করিয়া বাড়িয়াছে। একরত্ন মন্দিরের বিস্তারিত রূপ তাই পঞ্চরত্ন। পঞ্চরত্ন বিন্যাসে ছাদের চারিটি কোণে চারিটি রত্ন শিখর আর ছাদের ঠিক মধ্যস্থলে থাকে উচ্চতর কেন্দ্রিয় শিখরটি

পার্শ্ববর্তী রত্নশিখরগুলি আকারে কেন্দ্রীয় শিখরটির তুলনায় হ্রস্ব বলিয়া কেন্দ্রীয় শিখরটির আকৃতি মন্দির উচ্চতা নির্ধারণ করিয়া দেয়। রত্ন শিখরগুলির আকারের এই বৈষম্য যথার্থভাবে ব্যবহার করিয়া সাম্য রূপের সৃষ্টিই একরত্ন ভিন্ন অন্য সমস্ত রত্ন মন্দিরের সর্বপ্রধান সমস্যা।

চালা ছাদের মধ্য দিয়া উচ্চতা অর্জনের যে সম্ভাবনা ছিল তাহার পূর্ণ ব্যবহার খুব কমই হইয়াছে। এই সম্ভাবনা যে কতদূর ছিল চারচালা মন্দির নির্মাণে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আটচালা মন্দির যে পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছিল সেটিও যে সম্ভাবনা পূর্ণ ছিল তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আটচালায় এ সম্ভাবনার ব্যবহার প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে। রত্ন মন্দিরের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা উপেক্ষিত হয় নাই। রত্ন পরিকল্পনা বিস্তারিত ও প্রসারিত করিয়া সুউচ্চ তুঙ্গ দেবগৃহ নির্মিত হইয়াছে। রত্ন মন্দিরে উচ্চতা আরোপের প্রথম পদক্ষেপ ঘটিল নবরত্ন বিন্যাসে। পঞ্চরত্ন পরিকল্পনাকে পরিবর্ধিত করিয়া নবরত্নের সৃষ্টি। প্রথম পর্যায়ে ছাদের কোণগুলিতে পঞ্চরত্নের মতই চারিটি রত্নশিখর। দ্বিতীয় পর্যায়টি রচিত হয় ঠিক মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্রায়তন পঞ্চরত্ন কক্ষ সংস্থাপিত করিয়া। দুইটি পর্যায়ের মিলিত রত্ন সংখ্যা নয় হইয়া দাঁড়ায়। উপরে কক্ষ সংস্থাপনের ফলে মন্দিরদেহ হয় দ্বিতল, উচ্চতাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া যায়। নবরত্নে পরিবর্ধিত আকার হইল ত্রয়োদশ রত্ন। ত্রয়োদশ রত্নের মন্দিরদেহ দ্বিতলই থাকিয়া গিয়াছে, সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ত্রিতল করিয়া গঠন করা হয় নাই। নবরত্ন কাঠামোর মধ্যেই রত্নের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, প্রথমতলে ছাদের কোণগুলিতে আর একটি করিয়া রত্ন সংযোজিত হইয়াছে। ফলে, প্রথমতলের আটটি রত্ন ও দ্বিতলের পাঁচটি রত্ন মিলিয়া সংখ্যা হইয়াছে ত্রয়োদশ। সপ্তদশরত্ন মন্দিরেও তলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই তবে অধিক সংখ্যক রত্নের সমাবেশ ঘটাইবার জন্য দ্বিতলের আসন ও আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম তলের ছাদের উপর রত্নের অবস্থান ও তাহাদের সংখ্যা ত্রয়োদশ রত্ন পরিকল্পনার মতই, কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। দ্বিতলটিকে করা হইয়াছে অষ্টকোণাকৃতি। ছাদের উপর প্রতিটি কোণে একটি করিয়া রত্ন আর মধ্যস্থলে রহিয়াছে কেন্দ্রীয় রত্নটি। দুইটি তলের রত্নসংখ্যা একত্রে সপ্তদশ হইয়াছে। ত্রয়োদশ ও সপ্তদশ রত্ন মন্দিরে উচ্চতা আরোপের সুযোগ নবরত্ন অপেক্ষা অনেক বেশীই ছিল, তলের সংখ্যা বাড়াইয়া চার পর্যন্ত করা চলিত, কিন্তু সেদিকে অগ্রসর হইবার কোন প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। নবরত্ন মন্দিরের পর উচ্চতা আরোপের প্রথম প্রচেষ্টা দেখা গেল পঞ্চবিংশতি রথ মন্দিরে। দ্বিতল মন্দিরদেহ হইল ত্রিতল। প্রথমতলের ছাদের কোণগুলিতে রত্নের সংখ্যা বাড়িয়া হইল তিন আর দ্বিতীয় তলের ছাদের প্রতিটি কোণে রত্ন রহিল দুইটি করিয়া। সর্বশেষ তলটি একটি পঞ্চরত্ন কক্ষ। পঞ্চবিংশতি রত্ন মন্দিরই হইল রত্ন পরিকল্পনার বিস্তৃততম রূপ।

উত্তর রাঢ়ের লোকসংগীত

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

পটুয়া

পশ্চিমবাঙলার পশ্চিম সীমান্তে বিশেষ করে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় 'পটুয়া' বা 'পোটো' নামে এক সম্প্রদায় বাস করতো। বর্তমানে এই সম্প্রদায় প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। চিত্রাঙ্কনই এদের প্রধান উপজীবিকা। পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যকাহিনী চিত্রাঙ্কন এবং সংগীতের মাধ্যমে বর্ণনা করে জীবিকা অর্জন করে। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে রচিত বানভট্টের 'হর্ষচরিতে' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষসে' মহামতি চাণক্যের গুপ্তচর যে 'জম পট্টিক' শ্রেণীর উল্লেখ আছে এই জনপদের তারাই 'পটুয়া' বা 'পেটো' বা 'পোটো' নামে পরিচিত। প্রথমতঃ যমরাজার পট দেখিয়ে এরা গান গাইত।

পণ মহ জমস্‌স চলনে
কিং কজ্জং দে অ এহিং অন্নেহিং
এসো খু মারেই অন্ন ভত্তানাং চডপডন্তঃ

যমের চরণে পেন্নাম করো অন্য দ্যাবতায় কি কাজ? অন্য দ্যাবতার ভক্তদের ইনি মারেন— তারা ছটফট করে (চড়বড় করে)। পরবর্তীকালে এরা রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার পট ও আরও পরবর্তীকালে (শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর) চৈতন্যলীলার পটও এঁকেছে কিন্তু সবশেষে যমরাজা ও যমালয়ের ভয়াবহ চিত্র থাকে। খৃষ্টীয় সপ্তক শতাব্দী হতে একই ধারা আজ প্রবহমান।

'পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মনাঞ্চ কোপতঃ', ব্রহ্মার শাপে ও ব্রাহ্মণের কোপে এরা সমাজে পতিত। একথা সহজেই অনুমান করা যায় এরা ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণকে নিজেদের আচারে তুষ্ট করতে পারে নি। আর্যব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যখন কার্যকরী হয় নি তখনই এই আর্যেতর সম্প্রদায়কে অভিশাপ বরণ করে নিতে হ'য়েছে। চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় পৌরাণিক রীতির পরিবর্তে লৌকিক রীতি অনুসরণ করাই বোধ হয় আর্যসম্প্রদায়ের ক্রোধের মূল কারণ। এই অন্‌-আর্যসুলভ স্বতন্ত্র স্বাধীন মনোবৃত্তির জন্যই সমাজের উচ্চবর্ণের অভিশাপ কুড়িয়ে পতিত হ'য়ে রয়েছে। আর্যসম্প্রদায়ের ঘৃণার ফলে এরা অন্য ধর্ম বরণ করে কিন্তু পূর্ব অভ্যাসমত হিন্দুদের আচারাদিও মেনে চলে। সেই সমাজেও এদের স্থান নাই। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ। মেয়েরা শাঁখা-সিন্দুর পরে। হিন্দু দেব-দেবীর চিত্রাঙ্কন করে সংগীতের মাধ্যমে মাহাত্ম্য বর্ণনা করে অথচ অবলম্বিত ধর্মানুষ্ঠানও করে।

পট আঁকাই এদের প্রধান বৃত্তি। গ্রামের লোকে এই পট কিনে পুজো করতো। পরবর্তীকালে লোকে ছবি কিনে পুজা সুরু করলো। মালাকার সম্প্রদায়ও পট আঁকা সুরু করে দেন। গ্রামের মেলা খেলায় পট এঁকে ও পুতুল তৈরী করেও বিক্রী করতো। কোন কোন গ্রামে এই পটুয়ারা সাপুড়ের বৃত্তিও গ্রহণ করেছে। শুধু পট এঁকে গান গেয়ে আর জীবিকা অর্জন

করা যায় না—তাই ছাদমিস্ত্রীর কাজ, ছুতোর-এর কাজ ও দেওয়াল রঙ করার কাজও গ্রহণ করেছে।

'পট দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে—এক শ্রেণীর নাম চৌকা পট, ইহাতে একএকটি চিত্র বিচ্ছিন্নভাবে অঙ্কিত হয়—ইহা গীতি সহযোগে ব্যাখ্যা করিবার রীতি নাই, অন্য এক শ্রেণীর পটের নাম দীঘল পট বা জড়ানো পট ; '

এতদঞ্চলে দীঘল পটের প্রচলন আছে। কোন একটি উপাখ্যানের প্রধান প্রধান অংশগুলি পটের উপর হতে নীচ পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড ভাবে চিত্রিত থাকে। পটুয়াসম্প্রদায় এই পট গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে ক্রমে ক্রমে খোলে এবং গীতি সহযোগে খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলির সংযোগ সাধন করে। গীতি ও চিত্র উভয়ের সংযোগে একটি অখণ্ড ভাবব্যঞ্জনাময় আখ্যায়িকার সৃষ্টি হয়। মূলত পৌরাণিক দেবদেবীরা এই পটের বিষয়বস্তু হ'লেও গীতি সহযোগে বর্ণনার সময় দেবদেবীর লৌকিক রূপই প্রাধান্য পায়। এটি অনার্য মানসিকতার উত্তরাধিকার।

পটুয়াগণ যে চিত্র অঙ্কন করে—তাহা মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায় : প্রথমত, বেহুলা লক্ষীন্দর মনসা বিষয়ক ; দ্বিতীয়ত, রামায়ণ বিষয়ক ; তৃতীয়ত, ভাগবত বিষয়ক। লক্ষণীয় এই যে পটুয়া সম্প্রদায় মহাভারতের বিষয় চিত্রাঙ্কন করে না। সাপুড়ে বা বেদে যেমন সাপ খেলানোর সময় মনসার বিষয়ে গান করে পটুয়া সংগীতেও মনসা-মাহাত্ম্য প্রাধান্য লাভ করে। এর থেকে অনুমান করা যায় পটুয়া ও সাপুড়ে সম্প্রদায়ের মধ্যে অতীতের কোন যোগাযোগ ছিল হয়ত বা একই সম্প্রদায়ের দুই শাখা। স্থানীয় বা লৌকিকবাহিনী নিয়েও অনেক সময় পট অঙ্কিত হয়। ধর্মান্তরের পর মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্য এরা গাজীর পটও অঙ্কন করতো।

বর্তমানে উত্তররাঢ় অঞ্চলে যে সাপুড়ে সম্প্রদায় আছে তারা নিমাই সন্ন্যাস, রাধাকৃষ্ণ, পার্বতীর শাঁখাপড়া, সিন্ধুবধ, গোমঙ্গল, মহাদেবের চাষ করা, পঞ্চকল্যাণী, দশাবতার ইত্যাদির পট অঙ্কন করে। এরা পটুয়া সংগীতের মাধ্যমে জীবিকা অর্জ্জন ছাড়াও পট আঁকে, প্রতিমা গড়ে, ঘর রঙ করে, দরজা জানালায় নক্সা করে ও মিস্ত্রীর কাজ করে।

সিন্ধুবধের যে দীঘল পট তাতে সর্বপ্রথম চিত্রে দেখা যায় যে রাজা দশরথ রাজসভায় পাত্রমিত্র পরিষদ নিয়ে বসে আছেন প্রজাগণ এসেছেন অভিযোগ জানাতে শুধু এইটুকু খুলে গীত সুরু হয়।—

আজ অজ রাজার পুত্র রাজ (১)
নাম দশরথ
শোভা করে বসলো রাজা
(আজ) লয়ে প্রজাগণ।
(আজ) রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট
প্রজায় কষ্ট পায়।
গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট
ঘরের লক্ষ্মী উড়ে যায়।

নিপুত্র বলে রাজাকে
অযোধ্যার লোকে।
নিপুত্র রাজার আমরা
মুখ না হেরিব
নারদ শুনি কহেন কথা
'শোনেন মহাশয়'
শনিকে যদি বধিতে পারো
তাহ'লে রথশয্যা হয়।

জিন্ বন্দী করে রাজা
ঘোড়া সাজাইল
শনির উপরে বাণ রাজা
তবে নিক্ষেপ করিল
এক বান রাজা মারে
রাজা দুই বাণ মারে

তিন বাণের বেলায় শনি
নিঃশ্বাস ছাড়িল
শনির নিশ্বাসে
রথ রথী সারথি ঘোড়া
নিল ঘোড়া, খাসা জোড়া
বিনন্দের পাগড়ী।

রথ রথী, সারথি ঘোড়া
সব উড়িতে লাগিল।

এরপর দ্বিতীয় ছবি আসে—জটায়ু পক্ষীর গলায় রাজা দশরথ নিজের গলার মালা পরিয়ে দিচ্ছেন—আবার গান চলে।

কোথা ছিল জটায়ু পক্ষী
রথ ধরে নামাইল
জটায়ুর সাথে রাজা তবে
মিত্রতা পাতাইল
'আমি বনের পাখী, বনজন্তু
রাজা—মিত্রতার কি জানি
অন্তিমকালে দিও তোমার
রাঙা চরণ দুখানি

নিজের গলার মালা খুলে রাজা
(আজ) জটার গলে দিল
জটার সাথে জনম জনম
রাজা মিত্রতা পাতাল।
এইখানে থাকো জটা—মিত্রপাখী
পথখানি আগুলে
আমি চলিলাম গহন কাননে
মৃগশিকার করিলে।

গান চলে। দ্বিতীয় ছবি জড়িয়ে নেয় তৃতীয় ছবি বের হয়—সিন্ধুর পিতা-মাতা সিন্ধুকে জল আনতে নির্দেশ দিচ্ছেন—

ব্রত একাদশী করে আছেন
বনের ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দুজন।
কাল গেছে একাদশী ব্রত
ব্রাহ্মণের পালন।
'পালনের জল আনো গুণের সিন্ধু,
করি নিবেদন
'নিত্য যাই—নিত্য আসি
পিতা—সরোবরের ঘাটে

আজকে আর যাবো না পিতা
প্রাণ যে কেন কেঁদে উঠে
ধর্ম করে মরি যদি
পাণ্ডবের নন্দন
তবে ধর্ম কেন করে তারা,
কিসেরি কারণ
কাঁদিতে কাঁদিতে সিন্ধু
কুণ্ড নিল হাতে
'যাই সরোবরের ঘাটে।'

চতুর্থ পটে থাকে বাণবিদ্ধ সিন্ধু সরোবরের ঘাটে পড়ে আছে-পার্শ্বে শূন্য কুম্ভ। আর অদূরে শিকারীর বেশে হতবাক রাজা দশরথ—

চৌষট্টি বন ঘুরে রাজা
শিকার নাহি পেল

(আজ) তবে রাজা
সরোবরের ঘাটে এল।

কাঁদিতে কাঁদিতে সিন্ধু
　　জল তবে ভড়িতে লাগিল
জলের ভুকভুকি শব্দ
　　রাজার কর্ণগত হ'ল
বনে মৃগশিকার ব'লে
　　সিন্ধু বধিল
কে মেলি আমায়
　　শব্দভেদী বাণ
　অঙ্গ গেল জলে
শীগগির করি লয়ে চল
　　আমার অন্ধ মাতাপিতার কাছে

অন্ধ মাতাপিতা কাঁদছে আমার
　　বনের ভিতরে
ঘোড়ার পৃষ্ঠ থেকে নেমে রাজা
　　মরা সিন্ধুকে নিল কোলে
হায় কি করিলাম কোথায় গেলাম
　　কার বা নন্দন পেলাম
গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা-সুরাপান
　　যে জন করে
চার পাপের পাপী তারা
　　তাদের পাপের পরিত্রাণ নাই।

পট পরিবর্তন হয়। চতুর্থ যায় অন্তরালে পঞ্চমের প্রকাশ হয়। মৃত সিন্ধুকে কোলে করে রাজা দশরথ ঋষিগৃহে উপস্থিত অন্ধ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী শোকে মুহ্যমান হ'য়ে অভিশাপরত।

আজ মরা সিন্ধু কোলে রাজা
　　যায় মুনির দ্বারে
ঢুঁরিতে ঢুঁরিতে রাজা
　　মুনির দ্বারে এল।
পাতার মড়মড়ি শব্দ
　　মুনির কর্ণে এল
'কে এলি রে বাপ সিন্ধু এলি
　　বল্ না বচন
মা বলে ডাক রে বাছা
　　জুড়াক দুখিনীর জীবন
'একা সিন্ধু নয়—মুনিমাতা
　　রাজা দশরথ
না বুঝিয়া বধেছি মুনি
　　তোমার নন্দন।'

'কি বলিলি-আঁটকুড়ো রাজা
　　কি বেরুলো তোর মুখে'
আকাশ পাতাল ভেঙে পড়লো
　　অন্ধ মুনির বুকে।
মৎস্য চেনে গভীর গম্ভীর
　　পক্ষী চেনে ডাল
মায়ে বসে কাঁন্দে
　　পুত্রহারা যায়
'তোর পুত্র যদি আছে-রাজা
　　নিপুত্র হইবি
পুত্র যদি নাহি রাজা
　　চারি পুত্র পাবি।
পুত্রের বেদন জানবি রাজা
　　যেদিন রামকে দিবি বন।'

ধীরে ধীরে পট পরিবর্তন সুরু হয় গানও চলে—

একজনের মরণ দেখে (রাজা)
　　তিনজনেই মরিল
তিনজনের সৎকার্য রাজা
　　একই চিতায় করিল

নিমকাষ্ঠ চন্দন কাষ্ঠ দিয়ে
　　চিতা সাজাইল
কলসী কলসী ঘৃত মধু
　　ঢালিতে লাগিল

দাহন করে রাজা
ব্রাহ্মণকে করে দান

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে
মুনির গেল প্রাণ

ইতিমধ্যে নতুন চিত্রের উদয় হয়েছে—ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি রাজা দশরথকে যজ্ঞশেষে চরু প্রদান করছেন রাজা পরম ভক্তিভরে তাই গ্রহণ করছেন।

বাপ যার বিভাণ্ড মুনি
মাতা তার হরিণী
হরিণী গর্ভে জন্ম নিল
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি নামে
যজ্ঞ আরম্ভিল

যজ্ঞ না পূর্ণ হ'তে
চরু উঠিল
এই নাও চরু নাও
রাজা দশরথ তোমার নন্দন
এই চরু দান করে (রাজা)
জন্ম নেবে শ্রীরাম লক্ষণ

গান গাইতে গাইতেই পটের শেষ চিত্র উপস্থিত হ'য়েছে রাজা দশরথ সেই চরু রাজমহিষীদের প্রদান করছেন—সন্তান কামনায় উজ্জ্বল রাজমহিষীরা তা' গ্রহণ করছেন পরম পুলকভরে।

চরু নিয়ে গিয়ে রাজা
কৌশল্যার হাতে দিল

সেইচরু কৈকেয়ী, কৌশল্যা, সৌমিত্রী
পান করি নিল
সেইদিন হইতে রাম জন্ম নিল।

এই গান এককভাবে গাওয়া হয়। কোন বাদ্যযন্ত্র নাই।

উপরিউক্ত পটুয়া সঙ্গীতের মাধ্যমে একথা সহজেই বোঝা যায় যে—মাত্র সাতটি চিত্রের মাধ্যমে সিন্ধুবধ উপন্যাসটি বিবৃত করা হয়েছে। একটি চিত্রের সাথে পরবর্তী চিত্রের ঘটনার যে ব্যবধান তা পটুয়া অপূর্ব দক্ষতার সাথে সঙ্গীতের মাধ্যমে পূরণ করে দেয়। দরদী শ্রোতার মনে এই ব্যবধান বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে না।

লক্ষণীয় এই যে—এই সঙ্গীতের মাধ্যমে লোকশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করেছে এবং পৌরাণিক উপাখ্যানাশ্রিত এই শিক্ষা কৌমসমাজে ও সমাজের অন্দরমহলে সহজেই সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়—লোকশিক্ষার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে—

গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট
ঘরের লক্ষ্মী উড়ে যায়।

নিছক লোকশিক্ষা ব্যতীত এই অপ্রাসঙ্গিক ছত্রের সংযোজন মূল্যহীন। পরবর্তী ছত্রে রাষ্ট্রশাসকের সাথে প্রজার সম্পর্ক পরিস্ফুট।

পৌরাণিক পাত্রপাত্রীকে লৌকিক রূপ দেওয়ার জন্যই অন্ধমুনির মুখে অন্-আর্য রীতিসম্মত গালি শোনা যায়—'আঁটকুড়ো রাজা'—অথচ সঙ্গীতে অনেকক্ষেত্রে সাধুভাষার প্রয়োগ দেখা যায়।

পুরুষানুক্রমে এই গান চলে আসছে ফলে গানের কোন কোন অংশ ব্যাখ্যায় পটুয়া নিজেও অসমর্থ। 'বিনন্দের পাগড়ি' 'চৌখসি বন'-এগুলির অর্থ অপরিস্ফুট। হয়ত বা এগুলি কোন মূল শব্দের অপভ্রংশ। অবশ্য এর জন্য অখণ্ড রসসৃষ্টি ব্যাহত হয় না।

সঙ্গীতটি পাঠ করলেই বোঝা যায় যে রচনার ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট রীতি মেনে চলা হয় নি। গায়কের সুবিধামত মাত্রা প্রয়োগ করা হ'য়েছে। কিন্তু গান গাওয়ার সময় পটুয়া একজন নিপুণ গায়কের মত টেনে টেনে মাত্রার ব্যবধান পূরণ করে নেয়। ফলে শ্রোতার ক্ষেত্রে একটি অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীতধারা পরিবেশিত হয়। তবে সঙ্গীত রচনার পদ্ধতি, ভাব, ভাষা ও সুর দেখলে বা শুনলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে বিশেষ কোন প্রতিভাসম্পন্ন গীতিকার বা সুরকারের অবদান নাই। অত্যন্ত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক রীতি অনুসারে সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় এই সঙ্গীতের উদ্ভব।

এই সঙ্গীতের মধ্যে যে বাৎসল্যরস, ভক্তিরস, করুণরস দেখা দিয়েছে তার বিশেষ একটি মানবিক আবেদন আছে। পটুয়া যখন অন্তরের সমস্ত বেদনা বোধ দিয়ে, কণ্ঠে সমস্ত দরদ দিয়ে ভাব গদগদ চিত্তে গান ধরে।

আকাশ অন্ধ মুনির বুকে,
পাতাল ভেঙে পরলো

কিংবা 'মায়ে বসে কাঁদে
পুত্রহারা যায়'

তখন এক দুর্নিবার শোকে শ্রোত্রীমণ্ডলীর চোখ ছলছল করে ওঠে—চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দেখা দেয়। অপত্য স্নেহের যে সার্বজনীন আবেদন—বেদনাবোধের যে সার্বজনীন রূপ তা আর ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না—পটুয়ার বর্ণনপটুত্বে প্রবহমানকালের সোপান বেয়ে শ্রোতৃহৃদয়ের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়। গৃহস্থের একটি লৌকিক রূপ অখণ্ড ভাবসম্পদের সৃষ্টি হয়।

অধিকাংশ পটের শেষে লোকশিক্ষা প্রচারের জন্যই যমপুরীর এক বিভীষিকাময় চিত্র উপস্থাপিত করা হয়। অপরাধপ্রবণ মানুষের মন এই বিভীষিকাময় চিত্র দেখে যদি পাপকার্য হতে বিরত হয়। দেবতার উপর ভয়জনিত ভক্তিভাবেরও উদয় হয়। ভক্তিভাবের এই তামসিকতা, শাস্তিদানের এই বীভৎসতা—দেখেই কৌমজীবনের সাথে এদের যোগাযোগ অনুমান করা যায়। আজও সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। পটুয়া সঙ্গীতে ভণিতায় প্রয়োগও দেখা যায়। সাধারণত ভণিতার ঈশ্বরস্তুতি বা বন্দনাগীতি গীত হয়। যেমন 'নিমাইসন্ন্যাস' সঙ্গীতের সুরু হয়—

'আজি জয় নিত্যানন্দ প্রভু
জয় নিত্যানন্দ
আজ অদ্বৈতচাঁদ ভক্ত গৌর ভক্তবৃন্দ

অথবা 'গোমঙ্গল' সঙ্গীতের সুরু হয়—

নমো দুর্গা নমো নারায়ণী
কৃপা করো দয়া করো
বিপদতারিণী
বিপদে পড়িয়া মাগো
করি যে স্মরণ

তুমি গো মা ভগবতী-আদ্যাশক্তি
জগতের জননী
কৃপা করি দয়া করি দিও মা
তোমার চরণ দুখানি।'

পটুয়া সঙ্গীত মূলত উপাখ্যানাশ্রয়ী তাই বর্ণনাত্মক—ভাবাত্মক নয়। পটুয়াসঙ্গীতের জন্য পটশিল্পের উদ্ভব নয় পটশিল্পের জন্য পটুয়াসঙ্গীতের সৃষ্টি। তাই পটশিল্পের ক্রমাবলুপ্তির সাথে পটুয়াসঙ্গীতের আয়ু কমে এসেছে। কোন শিল্পের উপর নির্ভরশীল না হয়ে যদি এই সঙ্গীত আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারতো তাহলে হয়তো স্থায়িত্ব লাভ করতে পারতো। না হিন্দু না মুসলমান—এই মিশ্র সংস্কৃতির অভিশাপ পটুয়া সম্প্রদায়কে অনিবার্য কারণে বরণ করে নিতে হয়েছে চিত্রশিল্প ও সঙ্গীত দুই সূক্ষ্ম রসের কারবারী হয়েও অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও উচ্চ বর্ণের অবজ্ঞা আর অবহেলা এদের পেশাগত কৌলীন্যকে পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করে নিতে হয়েছে।

বেদের গান

অনার্য বংশোদ্ভূত এই বেদে বা সাপুড়ে সম্প্রদায় বিষাক্ত সাপ ধরে ও সঙ্গীত সহযোগে গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে এই সাপের খেলা দেখিয়ে জীবিকা অর্জ্জন করে। এখনও গ্রামাঞ্চলের এই রীতি প্রচলিত যে সাপুড়ে শ্রীদুর্গা পূজার পর একাদশীর দিন তার সাপের ঝুড়ি নিয়ে প্রতি বাড়ী যাবে ও গান করে সাপের খেলা দেখাবে। দ্রুত তালে ডুগডুগি (ডমরু) বাজে সাপুড়ের উর্ধাঙ্গ দুলতে থাকে—সাথে সাথে দোলে ছোটবড় বিষাক্ত সাপ। এক হাতে ডুগডুগি অন্য হাতে মুঠো বাঁধা। কখনও বা হাঁটু এগিয়ে, কখনও বা মুঠো ঘুরিয়ে সাপুড়ে বিচিত্র সুর ও তালের সৃষ্টি করে। গান খুব টেনে টেনে গায়। কখনও বা মুঠো এগিয়ে দিয়ে বা ডুগডুগির খোঁচা দিয়ে সাপকে উত্তেজিত করে দেয়। ক্রুদ্ধ সাপ ব্যর্থ ছোবল মারে।

এই বেদে সম্প্রদায় সম্পর্কে ডাক্তার নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', পুস্তকে লিখেছেন— 'অন্ত্যজ বর্ণের যাযাবর ডোম-শবর—পুলিন্দ-নিষাদ-বেদে প্রভৃতিদেরই অন্যতম বৃত্তি ছিল সাপ খেলানো, যাদুবিদ্যার নানা খেলা দেখানো ইত্যাদি। সাপের উপদ্রব খুবই ছিল। মনসা পূজাই তাহার অন্যতম সাক্ষ্য। রাজসভায় জাঙ্গলিক বা বিষবৈদ্য অন্যতম রাজপুরুষ ছিলেন। জাঙ্গুলী সাপেরই অন্য নাম। সাপের কামড়ে অনেককেই প্রাণ দিতে হত। সেই জন্য ওঝা বা বিষবৈদ্যদের সমাজে একটি স্থান ছিল। ইহারাই ছিলেন সাপুড়ে। উমাপতি ধরের একটি শ্লোকে সাপ খেলানোর বর্ণনা আছে।' গোবর্দ্ধন আচার্যের একটি শ্লোকেও সাপ নাচানোর বর্ণনা পাওয়া যায়— 'হে সখি, সাপ খেলা দেখিতে দেখিতে তোমার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া মধুরতর দেখাইতেছে। অতএব, কেন তুমি পরের জীবনকে বিপদাপন্ন করিতেছ ? তুমি দূরে সরিয়া যাও, সাপুড়ে প্রাঙ্গণে নির্বিঘ্নে সাপখেলা দেখাক।'

উমাপতি ধর ও গোবর্ধন আচার্য লক্ষণ সেনের রাজ সভার অন্যতম কবি। দ্বাদশ শতকের এই শ্লোকই ইহাদের ঐতিহ্যের কথা প্রমাণ করে।

সাপ মনসা দেবীর বাহন। মনসা পূজা মূলত অনার্য সম্প্রদায়ের। পূজা-পদ্ধতি ও উপচার অবৈদিক। পরবর্তী আর্য সম্প্রদায় ভয়ে এই দেবীকে মেনে নিয়েছে। সাপুড়ের যে গান তাতে মুখ্যত মনসাদেবীর স্তুতি ও মাহাত্ম্য বর্ণনা, বেহুলা-লক্ষিন্দরের কাহিনীই থাকে। তবে সাপুড়েরা তাদের গানকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। ১। মনসাসার, ২। ফুলসার

৩। কৃষ্ণসার ৪। রামসার প্রত্যেক শ্রেণীর গানের দৃষ্টান্ত নিয়ে দেওয়া হ'ল।

মনসাসার : মা মনসার চরণ (৩)

মা মনসার চরণ

বারানখানা ধূলাতে লুটায়

মুর্শিদ রাখে হে জীবন

কার বা সাঁঝ বহি যায়

সাত বোন তারা তখন প্রণাম জানায়।

ফুলসার : মায়ের ফুল তুলিতে যাব গো

ডুবুরারই ফুল নিয়ে মায়ের কাছে দোব গো

শ্বেত আকন্দের ফুল মায়ের কাছে দোব

কত শত ফুল আজ মায়ের কাছে দোব

লালজবার ফুল মায়ের কাছে দোব

শ্বেতকুঁচের ফুল মায়ের কাছে দোব

শ্বেতকরবীর ফুল মায়ের কাছে দোব

শ্বেতপদ্মর ফুল মায়ের কাছে দোব

ও গো মায়ের ফুল তুলিতে যাবো।

কৃষ্ণসার : বিষ ওড়ে কিসে

বেউনী (৪) বাতাসে বিষ ওড়ে

'হরিবল' ব'লে বিষ উড়িতে লাগিল

হে হরি—কি হ'ল?

যা চাইতে বিষ ম'ল

বিষের নাম লীলা

যেখানে খেলি সাপা

সেখানে বিষ ম'ল

—কার দ'য় (৫)

আস্তিক মুনির দ'য়।

রামসার : গুরু ভজিতে প্রাণ যায়

বিফলে মানুষজীবন

আর কি হ'বে-ভাই।

বল মুখে রাম রাম

রামগুণ গাও কি

কৃষ্ণগুণ গাও

হে নারদ মুনি

বদনে রামগুণ গাও।

বেহুলা লক্ষিন্দর উপাখ্যানও গানের মাঝে প্রায়ই শোনা যায়—

'মা বাঁচাও—মা বাঁচাও' বলে (৬)

কাঁদিছে বেহুলা গো

চম্পক নগরী ছিলো লোহার বাসর ঘরে গো।

'মা বাঁচাও.........বেহুলা গো।

বেহুলা কাঁদে পতি শোকে পড়ে ধূলিতে গো

'মা বাঁচাও.........বেহুলা গো।

বিষে অঙ্গ জরজর সোনার লখীন্দর গো

লখীন্দরকে সঙ্গে নিয়ে ভাসে গঙ্গার জলে গো

মা ... ... বেহুলা গো

চম্পকনগররাজ চাঁদ নামে সদাগর

বেহুলা তার পুত্রবধূ স্বামী বালা লখীন্দর গো

ছয় পুত্রে দংশিলে বালার ছয় বৌ করলে রাঁড়ী গো

'মা বাঁচাও ... ... গো

পূর্ব পৃষ্ঠার শেষের গানটি দেখে সহজেই বোঝা যায় এই গানে ধুরার প্রচলন আছে। এই গান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একক, তবে কখনও কখনও যৌথভাবে গীত হয়।

ছাদ পেটানোর গান

এই জাতীয় সঙ্গীতকে ঠিক লোকসংগীতের পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। যে কর্ম বা জীবিকাকে কেন্দ্র করে এই গান—সেই কর্মের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের নয়। এ গানে পল্লীজীবনের ভাবালুতার স্পর্শ নাই। কিন্তু যারা এই কাব্য করে তারা এককালে কোমবদ্ধ জীবনধারায় অভ্যস্ত ছিল। আজও এদের সামাজিক জীবনে আর্যেতর সভ্যতার আদিম রূপটি সুস্পষ্ট। শহরাঞ্চলে নতুন বাড়ী তৈরী হলে ছাদ পেটানোর সময় এদের ডাক পড়ে সাধারণত বাউরী, বাগ্দী শ্রেণীর মেয়েরাই এসে সমবেত হয় এই কাজের জন্য। কাজের গতি ও তালের সাথে সাথে দুলে দুলে বিচিত্র সুরে যৌথভাবে এ গান গায়—কাউকে শোনানোর উদ্দেশ্যে নয়—কিছুটা নিজেদের খুসীর আমেজে কিছুটা কর্মক্লান্তি অপনোদনের জন্য ও নতুন উদ্যম সঞ্চারের জন্য। গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে আদি রসিকতায় হেসে গড়িয়ে পড়ে, গান থামে না। কাজ শেষ হয় গানও থামে। গান ছাড়া একাজের কথা চিন্তা করা যায় না। কাজ যারা করে তাদের মাঝে বর্ষীয়সী মেয়েই প্রথমে গান ধরে—

'কনের মাকে বাইরে শুতে মানা
ওগো ধুমধুমা নাকড়া এসে
করে আনাগোনা।
কনের মাকে ··· ··· ···

সকলে যোগ দেয় এই গানে। কিছুক্ষণ পরে আবার নতুন গান সুরু হয়—

উপর ছাতে দে বাড়ি (৭)।
ছাত ব'সে না রূপায় (৮) কি করি ॥

গানের সাথে এই কাজের এত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক যে এই গানকে প্রকৃত অর্থে work song বা কর্ম সঙ্গীত বলা যেতে পারে।

১। ইটাগড়িয়ার মাসেম চিত্রকরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
২। বাগডোলা গ্রামের কোরবান চিত্রকরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
৩। রদিপুর গ্রামের ভক্তিভূষণ দাসের নিকট হইতে সংগৃহীত।
৪। পাখা ৫। দয়া ৬। রুদ্রনগর গ্রামের ভুলু খলিফার (বেদে) নিকট সংগৃহীত
৭। আঘাত ৮। উপায়।

অন্য নামের ভারতবর্ষ

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

নাম-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শেক্স্‌পীয়রীয় ঔদাসীন্য কিংবা দার্শনিক মিল-এর অনীহা যুগপৎ গভীর অনাস্থা জানালেও একথা অধিকন্তু স্বীকার্য যে, কোনো দেশের জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব কিংবা ঐতিহাসিক ভূ-বৃত্তান্তের খাতিরে স্থান নামের (topographical names) প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত অল্প নয়। সাধারণক্ষেত্রে, ধর্ম ও দৈব চেতনার প্রত্যক্ষ সন্নিধি-হেতু অধিকাংশ ব্যক্তি-নাম গঠিত হয়। এ-ছাড়া, জাতি, আজীবিকা, পদমর্যাদা, প্রাণী, উদ্ভিদ ও সমরকুশলতার পরিচয়-বাহী নানাবিধ পদসম্ভার থেকেও ব্যক্তি-নাম আহৃত হতে দেখা যায়। (তুলনীয়, Most prevalent of the descriptions are those, relating to battle, victory, animals, plants, offices, possessions, race and deities,—A History of surnames of the British Isles. P. 27, by C. L'estrange Ewen) কিন্তু কোনো দেশ অথবা স্থানবিশেষের নাম-করণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে, সেই দেশের ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, ও তৎসংশ্লিষ্ট অধিবাসিগণ। প্রধানত, নদ-নদী কান্তার আর উপজাতির নামেই বিধৃত রয়েছে পৃথিবীর তাবৎ দেশ-জনপদ!

সেই স্মরণাতীত কালেই পৃথিবীদেহে স্থান-বিপর্যয়ের ফলে দক্ষিণ গোলার্ধের ত্রিশ ডিগ্রি অক্ষ রেখার মধ্যে জিহ্বা-সদৃশ যে ভূখণ্ড তিন সাগরের লবণাম্বুরাশি লেহন করে পড়ে রইল, আজকের দুনিয়ায় তার ভারত নামে পরিচয়; কিন্তু যুগে যুগে হরেক নামে তাকে ডাকা হয়েছিল। আর্যদের আগমনের পূর্ব সময়ে অর্থাৎ মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পা সভ্যতার কালে এই ভূভাগের জন-অধ্যুষিত অঞ্চলের কোন অভিধা প্রচলিত ছিল তা এখনও জানা যায় নি। এবং সম্পদ প্রাচুর্য ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতির বিশিষ্টতা হেতু অদ্বিতীয় এই বিশাল দেশটি ইতিহাসের একাধিক কার্যক্রমের সাক্ষী হয়ে থাকলেও আক্ষেপের কথা, অনেকদিন পর্যন্ত কোনো বিশেষ নামের ললামক ওঠেনি এ দেশের ললাট ভাগে। এর কারণ হল বিরাট আয়তন এই দেশটির খুব অল্প অংশই তখনো আবিষ্কারকদের নয়ন সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে যেন সদর দরজাটাই দৃষ্টগোচর হয়েছে, দেহলী তখনো দূর অস্ত!

তবে এ-দেশের আদ্যতন গ্রন্থ ঋগবেদে উত্তর-পশ্চিম ভারতের নদী-মাতৃক অঞ্চলের যে-নাম সর্বপ্রথম উল্লেখিত হল, তা' 'সপ্তসিন্ধু'। 'য ঋক্ষাদংহসো মুচদ্ যো বার্য্যাৎ সপ্তসিন্ধুষু' (ঋগ্বেদ. ৮. ২৪. ২৭) আবেস্তার বেন্দিদাদে সপ্তসিন্ধু-র কাছাকাছি শব্দ 'হপ্তহিন্দু' ঐ একই জমি-জিরেতকে বুঝাতো। প্রাচীন চীনদেশও সিন্ধুবিধৌত ঐ অঞ্চলের নাম দিয়েছিলো—'সিন্-তু' (Shen-tu, or H sien-tou)। ঋক্‌-সংহিতা কিংবা ইতিহাস-গ্রন্থ ব্যতিরেকে পাষাণের বুকেও এদেশের নাম লেখা হয়েছে অন্য আখরে—পার্সিপোলিসের বিখ্যাত শিলালেখে কিংবা নাক্স্-ই-রুস্তমের প্রস্তরপটে 'মচিয়া, অরবায়, গন্দার হিন্‌দুস্=Maxeyes, Arabia. Gandaria, India [=Valley of the

Indus] '(Persepolis Inscription of Khsahayarsha = Xerexes. C. 486-65 B. C.)' তবে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ইল্লিখিত 'ইন্দিয়া' বা 'পারসীক সাম্রাজ্যের বিংশতিতম 'প্রদেশ' এক বিস্তৃততর অঞ্চলের মর্য্যাদা পেতে শুরু করলো। কারণ, গ্রীক ইতিহাস-লেখক সেই ভারতবাসীদের কথা বলেছেন, যারা পারস্য থেকে অনেক দূরে—বেশ দক্ষিণে বাস করত, আর সম্রাট দারায়ুস যাদের কেশাগ্রও ছুঁতে সাহস পান নি। এথেকেই বোঝা যায়, সিন্ধুর কূল ছেড়ে ভারতভূমির সীমানা তখন আরো বর্দ্ধিত হয়েছে। অবশ্য আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের অব্যবহিত পরে 'ইন্দিয়া'-র পরিসীমা আরো বেড়ে গিয়ে এক চতুর্ভুজাকৃতি স্থান-বিশেষকে নির্দেশ করল; মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ-কথা অনুসারে যার পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্ত সমুদ্র রেখায় বোনা, উত্তরভাগে 'হেমোদোস' পর্বত বহুবাহু হয়ে বাধা দিচ্ছে শকস্থানের অনধিকার প্রবেশ, আর পশ্চিম দিকে সিন্ধুনদ নাচছে শততরঙ্গ-ভঙ্গে। ভারতবর্ষের এই সীমা-সঞ্চারণ আরো চলিষ্ণু হয়েছিল টলেমি-র ভূ-বৃত্তান্তে। তিনি সিন্ধু অববাহিকাকে তো নিয়েছেনই, প্রাগ্রসর হয়ে গঙ্গোত্তর ভূমিকেও (India Extra Gangem) গ্রহণ করলেন 'ইন্দিয়া' নামের গভীরে।

তারো আগে সূত্র সাহিত্যের যুগে (আনুমানিক ৫০০ খৃঃ মুঃ—৫০ খৃঃ পূঃ) সিন্ধু উপত্যকার সুজল সুফল ভূমিভাগ ছেড়ে অভিযাত্রী আর্য-সন্তান সুদূরের পিয়াসী হ'ল। উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয়, দক্ষিণে পারিযাত্রের (বিন্ধ্যপর্বতের) পার্বত্য সীমানা, পশ্চিমে বিনশন—যেখানে মরুপথে হারিয়ে গেয়েছে সরস্বতী নদীর ধারাপ্রবাহ, এবং পূবে কালকবন বা প্রয়াগ—এই চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দীভূমি যখন মৌন আবেদন জানাল—ডাকো নতুন নামে, তখন বোধায়ন ও বশিষ্ঠ তাঁদের ধর্মশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে একটি নতুন নামের দীপশিখা জ্বাললেন—'আর্য্যাবর্ত'—'আর্য্যাবর্তঃ প্রাগাদর্শাৎ প্রত্যক্ কালকবনাৎ উদক্ পারিযাত্রাৎ দক্ষিণেন হিমবতঃ। উত্তরেণ চ বিন্ধ্যস্য।' (বাশিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্রম্ ১।১।৮-৯ এ, এ, ফ্যুরার সম্পাদিত, পুণা, ১৯৩০) কিংবা যথা 'প্রাগদর্শনাৎ প্রত্যক্ কালকবনাদ্ দক্ষিণেন হিমবন্তজুকক্ পারিযাত্রমেতদার্যাবর্তং তস্মিন য আচার স্ম প্রমাণম্' (বৌধায়নধর্মসূত্রম্ ১।১।২৫ ; এল. শ্রীনিবাসাচার্য্য সম্পাদিত, মহীশূর ১৯০৭) মানবধর্মশাস্ত্র অবশ্য বোধায়ন ও বশিষ্ঠ উল্লিখিত অঞ্চলের নাম দিয়েছে—'মধ্যদেশ' 'হিমবদ্ বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং প্রাগ্-বিনশনাদপি। প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥' (মানবধর্মশাস্ত্রম্ ২।১।২১, (জি, সি, হাফটন সম্পাদিত, লণ্ডন, ১৮২৫)। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে মনুর 'আর্যাবর্ত' দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে আরো অনেক বড়ো। তার পূবে ও পশ্চিমে দুটি সমুদ্রের বিপুল বিস্তার, আরো উত্তর এবং দক্ষিণ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই পর্বত—বিন্ধ্য ও হিমালয়ের স্তম্ভিত প্রশান্তি। 'আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদা-সমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ। ওয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্তং বিদুর্বুধাঃ' (তদেব, ২।১।২২)। সুতরাং আর্যজাতির বিক্রম-সূর্য তখনো বিন্ধ্যপর্বতের ওপারে হেলতে সাহস করে নি। দক্ষিণ তখনো অ-দক্ষিণ রয়ে গিয়েছে। আর্যরা তখনো যে আবর্তে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন তার নাম—আর্য্যাবর্ত। আজকের ভারতবর্ষ আকৃতিতে আরো অনেক বড়ো।

তারপর আর্যাবর্তের ভূম্যধিকার যখন আরো বিতত হ'ল, তখন সত্যই একটি 'Comprehensive designation'-এর তক্‌মা জুটলো এদেশের শিরোভাগে। এ-নামের ব্যাপ্তি

পর্বতপতি হিমালয়ের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ভারত সাগরের উপকূলে। অশোকের শিলালিপিতে তাঁর সাম্রাজ্যের পরিচয়বাহী এই নামের অক্ষরকটি—'জম্বুদ্বীপ'। 'ইমায় কালায় জংবুদ্বীপসি হুসুতে দানি অমিসা দেবা মিসকাটা' (মাইনর রক এডিক্ট—(১) রূপনাথ ভার্সন, পংক্তি ৪।৫)। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজক ই-ৎসিং-ও অশোকের রাজ্যের উল্লেখ করেছেন ঐ একই নামে। কিন্তু হিন্দু পুরাণ ও মহাকাব্যগুলোতে জম্বুদ্বীপ শব্দটির অন্যতম ভৌগোলিক অবস্থিতি লক্ষিত হয়। উক্ত মতে, পৃথিবী সাতটি বলয়াকার দ্বীপ নিয়ে গঠিত; আর ওই সাতটি দ্বীপকে জড়িয়ে আছে সাতটি ভিন্ন সমুদ্র! 'জম্বুদ্বীপ' তাদের অন্যতম। পৌরাণিক জম্বুদ্বীপের আর একটি নাম 'সুদর্শনদ্বীপ'। এর উৎপত্তি বিষয়ে মৎস্য পুরাণ বলছে সৃষ্টির আদি থেকেই সুদর্শন নামে এক জম্বু বৃক্ষ ছিল। সেই বনস্পতির নামেই এই জম্বুদ্বীপ আখ্যাত হয়েছে। মহাভারতেও প্রায় একই কথা 'সুদর্শনো নাম মহান জম্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ। তস্য নাম্না সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপো সনাতনঃ।' (মহাভারত ভীষ্মপর্ব, ১৯-২০, রামচন্দ্র শাস্ত্রী সম্পাদিত, পুণা ১৯৩০। এছাড়া 'বিনয়পিটক' ও নিকায় গ্রন্থগুলিতে এবং পরবর্ত্তীকালের 'বিসুদ্ধিমগ্‌গ ও অত্থসালিনী' নামক কয়েকটি পালি গ্রন্থেও জম্বুদ্বীপের সৃষ্টিমূলে জম্বুবৃক্ষের উপকাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। চাইল্ডার্স অবশ্য তাঁর পালি অভিধানে মন্তব্য করেছিলেন যে, সিংহলদ্বীপের সঙ্গে একযোগে জম্বুদ্বীপ উল্লিখিত হলেই ধরে নিতে হবে, জম্বুদ্বীপ বলতে উপমহাদেশীয় ভারতবর্ষকেই বুঝিয়েছে। কিন্তু ডঃ বিমলাচরণ লাহা এই মতকে খণ্ডন করে বলেছেন—'It is difficult to be definite on this Point'২

তবে জম্বুদ্বীপ'কে একেবারে বর্তমানে পরিচিত ভারতবর্ষের সঙ্গে একাঙ্গ করা যায় না। জম্বুদ্বীপ বোধ হয় উত্তর ও মধ্য এসিয়া জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এরূপ অনুমানের কারণ হচ্ছে, পৌরাণিক ও বৌদ্ধ-সাহিত্যের প্রাচীন অংশে এই দ্বীপকে যে নয়টি বর্ষে ভাগ করা হয়েছে তাদের অন্যতম ছিল ভারতবর্ষ। সুতরাং আর্যদের আগেকার দিনের বিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপ খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকেই বোধহয় অশোক-শাসিত ভারতের সঙ্গে সমান পদবী লাভ করেছিল। জম্বুদ্বীপের পরে এদেশের ভৌম-আকৃতির ফ্রেমে যে নামটি যথাযথ এঁটে গেলো সেটি তার স্বনামে অধুনাপি প্রোজ্জ্বল। জম্বুদ্বীপের দক্ষিণতম বর্ষের নাম যে 'ভারত,' তা যেমন মহাকাব্য ও পুরাণের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যাচ্ছে; তেমনি বৌদ্ধ গ্রন্থারাজিতে সমান মর্য্যাদায় উল্লিখিত। 'ভারতবর্ষ' নাম করণের সার্থকতা খুঁজতে গিয়ে পুরাণ ও মহাভারত থেকে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ মিলেছে তার সংক্ষিপ্তসার এই রকম: স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ছিলেন রাজা প্রিয়ব্রত। তাঁর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ রাজা ভরত স্বীয় নাম অনুসারে রাজ্যের নাম দিয়েছিলেন ভারতবর্ষ। 'হিমাবহং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় ন্যবেদয়ৎ। তস্মাত্তদ্ ভারতং বর্ষং তস্য নাম্না বিদুর্বুধাঃ॥' (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ৩৪, ৫৫) জৈন গ্রন্থ 'জম্বুদিপ-পন্নত্তি'-তেও অল্পবিস্তর একই কাহিনী পরিবেশিত। কোনো কোনো পুরাণে উল্লিখিত অন্যতর উপাখ্যানে দেখা যায়, প্রজাকুলের ভরণ-পোষণ করতেন বলে মনুর অন্য নাম ছিল ভরত। পদ-পরিবর্তনে তাঁর রাজ্যের নাম হল 'ভারত'। অবশ্য পুরাণ থেকে একাধিক সাক্ষ্য-শ্লোক উদ্ধার করে ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর সুপরিচিত জাতিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মন্তব্য করেছিলেন—
...It is Perhaps not unreasonable to suggest that the name of the Country,

South of the Himavat was derived not from 'the mythical Bharata' of the Puranas, but from 'the historical Bharata tribe' which Plays so important a part in Vedic and Epic tradition" (Studies in Indian Antiquities, Part 11, P. 79) 'ভারতবর্ষ' নামের মূলে 'ভারতী প্রজা' কিংবা ভারত রাজার অবদান যাই থাক না, উপমহাদেশের পরিচয়বাহী এই শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে দ্বিতীয় শতকেই। কেননা, এই নামটি কলিঙ্গরাজ প্রথম খারবেল-র হাতীগুম্ফা শিলালিপিতে বিশেষরূপে উল্লিখিত 'দসমে চ বসে দংড সংধীসামময়ো (?) 'ভরধবস' পটানং মহীজয়নং কারাপয়তি।' (Hathigumpha cave Inscription of Kharavela) এবং এই কালেই পৌরাণিক 'জম্বুদ্বীপ' তার ব্যাপক আধিপত্যের সীমানা কমিয়ে এনে ভারতের সম-পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

পুরাণগুলো থেকে যে-পর্যাপ্ত ভৌগোলিক তথ্য আহৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, এই পৃথিবী নটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এবং পুরাণকর্তাদের মতে, নবমখণ্ডটির নাম ছিল 'কুমারীদ্বীপ'। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী মনে করতেন, পৌরাণিক কুমারীদ্বীপই আসলে বর্তমানের আদত ভারতবর্ষ। এই মতটি সংগ্রহ করে পরবর্তী এক গ্রন্থকার লিখেছেন—'The ninth dvipa i. e., Kumari or Kumarika is described to be surrounded by sea and to have been inhabited by the Kiratas, at the eastern extreme and the Yavanas at the western, with the Brahmanas, Ksattriyas Vaisyas and sudras thrown within The Kumari dvipa thus seems to be identical with India proper.' (Geographical Essays, Vol. I, p 121-B. C. Law) এই সব বিশিষ্ট অধিবাসির নিবসতিহেতু কুমারীদ্বীপ যদিও 'India proper' এবং সমভূমি, তথাপি তার নাম যশ বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। 'ভারতবর্ষ'ই এ-গৌরব অধিকমাত্রায় ছিনিয়ে নিয়েছে।

অবশ্য বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাগোবিন্দসুত্তন্তে' এ দেশের অধিক পরিচিত দেশী নাম দু'টি 'জম্বুদ্বীপ' এবং 'ভারতবর্ষ' একেবারেই উল্লিখিত হয় নি। পক্ষান্তরে এই গ্রন্থটিতে জনঅধ্যুষিত অঞ্চল-মাত্র 'পঠবি'—অনেকটা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'পৃথিবী' শব্দটির মত। কৌটিল্য বলেছেন, দেশ বলতে 'পৃথিবী'কেই বুঝায়, যেখানে হিমবান্ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত একই সম্রাটের অধিকৃত রাজ্য বিস্তৃত। এর মধ্যে উত্তর অঞ্চলটিই হাজার যোজন জুড়ে ছড়িয়ে আছে। 'দেশঃ পৃথিবী। তস্যাং হিমবৎ-সমুদ্রান্তরমুদীচীনং যোজনসহস্রপরিমাণমতির্যক চক্রবর্তীক্ষেত্রম। তত্রারণ্যো গ্রাম্যঃ পার্বত ঔদকো ভৌমঃ সমো বিষম ইতি বিশেষাঃ।' অর্থশাস্ত্র, ৯, অধিকরণ, ১, অধ্যায় ১৭-১৯ সূত্র : আর. পি, কাঙলে সম্পাদিত, বোম্বাই ১৯৬০)। যদিও প্রদেশের উত্তরাঞ্চল সম্পর্কে কৌটিল্যের ভৌগোলিক জ্ঞানের সম্যক অভাব ছিল বলে অনেকে মনে করেন 'We have already seen that Kautilya had no knowledge of the extreme north and the distant parts of she Himalayas though expressions like 'Himavata' and 'Haimavata' occur several times in his work."—The Geography of Kautilya by Harihar. V. Trivedi'। তথাপি সহস্র যোজন ব্যাপী প্রশস্ত উত্তরাঞ্চল ও সঙ্কীর্ণ দক্ষিণদেশ [কৌটিল্য অবশ্য এ কথাটি উল্লেখ করেন নি] নিয়ে

সার্বভৌম নরপতি শাসিত যে দেশ তাকে তিনি 'চক্রবর্তীক্ষেত্র' নামে অভিহিত করলেও, সেই স্থানকে ভারত ব্যতীত অন্য কোনো দেশের আকৃতিগত সাদৃশ্যের মধ্যে আনা যায় বলে আমাদের মনে হয় না। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখতে হবে অর্থশাস্ত্রে দক্ষিণাঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্যাদির অধিক উল্লেখ পাওয়া যায় বলেই উত্তর ভারতের ভূগোল সম্পর্কে কৌটিল্যের কোনো জ্ঞানই ছিল না, এ সিদ্ধান্ত কোনো ক্রমেই যুক্তিসহ হতে পারে না।

এ-পর্যন্ত আলোচিত বৈদেশিক নামগুলি বিশ্লেষণ করলে বুঝা যাবে ভারতবর্ষের ভূ-প্রকৃতি এ বিষয়ে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। পক্ষান্তরে এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্মরণ করে দেশান্তরের লোকেরা গুটিকয় অভিধা-বচন তৈরী করেছেন, এ নজীরও দুর্লভ নয়। মুসলমান ভারত-পথিকেরা তাঁদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কিংবা দলিল দস্তাবেজে যে-নাম উল্লেখ করেছেন তার অধিকাংশই যেন আমাদের ধর্মীয় কিংবা সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিরচিত। এ-দেশের সর্বপ্রাচীন চৈনিক অভিধা 'সিন্-তু' তা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। এই নামটি ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হল 'তিএন-চু' (Tien-chu) তে। 'তাউ যুগে' অবশ্য চীনের প্রাচীরের ওপার থেকে আরো একটি নাম উপহার পেল ভারতবর্ষ। সে-টি 'য়িন্-তু' (Yin-tu)। বুদ্ধদেব যেদিন জন্মেছিলেন সেদিন আকাশে ইন্দু-বিভা। ক্রমে ইন্দু হল বুদ্ধ-প্রতীক। তারপর একদিন ত্রি-শরণ মন্ত্র কানে নিয়ে চীনারা তথাগতের দেশকেও ডাকলো ইন্দু নামে। 'য়িন্-তু' তারই সহজ রূপ। পরবর্তী যুগে আর্যদেশ রূপান্তরিত হল 'অলি-য়-তি-শ' (Ali-ya-ti-sha) তে। 'পো-লো-মেন-কুয়ো' (Po-lo-men-kuo) এবং 'ফান্-কুয়ো' (Fan-kuo) বা 'ব্রহ্মারাষ্ট্র' নামেও পরিচিত হল ভারতবর্ষ। এছাড়াও, 'ভু-তিএন' (Wu-tien) বা 'পাঁচ প্রদেশের ভারত', 'সি-ফাঙ্' (Si·fang) কিংবা 'পশ্চিমের দেশ ও 'ইন্দ্রবর্ধন' প্রভৃতি নামাবলীও ভারতের ভাগ্যে সেটে গেলো। এই সমস্ত চীনী নামকরণের একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'পো-লো-মেন-কুয়ো' এবং 'ফান কুয়ো' নাম দুটি নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তৎকালীন সূত্র-সাহিত্যেও ভারতবর্ষের 'ব্রহ্মর্ষিদেশ' নামটি পাওয়া গিয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে ভারত চীনদেশের পশ্চিম দিকের দেশ এ কথা কারুর অবিদিত নয়। 'সি-ফাঙ্' উক্ত ধারণার ফলশ্রুতি। 'ভু-তিএন' নামটি ভারতবর্ষের সে-কালীন আঞ্চলিক বিভাগকে লক্ষ্য করে বিরচিত। অথর্ববেদের কাল থেকেই এই দেশ মোট পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা'য় এই সমস্ত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যমণ্ডলীরও বিশদ উল্লেখ রয়েছে। সংহিতায় উল্লিখিত ধ্রুবা মধ্যমা প্রতিষ্ঠা দিশ, প্রাচীদিশ্, উদীচী দিশ্, প্রতীচী দিশ্ এবং দক্ষিণা দিশের একত্রিত সংজ্ঞা চীনাভাষার 'ভুতিএন' বা পাঁচ প্রদেশের ভারত।

মুসলমান আধিপত্যের ক্রমবিস্তারের সঙ্গেই আগন্তুকেরা ভারতবর্ষের আর একটি নাম দিলেন। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ও তাদের ধর্মমতকে অবলম্বন করেই নামটি গড়ে উঠলো 'হিন্দুস্থান'। এই নামটির প্রথম দৃষ্টান্ত বোধ করি, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর রাজাদের শিলালিপিতে অক্ষরাবদ্ধ—'পররাজভয়ঙ্করঃ হিন্দুরায় সুরত্রাণো বন্দিবর্গেন বর্ণ্যতে।' (সত্যমঙ্গল তাম্রপত্র ; এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ভল্যুম-৩ পৃঃ ৩৮)

এ আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীত হল যে, এ-দেশের সব কটি নামই এমন কিছু আচম্বিত সৃষ্টি নয়, বরং এই উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক তথ্য-সংক্রান্ত গভীর অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি। যুবতিজনের রাতুল পায়ের ছোঁয়ায় যদি অশোক ফুল ফোটে, তবে এই রূপকল্পটির অনুসরণে বলবো—কুমারী মাটিতে আগন্তুকদের ক্রমাভিসারী চরণ স্পর্শেই এই দেশের নতুন নামগুলো একটি একটি করে ফুটে উঠেছিল। অথচ আজকের ব্যবহারিক প্রয়োজনে আমরা মাত্র দুটি নামকেই প্রচল রেখেছি। একটি তার দেশী—'ভারত'; অন্যটি আলেকজাণ্ডারের সঙ্গিদলের উপহার—ইণ্ডিয়া।

১. Select Inscriptions p. 12 ed. by D. C. Sircar
২. Historical Geography of Ancient India, p. 9 by B. C. Law
৩. Select inscriptions, ed by D. C. Sircar
৪. Indian Culture, vol. I, No, 2

কমাণ্ডার পল ফ্রেজিয়ার লিখিত 'Antarctic Assault' গ্রন্থটি দক্ষিণমেরু বিজয়ের আধুনিক ইতিহাস। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষে (১৯৫৭-৫৮) বিশ্ববিজ্ঞানীগণের দক্ষিণমেরু অভিযানের প্রাক্-পর্বে বিভিন্ন ঘাঁটি স্থাপনা ইত্যাদি নানাবিধ প্রস্তুতি পর্বে কমাণ্ডার ফ্রেজিয়ার দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীর সর্বশেষ সীমান্তে পল কমাণ্ডার প্রচণ্ডতম প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে দক্ষিণমেরুর মুখোমুখী হয়েছিলেন—সেখানকার প্রতি মুহূর্তের রহস্যময়তা বর্তমান গ্রন্থে আকর্ষণীয় ভাবে চিত্রিত হয়েছে। যাঁরা অভিযানপ্রিয় এবং বিশেষত দক্ষিণমেরু সম্পর্কে উৎসাহী, তাঁদের কাছে বর্তমান গ্রন্থের অভিজ্ঞতাময় বিবরণীর আবেদন অসামান্য। গ্রন্থটি আলোকচিত্রে সুশোভিত এবং যে সরস প্রকাশ মাধ্যমে উপস্থাপিত তাতে সাধারণ পাঠককেও অনায়াসে চিরবরফের রাজ্যে সহজে টেনে নিয়ে যায়। লেখক দক্ষিণমেরুর রহস্য-শিহরণ প্রত্যক্ষ করেছেন—এক দুর্বার আকর্ষণে অকল্পনীয় পরিশ্রমীর ভূমিকায় অভিযানের অংশ গ্রহণ করেছিলেন—গ্রন্থটির প্রতি ছত্রে দুঃসাহসিক অগ্রগমণ পরিণামরমণীয় জয়ের আনন্দে রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান-অভিযান সাহিত্যে, বিশেষত মেরু-সাহিত্যে কমাণ্ডার ফ্রেজিয়ারের আলোচ্য গ্রন্থটি অভিযানপ্রিয় পাঠকের দৃষ্টি এড়াবার নয়।

১৯৫৭-৫৮ সালে দক্ষিণ মেরুর সাফল্যজনক অভিযানকে কেন্দ্র করে সম্প্রতিকালে নানা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। প্রণয়নকারীগণ অবশ্য অধিকাংশই উক্ত অভিযাত্রীগোষ্ঠীর সদস্যভুক্ত। এঁরা এঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, অভিজ্ঞতার আলোকে চির অপরিচিত চির তুষারের দেশ সম্পর্কে যে বহু অজ্ঞাত, নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য ও চিত্রী ভূমিকায় মেরু মহাদেশের যে সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন তা উৎসাহী পাঠক মহলে পর্যাপ্ত আগ্রহের সঞ্চার করছে। এঁদের রচনার বিশুদ্ধ উপকরণে অভিযান-ভ্রমণ সাহিত্য মেরু-সাহিত্যের-অন্যতর এক শাখার সূচনা হয়েছে।

বর্তমান প্রসঙ্গে ডঃ কার্ল একলুণ্ড ও জোয়ান বেকম্যানের 'ANTARCTIKA' গ্রন্থটিও উল্লেখ করা যেতে পারে। শুধুমাত্র ১৯৫৭-৫৮ সালের আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বৎসর উপলক্ষে নয়, বিগত দ্বিতীয় মহাসমরের সময় থেকেই দক্ষিণমেরুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত লাভ করেছিলেন ডঃ কার্ল একলুণ্ড। ডঃ একলুণ্ড একজন সুবিখ্যাত জীববিজ্ঞানী—চির তুষারের দেশে প্রাণের স্পন্দন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ স্বাভাবিক হলেও প্রাকৃতিক জীবনের স্পন্দন, বরফের বুকে জীবনের রঙ বদলানো তাঁর চোখকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। তাঁর গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক নানা তত্ত্বও তথ্যের পাশাপাশি তাঁর কল্পনাবিলাসী মানসিকতা সেই আশ্চর্য চির সৌন্দর্যকে সুন্দররূপে পাশাপাশি এঁকে গেছেন। দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে ডঃ একলুণ্ডের গ্রন্থখানি নানা জ্ঞাতব্যবিষয় সমৃদ্ধ। সর্বমোট তেরোটি পর্বে দক্ষিণমেরুর জীবন-স্পন্দনকে তিনি একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন আলোচ্যগ্রন্থে।

দক্ষিণমেরুর প্রকৃত চরিত্র অন্বেষণকারীদের কাছে ডঃ একলুণ্ডের গ্রন্থখানি অত্যন্ত সহায়ক বলে বিবেচিত হবে। মার্কিন বিজ্ঞানী লরেন্স এম. গুড গ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছেন : 'The book is not only a first rate account of our present scientific knowldge of Antarctica, but also much more. Here the real significance of present and future Antarctic research in relation to the world of science is clearly set forth. Here it is made clear that there is no major field of geophysics which does not need information derived from Antarctica.'

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

ANTARCTIC ASSAULT by commander paul W. Frazier, usn. Dodd, Mead & Co.Newyork. 1969

ANTARCTICA—by Carl R. Eklund and Joan Beckman. Holt, Rinehart and Winston, Inc., New york. 1963

কবিতার পীড়ন

আধুনিক বাংলা কবিতা প্রসঙ্গে কোন-কিছু মন্তব্য করা মানেই ভিমরুলের চাকে ঢিল মারা। এর আপাত ফল যে অনিবার্য দংশন, তা জেনেও কিন্তু নিরস্ত হতে পারি নি, চোখ বুঁজেই ঢিল ছুঁড়ে দিলাম পরিণাম ফল যা-হয় হোক। পূর্বাহ্ণেই সবিনয়ে জানিয়ে রাখি—আমার যা-কিছু মন্তব্য, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার ভাব-ধারণা বা চিন্তার আধুনিক অভিনবত্ব কিংবা মৌলিকত্বের বিরুদ্ধে নয়। বাংলা কবিতা যে ইতিমধ্যেই ভবিষ্যত আরো কয়েক শতাব্দীর মানস চিন্তার দিশারী বলে কারো কারো দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, সেই সমর্থনের বিরুদ্ধে নয়। আমার মন্তব্য এই সব অভূতপূর্ব কাব্য ভাবনার বাহক যে বিচিত্র ভাষা যা অধুনা বাংলাভাষা বলে চলছে—যে ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে আধুনিক কবিরা কাব্য লিখে চলেছেন, সেই বিচিত্র ভাষার বিরুদ্ধে। এ কী বাংলা ভাষা! মাত্র কয়েক বছর আগেও এমন বিচিত্র বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। নাকি আমিই বাংলা ভাষা ভুলে গেছি! শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত অমূল্যবিদ্যাভূষণ মশায়, শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী—যাদের কাছে ছাত্রাবস্থায় কিছু কিঞ্চিত বাংলা ভাষার পাঠ গ্রহণ করেছিলাম, তারা কি আমায় ভুল বাংলা শিখিয়েছিলেন? তাই যদি না হয়, তবে এ অভাগা আধুনিক বাংলা কবিতা বুঝতে পারে না কেন? এই কবিতাগুলো কি বাংলায় লেখা, বোধ-বুদ্ধির মধ্যেই এমন কোন গলদ আছে, যার জন্যে আমার কাছে কিছু কিছু আধুনিক কবিতা একেবারে 'গ্রীক'! আধুনিক কবিতাগুলো পড়ে দেখি, অক্ষরগুলো বাংলাই বটে অতএব শব্দগুলোও তাই, তার অনেকগুলোই অভিধানে পাওয়া যায়, কিন্তু কবিতার একটা চরণও পড়ে মানে বুঝতে গেলেই দাঁতি লাগবার উপক্রম হয়, এর কারণ কি? শব্দগুলো পঙক্তিতে কেন ভবিষ্যুক্ত হয়ে, সার সার বসে আছে ঠিকই কিন্তু বেশ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে দেখা গেল,—ওহো! এর মধ্যে গোটাকয়েক শব্দ অনাহুত এবং আরো বেশ কয়েকটা রবাহুত; দু একটা পঙ্গু, বিকলাঙ্গও আছে। যেহেতু কবিতার ভোজে পাতা পড়েছে, সেই হেতু এরাও আসন জাঁকিয়ে বসে গেছে। কাব্যক্রিয়া-কর্মের আসরে এরা যে অপাঙক্তেয় তাতে এদেরও যেমন হুঁস নেই, তেমনি কবি নামধারী কর্তাটিরও লক্ষ্য নেই, কিংবা সহৃদয় কবিকর্তার সবাইকে ডেকে এ-এক শ্রীক্ষেত্রের আয়োজন। কবিতার লঙ্গরখানায় গণ্ডে পিণ্ডে গিলে, যা কবি মহাশয় তাদের গিলিয়েছেন, হতভাগা শব্দগুলো সে বস্তু উদ্গীরণ করে, তাতে কবিতার অঙ্গন ক্লেদাক্ত, পিচ্ছিল। লঙ্গরখানার উদ্দেশ্য মহৎ হলেও পরিবেশ কখনই উপভোগ্য নয়—উচ্ছিষ্ট ছেঁড়া পাতা আর ভাঙ্গা গেলাসের ছড়াছড়ি; কে খেলো আর না খেলো, আর কে খাওয়ালো সেটাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বিরাট কিছু হল এই ভেবেই, সকলেই গদ গদ—ফলে কর্ণপটাহ বিদীর্ণকারী সমবেত জয়ধ্বনি।

আধুনিক কবিতা পড়তে গিয়ে সব প্রথম এই অবস্থাটাই চোখে পড়ে। আধুনিক কবিতায় ভাষা ব্যবহারে একটা জিনিস প্রথম দৃষ্টিতে বেশ চমকপ্রদ আর অভিনব মনে হয়। সেটা হচ্ছে, কবিতার প্রত্যেকটি শব্দ চূড়ান্তভাবে স্বাবলম্বী, যেন নিরেট স্বাতন্ত্র্যবোধ পুষ্ট। এরা ইদানীংকালে ব্যাকরণের থোড়াই কেয়ার করে। অনুদ্গত দন্ত পাঁচ-মেসে শিশু যেন হঠাৎ বন্দুক ঘাড়ে করে কুচকাওয়াজ শুরু করে দিয়েছে। ব্যাপার দেখে মনে হয়, অতঃপর বাংলা ভাষায় ব্যাকরণের বিধিনিষেধগুলোর চোখরাঙানি, আধুনিক কবিদের কাছে নিতান্তই 'জ্যাঠামি' বলে গণ্য হতে থাকবে। কবি-কর্মে ছন্দ যেমন কবিতার স্বাভাবিক গতি বিরোধী বলে কোনো কোনো মহলে ধিককৃত হয়েছে, সেই রকম ব্যাকরণেরও ওই রকম সব মহৎ দোষ আছে বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে ব্যাকরণ বিযুক্ত কবিতাবলীর অভিব্যক্তি এক অনন্য সৃষ্টি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে আসর জাঁকিয়ে বসবে বলে অনুমান হয়। আধুনিক কবি মহলে তারই প্রস্তুতি ও কর্মচাঞ্চল্য যে বেশ সরব হয়ে উঠেছে, তা যে-কোনো পত্র পত্রিকার কবিতা পড়তে গেলেই কানে যাবে। বাংলা সাহিত্য সংগ্রহে এই রকম কবিতার আপাতমূল্য কি, আর ভবিষ্যত লাভই বা কি পরিমাণ হবে, তার একটা হিসাব নিকাশের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। ব্যাকরণ বিমুক্ত শব্দ সর্বস্ব এই রকম একটা কবিতার উদাহরণ নিয়ে খতিয়ে দেখলে হিসাবটা বেশ পরিষ্কার হবে বলে মনে হয়। বাংলা সাহিত্যের লাভ লোকসানের খাতিরে আমাদের তা করতেই হবে। একালের এক সুখ্যাত পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় মুদ্রিত একটি আধুনিক কবিতার একটা চরণ নিয়েই আরম্ভ করা যাকঃ "এখন সাহেব বাড়ির পার্টিতে আমি ফরিদপুরের ছেলে ভাল পোষাক পরার লোভ সমেত কাদামাখা পায়ে কুৎসিত শ্বেতাঙ্গিনীকে দু-পাটি দাঁত খুলে আমার আলজিভ দেখাই।' এ ক্ষেত্রে মনে হয় কবি সম্ভবতঃ কিছু বুঝে তাঁর পাঠককে কিছু বোঝাতে চাইছেন। আবার এও হতে পারে, কবি কিছু না-বুঝেই কিছু বোঝাতে চাইছেন এবং পাঠকও কিছু না-বুঝেই কিছু বোঝবার আপ্রাণ চেষ্টা করে গলদঘর্ম হচ্ছেন। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, রাম বুঝাচ্ছে শ্যাম বুঝতে চাইছে না আবার শ্যাম বুঝতে চাইছে, রাম বোঝাতে পারছে না। গোলমালের কিছু নেই। অর্থাৎ হ য ব র ল। কবিতার ওই একটা চরণের শব্দের ভিড়ে কবি এবং পাঠক ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে মরছে—নানারকম অভিনব প্রত্যয়বোধের মনগড়া অন্তর্নিহিত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও। ব্যাকরণ যে একটা ভাষার জীয়নকাঠি এ কথা একটা স্কুলের ছাত্রও বোঝে কিন্তু এই সব তথাকথিত উগ্র আধুনিক কবিরা বোঝেন না বা বুঝতে চান না।' ইঞ্জিনে অগ্নিজলের বাষ্প না থাকলে রেলগাড়ি যেমন চলে না, তেমনি ভাষাতেও ব্যাকরণের বেগ না-থাকলে ভাষাও অনড়। তবে যদি ইঞ্জিনবিহীন রেল কামরায় পদ্মাসনে ধ্যানস্থ হয়ে কেউ কল্পনায় দিল্লী, আগ্রা ঘুরতে থাকলে বলবার কিছু নেই।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ব্যাকরণের দায়মুক্ত এই রকম সব শব্দের নির্বিচার সংযোগে, নির্দ্বিধায় কবিতায় বাক্য রচনা করেই আধুনিক কবি খালাস। পাঠোদ্ধারের দায়িত্ব হতভাগা পাঠকের। এহেন দুরূহ দায়িত্ব যে একজন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটও গুরুভার, সে-কথা কে বোঝায়? কবিরা লিখেছেন, এবং লিখতেই থাকবেন, তুমি না-বোঝো তো তুমি বেরসিক আকাট। ফলে

কিছু সংখ্যক পাঠক আধুনিক কবি মহলে আকাট বলে 'দেগে' যাওয়ার ভয়ে, তথাকথিত উদ্ভট আধুনিক কবিতাগুলো বোঝাবার ভাণ করছেন, শুধু তাই নয়, কেউ কেউ আবার মনগড়া সব সহৃদয় ব্যাখ্যা করে, হাতালিও কুড়োচ্ছেন। আরো এক কথা, আধুনিক কবিদের এমন সব অপ্রচলিত তদ্ভব এবং তৎসম শব্দ অভিধান খুজে খুঁজে কবিতায় ব্যবহার করবার ঝোঁক দেখা যায়, তাতে ওই ঝোঁককে একটা অপকৌশল বললে কি বেশী বলা হয়—অর্থাৎ কবিতাকে এমন অবোধ্য করা চাই যাতে ওই অবোধ্যতাই হবে কাব্যকৃতিত্বের মানদণ্ড। বলা বাহুল্য, এরকম উদ্ভট সৃষ্টি কেউ না বুঝলেও, কবি নিজেও না বুঝলে কিছু এসে যায় না। বাংলা সাহিত্যের সেরেস্তায় আধুনিক কবিতা সমালোচনার পাহাড় প্রমাণ 'খেরো'র স্তূপ দেখেই সবাই গদ গদ—আসলেই যে ফাঁকি, সে খবর কে রাখতে চায় ? কেউই রাখতে চায় না! এই সব কবিতা পত্র পত্রিকায় ছাপা হয় কটমটে শব্দ গুণে, আর অবোধ্যতার তারতম্যের হিসেব কষে। আমি হলফ্ করে বলতে পারি, যারা পত্র পত্রিকা কেনেন, তাঁরা তথাকথিত কবিতার পাতায় চোখ বুলিয়ে প্রায়শঃই পত্রান্তরে পালিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন। একদা আধুনিক কবিতা প্রিয় পাঠকের একটা পরিসংখ্যান মনে মনে তৈরী করার উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য রসিক আত্মীর-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, যারা মাসিক সাপ্তাহিক পয়সা খরচ করে নিয়মিত কেনেন এবং যারা নিয়মিত বুক্ষ্টলে দাঁড়িয়ে সাহিত্য পত্রিকার পাতা ওল্টান— তাঁদের পাঠ রীতি, পছন্দ অপছন্দের দিকে বেশ কড়া নজরে লক্ষ্য করে, যা দেখেছি, তা আমার ক্ষণপূর্ব মন্তব্যের সমর্থক। আমার এই লেখা পড়ে কেউ যেন না মনে করেন, আমি ঘড়ির কাঁটা পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবার পক্ষপাতী। আমি জাতকূপমণ্ডুক নই। আমিও আধুনিক কবিতা ভালোবাসেই পড়ে থাকি, অবশ্য যা যথার্থ আধুনিক, তাই পড়ে থাকি। আধুনিক বলতে আমি বুঝি সমকালীনেয় অনুসঙ্গ অথচ যে কবিতার ভাব ধারণা কিছুটা অভূতপূর্ব ও অভিনব। কালের বোধচেতনায় সুস্পষ্ট, অবোধ্য নয় কিছুতেই। যে কবিতার আবেদন সরাসরি পাঠকের অন্তরে নয়, সে কবিতায় পাঠক হৃদয়েও কবিমনের সাযুজ্য আশা করা যায় না। এই সাযুজ্যই সার্থক কবিতার নিরিখ হওয়া উচিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই আমাদের বাঙালী কবি মানসে এই বিকৃতির শুরু বলে অনুমান হয়। যে অর্থে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক, যে অর্থে সত্যেন্দ্রনাথ আধুনিক, যে অর্থে নজরুল জীবনানন্দ আধুনিক, সেই অর্থ এই হাল আমলের 'আধুনিকদের' মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, এঁরা এক-একটা যুগের কাব্য ধারণার স্থিতাবস্থার ভিত্তিকে আমূল নাড়িয়ে দিয়ে, নতুন একটা কাব্য চেতনার স্রোতকে নতুন খাতে বইয়ে দিয়েছিলেন। এই চেতনার স্রোতের মুখে যখনই সিলট্ পড়বার উপক্রম হয়েছে, তখনি একজন খোন্তা-কোদাল তুলে নিয়েছেন। আমরাও আধুনিক কাব্য সৃষ্টির রসাস্বাদন করেছি। অন্তত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তারা তাই বলে থাকেন। মোটকথা এঁদের পর বিংশ শতাব্দীর যষ্ঠ দশকেও একটা স্থিতাবস্থাই কায়েম হয়ে রয়েছে। খুন্তি কোদালি হাতে কেউ কাজে লেগেছেন বলে চোখে পড়ছে না। অনেকে অবশ্য শুধু হাতেই হাত পা ছুঁড়ছেন। তাতে কাজ কিছু যে হচ্ছে না, তা বলতে সঙ্কোচের কিছু নেই। যা সত্য তা বলতেই হবে।

আমার ব্যক্তিগত মত যা আমি সহজ পাঠক মনে বুঝেছি, তাই অকপটে জানিয়ে দিলাম। অনেকে আমার এই মত সরাসরি নাকচ করে দেবেন, এ আশঙ্কা আমার সব সময়ই আছে, সেটাও প্রবন্ধের শুরুতেই জানিয়েছি। হয়ত আমার এই সব মত খণ্ডন করতে এগিয়ে আসবেন তথাকথিত আধুনিক কবিরাই। অথচ আমি জানি, এই সব কবিদেয় মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা সাহিত্যের মৌল সংজ্ঞা, অনুজ্ঞা নির্দিষ্ট করে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন অত্যন্ত সহজ, সরল গদ্যে। কবিতা রচনার বেলাতেই এঁদের ঘাড়ে কী ভূত যে চাপে! লক্ষ্য করে দেখেছি, এই ভূতগুলোর বেশিরভাগই সাহেব। এদের ঘাড়ে করেই আধুনিক কবিদের নাচানাচি। এঁদের সৃষ্ট কাব্যে অবোধ্যতা বা অযৌক্তিকতার (সমসাময়িক পরিবেশে) কথা তুললেই, পাউণ্ড, এলিয়ট য়েটস্, গ্রেভস্ এর কবি কৃতির ধুয়ো তুলে মুখ বন্ধ করতে চান। এই সব কবিদের 'নতুন সৃষ্টির' (নিউ এজ্ ?) উদাহরণ উদ্ধৃত করেন। এঁদের দেশ, এঁদের কালের প্রাণচেতনার মধ্যে এঁদের নতুন সৃষ্টির যে তাৎপর্য্য আছে, সেই তাৎপর্য আমাদের দেশ, আমাদের কালের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে কি? আমাদের দেশ-কাল চেতনার নীচে যে অন্তঃশীলা স্রোতধ্বনি অবিরাম বেজে চলেছে, যার ঋতুতে ঋতুতে উদারা মুদারা, তারায় ওঠানামা; মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় নানান গতি ভঙ্গী, তাকে আমাদের কর্ণগোচর করার প্রয়াস কোথায়? আমাদের আধুনিক কবিদের কবিতা পড়তে বসলেই মনে হবে, এগুলো যেন খণ্ড খণ্ড বিদেশী কবিতার গ্রন্থি বন্ধন যার পদে পদে ('ফিল আপ দি গ্যাপস্' এর হোঁচট)—যা আমাদের দেশের নয়, কালের নয়—যার সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ যেন কিছুতেই হতে চায় না। কথাটা অতি বড় সত্য। আধুনিক কবিতা নিয়ে যারা নাড়া-চাড়া করেন, তাঁদের অনেকেই, মুখে না-বললেও মনে মনে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। কাব্য কৃতিত্বে আধুনিক হবার যেমন একটা উৎকট প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে, যে প্রচেষ্টা স্বভাবজ নয়, তেমনি জনকয়েকের আধুনিক কবিতার বোদ্ধা সমালোচক সাজবার লোভও বিশেষ দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে। কবি 'যা-ইচ্ছে' যেমন তেমন করে বোঝাচ্ছেন যা ইচ্ছে লিখছেন। এই বোঝা-বুঝির গোলকধাঁধায় পড়ে পাঠক বেচারা ভ্যাবাচাকা। গরুদাগা হবার ভয়ে মুখ খোলেন না।

এখন শেষ কথা এই বলা যায়,—বর্তমানে গাড়ি গাড়ি বাংলা কাব্য রচনা আর তার সমালোচনার মধ্যে যেন একটা ব্যবসায়িক জুটি বন্ধন বা লেনদেন এর কারুকার্যের আভাষ। 'তোমারও চলুক আমারও চলুক' এই রকম একটা অলিখিত চুক্তি। ফলে কবিতা আর সমালোচনার বাজার ভালই চলছে। মন্তব্য রূঢ় হলেও বলতে হচ্ছে, বাজারে যা মাল বেরোচ্ছে তার ভবিষ্যত মূল্য নির্দ্ধারণ করতে হলে, পুরোন কাগজ-শিশি-বোতলওলার হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল।

বিদ্যুৎ মৈত্র

পাখি জানে ॥ মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত। সাহিত্য। কলিকাতা-২০। মূল্য তিন টাকা।

'পাখি জানে' নামক সুমুদ্রিত ও শোভন-প্রকাশিত গ্রন্থে সংকলিত মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তের কবিতাগুলি চিরকালীন বিষয়ের কবিতা— খোঁপায় যে তোর
রক্ত গোলাপ
হায় দুলালী ;
কে জানে কোন্
পথিক রাজার
মন ভুলালি। (চিরকালীন)

এবং অকৃত্রিম ভালোবাসার কবিতা। এই ভালোবাসার কবিতাগুচ্ছের মধ্যে আপাতদৃষ্টে যদিও নারী অনুপস্থিত—এখানে 'বহে নদী নিরবধি', এখানে অবুঝ নদীর কথা, বকুল কুড়িয়ে আনার কথা—তবু অদৃশ্যভাবে মানুষী প্রেমের অস্তিত্ব প্রতি চরণে অনুমিত হয়, যে প্রেম ব্যতিরেকে 'অবিরল প্রকৃতির পটে' অন্য কেউ কবিকে উতলা করতে পারে না। এই কবিতাগ্রন্থে 'নিষ্পাপ পৃথিবীর মন' বালকের চোখ দিয়ে দেখা। কবিবালকের চোখ প্রেমেই নিষ্পাপ—'সময় নিমিত্তমাত্র'—'প্রেম জানে সুনিবিড় প্রতিদিন কোকিলের মাস'। প্রকৃতিকে ভালোবেসে, নারীর প্রেমে—দুইকে অখণ্ড জীবনপ্রেমের অঙ্গ হিসেবে দেখে কবি উচ্চারণ করেন--'এখন নিশ্চিন্ত নিঃশব্দের ভুবনে ফুলপাখির গাছপালা নিবিড় হোক এবং আর একটি হৃদয়।' প্রকৃতিপ্রেম, নিসর্গদৃশ্যের বন্দনা, এই কবির কাছে বস্তুত 'ভালোবাসা যার অন্য নাম' তাকেই অনুসন্ধান।

এই নম্র ভালোবাসার অপরিতৃপ্ত অভিজ্ঞান কবিতাগুলির চরণে চরণে বর্তমান। অন্ধকারের সিঁড়ি বেয়ে আলোকে ছিনিয়ে আনতে যাওয়ার কথা থাকলেও এখানে সিঁড়ির অন্ধকার প্রাথমিক হয়ে ওঠে নি, জীবনধারণের উল্লাসের উৎসে কবিতাগুলি জন্ম নিয়েছে।

হা-হা করছে বাইরে হাওয়া,
জানালায় মুখ শরীরে স্পর্শ ;
হা-হা করছে বাইরে হাওয়া
নিবিড় রাত্রে বিপুল হর্ষ ··· (অনুভবের কয়েক ছত্র)

আমারও ইচ্ছে করছে উল্লসিত দু বাহু বাড়িয়ে উচ্চকিত হাওয়ার আসরে
নিজেকে ছড়িয়ে দিই, হাওয়ায় জড়িয়ে পড়ি, কণ্ঠ দিই ;
মুক্তবন্ধ হাওয়াকে কেউ তর্জনী তুলে মানা করছে না বলে
ঐ হাওয়াকে ভালোবাসছি ভালোবাসছি ভালোবাসছি। (দীঘা)

দেওয়ালের চার বাহু নয়, প্রেমিক কবি ডাক দেন মুক্তিতে, বনে উপবনে, প্রকৃতির শান্তিনিকেতনে, যেখানে 'কিশোরী শীতের বেলা সুবাসিত' এবং 'ঘরে কিবা প্রয়োজন, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এসো'।

পাখি জীবনায়নের আনন্দে যা জানে তাই সর্বোত্তম জানা—বুদ্ধি সেই সহজাত জানার সাবলীল পবিত্রতাকে নষ্ট করে, এই যেন কবির বিশ্বাস। তাই বোধ হয় যে দুই-একটি কবিতায় যুক্তি বা বুদ্ধির বিন্যাস কবিতার বিষয় সেখানে কবি সমুচিত সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। হৃদয়াবেগ ও অনুভূতি মলয়শঙ্করের কবিতার প্রধান বিষয় কিন্তু তিনি মননকে আবেগময় ও অনুভূতিগ্রাহ্য করে তুলতে পারেন নি। যৌবনে বাঁচার সরল আনন্দে যে কবিতাগুলি কবি রচনা করেছেন তারই মধ্যে অবশ্য পাঠক নিজের গোপন লালিত চিত্তবৃত্তিকে আবিষ্কার করে কৃতজ্ঞ হয়।

বাইরে অবাধ মুক্তি ;
জানালা খোলো, দরোজা খোলো, আলো,
ছড়িয়ে পড়েছে ছাখো,
কেমন দিগন্ত জুড়ে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সকাল ; ··· (পাখি জানে)
দূর থেকে গান শুনি, চতুর্দিকে
গান, শুধু গান ··· (কার্শিয়াং : একটি সকাল)

যদিও বলেন 'পুনরুচ্চারণে কাজ নেই' তবু মলয়শঙ্কর কবিতায় পুনরুচ্চারণের রীতি বারংবার ব্যবহার করেন—এই পুনরুক্তিপরায়ণতা, সতর্ক না হলে, মুদ্রাদোষে পর্যবসিত হতে পারে। দুইটি উদাহরণ দিচ্ছি—

পেঁচারা ডাকছে ধীরে, ঝাউশীর্ষে বিরহী নিঃশ্বাস
ছড়াবে ছড়াবে কেউ জানছে নাকো কেউ না, কেউ না
নক্ষত্রও জানবে নাকো চন্দ্রানন নীরব অপার
অদৃশ্য কিসের ক্ষত বুক জোড়া, কেউ জানবে নাকো, কেউ না কেউ না
বৃথা কালক্ষেপ, তীরে বৃথা কালক্ষেপ। (বালিয়ারি ভেঙে ভেঙে)
দু'চোখ মেলো দু'চোখ ···
  জানতে সুর হৃদয়ে আছে ; হৃদয় ;
  সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
    সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে
      ছিঁড়ে ফেলে দাও অন্ধকারের ভয়। (ইন্দ্রাণীর জন্য কয়েক ছত্র)

স্বভাবে যিনি এতখানি কবি সবিনয়ে আরো দুটি বিষয়ে তাঁর এবং তাঁর পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ফরাসীরা মুক্তছন্দ (vers libre) এবং মুক্তবন্ধ ছন্দের (vers libere) মধ্যে পার্থক্য করে। প্রথমটি 'born free'—যেমন হুইটম্যান বা লরেন্স ব্যবহৃত গদ্যছন্দ, দ্বিতীয়টি 'has been liberated from some pre-existing chains' এবং 'which takes its starting-point from traditional versification। মলয়শঙ্করের এই গ্রন্থভুক্ত কোনো কোনো

কবিতায়, বিশেষকরে পয়ার ধর্মী কবিতায়, দেখা যায় তিনি নিয়মিত মাত্রিক পর্ব সমবায়ের মাঝখানে কখনো কখনো মাত্রাসংখ্যা লঙ্ঘন করেছেন। যদি তিনি সচেতনভাবে কখনো কখনো এই অনিয়মিত মাত্রার পর্ব ব্যবহার করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি ঐতিহ্যগত পয়ারের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বন্ধন থেকে ছন্দকে কিছু মুক্তি দেবার জন্য এই অভিনন্দনযোগ্য পরীক্ষায় রত। যদি অবশ্য কবি এ বিষয়ে সচেতন না হন, তাহলে পয়ারের মাত্রা গণনার পর্যাপ্ত স্থিতিস্থাপকতা সত্ত্বেও, সেগুলিকে ছন্দপতনের উদাহরণ হিসাবে গণ্য করতে হবে। এইরকম অনিয়মিত মাত্রার পর্বের উদাহরণ, যেমন—

নীলআঁধার স্বরকণ্ঠি ; | পরিবেশ আরণ্যক ছায়া
আকাশে ছড়ানো স্বর | দূর হতে নূপুরের ধ্বনি ; ··· (হঠাৎ কান্নার রাতে)
মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙে ; | **পর্বতশৃঙ্গ জুড়ে** | আলোক উৎসব
জ্যোৎস্নায় বিগলিত ; লহমায় ভেঙে গেছে বাঁধ ; ··· কোজাগরীর রাণীক্ষেত)

'হাওয়ার সূত্রে' কবিতাটির অধিকাংশ পর্ব আটমাত্রার, কিন্তু সেখানে ব্যতিক্রমের নিদর্শন—

কিশোরী নারকেল গাছের | বিনুনি কি চমৎকার | **হাওয়ায় বুনছে সন্ধ্যার আসর**···

এই কবিতার শেষ লাইনটি পূর্ববন্ধন থেকে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমেও তৃপ্ত না হয়ে পর্ববিন্যাসের স্থাপত্য একেবারে হারিয়ে শিথিল আলস্যে এলিয়ে গেছে—ক্ষতি কি, আহা যদি ফিরতে পারতে আম কুড়োবার সেই শৈশবের মাতাল দিনে।

এ ছাড়া প্রচলিত শব্দগুচ্ছের ব্যবহার কিছু মানসিক আলস্য ও শ্রমবিমুখতার প্রমাণ দেয়। কিঞ্চিৎ প্রযত্নে ঐ শব্দগুচ্ছকে উৎখাত করে জীবিত শব্দপুঞ্জ তৎ পরিবর্তে কবির পক্ষে ব্যবহার করা কিছু কঠিন হতো না। ব্যবহারে-ব্যবহারে অসাড় এই জাতীয় শব্দগুলি কোনো নূতন দ্যুতি বা ব্যঞ্জনা জাগায় না, বরং তা ব্যবহারে মলিন মুদ্রারই মত অচল। সমকালের নানা কবির হাতে-ফেরা শব্দগুলির অসতর্ক অনুপ্রবেশ থেকে আত্মরক্ষা প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যকামী কবির আবশ্যিক কর্তব্য। এই জাতীর শব্দগুচ্ছ কবির অসতর্কতার সুযোগে কবিতাগুলিতে স্থান পেয়েছে—ইচ্ছারা, মধুরতম মায়া, উজ্জ্বল বালক, উজ্জ্বল রৌদ্র, নাম-না-জানা, হঠাৎ খুশি, সবুজ ঠিকানা, সফেন ইত্যাদি। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যত্রতত্র কবির 'আশ্চর্য' বিশেষণটি ব্যবহারের মুদ্রাদোষ। চার ফর্মার এই ক্ষীণকায় বইয়ের মধ্যে এই আশ্চর্যজনক ব্যবহারের তালিকা দিলে কবির এই ক্ষুদ্র দোষের বিপুলত্ব প্রকট হবে, যদিও তালিকা থেকে এই রকম দুই-একটি ব্যবহার বাদ পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়—আশ্চর্য আপেল আশ্চর্য গহ্বর, আশ্চর্য সহসা, আশ্চর্য ধুলো, আশ্চর্য আলো, আশ্চর্য একটি স্বর, আশ্চর্য সরল, আশ্চর্য প্রতিমা, আশ্চর্য অন্ধকার আশ্চর্য দিনগুলি, আশ্চর্য কোমলকণ্ঠ, আশ্চর্য তিমির, আশ্চর্য নেশা, আশ্চর্য খুশি, আশ্চর্য মমতা, আশ্চর্য ছায়া, আশ্চর্য ফুলের সৌরভ, আশ্চর্য অতলান্ত নীল জল, আশ্চর্য গতি।

যে কবি ভালোবাসায় মগ্নমন, দিনযাপন যাঁর কাছে সপ্রাণ এবং সানন্দ, যিনি সেই আকণ্ঠ ভালোবাসা নম্র উচ্চারণে ছন্দোময় করে তুলতে উৎসুক, যিনি নিম্নের পেশল চরণগুলি রচনায় সক্ষম—

ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুমড়ে মুচড়ে যেতে চায় অতিদূর গহীন সাগর
তীরের অমাকে ভুলতে ব্যগ্র, কিন্তু প্রাক্তন নিঃশ্বাস
স্মৃতিকে জাগ্রত করে ঢেউ হয়ে জ্যোৎস্নায়, শরবিদ্ধ শোণিত কম্পন।

(প্রাক্তন নিঃশ্বাস)

তিনি যদি ছন্দব্যাপারে এবং শব্দ নির্বাচনে আরো কিছু সতর্ক হন তাহলে তিনি উচ্চতর সার্থকতার শিখরজয়ে সক্ষম হবেন। তিনি অন্তরের প্রেমে, প্রকরণগত প্রযত্নে সেই শিখর জয় করুন এই আশা রাখতে যেয়ে একটি প্রশ্ন মনে আসে। এই ভালোবাসার কবিতাগুচ্ছের মধ্যে 'রক্তমাংসে' কবিতাটি না থাকলে কি ভালো হত না? এই কবিতাটি চিরকালীন বিষয়ের কবিতা নয়, ভালোবাসায় স্পন্দিত নয়। ঘৃণা নিয়েও কবিতা হতে পারে' যদি সেই ঘৃণা তাৎক্ষণিকতার মলিন স্পর্শ অতিক্রম করে কাব্যের দূরত্ব অর্জন করতে পারে—কিন্তু এই ঘৃণাবিকৃত কবিতাটিতে সেই দূরত্ব নেই। 'তোর নামে কুকুর পুষবে মূর্খলোকে ভবিষ্যৎ স্বাধীন শিশুরা' সেই দুরাত্মার সেই অশুচির 'অন্যনাম চীন'—কিন্তু চীন সরকারের সঙ্গে শত্রুতা থাকলেও চীনের মানুষ শত্রু নয়, বিশ্বাসভঙ্গে সবচেয়ে আহত জওহরলাল নেহরু একথা জানতেন। রাষ্ট্রীয় প্রচারে চীনদেশের সাধারণ আজ যদি ভারতবর্ষের শত্রুও হয়, চিরকাল তা থাকবে না। চীন-সরকারের লোলুপতা বিশ্বাসঘাতকতা নাগরিক হিসাবে মলয়শঙ্করের চিন্তা ও কর্মের জরুরিবিষয় হতে পারে, কিন্তু কবি মলয়শঙ্করের প্রেমিক কণ্ঠের তা বিষয় নয়—এই কাব্যিক উত্তেজনা সাময়িক পত্রে স্থান পেতে পারে, কিন্তু কবিতাগ্রন্থে স্থায়িত্ব তার জন্য নয়॥

অশ্রুকুমার সিকদার

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 July '66 (0.50) Central Regd. No. B.N.3602/57 BAMAKALIN

ঝক্ ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
সাধনা
দশন
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
SADHANA
DASAN

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র-ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস (কলি:) আয়ুর্বেদাচার্য্য

চোখের দেখার উপরে
ক্রেতাদের পছন্দ নির্ভর করে
আপনার
জিনিস তাড়াতাড়ি
বিক্রি করার পরিকল্পনা
করছেন? জিনিসটিকে চোখে
পড়ার মত করে তুলুন —রোটাস
প্যাকেজিং কাগজে মুড়ে জিনিসগুলিকে
আরো আকর্ষণীয়, গ্রহণীয় এবং একান্ত
বৈশিষ্টময় করে তুলুন। ভাল মোড়ক, কাগজের
বাক্স ও কার্টনের জন্য প্রস্তুতকারকগণ সব-
সময়েই রোটাস প্যাকেজিং কাগজ ও বোর্ড
পছন্দ করেন কেননা এগুলি উৎকৃষ্ট। উজ্জ্বলরং,
ব্র্যাণ্ড নাম ও বিক্রির বিষয়বস্তু এদের উপরে
ছাপা হলে চোখে পড়বেই।
রোটাস প্যাকেজিং কাগজ বহুদিন টেঁকে,
চমৎকার দেখতে এবং আপনার জিনিসকে
ধুলো ময়লা ও নাড়াচাড়ার হাত থেকে রক্ষা করে।
এতে আপনার জিনিসের সদ্য তৈরী ঝকঝকে
চেহারা বজায় থাকে।
ROHTAS
রোটাস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
ডালমিয়া নগর (বিহার)
ম্যানেজিং এজেন্টস: সাহু জৈন লিমিটেড ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১
IPC-RI. 382. BEN

quality
BLOCK
MAKERS
and
PRINTERS

চতুর্দশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ তেরশ' তিয়াত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

দ্বারকানাথের ব্যবসায়ের পটভূমি

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্মসাল ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই শেষ দশক একাধিক কারণে যুগ-সন্ধিক্ষণ বলে দাবী করতে পারে। কেবল ভারত নয়, সারা বিশ্বে তখন একটা বিরাট পরিবর্তনের হাওয়া উঠেছিল। সে পরিবর্তন কেবল রাজনৈতিক বা সামাজিক নয়, শিক্ষায় বিজ্ঞানে ও চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তনের সূচনা ঐ সময়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে দ্বারকানাথের চিন্তাধারার বা কর্মগতির সঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়; তাই সমসাময়িক ইতিহাস কিছুটা স্মরণ রাখা দরকার।

ইংরাজ ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হবে এটা দ্বারকানাথের জন্ম সময়েও নিশ্চিত হয় নাই। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে পেলেও ১৭৭২ পর্যন্ত বাংলায় মহম্মদ রেজা খাঁ ও বিহারে সীতাব রায় নায়েব দেওয়ান হিসাবে খাজানা আদায় করতেন। ঐ বৎসর হেষ্টিংস বাংলার লাটসাহেব হয়ে নায়েব দেওয়ানের পদ উঠিয়ে দিয়ে রাজকোষ মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় নিয়ে এলেন, নাবালক নবাবের ভাতা কমিয়ে তাঁর দেখাশুনার ভার দিলেন ইংরেজদের বিশ্বস্ত মুন্নি বেগমকে। তখন থেকেই কলিকাতা কার্যতঃ বাংলার রাজধানী এবং তখন থেকেই ইংরেজ ভারতে শাসন পরিচালনার একটা উপযুক্ত ব্যবস্থার সন্ধান আরম্ভ করলে।

কোম্পানীর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা এতে কাজ দিল না আর নবাবী শাসন ব্যবস্থা তখন এতই নগণ্য যে সেদিক থেকেও কোন সাহায্য সম্ভব ছিল না। তা'ছাড়াও এদেশের আচারব্যবস্থা রীতিনীতি সম্বন্ধে প্রায়ান্ধ বিদেশীর পক্ষে কিছু করার চেষ্টায় বাধাও ছিল প্রচুর। তাই বিশ বছর ধরে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুলভ্রান্তির পর দ্বারকানাথের জন্মের প্রায় সময়ে

সময়ে ইংরেজরা যে ব্যবস্থায় পৌঁছায়, তার উপরেই ভিত্তিকরে পরবর্তী দেড়শ বছর ভারতে শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। এই সময়েই 'রেগুলেটিং' আইনের খুঁৎগুলি সংশোধন করে পিট তাঁর 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' পাশ করান। এই আইনে বড়লাটের ক্ষমতা ও মর্যাদা বিশেষভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। বড়লাট পরিষদের উপদেশ অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা পেলেন এবং সেই সঙ্গেই হলেন সেনাদলের অধ্যক্ষ। এ ব্যবস্থায় ত্রুটি বিচ্যুতি যতই থাক, এটা অনস্বীকার্য যে কর্ণোয়ালিশ এই ক্ষমতার ব্যবহার করে ইংরেজ অধিকৃত অংশে অনেকটা শৃঙ্খলা এনে, বাংলার জীবনযাত্রাকে নূতন ধারায় প্রবাহিত করেন। সে ধারার শুভাশুভ বিচার করবার ক্ষমতা তখন কারুর ছিল না।

লর্ড কর্ণোয়ালিস ছিলেন বিলাতের বড় জমিদার। তিনি সেই জমিদারতান্ত্রিক সমাজের ছায়াকেই এদেশে বসাতে চেয়েছিলেন। বিলাতের উন্নতির মূলে ছিল সেখানকার বিত্তশালী জমিদারশ্রেণী। এদেশে তার অন্যথা হতে পারে তা'তিনি কোনদিন ভাবেন নি। সেইজন্যই তাঁর পারিষদবর্গের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি সরাসরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করলেন। এতে সরকার খাজনা আদায়ের নিত্যনতুন ঝঞ্ঝাট থেকে অনেকাংশে রেহাই পেলেন। এ ছাড়া আরও একদিক দিয়ে এই বন্দোবস্ত ইংরেজ শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করে। এর আগে পর্যন্ত জমিদারের ক্ষমতা ছিল প্রচুর। খরিদ বা উত্তরাধিকারের সঙ্গেই জমিদারীর চৌহদ্দির মধ্যে দণ্ডমুণ্ডের শাসনক্ষমতা অর্শাত—কার্যতঃ ও দৃশ্যত। সাধারণ সময়েও তাদের সামলে রাখা রাজার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। শাসনের এতটুকু দুর্বলতা লক্ষ্য করলেই এঁরা পাইক-বরকন্দাজ-লাঠিয়াল নিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করতেন। এই দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে যেন ইংরেজ একটা সর্তাধীন সন্ধি করল। জমিদারের শাসনক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কর্ণোয়ালিশ তার বদলে জমিদারকে দিলেন জমির উপর নির্বুঢ় সত্ব এবং খাজানা কমবেশী করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা—যা এর আগে কোনদিনই জমিদারের ছিল না। এর পর দুই পক্ষই নিজ নিজ লাভের অংশ ভোগ করবার জন্য গুছিয়ে বসলেন।

বড়লাট কর্ণোয়ালিস বিলাতী জমিদারীর কায়দায় এ দেশটাকে চালাতে চাইলেও, এদেশের লোকের মানসিক ও অন্যান্য অবস্থা বা ক্ষমতা সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁর দপ্তরের সাহেবদের সঙ্গে এদেশীয়দের যোগসূত্র তখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এর আগের যুগে যে সব সাহেবরা এদেশে আসতেন, তাঁরা নিজেদের শাসক হিসাবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পর্যটক ও ব্যবসায়ীর। ভিন্নদেশে আচারবিচার ভিন্ন হাওয়া স্বাভাবিক বলে তাঁরা তফাৎ মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু তাই বলে তাঁদের রীতিনীতিই ভাল আর এদেশীয়টাই খারাপ একথা কখনও বুঝাতে চান নাই।

সেই প্রথম যুগে বিলাত যাওয়া আসা ছিল বহুসময় সাপেক্ষ। একতরফা যাওয়াই লাগত (কপাল ভাল হলে) ছয়মাস। সামান্য যে কয়জন ইংরাজ আসতেন তাঁদের উপর কড়া শাসন জারী করার মত আত্মীয় স্বজন এদেশে ছিল না। সাহেবদের তুলনায় মেমসাহেবদের সংখ্যা ছিল আরও কম। তাই সাহেবরা এদেশীয়দের সঙ্গে মেলামেশা ও ক্রমশঃ এদেশী আদব কায়দা গ্রহণ করে 'নবাব' বনে যেতেন। তাঁদের অধিকাংশেরই সাময়িক রক্ষিতা বা পাকাপাকি উপপত্নী

থাকত। দেশী সওদাগর ও শ্রেষ্ঠীদের ঘরে তাঁরা সমানভাবেই আনাগোনা করতেন। পরণে থাকত ঢিলা পায়জামা বেনিয়ান কোট। সাধারণ ভোজসভায় 'ভাত আর দোপেঁয়াজী, খিচুড়ি আর আমের চাটনি' চালু ছিল।

ক্রমশঃ এদেশে ইংরাজদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে নিজ সম্প্রদায়ে মেলামেশার সুযোগও বাড়ল এবং এদেশীয়দের সঙ্গে আনাগোনা ক্রমশঃ রহিত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন বণিকের মানদণ্ড ইংরাজের রাজদণ্ডরূপ ধারণ করল তখন বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে এক বিরাট বাধা গড়ে উঠেছে।

ঐ সময়ে ইংরাজের মনে মুখ্য প্রশ্ন ছিল এ দেশ শাসনের উদ্দেশ্য কি? কিভাবে শাসন হবে সেটা ছিল গৌণ। যতদিন ইংরাজ সওদাগর ছিল ততদিন এরূপ প্রশ্ন তাদের মনে উদয় হয় নি কিন্তু রাজ্য প্রসার ও রাজ্য লিপ্সার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রশ্ন প্রবল আকার ধারণ করল। —কারণ যুদ্ধবিগ্রহ রাজ্যগ্রাস সুন্দর বা শোভন নয়। বৈদেশিক আক্রমণ বন্যার মতই পরিচিত পথ নির্দেশগুলি মুছে দিয়ে বাঁধা ঘর, স্থির আশা নষ্ট করে দেশজুড়ে একটা পুতিগন্ধময় কলঙ্কের প্রলেপ মাখিয়ে যায়। কূটনীতির প্রবঞ্চনা ও ধ্বংসের জঘন্যতার জন্য বিজিত ও বিজয়ী উভয় পক্ষকেই কৈফিয়ৎ বানাতে হয়। নিজেদের পৌরুষ সম্বন্ধে হারানো আস্থা ফিরে পাবার জন্যে বিজিতেরা খোঁজে অজুহাত—যা তাদের পরাজয়, অপমান ও বৈষয়িক সর্বনাশের গ্লানি থেকে মুক্তি দেবে আর বিজয়ীরা খোঁজে সেই কারণ যা দিয়ে নিজেদের অত্যাচার ও বর্বরতাকে সমর্থন করতে পারে। তাই সেটনকারের ভাষায় "কর্ণোয়ালিসের স্থির বিশ্বাস ছিল যে হিন্দুস্থানের অধিবাসী মাত্রেই খারাপ" এবং ইংরেজস্বার্থ কায়েম করতে হলে ভারতবাসীকে নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় আনা দরকার ও কোন রকম উচ্চাভিলাষের প্রকাশমাত্র নির্মূল করা কর্তব্য। কর্ণোয়ালিসের পরের বড়লাট স্যার জন সোর স্বীকার করেছেন যে—"ইংরাজের মুলমন্ত্র ছিল নিজেদের সুবিধার জন্য সমস্ত ভারতবাসীকে সর্ববিষয়ে পদানত রাখা। হীনতম সাহেবও যতটুকু সম্মান অধিকার বা পদমর্যাদা দাবী করতে পারে কোন ভারতীয় তা' পারে না। তাঁর মাকে লেখা চিঠিতে এক জায়গায় লিখেছেন, "মোটের উপর যদি এদের সুখে রাখতে পারি ত' সেটা নেহাতই এদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও।" আরেক জায়গায় লিখেছেন "প্রত্যেকটি ঘণ্টা কাঁটার সঙ্গে এদেশে আমার জীবন আরো বেশী দুঃসহ হয়ে উঠছে। এদেশের লোকের স্বভাব ও ব্যবহার সম্বন্ধে যেটুকু আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এদের প্রতি সহানুভূতির কোন কারণ দেখি না।" দ্বারকানাথের জন্মকালে ইনিই যে ভারতের বড়লাট ছিলেন সে কথা মনে রাখা দরকার।

ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম যে দেশের পরিচালনার সঙ্গে দেশবাসীর কার্য্যত কোন যোগ রইল না। সার্বভৌম ক্ষমতা রইল বিলাতের পার্লামেন্টের হাতে। ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে "কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্" ও রাজনীতিক বিষয়ে "বোর্ড অফ কন্ট্রোল" মারফৎ তাঁরা কাজ চালাতেন। সপারিষদ বড়লাট ছিলেন বিলাতের শাসকদের অধীন কর্মচারী। শাসনের এই তিন স্তরে সাহেব ছাড়া আর কেউ রইল না। তাই তৎকালীন ভারতে ইংরাজ শাসনের লক্ষ্য খুঁজতে হয় সমসাময়িক ইংলণ্ডের চিন্তাধারায়।

সেটা ইংলণ্ডের পক্ষেও মহা পরিবর্তনের যুগ। দ্বারকানাথের যখন জন্ম হয় ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচার লণ্ডনে তখনও চলছে। ইউরোপের প্রধান ভূখণ্ডে ভল্‌টেয়ার, রুসো, কাণ্ট ও ডিজেরো প্রমুখ মণীষীরা তখন আচার ব্যবহার ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্ট। মর্তে স্বর্গসুখ এনে দেবে এরকম নিয়মানুগ একটা যুগের স্বপ্ন তাঁরা সেযুগের সাধারণলোকের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এতেই অনুপ্রাণিত হয়ে ফ্রান্সে যে বিপ্লব দেখা দিল তা' জনসাধারণের জয় ঘোষণা করে সমস্ত সভ্যজগতে আলোড়ন তুলল। ইংলণ্ডে এই নতুন ভাবধারা প্রতিফলিত হল ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায়, অ্যাডাম স্মিথের অর্থনীতিতে, বেন্থামের দর্শনে।

ভারত শাসন সম্পর্কে তখন বিলাতে তিনটি বিভিন্ন মত দেখা দিয়েছিল। বেন্থাম ও তাঁর শিষ্যদের প্রগতিশীল দলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। ইংরাজশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁদের মতে ছিল গৃহবিবাদে বিপর্য্যস্ত। রাজা ও নবাবদের অত্যাচারে জর্জরিত দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনা। ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাধীনতা বা স্বরাজের চেয়ে শান্তি ও সামঞ্জস্য ঢের বেশী দরকারী বলে মৎস্যন্যায় থেকে দেশকে উদ্ধার করে দেশের লোককে সুখে রাখবার ব্যবস্থা করতে তাঁরা চেয়েছিলেন। মধ্যযুগের অযৌক্তিক আচার অনুষ্ঠানের গণ্ডীতে আবদ্ধ জাতিভেদ ক্লিষ্ট, জমিদার ও ব্রাহ্মণ দ্বারা নির্য্যাতিত ভারতীয় জীবনধারা ছিল এদের অসহনীয়। তাঁদের চেষ্টা ছিল বিলাতী ভাবধারা দিয়ে ভারতের এমন পাকা সংস্কার করা যাতে রাজনৈতিক অনাচার ও সামাজিক অসমতা—দুইই চিরতরে দূর হয়।

দ্বিতীয় দল ছিলেন ধর্মযাজক সম্প্রদায় ও তাঁদের গোঁড়া ভক্তের দল। এঁদের মত ছিল যে খৃষ্টধর্মই ঐহিক ও পারত্রিক সুখের একমাত্র আধার; তাই এঁদের ইচ্ছা ছিল খৃষ্টধর্মের মারফৎ ভারতকে বিলাতী ছাঁচে গড়ে তোলা। ধর্মপ্রচারের জন্য দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ছিল খৃষ্টান সরকারের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। এঁরা ভারতবাসীর মনের উপর আধিপত্য করতে চেয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিস্তার ছিল এদের মূললক্ষ্যের অন্যতম অঙ্গ।

তৃতীয় দল ছিলেন সনাতনী। লক্ষ্য হিসাবে এঁদের সঙ্গে অন্য দুই দলের পার্থক্য বিশেষ কোন ছিল না। এদের মধ্যে কয়েকজন হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে কোনদিন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং মেকলের মত দু'একজন সেই দিনটিকে ইংলণ্ডের ইতিহাসের চরম গৌরবের দিন হবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, কিন্তু সমসাময়িক ভারতবর্ষের উপর তাঁদের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। রাজশক্তি ঈশ্বর প্রদত্ত—এই বিশ্বাসবলে তাঁরা বড়লাট থেকে জেলার কলেক্টার পর্যন্ত সকলকেই ঐশী শক্তির অধিকারী বলে দাবী করতেন এবং দেবতাদের মতই ভারতবাসীর প্রতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করতেন। ইংরাজ যে দেশের মা-বাপ কিন্তু দেশের অংশ নয়—কতকটা কৈলাসবাসী দেব-দেবীর মতই—এই ছবিটাই তারা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন।

অর্থনীতির দিক দিয়েও এটা ছিল দেশের একটা মহাপরিবর্তনের যুগ। পলাশীর যুদ্ধের সময়েও হিন্দু, মুসলমান ও আরমানী সওদাগরেরা পশ্চিমে আরব, তুর্কী ও পূর্বে আফ্রিকা এবং পূর্বে তিব্বত, চীন ও মানিলায় বাংলার পসরা নিয়ে রীতিমত আনা গোনা করত। এ ব্যবসায়ের

লভ্যাংশ সোনা হয়েই বাংলায় আসত। ১৭০৮ থেকে ১৭৫৬ পর্যন্ত বাংলার আমদানির তিন চতুর্থাংশ ছিল সোনা, রপ্তানির মধ্যে ছিল রেশম ও সুতির কাপড়, চিনি, লবণ, পাট, আফিম। সাহেবরা এদেশী কাপড় কিনে স্থলপথে ইস্পাহান ও জলপথে বাস্‌রা, মোচা, জেড্ডা পাঠাতেন। ওলন্দাজরা কাশিমবাজার থেকে বছরে দশ হাজার মণ-এর বেশী রেশম জাপান ও অন্যান্য দেশে চালান দিত। বাংলার চিনি মাদ্রাজ মালাবার সুরাট ছাড়িয়েও পারস্যোপসাগরে পর্যন্ত বিক্রী হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এ সবেরই দ্রুত পরিবর্তন হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ বাংলার ব্যবসা একচেটিয়া করে ফেলে। আগে থেকে দাদন দিয়ে চাবুকের ভয় দেখিয়ে বাংলার তাঁতিকে দিয়ে সস্তায় কাপড় বুনিয়ে বিদেশে চালান দেওয়া আরম্ভ হল। ফলে কাপড়ের ব্যবসায়ে তাঁতিদের আয় এত কমে গেল যে অনেকেই জাতব্যবসা ছেড়ে রোজকারের অন্যপথ ধরল। ইংলণ্ডের অবশ্য এতে কোন অসুবিধা হয় নাই কারণ ১৭২০ খৃষ্টাব্দের পর ভারতে তৈরী কাপড় বিলাতে বিক্রী করা আইন অনুসারে নিষিদ্ধ ছিল। এই আইনের ফলেই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসার প্রথম যুগে বিলাতের তাঁতশিল্পের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। তবু যখন প্রতিযোগিতায় বিলাতের তন্তুবায়রা পেরে উঠছিলো না, তখন তাদের আবেদন অনুসারে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ বাংলা থেকে ছাপা কাপড় চার বৎসরের জন্য আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ করতে সিদ্ধান্ত করেন। এর পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা ও মাদ্রাজ থেকে কাপড় বিলাতে নিয়ে গিয়ে সেটাকে পুনরায় রপ্তানী করতেন কিন্তু আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও তারপর নেপোলিয়ানের যুদ্ধের ফলে এই রপ্তানির সুযোগ অনেক কমে যায়।

তখন কাপড় ছেড়ে কোম্পানী তুলো বিলেতে চালান দিতে আরম্ভ করলেন। এই সময়েই ম্যাঞ্চেষ্টারে প্রথম তাঁতকল চালু হয়—ফলে মিলে তৈরী কাপড় সস্তা হয়ে পড়ে এবং ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলে। আমদানী রপ্তানীর হার এর ফলে কিরকম বদলে যায় তার প্রমাণ ১৮২৭ সালের সমাচার দর্পণে পাওয়া যায়। দ্বারকানাথের জন্মের সময় নাগাদ এক বছরে বাংলায় আমদানি হয়েছিল ১৬৫০ টাকার কাপড় ও মোট ৭০ লক্ষ টাকার জিনিষ আর রপ্তানি হয়েছিল ১২,২৩,০০০ থান কাপড়, ৭২৬৬ মণ নীল ও মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। এর ত্রিশ বৎসর পর যখন দ্বারকানাথ তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেছেন (কিন্তু পুরাপুরি ব্যবসায় নামেন নি) তখন বিলাতি কাপড় আমদানি হচ্ছিল ১১৪ লক্ষ টাকার এবং সর্বমুদ্ধ আমদানি তিন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকার উপর।

বিত্তবান ভারতীয় যাঁরা দেশের উন্নতি করতে পারতেন তাঁরা বাজার মন্দা দেখে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বাঁধামুনাফার নিশ্চয়তার লোভে অন্য ব্যবসা ছেড়ে জমির ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগ করলেন। কতখানি দূরদর্শিতার ফলে এই সাধারণ ধারা ছেড়ে দ্বারকানাথ ব্যবসায়ে নামেন তা' আজ সম্যক উপলব্ধি করা শক্ত।

বসুন্ধরা ও রূপসী বাংলা

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

শ্যামল বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি মেলে দিলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি বিরামহীন প্রাণময় বিকাশ। গাছ গাছালি, মাটীর পীত ধূসর কাজল বরণ, আকাশশীর্ষ পাহাড় পর্বত, নম্র চাঞ্চল্যের নদী নালা, আদিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর মালা—সব মিলিয়ে একটি নির্বাক প্রশান্তি ও ব্যাপক স্তব্ধতা মেখে নিয়ে পড়ে আছে অনাদ্যন্ত প্রকৃতি। পৃথিবীর এমন কোন কবি নেই যিনি প্রকৃতির করুণ কোমল উজ্জ্বল স্বপ্নালু রূপে মন না ভরিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে এমন সময় ছিল, যখন প্রকৃতিকে টেনে নিয়ে আসা হত কাব্যনাটমঞ্চে অনতিলক্ষ্য মামুলী ভূমিকায়। প্রিয়মিলনোৎসুকা রাধার অভিসারের পথের দুধারের প্রকৃতি কখনো বর্ষাবিপুল, কখনো শীতশীর্ণ, কখনো বাসন্তিক মোহনীয়, কখনো বা ছিল গ্রীষ্মদগ্ধ। কিন্তু রাধালীলার কাব্যে প্রকৃতির যথার্থ স্থান হল না, অর্থাৎ আপন মহিমায় সেখানে তিনি সুয়োরাণী নন—নিয়মরক্ষার দুয়োরাণী মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের কবিপ্রতিভা একটি তৃণসৌন্দর্যের আবেগে কেঁপে উঠতে চেয়েও সার্থক হয়নি। সেখানে অতিকল্পনার আধিক্যে স্থূলাবয়ব ভাবালুতারই উদ্ভব ঘটেছে। একমুঠো তরুণ আলোর কণা কবিতার অংগে অংগে ছড়িয়ে দিতে না পারার অক্ষমতাকে ঢাকতে গিয়ে সংস্কৃতকাব্য প্রথার দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্বরূপে দেখা দেয়নি সেসব কাব্য। বিহারীলালের তন্ময়তার দেশে প্রকৃতির কান্ত উপস্থিতি বারবার ঘটেছে! তৎসত্ত্বেও অমনোযোগী ও শিল্পকর্মে অপ্রকৃতিস্থ বিহারীলাল এমন কতকগুলি শব্দ ও উপমা ব্যবহার করেছেন যার ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁর কবিতা নম্রনবীনতা বহন না করে হাস্যোদ্দীপক হয়ে উঠেছে—অনেকক্ষেত্রে।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ—পতিসর—সাজাদপুরে ছিলেন জীবন্ত তীক্ষ্ণ চেতনায় সজ্জিত একটি বিস্ময়সুখী মানুষের মতো। সে-যুগের শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক লিরিক কবি জমিদারীর জাবেদাবহির আংকিক রুক্ষতার মধ্যে গিয়ে পড়লেন। তৃষ্ণার্ত রবীন্দ্রনাথ অবকাশ দিয়ে, বিস্ময় দিয়ে, আনন্দ ও বেদনা দিয়ে, অনুভূতির মনন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে ধীরে ধীরে বিশ্বপ্রকৃতিকে স্পর্শ করলেন ও গভীরভাবে ভালোবাসলেন। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানে যে দেহ নির্ভর জীবনটুকু রবীন্দ্রনাথ মূলধন হিসাবে পেয়েছিলেন তাকেই নিয়ে তুলেছিলেন প্রকৃতির কোলে। এখানে সীমার মাঝে অসীমকে খোঁজার প্রবণতা প্রশ্রয় পেল। একটি ধূলিকণাকেও জানতে না পারার বেদনায় যেমন তিনি আচ্ছন্ন হলেন, তেমনি সূর্যের তপস্যায় তিনি মগ্ন হতে পারলেন। প্রভাতবন্দনা ও সন্ধ্যাপ্রেমের সূত্রে রচিত হল এক অপূর্ব জীবনালেখ্য। শিলাইদহ সাজাদপুর পতিসরের স্থাবর ও পদ্মা ইছামতী বড়ল বলেশ্বর নাগর গোরাই আত্রাইএর জঙ্গম তাঁর সামনে খুলে দিল অমেয় জ্ঞান ও অপার সৌন্দর্য।

'বসুন্ধরা' কবিতাটি জন্মলাভ করে ২৬ কার্তিক ১৩০০ সাল। ঐ বিশেষ তারিখেই যে ঐ কবিতাটির জন্ম, তা ঐতিহাসিক সত্য হলেও, কাব্য-সত্য নয়। একটি কবিতার জন্মরহস্য সত্যই কৌতূহলদ্দীপক। কবিতা কখনো বা নিশি পদ্ম—তার পাপড়ি মেলার জন্য আকাশে যে সূর্য

থাকতে হবে এমন কোন বিধি নেই। অনেক সময় কবিতার উদ্ভবকারণ উপাদানের সরাসরি যোগ থাকে না। বা কবিতা স্বয়ম্ভু ও আকস্মিক নয়। কবিতা লেখা হয় কেমন করে? কবির সারা মনের কোন এক নিতল আড়ালে কবিতা প্রস্তুত হয়ে থাকে। বা বলা যেতে পারে, সারা দেহে মনে পঞ্চেন্দ্রিয়ানুভূতির নানা স্তরে কবিতা থাকে সঞ্চিত হয়ে। বাইরে থেকে কোন না কোন নাড়ায় তা যুবতী পরীকন্যার মত ডানা মেলে উঠে আসে। লিখিত হয় কাব্য। এ যদি সত্য হয়, তাহলে 'বসুন্ধরা' কবিতা একটি দীর্ঘ সময় পর্বের প্রস্ফুটন, তিল তিল করে তোলা ফসল। ১২৯৫ সালের প্রথম দিকে গাজিপুরের গঙ্গাতীরবাসের সময় থেকে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি তাঁর একাগ্র ঔৎসুক্য ও বাণীসমৃদ্ধ যোগাযোগ। তখন থেকে ছিন্নপত্রাবলীর প্রথম পর্ব পর্যন্ত 'বসুন্ধরা' কবিতাটির জন্মতারিখ বিস্তৃত। "আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি" এই স্বীকৃতির পিছনে দীর্ঘদিনের মনোযোগ বর্তমান। 'রূপসী বাংলা'ও কোন একটি নির্ধারিত তারিখে সৃষ্টি নয়। "...খুব পাশাপাশি সময়ের একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল" (ভূমিকা: রূপসী বাংলা)। ধলেশ্বরী, পদ্মা, মেঘনা, ইছামতী, কর্ণফুলী, জলাঙ্গী, রূপসা প্রভৃতির জীবনগতির সঙ্গে জীবনানন্দও আপন জীবনছন্দ মিলিয়েছিলেন। জন্মভূমি বরিশালের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য জীবনানন্দকে রূপসী বাংলার কবি হয়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছে। রূপসীবাংলার রচনা কাল ১৩৪৩-৪৪ সাল।

বসুন্ধরা ও রূপসী বাংলা (৬০টি কবিতাখণ্ডের পূর্ণরূপ একটি কবিতা) কবিতা দুটি পুংখানুপুংখ ভাবে পড়লে উভয়ের মধ্যে অনেক বক্তব্য ও পংক্তির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দেখতে পাওয়া যায়, একের অনতিক্রম্য অক্ষমতা অন্যে অনুপস্থিত। এবং এ উপলব্ধি সত্য হয়ে ওঠে যে রবীন্দ্রনাথ না এলে জীবনানন্দ (রূপসী বাংলার) সম্ভব হতেন না। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের সংশয় জীবনানন্দে সার্থক বিশ্বাসে সমুত্তীর্ণ।

প্রকৃতি-সম্মিলনের দিক থেকে একটি কৃপণ পরিবারে রবীন্দ্রনাথ লালিত পালিত হন। ভৃত্যরাজতন্ত্রের বালক প্রজা রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে পেতেন ফাঁকে-ফোঁকরে আড়ালে-আবডালে। ঐ কৃপণতার ফলে বিশ্বপ্রকৃতির জন্য যে মননজাত তীব্র তৃষ্ণা তার আধিক্য ঘটেছে পেনেটি, বোলপুর, হিমালয়ের ডালহৌসী পাহাড়ের ক্ষণ জীবনে, চন্দননগর ও গাজিপুরের নদীসঙ্গ লাভে। অতঃপর শিলাইদহের রাজকীয় মুক্তি ও সম্ভার তাঁকে প্রকৃতি ভাবনায় আচ্ছন্ন করেছে। শিলাইদহের গগনেই রবীন্দ্র-প্রভাত উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। এই দিক থেকে জীবনানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল খুঁজে পাওয়া দুরূহ নয়। যে যুগে 'Dead Land'-এর কবি চারিদিকে মৃত রুগ্ন পঙ্গু জীবনের ধূসরতায় ও ধূমে আচ্ছন্ন, যখন নাইটিঙ্গেল নয়—Hermit thrush-এর 'drip drop drip drop drop drop drop' গান ব্যর্থ চীৎকারে পর্যবসিত হচ্ছিল, যখন চারিদিকে 'নষ্ট শশার' মেলা তখন বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় ফিরে এলেন জীবনানন্দ। যদিও সে শ্যামলিমায় ছিল না অক্ষত একটা সুষমা, ছিল মাঝে মাঝে ভগ্নদীর্ণ জীর্ণতার রেখা তবু কবি সেখানেই তাঁর রূপসীকে দেখলেন, ভালোবাসলেন ও ভালোবেসে মুক্তিপেলেন সাহারা-পৃথিবীর নাগপাশ থেকে।

বসুন্ধরা কবিতাটির সঙ্গে রূপসীবাংলার মিল খুঁজলে বিস্মিত হতে হয়। আমরা শুধু পাশাপাশি উদ্ধৃতি রেখেই ব্যাপারটি বুঝতে পারবো—

"করি আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি।" বসুন্ধরা

"অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব" বসুন্ধরা

জীবনানন্দে ঐ তৃণপ্রীতি প্রায় সর্বত্র অন্বেষণ যোগ্য। টুকরো টুকরো উদ্ধৃতি দিই—এই বাংলার ঘাস; আমি এই ঘাসে বসে থাকি; বিজন ঘাসে; সোঁদা ঘাসের ধূলায়; গভীর ঘাসের গুচ্ছ; উঠানের ঘাস; পরথুপী মধুকুপী ঘাস; শুকনো পাতাছাওয়া ঘাস; বাংলার অবিরল ঘাস প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথও বকুল জুঁই পদ্ম আম্রমুকুলের মতো তৃণ ও তৃণকুসুমের প্রতি বিশেষ আগ্রহী লক্ষ্যপাত করেছেন সারাজীবন। তাছাড়া গভীর মিল যেটি সেটিও লক্ষ্যণীয়। পৃথিবীর বুক থেকে উঠে এসেছেন—উভয় কবিরই বোধের আকাশে এই বিস্ময়ের ইন্দ্রধনু। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি এই পৃথিবীর মাটির সঙ্গে বহুকাল এক হয়ে মিশেছিলেন তাই—

"সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি—
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর…"

জীবনানন্দ দাশ বলেন:

"ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর—
সবুজ ঘাসের সাথে; তাই রোদ ভালো লাগে"

উভয় কবির মনই এই ভালোবাসার জগৎকে ফেলে যাবার বেদনায় বিদ্ধ। কিন্তু মৃত্যুই যে অন্ত্য যতি নয়, এই ধ্রুব বিশ্বাস কেবল মাত্র বিশ্বাসী কবি রবীন্দ্রনাথই পোষণ করেন না, রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দও করেন।

"ফিরিব তোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয় মাঝে; কীট পশু পাখি
তরুগুল্মলতারূপে বারংবার ডাকি
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে" বসুন্ধরা

"আবার আসিব ফিরে ধান সিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শংখচিল শালিখের বেশে:
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়
হয়তো বা হাঁস হব… (রূপসী বাংলা)

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে, গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপন আলিঙ্গনে বাঁধতে চেয়েছেন। যদিও

মাটির পৃথিবীর সঙ্গে সন্তান-সম্পর্ক বাঁধতে চেয়েছেন। যদিও মাটির পৃথিবীর সঙ্গে সন্তান সম্পর্কে তিনি আবদ্ধ তবুও গ্রহ-নক্ষত্রময় আকাশের হাতছানিতে তিনি উন্মুখ। সমুদ্র-মেখলা পরা পৃথিবীর কটিদেশ সবলে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরবার ইচ্ছা তিনি চিরকাল মনে মনে পোষণ করেছেন। বিশ্বের সকল পাত্র থেকে আনন্দ-মদিরা ধারা অঞ্জলি ভরে পানের ইচ্ছাও জেগেছে। পাখিদের বিহ্বল চোখে আঙুল বুলিয়ে দেবার প্রেমনয় প্রবণতাও তাঁর ছিল। প্রাচীন চীনের ঘরে শিশু হয়ে জন্মলাভের অনিচ্ছাও তাঁর নেই। এমনি করে বিশ্বজীবনের প্রতি গভীর প্রেমে তন্ন তন্ন করে বিশ্বরূপ অন্বেষণ করার পরও তিনি বলেছেন—'সকলি রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ | বিস্ময়ের শেষ তল খুঁজে নাহি পাই। অন্যদিকে জীবনানন্দের কাছে বিপুল বিশ্বভুবন নয়—শংখ মালা, চাঁদসদাগর, শ্রীমন্তের বাংলাই একান্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। বলেছেন—'পৃথিবীর পথে পথে যাবো নাকো' বাংলার গোচারনা রূপের মেয়েদের ধূসর শাড়ীর ক্ষীণ স্বর শুনেই দিন কাটাবেন তিনি। মৌরী ফুল, কাকের ডাক, চালতা ফুলের সাদা, নীল কুয়াশা, ফেনসা ভাতের গন্ধ, পেঁচার স্নিগ্ধ মুখ —এই সব নিয়ে ভরে তুলবেন তাঁর প্রসন্ন বেদনায় ভরা করুণ মন। তবু মাঝে মাঝে তিনি বাংলার গণ্ডী যে অতিক্রম করেন নি তা নয়। মাঝে মাঝে বঙ্গপ্রেমিক কবিনায়ক জীবনানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে রোমান্টিক স্বর—"দূর পৃথিবীর গন্ধে ভরে ওঠে আমার এ বাঙালী মন আজ রাতে"।

জীবনানন্দ উভয়ত বাংলা ও বাঙালী নারীর জন্য, যে নারী আজ আর নেই, উল্লাস ও বেদনার কাছাকাছি গিয়ে একই ভাবনায় অনুরণিত হয়েছেন। অভিন্ন হয়ে গেছে 'সে' ও 'রূপসী বাংলা'। শেষের দিকে কয়েকটি কবিতাংশে বিশেষ করে 'সে'তে মেয়েটির চিন্তায় স্মৃতিচারণার আকুল দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে। আর রূপসী বাংলার সারা কাব্যশরীরেই ঐতিহ্যময় অতীতে বাংলাকে পরিপূর্ণভাবে খুঁজে না পাওয়া নম্র বেদনা তো আছেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে বেজেছে অহেতুক এক গভীর বেদনা এবং সেই প্রবল বেদনার মুক্তি সর্বলোক সর্ববিশ্বের সঙ্গে মিলনে বাধ্য। মনে হবে, রবীনাথের কবিতাটি নাটকীয় বিন্যাসে বিরচিত। প্রথম স্তবকেই আছে Key-note মূল বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত। তারই ভাব বিস্তার 'বসুন্ধরা' কবিতাটির ছন্দস্রোতে। সেখানে একই সঙ্গে সুদূরের পিপাসা ও নিকটের নিষ্ঠা জেগে উঠেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও পদ্মাপ্রকৃতি একই লগ্নে হাত মিলিয়েছে। বসুন্ধরা কবিতায় কোন মানবীর মুখ কবির হৃদয়ে স্মৃতির দোলা দেয়নি। তাঁর বিপুল কবি-প্রেম বিশ্ববিপুলতার সঙ্গে মিলনেই সার্থকতা লাভ করেছে। সে বিশ্বভাবনা দ্বিমুখী হয়নি। তবু বলা যেতে পারে, একজন প্রেয়সী নারীকে স্মরণ করে বাংলার রূপকে যেন নিবিড় করে দুই মুঠির মধ্যে জীবনানন্দ পেয়েছেন। জীবনানন্দের 'সে' যেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা' এবং রূপময়ী বাংলা যেন তাকে ঘিরে গিরিপ্রস্রবণ প্রান্তর ও সবুজ বনরেখা। অর্থাৎ দুয়ে মিলে এক পরিপূর্ণ চিত্রলেখা। তবে 'রূপসী বাংলায়' পটভূমিকার নেপথ্য ছেড়ে নিসর্গ সামনে এসেছে, মুখ্য হয়ে উঠেছে।

মৃত্যু ভাবনায় দুই কবিই সমতানে স্পন্দিত। যেদিন মরণ এসে কবির শরীর ভিক্ষা করে নিয়ে যাবে সেদিন জীবনানন্দের কোন অতৃপ্তি বা ক্ষোভ থাকবে না। কিন্তু তিনি প্রশ্ন করেন—

আমি চলে যাবো বলে
চালতা ফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে ?

এই প্রশ্ন সংশয়ের বেড়া অতিক্রম করে ইতিবাদী উত্তরের প্রাঙ্গণে উত্তরণ করেছে। সেই সমস্ত প্রাকৃত সৌন্দর্যই বর্তমান থাকবে যা কবি সারাজীবন উপভোগ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কামনা একটু অন্যরকমের : আমার আনন্দ লয়ে
হবে নাকি শ্যামতর অরণ্য তোমার ?
নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান
নদীকূল হতে ? উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্ত্যবাসী
নিদ্রা হতে উঠি ? আজ শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ ? ঘরে ঘরে
কতশত নরনারী চিরকাল ধরে
পাতিবে সংসার খেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি ?

জীবনানন্দের কণ্ঠ এত আবেগকম্পিত, আকাঙ্ক্ষাময় ছিল না। ত্যাগ করে যাবার ভাবনায় তিনি স্থৈর্য ও সমতা হারান নি। জীবনানন্দের মৃত্যু পরবর্তীকালীন বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় ও একান্ত—(অন্তত এই দুটি কবিতার তুলনা ক্ষেত্রে)—যদিও জীবনানন্দ অস্থির সংশয়রাত্রির ক্লান্ত কবি হিসাবেই খ্যাত। অন্তহীন প্রশ্নের আবেগে 'বসুন্ধরা'র কবির কণ্ঠ সংশয়দীর্ণ। একটি মাত্র প্রশ্নে যে বিশ্বাস বলিষ্ঠ হত, সংখ্যাতীত প্রশ্নে তাই হয়ে উঠেছে দুর্বল। জীবনানন্দ উত্তরসূরী বলেই তাঁর মৌলিকতা ও কলা সার্থকতা কমে যাবার নানা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অতি কলহ ও আবেগ বাহুল্যে তিনি যে প্রকৃতি প্রীত কুমুদরঞ্জন হয়ে ওঠেন নি অথচ আপন সৃষ্টিকে রবীন্দ্র সৃষ্টির পাশাপাশি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম নন তা অবশ্য স্বীকার্য।

বসুন্ধরা কবিতাটির কলাবিধি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সেখানে নির্মিতির বহু ত্রুটি আছে—আছে পুনরুক্তি, অনুভূতিকে ভাষায় পূর্ণ সংযমে প্রকাশ না করতে পারার পরিশ্রম-চিহ্ন ও আলগা ছড়ানো অতিবিস্তৃত আলাপের স্বরদৈন্য। অন্যদিকে জীবনানন্দ আত্মস্থ, ধ্যানী ও আপন বক্তব্য-বিষয়ে সুস্থির। রবীন্দ্রনাথের অস্থিরতার কারণ অন্বেষণ করলে দেখা যাবে তিনি এক পূর্বপরিচয়হীন বিপুল অভিজ্ঞতার উপাদান দিয়ে 'বসুন্ধরা' লিখতে বসেছেন। এমন এক মহাবিপুল ভাবতরঙ্গে তিনি আলোড়িত হয়েছিলেন যার সংবাদ অন্য কোন কবি পৃথিবীর বা বাংলার, তাঁর পূর্বে দিতে পারেন নি। তাই অপরিচয়ের সংশয় আবিষ্কারের উত্তেজনায় মিশে আলোচ্য কবিতাটির অংগকে করেছে বিভ্রান্ত। হয়তো যেকোন 'মহান কবিতার' ক্ষেত্রে তা উপেক্ষনীয়। কিন্তু কাঠামোর ত্রুটি

ও সংস্কারের অবহেলা এ কবিতায় এমনই প্রকাশ্য যে রীতিনিষ্ঠ বিদগ্ধ মন পীড়িত হয়। অন্যদিকে জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথকে আপন অভিজ্ঞতার পূর্বসূরী দোসর হিসাবে পেয়েছিলেন বলে তাঁর কলম মার্জিত কাব্যদেহ গঠনে নিপুণ হয়েই দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিসর্গপ্রকৃতি থেকে বেশ কিছু দূরবর্তী একজন সাংসারিক অথচ অসাধারণ মানুষের মত যে অনুভূতি আহরণ করেছেন, জীবনানন্দ সেই অনুভূতি প্রকৃতির শেষ নৈকট্যে পৌঁছে যেন একটি নীরব খরগোস বা লজ্জাবতী লতা হয়ে গ্রহণ করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ যেখানে 'বুঝিলাম নাহি বুঝিলাম জয় তব জয়' মনোভাবে আন্দোলিত, জীবনানন্দ সেখানে পূর্ণ পরিচয় ও সুগভীর মিলনে নিবিড়-কণ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের ত্রুটি ও অস্ফুষ্ট কণ্ঠস্বর জীবনানন্দে অনুপস্থিত। জীবনানন্দের চিত্রকল্প ও রবীন্দ্রনাথের উপমা তুলনায় পাল্লাতে চাপালে আমাদের বক্তব্যের সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রকৃতিবোধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই চিনি হয়ে যেতে পারেন নি, চিনির স্বাদ নিয়েছেন মাত্র; কিন্তু জীবনানন্দ নিজেই চিনি হতে পেরে ছেন। তার প্রমাণ রূপসী বাংলার ইন্দ্রিয়ঘন অথচ মন্ময় imageগুলি। সুন্দরী বসুন্ধরার সঙ্গে সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পেরেও রবীন্দ্রনাথ যেখানে বিস্ময় বর্ণনা করেই ক্ষান্ত সেখানে জীবনানন্দ বিস্ময় ও আনন্দের স্তরসীমাটুকুও সহজে পার হয়ে নিজেই বিকম্পিত বিস্ময় ও প্রমূর্ত আনন্দ হয়ে উঠেছেন। বিস্ময় ও আনন্দকে প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গান্তরে বর্ণনা না করে, তিনি কবিতায় সরাসরি নিসর্গপ্রকৃতিকে এনেছেন যার ফলে প্রকৃতিকে আমরা সবকটি আয়তনে আরো ইন্দ্রিয়স্পর্শী ও মনোরম রূপে পেয়েছি। 'সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মত অস্ফুট তরুণ' বা 'কিশোরীর স্তন প্রথম জননী হয়ে যেমন ননীর ঢেউয়ে গলে পৃথিবীর সব দেশে' এই সব চিত্রকল্পনার ক্ষেত্রে, পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে জন্মেছিলাম, এই সংবাদ আর সংবাদ মাত্র হয়ে নেই। তাই দেখতে পাই, জীবনানন্দের কাছে লক্ষ্মীপেঁচার সঙ্গে ধানগন্ধ তারুণ্যের অন্বয় আবিষ্কারের কোন অসুবিধা নেই, কারণ ঐসব কিছুই পার্থিব। বাংলার কিশোরীর স্তনের নম্র তারুণ্য ও জননীর দুধ সম্ভারের সঙ্গে ননীর ঢেউয়ের পার্থক্য নেই এবং তা একই সঙ্গে পৃথিবীর প্রান্তিক যে কোন নারীর পক্ষে সত্য। মানুষ যে পৃথিবীর দৃশ্য গন্ধ গান স্পর্শের সমাহার এবং এক ইন্দ্রিয় যে অন্য ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি শিক্ষায় শিক্ষিত তা আমরা আলংকারিক অর্থে একজন অ-কবির বক্তব্য স্মরণ করেও প্রমাণ করতে পারি। HELEN KELLER-এর কয়েকটি ইন্দ্রিয় ছিল মৃত। কিন্তু তিনি বলেন—"Not only are the senses deceptive, but numerous usages in or language indicate that people who have five senses find it difficult to keep their functions distinct. I understand that we hear views, see tones, taste music. I am told that voices have color. Tact, which I had supposed to be a matter of nice perception, turns out to be a matter of taste." (P. 137. The Open Door). hear views, see tones, taste music, এই অভিজ্ঞতা জীবনানন্দের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য। ইন্দ্রিয়ের ধারনা রীতির মৌল উপায় পাল্টে দিয়ে তিনি পার্থিব পরিচিত ও অনভিজাত উপাদানগুলি থেকে অধিক সত্য ও অনেক বেশি কবিত্ব আহরণ করেছেন। কেননা পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর অঙ্গে অঙ্গে সর্বব্যবধানলুপ্ত স্পর্শ এনেছে। "কিছু নাহি পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি বিষাদ ব্যাকুল" রবীন্দ্রনাথের

এই অক্ষমতার বেদনা জীবনানন্দে দেখা দেবার অবকাশ পায়নি। রবীন্দ্র-স্পর্শাতীত:প্রায় সব কিছুকেই তিনি স্পর্শ করতে পেরেছেন। 'মহামৃত্তিকা বন্ধন,' 'মহাব্যাকুলতা,' 'সমস্ত বাহিরখানি, 'প্রকাণ্ড উল্লাস', 'অন্ধ আনন্দ ভরে',—এখানে মহা, সমস্ত, প্রকাণ্ড, অন্ধ প্রভৃতি অসামর্থশীল পুরানো রিক্ত ফাঁপা বিশেষণগুলি ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ অমূর্ত অনেক ভাবনাকে বাণীমূর্তি দেবার অক্ষমতাই প্রকাশ করেছেন—যদিও ঐ শব্দগুলি দিয়েই তিনি তাঁর বক্তব্যকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা আরো পটু ঋজু ঘন চিত্র ও বাণী চেয়েছিলাম। "এই পৃথিবীর উপর আমার যে একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছে করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে—কিন্তু ওটা বোধহয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না, কী একটা কিম্ভুত রকমের মনে করবে" (ছিন্নপত্র : ৬৭ নং পত্র)। এই পরমুখাপেক্ষিতাজনিত আত্মঅবিশ্বাস ও বহুজন পরিচয়ের প্রমাণাভাবের ফলে বসুন্ধরা কবিতা অস্থিরতর অবিন্যাস সারা অঙ্গে বহন করল। ঐ কিম্ভুত হবার ভয়ের চাপ থাকা সত্ত্বেও কবিতাটি লিখতে গিয়ে যা সৃষ্টি করলেন তার জন্য কোন সমালোচক একথা বলতে সাহস পেলেন যে : "তেমনি কবিতার আকারে প্রবন্ধ লিখেছেন 'এবার ফিরাও মোরে বা 'বসুন্ধরা'য়।" অন্যদিকে "সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত" রূপসী বাংলার কবিতা রসবিশুদ্ধিতে স্বয়ম্ভর।*

কবিদের কাছে জাগতিক যাবতীয় দ্রব্য ক্ষুদ্র হোক তুচ্ছ হোক অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ অনুভূতির সিন্ধুসমাহৃত সম্পদ একটি ঝিনুকও আপন ছোট মুঠিতে মুক্তার মত বহন করতে পারে। রাঙা লিচু, নিমপেঁচা, পানের বাটা, সরপুঁটি, চিতল, দাঁড়কাক, মাছি, গাব, গোলপাতার ছাউনি, সোঁদাপথ, শজিনা, নারকেল নাড়ু, লালশাক, বৈঁইচি—কোন কিছুতেই জীবনানন্দের অনীহা নেই। এগুলি সচেতনভাবে কবির কল্পনায় ও পাঠকের মনে বাংলাকেই নির্মিত করে তুলেছে; এ এক অনবদ্য মণ্ডনকলার উদাহরণ। কালিদাসের মেঘদূতমে জামবনের কথা আছে (২৭ শ্লোক : পূর্বমেঘ) বলে রবীন্দ্রনাথ এক সময় উল্লসিত হয়েছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দের ঐ সব তুচ্ছ ও অনভিজাত উপাদান ব্যবহারপ্রবণতাকে সে দৃষ্টিতে বিচার করতে যাওয়া ভ্রান্তিমাত্র। এগুলি নিছক উপাদান মাত্রই নয়, এগুলি নির্ভাজ চিত্র-উপজাত প্রতীক। বাণী প্রতিমা রচনার উৎসাহে জীবনানন্দ বঙ্গীয় উপাদানগুলিকে যে চরিত্র দান করেছেন, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা অভাবিত। তাই 'রূপসী বাংলার' আছে এক স্পষ্ট রূপ, কিন্তু 'বসুন্ধরা' অস্পষ্ট অরূপময়ী।

তবে 'রূপসী বাংলায়' মূলত দেশপ্রেমের কবিতা। দেশপ্রেমের মামুলী অর্থের মধ্যে প্রকৃতি সংবেদনার ব্যঞ্জনা আরোপ করে জীবনানন্দ সার্থক কবি আখ্যা পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' দেশপ্রেম নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু, বিশ্বপ্রেমে অভিভূত। এখানে রবীন্দ্রনাথ মহাকবি অর্থে অদ্বিতীয়। সাহিত্যে দ্বিতীয় কোন 'বসুন্ধরা'' রচনার সম্ভাবনা নেই, যদিও দ্বিতীয় 'রূপসী বাংলা' একেবারে অভাবিত নয়।

* লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ বসুন্ধরা-ভাবনা প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করেছেন আর জীবনানন্দ রূপসী বাংলা রচনা করে পাণ্ডুলিপির অন্ধকারে ফেলে রাখলেন—প্রকাশ করলেন না। কেন?

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

শিখর রীতি

গুপ্তযুগের মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টার বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষার নিরীক্ষার ফল নাগর ও দ্রবিড় রীতি। দ্রাবিড় রীতি ব্যাপ্তি লাভ করিল দাক্ষিনাত্যে আর নাগর রীতির শিখর মন্দির সমগ্র উত্তর ভারত পরিক্রম করিয়া বিন্ধ্যপর্বতের অপর পার্শে একেবারে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। হিমালয় হইতে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ব্যাপিয়া নাগর রীতি চর্চায় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে আঞ্চলিক রূপের বিকাশ ঘটিল। নগর মন্দির নির্মাণের মুল নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া ওড়িশা, মধ্যভারত, গুজরাট, রাজপুতনা প্রত্যেকটি অঞ্চলে শিখর মন্দির নির্মাণে সমস্যা সমাধানে ও রূপরেখা রচনায় ভিন্নতর পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল। গুপ্তযুগের মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টায় সহিত বাংলাদেশের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ এবং নাগর শিখর নির্মাণের অভিজ্ঞতা তাহার প্রায় নাগর রীতির জন্মকাল হইতেই। ইহা সত্বেও কিন্তু উপরিকথিত অঞ্চলগুলির মত বাংলাদেশে নাগর রীতির বিশিষ্ট আঞ্চলিক রূপ পুর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে নাই। স্বাধীন প্রচেষ্টা যে বাংলা দেশে হয় নাই এমন নহে কিন্তু পুর্ণ প্রত্যয়ের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইবার পুর্বেই বাহিরের প্রভাব স্বীকার করিয়া নিতে হইল।

বাংলার অন্যতম নিকট প্রতিবেশী ওড়িশাতে শিখর মন্দির নির্মাণের একটি বলিষ্ঠ ঐতিহ্য গড়িয়াছিল। সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ও রাজনৈতিক সংযোগের পথে তাহারই প্রভাব বাংলাদেশে পৌছিয়া গেল। যে কারণেই হোক, বাংলাদেশে শিখর মন্দির নির্মাণ স্থানীয় ঐতিহ্যের পরিপুর্ণ বিকাশের পথে বহিরাগত এই প্রভাবের বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয় নাই। স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ পুর্বার্জিত অভিজ্ঞতা ও শিল্পবোধ ওড়িশায় শিখর মন্দির নির্মাণের অনুশাসনের উপর আরোপ করিয়া যে মিশ্র রূপের প্রবর্তন করিলেন তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বাংলার শিখর মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টা পরিণতির দিকে আগাইয়া চলিল।

বাংলার শিখর মন্দিরগুলি লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিবার পুর্বে শিখর মন্দিরদেহের বিভিন্ন অংশগুলির পরিচয় জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। ওড়িশার নাগর রীতির রেখ মন্দিরের সহিত বাংলার নাগর-শিখর মন্দিরের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, তাই ওড়িশার শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী বাংলার শিখর মন্দিরসমুহের অংশগুলিকে চিনিয়া নেওয়া সহজ হইবে। ওড়িশার রেখ দেউলে মন্দিরদেহটিকে নীচের দিক হইতে দেখিতে গেলে প্রথমেই যে অংশটি চোখে পড়ে তাহার নাম বাড়। ভিত্তিভূমি, তলপত্তন বা পিষ্ট হইতে বক্ররেখ শিখরের প্রারম্ভ পর্যন্ত ইহার লম্বমান বিস্তৃতি। বাড়টি আবার কয়েকটি অংশে বিভক্ত। প্রথমেই থাকে পাভাগ ভিত্তিভূমি হইতে বাড়ের গাত্র বাহিয়া উঠিয়া যাওয়া কয়েক সারি উদ্গত আনুভূমিক রেখা। পাভাগের উপরিস্থিত অংশটি হইল জাঙ্ঘ। রেখ মন্দিরের উন্নততর রূপে জাঙ্ঘের ঠিক মাঝখানে বান্ধনা নামে উদ্গত আনুভূমিক রেখা সৃষ্টি করিয়া জাঙ্ঘটিকে তল জাঙ্ঘ ও উপর জাঙ্ঘ এই দুই ভাগে করিয়া ফেলাই প্রথা। জাঙ্ঘের উপরে

আবার কয়েকসারি উদ্গত আনুভূমিক রেখা। ইহাই হইল বরণ্ড। বড়ণ্ড রেখাতে আসিয়া বাড় শেষ হইয়া যায়। বান্ধনা রেখায় বিভক্ত জাঙ্ঘ থাকিলে বাড়টির ভাগ হয় পাঁচটি, ওড়িশায় ইহাকে বলে বলে পঞ্চাঙ্গ বাড়। এই বিভাগ না থাকিলে বাড়টি হয় তিনটি অংশে গঠিত অর্থাৎ ত্রিঅঙ্গ বাড়।

এতক্ষণ মন্দিরদেহ বিভাগের একদিকের বর্ণনা করিলাম। উপরি উক্ত বিভাগের সহিত একত্রে আসনের গঠন অনুযায়ী আর এক প্রস্থ বিভাগ লম্বমান অবস্থানে মন্দিরটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া ফেলে। রেখ মন্দিরের সর্বোন্নত রূপে আসন হয় পঞ্চরথ অর্থাৎ ত্রিরথ আসনের উদ্গত অংশের ওপরে আর এক প্রস্থ উদ্গত অংশের সমাবেশ। ফলতঃ আসনের এক একটি বাহু পাঁচটি উচ্চাবচ অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। আসনের এই বিভাগ পরিকল্পনা মন্দিদেহের বিষম বা বেদীর শেষ পর্যন্ত লম্বমানভাবে সোজা উঠিয়া যায়। পঞ্চরথ আসন ও পঞ্চাঙ্গ বাড় ওড়িশার সর্বোন্নত রেখ মন্দির চিনিয়া লইবার উপায়। গণ্ডীর উপরের আসনের অনুবর্তী বিভাগগুলির নাম পগ। মধ্যস্থিত সর্বোচ্চ অংশটি হইল রাহাপগ। পঞ্চরথ আসনের উপর নির্মিত মন্দিরে রাহাপগের দুই পাশের বিভাগ দুইটির নাম অনুরথ পগ। সর্বশেষ পগ দুইটি কণিক পগ নামে পরিচিত। ত্রিরথ আসন সম্বলিত মন্দিরে গণ্ডীর এক এক দিকে বিভাগ থাকে তিনটি; রাহা পগ সে ক্ষেত্রে ঠিক কণিক পগের উপর হইতে উঠিয়া আসে। কণিক পগের প্রান্তদেশে গণ্ডীটি সর্বক্ষেত্রেই কয়েকটি ভূমিভাগে বিভক্ত। ভূমি বিভাগগুলি কণিকের প্রান্ত বাহিয়া গণ্ডীর শেষ অবধি চলিয়া যায় ও প্রতিটি ভূমির সীমা নির্দেশ করিয়া থাকে একটি করিয়া ভূমি আমলক।

রথকাসনে শিখর মন্দির নির্মাণ শুরু হইয়াছিল ত্রিরথ আসনের উপর। আসনের ত্রিরথ রূপকে অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হইল তাহার বিস্তার ও রূপরেখার বৈচিত্র। বিস্তার ও বৈচিত্রের পথে একটি পর্য্যায়ের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে বর্দ্ধমান জেলার বরাকরের সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে (বেগুনিয়া গ্রুপের ৪ নং মন্দির)। মন্দিরটির আসন ঠিক ত্রিরথ নয় আবার পঞ্চরথ আসনের উপর নির্মিত মন্দিরদেহের সমস্ত বৈশিষ্ট্যও ইহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। আসনের মূল বর্গের উপরে প্রথমে দুইটি সংকীর্ণ উদ্গমন, তাহার একটু পরে উঠিয়া আসিয়াছে প্রধান উদ্গত অংশটি। অপ্রধান উদ্গমনদ্বয় ও প্রধান উদ্গত অংশটির মধ্যস্থিত ক্ষেত্রে আসন নিম্নায়ত হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে। প্রধান রথক উদ্গমনটি দেওয়াল ও গণ্ডী বাহিয়া শিখরের শেষ অবধি বিদ্যমান কিন্তু অপ্রধান উদ্গমনদ্বয় দেওয়ালের উপরেই একটি করিয়া মন্দিরের অনুকৃতিতে শেষ হইয়া গিয়াছে। বাড়টি ত্রিঅঙ্গ; তিনপ্রস্থ পাভাগ রেখা, তাহার পর টানা জাঙ্ঘের উপরে রথক উদ্গমনের পাঁচটি ভাগ। বাড় এক প্রস্থ বরণ্ড রেখায় শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহার পরেই উঠিয়াছে সুউচ্চ শুকনাস শিখর; প্রথম হইতেই বাঁকিয়া গিয়া বেকীর পাদমূলে তাহার সমাপ্তি। মন্দিরটির যাহা কিছু সৌন্দর্য সজ্জা তাহার ক্ষেত্র হইল এই বিস্তৃত শিখর। লম্বমান অবস্থানে শিখরটির প্রত্যেকদিকে ছয়টি করিয়া ভাগ। ভাগও করা হইয়াছে বিচিত্র উপায়ে। আসনের অপ্রধান উদ্গমনদ্বয় তো বরণ্ড রেখার নীচেই শেষ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু গণ্ডীর উপরে তাহারা আবার উপস্থিত হইয়া পঞ্চরথ মন্দিরের মত গণ্ডীর দেহকে প্রত্যেক দিকে পাঁচটি অংশে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। বিভাগ কিন্তু এখানেই শেষ হয় নাই। রাহা পগের ঠিক মাঝখানে একটি গভীর বিভাজক রেখা প্রথম হইতে

শেষ অবধি চলিয়া গিয়াছে। ফলতঃ ভাগ হয়েছে ছয়টি। বিপরীত দিকে আনুভূমিক স্তরে পাথর সাজাইয়া গণ্ডীর বহির্মুখের আবরণ রচিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি পাথরের উপরে ও নীচে কাটনি কাটা। ফলে দুইটি প্রস্তরখণ্ড উপর্যুপরি বসাইলে মধ্যে থাকিয়া যাইতেছে একটি গভীর কর্তিত রেখা। লম্বমান ও আনুভূমিক উভয়দিকে মিলিয়া বহুভাগে বিভক্ত উচ্চাবচ-শিখরের উপরে তির্যক সূর্যালোকে সৃষ্ট আলোছায়ার সমাবেশ দৃষ্টির সম্মুখে শিখরটিকে অনেক লঘু করিয়া তোলে। শিখরের বহির্মুখ রচনায় ব্যবহৃত প্রায় প্রতিটি পাথরে মূর্তি ও লতাপাতার সজ্জা, অলঙ্করণের ইহাই প্রধান সম্পদ। মন্দিরের সম্মুখের দিকে শিখরের অলঙ্করণ বিন্যাস কিছুটা ভিন্নতর; দ্বারপথের উপরে স্থান বলিয়া হয়ত ইহার সজ্জাও স্বতন্ত্রভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে।

শিখরের উপরে অবস্থিত বেকীটি সুবৃহৎ আমলক শিলার ধারক। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের আমলকটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মত। সাধারণ ভাবে আমলকের পলকাটা গাত্র হয় convex কিন্তু বর্তমান আমলকটির আকৃতি concave।

বরাকরের সিদ্ধেশ্বরের মন্দির শিখর মন্দির নির্মাণের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি। ত্রিরথ হইতে পঞ্চরথ রূপে যাত্রাপথের পরিচয় ইহাতে রহিয়াছে; আসন পঞ্চরথ হইলেও মন্দিরদেহের সর্বত্র সে বিভাগ কার্যকর হইয়া উঠিতে পারে নাই—একটা সঙ্কোচ থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু মন্দিরটির তুঙ্গ শিখরের সজীব বলিষ্ঠতা ও দ্বিধাহীন উর্ধ্বগমনের পশ্চাতে যে সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে। অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বরাকরের এই মন্দিরটিতে কিন্তু আদিমতা একেবারে লোপ পায় নাই। আসনে ও মন্দির দেহে রথ পগ সমূহের কোণগুলি তীক্ষ্ণ, মার্জনা করিয়া কমনীয় করিয়া তোলা হয় নাই। অপরিস্ফুট পঞ্চরথ আসন, রথ-পগ সমূহের তীক্ষ্ণতা, অমার্জিত বহিরেখার বন্ধনে বিধৃত হইয়াও শিখরের স্বচ্ছন্দ উর্ধ্বগত সমস্তই শক্তি ও সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

ত্রিরথ হইতে পঞ্চরথ মন্দিরদেহে যাত্রাপথের ঠিক এই পর্যায়ে মন্দির ওড়িশার ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দির। অষ্টম শতকীয় এই খর্বাকৃতি গুরুভার শিখর মন্দিরটির আসনের বিন্যাস, অপ্রধান রথকদ্বয়ের পরিণতি ও গণ্ডীর উপরে কনিক পগের বিভাগ ঠিক বরাকরের সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরের একান্ত অনুরূপ। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঘটিয়াছে গণ্ডী রচনায়। গর্ভের তুলনায় শিখরের উচ্চতা পরশুরামেশ্বরে যেটুকু অর্জন করা সম্ভব হইয়াছে বরাকরের সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে সে উচ্চতা অনেক বেশী। ইহা ছাড়া সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের দ্বিধাবিভক্ত রাহা পগ ও concave আমলক তাহার স্বকীয়তার পরিচায়ক। কিন্তু এদুটির একটিও মূল সমস্যার সহিত জড়িত নয়। মূল সমস্যার প্রশ্নে গণ্ডী রচনার ক্ষেত্রে যে তারতম্য ঘটিয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয় যে অভিজ্ঞতায় পরশুরামেশ্বর মন্দির নির্মিত হইয়াছিল বরাকরের সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের ক্ষেত্রে তাহা অনেক বেশি বিস্তার ও গভীরতা অর্জন করিয়াছে।

ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সহিত বরাকরের সাদৃশ্য বরাকরের সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের নির্মাণকাল সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত রাখিয়া যায়। ভাবকল্পনা ও রূপরেখা রচনার কথা মনে রাখিলে সিদ্ধেশ্বর মন্দির পরশুরামেশ্বরের কিছুটা পরবর্তী হওয়াই সম্ভব। এই সম্ভাবনা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের গণ্ডীর অলঙ্করণ। মূর্তিগুলির অধিকাংশই অপটু হস্তের রচনা, আকৃতির

দিক দিয়া অমার্জিত। এগুলি ছাড়া অযত্ন অঙ্কিত আর এক শ্রেণীর মূর্তি রহিয়াছে। শৈলী বিচারে এগুলি নবম শতাব্দীর প্রথম দিকের বলিয়াই মনে হয়। লতাপাতার অল্প কিছু সজ্জা যাহা রহিয়াছে তাহাও ঐ একই সময়ের ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। মন্দিরদেহে ও অলঙ্করণে শৈলী বিচারের প্রশ্নটি সামগ্রিকভাবে ধরিলে বরাকরের সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দির নবম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল একথা বলিতে আর কোন বাধা থাকে না।

গণ্ডী রচনায় ও রথ পগ সম্বলিত মন্দিরদেহ নির্মাণে বরাকরের সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরে বিস্তার ও পরিবর্দ্ধনের যে ইঙ্গিত ছিল বর্দ্ধিত রথ পগ ও জটিল অলঙ্করণের পথে তাহাই বর্দ্ধমান জেলার দেউলিয়া গ্রামের শিখর মন্দিরটির মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। ত্রিরথ হইতে পঞ্চরথ আসন, পঞ্চরথ আসন পরিবর্দ্ধিত হইয়া রূপলাভ করে সপ্তরথে। বর্তমান মন্দিরটি সপ্তরথ কিন্তু রথকবিন্যাসে প্রচলিত পদ্ধতির এখানে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে' আসনের মূল বর্গক্ষেত্রের উভয় প্রান্তে কিছুটা ছাড়িয়া একটি করিয়া উদ্গত রথক উঠিয়া আসিয়াছে, ইহার পর আবার মূল বর্গক্ষেত্র বাহিয়া কিছুটা অগ্রসর হইবার পর ঠিক মধ্যস্থলে একটি ত্রিরথের সমাবেশ। বিন্যাসটিকে অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে আসন সপ্তরথ কিন্তু মধ্যস্থিত ত্রিরথ ও উভয়পার্শ্বের একক রথক উদ্গগনমদ্বয়ের মাঝখানে মূল বর্গক্ষেত্রের উপর যে গভীর নিম্নায়ত অংশ রহিয়াছে তাহা স্বাভাবিক রথকাসন পরিকল্পনার বস্তু নহে। আসনের দক্ষিণ দিকের বাহু পঞ্চরথ, মধ্যস্থিত ত্রিরথটি এখানে একটি সাধারণ উদ্গমনের মতই উঠিয়া আসিয়াছে, ত্রিরথ আকারে নয়। মন্দিরের প্রবেশদ্বার এই দিকে বলিয়াই এই ব্যবস্থা। শাস্ত্রানুসারে আসনের এই বিচিত্র বিন্যাস মন্দিরটির দেওয়াল ও শিখর বাহিয়া একেবারে শেষ অবধি চলিয়া গিয়াছে।

বাড় অংশে কয়টি ভাগ ছিল বলা দুষ্কর। পাভাগ ছিল কিনা সন্দেহ থাকিলেও বর্তমানে তাহার অস্তিত্বের আর কোন পরিচয় অবশিষ্ট নাই। জাঙ্ঘের উপর বান্ধনা বিভাগ বা অন্য কোনরূপ অলঙ্করণের কোন প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করা যায় না। টানা দেওয়ালটি গিয়া শেষ হইয়াছে কয়েক সারি উল্টা কাটনির রেখায়। ইহাই এখানে বরণ্ড। ইহার উপর হইতে অলঙ্কারসমৃদ্ধ গণ্ডীটি প্রথম হইতে বাঁকিয়া উঠিয়া গিয়াছে। গণ্ডীর ব্যাপক অলঙ্করণের কথা ভাবিলে বাড় অংশের সম্পূর্ণ অনলঙ্কৃত সরল রূপ কিছুটা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। তাই মনে হয় সম্ভবত বাড়কে ঘিরিয়া একটি আবৃত প্রদক্ষিণ পথ ছিল বলিয়া তাহার উপর অলঙ্করণ সমাবেশের কোন প্রয়োজন হয় নাই।

বাড়ের উপর হইতে তুঙ্গ শিখরটি প্রথম হইতেই বাঁকিয়া গিয়াছে। আসনের বিন্যাস অনুযায়ী সম্মুখের দিকটি ছাড়া অন্য তিনদিকে গণ্ডীর বিভাগ নয়টি করিয়া। গণ্ডীর অলঙ্করণ পরিকল্পনাও এই লম্বমান ধারাকে অবলম্বন করিয়াই। চৈত্য অলিন্দের সারি, ফুল লতাপাতার বঙ্কিম উর্দ্ধগতি গণ্ডীর সর্বাঙ্গকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার মধ্যে রাহা পগের উর্দ্ধাংশে প্রত্যেক দিকে একটি করিয়া সুবৃহৎ কীর্তিমুখ। তিনদিকের কীর্তিমুখগুলি পড়িশা গিয়াছে একমাত্র উত্তরদিকেরটি এখনও বিদ্যমান। কনিক পগের উপর ভূমিভাগ করা হয় নাই ফলত ভূমি আমলেকের অলঙ্করণও অনুপস্থিত। গণ্ডীর উপরে প্রত্যেকটি লম্বমান বিভাগের প্রান্ত বাহিয়া পাতলা টালির ছড় নামিয়াছে। উচ্চাবচ বিভিন্ন স্তরের প্রান্তে টালিগুলির সমান্তরাল অবস্থান আনুভূমিক বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছে বটে কিন্তু পগ বাহিত লম্বমান বিভাগের উপর প্রাধান্য লাভ

করিতে পারে নাই। অলঙ্করণের বিষয়বস্তুগুলি সূক্ষ্ম নয়, আকারে কিছুটা বৃহৎ—কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ বোধের অভাব কখনও ঘটে নাই। রূপচেতনার মধ্যে যে বলিষ্ঠ সজীবতা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে পরিমাণ বোধের বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া তাহা সুন্দর হইয়াছে।

গণ্ডীটি প্রথমাবধিই বাঁকিয়া গিয়াছে। বহিরেখার বক্রগতি দ্রুত উপরের দিকে উঠিয়া গেলেও স্থানচ্যুতি কোথাও ঘটে নাই। মন্দিরদেহের রথ পগের কোণগুলি অমার্জিত ও তীক্ষ্ণই রহিয়া গিয়াছে বলিয়া গণ্ডীর রূপ রেখা কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। বন্ধনের কাঠিন্যে যে শক্তি রহিয়াছে তাহাকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিবার কোন প্রচেষ্টাই এখানে হয় নাই। দেহে ও অলঙ্করণে সর্বত্র সজীব প্রাণশক্তির স্ফুরণেই দেউলিয়া মন্দিরের রূপবৈশিষ্ট্য ও তাহার সৌন্দর্য্য।

গণ্ডী শেষ হইয়াছে একটি গোলাকার অনুচ্চ স্তম্ভের পাদমূলে। নাগর মন্দিরের আমলক শিলার ব্যবহার খুব সম্ভবত এ মন্দিরটিতে হয় নাই। গণ্ডীর দেহেও তো ভূমি আমলকের কোন চিহ্ন নাই। অনুচ্চ স্তম্ভটি শিখরের উপর হইতে খানিকটা উঠিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে; ঠিক মধ্যস্থলে রহিয়াছে একটি লৌহদণ্ড।

দেউলিয়া মন্দিরের ভিতরের দিকে গণ্ডী উঠিয়াছে উল্টা কাটনি ছাড়িয়া। দেওয়ালের উপর হইতেই নিয়মিত ঘনত্বের উল্টা কাটনি ছাড়িয়া উঠিয়া যাওয়ার ফলে আকৃতি হইয়াছে ক্রম-হ্রস্বায়মান। অবশেষে একটা অতিক্ষুদ্রবর্গে গিয়া গণ্ডী শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রশস্ত দেওয়াল ভেদ করিয়া ত্রিভুজাকৃতি তীক্ষ্ণাগ্র দ্বারপথটিও রচিত হইয়াছে ওই একই পদ্ধতিতে, উল্টা কাটনি তুলিয়া। বাহিরের দিকে বাড়ের অন্ত ভূমিতে বরণ্ড রচনাতেও উল্টা কাটনিরই ব্যবহার।

দেউলিয়া মন্দিরের অঙ্গ বিন্যাস ও নির্মাণ কৌশল যে ঠিক কোন ভাবনা কল্পনা হইতে উৎসারিত হইয়াছিল আজ তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। দেওয়ালকে ঘিরিয়া পরিবেষ্টিত প্রদক্ষিণ পথ নির্মাণ করিবার প্রথা অজ্ঞাত নয়, গুপ্তযুগের মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টায় ইহাই ছিল বিধি। আসন ও তাহাকে অনুসরণ করিয়া মন্দিরদেহে যে বিভাগসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে নাগররীতির ক্রমবিবর্তনের সহিত যুক্ত হইলেও প্রচলিত কোন আঞ্চলিক পদ্ধতিতে তাহার স্থান নাই। তবে বিস্তৃত বিভাগ পরিকল্পনাকে যেভাবে সংবদ্ধ রূপে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার পশ্চাতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকাই স্বাভাবিক। বরাকরের সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরের প্রধান রথক ও অপ্রধান উদ্গমনের মধ্যে নিম্নায়তন একটা অংশ ছিল, দেউলিয়ার বিস্তৃত রথকাসনের মধ্যেও অনুরূপ নিম্নায়ত অংশের অবস্থান রহিয়াছে। হয়ত বরাকরের আসন পরিকল্পনার মধ্যে যে সম্ভাবনা ছিল পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়া দেউলিয়া মন্দিরের বিস্তৃত রথ পগ সম্বলিত মন্দিরদেহে পরিণতি লাভের চেষ্টা করিতেছে। মন্দির শীর্ষের গোলাকৃতি স্তম্ভটির প্রকৃতরূপ জানিবার কোন উপায় নাই; তবে স্তূপশীর্ষ পীড়া দেউলের মত স্তূপশীর্ষ শিখর মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টার পরিচয় ইহাতে রহিয়া গিয়াছে, এরূপ হইতে পারে।

দেউলিয়া মন্দিরের যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলিলাম উত্তর ভারতের নাগর মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টায় ইহাদের একটিরও স্থান হয় নাই। পরিকল্পনা ও বিন্যাসের এই অভিনবত্ব নাগর মন্দিরের পরিজ্ঞাত সমস্ত রূপের বাহিরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। দেউলিয়া মন্দিরে যে সংবদ্ধ রূপরেখা আমরা

দেখিতে পাইতেছি তাহার পশ্চাতে এই জাতীয় নাগর মন্দির নির্মাণপ্রচেষ্টার সুদীর্ঘ ইতিহাস যে ছিল তাহা অনস্বীকার্য। পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তগুলি লোপ পাইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে দেউলিয়ার মন্দির গাত্রে। নাগর মন্দিরের এই বিশিষ্ট রূপরেখাই বাংলার আঞ্চলিক রূপ—নাগর মন্দির নির্মাণে বাংলার স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। নাগর শিখর নির্মাণে বাংলা দেশে যে স্বতন্ত্র ধারাটি গড়িয়া উঠিতেছিল যে কারণেই হোক বাধা পাইয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার পরিপূর্ণ সমুন্নত রূপটি আজ আর দেখিতে পাইতেছি না।

দেউলিয়া মন্দিরের আসনের বৈচিত্র ও সংবদ্ধ পরিকল্পনায় গঠিত রূপরেখা রচনার অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে কতদিন সময় লাগিয়াছে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিবার উপায় নাই। বরাকরের সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের পরে দেউলিয়ার মন্দির নির্মাণ করিতে দীর্ঘ সময় লাগিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ। এই দীর্ঘ সময়ের একটা সীমা হয়ত নির্দেশ করিয়া দেওয়া যায়। একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে মূর্তি রচনায় ও মন্দির নির্মাণে অলঙ্করণের সূক্ষ্ম লালিত্য দেউলিয়া মন্দিরের গণ্ডীতে এখনও উপস্থিত হয় নাই; নবম শতকীয় বরাকরের সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের উত্তরকালে নির্মিত এই মন্দিরটি তাই দশম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছে এমন অনুমান অযৌক্তিক না হওয়াই সম্ভব।

নাগর শিখর নির্মাণে বাংলার স্থানীয় শিল্পীদের ভাবকল্পনা ও অভিজ্ঞতা ওডিশার রেখ দেউলের অনুশাসনের উপর আরোপ করিয়া মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টার পরিচয় রহিয়াছে, বাঁকুড়া জেলার সোনাতপালের সূর্য মন্দিরে, বোলাডা (বহুলাড়া)র সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে, ডিহরের ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর মন্দিরে ও সুন্দরবনের জটার দেউলে। সোনাতপাল গ্রামের মন্দিরটির অত্যন্ত ভগ্নদশা; যেটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহার মধ্যেই এই মিশ্ররূপে প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। আসন পঞ্চরথ, তাহাকে অনুসরণ করিয়া মন্দিরদেহের লম্বমান উচ্চাবচ বিভাগ। বাড় পঞ্চাঙ্গ। পাভাগ রেখার কোন অস্তিত্ব আজ নাই, তবে বান্ধনা রেখায় দ্বিধাবিভক্ত জাঙ্ঘ ও বরণ্ড রেখার সমাবেশ দেখিয়া পাভাগের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া নেওয়া অন্যায় হইবে না। বর্তমান অবস্থায় মন্দিরের উর্দ্ধাংশের ক্ষতি হইয়াছে সর্বাধিক। মস্তক ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, গণ্ডীটিও বহুলাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত। গণ্ডীর অবশিষ্ট অংশ হইতে বুঝা যায় কনিক পগের উপর ভূমি বিভাগ করিয়া ভূমি আমলক বসান হইয়াছিল। কাটা ইটের উপর পলাস্তারা করিয়া লম্বমান ধারায় গণ্ডীর সজ্জা বিন্যাস। উপকরণ হইল চৈত অলিন্দ ও ফুল লতা পাতার নকসা। গণ্ডীর অঙ্গসজ্জা আনুভূমিক বিভাগের কোন স্থানে হয় নাই।

আসলে বাড়ের বিভাগ বিন্যাসে এমন কতগুলি ক্ষেত্রে সোনাতপালের সূর্যমন্দিরে ওড়িশার পুরী-ভুবনেশ্বর অঞ্চলের রেখ মন্দিরের প্রভাবের স্পর্শ ইহাতে পড়িয়াছে ঠিকই কিন্তু নির্মাণ কৌশল, অলঙ্করণ ও রূপরেখা রচনায় বাংলার স্থানীয় শিখর নির্মাণ প্রচেষ্টার সহিত ইহার যে কোন প্রভেদ ঘটে নাই দেউলিয়া মন্দিরের সহিত ইহার নিকট সাদৃশ্যই তাহার প্রমাণ। আসনের বিস্তার ও বিন্যাসের পার্থক্য থাকিলেও দেউলিয়া মন্দিরের আসন ও পগের কোণগুলির তীক্ষ্ণতা বহিরেখার কাঠিন্য হইতে সূর্যমন্দির মুক্ত হইতে পারে নাই। সোনাতপাল মন্দিরের গণ্ডীর যেটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাতে দেউলিয়া মন্দিরের গতিভঙ্গ অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে ধরা পড়ে। একই ভাব

কল্পনার ফল না হইলে এতটা নৈকট্য ঘটিতে পারিত না। মস্তক অংশ পৃথক হওয়াই সম্ভব। সোনাতপাল মন্দিরের গণ্ডীতে ভূমি আমলকের সমাবেশ দেখিয়া মনে হয় গণ্ডীর উপরে বেকী বাহিত আমলক শীর্ষ রচনা করিয়াছিল।

নির্মাণ কৌশলের দিক দিয়াও সোনাতপালের সূর্য মন্দির দেউলিয়ারই সমগোত্রীয়। উপকরণ উভয়ক্ষেত্রেই ইট। সূর্য মন্দিরে গণ্ডীর অন্তর, তীক্ষ্ণাগ্র ত্রিভুজাকৃতি দ্বারপথ, বরণ্ড রেখা সমস্তই উল্টা কাটনি তুলিয়া রচিত। দেউলিয়ার মত এখানেও উল্টা কাটনিই যেন নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। গণ্ডীর অলঙ্করণে বিন্যাস পরিকল্পনা উভয় ক্ষেত্রেই লম্বমান পগবাহিত বিভাগকে অবলম্বন করিয়া, রূপকল্পনার প্রকৃতিও একই প্রাণকেন্দ্র হইতে উৎসারিত; বৈষম্য যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা অপ্রধান বিবরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেউলিয়া মন্দিরের সহিত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য সোনাতপালের সূর্য মন্দিরকে বাংলার শিখর মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টার একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের সহিত যুক্ত করিয়া তাহার নির্মাণ কালও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। মন্দিরটি দেউলিয়ারই সমসাময়িক।

সোনাতপালে মিশ্ররূপের যে পরিচয় প্রকাশ পাইল প্রধানত তাহাকেই অবলম্বন করিয়াই বাংলার পরবর্তী শিখর মন্দিরগুলির সৃষ্টি। সুন্দরবনের জটার দেউল ও বাঁকুড়া জিলার বোলাড়া (বহুলড়া) গ্রামের সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দির মিশ্ররূপের বিবর্তন ধারার পরিচয় বহন করিতেছে। সাম্প্রতিক সংস্কারের ফলে জটার দেউলের আদিরূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। পুরাতন একটি আলোকচিত্র দেখিয়া মনে হয় ইট দিয়া নির্মিত মন্দিরটি পঞ্চরথ আসনের উপর সমসংখ্যক রথ পগ বিভাগে বিভক্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছিল। বাড় ছিল পঞ্চাঙ্গ। মস্তক অংশের অস্তিত্ব দেখা যাইতেছে না—আগেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এতাবৎকালে বাংলার শিখর মন্দিরে রথ পগের অমার্জিত কোণ যে কাঠিন্য সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল জটার দেউলে তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। আসনে ও মন্দিরদেহে রথ পগের কোণগুলি মার্জনা করিয়া বর্তুলায়িত করিয়া তোলা হইয়াছে, ফলে মূলতঃ বর্গাকৃতি শিখর মন্দিরটিকে বাহির হইতে খানিকটা গোলাকৃতি বলিয়া মনে হয়। মন্দির দেহের এই কমনীয় আকৃতি আরও ঐশ্বর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে সমগ্র গণ্ডী ব্যপ্ত করিয়া পগসমূহের লম্বমান প্রবাহ অবলম্বন করিয়া রচিত সূক্ষ্ম অলঙ্করণের ব্যাপক বিস্তারে। জটার দেউলের গণ্ডীতে অলঙ্করণের একটি নতুন উপাদান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শিখর মন্দিরের উন্নতরূপে গণ্ডীর গাত্রে ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর মন্দির বসাইয়া অঙ্গ সজ্জাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার রীতি সমস্ত আঞ্চলিক রূপেই দেখা গিয়াছে। গণ্ডীর কোন অংশে ইহাদের অবস্থান হইবে তাহার সাধারণ কোন নিয়ম নাই, অঞ্চল বিশেষে অবস্থান ক্ষেত্রের পরিবর্তন হইয়াছে। জটার দেউলে রাহা পগের নিম্নাংশে উপর্যুপরি আনুভূমিক রেখার উপর সজ্জিত কয়েক সারি অতিক্ষুদ্র অঙ্গশিখর উপরের দিকে খানিকটা উঠিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে আবার কনিক পগ বাহিয়া এক সারি অঙ্গ শিখর একেবারে গণ্ডীর শেষ অবধি চলিয়া গিয়াছে। কনিক পগের প্রান্ত ভূমি বিভাগ ও তাহাকে নির্দেশ করিয়া বলয়াকৃতি ভূমি আমলক। ভিতরের দিকে পগ রেখার প্রান্ত বাহিয়া পাতলা টালির ছড় আনুভূমিক বিভাগের আভাস রাখিয়া যায়, কিন্তু লম্বমান রেখার প্রাধান্য অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই।

দেউলিয়া ও সোনাতপাল মন্দিরে গণ্ডীর যেটুকু ভার অবশিষ্ট ছিল জটার দেউলে সেটুকুও

আর নাই। সূক্ষ্ম অলঙ্করণ মণ্ডিত গণ্ডীটি হইয়া উঠিয়াছে লঘু ও স্বচ্ছন্দ। বরণ্ডের উপর হইতে ওড়িশার রেখ দেউলের মত খানিকটা সোজা উঠিয়া ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে একটু ঝুঁকিয়া বিষম প্রান্তে গিয়া শেষ হইয়াছে। বর্তুলায়িত বর্গাকার গণ্ডী রূপ কল্পনার বিশিষ্ট পরিণতির দিকে যে আগাইয়া চলিয়াছে তাহা বুঝিয়া নিতে অসুবিধা হয় না।

জটার দেউলের নিকটে একটি তাম্রপট্টোলী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পট্টোলীটির কোন সন্ধান এখন পাওয়া যায় না, তবে পূর্বতন বিবরণীতে দেখা যায় পট্টোলীটি নাকি ৮৯৭ শকাব্দে (৯৭৫ খৃষ্টাব্দ) রাজা জয়ন্তচন্দ্র কর্তৃক জটার দেউল নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। পট্টোলী কথিত বৎসরটি জটার দেউলের নির্মাণ কাল হওয়াই সম্ভব। দেউলিয়া ও সোনাতপালে যে ভাবকল্পনা বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল জটার দেউলে তাহারই মার্জিত সমুন্নত রূপ। দশম শতকীয় মন্দিরদ্বয়ের উত্তর সাধনার ক্ষেত্র জটার দেউল ঐ শতাব্দীরই শেষ দিকের সৃষ্টি হইলে তাহাতে অসঙ্গতির কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

দেউলিয়া সোনাতপাল ও জটার দেউলে শিখর মন্দির নির্মাণের যে নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার পরিচয় রহিয়াছে তাহাই পরিণতি লাভ করিল সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবালয় বোলাড়ার (বহুলাড়া) সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দিরে। জটার দেউলের মত বোলাড়ায় মন্দিরেও পুরী-ভুবনেশ্বর অঞ্চলের রেখ দেউলের স্পর্শ রহিয়াছে কিন্তু সে প্রভাব সর্বব্যাপী হইয়া উঠিতে পারে নাই।

মন্দিরটি পঞ্চরথ আসনের উপর উঠিয়াছে; বাড় পঞ্চাঙ্গ, তাহার উপর অনতিউচ্চ গণ্ডী। মস্তক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আসনে ও মন্দিরদেহে সর্বত্র রথ পগের কোণগুলি সযত্নে মার্জিত করিয়া বর্তুল করিয়া তোলা। কমনীয় লম্বমান রেখায় বিধৃত মন্দিরটির রূপ কল্পনার সৌন্দর্য সন্ধান শুরু হইয়াছে এইখানেই। পাভাগ রেখাগুলি খুব বিস্তৃত নয়, ইহাদের মধ্যে রূপ বৈচিত্র্যও খুব একটা নাই, উচ্চাবচ রথকচিহ্নিত দেওয়ালের উপর দিয়া টানা বাহিয়া গিয়াছে। বান্ধনা ও বরণ্ড রেখায় নীচের দিকে কিছুটা কাটনি তুলিয়া আনা হইয়াছে কিন্তু সে সবটুকুই গিয়াছে ইহাদের কমনীয় বর্তুল রূপের অন্তরালে। বাড় অংশে অলঙ্করণ কিন্তু অধিক নয়। ওড়িশার পঞ্চাঙ্গ বাড়ের তল জাঙ্ঘে থাকে ও উপরজাঙ্ঘে থাকে বদ্ধকাম মূর্তি, বোলাড়ায় কিন্তু উভয় জাঙ্ঘ ব্যাপিয়া উঠিয়াছে একটি পরিমিত আকারের শিখর মন্দিরের প্রতিকৃতি। তাহার বাড়ের মধ্যে একটি কুলুঙ্গির ভিতর রহিয়াছে পোড়ামাটির মূর্তি। বরণ্ড হইতে বিস্তৃত অলঙ্করণ আরম্ভ হইয়াছে। বরণ্ডের বৈচিত্র্য আনিয়াছে ক্রমোন্নত কাটনিগুলি। কাটনির বহুল সমাবেশও কিন্তু মন্দিরদেহের কমনীয়তার ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিতে পারে নাই বরং ইহারাই ললিত হইয়া উঠিয়াছে। বরণ্ডের সর্বনিম্ন রেখায় নীচে একসারি মালার অনুকৃতি তাহার মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের মূর্তি। মধ্যবর্তী একটি স্তরে পরিমিত আকৃতির এক সারি শিখরমন্দিরের অনুকৃতি।

বরণ্ডের উপর হইতে উঠিয়াছে তুঙ্গ শিখর। গর্ভের সহিত অনুপাতে শিখরের সমধিক উচ্চতা ও সর্বাঙ্গের লম্বমান রেখাপথ বাহিয়া সূক্ষ্ম অলঙ্করণের সমারোহ গণ্ডীর বিস্তারে কোথাও ভার সঞ্চয়ের অবকাশ দেয় নাই। সমগ্র মন্দিরটির প্রাণস্পন্দন যেন ঈষৎ বক্ররেখায় বিধৃত গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। কনিক পগের উপর বলয়াকৃতি ভূমি আমলকের সমাবেশ

রাহা পগের দুই প্রান্তে আর একসারি ভূমি আমলক। কনিক পগের প্রান্ত বাহিয়া পাতলা চাঁদির ছন্দ, রাহা পগের ধারেও তাহারই অস্ফুট আভাস। আনুভূমিক বিভাগে ইহাদের সহিত রহিয়াছে বিভিন্ন পগের উপর ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও গভীরতায় সৃষ্ট অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ রেখা। হয়ত ওড়িশায় গণ্ডী বিন্যাসের কথা কল্পনা করিয়াই ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু প্রবাহমান পগ পথ বাহিত লম্বমান ধারায় বিন্যস্ত অলঙ্করণ পরিকল্পনার উপরে আনুভূমিক রেখার স্বতন্ত্র গরিমা থাকিতে পারে নাই।

বোলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে অঙ্গশিখর সমাবেশের পদ্ধতিটিও লক্ষ্য করিবার মত। ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে রাহা ·পগ। জটার দেউলের মত রাহা পগের নিম্নাংশ সারি সারি ক্ষুদ্রাকৃতি অঙ্গশিখরে আচ্ছন্ন, আবার তাহারই দুই প্রান্তে একসারি করিয়া অঙ্গশিখর গণ্ডীর শেষ অবধি উঠিয়া গিয়াছে।

অলঙ্করণের সূক্ষ্মতা ও নিশ্চিত·পরিমাণ বোধ উপাদানের আকৃতি সমস্ত বৈষম্য একেবারে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। আকৃতির দিক দিয়া রাহাপগের উপরে চৈত্য অলিন্দ বা ভদ্রদেউলগুলি কিছুটা বৃহদায়তনের। কিন্তু গণ্ডীর সর্বাঙ্গে রূপ কল্পনার যে জাল বুনিয়া তোলা হইয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া ঐ চৈত্য অলিন্দ বা ভদ্রদেউলের অস্তিত্বের স্বতন্ত্র কোন প্রভাব জাগিয়া উঠিতে পারে না। সবকিছুই একটা সার্বভৌম রূপকল্পনার অংশ হিসাবে মিলিয়া যায়।

অপরূপ অলঙ্কৃত গণ্ডীটির উর্দ্ধগতি জটার দেউলের মতই সংযত কিন্তু স্বচ্ছন্দ। ভিতরের দিকে উল্টা কাটনি দিয়া গণ্ডীর অন্তর রচিত। ত্রিভুজাকৃতি দ্বারপথও ঐ একই পদ্ধতিতে গঠিত। সংস্কারের ফলে দ্বারপথের সম্মুখের দিকের আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাই আদি রূপের পরিচয়টি ঠিক পাওয়া যায় না, তবে সামগ্রিক কমনীয়তার প্রভাব তাহার উপর নিশ্চয়ই পড়িয়াছিল।

রূপ কল্পনা ও রূপরেখা রচনায় বোলাড়ার ললিত গম্ভীর সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দির সুদীর্ঘ কালের চর্চ্চার মধ্য দিয়া লব্ধ পরিণত শিল্প চেতনার ফল। বরাকর, দেউলিয়া, সোনাতপাল ও জটার দেউলে যে সৌন্দর্য্যবোধ বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল বহুলড়ায় তাহাই পরিণতি লাভ করিল। ইহার পরিণত রূপের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আনন্দ কুমারস্বামী মন্দিরটি দশম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয়ের অনুমান মন্দিরটি একাদশ কিংবা দ্বাদশ শতকীয়। জটার দেউলের আলোচনা প্রসঙ্গে সুন্দরবনের মন্দিরটি দশম শতকীয় বলিয়া বলিয়াছি তাহারই পরিণত রূপ বোলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দির একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়া থাকিবে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে কাল নির্ণয়ের ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ সর্বদাই থাকিয়া যায়—এ সম্ভাবনার কথা বলিয়া রাখা ভাল।

বাঁকুড়া জেলার ভিহর গ্রামের ষঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর (সল্লেশ্বর) মন্দির দুইটি বোলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দিরের সহিত ভাব কল্পনার একই পর্যায়ে সৃষ্ট। মাকরা পাথরে নির্মিত মন্দির দুইটির বাড় পর্যন্ত অবশিষ্ট রহিয়াছে। মন্দির দুইটি কখনও সমাপ্ত হইয়াছিল কি না তাহা জানিবার উপায় নাই। মন্দির দেহের যে পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে বহিরঙ্গের দিক দিয়া বোলাড়ার

মন্দিরের সহিত তাহার ভাবকল্পনাগত সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। অলঙ্করণের প্রশ্নেও ওই একই কথা। বরণ্ডের নীচে বোলাড়ার মত ডিহরের মন্দিরদ্বয়ে মালার সারি চলিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত মূর্তি। মাকরা পাথরের উপর পলস্তারা দিয়া অলঙ্করণ রচিত হইয়াছিল। পলস্তরার আবরণ অনেক ক্ষেত্রেই অপসৃত হইয়াছে। কিন্তু এই অলঙ্করণের আদিরূপের যেটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহার সহিত বোলাড়ার অলঙ্করণের প্রকৃতিগত সমগোত্রীয়তা খুব সহজেই ধরা পড়ে। দেহের ও অলঙ্করণের নিকট সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ডিহরের মন্দির দুইটি বোলাড়ার মন্দিরের সমসাময়িক ও সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে কোন বাধা থাকে না।

উত্তর রাঢ়ের লোকসংগীত

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

ভাঁজো

'ভাঁজো লো কলকলানী মাটির লো সরা'—বিচিত্র সুরে একসাথে নানান্ বয়সের মেয়েরা গেয়ে উঠে সাথে সাথে নেচে চলে কিশোরীর দল—অপরূপ দেহব্যঞ্জনায়। মনে তাদের খুসীর আমেজ—তাই এই নাচগান আর রঙ্গরস; আর আছে বিশ্বাসের দৃঢ়তা, জানে এভাবেই ভাঁজো সত্যিই কলকলিয়ে উঠবে—ধরিত্রীর বুকে নেমে আসবে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারা, ফলবে প্রচুর শস্য; সোনারঙ-এর ফসলের স্বপ্নে মন তাদের বিভোর—শস্যের কামনায় চোখে মুখে বিদ্যুতের শিহরণ। বীরভূম বর্ধমান জেলার পল্লীঅঞ্চলে ভাজুই বা ভাঁজো পূজা উপলক্ষ্যে এই গান গীত হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে ইন্দ্রপূজার উৎসব। এর পরদিন হতেই সুরু হয় ভাঁজোর আচারপদ্ধতি। ইন্দ্রপূজার পরদিনই সেই 'ইদ্‌তলা'র মাটি নিয়ে এসে নতুন সরা বা পাকাতালের ঘুঞ্রির মধ্যে সেই মাটি কিছু ইঁদুর কুড়ো মাটি অন্যান্য মাটির সাথে মিশিয়ে রাখা হয়। শনের বা কালকলায়ের বীজ দিয়ে সরা বা ঘুঞ্রিটিকে পূর্ণ করা হয়।

ইন্দ্রপূজার পর আটদিন নিত্যপূজা চলে। গ্রামাঞ্চলে কিশোরীর দল প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে চাল, ডাল, সঃতেল, নাঃতেল ইত্যাদি ও নগদ পয়সা সংগ্রহ করে এই পূজার জন্য। আটদিন পরে 'ভাজুই' মায়ের জাগরণ পূজা। গ্রামের যে সমস্ত পুরুষ বা মহিলা জাগরণের দিন উপবাস করে তারা সন্ধ্যায় পুকুরে স্নান করে। পুকুর হতে এক কলসী জল ভরে গ্রামে নিয়ে আসা হয়। আসার সময় ঢাক, কাঁসী, ধুপধুনা, শালুকের মালা, সিঁন্দুর ও পূজার অন্যান্য আসবাবপত্র নিয়ে উপবাসীরা ভাজুই মাকে অনুসরণ করে। এইভাবে মায়ের বারি(১) নিয়ে সাধ্যমত বাদ্যধ্বনি সহকারে উপবাসীরা গ্রামের সমস্ত পথ প্রদক্ষিণ করে। গ্রামের অধিবাসীগণ ভক্তিরসাপ্লুত মন নিয়ে এই দৃশ্য দেখে। যার মাথায় বারি থাকে তার ভর (২) নামে। গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ভাজুই মাকে তাঁর আঁটনে (৩) স্থাপন করা হয়। উপবাসী ছেলেমেয়েরা ভাজুই মা এসেছে কিনা জানার জন্য 'বারি'র উপর কিছু ফুল চাপিয়ে দেয়। সেই ফুল আপনা হইতেই উপবাসীর হাতে গড়িয়ে পড়লে জানা যা যে ভাজুই মা এসেছেন। ফুল পড়ার আগে উপবাসীরা ভাঁজুই মন্ত্র পড়ে একপাতা তুলসী হাতে নিয়ে—

একপাতা তুলসী ভাজুই মা কুমারী
ভাজুই জাগো তো জাগো
পায়েতে সোনার নুপুর বাজে।
ইন্দ্ররাজা ঠাকুর কোন ঘাটে কোন দেবতা জাগো

এই মন্ত্র ব'লে উপবাসী হাত পেতে বসে থাকে এবং ফুল আপনা হতে পড়ে যায়। এই আচারের মূলে আছে যাদুবিশ্বাস যা অনার্য্য-মানস হতে অদ্ভুত। এই উৎসব উপলক্ষো যে গান গাওয়া হয় তার কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হ'ল—

(১)

গোয়ালেতে গরু নাই ভাই ঘুঙুর কেন বাজে *
চাল (৪) পানে দেয়ে দেখি কেষ্ট ঠাকুর নাচে
ওপারে গাই বেয়াল (৫) গাই-এর নাম হাসি
বাগালকে (৬) গড়িয়ে দোবো পিতল বাঁধা কাঁসি
ও লাজের মাথ খাও
পিতল বাঁধা কাঁসি

(২)

শালুক ডাঁটার ঘর করিলাম
নেকের পেকের (৭) করে
কাল আনলাম পরের বেটি
ও লাজের মাথ খাও
জলে ভিজে মরে।
কাঁতরা (৮) ভেঙে শাক বুনলাম
শাক দলমল করে
শাক বিচে সৈঁকা (৯) পেলাম
সতীন কেঁদে মরে
ও লাজের মাথা খাও।

(৩)

মোড়লদের বাড়িতে ওল ফুলছে
খেয়েছে কি না খেয়েছে
ও লাজের মাথা খাও
গলা লেগেছে।

(৪)

আম ধরে থোবা থোবা তেঁতুল ধরে বেঁকা
হায় হায় তেঁতুল ধরে বেঁকা
নামাল দেশে দেখে এলাম
ও লাজের মাথা খাও
রাঁঢ়ীর (১০) হাতে সৈঁকা।

(৫)

মোড়লদের বাড়িতে ভাই
শত ঝুড়ি আকড়া
মোল্লানকে কাঁধে নিয়ে

ও লাজের মাথা খাও
মোড়ল বাজায় লাকড়া

(৬)

বেউল বাঁশে বাঁকখান
তেউর লতায় শিকে
কেষ্ট কাঁধে ভার দিয়ে
চলিল রাধিকে
ও লাজের মাথা খাও

(৭)

ভাজুই লো সুন্দরী মাটি লো সরা
আমার ভাজুইকে দেব ও মজার আচ্ছা বেশ
পঞ্চ ফুলের মালা
ও লাজের মাথা খাও।

(৮)

ও পারের নিমগাছটি
নিম ঝলমল করে
ছোট ঠাকুরের কোঁচা দেখে
ও লাজের মাথা খাও
মন ছটফট করে।

(৯)

আলুন্দার বিলে রে ভাই
বগাবগি চরে
বগার পায়ে জোঁক লেগেছে
ও লাজের মাথা খাও
বগি হেঁকে মরে।

উপরিউক্ত গানগুলি পড়ে কয়েকটি সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায়। প্রথমতঃ অনুষ্ঠানটি মূলত মেয়েদের এবং গানের ভাব ও ভাষা মেয়েলী। অধিকাংশ গানেই একটি নিম্নমধ্যবিত্ত বা অন্ত্যজ পরিবারের সহজ, সরল, গার্হস্থ্য পল্লীচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। গানগুলিতে ব্যঙ্গরসিকতার বা আদি-রসিকতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। ভাজুইকে কখনও বা সুন্দরী কন্যারূপে কল্পনা করা হয়েছে। 'ও লাজের মাথা খাও' এই ধুয়াটি প্রতিটি গানেই পাওয়া যায়।

'ভাঁজো' সঙ্গীতের সাথে যে নৃত্য—তাতে মুখ্যত গ্রামের কিশোরীরাই অংশ গ্রহণ করে। বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত 'ভাঁজো' মূর্তিকে কেন্দ্র করে চারিপাশে মাটির পাত্রগুলি সাজিয়ে রাখা হয়। মাটির পাত্রে দীর্ঘ আট দিনের ব্যবধানে কালকলায়ের ছোট ছোট ছোট গাছ বেরিয়েছে। পাত্রগুলি

গোলাকারে সাজিয়ে তাদের কেন্দ্র করে কিশোরীবৃন্দ সাড়ী পড়ে মণ্ডলাকৃতিতে কোমর দুলিয়ে নৃত্য করে। নৃত্যে পাদকর্ম বা অক্ষিকর্ম নাই।

'ভাঁজুই' বা 'ভাঁজো' সম্পর্কে উচ্চবর্ণের সমাজের এক পৌরাণিক বিশ্লেষণ আছে। শক্রোত্থানের পর বিজয়ী ইন্দ্রের সম্মানে যে নৃত্যকলার আয়োজন হয় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে। শক্রোত্থানই অভিনয়-শিল্পের প্রথম সোপান। এই নৃত্যনাট্যের প্রথম শিল্পীর নামের অপভ্রংশই 'ভাঁজুই' বলে অনুমান করা হয়।

বোলান

বর্ধমান জেলার কাটোয়া অঞ্চলে, মুর্শিদাবাদ জেলার বিশেষ করে কান্দি অঞ্চলে ও নদীয়া জেলার কিছু অংশে বোলান গানের প্রচলন দেখা যায়। এই উৎসব উপলক্ষ ব্রত উপবাস ও অন্যান্য আচারানুষ্ঠান চলে প্রায় সারা চৈত্র মাস কিন্তু প্রধান ধর্মানুষ্ঠানগুলি পালিত হয় চৈত্র মাসের শেষ চার দিন। গ্রামের শিবতলায় অগণিত 'ভক্ত্যা'র দল উপোস করে গাজনোৎসব পালন করে। আর্যেত্তর সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষ ও মহিলারা মদের নেশায় বিভোর হয়ে সারা দিন রাত নৃত্যগীত করে। যদিও শিবই উপলক্ষ—কিন্তু গানের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রণয় লীলা। কোন উচ্চাদর্শের ভিত্তিতে এই গান রচিত হয় না। উচ্চাঙ্গের কোন ভাব বা তত্ত্বজ্ঞান পরিবেশিত হয় না। পৌরাণিক দেব-দেবীর উপাখ্যানে লৌকিক অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ রূপ আরোপিত হয়।

চৈত্রমাসের যে কোন সন্ধ্যায় এতদঞ্চলে যে কোন গ্রামে শোনা যাবে যৌথ কণ্ঠে বোলানের গান। সমাজের যে অন্ত্যজ শ্রেণী, গ্রামের বাইরে যাদের বাস—তাদের বাড়ির কিশোর আর যুবকেরা এসে সমবেত হয় এক সাধারণ ঘরে—তারপর সুরু হয় গান। মূল গায়েন একটি পদ বলে—দোহারীরা যৌথ কণ্ঠে তার পুনরাবৃত্তি করে।

এই বোলান গান মূলত চার প্রকারের (১) পোড়ো (২) ডাক (৩) সাঁওতেলে (৪) পালাবন্দী। **পোড়ো**—এই গানে যারা অংশ গ্রহণ করে তারা চৈত্রমাসের শেষে শ্মশান হতে মড়ার মাথা নিয়ে আসে তন্ত্রমতে শুদ্ধাচার করে নেয়। এই মড়ার মাথাকে কেন্দ্র করে সঙ্গীত সহযোগে সুরু হয় গৃধিনীবিশাল নৃত্য, শ্মশান জাগানো নৃত্য। দশবারোটি মড়ার খুলি মাঝে রেখে নৃত্যশিল্পীরা প্রথমে গোলাকৃতি করে বসে, বীভৎস তাদের সাজ। মুখে কালী, মাথায় বড় বড় চুল। তারপর হস্তপদ ও গ্রীবাভঙ্গী দ্বারা এমন একটি ভ বের সৃষ্টি করে যেন কতকগুলি শকুনি একত্রে শ্মশানে কোন মৃতদেহের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। যখন উড়ে এসে সমবেত হচ্ছে তখন মুখে তাদের বিকট ভয়াবহ চীৎকার। যেন উৎক্ষিপ্ত শকুনিদলের কণ্ঠস্বর। প্রথমে পক্ষ বিস্তার করে মাটিতে নেমে এল—মাংস ছিঁড়ে ও কাড়াকাড়ি করে খেয়ে আবার পক্ষ বিস্তার করে উপরে উড়ে চলে গেল। যখন একে অন্যের সাথে মাংসের জন্য ডানা নাড়া দিয়ে কলহে ব্যস্ত তখন সে এক বীভৎস দৃশ্য। মুখে পৈশাচিক উল্লাস। শকুনিসুলভ অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে প্রতিটি ব্যাঞ্জনা পরিস্ফুট করে তোলে। তারপরে চক্রাকারে নৃত্য যেন একঝাঁক শকুনি গোলাকারে উড়ছে আর মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। সমগ্র পরিবেশে তন্ত্রমতের প্রচ্ছন্ন প্রভাব। ঢাক কাঁশির সাথে গানও চলে :

আমার কোল ভরা ধন
কোলের মানিক কে কেড়ে নিল।
যার মরে কোলের ছেলে
সে কি থাকতে পারে ধৈর্য্য ধরে॥
মায়ে কাঁদে—'বাবা, বাছা'
ভগ্নী কাঁদে—ভাই
পরের রমণী কাঁদে—
আমার ও কেউ নাই।

মৃতব্যক্তির গলিত দেহ নিয়ে বীভৎস নৃত্য আজও চলে কুড়মুন ও কাঁন্দিতে। নৃত্যশিল্পীর মুখসজ্জায় দক্ষ রূপ সজ্জাকরের ছাপ। প্রথমে সম্পূর্ণ মুখ নীলবর্ণে রাঙানো হয় তার উপর বিচিত্র বর্ণে শিল্পীর তুলি চলে। অনেকটা কথাকলি নৃত্যসজ্জার মত। বর্ণের অপূর্ব সমন্বয়ে দক্ষ হাতের তুলির টানে নিখুঁত রূপসজ্জা।

ডাক—কুড়ি পঁচিশজন বাউড়ী, বাগ্দী, সদগোপ ইত্যাদি শ্রেণীভুক্ত লোক উৎসবের প্রায় একমাস পূর্ব হতে গানের মহড়া চালায়। প্রত্যেকের হাতে একটি লাঠি, লাঠিগুলি প্রথমে একত্র রেখে সারিবন্দী হয়ে নাচগান করে। প্রত্যেকের পরণে শুধু একটি জাঙ্গিয়া, কোমরে ঘণ্টা। হাতে একগাছি করে প্রত্যেকে লাঠি নিয়ে কখনও সারিবন্দী ভাবে, কখনও মণ্ডলাকৃতি করে নৃত্য সুরু করে সাথে গানও চলে :

একদিন গোকুল বিন্দাবনে
দিনে আঁধার হল ক্যানে
গোপাল-তুই নাই বলে।

সাঁওতেলে—এই গানে নাচের অংশই মুখ্য। সদগোপ, বাউরী, বাগ্দী এমনকি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবরাও এই নাচে অংশগ্রহণ করে। বাদ্যযন্ত্র থাকে—ঢোল, বাঁশী, মাদল, ড্রাম, করতাল, জয়ঢাক, ফ্লুট, কর্ণেট, বাঁশী ইত্যাদি। নৃত্যশিল্পীর সারা অঙ্গে বিচিত্র সাজ। গলায় 'কাঁটির মালা', পরণে কালো জাঙ্গিয়া, কালো গেঞ্জি, হাতে মালা, মাথায় লাল ফিতেয় বাঁধা হাস-মুরগীর পালক, কোমরে ঘণ্টা ও হাতে তীর ধনুক। কোন কোন ক্ষেত্রে দলে প্রায় ১০০ জন লোক থাকে। প্রথমে সুরু হয় উদ্দাম যৌথ নৃত্য—তারপর সুরু হয় সঙ্গীত—

জয় মা কালী
আমার আসবে একবার
এস মা তুমি
বিনাযন্ত্রে রাগিণী দাও জননী।
ওগো মা বীণাপানি
এসো মা গৌরী নন্দিনী,
হংস পরে থাকো তুমি গো-শতদলবাসিনী
এসো মা গৌরীনন্দিনী॥

আত্মাবতী মহাশক্তি, ভক্তিদানে
আমায় দাও মা মুক্তি
জানি না তোর ভজন ভক্তি
অজ্ঞানের কর গতি ॥
সন্তানে সান্ত্বনা কর নিজ গুণে
বসে মাগো রত্নামায়া আসনে।
মক্ষীরূপে চণ্ডীপাঠে ভুল করে রাবণে
অকালেতে দেখা দিল রামে ॥
… … …
আয় আয় উমা, আয় আয় আয়
কাল সমন এল নিকটে
জানাই মা তাই তোমার তটে
পরেছি বিষম সঙ্কটে
কি করি উপায়—উমা আয় আয় আয়
(তবে) ধ্যানযোগে দেবীর আসন গো পড়িল টলিয়া
ভক্তে কারণ মর্তে ভুবনে গো এসে দিল দেখা ॥

গান শেষ হয়ে গেলে এই দল নাচতে নাচতে অন্যত্র চলে যায়।

পালাবন্দী—এই শ্রেণীর বোলান অনেকটা যাত্রা গানের মত। পুরুষে মেয়ের সাজসজ্জা করে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করে। ১৫।১৬ জন শিল্পী এতে অংশ গ্রহণ করে। দুখানি ঢোল, দুটি করতাল—এই বাদ্যযন্ত্রই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। একজন মুখ্য গায়েন বা 'বোলানদার' থাকেন। পালাগান হয়—কলঙ্কভঞ্জন. নৌকাবিলাস, মাথুর, সুবলমিলন, দাতাকর্ণ, সীতাহরণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সাবিত্রী-সত্যবান ইত্যাদি। এই জাতীয় পালাগানের চারটি পর্যায় থাকে—পর্যায়গুলি যথাক্রমে বন্দনা, বক্তৃতা, পাঁচালী ও পয়ার।

বন্দনা :— হররমা মাতা আয় বসে রই তোর আশায়।
এ দীনের প্রতি হও সদয় মিনতি জানাই তোমায় ॥
অশিবনাশিনী বিশ্বমাতঃ পদে তোমার করি নিবেদন।
আমি জানি না সাধন, তোমার ভজন ॥
নিজগুণে সরল প্রাণে, দিও শ্রীচরণ মোদের এই আকিঞ্চন।
ওগো তারা চরণ ছাড়া করো না এখন ॥

বক্তৃতা :—রাজা—রাণী চল, আমরা সত্যবানকে নিয়ে বনে যাই
তাছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নাই।
ত্যজি রাজ্য ধন—চল যাই বনে
কেমনে ভ্রমিব বনে অন্ধ নয়নে

রাণী— মরণের ফাঁসি লাগলো আসি, রাজ-তুমি পড়লে ঘোর বিপাকে।
আমি তোমার চরণ বিনে কিছুই তো জানি না-সঙ্গে নাও আমাকে ॥

পাঁচালি— কাট কাটিতে এসে কাননে তোমার এ ভাব হ'ল কেমনে
মুখে বাক্য নাহি সরে　বল কিসের কারণে ?
হায়রে বিধি কি করিলি দিয়ে নিধি হ'রে নিলি
আজি মোরে ফেলাইলি প্রজ্জলিত আগুনে।

পয়ার :— তোমা ভিন্ন গতি নাই—ওহে হরি দয়াময়
কোথায় হে করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু হরি
অভাগিনী ডাকে তোমায় দুটি করযুড়ি
অভাগিনী ডাকে তোমায় অতি সকাতরে
অবলা নারী আমি—রক্ষা কর মোরে
তোমা ভিন্ন গতি নাই—ওহে হরি দয়াময়।

এই বোলান উৎসবে নৃত্যগীতের বিশেষ সমারোহ দেখা যায় কাটোয়ার কাছে উদ্ধারণপুরের ঘাটে। বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ—এই চারটি জেলার প্রায় সমস্ত জাগ্রত শিবঠাকুরকে দেলায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামের 'ভক্ত্যারা' সারা পথ বোলানের নৃত্য-গীত করতে করতে এসে সমবেত হয় উদ্ধারণপুরের ঘাটে। পথেই সারা দিন রাত্রি কেটেছে কিন্তু মুখে কোন ক্লান্তি নেই। সমান উন্মাদনা নিয়ে উপবাসী 'ভক্ত্যা'র দল ও উৎসাহী গায়কের দল নৃত্য করে। সে এক দৃশ্য। দলের পর দল বিকট শব্দ করে তাদের আগমনবার্তা ঘোষণা করে। লাঠি উঁচু করে নাচতে নাচতে এমন ভাবে প্রবেশ করে যেন রাজ্য জয় করে এসেছে। শক্তির খেলায় মেতে উঠে। একটি করে দল আসে বিচিত্র রূপসজ্জায়। দর্শনার্থীর দল হতে প্রশ্ন আসে—'কোথাকার শিব গো ?' মদের নেশায় বিভোর হয়ে মেয়েপুরুষের দল সমানে তালে তাল দিয়ে নৃত্য করে চলেছে মুখে কখনও বা কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গান, কখনও বা আধুনিক কোন ঘটনাপ্রবাহের গান। নৃত্য করতে করতে কখনও বা অঙ্গের বসন যায় খুলে। উদ্দাম গতির গোষ্ঠিবদ্ধ নৃত্য।

বর্তমানে বোলান গান মুখ্যত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে : এক হল কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক। দুই হল আধুনিক যুগের ঘটনাবলী সম্পর্কে ব্যঙ্গগীতি। সুরেও অনেক সময় চলচ্চিত্র সঙ্গীতের সুরের অনুকরণ চলে। প্রতি গানের ক্ষেত্রেই বন্দনার প্রচলন আছে। বন্দনা সুরু হয়—

(১) গৌরীসুতে প্রথমেতে করি বন্দনা
যার চরণ নিলে স্মরণ-বিঘ্ন রহে না।
এসো শ্রীমধুসূদন বিপদভঞ্জ রাধিকাপ্রাণধন হরি
অনাথ বান্ধব শ্রীরাধিকাবল্লভ দাসে দাও চরণ তরী

(২) করপুটে হরগৌরীর বন্দিলাম শ্রীনন্দনে
সকল বিঘ্ন হয় বিনাশন, শুনি তব নামগুণে ॥

ওগো শ্বেতবরণী শতদলবাসিনী, এসো মা হংস বাহিনী
মম কণ্ঠে-এ সঙ্কটে গো—উদয় হ'য়ে বলাও মধুর বাণী ॥
অনুরাগের বীণাখানি গো
হৃদকমলে বাজাও বসি
শুনি মধুরধ্বনি গো।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক :

আর কি সখি শ্যামের সনে হ'বে আমার দেখা। (১১)
হৃদয় ভরা পোষা পাখী আমার সে বঁধুয়া ॥
ধৈর্য না ধরে সখি কালো বঁধুর কারণে-যাতনা সহে না প্রাণে।
'কাল আসবো ব'লে' গেল গো হো-কৈ সই এলোনা যাতনা সহেনা প্রাণে ॥
চল ললিতে আমার সাথে নাগর লাগিয়া যাব দূরদেশে।
পাগল বেশে দেশে দেশে দেখবো আমার প্রাণনাথে ॥
বুকের মাঝে তুষের আগুন দিল কালা বিরহ অনলে উঠে জ্বালা।
দয়ামায়া নাইকো প্রাণে এমনি কঠিন হিয়া নিঠুর হ'য়ে গেলগো চলিয়া ॥
কালো বরণ তোমার কারণ বাঁচে নাক' জীবন।
দিবানিশি জ্বলছে আমার রত্নামায়া আসন ॥
ধরিয়া বৃন্দের করে, কয় রাধে বিনয় করে—'শ্যামকে সই এনে দাও মোরে।'
এলে পরে রাখবো ধরে যতন করে বঁধুকে আমি হৃদয় মাঝারে ॥
যায় যায় যায় বৃন্দে যায়, যায় যায়।
যাবো গো মথুরা ভুবন-আনিতে সেই কালোবরণ ॥
পদধূলি দিয়ে মাথে, দাও গো বিদায় বৃন্দে যায় যায় যায়
(তবে) মথুরা পথেতে বৃন্দে গো শুভযাত্রা করে
কালাচাঁদে আনবো বলে গো বাসনা অন্তরে।

অত্যন্ত বিস্ময়কর এই যে বোলান গানে কখনও কখনও হিন্দীপদও পাওয়া যায়। যেমন—

সেলাম রাখি হে মাইজী তুঁহারী চরণে
যুগোলকা মুরতি হামকো দেখ দে নয়নে।

এই জাতীয় গানের শেষে দলপরিচয় থাকে। গানের মাধ্যমে এই পরিচয় প্রদান করা হয়।

বড় কাঁন্দরা মোদের বাড়ী গো
পূর্বপাড়া বাড়ি মোদের, দলের পরিচয়।
অথবা ছুটিগাছি মালা দেন গো মুহুরীর গলে
দলপতি আনন্দ ঘোষ আমাদের দলে।
মদন হয় বাজিয়ে
আনন্দ শান্তিকে নিয়ে বোলানের দল করি আমরা।

বাড়ী মোদের আখড়া গ্রাম গো উত্তরপাড়া হয়
দ্যুতি সংবাদ পালা মোদের শেষ হয়ে যায়।

অত্যন্ত লঘুসুরে আধুনিক ঘটনাপ্রসঙ্গে গান ধরে—

এ বছরে বোলান গেয়ে
সুখ পেলাম না মনে গো
ভীষণ 'রাইঅট' (Riot) লেগেছে
ভারত আর চীনে গো।

ভারত-চীন বিগত সংঘর্ষের কথা সুদূর এই পল্লীর লোকসংগীতেও এসেছে। আপন ভাব, ভাষা ও সুরে আধুনিক ঘটনাকে সাঙ্গীকরণ করা লোকসংগীতের অন্যতম ধর্ম। আধুনিক গ্রাম্য বধূদের ইঙ্গিত করে গান গায়:

বৌ আমাদের টাউনের মেয়ে
মন সরে না পাড়াগাঁয়ে
মন পড়ে সিনেমার হাউসে ক্ষণে ক্ষণে
ফুলেল (১২) তেলে, খোঁপা তুলে
বৌমা বাঁধছে ঝুটি চারবেলা
গোয়াল কাড়া, (১৩) গোবর ঠেলা গো
বৌ তো আমাদের পারে না
হাতের গন্ধ যাবে না।

এই বোলান গান বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। চৈত্র মাসের শেষ চারদিন গ্রামের সমগ্র অন্ত্যজ শ্রেণীই এই উৎসবে মেতে উঠে। উচ্চবর্ণের দুর্গা পূজার সমান আনন্দ উপভোগ করে। এই উপলক্ষে কিছু শক্তিচর্চাও হয়।

উত্তরবঙ্গে গম্ভীরা ও পশ্চিম বাঙলার অন্যত্র যে গাজন গান তা এই বোলানেরই অনুরূপ। তবে গাজনের ক্ষেত্রে এই উদ্দাম প্রকাশভঙ্গী নাই।

* গানগুলি মালাডাং গ্রামনিবাসী পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল ও কাঁদরা গ্রামনিবাসী ভগবৎ মণ্ডলের নিকট প্রাপ্ত।

(১) কলসীর জল (২) দেবীর প্রভাবে ঝোঁক (৩) বেদী (৪) ঘরের আচ্ছাদন (৫) প্রসব করলো (৬) রাখাল (৭) নড়বড় (৮) পুরোনো দেওয়াল (৯) শাঁখা (১০) নিঃসন্তান বিধবা। (১১)। আখড়া গ্রামের দলের নিকট প্রাপ্ত। (১২) সুগন্ধ (১৩) পরিষ্কার করা।

কান্ত-কবির গান

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

কেউ শুধু কবি, কেউ শুধু গায়ক, কেউ বা কবি-গায়ক। কান্ত-কবি রজনীকান্ত একজন কবি-গায়ক।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত সমকালীন, মাত্র দু-তিন বছরের ছোট বড়। রজনীকান্ত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে গান রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ একই সময়ে কতক গান রচনা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা কবিতা ও গান ব্যতীত নাটকেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভা কবিতা গল্প উপন্যাস গান প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের সমস্ত ধারাতেই প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু রজনীকান্তের কেবল গান আর গান।

ভাগ্য-বিড়ম্বিত রজনীকান্ত দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারেন নি। তাঁর প্রতিভা ৪৫ বৎসর বয়সেই নির্বাপিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালও পঞ্চাশের বেশি উঠতে পারেন নি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘজীবনে গান সম্বন্ধে অনেক রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে নানাবিধ ভাব ও সুরের খেলা খেলিয়ে অসংখ্য মূল্যবান গান রচনা করলেন। তাঁকে গান-সাগরও বলা যেতে পারে। বাঙলার গান-ভাণ্ডারে সমসাময়িক এই তিন জনেরই দান, অবশ্য পরবর্তী-কালে অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের দানও কম নয়।

তিনজনে ঠিক একই সময়ে গান রচনা করতে লাগলেন বটে কিন্তু সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের গানের চেয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের ও রজনীকান্তের গানগুলিই সমধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কথা যতদূর স্মরণ হয় তা থেকে বলতে পারি যে তখন আমি কোনও কোনও বৈঠকী গায়ক এবং কোনও কোনও স্কুল-কলেজের ছাত্রকে দেখেছি যিনি দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের অধিকাংশ গানই গাইতে পারতেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান হয়ত পাঁচ-সাতখানির বেশি জানতেন না। এর কারণ হয়ত এই হতে পারে যে এঁদের দু'জনের গান যতটা সাধারণ্যে প্রচারিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গান তখন ততটা হয়নি। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের গান তৎকালে তাঁর অনুরাগী মহলে ও শান্তিনিকেতনে সীমাবদ্ধভাবে প্রচারিত হয়েছিল, তাঁর গানে ভাবের জটিলতা ও সুরের খেলা তখনকার দিনে সাধারণ লোকে উপলব্ধি করতে পারে নি, তার ওপর আবার রবীন্দ্রনাথের উপর এক শ্রেণীর লোকের একটা বিরূপ মনোভাব ও অনীহা ছিল।

কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের গানই অধিক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগল এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত এই দাঁড়িয়েছে যে রবীন্দ্র-সংগীতের চর্চা সারা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। রবীন্দ্র-সংগীত নামে সংগীতের একটি পুরাদস্তুর পৃথক বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে অনেক রকম গবেষণা চলছে তবুও নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিজেন্দ্রলাল অথবা রজনীকান্তের গানগুলি ক্রমশঃ যবনিকার অন্তরালে পড়ে গেছে, কেবল কোনও আসরে কেউ

যদি তাঁদের গান গাইবার জন্য গায়ককে ফরমাস করেন তবেই একটা আধটা গেয়ে ঐতিহ্য রক্ষা করা হয়।

কান্ত-কবির জীবন গানের জন্যই উৎসর্গীকৃত, গানের দ্বারাই তিনি ভগবানকে লাভ করতে চেয়েছিলেন। গান তাঁর নেশা সেজন্য পেশা হিসাবে ওকালতী তাঁর মনকে আকর্ষণ করতে পারে নি। তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে আইনের ব্যবসা তাঁকে সাময়িক উদরান্ন দিয়েছিল কিন্তু সঞ্চয়ের জন্য অর্থ দেয় নি। সমকালীন উকীল গায়ক বহরমপুরের সংগীতাচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তীরও কতকটা এই রকম দশা হয়েছিল। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে ব্যক্তির মনপ্রাণ সংগীতে ভরপুর তা'র সাংসারিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে আদৌ আকর্ষণ থাকে না। তাই শেষজীবনে রোগশয্যায় তাঁকে অর্থসংকটে পড়তে হয়েছিল।

তাঁর গানের সম্বন্ধে জানতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা জানা দরকার, তা এই যে তিনি কোনও দিনই ঈশ্বরে বিশ্বাস হারান নি। এইটিই তাঁর জীবনের সুর এবং এ সম্বন্ধে তাঁকে তাঁরই সময়ের পণ্ডিত বিজয়রত্ন মজুমদারের সংগে তুলনা করা যায়। বিজয়রত্ন শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েও ভগবানের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেন নি, কান্ত-কবিও যখন মৃত্যুর দিকে নিশ্চিত পদক্ষেপ করছিলেন তখনও এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্তও ভগবানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা দূরে থাকুক ভগবানের উপর আত্মসমর্পণই করেছিলেন। ভগবানের প্রতি আকুতি ও আত্মনিবেদন তাঁর গানের প্রধান সুর এবং তাতেই তাঁর চরম সিদ্ধি।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত গিয়ে বিলাতী সংগীতেরও খুঁটিনাটি জেনে এসেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল অধিকাংশ গানে ভারতীয় সংগীতের রাগরাগিণী ও তাল ব্যবহার করেছেন বটে তথাপি কতকগুলি গানে বিশেষতঃ কোরাস গানে বিলাতী সুরেরও সাহায্য নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র। তিনি এদেশে মার্গ সংগীত ও দেশী সংগীতের সুর এবং বিলাতী সংগীতেরও সমস্তকিছু আত্মস্থ করেছিলেন এবং তার ওপর স্বীয় প্রতিভাবলে এমন সমস্ত সুর সৃষ্টি করলেন যা' অপূর্ব এবং চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজেই একসময়ে বলেছিলেন তাঁর সবকিছু গেলেও গানগুলো থেকে যাবে। কান্ত-কবি কিন্তু দেশীয় সংগীতের যা কিছু তাই ধরে নিয়েছেন, তাঁর গানে স্কচ-কানেড়া ইটালিয়ন ঝিঁঝিট প্রভৃতি কোনও রাগিনী নেই। সেদিক দিয়ে তিনি খাঁটি বাঙালী এবং তাঁর গান বাঙালীদেরই নিজস্ব গান। এবিষয়ে তাঁর মহাজন বলতে গেলে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব পদাবলী কর্তা, শাক্ত-পদাবলী কর্তা, রামপ্রসাদ, দাশু রায়, বাউল প্রভৃতি।

কান্ত-কবির গানকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—ধর্মমূলক দেশাত্মবোধমূলক ও হাস্যরসাত্মক। ধর্মমূলক বা ভক্তিমূলক গানগুলির অন্তর্নিহিত ভাব নিম্নলিখিত প্রকারে সংক্ষেপত নির্দেশ করা যায়। ভগবান সত্য ও মঙ্গলময় তাঁকে ডাকতে পারলে তিনি আমাদের মঙ্গলবিধান করবেন—'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে'। মানুষের অহমিকা ও গৌরব মিথ্যা ভগবানের ইচ্ছাই মানুষের মধ্যে পূর্ণ হয়—'ভাঙো এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব'।' মানুষ সাংসারিক ব্যাপারে নিয়ত মত্ত থেকে ভগবানকে ভুলে যায়—'আমি সকল কাজের পাই হে সময় তোমারে

ডাকিতে পাইনে।' মানুষ পাপকাজ করে বটে কিন্তু ভগবানকে মনপ্রাণ সমর্পণ করলে তিনি তাকে কোলে তুলে নেন এবং মানুষ তাঁর ওপর সেই ভরসাই করে—'কেন বঞ্চিত হব চরণে', 'পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভালো হয়', 'এ পাতকী যদি ডুবে যায়,' 'কুটিল কুপথ ধরিয়া' ইত্যাদি গান। এই জ্বালা-যন্ত্রনাময় সংসারের পরপারে চির শান্তিময় আনন্দধাম আছে মৃত্যু সেস্থানে যাবার দ্বারস্বরূপ অতএব মৃত্যুও বরণীয়—'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে', 'ওই বধির যবনিকা তুলিয়া'……ইত্যাদি। মানুষের দুঃখকষ্ট সমস্তই ভগবানের দেওয়া এবং তার ভিতর দিয়েই তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন—'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে গর্ব করিতে চূর'।

এই ভক্তিমূলক গানগুলি হিন্দুধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর পূর্ববর্তী ও সমকালীন প্রায় সমস্ত গায়ক সাধক প্রভৃতির মধ্যে এই ভাবগুলি দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথেরও এই সমগ্র ভাব অবলম্বনে অনেক অনেক গান আছে। ভগবানের প্রতি আকুতি ও আত্মনিবেদন এই সমস্ত গানের মূল সুর।

তাঁর ভক্তিমূলক গানের রচনা প্রকার চণ্ডীদাসের মত। এই সময়ে একটি মাত্র ভাব মনের মধ্যে উত্থিত হয়, প্রথম দু'একটি ছত্রে তিনি key-note বা ধূয়া নির্দেশ করেন এবং অবশিষ্টাংশ তারই বিস্তার মাত্র। একই গানের মধ্যে তিনি ভাবের জটিলতা আনেন না। তাঁর গানের ভাব তাঁর নিজের জীবনের মতই সরল এবং গানের বাণী তাঁর নিজেরই সদালাপের মত মধুর ও আন্তরিকতায় ভরা।

তাঁর সমস্ত রকম গানেরই টেকনিক সম্বন্ধে দেখা যায় তিনি তৎকালে প্রচলিত প্রধান প্রধান রাগ-রাগিনী ও তাল ধরে নিয়েছেন, বর্তমান সময়ের কোনও কোনও গায়কের মত নানাবিধ রাগিনী মিশিয়ে নূতন রকমের রাগিনী সৃষ্ট করে শ্রোতাদের চমক লাগিয়ে দিতে চান নি। তাঁর গানের প্রধান প্রধান রাগিনী বলতে গেলে ইমন, ইমন-কল্যাণ, বেহাগ, খাম্বাজ, সিন্ধু, ভৈরবী, দেশ ইত্যাদি এবং তাল বলতে গেলে প্রধানতঃ একতালা, তেতালা, যৎ, তেওরা, ঝাঁপতাল প্রভৃতি।

দ্বিতীয় বিভাগের মধ্যে তাঁর দেশাত্মবোধক গান। তিনি ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুণ্যভূমি বলে মনে করতেন—'সেথা আমি কি গাহিব গান, যেথা গভীর ওঙ্কারে সাম-ঝঙ্কারে কাঁপাত দূর-বিমান; 'নমো নমো নমো জননী বঙ্গ'……। বঙ্গভঙ্গরোধ আন্দোলনে ও তৎপরে বিলাতী বর্জন আন্দোলনের সময় তৎকালীন অনেক কবি তৎসম্বন্ধে গান রচনা করেছিলেন। কান্ত-কবিও তাঁদের একজন। 'তাঁর মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়', 'আমরা নেহাৎ গরীব আমরা নেহাৎ ছোট' প্রভৃতি গান তৎকালে যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, এমন কি নিষ্ঠুর সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও তাঁর প্রথম গানটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারেন নি। এ গানগুলিতে তাঁর অগাধ দেশপ্রেমের পরিচয় সুস্পষ্ট।

অবশেষে তাঁর হাসির গানের কথা। অসংগতিই হাস্যরসের নিদান। এই অসংগতি মানুষের কথায় কাজে ইংগিতে আচরণে অনেক রকমে প্রকাশ পায় এবং ইহাই হাস্যরচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিজেন্দ্রলালের রীতিতে কান্ত-কবি হাসির গান রচনা করেছিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রলালের মত সেগুলি

পরিমাণেও অনেক। সে সময়ে লোকে হাসির গান শুনতে ভালোবাসতো। রবীন্দ্রনাথের গদ্যে অনেক ব্যঙ্গকৌতুক আছে, তিনি 'হিংটিং ছট্' প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক কবিতাও রচনা করেছিলেন কিন্তু হাসির গান রচনা করেন নি। কান্ত-কবির হাসির গানগুলি খুবই উপাদেয়।

তাঁর হাসির গানের উৎকর্ষ অনুভব করতে গেলে হাস্যরচনার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। সংসারে নিয়ত পরিবর্তনশীল বিষয়ের মধ্যেও মানুষ সমস্ত বিষয়ে একটা সাধারণ মানদণ্ড বেঁধে নিয়েছে। এই অসংগতি বা অসামঞ্জস্য ঐ মানদণ্ড থেকে বিচ্যুত হলেই হাস্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অসংগতি যদি সরলতা বা নির্বুদ্ধিতা প্রসূত হয় অর্থাৎ নির্দোষ হয় তবে তাহা নির্মল হাস্যের উপাদান হয়, কিন্তু যদি দুর্নীতিযুক্ত বা ভণ্ডামিপূর্ণ হয় তবে তাহা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই দুর্নীতি বা ভণ্ডামি মানুষের মন থেকে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয় নি, সে কারণ এগুলি সর্বদেশে সর্বকালে সাহিত্যে বিদ্রূপের বস্তু হয়ে রয়েছে। ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যে এগুলি বহু পূর্বেই আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলা সাহিত্যেও এগুলি মুকুন্দরামের 'মুরারী শীল ভাঁড়ু দত্তের' আমল থেকে এতাবৎ নাটক নভেল কাব্য প্রহসন চিত্র কবিগান প্রভৃতিতেও এগুলির প্রকাশ। কান্ত-কবির বিশেষত্ব এই যে তিনি এগুলিকে হাসির গানের আকারে উপস্থাপিত করেছেন। প্রভেদ কেবল প্রণালাতে।

একটা দেশের সমকালীন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উপর ব্যঙ্গবিদ্রূপ-শ্লেষাত্মক রচনার সৃষ্টি হয়। কান্ত-কবি তৎকালীন সমাজের জনগণের যে বিষয়ে এই রকম দোষযুক্ত অসংগতি দেখতে পেয়েছেন তাকে নৃশংসভাবে বিদ্রূপ করেছেন। তিনি নিজে ধর্মভীরু ও নীতিপরায়ণ লোক, অতএব এরূপ বিদ্রূপ করার ব্যাপারে তিনি আদৌ সঙ্কোচ অনুভব করেন নি। তিনি পুরোহিত হাকিম উকীল মোক্তার কেরানী ভণ্ড ধর্মধ্বজাধারী ভণ্ড রাজনৈতিক ধ্বজাধারী নির্মম বরকর্তা প্রভৃতিকে নির্মম আঘাত হেনেছেন। তবে একথা মনে করবার কারণ নেই যে, তিনি ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ব্যঙ্গ করেছেন। তাদের মধ্যে যারা দুর্নীতিগ্রস্ত কেবল তারাই তাঁর লক্ষ্যস্থল। তিনি ব্যক্তিবিশেষকে বিদ্রূপ করে কোনও গান রচনা করেন নি। হাস্যরস সৃষ্টি করতে গেলে প্রয়োজনবোধে জীবনকে কিছুটা বিকৃত করতে হয় ও অতিরঞ্জন করতে হয়। তিনি তাও করেছেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই বিদ্রূপাত্মক গানগুলির মূল্য কী? দেখা যায় একটা দেশের তৎকালীন অবস্থার উপর হাস্যরসাত্মক রচনার সৃষ্টি হয় কিন্তু সে অবস্থা পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত অথবা সংশোধিত হলে সে রচনার আর মূল্য থাকে না। ব্যামফিল্ড ফুলারের শাসনকে নিয়ে যে বিদ্রূপ তা তাঁর শাসনের পরে অন্তর্হিত হয়ে গেল। বিলাতফেরতাদের ভড়ংগুলি সমাজ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলে তৎসম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক গানগুলির ধার কমে যাবে। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যাপারে মানুষের অসংগতি বা ভণ্ডামীগুলি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে সেজন্য তৎসম্বন্ধে ব্যঙ্গ রচনার একটা স্থায়ী মূল্য থাকে। দেশ উদ্ধারের নামে ভণ্ডামি, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, পণ-প্রথার অত্যাচার প্রভৃতি একশত বৎসর পূর্বেও ছিল, এখনও আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে। অতএব

সে সমস্ত বিষয় অবলম্বনে বিদ্রূপাত্মক রচনার মূল্য আজও হ্রাস হয়নি, পরেও হবে না। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নন্দলাল'-এর মত চরিত্র তখনকার দিনে যদি কয়েক শত ছিল বলে ধরা যায় এখনকার দিনে কয়েক লক্ষ দেখতে পাওয়া যাবে যাঁরা স্বদেশ উদ্ধারের নামে দুর্নীতির পথে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করছেন। বর্তমান সময়ে যদি কেউ এই ধরনের হাসির গান রচনা করতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি কালোবাজারী চোরা কারবারীদের সম্বন্ধে ও অন্যান্য অনেক দুর্নীতিপূর্ণ বিষয়ে গান রচনা করতে পারেন এবং সেগুলি যদি রসোত্তীর্ণ হয় তবে সাহিত্যের মর্যাদা পাবে। ভবিষ্যতে নূতন নূতন উপাদানে নূতন নূতন বিদ্রূপাত্মক গানের সৃষ্টি হবে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' আজ শতবর্ষ পরেও জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে। কথিত আছে কান্ত-কবির পণ-প্রথার অত্যাচার সম্বন্ধে একটি গান শুনে একজন বরের নির্দয় পিতার চোখে জল এসেছিল এবং তাঁর মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছিল। এ গানগুলির একটা নৈতিক দিক আছে, এগুলি মানুষের নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করে। এইখানেই এগুলির স্থায়ী মূল্য।

তাঁর কতকগুলি হাসির গান বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক অর্থাৎ তার মধ্যে নৈতিক উন্নতি বিধানের প্রশ্ন নেই কিম্বা ব্যঙ্গের দংশন নেই। সেগুলি স্যাটায়ার নয়, সেগুলি হিউমার শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁর 'যদি কুমড়োর মত চালে ধরে রত' কীর্তনটি অথবা বৈয়াকরণিক প্রত্নতত্ত্ববিৎ নবদম্পতির প্রেমপত্র প্রভৃতির গান এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ব্যঙ্গ-কবিতা অপেক্ষা বিশুদ্ধ কৌতুকের কবিতা রচনায় তিনি অধিক সিদ্ধহস্ত।

কান্ত-কবি তাঁর কতকগুলি হাসির গানে আর একটি জিনিসকে অতিরিক্ত হাসির উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন—সেটি পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা। পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষা নিজেই একটা বিদ্রূপের বস্তু নয় কিন্তু উহা নির্মল হাস্য উৎপাদনের একটি বস্তু। এগুলি তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলিতে যেন দ্বিগুণ হাস্যরসের সঞ্চার করেছে। তাঁর 'বাঙালের শ্যামাসঙ্গীত' 'বাঙালের বৈরাগ্য' 'বুড়ো বাঙাল' প্রভৃতি এই শ্রেণীর গান। পূর্ব বঙ্গের কথ্য ভাষাকে নিয়ে এই রকম অনাবিল ও নির্দোষ হাস্য উৎপাদন আমরা বংলা সাহিত্যে কবিকঙ্কণের আমল থেকে এতাবৎ নাটক নভেল কবিতা এমনকি গ্রামোফোনের রেকর্ডেও দেখতে পাই। এ প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে বাচাল 'নাবিকদের রোদন' অধ্যায় স্মরণীয়।

কান্ত-কবি কতকগুলি হাসির গানে অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণে ইংরাজী হরফে ইংরাজী শব্দ বাক্য ও বাক্যাংশ মিশিয়েছেন এমনকি ইংরাজি শব্দের দ্বারা ছন্দের মিলও ঘটিয়েছেন। এরকম মিশ্রণ বিশ্বসাহিত্যের রীতিবহির্ভূত আপত্তিজনক। তখনকার দিনে ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ইংরাজী মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন এবং কিছু ইংরাজী না জানলে লোককে শিক্ষিত বলা হত না। এমনকি রবীন্দ্রনাথও সে সময়ে ঐ রকম ধরণের কিছু অ্যাংলো বেঙ্গলী কবিতা রচনা করেছিলেন।

কবি-গায়ক রজনীকান্তের কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র রীতিতে কতকগুলি অষ্টপদী কবিতা রচনা করেছিলেন সেগুলি পুস্তকাকারে 'অমৃত' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এ কবিতাগুলি মণিমাণিক্য-সদৃশ এবং স্বাদেও অমৃততুল্য। এগুলি একবার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যায়, বিশেষতঃ প্রত্যেকটির শেষের দুই ছত্র মনের মধ্যে চিরকাল

গাঁথা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বাবুই ও চড়ুই পাখীর কবিতায় শেষ দুই ছত্র—পাকা হোক তবু ভাই পরের ও বাসা | নিজে হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা, কিম্বা দরিদ্র পণ্ডিত ব্রাহ্মণের কুটিরটি যখন সহসা আগুন লেগে পুড়ে গেল তখন—ব্রাহ্মণ কাঁদিছে গেল বেদান্তের টীকা | ব্রাহ্মণী কাঁদিছে গেল হাঁড়ি আর শিকা। তবে তাঁর 'সদ্ভাবকুসুম'-এর কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি, কারণ সেগুলি প্রেরণা-সমুদ্ভূত নয়, সেগুলি কতকটা চেষ্টা করে লেখা।

তাঁর মৃত্যুর পূর্বের সাত-আট মাস কাল তাঁর শরীরের দিক দিয়ে শোচনীয়তম দিন হলেও সাহিত্য রচনার দিক দিয়ে তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক অধ্যায়। ভগবান যেন তাঁর শরীরটাকে নিংড়ে আত্মার সৌন্দর্যরস নিষ্কাসিত করতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কাঠ যত পুড়িতেছে অগ্নিও তত বেশি করিয়া জ্বলিতেছে।' মৃত্যুর দু-তিন মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ মেডিক্যাল কলেজের কটেজ ওয়ার্ডে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তখন তাঁর গলায় অস্ত্রোপচারের কারণে বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে নিজের উপলক্ষে যা বলেছিলেন কান্ত-কবি বুঝি সেই ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথকে বললেন 'কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশী সঙ্গীতহারা।' পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথকে ঠিক এই রকম ঘটনাস্থলে আর একবার দেখতে পাই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তিম রোগশয্যায়। রামেন্দ্রসুন্দরও বুঝি সেদিন কবিকে সেই কথাই বলেছিলেন এবং কবিও বুঝি সেদিন আর একটি 'মানবাত্মার জ্যোতির্ময় প্রকাশ' দেখে এসেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের সবই সুন্দর, রজনীকান্তেরও সবই কান্ত।

কান্ত-কবি একটি ভালোবাসা ও সহানুভূতির যোগ্য চরিত্র। তাঁর সম্বন্ধে একটা সুবিচার করতে গেলে তাঁর সম্বন্ধে অনেকগুলি কথাই একসঙ্গে চিন্তা করে দেখতে হয়। তিনি সংগীতের প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন বটে, কিন্তু কোনও গুণী ওস্তাদের কাছে তালিম নেওয়ার সুযোগ পান নি। তখনকার দিনে পাবনায় বা রাজসাহীতে সংগীত শিক্ষার সুযোগ ছিল না। তিনি কলকাতায় এসে রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্কুলে অথবা অন্য কোথাও গান শেখেন নি; কিম্বা তদুদ্দেশ্যে গোয়ালিয়র লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে যান নি। রবীন্দ্রনাথ সংগীতের আবহাওয়াতেই লালিতপালিত এবং দ্বিজেন্দ্রলালও রীতিমত সংগীত শিক্ষা করেছিলেন। রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল না এবং শেষের দিকে তাঁকে একটা মারাত্মক ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করে যেতে হয়েছিল। এরকম অবস্থায় তিনি নিজের প্রতিভাবলে ও পরিশ্রমে তৎকালে প্রচলিত রাগরাগিনী গুলি আয়ত্ত করতে লাগলেন এবং নিজস্ব মনোহর বাণী সহযোগে গান রচনা করতে লাগলেন। উপমা দ্বারা বলতে গেলে তিনি উদ্যান-কুসুম নন, তিনি একটি বনফুল।

রজনীকান্তের ভক্তিমূলক গানগুলি বাংলা গানের চিরায়ত ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলি বাঙালীর নিজস্ব গান এবং ভাষান্তরিত করতে গেলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। এগুলি স্বচ্ছ শুচিশুভ্র এবং এগুলির বাণীও কমনীয়। তাঁকে বুঝতে হলে পাঠক বা শ্রোতাকে নিজের মনের মধ্যে একটি পৃথিবী সৃষ্টি করতে হবে। এ সম্বন্ধে তাঁকে এতাবৎ বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় নি। তাঁর সরলতা, আন্তরিকতা, ঈশ্বরানুরাগ, স্বদেশপ্রীতি, নীতিজ্ঞান সমস্তই তাঁর গানে প্রতিফলিত। এই নিষ্কলঙ্ক অভিমানশূন্য প্রচারবিমুখ মফঃস্বলবাসী লাজুক-প্রকৃতি কবিটি নিজ প্রতিভাবলে বাংলা

গীতি-সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন সংগ্রহ করে নিয়েছেন।

পরিশেষে একটা কথা বলতে চাই। সম্প্রতি কোনও সাময়িক পত্রিকায় দেখতে পেয়েছি যে তাঁর কোনও কোনও গানের সুর ও তাল এমনকি বাণীও পরিবর্তন করে স্বরলিপি করা হয়েছে। এটা বড়ই বেদনাদায়ক। বর্তমান লেখকের ধারণা এই যে কোনও কবি যখন প্রেরণার বলে কবিতা রচনা করেন তখন কথা ও ছন্দ একসঙ্গেই বেরিয়ে আসে এবং কোনও গায়ক যখন প্রেরণার বলে গান রচনা করেন তখন বাণীর সঙ্গে সুরও একসঙ্গেই উৎসারিত হয়। রচনার পর হয়ত শিল্পকলার অনুরোধে কিছু কিছু সংশোধনের প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করে নিজেই সুর দিতেন, সে সুর দিনেন্দ্রনাথ ধরে নিয়ে গান গাইতেন ও শেখাতেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথেরও কতক গানে অন্যরকম সুর লাগিয়ে গানগুলিকে হত্যা করা হয়েছে, হয়ত বা তাঁর কোনও কোনও উপন্যাসকেও সিনেমায়িত করে হত্যা করা হয়েছে। রজনীকান্ত কবি-গায়ক, তিনি নিজে সুর তাল সহযোগে গান রচনা করে নিজেই গেয়েছিলেন, ভাষার উপরেও তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল এবং তাঁর গানের ভাষাও সাঙ্গীতিকী ভাষা। তাঁর বাণী সুর ও তাল প্রভৃতির উপর কারসাজি করা খুবই অন্যায়।

তাঁর পুস্তকগুলির নাম—বাণী, কল্যাণী, অভয়া, আনন্দময়ী, বিশ্রাম, অমৃত, সদ্ভাবকুসুম ও শেষ দান।

কৃষ্ণকুমারী নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সম্পাদনা ডঃ অধীর দে। প্রকাশনা কল্লোল প্রকাশনী। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

বাঙলা সাহিত্যের আসরে মধুসূদনের আবির্ভাব যে নন্দন কাননের সৌরভ বয়ে এনেছিল, সে-সৌরভ, সে দিব্যগন্ধ আজ শুধু বাঙলা সাহিত্যকেই অভিভূত করে নেই। সে সৌরভ ক্রমে ক্রমে বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে এবং বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছে। মধুসূদন যে এক বিস্ময়কর প্রতিভা হয়ে বাঙলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মধুসূদনের যোগ্যতর উত্তরসাধকের পরিণতি দেখেও বর্তমান শতাব্দীর চোখে মধুসূদন এক অখণ্ড বিস্ময়।

মধুসূদনের আবির্ভাব যে সৌরভ বয়ে এনেছিল, তা আধুনিকতা। বস্তুত, যে যে উপাদানে পুষ্ট হয়ে বাঙলা সাহিত্যর সমৃদ্ধি, তার অন্যতম প্রধান হল এই আধুনিকতা। এ আধুনিকতা মূলত পাশ্চাত্য চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত এবং সে কারণেই মধুসূদন অবিসংবাদিতরূপে এই আধুনিকতার প্রবক্তা। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই আধুনিকতা বাঙলা সাহিত্যের দিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত করে রেখেছে। নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, বাঙলা সাহিত্য সনাতন অথবা প্রাচীন নয়। বাঙলা সাহিত্য আধুনিক এবং উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত (১৮৬১) 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' মধুসূদনের সেই দুঃসাহসিক আধুনিকতার একটি নিদর্শন।

'কৃষ্ণকুমারী নাটক' একটি ট্রাজেডি। মধুসূদন বলেছেন রোমান্টিক ট্রাজেডি। যেহেতু নাটকের বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক এবং বিষাদান্ত সেহেতু ঐতিহাসিক ট্রাজেডিও বলা চলে। মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে রোমান্টিক ট্রাজেডি বলেছেন এই কারণে যে সম্ভবত তাঁর সাহিত্য-জীবনে রোমান্টিকতার অপ্রতিরোধনীয় প্রভাব তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। একথা ঠিক, মধুসূদনের সমস্ত জীবনেতিহাস যে একটিমাত্র দীর্ঘশ্বাসে স্পন্দিত তা হল 'I sight for distant Albion shore।

যা অপ্রাপ্য তার প্রতি মানুষের সহজাত কামনাজনিত যে দুর্বলতা তার মধ্যেই নিহিত থাকে ট্রাজেডির বীজ। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকের' আখ্যানবস্তু যাই হক না কেন, অনিবার্য ভাবেই নাটকের চরিত্রগুলো ট্রাজিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে এই কামনাকে কেন্দ্র করে। অবশেষে কৃষ্ণকুমারীর আত্মহননে এর ঘটেছে যথার্থ পরিণতি। সুতরাং দৃশ্য সংস্থাপন অথবা চরিত্র নির্বাচন ঐতিহাসিক হলেও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' মূলত রোমান্টিক ট্র্যাজেডি।

ডঃ শ্রীঅধীর দে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' সম্পাদনা করে সকলের ধন্যবাদার্হ হবেন আশা করা যায়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নাটকটি প্রকাশিত হয়। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনয় হয় ১৮৬৬ সালে।

আজ থেকে ঠিক একশ' বছর আগে। সেদিক থেকেও এই সম্পাদনা কর্মের এক বিশিষ্ট ভূমিকা থেকে গেল।

ডঃ শ্রীঅধীর দে মহাশয়ের আলোচনা সুবিস্তৃত এবং তথ্যবহুল। সুলিখিত ভূমিকা ছাড়াও ডঃ দে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর অত্যন্ত দীর্ঘ এবং উপযোগী আলোচনা করেছেন। বিষয়গুলি যথাক্রমে, আধুনিক বাঙলা নাটকের প্রস্তুতি, মধুসূদন ও বাঙলা নাট্যসাহিত্য, 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনার প্রেরণা ও নাট্যকাহিনীর উৎস, নাট্যকাহিনী, মধুসূদনের ইতিহাস চেতনা, ট্র্যাজেডির স্বরূপ ও 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' ট্র্যাজেডি, নাটকের আঙ্গিক ও গঠনশিল্প, নাটকের ভাষা বৈচিত্র্য এবং পরিশেষে চরিত্র বিশ্লেষণ। নাটকের অন্তে একটি সুসম্পাদিত টীকাও সংযোজিত হয়েছে। আশা করা যায়, সমস্ত রকম প্রয়োজনই এ সম্পাদনা থেকে মিটবে। আলোচিত প্রতিটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। সম্পাদনাটি সমাদৃত হবে, ছাপার কাজ ভাল।

রবিশেখর সেনগুপ্ত

Regd. No. C-315 Phone : 23-5155 August '66 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ডব্লিউ. বি. আই অ্যাণ্ড পি. আর এ. ডি. ডি.-ডি ১৪৮১৩/৬৭

টাটার ইস্পাত কর্মীদের 'শ্রমবীর' জাতীয় পুরস্কার লাভ

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে আজকের ভারতের শিল্পজগতের 'নয়া জওয়ান'—টেকনিশিয়ান ও কারিগরদের 'শ্রমবীর' জাতীয় সম্মানে ভূষিত করেছেন। শ্রমশিল্পে খরচ কমিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর উপায় যাঁরা দেখাতে পারবেন তাঁদের প্রতিবছর এই সম্মান ও পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ বছর মোট ২৭টি পুরস্কারের মধ্যে সর্বোচ্চ দুটি পুরস্কার সমেত পাঁচটি টাটা স্টীলের কর্মীরা পেয়েছেন—এ দেশে আর কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান এত বেশী পুরস্কার পাননি।

জামশেদপুরে গত বিশ বছরে কর্মীরা ছোটখাটো নানারকম ব্যবস্থার দ্বারা যাতে উৎপাদন বাড়ানো যায় এরকম ১২,০০০ প্রস্তাব পেশ করেছেন, তার মধ্যে ১০০০টি কাজে লাগানো হয়েছে। এই প্রস্তাবগুলি উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া কারখানার কাজকর্মে নিরাপত্তা এনেছে আর দেশজ মালমসলা ও কর্মকুশলতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের শিল্পকে আত্ম-নির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

কারখানার যাবতীয় শ্রমিকদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্যে 'সাজেশ্চন বক্স' স্কীম আজ আমাদের দেশের শ্রমশিল্পে প্রচলিত হয়ে গেছে। এই স্কীমের প্রবর্তক হিসেবে টাটা স্টীলের গৌরব বড় কম নয়।

আর. সি. ভকৎ : সর্বোচ্চ পুরস্কার ২০০০৲ পেয়েছেন।

এম. এম. মজুমদার : সর্বোচ্চ পুরস্কার ২০০০৲ পেয়েছেন।

টাটা স্টীল

কে. বি. দুবে : ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

বলবন্ত সিং : ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

আফজল হুসেন : ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWTTN 3274A

ঝক্ ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
SADHANA
DASAN
SADHANA AUSADHALAYA
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
সাধনা
দশন
সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।
দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সম্পূর্ণ ঠিকানা
থাকলে
তাড়াতাড়ি
ডাকবিলি
করা যায়
ঠিকানা অসম্পূর্ণ
থাকলে ডাকবিলি
করতে দেরী হয়
আপনাদের আরও সেবা করার জন্য আমাদের সাহায্য করুন
ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

LET UCO BANK

চতুর্দশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র তেরশ' তিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ভাদ্র
তেরশ' তিয়াত্তর

চতুর্দশ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

ভারতচন্দ্র সম্পর্কে রাখালদাস হালদার

পশুপতি শাশমল

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রাখালদাসের (১৮৩২-১৮৮৭) কিছু মূল্যবান বিচিত্র ডায়েরী এবং নোটবই আছে। এই নোটবইয়ের মধ্যে রাখালদাসের স্বহস্তে লিখিত বিবিধ বিষয়ক রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। কোন কোন রচনা সংশোধিত হয়ে পুনর্লিখিত, আবার কোন কোন কবিতা বা প্রবন্ধ কিংবা গল্প পূর্বের কোন পাণ্ডুলিপি থেকে কপি করা হয়েছে। নোটবইয়ের এইসকল রচনায় বিষয় বৈচিত্র্য কৌতূহলী পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ। বর্তমান প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর ভারতচন্দ্র বিষয়ক একটি আলোচনার পরিচয় দেওয়া হল; প্রবন্ধটির বিশেষত্ব সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে নোটবইটির প্রয়োজনীয় অংশ বর্তমান প্রস্তাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ভারতচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনাকে রাখালদাস 'সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক [শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত] কর্তৃক সংগৃহীত ও বিরচিত' 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের [জীবন বৃত্তান্ত' নামক পুস্তিকাটির কথা স্বীকার করেছেন। বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্রের উক্ত পুস্তিকা পাঠ করে তার দোষ গুণ নির্ণয় প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের বিষয়টি অবতারণা করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রের কথা প্রথমে রাখালদাস বর্ণনা করেছেন :—

"এই পুস্তকখানির নিমিত্ত আমরা রচয়িতাকে নমস্কার করি। তাঁহার বিবিধ মতের সহিত আমাদের মতের চিরকালই বিভিন্নতা আছে; কোন কালে তাঁহার আস্বাদন বৃত্তিকে আমরা প্রশংসা বোধ করি নাই। তথাপি স্বীকার করিতে হয়, তিনি বিস্তর পরিশ্রম পূর্বক স্বদেশীয় কবি কেশরীর জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন।

ঈশ্বরবাবুর নিজের বিষয়ে কিছু না লিখিয়া আর আমাদের প্রসঙ্গকে উত্তমরূপে আরব্ধ করা যায় না। তিনি বহুদিবসাবধি বাঙ্গলা ভাষার চর্চা করিতেছেন ; তাঁহার পাঠকের সংখ্যা বিস্তর। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত অত্যুৎকৃষ্ট রচনা করেন বটে ; কিন্তু তাঁহাদের পাঠকের সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে ; কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাদের গৌরব বুঝিয়া থাকেন। প্রত্যুত অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট লেখক হইয়াও বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আপামর সাধারণ সকল লোকেরই অনুরাগভাজন হইয়াছেন। তাঁর নিজের আস্বাদন বৃত্তি উৎকৃষ্ট নহে ; এজন্য তিনি পাঠকদিগের আস্বাদন বৃত্তিকে উৎকৃষ্ট পথে চালিত করিতে পারেন নাই। তিনি কতকগুলি তাম্রখণ্ডকে রৌপ্যসদৃশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত রৌপ্য করিতে সমর্থ হন নাই, স্পষ্ট কথা, তিনি কতকগুলি ব্যক্তিকে অপকৃষ্ট লেখক করিয়া তুলিয়াছেন যাহারা সম্ভবত কদাপি লেখক হইতেন না।

ঈশ্বরবাবুর গদ্যের অপেক্ষা পদ্যরচনা প্রযুক্তই বিশেষ বিখ্যাত ; তাঁহার পদ্য রচনা প্রায় সুমিষ্ট হইয়া থাকে ; তিনি কখন কখন প্রকৃত কবিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার গদ্যরচনা প্রশংসাযোগ্য বোধ হয় না। তিনি শব্দের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে করিতে অর্থকে অবজ্ঞা করিয়া বসেন ; তিনি মধ্যে মধ্যে এমত শব্দসকল ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথা—

'সাহিত্যদর্পণকার দেখে পেতো ভয়।'

তাঁহার রচনা যদিও নিতান্ত কর্কশ না হউক, ব্যর্থবহুল বটে ; যদিও রসরাজের ন্যায় অপকৃষ্ট না হউক, তথাপি মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা প্রকাশ করিয়া থাকে। তিনি কদাপি উৎকৃষ্ট লেখকদের মধ্যে গণ্য হইবেন না ; আমাদের সন্ততিরা অবশ্য অনতি (?) চিরকাল মধ্যে তাঁহার সাধারণ পদ্যের রচনা বিস্মৃত হইবে।"

ভারতচন্দ্র সম্পর্কে এবং ভারতচন্দ্র বিষয়ক পুস্তিকা সম্পর্কে আলোচনাকালে গ্রন্থ-রচয়িতা সম্বন্ধীয় এবম্বিধ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কবিধর্মের দিক থেকে ভারতচন্দ্রও ঈশ্বরচন্দ্রের সমধর্মিতা লক্ষ্য করেছিলেন রাখালদাস, সম্ভবত এই কারণে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব নির্ণয়ের প্রাক্কালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে ; বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগত আক্রোশবশত এইরূপ আক্রমণাত্মক মনোভাবটি ব্যক্ত হয়নি। সেকথা রাখালদাস বলেছেন, "কেহ বলিতে পারেন যে আমরা ঈশ্বরবাবুর সহিত অতি কর্কশ ব্যবহার করিতেছি ; বস্তুতঃ তাঁহার সহিত আমাদের কিছুমাত্র শত্রুতা নাই ; তাঁহার খ্যাতি উপার্জনপথে কণ্টক রোপণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ন্যায়ানুগতরূপে তাঁহার বিষয়ে লিখিত হইলে, আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহার ন্যূনাতিরেক আমরা আর কিছুই লিখিতে পারি না।

আমরা সর্বারম্ভে ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনবৃত্তান্ত জন্য ঈশ্বরবাবুকে ধন্যবাদ দিয়াছি ; পুনর্বার তাহা প্রদান করিতেছি ; রায়গুণাকরের সমস্ত অনুরাগী ব্যক্তিই ঈশ্বরবাবুর নিকট ঋণী হইয়াছেন।" এই ঋণস্বীকার ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর রাখালদাস বলেছেন, "ভারতের পৌত্র তারকনাথ রায় জীবিত আছেন বলিয়া ঈশ্বরবাবু কৃতকার্য হইয়াছেন, একথা যথার্থ বটে ; কিন্তু এমত উপায় না থাকিলেই বা কে কোথায় পূর্বপুরুষের সমকালীয় ব্যক্তিদের জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? তারকনাথ রায়ের সহিত আমাদের অপশরদের ১ আলাপ ছিল ; আমরা অপশরা ১ ভারতচন্দ্রের

জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি; কৃতকার্য হইতে পারি নাই; অশীতপর বৃদ্ধ, অন্ধ পক্ষাঘাত-গ্রস্ত তারকনাথ রায়কে বিরক্ত করিতে আমাদের সাহস হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণ আহ্লাদের বিষয়, ঈশ্বরবাবু আমাদের ক্ষোভকে অপনয়ন করিয়াছেন। অন্তত তিনি এমত তথ্যসকল সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে এক উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত হইতে পারিবে।" এই উদ্ধৃতির মধ্যে খ্যাতিমান পূর্বপুরুষগণের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহের উপায় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখকের বিশিষ্ট ধারণাটি ব্যক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তিনিও এইরূপ উপায় অবলম্বন করে ভারতচন্দ্রের জীবনী সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়েছিলেন—এরূপ আভাস বর্তমান উদ্ধৃতাংশ থেকেও পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থনে আরও দু-একটি তথ্য পরিবেশন করা চলে। রাখালদাস হালদারের বর্তমান নোট-বইটির মধ্যে এমন আর একটি রচনা আছে যা বক্ষ্যমান প্রবন্ধকে কিছু পরিমাণে আলোকিত করে তোলে। এই প্রবন্ধ পাঠকালে জানা যায় রাখালদাস একদা ভারতচন্দ্রের জীবনী সংগ্রহে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে উঠেন। নোট-বইতে এই প্রবন্ধটির শিরোনাম 'ভারতচন্দ্র রায়ের বাটী ও কাউগাছির দুর্গদর্শন'। দুটি পৃথক প্রবন্ধকে একত্রিত করা হইয়াছে। লেখক ভারতচন্দ্রের গৃহে গমন করেন ও পরে নিকটবর্তী দুর্গদর্শন করেন—এই অভিজ্ঞতাগুলিকে আনুক্রমিক বিবরণ তিনি দিয়েছেন প্রবন্ধের মধ্যে। তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা নিম্নরূপ—

"যে সকল মনুষ্য ধর্মপ্রচার ও বিদ্যানুশীলন করেন তাঁহাদের প্রতি আমার অত্যন্ত ভক্তির উদয়। তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত জানিতে পারিলে আমি সাতিশয় সুখী হই। জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহে ইংরেজদের ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির বিশেষ যত্ন আছে; আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অন্যূন দুশত লোকের জীবনবৃত্তান্ত অদ্যাপি পাঠ করিয়াছি। স্বদেশীয় বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনচরিত জানিবার উপায় অতি অল্প। যাহারা অনতিদীর্ঘকাল পূর্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদির সাহায্যে তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত সংগৃহীত হইতে পারে।

আমি শ্রুত হইয়াছিলাম ভারতচন্দ্র রায়ের পৌত্র তারকনাথ রায় মূলাজোড় গ্রামে বাস করেন। ভারতচন্দ্র রায়ের ন্যায় মহদ্ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত জানিবার এমত সহজ উপায় আছে, শুনিয়া আমি আনন্দিত হই; এবং স্বকীয় প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানস করিয়া আমি ১২ই কার্তিক (১৭৭৬ শকে) তারকনাথ রায় মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলাম। আমি পূর্বে জানিতাম না যে ভারতচন্দ্র যে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন তাহার এত নিকট আমরা বসতি করিয়া থাকি। মূলাজোড় আমাদের জগদ্দল হইতে একক্রোশের অধিক দূর নহে। ভারতচন্দ্র মূলাজোড়ে বাস করিয়াছিলেন কাহার মুখে শুনি নাই। আমি ইহাও জানিতাম না ভারতের পৌত্র রামধন রায়ের সহিত আমার পিতার সৌহার্দ্য ছিল। উভয়ে বহুকাল একস্থানে অবস্থিতি করিতেন এবং পরস্পরকে ভ্রাতৃসম্বোধন করিতেন। এসকল অবগত হইয়া যখন ভারতের বাটীতে পদার্পণ করিলাম তখন একেবারে কৃতার্থন্মন্য হইলাম। নিজ পরিচয় প্রেরণ করাতে তারকনাথ রায় আমাকে অতি আত্মীয়ের ন্যায় ২ মধ্যে গ্রহণ করিলেন। দেখিলাম তাঁহার বয়স অশীতবর্ষের অতীত হইয়াছে। তিনি বহুদিবসাবধি

পক্ষাঘাতগ্রস্ত ; এবং কিয়দ্দিন পূর্বে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিহীন হইয়াছেন। তাঁহার বিজ্ঞতা প্রতীত হইয়া আমি পরিতুষ্ট হইলাম। আমার আগমন তাৎপর্য অবগত করাতে তিনি কহিলেন কিয়ন্মাস গত হইল জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া সেইসকল বিষয় লিখিয়া লইয়া গিয়াছেন। তৎপর রায় মহাশয়ের সহিত গৃহসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার কথাবার্তাতেই অনেক সময় বিগত হইল। আমিও তাঁহাকে পুনর্বার বিরক্ত করিবার ইচ্ছা করিলাম না ; ভাবিলাম, পূর্বোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যখন যত্নপূর্বক ভারতচন্দ্র রায় সম্পর্কীয় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন প্রকাশ করিবেন। রায় মহাশয়ের পুত্রের নাম বাবু অমরনাথ।" ৩

অতঃপর লেখক কাউগাছির দুর্গদর্শনের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। প্রবন্ধশেষে '১৭৭৬ শক' এই তারিখটি পাওয়া যায়। উপরের উদ্ধৃতির মধ্যেও ১৭৭৬ শক পাওয়া যায়, ঐ শকের ১২ই কার্তিক তারিখে রাখালদাস তারকনাথ রায়ের বাড়িতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নোটবইয়ের মধ্যে রচনাকাল অনুযায়ী প্রবন্ধ কবিতাগুলি বিন্যস্ত হয়নি ; তবে 'ভারতচন্দ্র রায়ের বাটী ও কাউগাছীর দুর্গদর্শন' প্রবন্ধটির আগের ও পরের রচনাগুলি যে ১৭৭৬ শকে রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। এই প্রবন্ধের মধ্যে ও শেষে ১৭৭৬ শক নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি শকের স্থলে বাংলা ছয়কে (৬) এমনভাবে ইংরেজী তিনের মত (৩) লেখা হয়েছে যে ১৭৭৬ এই পাঠনির্ণয়ে বিভ্রান্তি জন্মাতে পারে। এর সমর্থনে বলা যায় নোট-বইয়ের অন্যান্য স্থলেও কখন কখন বাংলায় সন তারিখ নির্দেশে তিনের পরিবর্তে ইংরেজী তিন লিখিত হয়েছে। তথাপি ১৭৭৬ শকই গ্রহণযোগ্য। এসম্বন্ধে একটি আভ্যন্তরিক প্রমাণ প্রদত্ত হল। পূর্বেই বলা হয়েছে। রাখালদাস তারকনাথের বাটীতে ১৭৭৬ শকের ১২ কার্তিক তারিখে গিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধীয় মূল প্রবন্ধের (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পুস্তিকা অবলম্বনে লিখিত) শেষাংশে লেখক রাখালদাস বলেছেন, "কিয়দ্দিন পূর্বে আমরা রায়মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলাম"। এই প্রবন্ধটি '১৭৭৭ শকে লিখিত' ; তাই এর 'কয়দিন পূর্বে' অর্থাৎ ১৭৭৬ শকের ১২ই কার্তিকে রাখালদাস 'ভারতচন্দ্র রায়ের বাটী ও কাউগাছীর দুর্গদর্শন' করেছিলেন এবং সেই সময়ে শেষোক্ত প্রবন্ধটি লিখিত হয়।

সংবাদপ্রভাকর পত্রিকার ১২৬১ সালের ১ শ্রাবণ (১৮৫৪, ১৫ই জুলাই) শনিবার তারিখে সংখ্যায় সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'এতদ্দেশীয় সর্বসাধারণ ব্যক্তির প্রতি বিনয়পূর্বক নিবেদন' জানিয়ে বলেছিলেন, "এতদ্দেশীয় যে সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরা বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সংগীত সকল এবং সেই সেই পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকার পূর্বক যাবজ্জীবন তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ রহিব এবং তাঁহাকে দেশহিতৈষি-দলের প্রধান শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিব। এই মহা মঙ্গলময় ব্যাপারে ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার জন্য যদিস্যাৎ কেহ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রত্যাশা করেন, আমরা যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব তৎপ্রদানেও বিরত হইব না। জগদীশ্বর অস্মদাদিকে ধন দেন নাই, কেবল এক মন দিয়াছেন, সুতরাং ধনের দ্বারা কিছুই করিতে পারিনা, শুদ্ধ মনের দ্বারা পণের ব্যাপার যতদূর পর্যন্ত করিতে পারি, তাহাই করিয়া থাকি।......যদবধি এই দেহের সৎকার্য্য না হয় তদবধি

এই সৎকার্য সাধনে যদ্যপি সর্বস্ব যায়, নিঃস্ব হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয় তথাচ আমরা এই কর্তব্যকল্পে কখনই ক্ষান্ত হইব না।" ঐ 'নিবেদন' থেকে জানা যায় কেবল আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য নয় শারীরিক অসুস্থতাকে পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে ঈশ্বরচন্দ্র এই ব্রতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থকারগণের মধ্যে 'কবিকঙ্কণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বিদ্যাধর, কাশীদাস, কেতকীদাস, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র' প্রভৃতি জীবনচরিত এবং রচনাবলী সংগ্রহের যে পরিকল্পনার কথা নিবেদনে ঘোষিত হয়েছিল তা কালক্রমে কার্যে রূপায়িত হতে থাকে। ফলে ভারতচন্দ্রের জীবনী ও রচনাবলী সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১২৬২ সালের ১ আষাঢ় তারিখে। 'কবিবর ৵ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়ার ঠিক একমাস পূর্বে অর্থাৎ ১২৬২ সালের ১ জ্যৈষ্ঠের সংবাদপ্রভাকরে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। উক্ত গ্রন্থের 'ভূমিকায়' ঃ গ্রন্থকার মন্তব্য করেন, পূর্বে কয়েকজন কবির জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া গতমাসের প্রথম দিবসের প্রভাকরে বিশ্ববিখ্যাত মহাকবি ৵ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-চরিত উদিত করিয়াছি এবং অদ্য সে বিষয়ে স্বতন্ত্ররূপে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।'

ঈশ্বরচন্দ্র প্রণীত ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তের 'ভূমিকা'টি নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে লেখক বলেছেন যে প্রাচীন কবিগণের জীবনচরিত সংগ্রহ করে সাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে 'প্রায় দশ বৎসর পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাপথের পথিক হইয়া প্রতি নিয়তই উৎসাহরথের চালনা' করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং 'দশ বৎসর পর্যন্ত সংকল্প করিয়া ক্রমশঃ অনুষ্ঠান করিতে প্রায় দেড় বৎসর গত হইল আমি এই কার্য্যের দৃষ্টান্তদর্শক হইয়াছি' অর্থাৎ জীবনচরিত রচনা ও প্রকাশে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন ; ফলে রামপ্রসাদ রামনিধি প্রভৃতির জীবনী ও রচনাবলী সংবাদপ্রভাকরে ক্রমে ক্রমে মুদ্রিত হতে থাকে। এই সকল রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশের বাসনাও তাঁর ছিল। সেই সদিচ্ছাবশত তিনি পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্র বিষয়ক পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে উক্ত পুস্তিকাব ভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র দাবি করিয়াছিলেন, "ইহার পূর্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোন কবির জীবনচরিত প্রকাশ করেন নাই,—এবং এতৎ প্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত হয়েন নাই—আমরা প্রথমেই ইহার পথপ্রদর্শক হইলাম।" পরিশেষে তিনি মানুষের নিকট আবেদন করেছেন ঃ

সংশোধিতা মপিময়া বহুলপ্রয়াসৈ র্বাক্যবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধয়ন্ত।
সন্তঃ সুশান্ত নয়নান্তনিরীক্ষণেন কৃত্বা কৃপামিহ ময়ীশ্বরচন্দ্র গুপ্তে ॥

কবি সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ভারতচন্দ্রের জীবনী পাঠ করার পর রাখালদাস হালদার তার সমালোচনা করেছিলেন। ১২৬২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের সংবাদপ্রভাকরে এবং আষাঢ়ে ঐ জীবনবৃত্তান্ত যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন রাখালদাস তা মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছিলেন। ইতিপূর্বেই তিনি ভারতচন্দ্রের জীবনী সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলেন, 'ভারতচন্দ্র রায়ের বাটী ও কাউগাছী দুর্গদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠকালে এই তথ্য জানা যায়। উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর যে সুচিন্তিত ও সতর্ক মন্তব্য পাওয়া যায় সেগুলি অনুধাবন করলে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিজীবনী রচনার মহৎ উদ্দেশ্য যেমন তাঁর দ্বারা সম্বর্ধিত

হয়েছিল তেমনি ভারতচন্দ্রের জীবন-সম্বন্ধীয় গুপ্তকবির কোনো সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যুক্তিনির্ভর প্রয়োজনীয় আপত্তিও প্রকাশিত হয়; সংস্কারমুক্ত মন এবং নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি থেকে রাখালদাসের এইসকল মতামত উৎসারিত হয়েছে, ব্যক্তিগত ঈর্ষা আক্রোশ কখনও প্রশ্রয় লাভ করেনি এই ব্যাপারে। প্রাচীন কবিজীবনী সংগ্রহের ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহীত পদ্ধতিকে রাখালদাস অকুণ্ঠ প্রশংসা জ্ঞাপন করেছেন এবং নিজেও ঐরূপ উপায় অবলম্বন করেছিলেন। রাখালদাসের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি গুপ্তকবির প্রবন্ধটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে তার গুণ দোষ নির্ণয় করেছেন। এমন অনেক তথ্য তাঁর প্রবন্ধে পরিবেশন করা হয়েছে যা ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবন্ধের মধ্যে নেই। ভারতচন্দ্রকে বিভিন্ন দিক থেকে নিরীক্ষণ করার প্রয়াসের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আধুনিক পাঠকের ধন্যবাদার্হ. বিশেষত পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতচন্দ্রকে উপস্থাপিত করে আস্বাদনের উদ্যমটি অনবদ্য। বিদেশীয় কবিগণের জীবনের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের জীবনের সাদৃশ্য-চিন্তনের শুভ প্রচেষ্টা বর্তমান প্রবন্ধের একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতচন্দ্রের কাব্য আস্বাদন করে তাঁর কৃতিত্ব নিরূপণকালে রাখালদাস একটি সুকর্ষিত ও সহৃদয় পাঠকচিত্তের পরিচয় তুলে ধরতে পেরেছেন। এবারে রাখালদাসের মূল প্রবন্ধটি পরিবেশন করা যায়।

ভারতচন্দ্রের কবিকৃতিত্ব ও শিল্পকর্ম সম্পর্কে রাখালদাস 'ভারতচন্দ্র রায়। | ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনবৃত্তান্ত; শ্রীঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক রচিত; | ১৭৭৬ শক' এই শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধটির মধ্যে বলেছেন, "ভারতচন্দ্র রায় আমাদের যেমন পরিচিত, তদ্রূপ প্রীতিভাজন। তাঁহার বিরচিত সুললিত পদাবলী লোকে সর্বদা দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করে; তাঁহার প্রণীত অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর 'যাত্রা' স্বরূপ হইয়া অদ্যাপি আমাদের দেশে নাটকের স্থলকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার জীবিতাবস্থায় লোকে তাঁহার অসম্মান করে নাই। ইহা যথার্থ বটে (যেমন তিনি নিজে ব্যক্ত করিয়াছেন)—

ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দরসমো যত্তাত অসীন্নৃপঃ।
রাজ্যাদ্‌ভ্রষ্ট ইহাগতস্য নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাশ্রিতঃ॥ ৫

কিন্তু তিনি কবি হইয়া আপনার দুর্ভাগ্য আনয়ন করেন নাই; কবি হইয়াছিলেন বলিয়া বরং তিনি একপ্রকার সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় কত কবি কতপ্রকার দুঃখ সহ্য করিয়াছেন। টাসো নামক কবি দুই টাকার নিমিত্ত সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন; ফরাশীশ দেশীয় বিখ্যাত নাটককর্তা কর্নীল এমত দরিদ্র ছিলেন যে তিনি বৃদ্ধাবস্থায় একদিবস চর্মকারের বিপণিতে দণ্ডায়মান থাকিয়া একখান পাদুকার জীর্ণ সংস্কার করাইতেছেন, ইহা কোন ব্যক্তির নেত্রগোচর হয়। অটওয়ে নামক কবি ক্ষুধার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন; চর্চাইল ভিক্ষুকাবস্থায় এবং তাঁহার বন্ধু লইতে কারাগারে জীবন শেষ করেন। ইঁহাদের দারুণ শোকজনক অবস্থার সহিত ভারতচন্দ্রের অবস্থা তুলনা করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত বিস্তর উৎকৃষ্ট বোধ হইতে পারে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত প্রণয় হওয়া অবধি ভারতচন্দ্র ৪০ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। পরে বাটী নির্মাণ নিমিত্ত ১০০ টাকা দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের মূলায়োত (মুলাজোড়) গ্রাম 'ইজারা' দিয়া বার্ষিক ৬০০ টাকা কর স্বরূপ গ্রহণ

করিতেন। ইহাতে ভারতচন্দ্রের ঐশ্বর্য সম্ভোগ না হউক তাৎকালিকরূপ সুখের সহিত দিনপাত করিবার কোন ব্যাঘাত ছিল না। স্মরণ করিয়া নিশ্চয় আহ্লাদিত হইতে হয় যে বঙ্গদেশের একজন শ্রমণ কালীয় কবি সম্ভ্রমে কালযাপন করিয়াছিলেন।

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন যে ভারতচন্দ্র অতি অল্প বয়সে পদ্য রচনা আরম্ভ করেন। ভারতচন্দ্র যৎকাল দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর বাটীতে অবস্থিতি করিয়া পারসীক ভাষা অধ্যয়ন করেন, তখন সত্যনারায়ণের ব্রতকথা বলিয়া দুইটি পদ্য রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'সনে রুদ্র চৌগুণা' অঙ্ক নির্দিষ্ট আছে; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহার দ্বিপ্রকার অর্থ করিয়াছেন; ১১৩৪ এবং ১১৭৪; প্রথম শক গ্রাহ্য করিলে তৎকালে ভারতচন্দ্রের বয়স ১৫ বৎসর হয়, তিনি ১১১৯ সনে (১৬৩৪ শকে) জন্মগ্রহণ করেন; দ্বিতীয় শকানুযায়ী তখন ভারতচন্দ্র ২৫ বৎসর বয়স্ক হয়েন। ঈশ্বরবাবুকে প্রথম শকের প্রতি অধিকতর অনুকূল বোধ হয়। কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় শককে বিবেচনা সিদ্ধ বোধ হইতেছে। পঞ্চদশক বর্ষ যে ভরতের সত্যনারায়ণ ব্রতকথার ন্যায় রচনা অসম্ভব, ইহা আমাদের মত নহে; কারণ তদপেক্ষা অল্পতর বয়সে উৎকৃষ্ট রচনার বিস্তর প্রমাণ আছে। কর্ক হোয়াইট নামক কবি চতুর্দশ বর্ষে মনোহর পদ্যরচনা করিয়াছেন। জার্মান কবি গেটি আট কিম্বা নয় বৎসর বয়সে বারখানি চিত্রের বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। স্যর টমাস লরেন্স অষ্টমবর্ষে নানাবিধ রচনা প্রকাশ করিতেন। স্যর ফন্সিস পালগ্রেব অষ্টমবর্ষে হোমরকৃত গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ করেন। ভারতচন্দ্রের বুদ্ধিশক্তিও সামান্য ছিল না, তথাপি একটি বিষয়ে বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে তিনি পঞ্চবিংশ বর্ষেই সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের অনুমোদিত মত গ্রাহ্য করিলে স্বীকার করিতে হয় যে ভারতচন্দ্র বিংশতিতম বর্ষে বর্দ্ধমান রাজবাটীতে আপনারদের বিষয়-সম্পত্তির পক্ষে 'মোক্তার' স্বরূপে নিযুক্ত হয়েন। আমরা এবিষয়ে বিস্তর সন্দেহ করি। তিনি যে পারসীক অধ্যয়ন সমাপনান্তর ত্রিংশদবর্ষে অভিহিত কার্যে নিয়োজিত হন, ইহাই আমাদের সঙ্গত বোধ হইতেছে। যিনি আমাদের এই কথায় সম্মত হইবেন, সুতরাং তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতচন্দ্র পঞ্চবিংশ বর্ষে পদ্য রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহাকে এক অদ্ভুত পদার্থরূপে প্রতিপন্ন করা যদি ঈশ্বরবাবুর অভিপ্রেত না হইত, তবে তিনি ভারতের পঞ্চদশবর্ষে পদ্যরচনার কথা উল্লেখ করিতেন না।

তিনি যে কালে সংস্কৃত পারসীক, হিন্দী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন তখন স্বদেশীয় ভাষাভাষী পুস্তকপাঠে অনুরাগশূন্য ছিলেন না। সে সময়ে এদেশে গদ্য গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই; কতিপয় পদ্যপুস্তকমাত্র প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ অবশ্য তাঁহার জন্মের পূর্বে রচিত হয়। বোধহয় কাশীরামদাসের মহাভারত এবং কবিকঙ্কণের চণ্ডী তিনি বাল্যাবস্থায় পাঠ করিয়া থাকিবেন। এইসকল পাঠদ্বারাই সম্ভবতঃ তাঁহার পদ্য রচনায় প্রবৃত্তি হয়।

দেশপর্যটনের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানসীমা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি উৎকল দেশে ভ্রমণ করেন; সেই দেশে মহৎ ভাবোদ্দীপক তাদৃশ কোন পদার্থ নাই বটে, তথাপি পর্যবেক্ষণকারী ব্যক্তিরা লোকের রীতিনীতি দেখিয়া বিস্তর জ্ঞানোপার্জন করিতে পারেন। এবিষয়ের আবশ্যকতা

তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম ছিল; কারণ তিনি সুন্দরের মুখে তিনি বক্ষ্যমাণ বাক্য অর্পণ করিয়াছেন :

'দেখিব রাজার সভা সভাসদগণ।
আবার বিচার রীতি চরিত কেমন ॥'

ভারতচন্দ্র এইরূপ প্রচুর জ্ঞানলাভ পূর্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া ১৬৭৪ শকে সুপ্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। আর কতিপয় পণ্ডিত এই পুস্তক রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। ঈশ্বরবাবু লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণচন্দ্র রায় নির্দোষ করিয়া অন্নদামঙ্গলকে প্রকাশিত হইতে দেন নাই। আমরা এই কথার সহিত কোনক্রমেই ঐক্য হইতে পারি না। অন্নদামঙ্গল নির্দোষ গ্রন্থ নহে। ব্যক্ত অশ্লীলতা তাহার মহৎ দোষ। ঘৃণা ব্যতিরেক বিদ্যাসুন্দরের এক এক অংশ পাঠ করা যায় না। ইংরেজদের মধ্যে জগন্মান্য শেক্স্পীয়র প্রভৃতি কবিরা অভিহিত অশ্লীলতাদোষে দূষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহারা নিন্দনীয় ব্যতিরেক প্রশংস্য হন নাই। এতদ্দেশীয় একজন লেখক ইউরোপীয় কবিদের দোষ দেখাইয়া ভারতচন্দ্রের দোষ খণ্ডনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেই কারণেই আমরা একথা উল্লেখ করিতেছি, শেক্স্পীয়র ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিরা কবি ছিলেন বটে কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদের দোষকে গুণ বলিয়া প্রচার করা উচিত নহে। অপিচ কথিত হইয়াছে যে ভারতচন্দ্র যে সময়ে বর্তমান ছিলেন তখন অশ্লীলতা দোষমধ্যে গণ্য ছিলনা; এখনকার রীতি অনুযায়ী পূর্বকালীয় ব্যবহার বিবেচনা করা অনুপযুক্ত। কিন্তু একথার দ্বারাও ভারতচন্দ্রের আস্বাদন বৃত্তিকে কলঙ্কহীন রাখা দুরূহ। সেকালেই হউক আর একালেই হউক, ব্যক্ত অশ্লীলতা কদাপি গুণমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। সহৃদয় সাধুব্যক্তিরা তাহা দোষ বলিয়াই বিবেচনা করেন। অশ্লীলতার দ্বারা পৃথিবীর অপকার ভিন্ন কি উপকার হইতে পারে? ভারতচন্দ্র যে প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে উক্ত দোষ বরং গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, আমরা স্বীকার করি তিনি অশ্লীলপ্রিয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সন্তোষ প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের আদিরস বর্ণনে যাদৃশ কৌশল দেখা যায়, নিজে আদিরস ভক্ত কবি না হইলে তাদৃশ রচনা করা সম্ভবে না।

কবি রায়গুণাকরের রচনার আর কতিপয় দোষ আছে। তিনি প্রচুর পরিমাণে অনুকরণ শব্দ ব্যবহার করেন, ইহাতে কেবল ভাবের অভাবমাত্র প্রতীত হয়; কেবল শব্দের উপর নির্ভর করা মহৎ কবির লক্ষণ নহে। মহত্তেরা মহৎ বা ভয়ানক রস উদ্দীপন করিতে হইলে কেবল অর্থের উপর মনোযোগ দিয়া থাকেন।

পারসীর ভাষাশিক্ষা তাঁহার কাব্য রচনায় কি উপকারজনক হয়? আমাদের বোধ হইতেছে. তিনি হিন্দী ও পারসীক ভাষা না শিখিলে মহত্তর কবি হইতেন। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতের অপ্রকাশিত রচনা সংপ্রতি প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে কতিপয় এককালে তিনচারি ভাষায় রচিত হইয়াছে। তাহা কবিত্ব প্রকাশক হওয়া দূরে থাকুক, বরং ভারতের রচনার একটি দোষরূপে গণ্য হইতে পারে। ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি যত প্রবৃদ্ধ হইতেছিলেন ততই এইরূপ রচনায় অধিক পরিশ্রম স্বীকার করিতেছিলেন। তাঁহার সর্বশেষ অসম্পূর্ণ গ্রন্থ চণ্ডীনাটক এইরূপে রচিত হইতেছিল।

অন্নদামঙ্গলের মূল প্রবন্ধবিশেষ আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেম। উহার মূল প্রবন্ধ কোন মতেই উৎকৃষ্ট নহে। যদি তাহা গদ্যে রচিত হইত, আমরা কদাপি সানুরাগে পাঠ করিতাম না। অন্নদামঙ্গল অর্ধকাব্য—অর্ধ পৌরাণিকভাব প্রীতিকর বোধ হয় না। বস্তুতঃ অন্নপূর্ণার পূজা প্রচার যদি উক্ত কাব্যের উদ্দেশ্য না হইত, তবে গ্রন্থকার উৎকৃষ্টতর কাব্য রচিতে পারিতেন।

আমরা তাঁহার কাব্যের আরও দোষ উল্লেখ করিতে পারি। তিনি রতির দৈববাণী নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক রূপে রচনা করিয়াছেন। তিনি ভূত প্রেত ডাকিনীদিগকে আবশ্যকরূপে (অনাবশ্যক-রূপে ?) পুনঃ পুনঃ কাব্যমধ্যে সমাবেশিত করিয়াছেন, তাঁহার অন্নপূর্ণার অপেক্ষা জয়ার কেমন বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ হইয়াছে! তিনি ব্যাসকে এক আশ্চর্য জন্তু করিয়াছেন :

দাঁড়াইলে জটাভার
চরণে লুটায় তাঁর
কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি
পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
চলনে কতেক আটুবাঁটু ॥ ৬

ব্যাস স্নান করিয়া উঠিলে না জানি তাঁহাকে কেমন অদ্ভুত পদার্থ বোধ হইত! কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ চিত্র নহে; ইহার আশ্চর্যতর অংশ পশ্চাৎ রহিয়াছে :

কপালে চড়ক ফোঁটা
গলে উপবীত মোটা
বাহুমূলে শঙ্খচক্র রেখা।
সর্বাঙ্গে শোভিত ছাবা
কলি মুগ বাঘথাবা
সারি সারি হরিনাম লেখা ॥
তুলসীর কণ্ঠি গলে
লম্বি মালা করতলে
হাতে কানে থরে থরে মালা।

ব্যাসের অতি দুর্ভাগ্যজনক চিত্র। যথার্থতঃ তাঁহার এমত ভাব আমরা কদাপি কল্পনা করি নাই। গুণাকর সহজে ব্যাসদেবকে বিদায় করেন নাই; তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিয়া দূর করিয়াছেন।

তাঁহার রচনার দোষবর্ণন অবশ্য আমরা এইস্থলে শেষ করিব, এবং তদীয় উজ্জ্বল ভাগকে অবলোকন করিব। কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যাবসানে সুধাংশু সন্দর্শন যেমন তৃপ্তিকর, এবিষয় আমাদের পক্ষে সেইরূপ হইয়াছে। কলঙ্ক সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল কবি ছিলেন। তিনি স্বীয় রচনার স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কোন ব্যক্তির (ব্যক্তি ?)

মেনকা কন্যার সহিত শিবের বিবাহ, বিদ্যাসুন্দরের মিলন, রাণীর নিকট অনুনয় প্রভৃতি বিষয় পাঠ করিয়া তত্তদ্ ব্যাপারে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব না করেন ? তিনি ইচ্ছামতে এক এক স্থানে এক এক রসকে মূর্তিমান করিয়াছেন বলিলে হয়। বস্তুত আদিরস ও হাস্যরস বর্ণনে তাঁহার এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তিনি রৌদ্র ও ভয়ানক রস বর্ণনে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হয়েন নাই; ভাষার দারিদ্র্যতার জন্য ইহা ঘটিয়া থাকিবে ; বর্তমান অবস্থায় বাঙ্গলা ভাষার সহজ ভাব উদ্দীপন বিষয়ে আমরণ বিস্তর সংশয় করি ; অদ্যাপি এরূপ রচনা প্রত্যক্ষ করা যায় নাই। রচনার যে অংশ নিতান্ত চিত্তাকর্ষণ সমর্থ, লোকে তাহাতে সহজে বিমোহিত হয় ; কিন্তু যে অংশের দোষগুণ বিচার মার্জিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, লোকে তৎবিষয়ে কিছুমাত্র স্থির করিতে পারে না। এই নিমিত্ত এই কাব্যবিষয় বিচার সময়ে সাধারণ লোকে ভ্রমাবর্তে পতিত হয় ; এই নিমিত্তই রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল নির্দোষ কাব্য বলিয়া বিরোচিত (?) হইয়াছে। কিন্তু এখন কবিত্ব বিচারের উপযুক্ত সময় উপস্থিত ; এখন ভারতের রচনার দোষ প্রকাশিত হইলেও তাহার পক্ষে সুখের বিষয় এই যে তিনি রসজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা যথার্থ কবি পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ মধ্যে কিয়দ্দিন নব্য পদ্যকারদের মধ্যে গণ্য হইতেছিলেন ; যাহাদের মস্তকে কবিত্বের প্রবাত্ত (?) কদাপি সংস্পর্শ হয় নাই, তাঁহারাও গুণাকরকে অনুকরণের চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গলার কবিত্ব প্রস্রবণের মুল বিষাক্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এদেশীয় লোকের দোষগুণ বিচারশক্তি অতি অল্প; এই অকবিদের দূষণীয় রচনার দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যশাস্ত্র বিকৃত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহা নিবারণের উপায় করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

আমরা যথার্থ কবিত্ব ও পদ্যরচনার ইতর বিশেষ বর্ণন করিতাম ; আমরা ভারতচন্দ্রের রচনার সৌন্দর্য প্রদর্শনে বাহুল্যরূপে প্রবৃত্ত হইতাম ; কিন্তু অবকাশাভাব প্রযুক্ত আমারদের এ সমুদয় অভিলাষ সম্প্রতি বিফল রহিল। আমরা অতি দুঃখের সহিত এই প্রস্তাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছি।"

প্রবন্ধটির আর একটি মাত্র অনুচ্ছেদ অবশিষ্ট আছে। এই শেষ পর্যায়ের একটি স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন :—"আর একটি কথা উল্লেখ না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা যায় না। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন যে গুণাকরের পৌত্র তারকনাথ রায় মহাশয়ের অন্নবস্ত্রের ক্লেশ নাই ; আমরা বলিতেছি তাঁহার অন্নবস্ত্রের সুখও নাই। কিয়দ্দিন পূর্বে আমরা রায় মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলাম। যদিও গুণাকরের আবাসভূমি বলিয়া আমাদের মন কৃতার্থম্মন্য হইল, কিন্তু রায় মহাশয়ের কষ্ট দেখিয়া আমরা ব্যাকুল হইলাম। ভারতচন্দ্রের অনুরাগী ব্যক্তিদিগকে আমাদের অনুরোধ এই যে তাঁহারা প্রিয় কবির সম্মান করুন ; তাঁহার নিকটে যে গুরুতর ঋণবদ্ধ তাহা পরিশোধ দিবার চেষ্টা করুন। জীবিতাবস্থায় রায়গুণাকর সচ্ছলে কাল যাপন করিয়া থাকিলেও তাঁহার সম্পূর্ণ সমাদর হয় নাই। তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মানার্থ মুলাজোড় গ্রামে এক সভা আহ্বান করা উচিত ; এবং উৎসব ব্যাপার সম্পন্ন করা কর্তব্য। ৯৫ বৎসর পূর্বে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। শতবর্ষের মধ্যেই যেন ইহা সম্পন্ন হয়।"

এই প্রবন্ধটি '১৭৭৭ শকে লিখিত' বলে প্রবন্ধ শেষে মন্তব্য করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে প্রবন্ধের শিরোনামের মধ্যেও ১৭৭৭ শকের উল্লেখ পাওয়া যায়। উপরের উদ্ধৃতিতে

রাখালদাস 'কিয়দ্দিন পূর্বে' তারকনাথ রায়ের বাড়িতে যাওয়ায় যে প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন সে সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হয়েছে। এই সূত্র অনুসরণ করে বলা হয়েছে যে 'ভারতচন্দ্র রায়ের বাটী ও কাউগাছির দুর্গদর্শন' প্রবন্ধটি ১৭৭৬ শকে রচিত হয়। ১৭৭৬ শকের ১২ কার্তিক তারিখে তিনি মূলাজোড় ভারতচন্দ্রের বংশধরগণের বাড়িতে গমন করেন, অতঃপর কাউগাছির দুর্গদর্শন করেন। এর বেশ কয়েকমাস পরে (১৭৭৬ শকে) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত গ্রন্থ অবলম্বন করে রাখালদাস ভারতচন্দ্রের সম্বন্ধে এই আলোচনামূলক প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন।

(জগদ্দলের শ্রীরাখালদাস হালদার (১৮৩২-৮৭) চিন্তাশীল ও জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ও অনঙ্গমোহন মিত্রের সহিত মিলিত হইয়া ১৮৫২ সালে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে আত্মীয় সভা স্থাপন করেন।—সম্পাদক)

১। এই দুইটি শব্দের তাৎপর্য বোধগম্য হইল না।

২। এর একটু কাটাকুটি আছে, বাকী অংশ পরপর উদ্ধৃত হল।

৩। ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত ও রচনাবলী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরচন্দ্র এই একই তারকনাথ রায়ের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, ভারতচন্দ্র বিষয়ক পুস্তিকার (১লা আষাঢ় ১২৬২ সং) ৪৫ পৃষ্ঠায় সেকথার উল্লেখ আছে।

৪। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক লিখিত, কলিকাতা। ১লা আষাঢ় ১২৬২ প্রভাকর যন্ত্রালয়।'

৫। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলীর (চৈত্র ১৩৫৭ সং) ৪৫৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'চণ্ডী নাটক' এর অন্তর্গত 'সূত্রধারের উক্তি' থেকে বর্তমান অংশ উদ্ধৃত। পাণ্ডুলিপিতে যে অশুদ্ধি ছিল পরিষৎ পাঠ অবলম্বনে তা সংশোধিত হল। শেষ চরণের অংশবিশেষ মূল পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী রেখাঙ্কিত করা হয়েছে।

৬। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, অন্নদামঙ্গল—ব্যাসবর্ণন, ১০৯।

৭। বোধহয় 'বিবেচিত' হবে। কিংবা 'বিরচিত' এই পাঠ ধরলে 'বিচারিত হওয়াও অসম্ভব নয়।

৮। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেছিলেন, "যদিও তাঁহাদিগের অবস্থা তাদৃশ উন্নত নহে, কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছায় অন্নবস্ত্রের বিশেষ ক্লেশ নাই"। দ্রঃ- ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী' ১৯৫৮,৩৫।

দেবতা না শয়তান

প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ইংলণ্ডের রেনেসাঁর কীর্তি হলো নাটক। এদেশে নাটকের মাধ্যমেই জাতীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিলো। সাহিত্যের ইতিহাসে রোমান কর্তৃক বৃটেন-বিজয় নাট্যচর্চার জন্মলগ্ন বলে গৃহীত হয়েছে। বলা বাহুল্য, নব জাগৃতির কালে অন্য দেশের মত বৃটেনের সামনেও ধ্রুপদী সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু ছিলো না। সেনেকার নাটক দিয়েই নাট্যচর্চার উদ্বোধন হলো। বিদেশী নাটকের সাময়িক সাফল্য দীর্ঘজীবী হয়নি, শ্রোতৃমণ্ডলীর ধমনীতে ইংরাজ-রক্ত ছিলো প্রবহমান। তবে শুধু ইংরাজ নয়, কোনও আত্মসচেতন জাতিই সহোদর সংস্কৃতির দাসত্ব করে বেঁচে থাকতে পারে না। ইংলণ্ডও পারেনি। যাই হোক, বৃটেন থেকে রোমানদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী নাটকেরও বিসর্জন হলো।

পরবর্তী কাল ইতিহাসে মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত। তমসাবৃত কেননা যে সব প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে আজ আমরা রেনেসাঁর উত্তরকথন বলে জেনেছি, সেদিন সে-সব অচিন্ত্য ছিলো। মধ্যযুগীয় চেতনায় ঐহিক সুখের মত ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ছিলো ঘৃণিত। আর নারী ছিলো নরককুণ্ডের নামান্তর। ঠিক এই সময়, সামাজিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের যুগে চার্চ জনচিত্ত বিনোদনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে। 'দায়িত্ব' বলছি কেননা পোপশাসিত সমাজব্যবস্থায় জনশিক্ষা সম্পর্কে চার্চের মাথাব্যথার অন্ত ছিলো না। নৈতিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতাকে মিলিয়ে দিয়েছিলো চার্চ। 'এভ্রিম্যান্' হলো এই মিলনের রূপক।

মধ্যযুগীয় অচলায়তনের অন্তরালেও সৃষ্টির কাজ অব্যাহত ছিলো। চার্চের অভিভাবকত্বে শিল্প যতই নীতিকথা সার হোক না কেন, তবু আশার কথা এই যে সদ্যোজাত জাতীয় সংহতি দেখে এটুকু বোঝা গিয়েছিলো যে নবজাগৃতির পরম লগ্ন আর সুদূরে নেই।

অবশেষে ইংলণ্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথান্ সুবর্ণযুগ এলো। এই উষালোকিত মুহূর্তে অন্ধকারের বন্ধনদশা থেকে শিল্পের মুক্তি ঘোষণা করলেন 'য়ুনিভার্সিটি উইটস্'। ক্রিস্টোফার মার্লো ছিলেন এই দলের মধ্যমণি। মার্লো রচিত 'তাম্বুরলেন' এবং 'জ্যু অব মাল্টা' থেকে 'ট্র্যাজিকাল হিসট্রি অব ডক্টর ফস্টস্ গ্রন্থখানি একটু স্বতন্ত্র। গত চারশো বছর ধরে বইখানি আমাদের আকৃষ্ট করে আছে। উপরিউক্ত নাটকদ্বয় থেকে এর পার্থক্য প্রভূত। কেননা এটি যতখানি ঐতিহ্যবাহিত ঠিক ততখানিই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। ফাউস্ত এক জর্মন কিংবদন্তীর নায়ক। পেশাতে তিনি একজন রসায়নবিদ্। নেশা তাঁর জ্ঞানাহরণ। সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করে অবশেষে শয়তানের কাছে তিনি আত্মবিক্রয় করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের ইংরাজী সাহিত্য মধ্যযুগীয় প্রভাবাক্রান্ত। কিংবদন্তী মাত্রেই সংস্কারপুষ্ট। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণকলার বিনিময়ে শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় মধ্যযুগীয় সংস্কারপ্রসূত কল্পনা। মার্লো এটি আহরণ করেছিলেন। 'মর‍্যালিটি' নাটকে পাপ-পুণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো। মার্লো রচিত আলোচ্য

নাটকের নায়ক ডক্টর ফস্টসের ওপরও 'গুড্ এঞ্জেল' বা 'ব্যাড্ এঞ্জেলের' বিপ্রতীপ অভিঘাত আছে। 'গুড্ এঞ্জেল' চায় ফস্টস সুপথে আসুক, ঈশ্বরের পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করুক। আর 'ব্যাড এঞ্জেল' নায়ককে ক্রমশ আধ্যাত্মিক অধঃপতনের দিকে ঠেলছে। ডক্টর ফস্টস এগিয়ে আসতে বারম্বার পিছিয়ে পড়ছে। এখানেই নাটকটির ট্রাজিডি।

আলোচ্য নাটক রচনার প্রাক্কালে মার্লোর ঐশ্বরিক বিশ্বাস ইতিবাদী না নেতিবাদী ছিলো তা বিতর্কের বস্তু। আমার ধারণা খৃষ্টপুরাণের পাপ বা তদ্দজনিত নরকবাস তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো। 'ডিভাইন কমেডি'তে দান্তে পরকালের জন্য ইহকালকে দায়ী করেছিলেন। প্রতিটি মানুষের ইহলৌকিক কর্ম তার যথাযথ আসন নির্ধারণ করেছে ইনফার্ণো, পারগেটোরিও অথবা প্যারাডিসোতে। ডক্টর ফস্টসের নরকবাস ঘটেছিলো। কেননা তিনি দেবতাকে অবহেলা করেছিলেন। নরকে যে তাঁর স্থান সুরক্ষিত আছে এ বিষয়ে ফস্টসের সন্দেহ ছিলো না। তবু ঘড়িতে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যন্ত্রণা তীব্র হয়েছে।—

> 'O it strikes, it strikes ! Now body turn to air
> Or Lucifer will bear thee quick to hell.
> O soul be chang'd in to little water drops.
> And fall in to the ocean. n'eer be fonud'

এ কাকুতি, এই ক্রন্দন অনিবার্য হলেও নিষ্ফল। ফাউস্ত কি জানে না সেকথা? যে শরীর এত প্রিয়, তা নরকে কীটভোগ্য হবার আগেই ফস্টস পরিত্রাণ চেয়েছে—দেহ মিলিয়ে যাক শূন্যে বায়ুতে, আত্মা গলে পড়ুক, জল হয়ে ঝরে পড়ুক সমুদ্রগামী নদীস্রোতে। তবু তাঁর প্রার্থনা নামঞ্জুর হলো। বাহির দুয়ারে নারকীয় দানবদের দেখে ফস্টস্ চীৎকার করে উঠলেন—

> My God my God, Look not fo firce on me
> Adders and serpents, but me breathe a while
> Ugly hell, gape not ! Come not Lucifer !

প্রতিটি শিল্পীই তার যুগের কাছে ঋণী। মার্লোর 'Tragical History of Doctor Faustus রেনেসাঁর ফলশ্রুতি বহন করছে। ফ্রান্সিস বেকনের 'Knowledge in the power of man' কথাটি হৃদয়ে ধারণ করেছিলো ডক্টর ফস্টস্। মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রা ছিলো ঈশ্বরকেন্দ্রিক। রেনেসাঁ এসে পৃথিবীর প্রচ্ছদপট পালটে দিয়ে গেলো। মানুষ জানলো সে আগের মতো অসহায় নয়, সংস্কারের ক্রীতদাস নয়। তমসাবৃত যুগে সে যদি দাসত্বের দেনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে থাকে তবে আজকের এই ব্যক্তি বিমুক্তির যুগেই বা আত্মমর্যাদার পাওনা ছাড়বে কেন? এখন থেকে আমরা মানবকেন্দ্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করলাম। 'Man is the measure of universe' উক্তিটির মাধ্যমে মানবকেন্দ্রিক চেতনার নূতন সংজ্ঞা মিললো। মার্লোর লেখায় মানুষের উত্তরণের দৃষ্টান্ত প্রচুর। শুধু 'ডক্টর ফস্টস' নয় 'তাম্বুরলেনে'র মধ্যেও এই প্রগতিশীল চিন্তাধারা বর্তমান।

দ্বিতীয়তঃ রেনেসাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ভৌগোলিক তৃষ্ণা। মানুষকে জানতে গিয়ে

বিশ্বকে জানার আকাজ্ক্ষায় লোকে ঘর ছাড়্‌লো। বলা বাহুল্য, নবজাগৃতির মুহূর্তে য়ুরোপে যত পরিব্রাজক বা আবিষ্কারক দেখা গিয়েছিলো অন্যযুগে সেই সংখ্যার ভগ্নাংশও বিরল। এই বিশ্বচেতনা মার্লোরও ছিলো। 'Without the voyagers Marlowe is inconcivable' কথাটি যথার্থ দৃষ্টান্তস্বরূপ—

"I'll have them fly to India
Ransack the ocean for orient pearl
And search all Corners of the New foundland
For plesant fruits and princely delicates'.

তৃতীয়তঃ রেনেসাঁর নন্দন জিজ্ঞাসা মার্লোর মধ্যে প্রখর ছিলো। মধ্যযুগে ইন্দ্রিয়সুখ যৌনব্যাভিচার বলে গৃহীত হত। সেদিন সৌন্দর্যের নিখিল আবেদন পাপবোধ বলে ঘৃণিত ছিলো। রেনেসাঁ এসে দৃষ্টিভঙ্গী পালটে দিয়ে গেলো। য়ুরোপীয় শিল্পীর চিত্রে ভাস্কর্যে আর কবিতায় নরদেহের সৌন্দর্যচেতনা প্রখর হয়ে উঠলো। সেই থেকে আমরা দেহকে ভালোবাসতে শিখলাম। জানলাম জীবন আর বাসনার শ্মশান নয়। জীবনের জয়গান গাইতে গেলে দৈহিকতার প্রতি অন্ধ হলে চলবে কেন! সেই থেকে য়ুরোপীয় কাব্যে উত্তাপ এলো, আবেগের পুনরুদ্ধার হলো। ডক্টর ফস্টসের নন্দনচেতনা রেনেসাঁরই ফলশ্রুতি। হেলেনের রূপের প্রশান্তিতে সে মুখর রয়েছে—

'Was this the face that launched a thousand ships
And burut the topless towers of Illium ?
Sweet Helen, make me immortal with a kiss.'

তা হলে দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য নাটকটির ওপর মধ্যযুগ, খৃষ্টপুরাণ এবং রেনেসাঁর প্রভাব লক্ষণীয়। তাই এর অসাধারণ মূল্য আছে। এর ভেতরে ঐতিহ্যবাহিত সংস্কার আর স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত সত্তা মিলে গেছে অর্থাৎ এটি এমন একটি নাটক এই ধারাগুলির যৌথপ্রভাব লক্ষণীয়। যে যুগসন্ধিক্ষণে মার্লোর জন্ম তখন যেমন মধ্যযুগীয় পূর্বসূরীর প্রভাব অনতিক্রম্য ছিলো ঠিক তেমনি দুর্বার ছিলো রেনেসাঁর নন্দনতত্ত্বের আবেদন। তাই মার্লোর রচনায় বিশেষ করে 'Tragical History of Doctor faustus'এর মধ্যে তমসাবৃত মধ্যযুগ আর উষালোকিত রেনেসাঁর মধ্যে নাট্য-সাহিত্যের বিবর্তনের কক্ষপথ চোখে পড়ে।

'ডক্টর ফস্টসে'র আলোচনা করতে বসলেই 'ফাউস্তের' প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। এরা দুজনেই সহোদর। কেননা উভয়ই একই জর্মন কিংবদন্তী থেকে জাত। এরা দুজনেই অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি। জ্ঞানস্পৃহা এদের অনন্ত। পরিচিতিতে এরা রসায়নবিদ্। তবু তীব্র জিগীষা এদের শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয়ে বাধ্য করেছিলো। মার্লো এবং গ্যেটের মানস সন্তানদ্বয়ের আপাতত সাদৃশ্য সত্ত্বেও এদের মূলগত বৈষম্য অনতিক্রম্য। পঠনের বিশাল পরিধির অধিকারী হয়েও, শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় সত্ত্বেও এরা দুটি ভিন্ন চরিত্র। মার্লো গ্যেটের মেফিষ্টফিলিসও কিন্তু এক নয়, আলাদা। এঁদের দুজনের রচনায় শয়তানের রূপান্তর লক্ষণীয়, ঠিক যেমন আকর্ষণীয় ফস্টস অথবা ফাউস্তের পার্থক্য।

মার্লোর মেফিষ্টফিলিস এক নারকীয় সত্তা। যথার্থ নারকীয়। এখানে পবিত্র, সরল, কল্যাণকামী কিছু নেই। যা আছে সমস্ত ঘৃণ্য স্পৃষ্ট, উচ্ছিষ্ট, হঠকারিতা। যেটুকু বিস্ময়কর আছে তা হলো মেফিষ্টফিলিসের যাত্নকরী ছলনা। হুটি ক্ষেত্রেই শয়তান কল্পতরু। এমন কিছু নেই, ঐহিক সুখ, কোনও ইন্দ্রিয় সম্ভোগ, অবিশ্বাস্য, ঐশ্বর্যবিলাস যা মেফিষ্টফিলিসের পক্ষে দেওয়া সাধ্যাতীত। তবে সব কিছুরই একটি সীমা আছে। শয়তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ফস্টস সীমিতকাল সুখভোগ করতে পেরেছে। সে কথা থাক। এখন মার্লো এবং গ্যেটের মেফিষ্টফিলিসের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা যাক।

ড্রাগনের ছদ্মবেশে যখন মেফিষ্টফিলিস এলো তখন ডক্টর ফষ্টস বললে—

"I change thee to return and change thy shape
Thou art too ugly to attend on me."

এই 'ugly' কথাটি মেফিষ্টফিলিসের নারকীয় সত্তার উদ্‌ঘাটক। আরেকবার আত্মানুতপ্ত ডক্টর ফস্টস মেফিষ্টফিলিসকে বরখাস্ত করে দিয়ে বললে,—

"Ay go accursed spirit to ugly Hell."

এই 'ugly' কথাটির চূড়ান্ত অর্থবোধ হলো যখন নাটকের শেষে ফস্টস বললে : 'ugly Hell gape not......"

গেটের শয়তান সিনিক্ হতে পারে, শ্লেষমুখর হতে পারে, কিন্তু পাপের পরাকাষ্ঠা নয় কিছুতেই। সে ধ্বংস ও অকল্যাণের প্রতীক। তার প্রতিটি কাজে ও কথায় মানুষের সীমিত ক্ষমতার প্রতি কটাক্ষের তীব্রতা আছে। তবে তার মধ্যে দ্বৈতশক্তির বিপ্রতীপ অভিঘাত লক্ষণীয়। দায়িত্বশূন্যতা ও অলৌকিক ইচ্ছাপূরণ এই বিপরীত শক্তির সংঘাতে মেফিষ্টফিলিস চরিত্রে ধূপছায়ার সৃষ্টি হয়েছে। স্বগতে সে আত্মপরিচয় দিয়েছে—

'Part of that Power, not understood which always wills the Bad, and always work the Good !

গ্যেটের রচনায় মেফিষ্টফিলিসের সঙ্গে দেনাপাওনার চুক্তিতে ফাউস্টের চৈতন্য মলিন হলেও তার কল্যাণব্রত অনির্বাণ ছিলো। তাই প্রাথমিক পদস্খলনের পরেও দ্বিতীয়পর্বে তাকে সত্যতার মশালবাহক বলে মনে হয়েছে। প্রথম পর্বের ফাউস্ত যদি হঠকারী হয়, তবে দ্বিতীয় পর্বে সে সৃষ্টিশীল সংস্কারক। অথচ মার্লোর ডক্টর ফস্টস কিন্তু অপরাধচেতনায় বারম্বার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। মেফিষ্টফিলিসের সফল মরীচিকায় সে বিভ্রান্ত হতে পেরেছে। ডক্টর ফস্টস বলেছে—

Had I as many souls as there be stars
I'd give them all for Mephistophilis.

ফাউস্তের Rousseanistic benevol nce-এর পাশে ডক্টর ফস্টসের দায়িত্বশূন্যতা বড়ো প্রকট। ফাউস্ত যেখানে পরহিতব্রতী, ডক্টর ফস্টস সেখানে ক্ষুদ্রতৃপ্তিতে আত্মসন্তুষ্ট। ফাউস্ত যখন কল্যাণকামী ডক্টর ফস্টস তখন যেন আত্মনিগ্রহী। ফাউস্তের তুলনায় ডক্টর ফস্টসের চৈতন্যের গ্লানি বড়ো হীন।

ডক্টর ফস্টসের যন্ত্রণার মধ্যে যুগবিষাদ আর অপরাধ সচেতনতা যৌথভাবে কাজ করেছে।

তাই সে বলতে পারলো : 'My heart is hardend, I cannot repent.' যেহেতু ডক্টর ফস্টস যুগবিষাদ আর অপরাধ সচেতনতার কল্পিত সীমারেখা অতিক্রম করিতে পারেনি তাই তার উত্তরণও হলো না। এটি স্বাভাবিক। কেননা ফস্টস জনক স্বয়ং মার্লো এই যুগযন্ত্রণার শিকার হয়েছেন। তাঁর পক্ষে আস্তিক্যবাদ যেমন হাস্যকর ছিলো, তিনি যেমন মধ্যযুগীয় ঈশ্বরভীতিকর কটাক্ষ করেছিলেন, ঠিক তেমনি নাস্তিক্যবাদও অবলম্বন করতে পারেন নি। মার্লোর মত ডক্টর ফস্টসেরও দোটানা ছিলো। সে যেমন বিশ্বাসের রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে পারলো না, তেমনি পারলো না নাস্তিক্যবাদকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে। ভেবে দেখুন পাঠক, অমরতার আকাঙ্ক্ষায় যে ডক্টর ফস্টস হেলেনের কাছে একটি চুম্বন প্রার্থনা করেছিলো, সেই ব্যক্তিই অন্তিমকালে যীশুর শরণ নিলো। এটি ফস্টস চরিত্রে বিশাল 'আয়রণি।'

নরকবাসের পূর্বমুহূর্তে ডক্টর ফস্টস ইহলোকের জন্য বেদনাবোধ করেছেন। বলা বাহুল্য এবম্প্রকার বেদনাবোধ বন্ধনজনিত। তাই শেষমুহূর্তে সে তার ছাত্রমহলকে পালিয়ে যাবার সু-পরামর্শ দিয়েছে। কেননা ডক্টর ফস্টসের ভয় ছিলো—Best you perish with me!' শুধু তাই নয়, নরকবাসের পূর্বমুহূর্তে সে বলে উঠেছে 'I'll burnt my books, Ah Mephistophilis!

তবু মার্লোর নায়ক নিষ্কৃতি পায়নি। অথচ গ্যেটের ফাউস্ত রেহাই পেয়েছে। তার নরকদর্শন পর্যন্ত হয়নি। তাছাড়া ফাউস্তের যে মৃত্যুর বর্ণনা গ্যেটে দিয়েছেন, ডক্টর ফস্টসের পাতাল প্রবেশের সঙ্গে, তার কোনও তুলনাই হয় না। কাব্যরসিক মাত্রেই স্বীকার করেছেন ফাউস্তের মৃত্যু, ডক্টর ফস্টসের চেয়ে অনেক বর্ণাঢ্য। এখানেই মার্লো আর গ্যেটের পার্থক্য।

'The Death of Tragedy গ্রন্থে জর্জ স্টাইনার বলেছেন রোমান্টিকতা আর ট্র্যাজেডির সহবাস অসম্ভব। কথাটি যথার্থ। রোমান্টিকতা হৃতসর্বস্ব নায়ককে সময়োচিত মুক্তি এনে দেয়। এখানে নায়ক কষ্ট, ক্লেশ আর যন্ত্রণা স্বীকার করে বটে, কিন্তু সে জানে "If winter comes, Can spring be far behind?" যন্ত্রণা স্বীকার করেও রোমান্টিক নায়ক প্রতীক্ষায় বাণবিদ্ধ হয়ে থাকে—সুফলের আশায়। ক্লেশ স্বীকার এখানে অনিবার্য হলেও নিস্ফল নয়। ফলে প্রমিথিয়ুস মুক্তি পায়। ফাউস্তকে সহোদর অগ্রজ ডক্টর ফস্টসের মত নরকাগ্নিতে প্রজ্জলিত হতে হয় না। বিধির বিধানে এখানে আপনি এসে যায় রুশোর 'Compensating Heaven.' এর ফলে নায়কের ট্র্যাজিক সত্তা ক্ষুন্ন হয়। স্টাইনার লিখেছেন "The dramatic personages assume their own integral being in authentie tragedy." লেখকের পক্ষ থেকে ট্র্যাজেডী রচনার অন্যতম প্রতিজ্ঞা হলো নৈর্ব্যক্তিকতা। অথচ রেমোন্টিকতা কবি আর কাব্যকে মিলিয়ে দিয়েছে। ট্র্যাজেডীতে নাট্যকার ট্র্যাজিক নায়ক ভিন্ন লোক। এঁদের জীবনের গতিও ভিন্ন। অথচ রোমান্টিকতার অন্যতম লক্ষণ কাব্যের চরিত্র আর কবির চরিত্র মিলিয়ে দেওয়া। এরা আলাদা নয়—এক, অভিন্ন।

এই কারণেই মার্লোর "Tragical History of Doctor faustus" যথার্থ ট্র্যাজিক মহিমামণ্ডিত আর গ্যেটের "Faust" কালো আঁধারির অতি নাটকীয়তায় একটি "Sublime melodrama"য় পর্যবসিত হয়েছে।

উত্তর রাঢ়ের লোকসংগীত

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

'করম্' পূজার গান

বাঙালী হিন্দুর বৎসরের শ্রেষ্ঠ পূজা যেমন দুর্গাপূজা, মুসলমানদের যেমন ঈদ, সাঁওতালদের যেমন 'সহরাই' বা বাঁধনা—ধাঙর (ওঁরাও)দের তেমনি এই 'করম' পূজা 'কার্মাধার্মা'য়। ধাঙড়দের সমস্ত কামনাবাসনার স্ফুরণ এই উৎসবে। সন্তানের কামনা, শস্যের কামনা, যুদ্ধব্যয়ের কামনা। এই পূজা একই সময়ে সমাজের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা 'ইন্দ্রপূজা,ও অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দুরা 'ইঁদ' পর্ব নামে করে থাকে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন 'করম' পূজা মূলতঃ ইন্দ্রপূজার অনার্যীকরণ; এর স্বপক্ষে যুক্তিগুলিও নীচে আলোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু বাঙালীর ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করলেও ওঁরাও সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতি নীতি অনুধাবন করলে একথা অনুমান করা যায় মূলতঃ এ পূজা অবৈদিক আর্যেতর সম্প্রদায়ের বর্ষা উৎসব।

বাঙালীর ধর্মে ও ইতিহাসে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজারও প্রসার এতই বিচিত্র যে তা বিস্তৃত আলোচনার দাবী রাখে। ইন্দ্রপূজার ক্রমবিবর্তন অনুধাবনে এর ঐতিহাসিক রূপটি উপলব্ধি করা যায়। একই কারণে একই পূজা বাঙলার আদিবাসী ও অন্ত্যজ সম্প্রদায় হতে সুরু করে সমাজের উচ্চকোটির হিন্দুসম্প্রদায় পর্যন্ত সকলেই করে চলেছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের উদ্ধৃতিতে ও ঐতিহাসিকের ব্যাখ্যায় ইন্দ্র কখনও বৃষ্টির দেবতা, কখনও বা যুদ্ধের দেবতা।

ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে এই পূজার অনুষ্ঠান। পঞ্জিকায় এই পূজার নাম 'শক্রোত্থান'। পৌরাণিক কাহিনী মতে রাজ্যচ্যুত ইন্দ্র বামন দেবতার প্রসাদে দৈত্যরাজ বলীর হাত থেকে স্বর্গরাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। ঐদিন শক্র অর্থাৎ ইন্দ্রের পুনরুত্থান হয়েছিল—তাই তিনি বিধান দেন যে—যে রাজা এই ইন্দ্রধ্বজ পূজা করবেন—তার ধন, বল বৃদ্ধি পাবে। পৌরাণিক কাহিনীর অর্থ হল এই যে এই পূজা রাজাদের বিজয়ধ্বজ পূজা।

দেবতাদের সাথে অসুরের যুদ্ধমীমাংসা হওয়ার পর নাট্যাকারে সর্বজনসমক্ষে এই অভিনয় উপস্থাপিত করার জন্য ব্রহ্মার উপর ভার দেন। ব্রহ্মা 'দেবাসুর সংগ্রাম' নাটক প্রস্তুত করে ইন্দ্রকে উপহার দেন। ইন্দ্র দেবতাদের দ্বারা এই নাটক অভিনীত হবে না এই বিবেচনা করে মর্তের ভরত ও তাঁর শতাধিক শিষ্যের উপরে অভিনয়ের ভার অর্পণ করেন। ভাদ্র মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে ইন্দ্রের মুকুট উপরে ধারণ করে এই অভিনয় সুরু হয়েছিল। শক্রের সম্মানের পুনরুত্থান প্রসঙ্গেই এই নাটক—তাই 'শক্রোত্থান' নামকরণ (ভরতের নাট্যশাস্ত্র) শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্ররাজের যে উল্লেখ আছে তা হল—'নন্দ কহিলেন, হে তাত! ভগবান ইন্দ্র পর্জন্যরূপী মেঘসকল তাঁহার প্রিয়তম মূর্তি—ইহারা জীবগণের প্রীতিসাধক প্রাণপ্রদ সলিল বর্ষণ করিয়া থাকে। হে বৎস

সেই মেঘ সকলের প্রতি যে জলবর্ষণ করিয়া থাকে সেই জলে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় আমরা তদ্দ্বারা তাহার যজ্ঞ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ ধর্ম, অর্থ ও কামসিদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা জীবন ধারণ করে। পুরুষদের যে কোন বৃত্তি বা ব্যবসায় আছে—বর্ষা ঋতু সেই সমুদয়ের ফলোৎপাদক।' মানুষের বৃহত্তর কল্যাণসাধনে শস্যোৎপাদনের জন্য ইন্দ্ররাজ্যের বৃষ্টিদাতার ভূমিকাই এখানে বিশেষভাবে প্রকাশিত।

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর লোকায়তদর্শন' গ্রন্থে ইন্দ্রকে ক্রমবর্দ্ধমান আধিপত্যের সাথে যুদ্ধজয়ের বাসনার যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। ঋগ্বেদ রচিত হওয়ার যুগ থেকে বৈদিক কবিদের বন্দনায় ইন্দ্রের গৌরব বরুণের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। পশুপালন নির্ভর ট্রাইবের পক্ষে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দিকে যে অগ্রগতি তার একটি প্রধানতম অঙ্গ হল—যুদ্ধের উৎসাহবৃদ্ধি। বৈদিক মানুষের জীবনে যতই লুণ্ঠন ও লোভের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, যত বর্দ্ধিত হয়েছে যুদ্ধের উদ্দীপনা ততোই তাদের দেবলোকেও ঐ যুদ্ধের দেবতা, লুণ্ঠনের দেবতা ইন্দ্রের গৌরব বেড়ে গিয়েছে।

দেবরাজ ইন্দ্র সম্পর্কে ঋগ্বেদের কয়েকটি উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ নীচে দেওয়া হল—

: হে ইন্দ্র তুমি শত্রুক্ষয়কারক অতএব বৃষ্টিপূর্ণ ত্বকরূপে জলের আবরণকে (মেঘকে) ভেদ করিয়া (জল) সেচন কর এবং মর্তের ন্যায় গমনশীল মেঘকে ধরিয়া বৃষ্টিশূন্য করিয়া ছাড়িয়া দাও যেমন কোন বীর গমনকারী শত্রুকে নিগৃহীত করে। ১. ১২৯. ৩॥

: হে ঋত্বিকগণ—আমাদিগের যজ্ঞে ইন্দ্রকে কামনা করি। ইন্দ্র আমাদের সখা, সর্বগামী ও শত্রুদের অভিভবকারী এবং তিনি আমাদিগকে অন্নসমূহদ্বারা যুক্ত করেন। তিনি আমাদিগের সহায়ভূত হইয়া শত্রু বিনাশ করেন। ১. ১২৯. ৪॥

: হে ইন্দ্র : ওষধিসমূহ ও জল তোমারই নির্মিত ৩. ৫৫. ২২

উক্ত শ্লোকগুলিতে ইন্দ্রের শত্রুবিজয়ী ও বৃষ্টিদাতা উভয়রূপেই পরিচয় আছে। লুণ্ঠন, যুদ্ধজয় ও শস্যোৎপাদনের কামনার স্ফুরণ প্রাগৈতিহাসিক যুগে অনার্য মানসেই সম্ভব কারণ এই আর্যেতর সম্প্রদায়ই প্রকৃতপক্ষে শিকারী, পরবর্তীকালে যুদ্ধজীবী ও কৃষিকর্মের উদগাতা। উত্তরকালে এই কামনা আর্যমানসিকতায় সংক্রামিত হয়েছে বলেই ধারণা।

'পূজাপার্বণ' গ্রন্থে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এই পূজা সম্পর্কে লিখেছেন—'জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লানবমীতে মহাবিষুব হইয়াছিল। ইহার ৩ মাস ৩ তিথি পরে অর্থাৎ ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে রবির দক্ষিনায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল। সে তিথির নাম—বামনদ্বাদশী। সেদিন ভারতের কোন কোন রাজ্যে ইন্দ্রধ্বজ রোপন নামক বৃহৎ উৎসব হয়। ধ্বজের শীর্ষে এক দীর্ঘ পতাকা থাকে। কোনদিন রবির দক্ষিনায়ণ আরম্ভ হইবে তাহা ধ্বজের ছায়া দ্বারা ও বায়ুপ্রবাহ দিক পতাকা দ্বারা নির্ণীত হইত। বহু পূর্বে চেদী দেশের রাজা উপরিচর বসু এই পূজার প্রবর্তন করেছেন এবং পরবর্তীকালে বিভিন্নদেশের রাজা প্রজাদের সাথে মিলিত হয়ে এই পূজা করেছেন। যদি এই পূজা বিজয়োৎসব হয় তাহলে প্রজাবর্গ রাজার আনন্দের স্বার্থে এই উৎসবে মিলিত হতেন আর যদি এই পূজা শস্যকামনায় বৃষ্টির আবাহন হয় তাহলে প্রজাদের স্বার্থে রাজা এসে মিলিত হতেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর 'বেদের দেবতা ও বৃষ্টিকাল' গ্রন্থে লিখেছেন—সূর্যের যে শক্তি দক্ষিনায়ণ আরম্ভদিনে বৃষ্টিদাতারূপে প্রকাশিত হন—তিনিই ইন্দ্র। সেদিন প্রত্যক্ষ সূর্যের নাম বিবস্বান। ইহার পরদিন ইন্দ্রযজ্ঞ হইত।...ইন্দ্র বৃত্রকে পূর্ণিমায় নিহত করিয়াছিলেন। বৃত্র কে? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে সে-বৃত্র বৃষ্টি রোধকারী, দীর্ঘদেহ, হস্তপদহীন দিব্যালোকে অবস্থিত দৃশ্যমান উজ্জ্বল কোন এক পদার্থ। কেহ মনে করিয়াছেন বৃত্র অন্ধকার। সূর্যরূপে সে অন্ধকার ভেদ করিয়াছেন—মরুদগণ তাহার সহায় হইয়া ভূতলে জলধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন।'

একাদশ শতকের পূর্বেও যে এই পূজার প্রচলন ছিল তার প্রমাণ লক্ষণসেনের সভাকবি শ্রীগোবর্দ্ধন আচার্যের গ্রন্থে ও জীমূতবাহনের 'কালবিবেক' গ্রন্থে পাওয়া যায়। গোবর্দ্ধন আচার্য লিখেছেন: হে শক্রধ্বজ। যে শ্রেষ্ঠীরা (একদিন) তোমাকে উন্নত করিয়া গিয়াছিলেন সম্প্রতি সেই শ্রেষ্ঠীরা কোথায়? ইদানীং কালে লোকেরা তোমাকে (লাঙ্গলের) ঈষ অথবা মেঢ়ি (গরু বাঁধিবার গোঁজ) করিতে চাহিতেছে।' এই উদ্ধৃতি হইতে প্রমাণিত হয় যে ইতিপূর্বে এই পূজা ধনী বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে ব্যবসাবাণিজ্যের অবনতিতে এই পুজার মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে। বণিক সম্প্রদায়ের লক্ষ্য সম্পদ বৃদ্ধি—দেশের সীমানা বৃদ্ধি নয়। বাঙালীর ইতিহাস তখন কৃষিনির্ভর বা পশুপালননির্ভর সভ্যতা অতিক্রম করে বাণিজ্যনির্ভরতায় আশ্রয়ী হয়েছে। এমতাবস্থায় এযুগের শ্রীবৃদ্ধির মূল্যে শস্যকামনা ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

একথা হয়তো ঠিক বাঙালীসভ্যতা আর্যীকরণের সঙ্গে সঙ্গে রাজাদের যুদ্ধজয় ও বিজয়োৎসবের প্রতীক হিসাবে এই পূজার প্রচলন কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাৎ দেশ যখন রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের যুগ অতিক্রম করে জমিদারতন্ত্রে এসে পৌচেছে তখন এ পূজার উদ্দেশ্য বদলে গিয়েছে। জমিদারেরা প্রজাদের স্বার্থে বৃষ্টির জন্য করেছেন। এ সম্পর্কে সুসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় 'গ্রামের কথায়' লিখেছেন—'পার্শ্ব একাদশীর পরের দিন ইন্দ্রদ্বাদশী। এইদিন বাঙলার প্রতিটি মৌজায় জমিদারী উচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত ইন্দ্রপূজা হত। হত বৃষ্টির জন্য।'

ধাঙড়দের এই ইন্দ্রপূজা শুক্লাদ্বাদশীর স্থলে শুক্লাত্রয়োদশীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাক, ঢোল, মাদল বাজাতে বাজাতে 'কার্মা' অর্থাৎ চাকলতার ডাল. ভেলা আর কুশ নিয়ে আসে বন হতে—গ্রামের সমস্ত মেয়ে পুরুষ একত্রে জোটবদ্ধ হয়ে যায়—ফিরে এসে সেই 'কার্মা' ইদতলায় প্রতিষ্ঠা করে। তারপর মুরগী বলিদান হয়। সারারাত্রি ও পরদিন দুপুর পর্যন্ত এই 'কার্মাকে কেন্দ্র করে চলে মেয়েপুরুষের যৌথ নৃত্যগীত। পরে নতুন সাজ। চক্ষে নেশার উন্মাদনা! শস্যকামনায় দেহমন উন্মুখ। জলধারা প্রবাহের আশায় উৎসব আবেগমুখর।

আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর দিন হতেই এই পূজা উপলক্ষে নাচগান সুরু হয়। লক্ষণীয় এই যে—এই অম্বুবাচীর দিন ধরিত্রী রজঃস্বলা হয়। প্রকৃতির সন্তানকামনা আদিবাসীর শস্যকামনায় পর্যবসিত হয়। পূজার উপকরণ আতপচাল আর সিঁদুর।

মহুয়া মাতাল মন ভুলে যায় সংসারের অভাব অনটনের কথা। মেয়েরা পরস্পরের পিঠে হাত রেখে অর্দ্ধবৃত্তাকারে একসাথে নাচে। একবার উর্দ্ধাঙ্গ সামনের দিকে ঝোঁকে আর একবার পিছিয়ে আসে। সঙ্গে চলে নিখুঁত পদকর্ম। পুরুষদের দল মাদল বাজায়। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে

নৃত্যশিল্পীর দেহভঙ্গী অপূর্ব এক ছন্দোময়-পরিবেশের সৃষ্টি করে। প্রবীণা মেয়ের কণ্ঠে সুর ও তান এসে যোগ দেয় তার সাথে : সাতো ভাই রাহালে

আর সাতো গতনি (১) রাহালে
তো সাতদিন সাতরাতে
ঝুমার (২) খেলে
ঝুমার খেলতে খেলতে
আণিজ্যার বাণিজ্যার শিকার খেলতে গেলে।
শ্যামসুন্দর বিন্দাবন মে
হরির মারে হে
ঘোরাহর মারে হে
বরাহর মারে হে
মারতে মারতে
আলামারা (৩) ভে গেলে
তখন কেঁদপাকা, পিয়ালপাকা, বৈচীপাকা
খাই লেলে হে।
পানিপিয়াস সে আর রহেল না পরে—
তো পানি নাহি মিলেল হে
তো চলি গেলে হে
সাত সমুদ্দুর মে
সাতদিন সাত রাত
চাল্‌তে চাল্‌তে এক নদী ভেলে।
নদীসে কুঁয়া কাড়ে হে
কুঁয়া কাড়ে তো
পানি মিললে রকত্‌।
তো ফিন ঘুরকে আও হে
আও হে স্মরণশক্তি করে হে
নাচন কুঁদন করে হে
তো দিন চালি গেলে হে
চাল্‌তে চাল্‌তে চালি গেলে হে
সাতদিন সাতরাত
সমুদ্দুর পানি ভেলল আচ্ছা
তো পেটভর খাই লেলে হে।

গানটিতে প্রথমে বিশুষ্ক নদীনালার জলের অভাব ও তৃষ্ণার্তের কষ্ট ও পরে সমুদ্রের জলপানে

তৃষ্ণা নিবারণের চিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। গানের ভাষার ক্ষেত্রে বাঙলা, আদিবাসী ও ভোজপুরী ভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই মিশ্র সংস্কৃতিই বাঙালীর ইতিহাস, বাঙলার লোকসংগীতের ইতিহাস। এই ওঁরাও সম্প্রদায় মূলতঃ ছোটনাগপুরের অধিবাসী। বাঙলার পশ্চিমের পার্বত্যঅঞ্চলের লোকসংস্কৃতির এই বিশিষ্ট দিক বাঙলার সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বাঙলার লোকসংস্কৃতিতে স্বাঙ্গীকৃত হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সাংস্কৃতিক উপকরণ আদান-প্রদান সংমিশ্রণ গ্রহণ ও বর্জনের ফলে বাঙলার লোকসংগীতের এই পরিপুষ্টি ও প্রসার। প্রতিবেশী অনার্য সংস্কৃতির এই উপাদান গ্রহণে দ্বিধাহীন মনোভাবই বাঙলার লোকসংগীতের ক্ষেত্রে বীরভূম জেলা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকারে সাহায্য করেছে।

গানে বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দরের উল্লেখ আছে। এই ওঁরাও সম্প্রদায়ের কীর্তন বাঙলা লোকসংগীতে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। খণ্ড খণ্ড জাতি বা উপজাতির যে গোষ্ঠীবদ্ধ বা কোমবদ্ধ চেতনা বা এদের সংমিশ্রণে যে আঞ্চলিক চেতনা তার প্রভাব সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষত লোকসংগীতে পড়বেই। কিন্তু সমগ্র বাঙলার লোকসংগীতে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা ও রামায়ণের প্রভাবে অদৃশ্যভাবে এক অখণ্ড ভাবগত ঐক্যের সৃষ্টি করেছে।

উৎসবে মুরগী বলিদানও এদের 'টোটেম' বিশ্বাসেরই অবদান। বিশেষ 'টোটেম' বিশ্বাস ও 'টাবু' নিয়ে খণ্ড খণ্ড ট্রাইবের সৃষ্টি হয়েছিল। মুরগীকে উৎসবের অবিভাজ্য করার ক্ষেত্রে কামনার রূপও কার্যকরী হয়েছে। মুরগী উর্বরা শক্তির প্রতীক। বাঙলার মেয়েরা সন্তান কামনায় 'কুক্কুটী ব্রত' পালন করে। মুরগী অনেক ডিম প্রসব করে। তাই সন্তানের কামনা ও অধিক শস্যের কামনায় অনার্য সম্প্রদায় বিশেষ করে ওঁরাও, সাঁওতাল ইত্যাদি সম্প্রদায়-এর পূজার ক্ষেত্রে মুরগী একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ।

এই ইন্দ্রপূজা সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র রায়ের একটি উদ্ধৃতি আলোচনা করা যাক; তিনি লিখিয়াছেন: আর্যরা দাসজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতেন—যুদ্ধের পূর্বে ইন্দ্রের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেন।' দেখা যাচ্ছে ইন্দ্রের অনুগ্রহে আর্যেরা বিজয়ী ও দাসজাতি বিজিত। তাহলে প্রশ্ন উঠে যে ইন্দ্রের কৃপাবলে আর্যেরা দাসজাতিকে পরাজয়ের অসম্মান এনে দিয়েছে সেই ইন্দ্রকে কিভাবে দাসজাতি উপাস্যদেবতা হিসাবে মেনে নেবে এবং তাদের সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসবের স্বীকৃতি দেবে? মনে করা যেতে পারে যে রাজার ইচ্ছায় বা পরবর্তীকালে জমিদারের ইচ্ছায় প্রজাকে এই উৎসবে মিলিত হতে হয়েছে কিন্তু পরাজয়ের অসম্মান নিয়ে উৎসবের সাথে অন্তরের যোগসাধন করা যায় না।

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিম বাঙলার সংস্কৃতি গ্রন্থে লিখেছিলেন: ইন্দ্রধ্বজ উৎসব মূলত আদিমজাতির বিজয়োৎসব। কৌমপতি বা গোষ্ঠীপতি (পরবর্তীকালে রাজা) যে অধিকার পেতেন তার প্রতীক ঐ ছত্র।...তারই সঙ্গে আদি অকৃত্রিম বৃক্ষপূজা ও ফলন শক্তি বৃদ্ধির কামনা উৎসবও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে।...এই আদিম কৌম উৎসবটা পরবর্তীকালে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে দেবরাজ ইন্দ্রের ধ্বজোৎসবে পরিণত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে ধনবল ও সুখসমৃদ্ধির কামনা উৎসব ও বিজয়োৎসবে রূপ নিয়েছে।

বন হতে বৃক্ষশাখা নিয়ে এসে দেবতার অধিষ্ঠান এই বৃক্ষপূজারীতি অনার্যেই সম্ভব। সাঁওতাল, মুন্দা' ওঁরাও, খাসিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি আদিবাসী কোমবদ্ধ অধিবাসীদের কোন ধর্মানুষ্ঠানই ধ্বজা বা ধ্বজা পূজা ছাড়া সম্ভব হত না।

পূজার স্থান গ্রামের প্রান্তে যেখানে অন্ত্যজ শ্রেণীর বাস। কাল বর্ষা। পূজার ও নৃত্যগীতে মুখ্য অংশগ্রহণকারী হচ্ছে আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণী। ক্ষেতের ফসলের সাথে যাদের যোগ নিগূঢ়। এগুলি বিচার করলে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় অধিক শস্য কামনায়, ফলনশক্তি বৃদ্ধির জন্য কৌমসভ্যতায় আর্য্যেতর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা 'করম'ই বৃষ্টিদাতারূপী দেবরাজ ইন্দ্র। তাই সঙ্গীতের মাঝে প্রার্থনা জানায়—

হারে রাজী কীডা হারে দেশ কীড়া
কাটাই মন্নান ধ্বজা চাই
হে আগাহে—চায়হো
কিয়া জরু মাইয়া পাখাহে চ্যায়

হে গাছ পতাকা বেঁধে তোমারই পূজা করছি। অকাল দুর্ভিক্ষ দূর করে দাও। হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশানটি নীচে না বেঁধে বৃক্ষের উপর যথাস্থানেই বাঁধা হয়েছে।

ওঁরাও সম্প্রদায় সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য :

[এই সম্প্রদায়ের নামের পদবী মুচী বা সর্দার। প্রকৃত পদবী 'ওড়াং'। ছোটনাগপুর, রাঁচি, চুটিয়া ও নাগপুর ইত্যাদি এলেকায় এদের সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীরা বাস করে। ১৫।১৬ বৎসর অন্তর এদের একটি বিরাট উৎসব হয় নাম 'নাথহজরনা'। ফাল্গুন মাসে হয়। পুরোহিত পাতায় তেল মাখিয়ে পূজা সুরু করে। কেঁচো মাটিতে তুলে ফেললে হবে না। মহিষ বলিদান হয়। মোড়লের বিচার মানে। স্যাঙাৎ প্রথা চালু আছে। কন্যাপক্ষ বিবাহে পণ দেয়। পাত্রপক্ষের মোড়লের সাথে মদের দোকানে বিবাহের কথা জানাজানি হয়। কন্যাপক্ষ নেয় সাড়ে বাইশ টাকা। এছাড়া মা, দাই ও কনেকে কাপড় লাগে। বিবাহিতা মেয়েরা সিঁদুর দেয়। শাঁখা পড়ে না তবে লোহার নোয়া পড়ে। মৃতদেহ দাহ করলে একমাস পালন করতে হয়। 'বিনুদোষী' হওয়ার জন্য বাইশটি গ্রামের লোককে খাওয়াতে হয়। মাটিতে পুঁতে সৎকার করলে তিনদিন পালন করতে হয়। পুরোহিত ও মন্ত্র প্রথার প্রচলন আছে। এদের আদি বংশধর—তাদের কানে ফুটো তাতে তালপাতার গুটি। কাপড় পরার ধরণ পৃথক। সারা দেহে উল্কি পড়ে। পিঠে ছেলে বাঁধে। নীচে পানছি উপরে পানালার পরে।]

১। বোন ২। ঝুমুর ৩। ক্লান্ত

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

শিখর রীতি

পূর্ববর্তী সংখ্যায় যে মন্দিরগুলি লইয়া আলোচনা করিয়া আসিয়াছি তাহার সবগুলিই পাল সেন যুগে নির্মিত। পাল সেন যুগের যে মন্দিরগুলি আজও দাঁড়াইয়া আছে সেগুলি তো সংখ্যায় সামান্যই, কিন্তু ধ্বংস হইয়াছে অনেক বেশী। লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করিলে বখত-ইয়ার খিলজীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের সূচনা হইল। মুসলমানগণ আসিয়াছিলেন বিদেশ হইতে এবং প্রতিষ্ঠিত হইলেন বিজয়ীরূপে। বিজিত জাতিকে লাঞ্ছিত করিবার অন্যতম পন্থা হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল মন্দির ও ধর্মীয় সংস্থানগুলি ধ্বংস করিয়া তাহারই উপাদানে মসজিদ আস্তানা প্রভৃতি নির্মাণ করা। ভাগীরথীর তীরভূমি ব্যাপিয়া এই ধ্বংসলীলার চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে পাণ্ডুয়া (মালদহ জেলা), গৌড় (মালদহ) কালনা (বর্দ্ধমান), পাণ্ডুয়া, ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম (হুগলী) এবং পূর্বদিকে খানিকটা ভিতরে চব্বিশ পরগণা জেলায় বসিরহাটে। পশ্চিম দিনাজপুর জিলার বাণগড়ের নিকটস্থ শিববাটীর ধ্বংসাবশেষ ও পুর্বপাকিস্থানের পাবনা জেলার চাটমোহর গ্রামের মসজিদটি ঐ একই ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। উল্লিখিত স্থান সমূহে প্রতিটি ক্ষেত্রে মন্দির ধ্বংস করিয়া আনীত প্রস্তরখণ্ডের ব্যবহার পর্যাপ্ত পরিমাণেই ঘটিয়াছে। মূর্তি ভিন্ন অন্য সজ্জা যাহাকিছু তাহার উপর কিন্তু আঘাত করা হয় নাই। সেগুলিকে অক্ষত রাখা হইয়াছে—হয়ত সৌধের শোভা বর্দ্ধনের জন্য। বিজেতাদের সৌধ নির্মাণের উপকরণ ছিল ইট ; ইটের মসজিদ সম্পূর্ণ ইটেই হইতে পারিত, প্রস্তরখণ্ড ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না—বিজিতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের উপায় হিসাবেই যে ইহা করা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

মুসলমান অধিকারের প্রথমদিকে মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের যে অংশগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল, আগেই বলিয়া আসিয়াছি, তাহার সবই পাথরের। ভগ্ন মূর্তিগুলির রচনাশৈলী যতটুকু বুঝিতে পারা যায় ও অলঙ্করণের প্রকৃতি ও তাহার বিন্যাস দেখিয়া মনে হয় ইহাদের অধিকাংশই পাল সেন যুগে নির্মিত মন্দিরের অংশ। দেউলিয়া, সোনাতপাল, জটারদেউল, বহুলাড়া ও ডিহরে যখন ইট ও মাকরা পাথরে শিখর মন্দির নির্মিত হইয়াছে তাহারই সমকালে রাজমহল হইতে ভাসাইয়া আনা পাথরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করিয়া ভাগীরথীর উভয় তীরে প্রস্তর নির্মিত মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টা একই সঙ্গে চলিয়াছে। প্রস্তরে নির্মিত এই মন্দিরগুলি যে কোন রীতির ছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই তবে পাল সেন যুগের বর্তমান শিখর মন্দিরগুলি নির্মাণ নৈপুণ্য ও ভাবকল্পনার যে ঐশ্বর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার ইতিবৃত্ত শুধুমাত্র এই কয়টি মন্দির দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবার কথা নয়। বিদেশী বিজয়ীদের ধর্মোন্মত্ততার সাক্ষ্য বহন করিয়া যে মন্দিরাংশ মসজিদ, আস্তানার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহারা বিস্মৃত কোন শিখর মন্দিরেরই অংশ হইয়া থাকিবে।

মসজিদ আস্তানায় যাহাদের ভগ্নাংশ রহিয়া গিয়াছে সেগুলি পাথরে নির্মিত হইয়াছিল। ভাগীরথীর উভয় কূলে ও বাংলাদেশের অন্যত্র মন্দির নির্মাণ পাথরের সহিত ইটের ব্যবহারও হইয়াছিল স্বভাবতঃই একথা অনুমান করিতে ইচ্ছা করে। ইটের ব্যবহার হয়ত ভাসাইয়া আনা পাথরের তুলনায় অধিক পরিমাণেই হইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের সামান্য ভগ্নাংশও আজ আর খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। পাথরের মন্দিরাংশ ইটের মসজিদে ব্যবহৃত হইলে সহজেই তাহাকে চিনিয়া লওয়া যায়—কিন্তু ইটের মন্দিরে সে প্রশ্ন উঠিবে না, তাহাদের পরিচয় অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে সুদীর্ঘকাল—ঠিক কতদিন নির্দেশ করা সম্ভব নয়—বাংলার মন্দিরশিল্পের ইতিহাসে ভাঙ্গা ও গড়া যুগপৎ চলিয়াছে। মুসলমান বিজয়ীরা মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ করিয়াছেন কিন্তু সেই সমস্ত মসজিদ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও স্বদেশ হইতে শিল্পধারার যে স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহার প্রয়োগও করিয়াছিলেন বহুল ভাবেই। সমগ্র বিজয় ক্ষেত্র জুড়িয়া মুসলমান বিজয়ীদের গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি ও রূপসজ্জার পরিকল্পনা বিজিত জাতির স্থাপত্য শিল্পের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। প্রভাব যে ঠিক কোন পথ বাহিয়া মন্দিরের দেহে স্থায়ী আসন অর্জন করিয়া লইল, তাহার বিভিন্ন স্তর বাংলার মন্দিরের ইতিবৃত্তের আরও অনেক তথ্যের মতই অজ্ঞাত। পঞ্চদশ ষোড়শ শতকীয় বাংলার ইটের মন্দিরে ভারতীয় ও পশ্চিমাগত মুসলিম স্থাপত্যকলা ও অলঙ্করণের সহঅবস্থান ও মিশ্রণ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। মিলন মিশ্রণ যেমন ঘটিল মন্দিরের দেহে তেমনি তাহার অঙ্গসজ্জার অলঙ্করণ বিন্যাসে। সাঙ্গীকরণের এই পথে মন্দির দেহে আসিয়াছে গম্বুজ ও অর্দ্ধবৃত্তাকার খিলান। অর্দ্ধবৃত্তাকার খিলানকে অবলম্বন করিয়া দ্বারপথের উপরে ভঙ্গীকাটা খিলানও মুসলমান বিজেতাদের অবদান। অলঙ্করণে তো আরব ও পারস্যের কিছু ডিজাইন সজ্জাবিন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

ত্রয়োদশ হইতে একেবারে পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে আসিয়াছি। মধ্যবর্তী কালের মন্দির নির্মাণের কোন সুস্পষ্ট পরিচয় দিতে পারিব না বলিয়াই। এই সময়ের মধ্যে বাংলার মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টা কোন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল তাহার আভাসটুকু পাইবার জন্যও অনুমানের আশ্রয় নিতে হইবে। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত শিখর রীতি ও চালা রীতির মন্দিরে ভাব কল্পনার একটা সুস্পষ্ট পরিণতি চোখে পড়ে; পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগ যে তাহারা ছাড়াইয়া আসিয়াছে ইহা নিশ্চিত। ভাব কল্পনার পরিণতি চালা মন্দিরের ক্ষেত্রে নবতর পরিকল্পনার বিকাশ ও বিবর্তনের সূত্রে গ্রথিত কিন্তু শিখর মন্দিরের ক্ষেত্রে অবস্থাটা ভিন্নরূপ। শিখর মন্দির নির্মাণে উপকরণ হিসাবে ইটের ব্যবহার দীর্ঘকাল ধরিয়াই চলিয়াছে—উপকরণের বৈশিষ্ট্যে সমস্যার রূপ হইয়াছে ভিন্ন, নির্মাণ কৌশলও পরিবর্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্তন সৃজন ক্ষমতার সহিত মিলিয়া রূপ কল্পনার যে বৈশিষ্ট্যে ধরা দিল সৌন্দর্য্য কল্পনা বিরহিত শুধুমাত্র অনুকরণ সর্বস্ব নির্মাণ প্রচেষ্টায় তাহাই হইয়া উঠিল নিষ্প্রাণ ও গতিহীন। শিখর মন্দির সম্পর্কে এ কথাগুলির ব্যাখ্যা একটু পরেই করিতেছি, বর্তমান আলোচনায় এইটুকুই বোধহয় যথেষ্ট হইবে। চালা মন্দিরের উন্মেষ, ভাব কল্পনার বিবর্তন ও শিখর মন্দিরের

কল্পনাবিহীন নিষ্প্রাণ রূপ উভয় ক্ষেত্রেই ষোড়শ শতাব্দীতে যে রূপের বিকাশ ঘটিয়াছে তাহার পশ্চাদপটের প্রস্তুতির ইতিহাস আজ অজ্ঞাত থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা চলে না। চালা মন্দির এই তিন শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ের সৃষ্টিশীল কল্পনার ফলশ্রুতি কিন্তু শিখর মন্দিরের ক্ষেত্রে ষোড়শ শতাব্দীর রূপ ধারাবাহিক কর্ষণের ফল মাত্র। তাহাকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টিশীল কল্পনা একেবারেই আগাইতে পারে নাই। তবুও স্রোতহীন জলধারার মত হইলেও শিখর রীতি বাংলার মন্দির শিল্পের জীবনের শেষ দিন অবধি রহিয়া আসিয়াছে—একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। ইটের শিখর মন্দিরে অনুকৃতি যে বদ্ধতার মধ্যে আটকাইয়া গিয়াছে পাথর বা মাকরা পাথরে নির্মিত মন্দিরের ক্ষেত্রে ধারাটি কিন্তু এমন প্রাণহীন অনুকৃতির মধ্যে একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায় নাই, কিছুটা প্রাণস্পন্দন যেন মন্দিরদেহে একটা সজীবতা ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

পাথর বা মাকরা পাথরে শিখর মন্দির এ যুগে প্রধানত নির্মিত হইয়াছে বাংলা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে, বর্তমান মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায়। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত ওড়িশার ঘনিষ্ঠ যোগ যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সেকথা তো সুবিদিত। ওই পথেই ওড়িশার রেখ মন্দিরের প্রভাব বাংলার শিখর মন্দিরে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সৃষ্টিশীল কল্পনার শক্তি সে প্রভাবকে সাঙ্গীকৃত করিয়া নিয়া নিজের ঐশ্বর্যকেই দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারই প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে সোনাতপাল, জটার দেউল, বহুলাড়া ও ডিহরের মন্দিরসমূহে। কিন্তু সৃষ্টিশীল কল্পনার স্রোত যেদিন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে সেদিন মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে বহিরাগত প্রভাবকেই প্রধান অবলম্বন করিয়া নিতে হইল। তাহার পর হয়ত তাহাকে অবলম্বন করিয়া কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটাইবার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার সূত্র ধরিয়া ইটের মাধ্যমে শিখর মন্দির নির্মাণে বাংলার স্থপতিগণ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা হয়ত পাথরের মন্দিরকে প্রভাবিত করিয়াছে কখনও বা দেহগঠনে কখনও বা অলঙ্করণে।

পূর্ববর্তী পর্যায়ের আলোচনায় প্রতিটি মন্দিরকে তাহার সবকিছু স্বাতন্ত্র্যের সহিত তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু বর্তমান পর্যায়ের আলোচনায় প্রতিটি মন্দিরকে লইয়া পৃথকভাবে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া ভাব কল্পনার ধারাটি ধরিয়া দেওয়াই হইবে উদ্দেশ্য। মন্দিরের সংখ্যাও এ যুগে অনেক বেশী তাই ভাবকল্পনার গতি পথটি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নয়।

বরাকরের একটি মন্দিরের কথা আগের সংখ্যায় বলিয়াছি। এই মন্দিরটির অতি নিকটে আরও তিনটি মন্দির রহিয়াছে। ইহাদের একটির দ্বারপথের পার্শ্বে তাহার নির্মাণকাল জ্ঞাপন করিয়া রহিয়াছে একটি সুদীর্ঘ শিলালেখ। রাজা হরিশ্চন্দ্রের ভার্যা হরিপ্রিয়া তাঁহার উপাস্য দেবতা শিবের সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত ১৩৮২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটি দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মন্দিরটির নির্মাণকালের পরিচয় এই যুগের বাংলার শিখর মন্দির নির্মাণের ইতিহাসে একটি সুস্পষ্ট দিক দর্শন। ভাবকল্পনায় ও রূপরেখা রচনায় যে বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরটিতে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই কিছুটা পরিবর্তিত ভাবে বরাকরের অপর দুইটি মন্দিরে ও অজয় নদের তীরবর্তী বর্দ্ধমান জেলার গৌরাঙ্গপুর গ্রামের ইছাই ঘোষের দেউলে বিদ্যমান। মুসলমান অধিকারের পূর্ববর্তী সময়ের শিখর মন্দিরের সুন্দরতম নিদর্শনগুলির সহিত আত্মিক যোগ

ইহাদের পরিচয়কে সুদূর অতীত বিস্তৃত-করিয়া দিয়াছে। ইটকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করিতে গিয়া সমস্যা সমাধানের যে ঐতিহ্য বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল পাথরের মন্দির নির্মাণ করিতে গিয়া শিল্পী তাহার প্রভাব এড়াইয়া যাইতে পারিলেন না—স্বীকার করিয়া নিতে হইল।

বিগত দিনের ভাবকল্পনা ও সৌন্দর্যভাবনার স্মৃতি লইয়াই গঠিত মন্দিরটির দেহে উত্তরকালের ইটে নির্মিত শিখর মন্দিরের কতগুলি বৈশিষ্ট্যের পূর্বভাগও ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাই বাংলার শিখর মন্দির নির্মাণের ইতিহাসে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত মন্দিরটির প্রকৃত স্থানটি বুঝিয়া নিবার জন্য ইহাকে নিয়া একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। মন্দিরটির আসন সপ্তরথ। রথকগুলি কিন্তু গভীর নয়, প্রতিটি রথক উদ্গমন তাহার নিম্নবর্তী অংশ অপেক্ষা সামান্যই আগাইয়া আছে। রথকাসনের এই বিন্যাস অবলম্বন করিয়া মন্দির দেহ যখন উঠিয়া গেল তখন তাহার সর্বাঙ্গে ভার জমিবার এতটুকু অবকাশও আর কোথাও রহিল না। ভিত্তি ভূমির উপর হইতে মন্দিরটি সোজা উঠিয়া আসিয়াছে। আসন সপ্তরথ হইলেও বাড়টি কিন্তু তিন অঙ্গে রচিত। বৈচিত্র্যান্বিত বেশ কয়েকপ্রস্থ উদ্গত রেখা সাজাইয়া পাভাগ—বাড বাহিয়া অনেকটাই উঠিয়া আসিয়াছে। অখণ্ডিত জাঙ্ঘের উপর কেন্দ্রীয় রথকটি এক প্রমাণাকৃতি শিখরমন্দিরের অনুকৃতিতে অলঙ্কৃত। তাহার বাড় অংশে একটি ক্ষুদ্র কুলুঙ্গি, বোধ করি মূর্তি বসাইবার জন্য। ইহার উভয় পার্শ্বস্থিত রথকগুলির উপর কতকগুলি অলঙ্কৃত দণ্ড কাটিয়া তোলা হইয়াছে—ইহাতেই তাহাদের সজ্জা। বাড়ের অন্ত নির্দেশ করিয়া রহিয়াছে বরণ্ড; উপরে ও নীচে একপ্রস্থ করিয়া স্থূল উদ্গতরেখা, মধ্যবর্তী নিম্নায়ত অংশে চারিদিক ঘুরিয়া একসারি মূর্তি।

বক্ররেখায় বিধৃত শিখরটির বহিরেখার গতিভঙ্গে সৌন্দর্য কল্পনার কোন সচেতন প্রয়াস নাই, কিন্তু স্বচ্ছন্দ গতিবেগের প্রকাশ তাহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। গণ্ডীটি কেন্দ্রের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়া বেশ কিছুটা উঠিয়া যাইবার পর হঠাৎ অনেকটা বাঁকিয়া গিয়া বেকীর পাদমূলে শেষ হইয়া গিয়াছে।

মুসলমান আক্রমণের পূর্বে নির্মিত শিখর মন্দিরে গণ্ডীর অলঙ্করণ বিন্যাসে পগ প্রবাহের লম্বমান রেখাই ছিল অবলম্বন, আনুভূমিক বিভাগের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় নাই। বর্তমান মন্দিরটিতে অবস্থাটা ঘটিয়াছে বিপরীত। লম্বমান পগরেখা সমূহের পারস্পরিক উচ্চতা আসনের সীমায় বিধিবদ্ধ। রাহাপগের উপরেই অলঙ্করণের যাহা কিছু বৈচিত্র। সম্মুখেরটি ছাড়া অন্য তিনদিকে রাহার প্রায় সবটুকু জুড়িয়া একটি অপ্রশস্ত প্রলম্ব রেখ দেউলের অনুকৃতি। তাহার নীচের দিকে দুইটি কুলুঙ্গি, আর গণ্ডীর উপরে সামান্য উদ্গত রেখার বন্ধনে আবদ্ধ রেখ মন্দিরের আর একটি ক্ষুদ্রায়ত অনুকৃতির মধ্যে একটি কীর্তিমুখ। রাহার উপরে উৎকীর্ণ বৃহত্তর মন্দিরাকৃতিটির গণ্ডীর প্রায় শেষ দিকে একটি ঝম্প সিংহ। সম্মুখের দিকে রাহার উপরে উপর্যুপরি তিনটি ক্রমহ্রস্বায়মান কুলুঙ্গি তাহার উপরে ঝম্প সিংহটির অবস্থান। অনতিউচ্চ পগরেখা সমূহের কেন্দ্রস্থিত রাহাপগটি ছাড়া অন্য সবগুলির সমগ্র প্রসার ও দৈর্ঘ্য জুড়িয়া দেউলিয়া মন্দিরের মত টানা ছড় নামিয়া আসিয়াছে। চড়গুলি উচ্চবচ গণ্ডীর দেহে সুস্পষ্টভাবে বসান ও সমান্তরালভাবে অবস্থিত। ইহাদের সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সমগ্র গণ্ডীটিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

রাহাপগের উপরে লম্বমান ধারায় রচিত অলঙ্করণ পর্যন্ত ইহাদের প্রভাবে একেবারে আবিষ্ট।

গণ্ডী তাহার গতিপথে বেশ খানিকটা আসিবার পর একসময়ে ভিতরের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া যাইবার ফলে যেখানে পাটা ফেলিয়া গণ্ডীর ছাদ রচনা করা হইয়াছে সেখানে বর্গক্ষেত্রটি গণ্ডীর প্রারম্ভে ক্ষেত্রের বর্গ অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষুদ্রাকায় গণ্ডীর উপরে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি আমলক শিলা ধারণ করিয়া বেকী। আমলকটি যেমন ক্ষুদ্র তেমনি লঘুপ্রকৃতির। দীর্ঘছন্দে বাঁধা লঘু মন্দিরদেহের সহিত মিলিয়া গিয়াছে এইমাত্র। গুরুভার মন্দিরকে চাপ দিয়া রাখিবার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, এখন তাহার ব্যবহার শুধু নিয়মরক্ষা করিবার জন্য। বাহুলাড়া, জটার দেউল ও সোনাতপালের ইটের মন্দিরে আমলক ছিল ইহা অনুমান, থাকিয়া থাকিলে তাহাও নিয়মরক্ষার প্রয়োজনেই যুক্ত হইয়াছিল প্রকৃত কোন প্রয়োজন তাহার ছিল না। কিন্তু পাথরের মন্দিরে আমলক তাহার প্রকৃত রূপ ও গৌরব লইয়া অধিষ্ঠিত হইতে পারিত। আমলকের উপর কলস, চারিটি লম্বমান বেষ্টনী তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

দেহ গঠনে সমস্ত ভার ঝাড়িয়া ফেলিয়া সৃজনশীল প্রাণশক্তির রূপময় প্রকাশ বাংলার শিল্পীদের নিজস্ব কল্পনার ফল, সাধনার লক্ষ্য। এই রূপ কল্পনা কাল প্রবাহের সহিত বহিয়া আসিয়া বৈদেশিক বিজয়ের আঘাত ও তাহার আগ্রাসী ধ্বংসলীলার হাত হইতে কিভাবে আত্মরক্ষা করিল সে ইতিবৃত্ত অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। কিন্তু ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত বরাকরের এই মন্দিরটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমস্ত বাঁধা সত্ত্বেও শিখর মন্দির নির্মাণের নিরবচ্ছিন্ন চর্চার কথা অস্বীকার করা যায় না।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলা দেশে ইটে নির্মিত শিখর মন্দিরসমূহ রথকাসনের উপর নির্মিত হইয়াছে বটে কিন্তু রথকউদ্গমন এত অগভীর যে রথকাসনের প্রয়োগ নামমাত্র বলিয়াই বোধ হয়। ঠিক এই অবস্থাই তো ঘটিয়াছে বরাকরের এই মন্দিরটিতে। রথকাসনের অগভীর বিন্যাস কবে শুরু হইয়াছিল সে প্রশ্নের উত্তরে নির্দিষ্ট কিছুই বলা যাইবে না, তবে পরবর্তী ইটের শিখর মন্দিরে যাহার বহুল প্রয়োগ ঘটিয়াছে বরাকরের এই পাথরের মন্দিরটিতে তাহাই বিদ্যমান। পরবর্তী ইটের শিখর মন্দিরগুলির আরও একটি বৈশিষ্ট্য এ মন্দিরটিতে লক্ষ্য করা যায়। প্রাক্-মুসলমান যুগের শিখর মন্দিরে গম্ভীর অঙ্গসজ্জায় আনুভূমিক বিভাগ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই—লম্বমান ধারাই হইয়াছে সজ্জা বিন্যাসের প্রধান অবলম্বন। আলোচ্য মন্দিরটিতে কিন্তু আনুভূমিক বিভাগের প্রভাবেই সমগ্র গণ্ডী প্রায় আচ্ছন্ন বোধ করি ইহারই স্মৃতি অবলম্বন করিয়া পরবর্তী ইটের শিখর মন্দিরগুলিতে গণ্ডীটিকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আনুভূমিক বন্ধনীর বন্ধনে বাঁধিয়া দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

বরাকরে এই মন্দিরটির নিকটবর্তী আরও দুইটি মন্দিরের কথা আগে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। ভাবকল্পনা ও নির্মাণ পরিকল্পনার দিক দিয়া ও মন্দিরদেহ বৈচিত্র্যায়িত করিবার প্রশ্নে আলোচিত মন্দিরটির সহিত ইহাদের আত্মীয়তা অত্যন্ত নিকট। মন্দির তিনটি প্রায় একই সময়ে নির্মিত এ অনুমান অযৌক্তিক হইবে না।

বর্ধমান জেলার, অজয় নদের তীরে জয়দেব-কেঁদুলির প্রায় বিপরীত দিকে, গৌরাঙ্গপুর গ্রামে ইছাই ঘোষের দেউল। লঘুভার দীর্ঘাঙ্গ মন্দিরটির সহিত বরাকরের উল্লিখিত মন্দিরগুলির

ভাবকল্পনাগত নিকট সাদৃশ্য ইহার পরিচয় ও নির্মাণকাল সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ভাবকল্পনায় নিবিড় ঐক্য সত্ত্বেও ইছাই ঘোষের দেউলে বহিরেখার সংযত গতি কিন্তু বরাকরের মন্দিরত্রয় অপেক্ষা ইহাকে কিছুটা গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। গণ্ডী কোথাও বেশী বাঁকিয়া বেকীর পাদমূলের দিকে অগ্রসর হয় নাই, প্রথম হইতেই ধীর গতিতে অন্তের দিকে আগাইয়া গিয়াছে, কোথাও বাধা পাইয়া যায় নাই।

ইছাই ঘোষের দেউলে অলঙ্করণ খুব বেশী নয়। রাহা পগকে অবলম্বন করিয়া অঙ্গসজ্জার সবটুকু পরিকল্পনা। বিষয়বস্তু কতকগুলি শিখর মন্দিরের অনুকৃতি, মূর্তি, ফুল, লতা পাতা। ইট কাটিয়া রচিত। অলঙ্করণ বিন্যাস বরাকরের রাহা পগগুলিরই অনুরূপ। উপর্যুপরি অবস্থায় স্থাপিত। রাহাপগের এই অলঙ্করণ ব্যতীত সমগ্র মন্দিরদেহে বৈচিত্র আনিবার বিশেষ আর কোন প্রয়াস নাই। বরাকরের সুস্পষ্ট আনুভূমিক বিভাগ ইছাই ঘোষের দেউলে শিল্পীরা কিন্তু কোথাও প্রয়োগ করেন নাই।

লঘুদেহের স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গে মন্দিরদেহকে রূপময় করিয়া তুলিবার প্রয়াস ছিল সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলার শিখর মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টার অন্যতম লক্ষ্য। জটার দেউল ও বহুলাড়ার রূপরেখা রচনায় সৃজনশীল রূপকল্পনার সহিত মিলিত হইয়া গতিভঙ্গের স্বাচ্ছন্দ্য রূপময় হইয়া উঠিয়াছিল। সৃজনশীল রূপকল্পনা বরাকরের স্থপতিদের অনুভূতির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য যে সম্পদ রাখিয়া গিয়াছিল তাহার বিলীয়মান প্রভায় ওই স্বাচ্ছন্দ্য গতিভঙ্গের বৈশিষ্ট্যটুকু একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। কিন্তু এই অবশেষটুকুও আর বেশীদিন থাকিতে পারিল না, এই কয়টি মন্দির দেহের মধ্যে আপনার বিগত মহিমার শেষ পরিচয় রাখিয়া একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

বাংলার শিখর মন্দির নির্মাণের যে ধারাটি সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া আসিয়া বরাকর ও গৌরাঙ্গপুরের মন্দিরগুলির মধ্যেই শেষ হইয়া গেল তাহার অন্তিমকালে তাহার সহিত একই সঙ্গে শিখর মন্দির নির্মাণের আর একটি ভাবপ্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া বহিয়া চলিয়াছিল। এই শ্রেণীর মন্দির নির্মাণে উপকরণ হিসাবে প্রধানত মাকরা পাথরই ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাবকল্পনার দিক দিয়া ইহারা ওড়িশার রেখ মন্দিরের সমগোত্রীয়, কিন্তু নির্মাণ কৌশল ও রূপরেখা রচনায় অক্ষম স্থপতির পরিমিত অভিজ্ঞতা গোত্রবন্ধন অনেক শিথিল করিয়া তুলিয়াছে। সৌন্দর্য্যভাবনার সামান্যতম স্পর্শও এ মন্দিরগুলিতে পড়ে নাই, মন্দির গড়িতে হইলে কি করিতে হইবে এ সম্পর্কে একটা শিক্ষা আছে মাত্র। দৃঢ়বদ্ধ এবং স্থূল দেহের উপর রথপগের তীক্ষ্ণ কোনগুলি বা পাভাগ, বান্ধনা ও গণ্ডীর সামান্য কিছু অলঙ্করণের অমার্জিত প্রকাশ সৌধের সর্বাঙ্গে একটা রূপহীন কাঠিন্যের বন্ধন আরোপিত করিয়া দিয়াছে।

যে মন্দিরগুলির কথা এখন আলোচনা করিব তাহাদের কতকগুলির আকৃতি গুরুভার, দেহ দৃঢ়বদ্ধ। অপর কতকগুলির ক্ষেত্রে দেহ গুরুভার নয় বটে কিন্তু ঋজু বলিষ্ঠতার অভাব কোথাও ঘটে নাই। আসনের রূপ নির্দিষ্ট নয়। ত্রিরথ হইতে সপ্তরথ, আসন বিন্যাসে ইহাদের সবকয়টিরই ব্যবহার ঘটিয়াছে। গণ্ডীর উর্ধগতি প্রায়সই আড়ষ্ট ভঙ্গিমায় বদ্ধ—ক্ষেত্র বিশেষে হয়ত সাবলীল

রেখার কিছুটা প্রাধান্য। গণ্ডীটির বৃহত্তর অংশ প্রায় সোজা উঠিয়া তাহার পর বাঁকিয়া গিয়া শেষ হয়। খুব বেশী বাঁকিয়া গিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত অল্প; ফলে মন্দিরের ছাদটি হয় প্রশস্ত। ইহার উপর উঠিয়াছে স্থূল বেকী। মন্দিরদেহের অঙ্গ হিসাবে আমলক শিলার গুরুত্ব এই শ্রেণীর মন্দিরে অতিশয় হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। কোথাও হয়ত আমলকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় কিন্তু বেকীর উপরের অংশে পল কাটিয়া আমলকের আভাস সৃষ্টি করা হইয়াছে এইরূপ দৃষ্টান্তই অধিক, আমলকটিকে ধারণ করিবার জন্য বেকীটি রচিত হয় নাই, আমলক বেকীরই একটা অংশমাত্র হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে আমলক বেকীর ব্যাস ছাড়াইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে সেখানেও তাহার আকৃতি এত লঘু ও পাতলা যে নিয়মরক্ষা ছাড়া ইহার অন্য কোন প্রয়োজন ছিল এমন কথা মনে হয় না। ইটের মন্দিরেও অতি ক্ষুদ্রাকৃতি বেকী ও আমলকও নিয়ম রক্ষার জন্য সৃষ্ট, তবে এযুগের ইটের মন্দিরে গণ্ডীর অন্তভূমি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া আমলকের বিস্তৃত হইবার সুযোগ একেবারেই নাই; কিন্তু আলোচ্য মন্দিরগুলির গণ্ডীর অন্তভূমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুপরিসর, বেকীও তদনুযায়ী, কিন্তু তৎসত্বেও আমলক স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

আমলক শিলার শীর্ণাবস্থা আরও কতকগুলি মন্দিরে বিদ্যমান। বাঁকুড়া জেলার কোণ্ডারপুর গ্রামের শিব মন্দির ও বিক্রমপুর গ্রামের গোপাল মন্দিরে মাকরা পাথরে মন্দির নির্মাণ করিতে গিয়া আমলকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকিয়াও তাহাকে প্রকৃত মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় নাই। মেদিনীপুর জেলায় ইহার উদাহরণ মিলিবে চন্দ্রকোণার রঘুনাথজী মন্দিরে কেশিয়াড়ী গ্রামের জগন্নাথের মন্দিরেও বাঁকুড়া জেলার ঘুটগেড়িয়া গ্রামের নিকটে একটি পরিত্যক্ত মন্দিরে। মেদিনীপুর জেলার বহু সংখ্যক মন্দিরে কিন্তু আমলকের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের মর্যাদাটুকু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গড়বেতার সর্বমঙ্গলা মন্দির, এগরা-হাটগর গ্রামের মহাদেব মন্দির, তমলুক সহরের বর্গভীমা ও হরিমন্দিরে ইহার উদাহরণ মিলিবে।

আমলকের রূপে সামঞ্জস্য থাকিলেও দেহের দিক দিয়া ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু স্বাতন্ত্র্য রহিয়া গিয়াছে। দৃঢ়বদ্ধ গুরুভার দেহের শ্লথ গতির সহিত পরিমাণজ্ঞানের অভাব আসিয়া যুক্ত হইয়াছে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতার সর্বমঙ্গলা মন্দিরে, গর্ভের তুলনায় মন্দিরের উচ্চতা অত্যন্ত কম; দেখিয়া মনে হয় বাড় পর্য্যন্ত যথাযথ পরিমাণের সঙ্গেই নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার উপর গণ্ডী রচনা করিতে গিয়া পরিমাণ রক্ষা করা আর সম্ভব হয় নাই। গণ্ডীটি হইয়া উঠিয়াছে অত্যন্ত হ্রস্বকায়। বিষম একটি বিস্তৃত ছাদে আসিয়া শেষ হইয়াছে। কিন্তু প্রশস্ত ছাদটিকে তাহার সমস্ত সম্ভাবনা সহ ব্যবহার করা হয় নাই। বেকীটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং সঙ্কীর্ণ, তাহার উপর পলকাটা বস্তুটিই আমলক, মন্দিরটিতে একটি অভিনব বস্তুর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। গণ্ডীর দুই পার্শ্বে বেদীর উপর হইতে দুইটি জিগুরাট বেকী ও আমলকের দৈর্ঘ্য ছাড়াইয়া অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে। কোণ্ডারপুরের শিব মন্দিরটির গঠন স্থূল ও দৃঢ়বদ্ধ হ্রস্বকায় মন্দিরটির দেহে সৌন্দর্য্য বিকাশের অবকাশ নাই সত্য কিন্তু শক্তির সংহত বেগ ইহাকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। মেদিনীপুর জেলার রেয়াপাড়া গ্রামের শিব মন্দির ও বাঁকুড়া জেলার জগন্নাথপুর গ্রামের রত্নেশ্বর শিব মন্দিরের গঠনে ওই শক্তির সংহত বেগই সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান।

দেহের এই গুরুভার পরিহার করিয়া সুউচ্চ শিখর নির্মাণ করিবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় চন্দ্রকোণার রঘুনাথ জিউ মন্দিরে। সুউচ্চ গণ্ডীটি অনেকটা প্রায় সোজা উঠিয়া যাইবার পর শেষের দিকে বেশ খানিকটা বাঁকিয়া, চারিদিক হইতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া শিখরশীর্ষে একটি বিন্দুতে গিয়া মিলিয়া গিয়াছে। প্রারম্ভ হইতে গণ্ডীটি যেভাবে ধীর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে তো একটি বিস্তৃত বিষমে গিয়া শেষ হইবার কথা। কিন্তু ঘটিয়াছে ঠিক বিপরীত। গণ্ডীর ধীর গতি যেন সচেতন সংযম হইতে আসে নাই, আড়ষ্টতা হইতে তাহার জন্ম। ইহার উপর সঙ্কীর্ণ বেকী! আমলকটি লঘু, ঘনত্বও খুব কম; চারিদিকে অনেকটাই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। দ্রুতগামী বক্ররেখায় বিধৃত শিখর প্রান্তের উপর ছত্রের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক এই ঘটনাই ঘটিয়াছে বাঁকুড়া জেলার ঘুটগেড়িয়া গ্রামের সন্নিকটে মাঠের মধ্যে অবস্থিত একটি পরিত্যক্ত মন্দিরে। ইহার নির্মাণ উপকরণ প্রধানতঃ মাকরা পাথর, নিকৃষ্ট বেলে পাথরও কিছু পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরটি আকারে কিছু হ্রস্ব, আমলকটি গুরুভার, চারিদিকে রাহাপগের উপরে চারিটি ঝম্প সিংহ। অনতিউচ্চ মন্দিরদেহের তুলনায় আকৃতিতে এগুলি এতই বৃহৎ যে ইহাদের অবস্থিতি মন্দিরের বহিরেখা বিঘ্নিত করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মন্দিরটির একটি বৈশিষ্ট্য ইহার অলঙ্করণে। দ্বারপথের উভয় পার্শ্বে ও উপরে লম্বমান ও আনুভূমিক বন্ধনীর মধ্যে ও ভঙ্গীকাটা খিলানের উপর বেলে পাথরের উপর খোদিত কয়েকসারি মূর্তি সম্মুখভাগের সজ্জাবিন্যাসের উপকরণ। বিন্যাস ও রচনাশৈলীর দিক দিয়া মূর্তিগুলি বাংলার ইটের মন্দির সজ্জার পোড়ামাটির মূর্তি শিল্পের সহিত একই গোত্রে পড়ে, পার্থক্য যাহা কিছু সে সবটাই উপকরণের গুণে। মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী গ্রামের লঘু ও দীর্ঘাকৃতি জগন্নাথ মন্দিরটি সাবলীল বহিরেখায় বদ্ধ। এইরূপ দীর্ঘাকৃতি আর একটি মন্দিরে—চন্দ্রকোণার রঘুনাথজী মন্দিরে—আড়ষ্টতার যে বাধা ছিল জগন্নাথ মন্দিরে দেখিতেছি তাহা ঘুচিয়া গিয়াছে। সামান্য হইতেও এই কারণেই মন্দিরদেহে সৌন্দর্য্যের একটু আভাস আসিয়াছে। সাবলীল গতিভঙ্গের সম্ভাবনা আর একটি মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটি মেদিনীপুর জেলার এগরা-হাটনগরের মহাদেব মন্দির। পরিমাণজ্ঞানের অভাবে এ সম্ভাবনা এখানে ফুটিয়া উঠিতে পারিল না। হ্রস্বাকৃতি মন্দিরটির সহিত অতিকায় বেকীর কোন সামঞ্জস্য নাই। আমলকের আকৃতি হইয়াছে গড়বেতার মন্দিরটিরই অনুরূপ। বাঁকুড়া জেলার ধরাপটে গ্রামের ন্যাংটা শ্যামচাঁদের মন্দিরটিও পরিমাণজ্ঞানের অভাবেই বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। বাড় পর্য্যন্ত যে দৈর্ঘ্য লক্ষ্য করা যায় গণ্ডীতে উঠিয়া তাহা রক্ষা করা হয় নাই, গণ্ডীটি হইয়া গিয়াছে অনেকটা হ্রস্বাকৃতি। বেকী ও আমলকের আকৃতি গড়বেতা এগরা-হাটনগরের মন্দিরগুলির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

গুরুভার দেহ মাত্রাজ্ঞানহীন অঙ্গবিন্যাস, আড়ষ্ট দেহের শিথিলভঙ্গী সংক্ষেপে ইহাই হইল উপরোক্ত মন্দিরগুলির কাহিনী। বস্তুত কল্পনাহীন চিত্তের নিকট ইহার বেশী আশা করাও যায় না। শুধু একটি মাত্র মন্দিরে দেখিতেছি ইহার কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। অনুকরণ হইয়া উঠিয়াছে সফল। মন্দিরটি বাঁকুড়া জেলার হাড়মাসড়া গ্রামের মাকরা নির্মিত একটি অনতিউচ্চ দেবগৃহ। কোন দেবতার মূর্তি ইহাতে নাই, কোন এক সন্ন্যাসীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয় মাত্র।

নাতিদীর্ঘ মন্দিরটির দেহে বৈচিত্র আনিবার বা অঙ্গসজ্জা রচনার কোন প্রচেষ্টা নাই বলিলেই হয়; পাভাগ নাই, বরণ্ড বিভাগও যে বিশেষভাবে রচিত হইয়াছে এমন নয়। রথকাসনের বিভাগ অবলম্বন করিয়া বাড় সোজা উঠিয়া গিয়াছে। বরণ্ড অংশ অনাবশ্যকভাবে বিস্তৃত। তাহার পর উঠিয়াছে গণ্ডী। খানিকটা সোজা গিয়া তাহার পর ভিতরের দিকে সামান্য ঝুকিয়া বিষমপ্রান্তে শেষ হইয়া গিয়াছে। গণ্ডীর ধীর সংযত গতির ফলে ছাদটি হইয়াছে সুপরিসর। তাহার ঠিক উপরে সংক্ষিপ্ত বেকী সুবৃহৎ আমলক শিলাটি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বিস্তৃত গুরুভার আমলক মন্দিরদেহের বিস্তৃত ও উচ্চতায় পরিমিত হইয়া স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। দেহের পরিমিত বিস্তারে ও রথ-পগের যথাযথ গভীরতায় কোথাও অনাবশ্যক ভারসঞ্চয়ের অবকাশ ঘটে নাই।

ওড়িশার সহিত এই শ্রেণীর মন্দিরের ঘনিষ্টতার আর একটি বিশিষ্ট নিদর্শনের পরিচয় রহিয়াছে মন্দির সংস্থানের বিস্তৃতির মধ্যে। ওড়িশার পুরী-ভুবনেশ্বর অঞ্চলে মূল মন্দিরের সম্মুখে সমান্তরালভাবে জগমোহন, ভোগমণ্ডপ ও নাটমণ্ডপ গড়িয়া তোলা হয়। ওড়িশায় মন্দির সংস্থান বিস্তৃতির ইহাই নিয়ম। যে মন্দিরগুলির কথা বলিতেছি সেগুলিতেও মন্দির সংস্থানের বিস্তৃতি একটা সাধারণ ঘটনা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্মুখে একটি মাত্র পীড় দেউল। কতকগুলি মন্দিরে আবার পর পর আরও কয়েকটি কক্ষযুক্ত হইয়াছে, তবে সেগুলি সাধারণতঃ অন্যরীতিতে নির্মিত—পীড দেউল নয়। কোথাও বা ইহারা চাপা রীতিতে নির্মিত আবার কোথাও বা সমান ছাদ বিশিষ্ট একটি কক্ষ মাত্র। তমলুক সহরের মুল মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রথম কক্ষটি কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই চালা রীতির চারচালা ছাদ বিশিষ্ট কক্ষ—পীড রীতির কোন স্থান সেখানে হয় নাই। বিস্তৃতি সাধারণতঃ তিনি ক্ষেত্রেই শেষ হইয়াছে। সর্বশেষ কক্ষে দেওয়াল নাই, সারিবদ্ধ স্তম্ভের উপর ছাদ নির্মাণ করা হইয়াছে। একমাত্র চন্দ্রকোণার রঘুনাথ মন্দিরের সংস্থাপন শেষ হইয়াছে চারিটি কক্ষে। শিখর দেউলের ঠিক সম্মুখে একটি ভদ্র বা পীড দেউল, অপর দুইটি কক্ষ সম্মুখে রহিয়াছে বটে তবে অসংলগ্ন ভাবে যুক্ত বলিয়া মনে হয়। ইহাদের ছাদও কোন বিশিষ্ট রীতিতে নির্মিত নহে, সমতল।

আমাদের নাটক—বিদেশীর চোখে

কথা হচ্ছিল ডেম সিবিল থর্ণডাইক প্রসংগে, শিশিরকুমার অসহিষ্ণু ভাবেই বললেন—ওদের কথা বাদ দাও। সামনে বলে গেল, বেশ ভাল নাটক আর দেশে গিয়ে লিখলে, কলকাতায় অতি আধুনিক নাট্যশালার পাশেই রয়েছে ১৯শ শতকীয় প্রচেষ্টা।

আর একদিন রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ভ্রমণ প্রসংগে বলেছিলেন—ওরা তাঁকে বলত 'হাফ ক্রেজি প্রফেট'। রবীন্দ্রনাথের রচনার সম্বন্ধে কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অফ লিটারেচারে নাকি লেখা আছে, ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর আর অবদান কি? ওঁর চেয়ে তরু দত্ত, মনোমোহন ঘোষ বা সরোজিনী নাইডুর অবদান বেশী। রবীন্দ্রনাথও শেষ দিকে বুঝেছিলেন তাই নাকি বলেছিলেন, ইংরাজী অনুবাদ করার দরকার নেই।

শিশিরকুমার তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কালে বলেছিলেন যে, তাঁকে সীতা ইংরাজীতে অনুবাদ করে অভিনয় করতে বলা হয়েছিল। তিনি যখন জানিয়েছিলেন তাঁর দলের অনেকে ইংরাজী বলতে পারেন না, প্রযোজক হেসে বলেছিলেন, যত ভুল হয় ততই তো ভাল। নিউইয়র্কে যতজন ভারতীয় ছিল সবাইকে পাগড়ী বাঁধিয়ে মঞ্চে তুলতে চেয়েছিলেন, এমনকি হাতীও তুলতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ তোমাদের নাটক যে নাটক নয় সঙ সাজা মাত্র সেটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন সে ভদ্রলোক।

গত কয়েক মাসে বিভিন্ন দেশ থেকে নাট্য বিশেষজ্ঞ (প্রকৃত ও তথাকথিত) যাঁরা এদেশে এসে এদেশের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে গেছেন তাঁদের মন্তব্যগুলি পড়তে পড়তে শিশিরকুমারের কথাগুলি নতুন করে মনে পড়ছিল।

প্রথমেই মনে হতে পারে, শিশিরকুমার ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে মন্তব্য করেছেন। কারণ বিদেশীরা আমাদের নাটক প্রশংসনীয় বলেই বর্ণনা করেছেন। ব্যক্তিগত প্রবণতা, পারিপার্শ্বিক ইত্যাদি বিচারে বিশেষ বিশেষ ধরনের নাটককে তাঁরা বেশী প্রশংসা করেছেন তবে সাধারণভাবে কোনটাকেই খারাপ বলেন নি।

এ অবস্থায় ধরে নিতে হবে বিদেশীদের আমাদের নাটক ভাল লাগে কিন্তু প্রকৃত কথা কি তাই? নিমন্ত্রিত অতিথিকে যদি আপ্যায়ন কেমন হয়েছে বা ভোজের আয়োজন কেমন লেগেছে এ বিষয় গৃহকর্তা প্রশ্ন করেন অতিথি কি তাহলে সরাসরি বলতে পারেন যে সবকিছু অতি বিশ্রী হয়েছে। মনে যাই থাকুক না কেন মুখে তিনি বললেন—সবকিছু সুন্দর হয়েছে। এটা কিন্তু মনের কথা নাও হতে পারে তাঁদের। বিদেশীদের মনের প্রকৃত কথা বুঝতে হলে নিজেদের দেশে তাঁরা কি বলেন তা জানা দরকার। সেখানেও যদি প্রশংসা থাকে তো ধরে নিতে পারি বক্তা তাঁর মনের কথাই বলছেন।

গত কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক নাট্যসংস্থার মুখপত্র নিয়মিতভাবে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে কিন্তু সেখানে কোথাও ভারতীয় নাটক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা চোখে পড়েনি। এমনকি বিভিন্ন দেশে কোথায় কি নতুন নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে তার যেসব বিবরণ থাকত তাতেও ভারতের একমাত্র নাটকের যে খবর আছে তার কথা বাংলা দেশের নাট্যামোদীরা জানেন না বললে অনৃত ভাষণের দায়ে পড়তে হবে না বলেই আমার ধারণা। দিল্লীতে মোহিনী মোহিয়াল নাটকটি কবে, কখন কোথায় হয়েছিল রসিক পাঠক বলতে পারেন? না পারলে লজ্জিত হবেন না, নাট্যসংস্থার মুখপত্র না পড়লে আমিও বলতে পারতাম না। অথচ সেই নাটকই ভারতের একমাত্র নাটকরূপে সেই পত্রিকায় বর্ণিত যেখানে ইউরোপ, আমেরিকা (উত্তর ও দক্ষিণ)-র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগরের তুচ্ছাতিতুচ্ছ নাটকের অতি বিশদ বিবরণ মুদ্রিত করা হয়েছে।

খবর না থাকার দায় দায়িত্ব কিছুটা কিছুটা কেন অনেকটাই যে আমাদের এতথ্য স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু অন্য পক্ষের যে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই এ কথাকেই বা অস্বীকার করা যায় কি করে?

অন্যদিক থেকে বিচার করে দেখলেও এই অনাগ্রহ সুস্পষ্ট হবে। আন্তর্জাতিক নাট্যসংস্থার বর্তমান সভানেত্রী শ্রীমতী রোজামণ্ড গিল্ডার নাট্যবিশেষজ্ঞরূপে দীর্ঘদিন নতুন দিল্লীতে কাটিয়ে গেছেন কিন্তু ভারতবর্ষের যেখানে নাট্য আন্দোলন সবচেয়ে জোরদার সেই কলকাতা নগরীতে তিনি কতদিন ছিলেন? ভারতবর্ষের নাটক সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মূল্যায়নও তো বিদেশের পত্র-পত্রিকায় করেন নি?

আধুনিক ইউরোপীয় নাটকের বর্তমান প্রবণতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের নাট্যবিশেষজ্ঞরা পূর্বদেশীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধোত্তরকালে চীন ও জাপানে পরম্পরাগত নাটক দেখে উঠতি নাট্য-প্রযোজক, পরিচালক তথা প্রয়োগ প্রধানরা প্রভাবিত হন। আধুনিক ইউরোপীয় নাটকে তাই জাপানী কাবুকিগুলো এবং চৈনিক নাটকের প্রভাব স্পষ্ট। ভারত সম্বন্ধে কেউ বলেন নি ওকথা! অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালেও এদেশে বিদেশীদের আনাগোণার কমতি ছিল না।

তাহলে মোদ্দা কথাটা দাঁড়াচ্ছে কি? এদেশের নাটককে বিদেশীরা সঙেরই নামান্তর মনে করেন বলে তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। জীবন সন্ধ্যায় ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শিশিরকুমার নাটককে যাত্রাইজড করার কথা বলেছিলেন। তাঁর মত হল তা না হলে বাঙালী জিনিয়াস কোনদিনই পূর্ণতা পাবে না।

যাত্রাইজড করাটাই কি সম্ভব? মনে হয় না, কারণ যাত্রা বহুদিনই নাট্যমঞ্চের অনুগামী আর আজ দুইই চলচ্চিত্রের পাকে পড়ে গেছে। থিয়েটারস্কোপ আর যাত্রাস্কোপের তাই ছড়াছড়ি: গল্পের গরুর গাছে চড়ার মত প্রয়োজন থাক না থাক নাটককে রেললাইনের ধারে নিয়ে যাবার চেষ্টার ক্রটি নেই। সুতরাং সেদিকেও নাস্তি।

কেন এমন হচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে সেই চির পুরাতন তত্ত্বের নব আবিষ্কার ঘটাতে হয়। উনবিংশ শতকের নব জাগরণ থেকে আমাদের মনে যে দোটানা সুরু হয়েছে তারই

অন্তঃফল আজকের এই অত্যধিক আধুনিকতা, যার আর এক নাম পশ্চিমমুখিতা, তথা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রতি প্রবণতা। আজকের নাটকে তাই সাইক্লোরামা আর আলোক সম্পাতের একাধিপত্য। আংগিকের আধিক্যের জন্য নাট্যসংস্থার বা পরিচালকের দোষ দিয়ে লাভ নেই তারাও ভেজাল দিয়ে লাভবান হলে সেইদিকেই ঝুঁকবেন। খারাপ জিনিসটাকে আমরা যখন খারাপ বলব না বরং প্রশংসা করব তখন ভালোর সংস্থান কেন করা হবে?

সম্রাটের যে পোশাক নেই এটা সবাই দেখছি কিন্তু কেউ কোন কথা বলব না, কারণ বললেই লোকে বোকা ঠাউরাবে।—আমাদের এ মনোভাবটা সর্বজনবিদিত বলেই বুদ্ধিমানে তার সুযোগ নেয়। আপনার আমার বুদ্ধিকে চমকে দেবার জন্য তাই বিদেশীদের প্রশংসাপত্র একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আর চতুর্বর্ণ লাভের পর একটুকরো কাগজে কিছু ছেঁদো কথা, অ্যাঁও হয় অঁও হয় গোছের লিখে দেবে না, এমন অভদ্রলোক কে আছে?

আর এই প্রশংসাপত্র দেখার পর আমরাও বোকা বনে যাই। আলুর ব্যবসাদার নাটককে ভাল বললে আমাদের বোধ হয় চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়! অথচ সেই ভদ্রলোক নিজের দেশের নাটক সম্বন্ধে একটি কথাও বোধ হয় বলতে সাহস করবেন না। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্?

এই মায়েরপ্রীতি যতদিন না দূর হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশ জীবনের কোন ক্ষেত্রেই অগ্রগামী হতে পারবে না, কাজেই নাটকের কথা তো বলাই বাহুল্য। নাটক জীবনের দর্পণ একথা যদি সত্য বলে বিবেচনা করা হয়, এও মানতে হবে যে, নাটককে জীবনের অনুগামী হতে হবে। যে পরিবেশ আমাদের জীবনের সে পরিবেশ কোনদিনই বিদেশীর চোখে যথাযথভাবে ধরা পড়তে পারে না অথচ তাঁদের প্রশংসাপত্রের জোরে আমাদের নাটক চলবে একথা চিন্তা করাও অশ্রদ্ধেয়। যে নাট্যকার আপন পরিবেশকে ঠিকমত রূপায়িত করেছেন অথচ তারই ওপর পূর্ণ চরিত্র সৃষ্টিতে অক্ষম হয়েছেন তাঁকে প্রশংসাপত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। আমাদের দেশের ভাস, কালিদাস, শূদ্রককে হয়নি!

নিজের দেশের উপযোগী করে লিখলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় এমন ধারণা এদেশের অনেকের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে: কাজেই তাঁরা আন্তর্জাতিক হবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। যাঁরা কিছু পরিমাণে দেশজ থাকতে চান তাঁদেরও একচক্ষু বিদেশীদের কাছে প্রশংসিত হবার আশায় উচ্চকিত। এ অবস্থায় নাটকের যা হচ্ছে তা সন্ধানী জনের অজানিত নয়। তবুও আজকের রাধা বিদেশী কালার বাঁশীর ডাকে সাড়া দিতে উন্মুখ।

এরপর জাতীয় নাট্যশালা, থিয়েটারকে যাত্রাইজড করা ইত্যাদি কথা তোলাটা নিতান্তই অবান্তর নয় কি? সুতরাং রসিকজন ওসব কথা ভুলে গিয়ে ইবসেন, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ ব্রেখট, উইলিয়ামস মিলার, ইনজে, পিরান্দেলো, অসবোর্ণ, পিণ্টার, ওয়েস্কার, বেকেট, আয়োনেস্কো প্রমুখের অনুকরণ-অনুসরণের জয়ধ্বনি করলেই নাট্যলক্ষ্মীর খাস কামরার দরজা রবিবার সকালের গিরজার দরজার মত হাট হয়ে যাবে আর বাঙলা নাটক অমরত্ব লাভ করবে। দুর্জনে আবার নিমতলা-কেওড়াতলায় যেন খুঁজে না মরেন।

রবি মিত্র

অরসিকেষু

সেদিন পথ চলতে চলতে পুরাণো এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা—দীর্ঘদিন পরে হলেও চিনতে খুব বেশী দেরী হয়নি আর পুরানো পরিবেশ নিয়ে আলাপ স্থুরু হওয়ায় জমতেও দেরী হল না। কথা প্রসংগে কি করে জানিনা আমার লেখক পরিচিতির কথা উঠল। ব্যক্তিগতভাবে নিজের লেখার ব্যাপারে আমার কুণ্ঠা আছে (সম্পাদকের উদ্যত ডাণ্ডা যে লেখার ব্যাপারে সকর্মক এতথ্য এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি), কাজেই চারুবাদের সম্ভাবনায় চঞ্চল হয়ে উঠলাম কিন্তু বন্ধুবরের কথা সেদিকেই গেল না। পরিষ্কার বললেন তিনি, নাটক নিয়ে প্রবন্ধ লিখলে কি পেট ভরে?

পেট ভরাবার জন্য যে লিখি না একথা হয়ত বলা চলত কিন্তু বলা হল না কারণ তিনি ব্যস্ত মানুষ নিজের কাজের তাগিদে আমার পথের কৌনিক রেখায় ছুটে চলে গেলেন। তিনিও গেলেন কিন্তু আমার মনের মধ্যে চিন্তার বীজ উপ্ত করে গেলেন। গত ক'মাস থেকে ভেবে ভেবে তার সমাধান পাইনি।

আমার চিন্তার প্রথম কথাই হল—আমাদের সামাজিক চিন্তাধারার কি আগাগোড়া বদল হয়ে গেছে? আজকের দিনে বিদ্যার জ্ঞান কি বিদ্যাচর্চার কোন মূল্য নেই? শেষে এ প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর ওই মুহূর্তেই সমস্বরে দেওয়া যেতে পারে, বিদ্যার জন্য বিদ্যাচর্চা আজকের দিনে অপ্রয়োজনীয়! (কেউ কেউ এ পর্যন্ত বলেন শুদ্ধবিদ্যা অর্থ, সময় ও মস্তিষ্কের অপচয় এবং সেই জন্য সে বিদ্যা চর্চা অমার্জনীয় অপরাধ। তাদের কাছে বিদ্যা একমাত্র প্রয়োগ তথা প্রকরণগত বিদ্যা!) অথচ আমাদের সমাজে নিজস্ব মূল্যই শেষ কথা ছিল। বিদ্যা তাই বিক্রি হত না, দান করা হত, পঞ্চতন্ত্রকথামুখমে বিষ্ণুশর্মা তাই সাহংকারে বলছেন, নাহং বিদ্যা বিক্রয়ং করিষ্যামি। আজ অবশ্য বিদ্যা বিক্রিই হয়। শিক্ষক ছাত্রদের যা শেখান তার নেপথ্যে বড় হয়ে থাকে অর্থের প্রশ্ন। ছেলেকে ভাল করে লেখা পড়া শেখাতে হলে বিষয়ানুক্রমিক গৃহশিক্ষক রাখা প্রয়োজন অর্থাৎ বাপের পয়সা না থাকলে ছেলেমেয়ের যত বুদ্ধিই থাকনা কেন, তার কোন মূল্য থাকবে না। অর্থাৎ দারিদ্রদোষ গুণরাশি নাশি।

এ পর্যন্ত চিন্তা সরল আর তার উত্তরও সোজা। কিন্তু এর পরেই গোল বাধছে। এমন মানুষকে আমি চিনি যিনি সারা জীবন বিদ্যার্জনই করে গেলেন অন্য কোন কিছু ভাববার বা করবার অবকাশ পেলেন না অথচ নানাজনে তাঁর কাছে নতশির। সংসার খুব স্বচ্ছল না হলেও অস্বচ্ছল নয়, অবশ্য পারিবারিক নানা জনকে এজন্য কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু তার জন্যও কেউ দুঃখিত নয়।

আবার অত্যন্ত দরিদ্র সন্তানও তো পরীক্ষা সাগর সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়, নিশ্চয় সে কোন না

কোন শিক্ষকের সহায়তা পেয়েছে। আর এঘটনা যদি কোটিকে গোটিক হত তাহলে তা ব্যতিক্রম বলে গণ্য করা যেত। কিন্তু এমন ঘটনা সংখ্যালঘু হলেও উল্লেখযোগ্য সুতরাং নিতান্তই ব্যতিক্রম নয়। তাহলে আমাদের প্রাচীন সামাজিক কাঠামো এখনও আমূল বদলায় নি একথা বোধ হয় বলা চলে।

নিত্যদিনের দেখাটার মধ্যে কি তাহলে কোন গরমিল আছে। শিক্ষক উচ্চতর শিক্ষালাভ করছেন ছাত্রকে ভাল করে পড়ানোর জন্য নয় অধিক উপার্জনের জন্য ও চিকিৎসক উচ্চতর ছাপ সংগ্রহ করছেন একই উদ্দেশ্যে, রোগ নিরাময়ের জন্য নয়—এ ঘটনাও আমরা অহোরহ দেখছি। পণ্ডিতম্মন্যরা তাই নিজেদের মতের কোন দোষত্রুটি কেউ দেখালে বিচার করেন তিনি অধিকতর পণ্ডিতম্মন্য কিনা, না হলে তুবিনয়ের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ সমালোচনার জবাব দেন। অথচ অর্থবান বা ক্ষমতাবানদের অর্থহীন সমালোচনাকে শিরোধার্য করেন।

আবার এওত দেখেছি সহায় সম্বলহীন প্রকৃত পণ্ডিতজন অতি প্রকাণ্ড এক কর্মকাণ্ড সুরু করে বহুজনের সহায়তায় তা সমাধা করতে সক্ষম হচ্ছেন। দেখছি প্রকৃত বিদ্যার্থীর শিক্ষার পথের বাধা নানাজনে দূর করে দিচ্ছে।

এই দোটানা কিন্তু আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে একই ভাবে প্রচলিত। আমরা একান্নবর্তী পরিবারের বিধিবন্ধনকে ভাঙছি (মূলত অর্থনৈতিক কারণে) কিন্তু যৌবন প্রাপ্ত সন্তানদের মা বাপের কাছ থেকে আলাদা করে দিই না। অর্থাৎ আমার ভাইবোনেদের সঙ্গে থাকলে অসুবিধা হয় কিন্তু আমার ছেলে মেয়ে এক সঙ্গেই থাকবে, তাদের কোন অসুবিধা হবে না। আমার বাড়িতে সামাজিক কাজে লৌকিকতা আশা করব কিন্তু রিসেপশান দিয়ে ছেড়ে দেব, অন্যের বাড়িতে দাড়ি ছুবড়ে খাব কিন্তু খালি হাতে যাব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থাৎ নিজের বেলায় আঁটিসাঁটি পরের বেলায় দাঁত কপাটি হওয়ার দিকে প্রবণতা পুরো মাত্রায় উপস্থিত। তা হোক আপত্তি নেই কিন্তু স্বার্থপরতার একটা নিয়মন থাকে, আমরা সে নিয়মনও মানব না; আবার পরার্থপরতার নিয়মনেও পুরোপুরি বাঁধা থাকব না।

উনবিংশ শতকে বাংলার নব জাগরণের কাল থেকে আমরা পশ্চিমী ভাবধারাকে পুরোপুরি আঁকড়ে রাখতে চাইছি অথচ যুগ যুগান্তের সঞ্চিত বিধিকেও একেবারে ত্যাগ করতে পারছি না। দোটানায় আমাদের অবস্থা না ঘরকা না ঘাটকা।

আমাদের নাটকের দোটানার সূত্রপাতও সেইখানে এবং যতদিন জীবনের দোটানা না কাটছে ততদিন নাটকের দোটানাও কাটবে না। অথচ নাট্যসমালোচকরা জীবন যন্ত্রণার দ্যোতক হিসাবে যে সব নাটকের কথা বলেন তাতে কি এই দোটানা পুরোপুরি ফুটে ওঠে? হয়না, কারণ কোন নাটক পূর্ণতঃ পশ্চিমী অংশের প্রতিফলন; কোনটা আবার পুরোপুরি ঐতিহ্যানুগ; কোন কোন ক্ষেত্রে দোটানাকে মিলিয়ে সমান করার প্রচেষ্টা যে হয় না তা নয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অসমান থেকে যায়।

ইদানীংকালে যুগ যন্ত্রণা, যুগলক্ষণ ইত্যাদি বলার একটা ঝোঁক দেখা যায়। কথাটা যদি সচেতনভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকত আনুষংগিক হিসাবে একথা বলা উচিত যে পটভূমিকায় যুগটি

উপস্থিত। কিন্তু যুগ কি আসে? এলে নাটকীয় অজস্র উপাদান সত্ত্বেও ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের নিয়ে প্রকৃত নাটক একটাও লেখা হ'লনা কেন? কেন উদ্বাস্তুদের কথা বলতে গেলে হয় উন্নাসিকতা না হয় অতিভাষণ প্রয়োজন হবে?

আধুনিক জীবনের রূপায়নের ক্ষেত্রেও তো দেখা যাচ্ছে হয় জীবনের অন্ধকার দিক না হয় বি-নাটক। মোট কথা মল্লিনাথ ছাড়া কোনটির রস বোঝবার উপায় নেই! আর মল্লিনাথেরা দিগভ্রান্ত নবকুমারের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু কোন কপালকুণ্ডলাই পথ দেখাতে আসছেনা।

এ অবস্থায় প্রকৃত সৃষ্টি কোন মতেই সম্ভব নয় আর বাংলা নাটকের বর্তমান অবস্থার মধ্যে এই দুর্ঘটনাই ঘটতে দেখা যাচ্ছে। অথচ প্রকৃত ঘটনার কথা কেউ বলতে রাজী নয়। আর বলেই বা লাভ কি? রাজার পরণে যে কাপড়ই নেই একথা বলতে বলতেও মুখ ব্যথা হয়ে গেছে অধিকন্তু লোকে দুর্ণাম দেয়, 'ওসব ছিদ্রান্বেষীর কথা, পরের ভাল ওরা দেখতে পায় না!

রবি মিত্র

সমালোচনা

বিবিধ প্রবন্ধ। সম্পাদনা : শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত ও শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল। ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্‌স্‌, ৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে তেমন সমৃদ্ধি বা সমুন্নতি ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়নি। রবীন্দ্রনাথই প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনেছেন এবং নীরস বা দুর্বোধ্য বলে প্রবন্ধ সম্পর্কে পাঠকের যে ভীতি বা অবহেলা তা অনেকাংশে নিরসন করতে সমর্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই দ্রুতগতিতে প্রবন্ধের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ যে পাঠক সমাজে বেড়ে চলেছে তা আজকের দিনে স্বীকার না করে উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথই তাঁর প্রতিভার জাদুতে প্রবন্ধের রূপ পাল্‌টে দিয়েছেন এবং প্রবন্ধকে সরস সাহিত্যে রূপান্তরিত করে পাঠক সমাজে তার আসন দৃঢ় করে তুলেছেন। আধুনিককালে তাই বাংলা প্রবন্ধ স্বাদে-গন্ধে-বৈচিত্র্যে সকলশ্রেণীর পাঠকের কাছেই রমণীয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি বাংলা ভাষায় বিচিত্র স্বাদের একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ সংকলন 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত ও শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল। মোট ছাব্বিশটি প্রবন্ধ এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব বিভাগ নিয়েই কিছু না কিছু আলোচনা সেই সব প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কবিতা, নাটক, ছোট গল্প, লোকসাহিত্য বৈষ্ণব-সাহিত্য, শিশু, সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন প্রবন্ধকার কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তবে কয়েকটি প্রবন্ধ এত সংক্ষিপ্ত হয়েছে যে আলোচনা অপূর্ণতা-ও অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট হয়েছে। যদিও এর কারণ আছে। কেননা প্রবন্ধগুলো আগে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং সাধারণতঃ সাময়িক পত্রিকার জন্যে লিখিত ফরমায়েসী রচনা সংক্ষিপ্তই হয়ে থাকে। এর জন্যে ব্যক্তিগতভাবে প্রবন্ধকারগণ যতটা দায়ী তার থেকে অনেক বেশী দায়ী এই সংকলনের সম্পাদকদ্বয়। তাঁরা যদি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে প্রবন্ধকারদের দিয়ে তাঁদের রচনাগুলো আর একবার পরিমার্জনা করে নিতেন তাহলে যে প্রবন্ধ-গুলির ক্রটি এখন প্রকটভাবে ধরা পড়েছে সেগুলো ক্রটিমুক্ত হবার অবকাশ পেত। এদিক দিয়ে সম্পাদকদ্বয় এক অমূলক কৈফিয়ৎ তুলে নিজেদের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করেছেন। সংকলনটির যদি দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়ার সুযোগ আসে তাহলে নিশ্চয়ই তখন সম্পাদকদ্বয় বর্তমার ক্রটি সম্পর্কে সচেতন হবেন বলে আশা করা যায়।

'বিবিধ প্রবন্ধে' যাঁদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অধিকারী। লেখক পরিচিতি থেকে জানা যায় যে, প্রবন্ধকারগণের প্রত্যেকেই সাহিত্যের অধ্যাপক বা গবেষক। তাদের আলোচনার মধ্যে কিছু যে অভিনত্ব থাকবে সেটা আশা করা অন্যায় নয়।

কিন্তু প্রতিটি প্রবন্ধকারই যে স্ব স্ব রচনায় কৃতিত্ব বা মৌলিকত্ব দেখাতে পেরেছেন একথাও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করা যায় না। অনেকগুলি রচনা সম্পাদকদ্বয় নির্মমভাবে ছাঁটাই করে দিতে পারতেন। কারণ, ঐ প্রবন্ধগুলি লেখকদের পদমর্যাদাই ক্ষুন্ন করেছে।

এই জাতীয় প্রবন্ধ সংকলকদের 'সম্পাদকীয়' রচনাটি খানিকটা স্বতন্ত্র ধরণের হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয়নি। যে গাম্ভীর্য নিয়ে রচনাটি সুরু করা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত তা অক্ষুন্ন থাকেনি এবং 'সম্পাদকীয়' পড়ে সংকলনের রচনাদি সম্পর্কে কোন ধারণা করাই সম্ভব হয় না। অত্যন্ত মামুলী ব্যবসায়িক ধরণে লেখা 'সম্পাদকীয়'টি সংকলনের বিশিষ্ট চরিত্র ও সদুদ্দেশ্যকে নষ্ট করেছে।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ সুরসিক পাঠক মাত্রকেই চিন্তা বা কৌতুহলের খোরাক দেবে—দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা কবিতা : গত একদশক', নিরঞ্জন সেনগুপ্তের 'বাংলা সংবাদ পত্রের ভাষা : গত একদশক, পীযূষকান্তি মহাপাত্রের 'গ্রন্থবিহীন গ্রন্থাগার', দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য,' ও জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর 'শক্তিসাধনার লক্ষ্য'।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে বিদেশী কবিদের ভাবানুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের গত একদশকের কবিদের প্রকৃতি বা মনোভাব সুষ্ঠুরূপে আলোচনা করে দেখিয়েছেন। তবে তাঁর ভাষা খানিকটা জটিল হওয়ায় আলোচনার সর্বজনীন আবেদন কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেবীপ্রসাদের প্রবন্ধের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করে দেখান যেতে পারে—'যে সম্মিলিত সচ্ছলতায় উত্তর রৈবিক ভাবনার স্বরগ্রাম আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে সেই রকমই, হয়তো তারও থেকে অনিবার্য যৌথ দায়িত্ব, কিন্তু অনেক বেশী অসংহত, প্রতিপক্ষহীন সময়ে ব্যাপৃত কয়েকটি শিবির, আর কয়েকজন বিচ্যুত ও স্বাধিষ্ঠিত ; প্রায় সবাই তাঁর স্নায়ব বিপ্লবতার প্রতিলিখন ধরে রাখতে চান চীৎকৃত ত্রস্ত ভাষায়, তার ক্বচিৎ কেউ সেই বিভীষিকাকে শাসিত করবার ব্রতে সেই অস্থিরতাকে এড়িয়ে ভীষণ একাকী দাঁড়িয়ে আছেন।'

শঙ্কর সেনগুপ্তের 'লোকবৃত্ত' প্রবন্ধটি বিতর্কমূলক। ইংরেজী Folklore-এর ভারতীয় প্রতিশব্দ হিসাবে তিনি 'লোকবৃত্ত' কথাটি গ্রহণ করেছেন এবং এই প্রতিশব্দ গ্রহণের পশ্চাতে যেসব কারণ দেখিয়েছেন তা একেবারে অসংগত বলে মনে হয় না। এই প্রবন্ধের মধ্যে শঙ্করবাবুর নির্ভীক সমালোচনা দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। লোক-সাহিত্যের পণ্ডিত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তির যথাযোগ্য সমালোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। লোকসাহিত্যের ঐতিহাসিক দাবী সম্পর্কে ডঃ ভট্টাচার্য্যের অস্বীকৃতি যে অমূলক তা তিনি বিদেশী লোক-সাহিত্য গবেষক পণ্ডিতগণের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। প্রবন্ধের শেষে কামিনীকুমার রায়ের উদ্ধৃত ছড়ার সঙ্গে ডা: ভট্টাচার্যের সংগৃহীত ছড়ার যে বৈসাদৃশ্য এবং ডঃ ভট্টাচার্যের যে হাস্যাস্পদ মন্তব্য তা উদ্ধৃত করে শঙ্করবাবু তাঁর প্রবন্ধটিকে বেশ কৌতুহলোদ্দীপক করে তুলেছেন। লোক-সাহিত্যের অনুরাগী প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর এই প্রবন্ধটি যে খানিকটা কাজে লাগবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

যাই হোক, পরিশেষে 'বিবিধ প্রবন্ধ' সম্পর্কে এই উক্তি করা নিশ্চয়ই অংসগত হবে না যে

এই জাতীয় সংকলনের প্রয়োজনীয়তা বাংলা সাহিত্যে নিশ্চয়ই আছে, কেননা বিভিন্ন মনের আধারে বিচিত্র রসের সম্ভার এই জাতীয় সংকলন ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ। সেই হিসাবে বাংলাদেশের সাহিত্য সমাজে 'বিবিধ প্রবন্ধ' সমাদৃত হবে বলে আশা করা যায়।

অধীর দে

ব্রীজ। রাম বসু। গ্রন্থজগত, ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরস্, কোলকাতা-২৯। দাম দু' টাকা।

বাংলা সাম্প্রতিক কবিতার পাঠকের কাছে রাম বসু পরিচিত। তাঁর কবিতায় বর্তমান দশকে সুলভ ষ্টাণ্টপ্রিয়তা দেখা যায় না। নিঃসঙ্গতা এবং সংবেদনশীল আর্তি তাঁর কবিতায় অত্যন্ত সাবলীল পর্যায় নির্মিতিতে সফল হয়েছে। 'ব্রীজ' কবির দ্বিতীয় কাব্যনাটক।

আগাগোড়া গদ্য ছন্দে লেখা এই কাব্যনাটকে ভাষা সাবলীল কিন্তু ভাববস্তু অত্যন্ত কন্‌ভেন্‌শনাল—বহুদিন কাব্য নাটক লেখা হয় নি সুতরাং এবার একটা লেখা যাক—ঐ ধরণের ভাব অস্বস্তি উৎপাদন করে। অধুনা কাব্যনাটক লেখা হয় প্রায়শই মঞ্চকে উপেক্ষা কোরে—রাম বসু সেই দোষ-মুক্ত। কিন্তু তাঁর নাট্যবোধ সম্বন্ধে আমরা আশান্বিত হতে পারি নি। সমাপ্তি এত অ্যাব্রাপ্টলি আনা হয়েছে, মনে হয় কবির ঘোড়াকে অনাবশ্যক জিন দেওয়া হয়েছিলো। নিখিলের ব্যাপারটা প্রথম দিকে খুবই আরোপিত লেগেছে। শেষ পর্যন্ত সুশান্ত এবং অপর্ণাও কাছাকাছি যাবার কোন সেতুর সন্ধান কী পেয়েছিলো—কবি প্রত্যক্ষভাবে কোন উত্তর দেন নি, ফলতঃ আগাগোড়া নাটকটাই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। নিখিলের আকস্মিক ভাবে—

'...ঠোঁট ভিজাবে প্রেমের সিরাপে যাকে ভালোবাসতে পারো নি, তার সঙ্গে বাস করে পাবে সংকটের ত্রাণ? চমৎকার, রঙ্গময়ী চমৎকার!...' বলা খুব হাস্যকর লেগেছে। বয়ঃসন্ধি পেরোনো কোন যুবক হঠাৎ এক রাতে ঐ সব কথা বলতে সক্ষম কী না যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। রাউতাইনের দু-একটি অভিব্যক্তি আরোপিত মনে হয়। বিশেষত '...অর্পণা। আসবে ও? আচ্ছা, তুই রাউতকে খুব ভালোবাসিস, না?

রাউতাইন। মাই-জী।

অর্পণা। রাউতের সঙ্গে যদি তোর বিয়ে না হতো।

রাউতাইন। অঃ [অবিশ্বাসের সুরে]...'

জায়গাটা রীতিমত ছেলেমানুষী লাগে, যা নাটকের গতির পরিপন্থী। সুশান্তের কথাবার্তা ক'এক জায়গায় বেশ কমিক্যাল। অর্পণাকে কবি সযত্নে চিত্রণ করেছেন। তার দ্বন্দ্ব, তার না পাওয়ার অবশ্যম্ভাবী যন্ত্রণা ভালোরকম ফুটে উঠেছে।

গণেশ বসুর প্রচ্ছদ গতানুগতিক হলেও উপযুক্ত। ছাপা ভালো।

সুদর্শন রায়চৌধুরী

Regd.No. C-315 Phone: 23-5155 September'66 (0.50) Central Regd.No.R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

চতুর্দশ বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৭৩

ডব্লিউ. বি. (আই অ্যাণ্ড পি. আর) এ ডি ভি-ডি ১৮১০১/৬৬

শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ
দাগ লাগে না।
POISON
FOR EXTERNAL
USE ONLY
30 G.
ACRIMENT
(0.185% of 5-aminoacridine-sulphadiazine
in a non-staining and washable base)
হাতের কাছে
রাখুন

কেয়ো-কার্পিন
একটি বিশিষ্ট কেশ তৈল
দে'জ
মেডিকেলের
তৈরী
সুলেখা
প্রতিদিনের প্রয়োজনে
সুলেখা
ড্রইং এর
কালি
সুলেখা
ফাউন্টেন পেন-এর
কালি
অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম
সিকুর্যারিটি
সিলিং
ওয়াক্স
সুলেখা
স্ট্যাম্প প্যাড
সুলেখা
ওয়ার্কস্ লিমিটেড
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা—৩২

ঋ

আনন্দে
উৎসবে...
প্রত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিনামরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

ছুটিতে বেড়ানোর
ই তো সময়! ভাবনা চিন্তাহীন অনাবিল আনন্দে আর খুশীর আমেজে
আকাশ বাতাস ভরে উঠেছে...আর আইএসি বিমান আপনাকে নিয়ে
আকাশের নীলিমায় ডানা মেলার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। আমরাই তে
এই বিশাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও মানুষের মধ্যে সবচেয়ে
তাড়াতাড়ি যোগসূত্র রচনা করছি।
IAC
ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্

quality
BLOCK
MAKERS
and
PRINTERS

চতুর্দশ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন তেরশ' তিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

Orient
ENGINEERED
TO OUTLAST
MANY MANY SUMMERS
Orient
CEILING FAN
GUARANTEED FOR TWO YEARS
ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD.
CALCUTTA-54
ASP/OGI-2/66

অথ ভাষাপ্রসঙ্গ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাক্‌স্বাধীনতাপর্বে আমরা যে সমস্ত আদর্শকে সামনে রেখে লড়াই করেছিলাম, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেখা গেল, সে-আদর্শের কয়েকটা রাংতামোড়া কাষ্ঠমূর্তি মাত্র। ইতিহাসেও বলে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে যখন কঠিন কর্মক্ষেত্রে নেমে নানা সমস্যার সমাধানে হস্তক্ষেপ করতে হয়, তখন চোখ থেকে আদর্শের মায়াঞ্জন বেমালুম মুছে যায়। সে যুগে আমরা ভেবেছিলাম, দেশ যখন দেশের অধিকারে আসবে, তখন পরশাসনের নিগড় থেকে আমরা অচিরে মুক্তি পাব। বিদেশী জাতি শৃঙ্খলা রক্ষার ছলে মানবতাবর্জিত নিষ্ঠুর শাসন ও নিরবচ্ছিন্ন শোষণের দ্বারা যেমন একটা বহু পুরাতন সংস্কৃতিবান জাতির আত্মার অবমাননা করেছে, তেমনি জাতির দেহটাকেও 'গজভুক্ত কপিত্থবৎ' নিঃশেষ করে ফেলেছে। ভেতরে বাইরে এমন করে নিষ্ফল করে দেওয়ার দৃষ্টান্ত উপনিবেশিক ইতিহাসেও দুর্লভ।

সত্যযুগে সমুদ্রমন্থনে অমৃতের সঙ্গে বিষও উঠেছিল, ব্রিটিশভারতে অত্যাচারের সমুদ্রমন্থনে বিষের সঙ্গে কিছু অমৃতও উঠেছিল। এই অমৃতের নাম ইংরেজী ভাষাবাহী পাশ্চাত্য সাহিত্যের জীবনবাদ। এই অভিনব প্রত্যয় ও সিদ্ধি হতচেতন জাতির স্বল্প কয়েকজনের চিত্তে অসাধারণ বলিষ্ঠতা ও অকুণ্ঠ আশার সঞ্চার করেছিল। বস্তুতঃ ইংরেজী ভাষাতেই উনিশ শতকের ভারতে উজ্জীবনমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল, প্রাদেশিক পার্থক্য, ইংরেজী ধরণের রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, স্বাদেশিক ঐক্যের স্ফাটিকমূর্তি ধরেছিল। ইংরেজী ভাষার মারফতেই আমাদের রুদ্ধদ্বার মনের চেহারা বদলে যেতে বসেছিল। অবশ্য ইংরেজ না এলে আমরা এখনও মধ্যযুগের তমোগহ্বরে নিদ্রিত থাকতাম একথা ঠিক নয়। বিশ্বের, বিশেষতঃ প্রাচ্য ভুবনের এমন অনেক

দেশ আছে, যেখানে ইংরেজ যায় নি, কিন্তু যুগধর্ম ও কালপ্রবাহে সে জাতির মধ্যযুগের অবসান হয়েছে এবং আধুনিক যুগ অবতীর্ণ হয়েছে। অনেকটা 'কাকতালীয়বৎ' ইংরেজ জাতি ও ইংরেজী ভাষা আমাদের নবজাগরণের সহায়ক হয়েছিল। ঘড়ি যেমন কাল নিয়ন্ত্রণ করে না, তেমনি ইংরেজীভাষাবাহী পাশ্চাত্য সভ্যতাও এদেশের নবজীবনের একমাত্র কারণ নয়। আকস্মিকভাবে ঘটেযাওয়া শত্রুতার সম্পর্ক থেকেই এদেশের শিক্ষিতমহলে ইংরেজী ভাষা নতুন জীবনকে ত্বরান্বিত করেছে। এ সম্পর্ক আকস্মিক এবং মানুষ্যত্বনাশী হলেও একে একেবারে অবাঞ্ছিত বলা যায় না।

লর্ড মেকলে আশাবায়ুতে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিলেন, "Boys black in face, living on the banks of the Ganges, will read Shakespeare and Milton and will glory in our literature." সেযুগের ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার তন্ত্রধার হয়ে কোন কোন বঙ্গসন্তান বটবৃক্ষের বীজে উইলে-চেরী ফলনের চেষ্টা করেছিলেন, মিল—বেন্থাম—বার্ক আউড়ে তাঁরা গাত্রচর্মের পাকা রংটাকে ফিকে করার জন্য সর্বস্ব পর্ণ করেছিলেন। তাঁদের সে বিড়ম্বিত প্রচেষ্টা এখন আমাদের করুণা উদ্রেক করে। ক্রমে ক্রমে তাঁদের মুখ না ফুটলেও চোখ ফুটল, পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের অধমর্ণ না সেজে তাঁরা এদেশকে নিজের দেশ বলে চিনতে শিখলেন। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য একদল দাসত্বজীবী ইঙ্গ-বঙ্গ অদ্ভুত জীবের মনের ভাবে কি রকম পরিবর্তন আনল, তা উনিশ শতকের শেষার্ধের সাহিত্য, সমাজ ও স্বাদেশিকতার বিবর্তনধারা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে।

প্রাক্ ইংরেজ আমলে, যাকে যথার্থ স্বাদেশিকতা বলে, তা গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। মধ্যযুগীয় ভারতে বীরত্বের কাহিনী প্রচুর আছে, দেশের সমাজের, জাতির ও ব্যক্তির স্বধর্ম রক্ষার জন্য অনেক বীরপুরুষ অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু যাকে ভৌগোলিক স্বাদেশিকতা বলে, তার প্রায় সবটাই কালাপানির ওপার থেকে আমদানি হয়েছে গত শতাব্দীতে। অবশ্য মধ্যযুগে ভূমি রক্ষার জন্য রাজপুত, শিখ ও মারাঠারাও বীরত্ব প্রকাশে সঙ্কুচিত হন নি। কিন্তু তার চেহারাটা ছিল মধ্যযুগীয় 'ক্ল্যানধর্মী। বিশেষ দলপতি ও গোষ্ঠীপতির প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি থেকে তার উদ্ভব হয়েছে, কোথাও-বা সম্প্রদায়গত অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এঁদের কেউ কেউ অস্ত্রহাতে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের খাতিরে একথা মেনে নিতে হবে যে, রাজনৈতিক চেতনা, শাসকবিশেষের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব এবং স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার দীক্ষা ইংরেজের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। শত্রুর কাছ থেকেও তো মানুষ কত কি শেখে, এ-ও সেই রকমের শিক্ষা।

নানা ভাষা ও উপভাষা-ভাষী, বিচিত্র আচারবিচার পরায়ণ ভারতবর্ষ কখনও আর্যধর্মের দ্বারা, কখনও বৌদ্ধধর্মের পাশবন্ধনে, কখনও সংস্কৃত প্রাকৃতভাষার মারফতে, কখনও বা মুসলমান যুগের একধরণের রাজস্বব্যবস্থা ও শাসনপ্রণালী এবং ফারসী ভাষার চাপে এই বিশাল দেশ কখনও কখনও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ইংরেজ আমলেও দেখা গেল, গোটা ভারতকে রাজনৈতিক ঐক্যসূত্রে বেঁধে দেবার জন্য ইংরেজীভাষা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল। অবশ্য উনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যাবতীয় স্বাদেশিক আন্দোলন ইংরেজীশিক্ষিত মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পরিচালনা করেছেন। তাঁদের ভাষা গোটা দেশ বুঝত না, কিন্তু তাঁদের অনুনয়বিনয় বা সরব আন্দোলন সম্বন্ধে কেউ উদাসীন থাকতে পারেনি। ক্রমে স্বাদেশিক আন্দোলন চিন্তায় ও

কর্মে স্বদেশীমূর্তি ধরল, ইংরেজী না-জানারাও সমাজ ও রাষ্ট্রের আন্দোলনের মোটামুটি স্বরূপ বুঝতে পারলেন। নেতাদের মধ্যেও একটা কথা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল—তাঁরা যে ভাষায় আলাপ-আলোচনা করেন, তা বিতর্কসভার বিদগ্ধ বৈঠকে খুব কার্যকরী হলেও জনসাধারণ সে-ভাষার বিন্দু-বিসর্গ বোঝে না। দু'একটি রাজনৈতিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিমার্গে মাতৃভাষার ব্যবহারের জন্য আবেদন করেন; তখন তাঁর কিছু কিছু সমর্থনও জুটেছিল। পরবর্তী যুগে যেমন 'গাঁও মে কংগ্রেস হোগা' নীতি বাস্তবে রূপায়িত হল, তেমনি হিন্দীভাষা ভাবীভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে, এ কথা সে যুগের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস সেবকেরা একবাক্যে মেনে নিয়েছিলেন। মহাত্মাজী হিন্দু-মুসলমানের সর্বাত্মক মিলনের 'এলডোরাডো'য় মুগ্ধ হয়ে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দী ও উর্দুকে মিশিয়ে রাষ্ট্রভাষার একপ্রকার নতুন রূপের পরিকল্পনা করলেন। সংস্কৃতপ্রধান বিশুদ্ধ হিন্দীকে মুসলমান সমাজ প্রাণের কথা দূরে থাক, মুখের বুলি হিসেবে গ্রহণ করতে চাইবে না, তা তিনি বুঝেছিলেন। তাই তিনি হিন্দীভাষায় উর্দু-ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করে ভাষাক্ষেত্রে খানিকটা সাম্প্রদায়িক প্রীতি আনতে চাইলেন। বাংলাদেশের সুনীতিকুমার এবং বিশুদ্ধ হিন্দীর সমর্থনকারী হিন্দুঘেঁষা কেউ কেউ হিন্দীকে পলাণ্ডু-স্পর্শদোষ থেকে রক্ষার জন্য এভাষায় প্রচুর পরিমাণে তৎসম শব্দপ্রয়োগ সমর্থন করেছিলেন। এখন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী ভাষানীতির দৌরাত্ম্যের প্রতি শঙ্কা প্রকাশ করছেন। এর মূল দায়িত্ব কিন্তু তাঁর। একদা সদিচ্ছার বশে তিনি যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেছিলেন, এখন তার সারা ভারতবিস্তারী শাখাপ্রশাখা দেখে তিনিও যেমন বিব্রত হয়েছেন, তেমনি যাঁরা ভারতের ঐক্য অক্ষুন্ন রাখতে চান, সাম্প্রতিক ভাষা আন্দোলন এবং 'রাজার নন্দিনী প্যারী' হিন্দীর দাপট দেখে তাঁরাও বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা গঠনমূলক কাজ আরম্ভ হল, যন্ত্রশিল্প ও কৃষিকর্মে, কলকারখানা ও পরিকল্পনায় গোটা দেশটাকে ময়দানবের আস্তানায় পরিণত করবার জন্য চারিদিকে নানা কর্মোদ্যম লেগে গেছে, আর তার সঙ্গে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে হিন্দিভাষাকে সর্বভারতীয় মর্যাদা দেবার প্রচেষ্টা প্রায় সফল হতে চলেছে। আজ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম, ভারতের সমস্ত অঞ্চলেই, কোথাও কৌশলে, কোথাও বা বলপূর্বক আঞ্চলিক ভাষা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে উপস্থাপনা প্রায় অবধারিত মনে হচ্ছে। যেহেতু হিন্দীভাষীরা উত্তরাপথের অধিবাসী, এবং যেহেতু উত্তরাপথ আর্যাবর্তের বংশাবতংস, সেই হেতু সমগ্র হিন্দুস্থান ও দ্রাবিড়স্থানের নিয়ন্ত্রনরজ্জু এঁরা নিজেদের হাতে রাখতে চান। যদিও অহিন্দীভাষী জনসংখ্যা হিন্দীভাষীর চেয়ে অনেক বেশী, তবু ভারতভাগ্য-বিধাতারা যে ভাষায় কথা বলেন, সেই ভাষা গোটা ভারতের মুখের ভাষা না হোক, অন্ততঃ কাজের ভাষা, রুজি-রোজগারের ভাষা, সংস্কৃতির ভাষা হোক, এই তাঁদের প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়।

আজ হিন্দীভাষা সারা ভারতের রাজ্যপরিচালনার ভাষা, কেন্দ্রীয় কর্মনির্বাহের ভাষা—এমন কি শনৈঃ শনৈঃ আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হতে চলেছে। চৌদ্দ ভাষার চৌদ্দ প্রদীপ জ্বালিয়ে ভারতের ভাষান্ধকার দূর করা যাচ্ছে না। 'একশ্চন্দ্রো তমোহন্তি'—একা হিন্দীভাষাই ধ্বান্তারি হতে চলেছে। ইংরেজী ভাষা পরাধীন ভারতে যে স্থান অধিকার করেছিল, হিন্দীকে সেই শূন্যস্থানে বসাবার চেষ্টা এবং ইংরেজী ভাষার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। ভারতবিধানে স্বীকৃত চৌদ্দটি ভাষা

অঞ্চলবিশেষে স্বীকৃতি লাভ করলেও হিন্দীভাষার ভারতব্যাপী প্রভাব বিস্তারের প্রচণ্ডতাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। বিদেশে আমাদের গুণধর এমব্যাসির সাহায্যে নানা দেশে প্রচারিত হয়েছে যে, ভারতে কিছু কিছু আঞ্চলিক ভাষা থাকলেও হিন্দীই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজন বোধ্যভাষা। বাংলা, গুজরাটি, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালয়ালী—এঁদের মতে সবই আঞ্চলিক ভাষা অর্থাৎ 'patois-এর একটু ওপরে। ফলে পশ্চিম দেশের কোন ভারতসন্ধানী ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি টেগোরের মৌলিক হিন্দী রচনাবলী পাঠে উৎসুক হলে তাঁকে ঠেকাবে কে? আমরা লোকপরম্পরায় শুনেছি, বিদেশে কোন ভারতীয় দূতাবাসে রবীন্দ্রানুরাগী এক ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের মৌলিক বাংলা রচনার সন্ধান করতে এলে রবীন্দ্রনাথের হিন্দী অনুবাদ দিয়ে তাঁকে ভোলাবার চেষ্টা হ'য়েছিল। বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলিতে হিন্দী শেখাবার ঢালাও ব্যবস্থা, কিন্তু কেউ বাংলা বা অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষা সম্বন্ধে কৌতূহলী হলে তাঁদের কৌতূহল নিবৃত্তি করা হয় অজ্ঞতা বা উদাসীনতা দিয়ে।

২

এখন বর্তমান ভারতে ভাষা সমস্যা কি আকার ধারণ করেছে দেখা যাক। বিভিন্ন প্রদেশের স্বীকৃত ভাষা প্রদেশের প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, বা হবার চেষ্টা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকপর্ব পর্যন্ত স্থানীয় ভাষা প্রযুক্ত হচ্ছে। কেবল চিকিৎসা বিজ্ঞান, উচ্চবিজ্ঞান, পূর্তবিজ্ঞান, ব্যবহার শাস্ত্র, ধর্মাধিকরণ, এমনকি ছোটখাট যন্ত্রবিজ্ঞান ও কারুশিল্পেও ইংরাজী ভাষার কথঞ্চিৎ দাপট রয়ে গেছে। সামরিক বিভাগের মাঠের কাজ বাদে অফিসের কাজে সর্বত্র ইরেজী ভাষাই বাহন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ানো ও পরীক্ষাগ্রহণে এখনও ইংরাজী ভাষা বজায় আছে। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যাপারে, বিশেষতঃ সর্বভারতীয় শাসন, সামরিক বিভাগ, বেসামরিক কাজকর্ম, ডাক-তার, রেলপথ ও অন্যান্য যানবাহনাদির ব্যাপারে ক্রমে ক্রমে হিন্দীর প্রাধান্য স্থাপিত হচ্ছে। সর্বভারতীয় ও কেন্দ্রীয় শাসনকার্যে হিন্দী জানা বিশেষ আবশ্যক হয়ে পড়েছে, উচ্চ গ্রেডের বৃক্ষচূড়াবলম্বী হতে গেলে হিন্দীর দুচারটি পরীক্ষা দিয়ে রাখাই মঙ্গল। এখন বলা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় বিষয়ে হিন্দী ভাষাই চলুক, যেমন ইংরেজী চলত সে যুগে। কেন্দ্রের সঙ্গে যেখানে প্রদেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের সম্পর্ক রয়েছে, সেখানেও না হয় দ্বিভাষী ভাষা ব্যবস্থা (হিন্দী + প্রাদেশিক ভাষা) চলতে পারে। ইংরেজী ভাষা এখনই বাতিল না হলেও অদূর ভবিষ্যতে একে কোতল করা হবেই। "পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ"—সকলেই, আজ হোক, কাল হোক হিন্দীকে বাইরে ব্যবহার করতে বাধ্য হবে, ঘরে করতে পারলে আরও ভালো হয়। কারণ তাহলে অহিন্দীভাষীরা চট করে হিন্দীটা রপ্ত করে ফেলতে পারবে। সর্বভারতীয় পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতামূলক লড়াইয়ে নামতে হলে, বিহার উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের হিন্দীভাষীর সঙ্গে চাকরীর পাঞ্জা কষতে হলে, শুধু বাইরের পোষাকী ভাষা হিসেবে নয়, ঘরের মধ্যেও হিন্দী ব্যবহার করতে হবে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ইংরেজী মিডিয়ম স্কুলে, ফেরঙ্গ স্কুলে, কনভেন্টেঅনেকে পুত্রকন্যাদের পড়াতেন অনেক টাকা খরচ করে। কেউ কেউ সাগর পাড়ি দেবার আগে, ইঙ্গভারতীয় 'মিসের' কাছে ইংরেজী কেতাদুরস্ত জবান শিখতেন এবং পি, এণ্ড ও জাহাজের খাবার টেবিলে বে-ইজ্জত হবার ভয়ে চৌরঙ্গীর

ফিরিঙ্গী রেস্তোরাঁয় কষ্টার্জিত টাকার আক্কেল-সেলামি দিয়ে ছুরিকাঁটা আয়ুধ সহযোগে আহারযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন। আগামীকাল যাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপথ জনপথে তন্‌খা কুড়োবার স্বপ্ন দেখবেন, তাঁদের অশনে বসনে ভাষণে উত্তর ভারতীয় কুর্তাদি এবং হিন্দীভাষাকে পলিসি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

ইদানীং দেখা যাচ্ছে, সরকারী ঢালাও বদান্যতায় হিন্দীভাষার কলেবর বৃদ্ধি হচ্ছে, প্রভাব ছড়াচ্ছে। অবশ্য অন্য প্রদেশের ভাষাও তার ছিটেফোটা যে পাচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু হিন্দীর ভাগে সিংহভাগ পড়লে অহিন্দীভাষীদের তার জন্য ঈর্ষাতুর হয়ে অভিমান করা ঠিক হবে না। কারণ হিন্দীই হচ্ছে ভারত-ভাগ্যবিধাতার ঐক্যনিয়ামক বন্ধনরজ্জু; সেই হিন্দীকে সেবা করাই হচ্ছে ভারত-ঐক্য রক্ষার মূলমন্ত্র। উত্তরাপথের শৌরসেনীর বংশধরেরা মনে করছেন, ভারতের ঐক্যের জন্য হিন্দীভাষার ওপরে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তাতে অন্য প্রদেশের গায়ে কিঞ্চিৎ আঁচড় লাগলে ভারতের ইন্টিগ্রেশনের জন্য তা হাসিমুখে মেনে নেওয়া উচিত।

ইংরেজ বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ইংরেজীভাষা তাড়াবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছেন। 'অংরেজী হঠাও'—এ বুলি উত্তরাপথের উঁচু-নীচু সব মহলেই উচ্চরবে উচ্চারিত হচ্ছে। তাদের ধারণা হয়েছে, ইংরেজ শাসন যেমন পরশাসন বলে ঘৃণ্য ও পরিহর্তব্য, ইংরেজী ভাষাও তেমনি শত্রুর ভাষা বলে পরিহর্তব্য, এঁরা মেধাবৈগুণ্যে ইংরেজী ভাষাকে ঘৃণা করেন, কিন্তু ইংরেজী আদবকায়দার মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িকে সমাদর করেন। ওদেশের জীবনযাত্রা, আচারব্যবহার, খানাপিনা, পোষাক পরিচ্ছদে কদাচার ও কুক্রিয়াকে এঁরা মূঢ়ের মতো নকল করছেন, আপত্তি শুধু ইংরেজ ভাষার বেলায়। এখন উত্তরাপথের প্রধান শহর, আধাশহর, এমনকি গ্রামেও ইংরেজী কুর্তি-টুপি পাৎলুনের ছড়াছড়ি; মহামূর্খ বর্ণজ্ঞানহীন ব্যক্তিও শর্ট-সার্ট পটাবৃত হয়ে শোভমান হয়। দিল্লী মহানগরীর অভিজাত পাড়ায় ধুতি পরা ভদ্রলোক দুর্লভদর্শন হয়ে পড়েছে। হয়তো লণ্ডনের মতো দিল্লীতে ধুতিপাঞ্জাবীচাদরপরা ব্যক্তি দর্শকের কৌতুহল আকর্ষণ করবে।

এঁরা ইংরেজী ভাষার ঘোর শত্রু। কিন্তু আমরা কোন্ বিষয়ে ইংরেজের নকল না করছি? পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা, দীর্ঘসূত্রী ডেমোক্র্যাসী, পোর্টোকোলের তাসের দেশ, ককটেল পার্টিতে শ্রী ও শ্রীমতীদের যোগস্থাবস্থায় কার্পেটশয্যাগ্রহণ, জাগ্রতাবস্থায় টুইস্ট্ নাচের হুলাহুলি, ভুল ইংরেজীতে বাক্যালাপের আপ্রাণ চেষ্টা এবং সপ্তাহান্তে দ্রুতগামী স্কুটারের রাশ ধরে পশ্চাদবর্তিনীকে পিছনে বসিয়ে ওকলাভিমুখে উধাও হয়ে যাওয়া—এ তো আধুনিক ইন্দ্রপ্রস্থের অতি সাধারণ দৃশ্য।

যাঁরা ইংরেজীকে হালাল করবার জন্য বদ্ধপরিকর, তাঁরা কিন্তু নিজ নিজ বালবাচ্ছাদের ইংরেজী-মিডিয়মের স্কুলেই পড়াচ্ছেন। কলকাতা-দিল্লী-বোম্বাই-এর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরা ইংরেজ স্কুলের এমন ভক্ত হয়ে পড়েছেন যে, যে-কোন প্রকারেই হোক নিজেদের ছোট ছেলেমেয়েদের ঐ সব স্কুলে ভর্তি করাবেনই। বাচ্ছারা তো বোল ফুটবার সঙ্গে সঙ্গেই ড্যাডি, মামি বলতে শুরু করে। বিশেষজ্ঞরা জানেন, কলকাতা-দিল্লী-বোম্বাই প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শহরের ইংরেজী-মিডিয়মের স্কুলের সংখ্যা কত বেড়ে গেছে, তবু ছেলেমেয়ে ভর্তি করতে কত বেগ পেতে হয়। এর আসল উদ্দেশ্য সূক্ষ্ম চাতুরীপূর্ণ। আজ সমাজের যাঁরা পাঁচহাজারী মনসবদার, বা বৈশ্যকুলতিলক, তাঁরা চাইছেন,

নিম্নমধ্যবিত্ত, কেরাণী, স্কুলমাস্টার জাতীয় হীনপ্রভ জীবেরা বাংলা-হিন্দী-গুজরাটি পড়ে নীচের দিকে রুজিরোজগার করুক। কিন্তু ইংরেজী জানা মুষ্টিমেয় মহাপুরুষেরাই ওপরে বসে কৃপা বর্ষণ করবেন। তা নইলে প্রাদেশিক ভাষা যেখানে প্রদেশে কায়েম হয়েছে, রাষ্ট্রভাষার কলেবর দিন দিন শশিকলার মতো বাড়ছে, সেখানে ইংরেজী মিডিয়মের ফিরিঙ্গী স্কুলে ছেলে পড়াবার জন্য সরকারী চাকুরে থেকে ব্যবসায়ী পর্যন্ত এমন মরীয়া হয়ে উঠেছেন কেন? কেউ কেউ চাইছেন—দেশের সমাজব্যবস্থা মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাক। একদল বহু দর্শনী দিয়ে ইংরেজ স্কুলে লায়েক হয়ে কারখানায় ম্যানেজার হবেন, সওদাগরী অফিসের প্রধান অফিসবস্ হবেন, ডাক্তারী ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগেও তাঁদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকবে, বিদেশে যাবার সমস্ত সুযোগ তাঁদের সোনার চাঁদেরাই নিয়ে নেবেন—যেহেতু ইংরেজী বলা-কওয়াতে তাঁদের কিঞ্চিৎ এলেম আছে। আর একদল শুধু মাতৃভাষা শিখে সামান্য চাকরী, ইস্কুল মাস্টারী বা সওদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী হয়ে থাক না! সুতরাং সর্বসাধারণের স্তর থেকে 'অংরেজী হঠাও', কিন্তু শ্রেণীবিশেষের জন্য তা আরও বেশী করে চলুক। স্বাধীন ভারতে এর চেয়ে কঠোর জাতিভেদের ব্যবস্থা কল্পনা করা যায় না।

৩

কথা উঠেছে প্রদেশে আঞ্চলিক ভাষা সর্বস্তরে ব্যবহৃত হোক, আর সর্বভারতীয় ব্যাপারে হিন্দী হোক রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু যেকোন কারণেই হোক অধিকাংশ হিন্দীভাষীদের মনে উগ্র ধরণের ভাষাগৌরব-বোধ জেগেছে সে উগ্রতা এত বেশী যে অন্যভাষীরা তাতে শঙ্কিত হয়েছেন—হিন্দীপ্রেমীরাও কম শঙ্কিত হন নি। শেষোক্তরা দেখছেন যদি এখনও অশোভন দ্রুততার সঙ্গে অহিন্দীভাষীর ওপরে হিন্দীর জগদ্দলশিলাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে তার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন গড়ে উঠবে, তাতে হিন্দী ভাষাকে বেশ কিছুকালের জন্য ধামা চাপা দিয়ে রাখতে হবে। অতএব সাবধানী ও পরিপক্ক মাথারা বলছেন "ধীরে রজনী ধীরে।" তাই যাঁরা হিন্দীভাষাসমুদ্রের তিমিঙ্গিল, তাঁরা বলছেন, এরকম জোরজবরদস্তী করে হিন্দী চাপিওনা, বেশী টানাটানি করলে সুতো ছিঁড়ে যাবে। অতএব কৌশল অবলম্বন কর। পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় হিন্দীতে উত্তর দেওয়া চালু হোক, ইন্টারভিউ-এ বাতচিত ও পুছতাছ হিন্দীতে স্বীকৃত হোক, অহিন্দীভাষী অঞ্চলের বাল বাচ্ছাকে দুধে দাঁত থাকতেই হিন্দী বালবোধ ধরাও—আর কুরুচিপূর্ণ হিন্দী চলচ্চিত্র ও গ্রামোফোন রেডিওর কুৎসিত হিন্দী গান কষে চালাও। আধুনিক ছোকরাদের মগজে বিদ্যে এবং জঠরে অন্ন না থাকলেও হৃদয়ে মংব্বৎ আছে প্রচুর—তারাই হোক হিন্দী সংস্কৃতির বাহক। মানুষের মধ্যে যে রিপুপরবশ পশু ঝিমিয়ে আছে, তাকে হিন্দী ফিল্ম ও ফিল্মী গানের খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দাও, অচিরে হিন্দীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

নয়ন বিস্ফারিত না করেই বোঝা যে, আগামী কয়েক বছর ইংরেজীভাষা হিন্দীর সহযোগী ভাষা হিসেবে চলবে বটে, কিন্তু তারপর ক্রমে ক্রমে ইংরেজীর ব্যবহার সঙ্কুচিত হয়ে আসবে, তার পর একদিন সুপ্রভাতে শোনা যাবে ইংরেজী ভাষার অপঘাত মৃত্যু হয়েছে। তখন প্রদেশ এবং কেন্দ্রে একমাত্র হিন্দীর প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে, অবশ্য প্রাদেশিক ভাষারও কিছু বাড়বাড়ন্ত হবে, কিন্তু হিন্দীর গৌরব হবে সর্বাধিক। এরপর টেকনলজি, চিকিৎসাশাস্ত্র, অন্যান্য বিজ্ঞানশাখায় ইংরেজী

ভাষার ব্যবহার থাকলেও (কারণ ও বিষয়ে হিন্দী সাবালক হয়ে ওঠার বিলম্ব আছে), হিউম্যানিটিজ থেকে ইংরাজী সম্পূর্ণরূপে বিদায় নেবে। যারা হিন্দীকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করেন, তাঁরা অন্ত-কোন প্রদেশের ভাষাকে অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে শিক্ষা করবেন, কিন্তু তাতেও যুক্তির ফাঁক থাকবে। হিন্দী ভাষীরা যদি মারাঠী, গুজরাটি বা রাজস্থানী ভাষাকে বিশেষ শিক্ষনীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁদের মাতৃভাষার ভগিনীস্থানীয় উক্ত ভাষা শিখতে বিশেষ কোন ক্লেশ স্বীকার করার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু বাঙালী বা কেরলীকে যদি ভালোভাবে হিন্দীভাষা আরও করতে হয়, তবে তা হবে একটা বিশেষ ব্যায়ামপাথ্য ব্যাপার, বিশেষতঃ দক্ষিণীদের পক্ষে হিন্দীভাষা আয়ত্ত করা আর উত্তরাপথের আহার্য হজম করা প্রায় একই প্রকার দুঃসাধ্য। অপরদিকে অহিন্দী-ভাষীদের তুলনায় হিন্দীভাষীরা অনেক 'ওয়েটেজ' পাবেন, উপরন্তু সর্বভারতীয় চাকরী-বাকরী ক্ষেত্রে শুধু হিন্দীভাষার দৌলতে হিন্দীভাষীরাই বেশী সুযোগ পাবেন। যদি এমন ব্যবস্থাও বলবৎ হয় যে, অহিন্দীভাষীরা পাবলিক সার্ভিস প্রভৃতি নিখিল ভারতীয় পরীক্ষাদিতে হিন্দীর বদলে ইংরেজী ভাষায় উত্তর করতে পারেন তাতেও তাঁদের অসুবিধে পুরো দূর হবে না। কারণ হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা, তাঁদের চেয়ে যাঁরা ইংরেজীতে উত্তর করবেন তাঁদের আত্মপ্রকাশের কিছু বাধা ঘটবেই ; কারণ ইংরেজী তাঁদের মাতৃভাষা নয়। তখন স্বার্থের খাতিরে অহিন্দীভাষীরাও হিন্দী শিখবার জন্য উন্মুখ হবেন, তাতে হিন্দীপ্রচারকদের সুবিধেই হবে। অর্থাৎ এখন কিছু দিন ইংরেজী ভাষা অধিকন্তু ভাষা হয়ে কোনও প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করলেও, অচিরে এর প্রাধান্য ও প্রচলন রাষ্ট্রবিধাতাদের চক্রান্তে লোপ পেয়ে যাবে। কারণ হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা তাঁদের কারও কারও মধ্যে যেরূপ প্রধর্ষী উগ্রতা দেখা যাচ্ছে, তাতে তাঁদের মনে যে অপরভাষীদের প্রতি ঔদার্য সঞ্চারিত হবে, এমন আশা দুরাশা মাত্র। ইতিমধ্যেই তাঁদের কারও কারও কণ্ঠে 'মারো বাহাদুর, ধর বাহাদুর' জঙ্গীরব শোনা যাচ্ছে, তাতে অহিন্দীভাষীরা যদি হিন্দী ভাষার মরণ আলিঙ্গনকে ঠিক প্রেয়সীর গললগ্ন বাহুবন্ধন বলে মনে না করেন, তা হলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না, এবং সেরকম সন্দেহ প্রকাশ করলেই যাঁরা ভারতের ঐক্য ফুটিফাটা হয়ে গেল বলে জিগির তোলেন, তাঁদের স্বাদেশিকতায় স্বতই সন্দেহ জাগে। হিন্দীভাষীরা চার প্রদেশে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গাছেরও খাবেন তলারও কুড়োবেন—এই তাঁদের মনোগত অভিলাষ।

৪

এর প্রতিবিধান কি তাও চিন্তার বিষয়। যদি ইংরেজী ও হিন্দীকে সমান গুরুত্ব দেওয়া যায় তবে ভাষাগত মনোমালিন্য থেকে মাথা ভাঙাভাঙিকে কথঞ্চিত রোধ করা যায়। আগামী অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত অহিন্দীভাষীরা যদি ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা বলে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারের সুযোগ পান, তা হলে ভারতবর্ষ মেধা ও কর্মে বিশ্বপ্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ততটা পিছিয়ে পড়বে না। এখনও পর্যন্ত বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, প্রয়োগবিজ্ঞান ও কারুবিজ্ঞানে ইংরেজীভাষা বলবৎ আছে, এবং আরও বহুদিন থাকবে। জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে অবশ্য নিজ নিজ ভাষায় ইংরেজী ও অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় লেখা গ্রন্থাদি অনুবাদ করে নেওয়া হচ্ছে। অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় প্রায়শই জাপানের এই দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে জাপানের ভাষা সমস্যা এবং ভারতের ভাষা সমস্যার মধ্যে

আকাশ পাতাল প্রভেদ। সূচীমুখ সমস্যার উৎকট আক্রমণে analogy ও statistics—আধুনিক অস্ত্র দুটি অনেক সময়ে ভোঁতা হয়ে যায়। জাপানে বৌদ্ধ ভাষার সমারোহ নেই, একটি প্রাদেশিক ভাষাকে, কিছু সংখ্যাধিক্যের জোরে (তাও সংশয়াতীত নয়) ও ভারত ঐক্যের অজুহাতে অধিকতর গুণবান ভাষার মাথার ওপর বসিয়ে দেবার অপচেষ্টাও নেই। এইজন্য সেখানে বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদের দ্বারা দেশকে ও ভাষাকে উপকৃত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে বিজ্ঞান, কারুবিজ্ঞান, উপযোগবিজ্ঞান থেকে শুরু করে ইস্তিরি মেরামত পর্যন্ত সমস্ত বিদেশী গ্রন্থকে হিন্দীতে অনুবাদ করতে হবে। এর সঙ্গে যুক্ত হোক চিকিৎসা শাস্ত্র, পূর্তবিজ্ঞান এবং তথাকথিত হিউম্যানিটিজ-এর অসংখ্য বিদেশী গ্রন্থ। সরকারী ঢালাও সাহায্যে হিন্দীতেই না হয় অনুবাদকার্য শুরু হয়ে গেল। কিন্তু বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ব্যবহার, রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজনীতি—আরও হাজার হাজার গ্রন্থকে হিন্দীতে অনুবাদ করতে হলে যে পরিমাণে অর্থের শ্রাদ্ধ করতে হবে তার জন্য নতুন নতুন গৌরীসেনের সন্ধান করতে হবে, এবং সাগরপারের গৌরীসেনেরা ভারতের ভিক্ষের ঝুলিতে টাকাটা-সিকেটা ফেলে দেবার পূর্বে আমাদের নাকেবাঁধা দড়িটাকে আরও খাটো করে আনবে। কল্পনা করে নেওয়া গেল, কাল যখন নিরবধি, তখন কোন না কোন সময়ে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে সিঁধ দিয়ে হিন্দীর ভাণ্ডার ভরে তোলা হল অনুবাদের মারফতে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা ভাবলেই কেমন যেন রোমাঞ্চ হয়। তার পরে আছে আবার অন্য প্রাদেশিক ভাষা তস্য অনুবাদ।

এর সোজা উত্তর দেবেন হিন্দীভাষীরা, নানা প্রাদেশিক ভাষায় আবার অনুবাদ করে অর্থের অপচয় ও হাঙ্গামা বাড়ানো কেন? শুধু হিন্দীতে অনুবাদ করলেই চলবে। কেন না সকলকেই তো ভারত ঐক্যের জন্য হিন্দীভাষা শিখতেই হচ্ছে। অর্থাৎ হিন্দীর মতো অনগ্রসর ভাষাকে সরকারী বদান্যতায় জাতে তুলতে হবে, ইংরেজীর সমকক্ষ করতে হবে। পরাধীন ভারতে এবং এখনও ইংরেজী ভাষাতে যে ব্যাপক প্রচার হয়েছে, গৌরব স্বীকৃত হয়েছে, কিছুকালের মধ্যে হিন্দীকে সেই তুঙ্গস্থানে তুলতে হবে। এঁদের ইচ্ছা হিন্দী হোক সারা ভারতের রাষ্ট্রভাষা, সংস্কৃতির ভাষা, রুজিরোজগারের ভাষা, এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের সংযোগ ভাষা, সব প্রদেশেরই উচ্চশিক্ষার একমাত্র মিডিয়ম। সর্বভারতীয় ভাষা করবার জন্য না হয় হিন্দীতে অন্য প্রদেশের সাহিত্য ও ভাষা থেকে কিছু নেওয়া গেল। কালচার্ড হবার জন্য হয়তো হিন্দীভাষীরা কেরলের লোকসঙ্গীতকে হিন্দীভাষায় রূপান্তরিত করে নিলেন, কিংবা কবিগুরুর 'চণ্ডালিকা'র হিন্দীমুখোস পরিয়ে দিলেন। কিন্তু এভাবে জোড়াতালি দিয়ে কি ভাষাগত ঐক্য আসে? এতে ঐক্য আনা যায়না শুধু প্রতিরোধ বেড়ে যায়। ভারতবর্ষে ঐক্য আনার জন্য হিন্দীভাষার মুষল ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতমাতা জনতাব্যঞ্জন রাঁধবার জন্য যে কারীপাউডার বাবহার করবেন তাতে অন্য কোন স্বাদ থাক আর নাই থাক, কড়া মিরচাইয়ের অশ্রুঝরানো স্বাদটা আর সকলকে ছাপিয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নাই।

কেউ কেউ বলবেন—এই অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর। কিন্তু উত্তর স্বাধীনতা পর্বে নানা কারণে আমরা চারিত্রভ্রষ্ট হয়েছি; কোন মহৎ আদর্শের জন্য সর্বস্ব পণ করার মতো মনোবল

আমাদের কমে গেছে। ইংরেজ শাসনের মস্ত বড় অভিশাপ হচ্ছে এই চরিত্রহরণ। তারপর পার্লামেন্টে 'পাশববলের সংখ্যাধিক্যে'র জোরে যে-কোন প্রস্তাব কার্যকরী করার সুযোগ হিন্দীভাষীদের হস্তগত হয়েছে। সুতরাং যারা ভোট গুণে এবং জোট বেঁধে জীবনের দাম দেন না, বা বৈশ্যতন্ত্রের মাপকাঠির সাহায্যে সংস্কৃতিকে বিচার করে না, তাঁরা উপস্থিত ক্ষেত্রে কি করবেন? যাকে ভদ্রতা ও নাগরিকতা বলে, তাকে বজায় রাখতে হলে লড়নেওয়ালা হয়ে তাল ঠুকে মাঠে নামাও যখন সম্ভব হচ্ছে না, তখন কি করণীয়? মনে রাখতে হবে, হিন্দীভাষার সাহায্যেই উত্তরভারতীয় প্রাধান্য কায়েম হবার চেষ্টা করছে। ঐ অঞ্চলের মাতব্বরেরা জানেন. ইংরেজী ভাষা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ কর্মে ব্যবহৃত হলে সব প্রদেশের লোকই সমান সুবিধে বা অসুবিধে ভোগ করবে, ভাষাগত অতিরিক্ত সুবিধে সুযোগ বিশেষ কোন অঞ্চলই পাবে না। হিন্দীভাষা রাষ্ট্রভাষা না হলে উত্তরাপথের জনগণ কাজকর্ম, শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষাসংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করতে পারবে না। ইংরেজী যতদিন রাষ্ট্রভাষা ছিল, ততদিন হিন্দীভাষী অঞ্চল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্য প্রদেশের চেয়ে কোথাও তো অধিকতর অগ্রসর হতে পারেনি বরং কোন কোন প্রদেশের চেয়ে এই বিশাল অঞ্চল পিছিয়েই ছিল। যে-ভাষা কোন প্রদেশেরই মাতৃভাষা নয়, সেই ভাষা রাষ্ট্রভাষা হলে সমস্ত প্রদেশের লোকই নিজ নিজ সামর্থ্য ও বুদ্ধি অনুসারে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন, হয়তো পূর্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক গৌরব অধিকতর প্রাধান্য পাবে। তাই মনে হচ্ছে, উত্তরাপথের ভাষাগোষ্ঠীর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যই হিন্দীভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষা করার চেষ্টা চলছে, ভারত-ঐক্য কাজকর্মের সুবিধার কথা ধূর্ত রাজনীতিকদের চক্ষুলজ্জাহীন অছিলা মাত্র। একটু বুদ্ধিমান ব্যক্তি শর্করামণ্ডিত দিল্লীকা লাড্ডুর আসল স্বরূপটা বুঝতে পারবেন।

হিন্দীভাষার প্রাধান্যের ফলে মনে যে যে আশঙ্কা ও সন্দেহের উদয় হতে পারে তা বলা গেল। এখন সমুপস্থিত সর্বনাশকে এড়াতে হলে কি করণীয়? এ সম্বন্ধে সর্বাগ্রে মার্কামারা রাজনীতিকদের বর্জন করা উচিত, কারণ আমাদের মতো চারিত্রভ্রষ্ট দেশে রাজনীতি যে বদলোকের শেষ আশ্রয়স্থল, তা কে না জানে? জনস্মৃতি যতই দুর্বল ও উদাসীন হোক না, বাংলা বিহার মার্জার নীতিশ্ব পরিপোষক রাজনীতি-ওয়ালাদের কথা এত শীঘ্র ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। সারা বাংলাদেশকে বাঁধা দেওয়ার কতো আয়োজন করা হয়েছিল, জনগণ ধূর্ত রাজনীতিব্যবসায়ীদের সে ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল। এখন ভাষাসমস্যা সমাধানের জন্য সাহিত্যিক, শিল্পী, সমাজসেবী, শিক্ষাব্রতী—যাবতীয় বুদ্ধিজীবীদের এগিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলের কখনই সাহায্য পাওয়া যাবে না। বরং তাঁরা সর্বভারতীয় ঐক্যের ফতোয়া মাথায় বেঁধে উদ্দাম নৃত্যগীত জুড়ে দেবেন। তাঁরা সমাজ-সংস্কৃতির অতটা ধার ধারেন না, যতটা বোঝেন মাথাগুণতি ভোটের হিসেব। সুতরাং দেশের বড় সত্তা, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক সত্তা নিয়ে চিন্তা করেন, এ পর্যন্ত স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে একনায়কী বা একদেশী অপকর্ম থেকে জাতির মাননধর্মকে বাঁচাবার জন্য বার বার আত্মনিয়োগ করেছেন, সেই সমস্ত সারস্বতদেরই এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, কর্মপন্থা নির্দেশ করতে হবে। অবশ্য সেখানেও আশঙ্কা কম নেই। নানা-খেতাব খেলাতের

প্রলোভনে সরস্বতীর বরপুত্ররাও সাংস্কৃতিক স্বার্থ বিপন্ন করে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির মানসে নয়াদিল্লীর দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিচ্ছেন, একথাও বেদনার সঙ্গে স্বীকার্য। তাহলেও সারা দেশটা এখনও তো 'জোরোস্-আইল্যাণ্ডে' পরিণত হয়নি, মনুষ্যত্ব ও মহৎসংস্কৃতির প্রতি আস্থা লোপ পেয়ে যেতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে।

এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রাখা মূঢ়তা যে, হিন্দীভাষা সারাভারতে 'একমেবম্' হয়ে দেখা দিলে অন্যপ্রদেশের ভাষাগুলির অবস্থা ক্রমে ক্রমে দীন থেকে দীনতর হয়ে পড়বে। বাইরের দেশবিদেশ জানবে (এখনই তাদের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে), ভারতের একমাত্র ভাষা হল হিন্দী, আর সমস্ত প্রদেশে কিছু কিছু খুচরো *patois* আছে মাত্র। 'অংরেজী হঠাও' জিগীরের পেছনেই 'হিন্দীকে সব প্রদেশে সব কাজে লাগাও'—এই প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে বর্তমান হিন্দীভাষী অঞ্চলের হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, ইংরেজী হঠিয়ে সেখানে হিন্দীকেই অযৌক্তিকভাবে প্রধান করে তোলা হবে, এই সিদ্ধান্তের করোলারি হল— প্রাদেশিক ভাষা, প্রদেশের মধ্যে কোনও প্রকারে আত্মসঙ্কোচন করে থাকা। ইংরেজী বিদেশী ভাষা তাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা হলে আমাদের নাকি সামাজিক সত্তায় আঘাত লাগে, বিদেশের কাছে মুখ দেখানো ভার। কিন্তু ভাষা নিয়ে পরস্পরের মুখপোড়ানোর চেয়ে দীর্ঘকাল ইংরেজীকে সর্বকর্মে ব্যবহার করা মন্দের ভালো।

সর্বনাশ সমুৎপন্ন হলে পণ্ডিতে অর্ধেক স্বার্থ ত্যাগ করতে বলেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা সেই সঙ্গে ঐ অঞ্চলের সর্বপ্রকার স্বার্থ যখন সর্বনাশের আসনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন একটা সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। যে-অঞ্চল হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করতে চান, সে অধিকার তাঁদের আছে; যে অঞ্চল হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে নিতে চান না, তাঁদেরও সে অধিকার আছে। সুতরাং বিপদ এড়ানোর জন্য দু অঞ্চলে দুটো ভাষা ব্যবহৃত হোক—হিন্দী ও ইংরেজী। যে-কোন অঞ্চল, এর যে কোন একটিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করিতে পারবেন। পরে যদি অহিন্দীভাষী অঞ্চল স্বেচ্ছায় ইংরেজী ছেড়ে হিন্দীভাষার প্রেমে ডগমগ হতে চায়, তবে তখন সে সিদ্ধান্ত করা যাবে। তাই বলে যে অঞ্চল হিন্দীর প্রতিকূল, সেখানে ধীরে ধীরে সুকৌশলে হিন্দীর অহিফেন বটিকা সেবন করানোর চেষ্টাও ভারতভাগ্যবিধাতাদের উচিত হবে না। অদূরভবিষ্যতে হিন্দীর ছায়াতলে সমস্ত ভারতকে টেনে আনা হবে, দীর্ঘদিনের জন্য এ প্রস্তাব হিমকক্ষের তাকে তুলে রাখা উচিত। কেউ বলবেন, অনন্তকালের জন্য ইংরেজী চলবে নাকি? এসব ব্যাপারে অনন্তকালের অনাগত পথিকেরাই তার বিচার করবে, আমাদের অত বড়বড় কথা চিন্তা না করলেও চলে। মোটকথা হিন্দীর অতিপ্রাধান্যের ফলে ভাবগত যে খণ্ডপ্রলয়ের সৃষ্টি হবে তা এড়াতে গেলে এখনও বহুদিন ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা রাখতে হবে। জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রত্যেকের মনোযোগের জন্য ইংরেজীভাষার গুরুত্বের কথা স্কুলের বালকেও জানে, এখানে সেকথা না হয় নাই তুললাম। এতে যারা মনে করবেন, এতে জাতীয় 'ইন্টিগ্রেশন' নষ্ট হবে, তাঁদের বলে দেওয়া উচিত, ঘষে মেজে রূপ যদিও বাড়ে, ধরে বেঁধে 'প্রীতি' জাগানো যায় না। জোরজবরদস্তি বা কৌশলের দ্বারা সেরকম কোন কৃত্রিম বাঁধনে সব প্রদেশকে বাঁধতে গেলে চারিদিকে দড়িছেঁড়ার

হিড়িক আরম্ভ হয়ে যাবে, দক্ষযজ্ঞের আরম্ভ হতে বিলম্ব হবে না। যাদের জোর করে এক করা হয়, তারা জোর করেই একদিন পৃথক হয়ে যাবে—কবিগুরুর এই নিদারুণ নির্মম সত্যকথাটা নির্বাচন-প্রার্থীরা মনে রাখেন না, তাঁদের সেরকম মানসিক সামর্থ্যও নেই। কিন্তু যারা খোলামনে সব কথা ভাবেন এবং খোলাচোখে পথ চলেন, তাঁরা একথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, হিন্দীভাষীদের লোলুপতার দাপটে অহিন্দীভাষীরা শঙ্কিত হয়েছেন, এবং সে শঙ্কা ফাঁকা আদর্শের বুলি আর ভারত-ঐক্যের দোহাই দিয়ে দূর করা যাবে না। তবে যদি অহিন্দীভাষীরা কোনদিন প্রেমপ্রীতির বশে হিন্দীকে স্বেচ্ছায় বরণ করতে উৎসুক হন (ফাঁসীর গলরজ্জুকে যদি কখনও প্রিয়ার বাহুবন্ধন বলে মনে হয়), তবেই হিন্দী হবে সারা ভারতের রাষ্ট্রভাষা। অন্যথা হিন্দীর একগুঁয়েমি ও তালঠোকা পালোয়ানী মনোবৃত্তির ফলে, অন্য ভাষাগোষ্ঠীরা শিঙ বাঁকাবার অধিকার না পেলে দড়ি ছিঁড়বার জন্য মরীয়া হয়ে উঠবেই—গোষ্ঠীপতিরা যষ্টি হাতে তেড়ে এলেও কোন ফল হবে না। অহিন্দী অঞ্চলে সারা দেশ জুড়ে 'গ্যালপ পোলের' ব্যবস্থা করে তাদের মত নিতে হবে—হিন্দীসম্পর্কে তাঁদের অভিমত কি। আইনসভার জোহুকুম হাততোলাদের উর্ধ্ববাহু সম্মতি এ ক্ষেত্রে কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। ভাষাসমস্যা এক একটা অঞ্চলের জীবনমরণ সমস্যা, ভাবীকালে জাতিকে মৃত্যুঞ্জয় করে রাখার সমস্যা। এর জন্য যেমন জনসাধারণের সম্মতি চাই, তেমনই আবার বুদ্ধিজীবী, ও সংস্কৃতির ধারক-বাহকদেরও সুচিন্তিত অভিমত প্রয়োজন। আজকাল রাজনীতি যাদের পেশা, তাঁদের অনেকেরই সংস্কৃতি ও মনোধর্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা নেই। বুদ্ধিবিবেচনার দিক থেকে সাধারণশ্রেণীর ব্যক্তিরা গণতন্ত্রের ছাড়পত্রের সহযোগিতায় আইনসভা—লোকসভা আলো করে বসে আছেন, দেশের ভবিষ্যৎ, সংস্কৃতি, জাতি ইত্যাদি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে চিন্তিত হবার তাঁদের সময়ও নেই, মানসিক সামর্থ্যও নেই। সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবক, ভাষাতাত্ত্বিক —এঁদের মন্ত্রণাই আজ বেশী করে প্রয়োজন। যারা বিশেষ রাজনৈতিক দল-উপদলের পায়রার খোপে বন্দী নন, তাঁরাই খোলাচোখে সমস্যাটার যথার্থ চেহারা ধরতে পারবেন এবং তার যথোপযুক্ত দাওয়াই-এরও ব্যবস্থা করতে পারবেন। যারা পুনঃ পুনঃ ভারত ঐক্যের বুলি উচ্চারণ করতে চান, তাঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলে দোষ দেওয়া যায় না। জোর করে রোলায় চালিয়ে একাকার করা যায়, ঐক্য আনা যায় না। কোথাও বাঁধনের দ্বারা ঐক্য আনতে হয়, কোথায় বা বাঁধন শিথিল করে ঐক্য বজায় রাখতে হবে। মোটামুটিভাবে এই কথাগুলি পুনর্বিবেচনা করা উচিত:

(১) হিন্দীভাষীদের অশোভন ব্যবহার ও অন্যায় জিদ প্রকাশের জন্য অহিন্দীভাষীরা তাঁদের সদিচ্ছায় বিশেষ সন্দিহান এবং হিন্দীর মতো ঈষৎ অনগ্রসর ভাষাকে এতটা গৌরবের আসনে বসাতে অনেকেরই আপত্তি আছে।

(২) হিন্দীভাষীরা চাইলে তাঁদের অঞ্চলে হিন্দী সর্বকর্মের ভাষা হোক, অহিন্দীভাষীরা না চাইলে সেই অঞ্চলে ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা থাকুক। বিপদ এড়াবার জন্য দোভাষী হতে আপত্তি কি?

(৩) উচ্চতর, বিশেষতঃ বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা এখন কিছুদিন ইংরেজীতেই চলুক,

প্রাদেশিকভাষা ক্রমেক্রমে সর্বকর্মের উপযুক্ত হলে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তার নিয়োগ চলবে।

(৪) শিক্ষার সর্বস্তরের সহজ উপায়ে ইংরেজীভাষা শিখবার ব্যবস্থা থাকা চাই, ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণের যৎসামান্য জ্ঞান হলেই চলবে, কিন্তু নির্ভুলভাবে ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারা চাই।

(৫) হিন্দী শেখবার জন্য প্রলোভন বা জোরজবরদস্তি ত্যাগ করতে হবে। চাকরীর উন্নতি বা স্থায়িত্বের আশায় অনেককে হিন্দী শিখতে হচ্ছে "রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন।"

(৬) কোনও দিনই ইংরেজীভাষা ত্যাগ করলে চলবে না। ইংরেজী তুলে দেওয়া আর ঘরের আলোহাওয়া আসবার পথ বন্ধ করে দেওয়া একইরকম।

(৭) সব প্রদেশেই অপর প্রদেশের ভাষা শিখবার, অন্যের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ চাই। উত্তরাপথ দক্ষিণাপথের সাহিত্যসংস্কৃতির কতটুকু সংবাদ রাখে?

(৮) গোটাভারতকে অঙ্গুলিহেলনে চালাবো, হিন্দীভাষীদের এই দাম্ভিকতা ত্যাগ করতে হবে। কারণ হিন্দীর চেয়ে সাহিত্যগুণ, প্রকাশশক্তি এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের মাধ্যম হিসেব একাধিক উৎকৃষ্টতর ভাষা আছে, সংখ্যায়ও তারা খুব অবহেলার বস্তু নয়। হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষা করলে এ দেশ অচিরে আবার মধ্যযুগীয় কূপমণ্ডুকতায় ফিরে যাবে।

বুদ্ধিবিবেচনা, দূরদৃষ্টি, উদারতা বিসর্জন দিয়ে, অন্য প্রদেশের মনের দিকে না তাকিয়ে অর্থ, বল, বা সংখ্যাধিক্যর জোরে যারা অনিচ্ছুক অন্য প্রদেশের ওপর হিন্দী চাপিয়ে দিয়ে ধরে বেঁধে ঐক্য আনতে চাচ্ছেন—তাঁরা কবিগুরুর কয়েকছত্র মনে রাখলে উপকৃত হবেন :

অনেক তোমার টাকাকড়ি,
অনেক দড়া, অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী,
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে
হয়না যেটা সেটাও হবে॥

প্রস্তরে বনের স্বাক্ষর

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর জীবনের বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করলে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে তা হচ্ছে উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের নিকট সম্পর্ক। কবে ঠিক কোনকালে এবং কোথায় জীবনের প্রথম স্থুরু হয়েছিল একথা আজও যেমন সঠিকভাবে বলা সম্ভব হয়নি—ভবিষ্যতেও একথা বলা হয়তো অসম্ভব হবে—কিন্তু এ বক্তব্য আজ মোটামুটি স্বীকার্য্য যে প্রথম জীবনের সূত্রপাত সমুদ্রে এবং তা ভূতাত্ত্বিকদের প্রি-কেমব্রিয়ান যুগে।

যদি পৃথিবীর বয়স ধরা যায় ৩০০ কোটি বছর তবে এই যুগের বিস্তৃতি সেদিন থেকে যাট কোটি বছর আগে পর্যন্ত। এই বিরাট সময়ের পরিধিতে জীবনের ইতিহাস অত্যন্ত অস্পষ্ট। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রি-কেমব্রিয়ান শিলাস্তরের অনুসন্ধানে যে সামান্য সামান্য জীবনের ইংগিত পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যায় যে এ জীবনের রূপ সীমাবদ্ধ ছিলো সামুদ্রিক শ্যাওলা ও নরম দেহ-সর্বস্ব প্রাণীতে। ভারতবর্ষের অন্ধ্রপ্রদেশে অনন্তপুর অঞ্চলের কাডাপ্পা নামক শিলাস্তরের কিছু কিছু শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর পর কেম্‌ব্রিয়ান এবং অর্ডোভিসিয়ান যুগে অর্থাৎ যাট কোটি থেকে চুয়াল্লিশ কোটি বছরের মধ্যে এই ধরনের সামুদ্রিক উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে, রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই খাদ্যে পরিপুষ্ট হয়ে বিবর্তিত বিভিন্ন আকারের এবং প্রকৃতির মেরুদণ্ডহীন সামুদ্রিক প্রাণী। এর মধ্যে অন্যতম হল ট্রাইলোবাইট যার প্রায় এক হাজার রকমের প্রোথিত দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। তাছাড়া শাঁখ জাতীয়, শামুক জাতীয় জীবেরও সন্ধান মেলে। ভারতের স্পিতি এবং কাশ্মীর অঞ্চলে এই সময়ের শিলাতে প্রস্তরীভূত দেহাবশেষের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এই যুগের শেষের দিকেই মেরুদণ্ডওয়ালা মাছ জাতীয় জন্তুর আবির্ভাব হচ্ছে কিন্তু তাও সামুদ্রিক। এর কারণ পৃথিবীর মাটিতে কোন উদ্ভিদের জন্ম হয়নি,—যা খেয়ে প্রাণী বাঁচতে পারে। চুয়াল্লিশ কোটি থেকে চল্লিশ কোটি বছরের মধ্যে অর্থাৎ সাইলুরিয়ান যুগে প্রথম উদ্ভিদ সমুদ্র ছেড়ে মাটিতে পা দিল। এবং এর ঠিক পরেই কয়েক কোটি বছরের মধ্যেই বেশ কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণীরাও মাটিতে থাকার জন্য নিজেদের পোক্ত করে নিয়েছে।

ভারতবর্ষে উদ্ভিদজগতের রীতিমত সমাবেশ দেখা যাচ্ছে প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি বছর অর্থাৎ কারবোনিফেরাস যুগ থেকে।

তখনকার উদ্ভিদের আকৃতি আর প্রকৃতি বলার আগে উদ্ভিদদের শ্রেণীবিভাগ এবং তখনকার ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণের সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন আছে।

উদ্ভিদ জগৎকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(১) অপুষ্পক উদ্ভিদ, (২) সপুষ্পক উদ্ভিদ। অপুষ্পক উদ্ভিদ আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—ফার্ণ জাতীয় (ফিলিক্যালিস্) যাদের শেকড়, মূল এবং কাণ্ড থাকে, কিন্তু কোন বীজ হয় না। মস্‌জাতীয় (ব্রায়োফাইটা)

যাদের মূল এবং কাণ্ড থাকে কিন্তু শেকড় থাকে না। শৈবাল জাতীয় যাদের শেকড়, মূল, কাণ্ড পৃথকভাবে কিছুই থাকে না। এ ব্যতীত ছিলো আরো কয়েকটি শ্রেণী যাদের কোন প্রতীক আজকের পৃথিবীতে নেই। কিন্তু পুরোনো পৃথিবীর মাটিতে কখন কখন অসংখ্য রূপ নিয়ে প্রতিভাত ছিলো। সপুষ্পক উদ্ভিদকে দুটি বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—গুপ্তবীজী এবং ব্যক্তবীজী। গুপ্তবীজীর অন্তর্গত গাছেদের বীজ লুকিয়ে থাকে ফলের মধ্যে, যেমন আঁটি আমের মধ্যে আর ব্যক্তবীজী—যাদের বীজ ব্যক্ত, যেমন পাইন বা ফার গাছের।

অধুনা উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে—গাছের খাবার আদান-প্রদানের বন্দোবস্ত অনুযায়ী যথা—

1. Now Vascular Plants : (Without organized conducting tissues)

Bacteria, slime, Fungus, Algae and, Mosses (Bryophyta).

II. Vasular Plants : (with highly orgnized conducting tissues). Psilophytes: extinct, Lyco podiales : mostly extinct, Equisetums : mostly extinct, Ferns : mostly extinct, Seed Ferns (pterido spermae) : extinct, gymuosperms, Augiosperms ইত্যাদি।

পঁয়ত্রিশ কোটি বছরের পুরোনো ভারতবর্ষের আকৃতি, ব্যাপ্তি এবং জলবায়ুর চেহারা স্বভাবতঃই আজকের মতো ছিল না। যদিও এ বিষয়ে মতদ্বৈধের শেষ নেই, তবু মোটামুটি একথা প্রমাণিত যে আজকের ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, মালয় দ্বীপপুঞ্জ এবং এ্যান্টারটিকা সেই যুগে একই দেশের অংগীভূত ছিল অথবা এই এই দেশগুলির যোগাযোগ ছিল ভাঙ্গাজমির সেতুতে। আমরা বিশ্বাস করি যে কোন বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ অথবা জীব একই সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বিবর্তিত হয় না, বরং এক বিশেষ স্থানে বিবর্তিত হয়ে প্রসারিত হয় বিভিন্ন স্থানে। এই ছয়টি দেশপুঞ্জের কারবোনিফেরাস যুগের পলি থেকে প্রাপ্ত জীবের এবং উদ্ভিদের প্রকরণের মিলের প্রাচুর্য দেখে আমরা মানতে বাধ্য যে বিভিন্ন জীবজন্তু এবং গাছপালা বিবর্তিত হয়ে এই প্রকাণ্ড দেশগুলিতে অবাধ প্রসারনের সুযোগ পেয়েছিল, হয় তাদের সান্নিধ্যের হেতু অথবা ভাঙ্গাজমির সেতুর সংযোগের মাধ্যমে এই সংযুক্ত বিরাট পরিধির দেশের নাম দেওয়া হয়েছে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। এই বিশেষ দেশে পঁয়ত্রিশ কোটি বছর আগেকার গাছপালা সৃষ্টি হবার আগেই এখানে একটা শীতল জলবায়ুর সৃষ্টি হয়, কোন কারণে হিমবাহ নেমে আসে বিভিন্ন পর্বতশ্রেণী থেকে উপত্যকা অঞ্চলে। ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে যে হিমবাহ নেমে ছিল তখনকার সুউচ্চ আজকের মালভূমি রাজপুতানার আরাবল্লী অঞ্চল থেকে উত্তরমুখী হয়ে, আর পূর্বঘাট থেকে পশ্চিমএবং উত্তর পশ্চিমমুখী হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে, উড়িষ্যায় এবং দামোদর উপত্যকার দিকে। এই গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের উত্তরে আজকের হিমালয় আর তিব্বতের স্থানে তখন ছিল বিরাট সমুদ্র যার নাম দেওয়া হয়েছে তেথিস্। এই তেথিস্ সমুদ্র সেদিনের উত্তরের মহাদেশগুলিকে দক্ষিণের ভারত আফ্রিকা ইত্যাদি দেশপুঞ্জগুলো থেকে পৃথক করে রেখেছিল। এবং তাই এই দুই দেশের মধ্যে স্থলচর জীবজন্তুর বা উদ্ভিদদের আদান প্রদান প্রায় সম্ভবই হয়নি। কয়েককোটি বছর ধরে

এই অতিশীতল জলবায়ুর প্রভাব চলতে থাকে এবং তার পরে দেখা দেয় নাতিশীতোষ্ণতা, আর যার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ এবং জীবগতের নতুন রূপান্তর গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডে, এই সময় অর্থাৎ প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি বছর থেকে বার কোটি অর্থাৎ ক্রিটেশাস্ যুগ পর্যন্ত গাণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের স্থিতি এবং জলবায়ু মোটামুটি অপরিবর্তনীয় অবস্থায় দেখা যায়। মাঝে একটিবার জলবায়ু ভীষণ শুষ্ক হয়ে এসেছিল। কিন্তু তা এই বিরাট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় উপেক্ষণীয়। আজকে ভারতবর্ষে যে বিরাট কয়লার সম্ভার ছড়িয়ে আছে সর্বত্র (অনুমিত সত্তর হাজার মিলিয়ন টনেরও উর্দ্ধে) তার অধিকাংশের স্রষ্টা সেই যুগের বিস্তীর্ণ বনমালা। এই বনের বিস্তৃতি কতখানি ছিল তা বলা মুস্কিল। কারণ গণ্ডোয়ানার প্রস্তরীভূত শিলা থেকে এবং কয়লা থেকে প্রাপ্ত ফসিল শ্রেণী থেকে বোঝা যায় যে এই সমস্ত গাছপাতা পলিতে স্থিতি হওয়ার আগে বেশ কিছু দূর থেকে হয়ত নদীর বন্যার জলে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। দ্বিতীয়তঃ এই সময়ের প্রস্তরের উপর কোন কোন জায়গায় অন্য অন্য পরবর্তী যুগের পলি বা আগ্নেয় উদ্গিরীত লাভাজাত শিলাচাপা ফেলে তাকে আমাদের

রাণীগঞ্জ কয়লা খনি অঞ্চলে প্রাপ্ত পারমিয়ান এজ-এর একটি প্রস্তরীভূত গাছের গুঁড়ি ডাডোক্সিলন (কলিকাতা যাদুঘর)

থেকে লুকিয়ে রেখেছে। যেমন গাঙ্গেয় উপত্যকার পলিমাটীর তলায় কয়লার বা গাণ্ডোয়ানার প্রস্তর চাপা আছে কিনা তা এখনও প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হয়নি। তেমনি দাক্ষিণাত্যের বিস্তৃত আগ্নেয়শিলার তলার রহস্য আমাদের এখনও জানা নেই। তবে এই যুগের বন যে মাদ্রাজ,

অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবাংলা, বিহার এবং সিকিমে বিস্তৃত ছিল একথা স্পষ্ট। এই বনমালার রূপ স্বভাবতঃই পাল্টেছে কারবোনিফেরাস্ যুগ থেকে ক্রিটেশাস্ যুগের মধ্যের সময়ে এবং সেই পরিবর্তনের জন্য গাণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের সমস্ত এলাকার জীবজন্তু, উদ্ভিদের বিবর্তন, প্রসারণ ইত্যাদি অনেকাংশে দায়ী।

এই পঁচিশ কোটি বছরকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করব, সে বনমালার প্রকৃতিকে এবং গাছপালার রূপকে বিচার করার জন্য। প্রথমটি পঁয়ত্রিশ কোটি থেকে বাইশ কোটি বছর পর্যন্ত আর অপর বিভাগটি, বাইশ থেকে দশ কোটি বছর পর্যন্ত।

প্রথম ভাগের সুরুতে দেখি যে তখনকার উদ্ভিদজগতের নিদর্শন শেকড় মূল, কাণ্ড, পাতা এবং বীজের সমারোহ। এই সমস্ত বনের মধ্যে আছে একশ ফুট লম্বা গাছ আকাশগামিনী হয়ে। তার তলায় আছে মাঝারি এবং জংগলের মাটিতে ছোট গাছ, শ্যাওলা এবং মস্। যে গাছের সব থেকে বেশী প্রাচুর্ভাব সেদিন ছিল তা হচ্ছে ফার্নজাতীয়। কিন্তু বীজবহনকারী বলে ফার্ণের থেকে সপুষ্পক গাছের সদৃশ 'টেরিডোস্পার্মি, তাদের কাণ্ডের মধ্যে শেকড় দিয়ে আহরণ করা পানীয়ের গতায়তের জন্য আধুনিক গাছের সদৃশ কোষের প্রাচুর্য। যে সমস্ত পাতার কাণ্ডের বা গাছের প্রস্তরীভূত অবশেষ পাওয়া গেছে তা হল :—

Pteridospermeae (seed ferns) : Glossopteris indica, Glossopteris communis, Glossopteris decipiens, Glossopteris longicaulis, Glossopteris ampla, Glossopteris retifera, Glossopteris browniana, Glossopteris stricta, Glosspteris tortuosa, Glossopteris formosa, Glossopteris divergens, Glossopteris conspicua, Gangamopteris whittiana, Gangamopteris angustifolia, Gangamopteris kashmirensis, Gondwanidium validum Sphenopteris polymorpha, etc.

Equisetales : Schizoneura spp, S. gondwanensis, Phyllothe a greisbachi and P. indica.

Cordaitales : Noegerrathiopsis hislopi, N. whittina, Dadoxylon indicum.

Coniferales : Buriadia sewardi, Moranocladus oldhami.

Ginkgoales : Psygmophyllum haydeni, Rhipidopsis ginkgoides.

Cycadophyta : Taeniopteris danedoides.

এই পর্বের শেষের দিকে বেশীর ভাগ বনই আবহাওয়া শুষ্ক হওয়ার জন্য, লুপ্ত হয়ে যায় এবং কয়েক কোটি বছর পর আবার যখন আবহাওয়া আর্দ্র হতে থাকে তখন নতুন ধরনের গাছপালা বনপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। এই বনমালার সময়ের পরিধিতে, অবস্থান ছিল আজ হতে বাইশ কোটি থেকে দশকোটি বছরের মধ্যে।

এই সময়ে যে গাছের প্রাধান্য তা হচ্ছে 'সাইক্যাডোফাইটা' এবং 'ফিলিক্যালিস্' তা ছাড়া 'কনিফেরালিস্' এবং কিছু অন্যান্য গাছের যথা—'জিম্নোস্পারম্'-এর প্রাচুর্ভাব হতে শুরু করেছে। যে সমস্ত ফসিল পাওয়া গেছে তাদের কিছুকিছুর নাম দেওয়া হল নীচে।

I. Glossopteris decipiens

2. Glossopteris indica
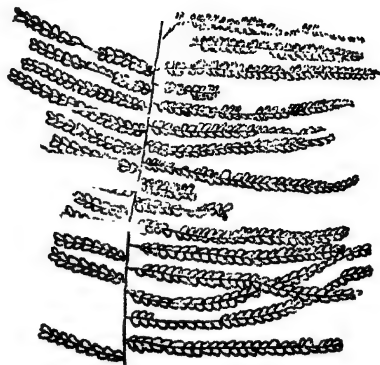
3. Gleichenites gleichenoides
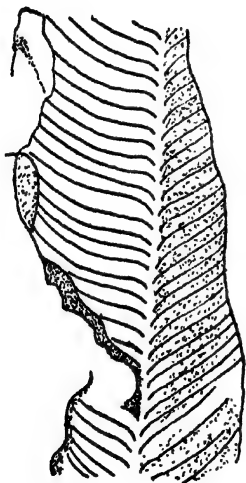
4. Ptillophyllum acutifolium

5. Otozamites bengalensis

6. Williamsonia sewardiana

Plant Fossils (after krishnan)

Cycadophyta : Ptylophyllum acutifolium, P. cutchense, Dictyozamites falcatus, D. indicus, Taeniopteris lata, T. spatulata, Nilsonnia (pterophyllum) princeps, N. fissa, N. orientalis, Willomsonia blanfordi' Otozamites bangalensis etc.

Filicales : Marattiopsis macrocarpa, Gleichonites gleichonoides, Sphenopteris hislopi, Pecopteris lobata etc.

Coniferales : Elatocladus conferta, E. jabalpurensis, E. plana, Retinosporites (Palissya) indica, Araucarites cutchensis, A. macropterus.

Gymnospermous stems & cones : Nipanioxylon guptai, Pentoxylon sahnii, etc.

Ginkgoales : Ginkgoites lobata, Ginkgo crassipes.

একই পর্বে, এই সমস্ত বনঅঞ্চলে ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপের প্রাদুর্ভাব চমকপ্রদ। বিশেষ করে মধ্যভারতে, জব্বলপুরে তাদের সমাধিস্থ অস্থির প্রমাণ পাওয়া গেছে। সরীসৃপসমুদয় বিভিন্ন আকৃতির ছিল তবে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ টন ওজনের জীবও ছিল তার প্রমাণ আছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে সরীসৃপগুলির ডিমের আকৃতি ছিল মাত্র ৮″—১০″ ইঞ্চি এবং পঞ্চাশটন ওজত হতে যে পরিমাণ উদ্ভিদ তাই খাবার প্রয়োজন ছিল এবং একথা বলা সম্ভব যে তারা নিশ্চয়ই ঘন বনে বসতি করত।

অতএব এখন অনুমান করা যেতে পারে যে গণ্ডোয়ানার আমলে ভারতে বনের বিস্তৃতি ছিল পশ্চিমে রাজপুতনা কচ্ছ, কাথিওয়ার, সেণ্ট রেঞ্চ, হাজারা অঞ্চলে, পূর্বে দামোদর, রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, উড়িষ্যা অঞ্চলে, মহানদী উপত্যকা ধরে এবং মধ্যভারতে নাগপুর, জব্বলপুর অঞ্চলে। তখনকার গাছের এবং পাতার ফসিল থেকে ধারণা করা হয়ে থাকে যে এই সমস্ত বন আর্দ্র এবং ঘন ছিল।

গণ্ডোয়ানা পর্বের সঙ্গেই প্রথম দেখা গেল সপুষ্পক গুপ্তজীবী বৃক্ষসমুদয়, যার লক্ষ লক্ষ রূপ আজকের বনে বনান্তরে, তা প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে—কিন্তু স্বভাবতঃই পরিপূর্ণ রূপ পায়নি তখনও।

গণ্ডোয়ানা পলিসৃষ্টির আস্তে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডে লেগে যায় তুলকালাম। উত্তরের তেথিস্ সমুদ্র হঠাৎ মথিত হয়ে বিপর্যয় আনে। পলির ঢেউয়ের ওপর ঢেউ তুলে সৃষ্টি করতে থাকে আজকের হিমালয়। একটা বিরাট টানা পোড়নে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হতে থাকে—অ্যাণ্টার্টিকা, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ক্রমাগত নিজের নিজের থেকে দূরে সরতে থাকে আর ভারতের দাক্ষিণাত্যে প্রচণ্ড গরম আগ্নেয় লাভার উদ্গীরণের সুরু হয়। এই প্রচণ্ড মন্থন উদ্গীরণ ঠিক কতদিন ধরে চলেছিল তা আজ বলা মুস্কিল তবে অনুমান যে তা বেশ কয়েককোটি বছর ধরে। লাভার উদ্গীরণ যে কত হয়েছিল তা বোঝা যাবে যদি বলা যায় যে এখনও ভারতবর্ষে প্রায় দু'লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে এই লাভার শিলা কোন কোন জায়গায় দশহাজার ফুট গভীর। এই বিশাল

পরিবর্তনের মাঝে পড়ে ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপ যেমন নিঃশ্চিহ্ন হয়ে গেল চিরকালের জন্য তাদের অস্থির প্রমাণ রেখে, তেমনি উদ্ভিদ জগতের সাইক্যাড্-এর বেশীর ভাগ শ্রেণী লুপ্ত হল এই নতুন পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ না খাওয়াতে পেরে। কিন্তু এর জায়গায় দেখা দিল স্বল্প প্রকাশিত সপুষ্পক গুপ্তজীবী বৃক্ষসমূহ। উদ্ভিদজগতের ইতিহাসে তেথিসের সমুদ্র মন্থন এই সময় থেকে শুরু হয় কিন্তু তা চল্‌তে থাকে মাঝে মাঝে এবং সেই টানাপোড়নের আজও শেষ হয়নি। আজকে অবলুপ্ত, কিন্তু এখনও হিমালয়ের নড়াচড়া একটু একটু করে চলছে। সমুদ্রমথিত হিমালয় উঠার পর আসাম থেকে কাশ্মীর অঞ্চল পর্যন্ত একটা নীচু খাদের অথবা নদীর সৃষ্টি হয়েছিল যা আজ থেকে মাত্র এক কোটি বছর পূর্বে প্রথম উচু হয়ে ওঠার সুযোগ পায়—অনেকের মতে দাক্ষিণাত্য ধীরে ধীরে হিমালয়ের দিকে সরে আসার কারণে। যাই হোক এই শেষ ওঠা পলি যা স্তরীভূত হয়ে পাহাড়ের জন্ম দিয়েছে তা এখন হিমালয়ের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত—আর যাকে বলা হয় সিওয়ালিক।

এই পর্বের অর্থাৎ সাত-আট কোটি বছর থেকে দশ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত উদ্ভিদের ইতিহাস প্রধানতঃ গুপ্তবীজী সপুষ্পক উদ্ভিদের বিবর্তনের ইতিহাস। আর একই সময়ে স্তন্যপায়ী জন্তুর বিভিন্নতা বোধকরি চরমভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে এই সময়কার উদ্ভিদের ফসিল শ্রেণীর সম্পর্কে যথেষ্ট অনুসন্ধান আজও করা হয়নি। তাই আমাদের জ্ঞান অত্যল্প। আর তা ছাড়া হিমালয়ের দিকটা বাদ দিলে সেদিনের ভারতবর্ষ প্রায় আজকের ভৌগোলিক রূপ নেওয়ার দরুণ তখনকার পলির শিলারও অভাব আছে। দাক্ষিণাত্যের এই সময়ের শিলা পাওয়া গেছে ত্রিবাঙ্কুর, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অঞ্চলে। পূর্বদিকে দুর্গাপুর অঞ্চল থেকে, অসংলগ্নভাবে পূর্বঘাট ধরে ভারতের প্রায় দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত উড়িষ্যা মাদ্রাজ দিয়ে।

এই পর্বে ব্যক্তবীজী গাছের মধ্যে 'কনিফেরালিস্' যা আগের পর্বে যথেষ্ট বিস্তৃত তার মাত্র একটি রূপ দেখা যায় দাক্ষিণাত্যে 'পোডোকারপাস্ ল্যাটিফোলিয়া' সদৃশ একটি স্পীষিযের। আজও দাক্ষিণাত্যে এই গাছের সমরূপী 'পোডোকারপাস্ নেরিফোলিয়া' পাওয়া যায়। তাছাড়া উত্তর ভারতের হিমালয়ে এখন এই শ্রেণীর অনেক রূপ বর্তমান—যেমন পাইন দেওদার ফার ইত্যাদি।

মাদুরা অঞ্চল থেকে পণ্ডিচেরী পর্যন্ত এবং পশ্চিমে গোদাবরী উপত্যকা এবং উড়িষ্যার মহানদী পর্যন্ত এই সময় ঘন বনের হদিস পাওয়া গেছে। পণ্ডীচেরীর নিকটে নেইভেলীতে অধুনা আবিষ্কৃত প্রায় দু'শ কোটি টনের lignite এর স্তর থেকে বোঝা যায় সেদিনের বনমালার বিস্তীর্ণতা। এর ধারে কাছে 'পিউসি সিমিডিয়ানা' নামক এক গুপ্তবীজী সপুষ্পক গাছের, ৬০।৭০ ফুট লম্বা পর্যন্ত এবং ৩।৫ ফুট গোলাইয়ের গুঁড়ি বেশ কিছু উদ্ধার করা হয়েছে। তাছাড়া পাওয়া গেছে শিরিষ আম শাল, হরিতকী ধরনের গাছের প্রমাণ।

আর একটু উত্তরে এসে দুর্গাপুর অঞ্চলে আর আসামেও 'ডিপটেরোকারপোক্সাইলন' 'ম্লুটাক্সাইলন', 'সাইনোমেট্রোক্সাইলন' ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে, যাতে করে বোঝা যায় এ অঞ্চল-গুলোও ছিল বন এলাকার মধ্যে। পশ্চিমে এগোলে রাজস্থান পর্যন্ত নাগকেশর, মেহুয়া,

গারিসিনিয়া, ক্যালোফিলাস (অন্যতম লোহাকাঠ) ইত্যাদি গাছের মতন পাতার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। এই সমস্ত গাছ জন্মায় বৃষ্টিপাত উপদ্রুত অঞ্চলে। তার থেকে বোঝা যায় যে আজকের বাংলা, উড়িষ্যায় আবহাওয়ার হয়তো খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু ভারতের পশ্চিমে সেদিন ছিল ক্রান্তীয় আবহাওয়া। উত্তর-পশ্চিমের পাঞ্চাল-কাশ্মীরের কসৌলি অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত গাছ-গাছড়াও প্রমাণ করে যে তারাও ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যেই পড়ে। অর্থাৎ একথা মোটামুটি স্পষ্ট হয় যে এই পর্বের ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় আবাহাওয়া সেদিন আসাম থেকে প্রায় কাশ্মীর অঞ্চল পর্যন্ত আবার দক্ষিণে রামেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত। শুধু তাই নয় রাজপুতনার মরুভূমি আজকের বালির হলুদের বদলে সেদিন ছিল গাছ জংগলে শ্যামল।

এই পর্বের শেষের দিকে স্তন্যপায়ী জন্তু যে কি বিচিত্র রূপ পেয়েছিল তা মুগ্ধ করে। যেমন হাতীই ছিল প্রায় চার পাঁচ রকমের, গণ্ডার ছিল দু-তিন রকমের, ঘোড়া দু-তিন রকমের, জলহস্তী, জিরাফ চার রকমের, গরু পাঁচ-ছ রকমের, সাত-আট রকমের শূয়ার আরও কত কি। আর এই বিরাট জন্তুশ্রেণীর খাদ্য ও বাসস্থান ছিল তখনকার জংগল। অতএব সে জংগলের আয়তন সহজেই অনুমেয়।

এই সময়ের পরেই স্নরু হয় আবার এক আবহাওয়া পরিবর্তনের পালা। হঠাৎ পৃথিবীতে বারেবারে ঠাণ্ডার আমেজ আসতে শুরু করে। হিমবাহ নামতে থাকে উত্তর থেকে সিওয়ালিক পাহাড় পেরিয়ে। এই পাহাড়ে বাস করা জীবজন্তু পালিয়ে বাঁচতে পারেনি, মারা পড়েছে সেদিন। আর গাছের প্রাণ অনেক মজবুত বলে তারা নীচে গরমের দিকে নেমে এসে আজও সমগোত্রীয় গাছপালার মধ্য দিয়ে দেখা দেয় বনে বনে সামান্য রূপ পরিবর্তন করে। এই সময়ের গাছের সব থেকে ভাল অনুসন্ধান হয়েছে কাশ্মীর অঞ্চলে। সেখানে পাওয়া গেছে আজকের ওক, লরেল, পাইন, দেওদার জাতীয় এবং ডুমুর জাতীয় গাছের চিহ্ন। তবে ভারতের অন্যান্য জায়গায় এ সম্পর্কে যথেষ্ট অনুসন্ধান হয়নি বলে তথ্য সন্নিবদ্ধ করা মুস্কিল। এই পর্বেই এসেছে আজকের মানুষদের পূর্বপুরুষ। সে আজ থেকে প্রায় দশলক্ষ বছর আগেকার কথা। কিন্তু তা ভূতাত্ত্বিকদের তথ্য সংগ্রহের আওতার বাইরে। ভারতের শিলাশ্রেণীতে প্রাপ্ত ফসিল বহন করছে আজকার উদ্ভিদ-প্রাণীজগতের রহস্য। কেম্‌ব্রিয়ান যুগের সামুদ্রিক শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ ধীরে ধীরে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের মধ্যে দিয়ে আজ সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদে বিবর্তন করেছে। কেম্‌ব্রিয়ান-এর বিস্তীর্ণ বনমালা আবাহাওয়া-জলবায়ুর পরিবর্তনের সংগে সংগে কত বিচিত্র রূপ নিয়ে আজকের ভারতের বনভূমির রূপে এসে দাঁড়িয়েছে। আরও যত বেশী তথ্য সংগ্রহ হবে, ভারতের বনের দূর পশ্চাতের ইতিহাস খুলবে পদ্মের পাঁপড়ির মত সুন্দর আর বিচিত্র হয়ে।

রামমোহনের ফার্সী পত্রিকা ঃ 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার'

অমিয়কুমার মজুমদার

রামমোহনকে আধুনিক প্রাচ্যের প্রথম জাগ্রত মানুষ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। জ্ঞানবাদ, যুক্তি, প্রয়োগবিজ্ঞান, প্রত্যভিজ্ঞামূলক আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি আধুনিক পূর্বহেতুকে অবলম্বন করে তিনি অভ্যর্থনা করেছিলেন নবজীবনকে। তিনি বহু কীর্ত্তির অধিকারী। তারমধ্যে অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র প্রকাশ। ফার্সী ভাষায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের গৌরব রামমোহনের। বহুগুনসম্পন্ন, রাজা রামমোহনের সাংবাদিক সত্তা সাধারণের কাছে প্রায় অজ্ঞাত হয়ে আছে। অথচ অনেকেই হয়ত জানি না—যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাকে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অশেষ মঙ্গলের কারণ বলে স্বীকার করেন, তার জন্য লর্ড মেটকাফের মত রাজা রামমোহনের নিকট আমাদের সমান ঋণ। এ ঋণ সমগ্র জাতির। ফার্সী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে রামমোহনের তত্ত্বাবধানে আরও একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো—তা হলো 'সম্বাদ কৌমুদী'।

ফার্সী পত্রিকাটির নাম 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' (বা 'সংবাদ-দর্পণ')। কলকাতার ধর্মতলা থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এটি ছিল সাপ্তাহিক। শুক্রবার বের হতো। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১২ই এপ্রিল, ১৮২২ ; বাংলা ১২২৯ সালের ১লা বৈশাখ, শুক্রবার।

রামমোহনের কালে আমাদের দেশের খুব কম সংখ্যক মানুষ ইংরেজী পড়তে জানতেন, প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাও সাংবাদিকতার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। ফলে, বৃটিশ শাসিত ভারতেও ফার্সী ভাষা বিদগ্ধ ভারতীয় সমাজে, কূটনৈতিক পত্ররচনায়, আদালতের কাজে এবং অন্যান্য সরকারী রিপোর্ট রচনার ক্ষেত্রে বাহন হয়ে ছিল। ফার্সীর এই গৌরব কাল চলেছে প্রায় ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত। সেসময়ে ভারতের এক বিরাট অংশ যদিও উর্দ্দু জানতেন, কিন্তু তা ছিল কথাবার্তার মাধ্যম মাত্র, লেখার সময়ে এর ব্যবহার হতো খুব কম, হয়তো একারণেই সাংবাদিকতার কাজে উর্দ্দুর প্রচলন ছিল না। এ কারণেই পাঠকদের একাংশ যারা সংবাদপত্রের জন্য পয়সা খরচ করতে দ্বিধাগ্রস্ত নন, তাঁরা ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের জন্য উদ্‌গ্রীব হবে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' প্রকাশের আগে ১৮২২ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে কলকাতা থেকে 'জাম্-ই-জাহান্-নুমা' (Jam-i-Jahan-Numa) শীর্ষক একটি হিন্দুস্তানী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার অষ্টম সংখ্যা থেকে (১৬ই মে, ১৮২২) হিন্দুস্তানী এবং ফার্সী উভয় ভাষায় সংবাদ ছাপা হতো। ১

কয়েকমাস পরে, অবশ্যই ১৮২৩ সালের ফেব্রুয়ারীর পূর্বে এটি কেবলমাত্র ফার্সী ভাষায় মুদ্রিত হতো।

'জাম্-ই-জাহান্-নুমা' পত্রিকা প্রকাশের পক্ষকালের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করলো 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার'। 'মীরাৎ' প্রকাশিত হবার মাস খানেক আগে ৪নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটের

(কলিকাতা) লক্ষ্মীনারায়ণ বসাক জনসাধারণের কাছে এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানিয়েছিলেন যে 'এমূল-উখ্‌বার' (Emmul-Ukhbar) নামে একটি ফার্সী পত্রিকা তিনি বের করবেন। ২

দুঃখের বিষয় এই পত্রিকা কখনোই প্রকাশিত হয় নি। তাই রামমোহন প্রবর্তিত 'মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার' এদেশে সর্বপ্রথম ফার্সী পত্রিকা ৩ বলে মনে হয়। পত্রিকা প্রকাশের সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক জানিয়েছেন, 'সম্পাদক জনসাধারণকে জানাচ্ছেন যে, পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য এই শহরে অনেক সংবাদ পত্রের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু যারা ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত অথচ ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ—বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা তাঁদের পাঠের জন্য একখানা ফার্সী সংবাদপত্রও নেই ; একারণে তিনি একখানা সাপ্তাহিক ফার্সী সংবাদ পত্রের ভার নিয়েছেন।'

'ক্যালকাটা জার্নাল' তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'দেশীয় সংবাদপত্র' (নেটিভ নিউজ পেপারস্‌) শিরোনামায় 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বারের, আবির্ভাবকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সম্পাদক লিখেছেন, '...of all the Papers which have yet appeared in the Native languages none has created a more favourable impression on our mind than the MIRAT-OOL-UKHBAR ; and being coufilant that many of our readers will derive as much gratification from the Prospectus as we have done,...The Editor, we are informed, is a Brahmin of high rank, a man of liberal sentiments. and by no means deficient in loyalty, well versed in the Persian language, and possessing a Competent knowledge of English ; intelligent with a considerable share of general information and an insatiable thirst after knowledge..." ৪

ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক সিল্ক বাকিংহাম প্রাচ্যদেশীয় কয়েকটি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। রাজা রামমোহনের সংগে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। 'মীরাৎ' প্রকাশে তাঁরও সহায়তা ছিল বলে মনে হয়।

মীরাৎ-এর প্রথম সংখ্যা থেকে তার উদ্দেশ্যে বা প্রস্‌পেকটাসটির কিছু অংশ অনুবাদ করে দেওয়া হচ্ছে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে বর্তমান কলকাতার অধিবাসীরা ইংরেজ জাতির শাসনে (ইংরেজ গভর্নমেন্টের শাসনে) স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা উপভোগ করছেন।...ব্যক্তি এবং সম্পত্তিকে রক্ষা করবার জন্য অনেক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। যে সব আইন-কানুন ন্যায় বিচার এবং শাস্তি-প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রচলিত হয়েছে, তা ইংলণ্ডের আইনের মতানুসারী। এই আইনসমূহের ফলে স্বাধীনতার পূর্ণ সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে এবং উচ্ছৃঙ্খলতাকেও দমন করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে ক্ষুদ্রতম মানুষটিও তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না—বড়ো মানুষদের সঙ্গে একই স্থানে দাঁড়াবার অধিকার পাচ্ছে। এমনকি সরকারের উচ্চতম ব্যক্তিটির সঙ্গেও সমপর্যায়ে দাঁড়াতে পাচ্ছে। প্রতিটি মানুষ তার বক্তব্য প্রকাশ করবার অধিকার পেয়েছে, এমনকি অপরের আচরণ সম্পর্কেও সমালোচনা করবার সুযোগ তার আছে, তবে তার পূর্বে বিবেচ্য হবে ঐ সমালোচনা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা।

দেশের এই পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের কতিপয় ভদ্রলোক দেশীয় এবং বিদেশীয় সংবাদ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। যারা ইংরেজি জানেন তাঁরা নিঃসন্দেহে এই জাতীয় সংবাদপত্র থেকে উপকৃত হচ্ছেন যেহেতু তাঁরা কেবলমাত্র নিজের স্থানের নয়, প্রায় সমস্ত স্থানের সংবাদ পেয়ে থাকেন। কিন্তু, যেহেতু ইংরেজি ভাষা ভারতের সর্বত্র বোধগম্য নয় (অর্থাৎ দেশের সকলে ইংরেজি ভাষা জানে না), একারণেই ইংরেজি না-জানা পাঠকেরা সংবাদ জানবার আশায় হয় ইংরেজি জানা লোকের কাছে যাবে অথবা তারা সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত থাকবে। এ কারণে মনুষ্য সমাজের দীনতম ব্যক্তি আমি ফার্সী ভাষায় লিখিত একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। ফার্সী ভাষা এদেশের সর্বত্র সম্ভ্রান্ত মানুষেরা জানেন এবং যারা এতে উৎসাহী তাঁদের প্রত্যেককে এই পত্রিকা দিতে আমি প্রস্তুত।

আমি বিনীতভাবে প্রতিবাদ করি যে এই পত্রিকার উদ্দেশ্য বড় মানুষকে অথবা আমার বন্ধুদের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করা যাতে আমি তাঁদের অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। সম্পাদকের ক্ষমতার সুযোগে অপরকে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং সত্যের প্রতি, ক্ষমতায় আসীন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের প্রতি এবং (পত্রিকার) প্রতিটি লাইনের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা থাকবে। যে সব বক্তব্য অপরের ধারণা বা অনুভূতিকে আঘাত করে তা থেকে সতর্ক থাকতে প্রয়াসী হবো।

এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করবার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে এই, যে আমি জনসাধারণের সামনে এমন সব সংবাদ প্রবন্ধ উপস্থিত করবো যাতে পাঠকের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা সমাজের উন্নতি সাধনে ব্রতী হয়, যে দেশের শাসকরা তাঁদের প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা অবগত হোন ; যে প্রজাপুঞ্জ শাসনকর্তাদের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও আইন সম্পর্কে জানুন যাতে শাসকরা সহজেই তাঁদের প্রজাদের সুযোগ সুবিধা দিতে পারেন…' (অনূদিত)

পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অধিকাংশ রামমোহন নিজেই রচনা করতেন এবং যে সমস্ত রচনার ইংরাজি অনুবাদ ক্যালকাটা জার্নালে বেরোত তাও রাজা নিজেই করতেন বলে মনে হয় ; কারণ, ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক সিল্ক বাকিংহাম কথ্য আরবীতে সুপণ্ডিত ছিলেন, সম্ভবতঃ ফার্সীতে তাঁর তেমন অধিকার ছিল না। কাজেই মীরাৎ উল-আখ্‌বারে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি অতি মূল্যবান। এগুলি রামমোহনের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর মতামত, ইংরেজ জাতি, তাদের সংবিধান ও এদেশবাসীর অধিকার সম্বন্ধে তাঁর মহামূল্যবান মন্তব্য বহন করছে।

মীরাৎ উল-আখ্‌বার পত্রিকার প্রথমসংখ্যায় যে বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে তা হলো এই—

(১) সম্পাদক জনসাধারণকে জানাচ্ছেন যে, পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য এই শহরে অনেকগুলি সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয়েছে সত্যি, কিন্তু যারা ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত অথচ ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ—বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা,—তাঁদের পাঠের জন্য একখানিও ফার্সী সংবাদপত্র নেই, একারণে তিনি একখানি সাপ্তাহিক ফার্সী সংবাদপত্র প্রকাশের ভার নিয়েছেন।

(২) শারীরিক অসুস্থতার জন্য কোম্পানীর কর্মচারীরা তাঁদের কার্য থেকে কতদিন অনুপস্থিত

থাকতে পারবেন সে সম্পর্কে সরকারী রেগুলেশন।

(৩) চীনের সহিত অনৈক্য

(৪) ত্রিপুরার জজ জন হেসের বিচার

(৫) ২৩শে এপ্রিল—রাজার জন্মদিন উপলক্ষে বন্দীদের মুক্তি

(৬) জাহাজের খবরাখবর (Shipping intelligence)

(৭) রাশিয়া ও "Sublime Porte" এর সঙ্গে শত্রুতার কারণ

(৮) রণজিৎ সিংহের কৃতিত্ব

(৯) হিন্দুস্তানে এ বছর প্রচুর ফসল উৎপাদন

(১০) একজোড়া হাতী বিক্রয়ার্থ

(১১) নীল এবং আফিং এর দাম

(১২) শাজাহানাবাদে কোম্পানী বাহাদুরের একজন অফিসারকে পাঠানোর প্রস্তাব। সেখানে অধিবাসীরা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অমনোযোগী। একারণে একজন অফিসারকে পাঠিয়ে সেখানে ইংরেজি স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো হোক। প্রথম সংখ্যার সূচীতে দেখা যাচ্ছে রণজিৎ সিংহের কার্যাবলী থেকে শুরু করে রাশিয়া, চীন প্রভৃতি কোনো দেশের সংবাদ বাকী থাকছে না। তাছাড়া রাজনীতি, শিক্ষা সংক্রান্ত বহু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

ইংরেজ জাতি সম্পর্কে রামমোহনের নিবন্ধ অতি মূল্যবান। এটি মীরাৎ-এর প্রবন্ধ। রামমোহন নিজেই তা ইংরেজিতে অনুবাদ করে ক্যালকাটা জার্নালে পাঠান। ইংরেজি রচনাটি তুলে ধরছি—

Although in ascertaining the particular causes of different natural phenomena, and in investigating the specific connection between objects, which' justifies men in calling one a cause, and the other aneffect, there is a great liability to error ; yet, as human perfectiou and social improvement depend on 'posteriori reasoning, mankind cannot dispense with it while seeking the good things of this world and the blessings of futurity. On this account, he that is possessed of rational faculties and is desirous of improving himself by experience, can not neglect enquiring into the particular cause of the present greatness of the English Nation, not withstanding the comparative smallness of the population, and the very limited extent of their Native Country—so that things and Emperors of great power are anxious to secure their friendship'.

ইংরেজ জাতির সৌভাগ্যলাভের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে রামমোহন প্রশ্ন করেছেন—'তাদের (বৃটিশের) যশোলাভের কারণ কি তাদের জলবায়ু অথবা শারীরিক ক্ষমতা বা ব্যক্তিগত সাহস? খতিয়ে দেখতে গেলে কোনটাই নয়। এর কোন একটা তাদের যশোলাভের অন্যতম কারণ একথা বললে যথেষ্ট বলা হবে না। ইংলণ্ড দ্বীপটি ভারতের সামান্য এক অংশের মতো।

তাছাড়া প্রায়ই বৃষ্টি এবং বরফ পড়ার জন্য শস্য উৎপন্ন হওয়া বেশ শক্ত এবং তা করতে হলে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। (শক্তির প্রসংগে—) অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা যেমন, জার্মানী ও রাশিয়ার লোকেরা সাহসে ও শক্তিতে নিজেদের ইংলণ্ডের সমান বলে মনে করে। ফ্রান্স তো ইংলণ্ডকে যুদ্ধবিদ্যায় নিজেদের চেয়ে বড়ো মনে করে না। ওলন্দাজেরাও নৌবিদ্যায় ইংলণ্ডকে নিজেদের চেয়ে বড়ো ভাবে না।

তারপরে ইংলণ্ডের অদ্ভুত অবস্থার ফলে (প্রাকৃতিক) যদিও তাকে আক্রমণ করা শক্ত, তাহলেও এইটেই তার প্রতিদিন যশ ও সৌভাগ্যের সোপানে আরোহণ করবার পক্ষে একমাত্র কারণ হতে পারে না, যেহেতু প্রায় সমস্ত দ্বীপেরই ইংলণ্ডের মতো সুবিধাজনক পরিস্থিতি। পূর্বে অন্যান্য রাজ্য এবং ফ্রান্সের একটি প্রদেশের প্রধান কর্তৃক অতীতে অনেকবার বিজিত হলেও প্রাচীনকালে বা বর্তমানে তার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।

প্রজাদের নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার ফলশ্রুতিতে প্রথম চার্লস এবং দ্বিতীয় জেমসের সিংহাসনচ্যুতির পর সংবিধান ক্রমশ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় এবং ক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। সংবিধানের ঔৎকর্যের জন্যই দেশের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া দেশের ভৌগোলিক অবস্থা (যার ফলে, জলপথ ছাড়া প্রবেশ করা যায় না) এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য স্কটল্যাণ্ডের ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্তির ফলে ইংরেজ সংবিধানের সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। যেহেতু একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝতে পারবেন, যে রাষ্ট্রের কোন টেরিটরি দেশ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হলে বা ভৌগোলিক উপায়ে সংযুক্ত দুটি দেশের পৃথকীকরণ হলে সাম্রাজ্যের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।'
(অনূদিত)

মীরাৎ-এর পরবর্তী সংখ্যায় রামমোহন বৃটিশ সংবিধান নিয়ে পর্যালোচনা করেন। প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি স্বীকার করে নিলেন যে প্রতিটি দেশের যে কোন একধরণের গভর্ণমেণ্ট থাকা বাঞ্ছনীয় —'তিন রকমের সরকার গঠিত হতে পারে।

প্রথম—দেশের প্রতিটি লোকের গভর্ণমেণ্টের শাসন ব্যবস্থায় সমান অংশ থাকবে।

দ্বিতীয়—গভর্ণমেণ্টের শাসনব্যবস্থা একটি মাত্র লোকের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

তৃতীয়—রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনার ভার হয় উঁচুশ্রেণীর অথবা নীচু শ্রেণীর একাংশের হাতে থাকবে।'

এর পর রামমোহন তিনটি শ্রেণীর দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করেছেন নিপুণভাবে। মীরাৎ-উল্-আখ্‌বারের চতুর্থ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য সংবাদ রণজিৎ সিংহ সম্পর্কে। সংবাদে রামমোহন লেখেন, 'ভাওয়ালপুর বিজয়ের পর লাহোরের রাজা রণজিৎ সিংহ তাঁর দেশে ফিরে এসেছেন। এত তাড়াতাড়ি তিনি যে ফিরে এলেন তার কারণ সম্বন্ধে জানা যায় যে গভর্ণর জেনারেলের ইচ্ছানুসারেই তাঁর শীঘ্র প্রত্যাগমন হয়েছে। পেশোয়াকে (ইংরেজ সরকারের ?) অধীনতায় আনবার মহৎ উদ্দেশ্য তাঁর আছে—এবং তিনি তাঁর প্রজাদের কাছে সর্বদাই এমন কথা বলে থাকেন। যাহোক, তিনি এখন পেশোয়ার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনি পাঠানদের সঙ্গেও মিত্রতা স্থাপন করেছেন।' (অনূদিত)

এই পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যার (১৪ মে, ১৮২২) সূচী :

(১) গত ২০শে এপ্রিল (১৮২২) ভাগলপুরে শিলাবৃষ্টিসহ প্রবল ঝড় হয় (২) পত্রিকায় প্রকাশিত মুতোমেদ্দৌলার চরিত্র সম্পর্কিত নিবন্ধের জন্য সম্পাদকের নিকট লিখিত এক পত্র প্রকাশ। (পত্রটি লক্ষ্ণৌর এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক লেখেন, পত্রে মুতোমেদ্দৌলার চরিত্র সম্পর্কে প্রমাণও যুক্তি সহকারে মন্তব্য করা হয়) (৩) মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে সড়ক নির্মাণ (৪) শাহারানপুর থেকে রামপুর এবং তাকে ছাড়িয়ে আরো অনেকদূর পর্যন্ত খালের মেরামত। (৫) লণ্ডনে এক ভদ্রলোকের অস্বাভাবিক আয়ুলাভ (৬) দেশের মধ্যে নানা স্থানে সেতু স্থাপন (৭) সুরাটে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড (৮) দ্রব্যমূল্য

ষষ্ঠ সংখ্যার প্রধান সূচী :

(১) ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদের উত্তরাধিকারী (পরবর্তী ব্যক্তি) নিয়োগ। (২) মুর্শিদাবাদের কলেক্টরের কোষাধ্যক্ষ (ক্যাশ কীপার) গ্রেপ্তার (৩) এক বৃদ্ধা মহিলার নতুন এক পংক্তি দন্ত লাভ (৭) বাঁশবেড়িয়াতে ডাকাতি (৫) কয়েকজন ইয়োরোপীয়ের বিষ ভক্ষণ (৬) দক্ষিণ আয়র্লণ্ডে নৃশংসতামূলক ঘটনা (৭) দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের সঙ্গে পঞ্চাশ বর্ষীয় এক কুলীন কন্যার বিবাহ (৮) তুরস্ক এবং পারস্যের মধ্যে শত্রুতা। (৯) এক ব্যক্তি কর্তৃক নিজ স্ত্রী হত্যা (১০) সিন্ধিয়ার সেনাদলের অসন্তোষ (১১) গৃহের ছাদ থেকে আকস্মিকভাবে পতনের ফলে এক ব্যক্তির মৃত্যু (১২) কম ওজনে জ্বালানী কাঠ বিক্রয়ের জন্য কতিপয় বিক্রেতাকে শাস্তি প্রদান (১৩) জাহাজীয় খবরাখবর (১৪) দ্রব্য মূল্য

সপ্তম সংখ্যার প্রধান প্রধান সূচী :

(১) জৌনপুরে জমিদারের বিপত্তি (২) রাজা অন্দিতনারায়ণের বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রা (৩) এলাহাবাদ থেকে কলকাতা আসার পথে কয়েকজন বন্দীর পলায়ন (৮) তাইকুটে নীল চাষে ভাল ফলনের সম্ভাবনা (৫) মন্দির অপবিত্রকরণ (৬) কলেরা মহামারী (৭) বারুদ বোঝাই এক নৌকা ডুবি।

অষ্টম সংখ্যার প্রধান তালিকা :

(১) নূতন গভর্ণর জেনারেলের নিয়োগ সম্পর্কে প্রবন্ধ (২) বাংলায় প্রধান বিচারক নিয়োগ (৩) অসামরিক কর্মচারীদের নিয়োগ (৪) নিজ প্রজাদের স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিতকরণের কাজে বিশেষ ধরনের ব্যাজ ধারণ করবার জন্য অযোধ্যার নবাবের হুকুমনামা। (৫) নবাবগঞ্জে বারুদে বিস্ফোরণ। (৬) খুনের জন্য এক সামরিক অফিসারের বিচার (৭) বৃটিশ সংবিধান পর্যালোচনা।

নবম সংখ্যার সংক্ষিপ্ত সূচী :

(১) তুরস্কে যুদ্ধারম্ভ (২) মালব থেকে সংবাদে প্রকাশ যে বৃটিশ সৈন্য সেখানে পৌঁছেচে এবং সিন্ধিয়ার সেনাদল বাগ মানছে না।

দশম সংখ্যার সংক্ষিপ্ত তালিকা :

(১) রাশিয়া এবং তুরস্কের যুদ্ধ বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রের ভিন্ন ভিন্ন মত সম্পর্কে পর্যালোচনা (২) কনষ্টান্টিনোপলে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড (৩) কলেজে অধ্যাপকদের পারিশ্রমিক

রামমোহনের 'মীরাৎ'কে ইংরেজরা খুব প্রীতির চোখে দেখত বলে মনে হয় না। ক্যালকাটা জার্ণালের সম্পাদক মিঃ জেমস সিল্ক বাকিংহাম নির্ভীক সম্পাদক ছিলেন। গভর্ণমেণ্টের শাসনকার্যে ত্রুটি হলে তিনি কঠোর সমালোচনা করতে পশ্চাদপদ হতেন না। তাঁকে অনেকবার সতর্ক করে দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি। তাঁর এই নির্ভীকতা রামমোহনকে মুগ্ধ করেছিল এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সৌহার্দ্য জন্মেছিল। এ সময়ে গভর্ণমেণ্টের কাছে আপত্তিজনক কয়েকটি প্রবন্ধ ক্যালকাটা জার্ণালে প্রকাশিত হয়। এগুলি লর্ড হেস্টিংসের নিয়মের বিরোধী বলে বিবেচিত হলো। সরকার রুষ্ট হয়ে সংবাদপত্র শাসনের জন্য বিধি প্রবর্তনের আয়োজন করতে লাগলেন। বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের সদস্যরা ইংরেজী সংবাদপত্র (বিশেষতঃ ক্যালকাটা জার্ণাল) সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্য নিজেদের মিনিটে প্রকাশ করলেন।

উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেলী তাঁর ১০ই অক্টোবর ১৮২২ তারিখের দীর্ঘ মিনিটে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের মুদ্রিত নানা প্রবন্ধ থেকে সরকারের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক অনেক অংশ উদ্ধৃত করেন। তিনি লিখেছিলেন, 'বর্তমান চারখানা দেশীয় সংবাদপত্র কলকাতায় প্রকাশিত হচ্ছে, দুটি বাংলায়, দুটি ফার্সীতে। চারটেই সাপ্তাহিক।...ফার্সী সংবাদপত্রগুলির নাম—জাম-ই-জাহান-নুমা ও 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার'।...দ্বিতীয়খানি সুপরিচিত রামমোহন রায়ের। ধর্ম সম্পর্কীয় তর্কবিতর্কে সম্পাদকের প্রবণতা আছে—এ জানা কথা এবং সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পেয়ে তিনি খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন তা প্রচ্ছন্ন হলেও অনিষ্টকর...

ফার্সী ও বাংলা দুটি ভাষার সংবাদপত্রে অনেক আপত্তিজনক অংশ আছে। 'সতীদাহ' নিয়ে বাংলা সংবাদপত্রে অনেক তীব্র আলোচনা প্রকাশ করা হচ্ছে। ইয়োরোপীয় মধ্যস্থতা ছাড়া, দেশের লোকেরা নিজের ইচ্ছায় এ সব আলোচনা চালাতে পারলে মঙ্গল হবে।' (অনূদিত)

বেলী তাঁর মিনিটে বেশ স্পষ্টভাবে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সংবাদপত্রের অবাধ আলোচনা সে সময়ে রাষ্ট্রের পক্ষে আশঙ্কাজনক এ মত তিনি পোষণ করতেন। তিনি লিখেছেন, "The stability of the British dominion in India mainly depends upon the cheerful obedience and subordination of the officers of the Army, on the fidelity of the Native Troops, on the supposed character and power of the Government, and upon the opinion which may be entertained by a Superstitions and unenlightened Native population of the motives and tendency of our actions as affecting their interest.

The liberty of the press, however essential to nature of a free state, is not in my judgment, consistent with the character of our institutions in this Country, or with the extraordinary nature of our dominion in India."

ক্যালকাটা জার্ণাল বন্ধ করে দিয়ে গভর্ণমেণ্ট মিঃ বাকিংহাম ও তাঁর সহকারী মিঃ আর্ণটকে এদেশ থেকে চলে যেতে আদেশ দিলেন। বাকিংহামের উপর বিতাড়নের আদেশ সম্পর্কে রামমোহন 'মীরাৎ'-পত্রিকায় সুন্দর মন্তব্য করেছিলেন। মন্তব্যের শেষে এক ফার্সী কবিতার চরণ

উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন।

তাঁর মন্তব্য হলো, "বাকিংহামের উপর সরকারী বিতাড়নের আদেশ সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। নীল নদীর ধারে জনৈক হস্তীরক্ষক একটা কবিতা বার বার বলতো—সেই কবিতাটি আজ বিশেষ করে মনে হচ্ছে—তোমার পায়ের তলায় পিঁপড়ের অবস্থা কেমন হয় তা যদি তুমি জানতে তাহলে নিশ্চয়ই হাতীর পায়ের তলায় তোমার অবস্থা কেমন হতে পারে তা বুঝতে পারতে।" (অনূদিত)

১৮২২ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখের সংখ্যায় আয়র্লণ্ড ও ঐ দেশবাসীর দুঃখ দুর্গতির বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ছিল। প্রথমেই তিনি আয়র্লণ্ডের ভৌগোলিক বিবরণ দেন। পরে রাজনৈতিক ইতিবৃত্তি আরম্ভ করেন। তিনি যা লিখেছিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই : ইংলণ্ডের রাজারা নিজেদের তোষামোদকারীদের আইরিশ জমিদারদের জমিদারী অন্যায়ভাবে দান করেছিলেন। আয়ার্লণ্ডবাসীদের ধর্মমত ইংলণ্ডের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। তাঁরা ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁদের ধর্মসম্পর্কীয় কার্য সম্পন্ন করেন পোপের অধীনস্থ ধর্মযাজকেরা। তাঁরা কোন প্রটেস্ট্যাণ্টমতাবলম্বী যাজককে ডাকতেন না। অথচ প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মযাজকদের বেতন দেওয়া হতো আয়র্লণ্ডবাসীর কাছ থেকে কর আদায় করে। অথচ অন্যায়ের কথা ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের বেতন রাজকোষ হতে দেওয়া হতো না। আয়ার্লণ্ডের অধিবাসীরা চাঁদা তুলে ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের টাকা দিতেন। আয়র্লণ্ডেরজমিদারেরা ইংলণ্ডে থেকে তাঁদের অতুল ঐশ্বর্য নিজেদের সুখ ভোগের জন্য সেখানেই ব্যয় করতেন। তারফলে ইংলণ্ডের বণিক এবং দোকানদারেরাই লাভবান হতো। এই সব জমিদারের কর্মচারীরা আয়র্লণ্ডে থেকে নিষ্ঠুর এবং অন্যায়ভাবে দুঃখী প্রজাদেরকাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতো। এদের অত্যাচারে দরিদ্র প্রজাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় পর্যন্ত থাকত না।

আয়র্লণ্ডের দুর্ভিক্ষ হওয়াতে মিরাৎ-উল্-আখ্‌বার সে দেশের জন্য চাঁদা প্রার্থনা করলে এদেশের অনেক অধিবাসী এবং ইংরেজরাও অর্থ সাহায্য করেন।

১৭ই অক্টোবর (১৮২২) সকৌন্সিল লর্ড হেষ্টিংস সংবাদপত্রসমূহকে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধবার উদ্দেশ্যে বিলেতের কর্তৃপক্ষের কাছে নতুন ক্ষমতা প্রার্থনা করলেন। ১৮২৩ সালের ৯ই জানুয়ারী লর্ড হেষ্টিংস বিলেত যাত্রা করেন। অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল হলেন অ্যাডাম। তিনি বিলেতের কর্তৃপক্ষের সমর্থন পেয়ে ১৮২৩ সালের ৫ঠা মার্চ এক কড়া প্রেস আইন লিপিবদ্ধ করেন।

রামমোহন অনুভব করলেন এই আদেশের ফলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে। সে সময় নিয়ম ছিল যতদিন সুপ্রীম কোর্ট গ্রাহ্য করছেন না ততদিন বড়লাটের কোন আদেশ আইন বলে স্বীকৃত হবে না। এই সুযোগ রামমোহন হারালেন না। অ্যাডামের অর্ডিন্যান্স (এখন থেকে কোন ব্যক্তি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলে পুলিস অফিসে হলফ করতে হবে এবং গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারীর কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। তারপরও কোন গভর্ণর জেনারেল কোন কারণে অসন্তুষ্ট হন তবে লাইসেন্স বাতিল হয়ে যেতে পারে) যাতে আইনরূপে স্বীকৃত হতে না পারে সেজন্য তিনি এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করলেন।

এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ আবেদন পত্রের স্বাক্ষর করেন রামমোহন রায়, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ ও গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩১শে মার্চ আবেদন পত্র পাঠানো হলো। সুপ্রীম কোর্ট সে আবেদন উপেক্ষা করলেন। অডিন্যান্স ক্রমে আইনে পরিণত হলো। ৪ঠা এপ্রিল সুপ্রীম কোর্টে রেজিস্ট্রী হয়ে এই আইন জারি হলো।

রামমোহন তখনও নিরস্ত হলেন না। সুপ্রীম কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে তিনি ইংলণ্ডে রাজার কাছে আপীল করলেন। এই আপীলেও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। ইংলণ্ডের রাজা তখন চতুর্থ জর্জ। ইংরেজের ন্যায় বিচারের প্রতি রামমোহনের আস্থা ছিল। অন্ততঃ তাঁর ধারণা ছিল ইংরেজ সুবিচার করে। বলাবাহুল্য আপীল অগ্রাহ্য হলো।

রামমোহন ব্যর্থতায় মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আস্থায় বোধহয় একটু চিড় খেলো। সে যাই হোক ; আপীল অগ্রাহ্য হোক, কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টায় এ আবেদনের তুলনা নেই। রাজনীতি, সাহিত্য, ভাষা সবদিক থেকেই তা অতুলনীয় ছিল। রামমোহনের জীবনীকার মিস সোফিয়া ডবসন্ কলেট এই আবেদন পত্রকে, 'এরিওপ্যাগিটিকা'র সংগে তুলনা করেছেন।

নূতন আইনের প্রথম বলি রামমোহনের 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার'। পত্রের শেষ সংখ্যায় তিনি মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এখানে তার বাংলা অনুবাদ করে দেওয়া হচ্ছে।

'মীরাৎ-উল-আখবার, শুক্রবার, ৪ এপ্রিল ১৮২৩ (অতিরিক্ত সংখ্যা) আগেই জানানো হয়েছিল যে সকৌন্সিল মহামান্য গভর্ণর জেনারেল একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্তন করেছেন যার ফলে এখন থেকে এই শহরের পুলিস অফিসে সত্বাধিকারীকে হলফ করতে হবে। এবং গভর্ণমেণ্টের মুখ্য সেক্রেটারীর কাছ থেকে লাইসেন্স না নিয়ে কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশ করা যাবে না। এর পরও পত্রিকার প্রতি অসন্তুষ্ট হলে বড়লাট এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন। এখন জানানো হচ্ছে যে, ৩১শে মার্চ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যার ফ্রান্সিস ম্যাক্নটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করেছেন। এহেন অবস্থায় কতগুলি বিশেষ প্রতিবন্ধকতার জন্য মানব-সমাজে সবচেয়ে নগণ্য হলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছায় ও দুঃখের সঙ্গে এই পত্রিকা (মীরাৎ-উল্-আখ্বার) প্রকাশ বন্ধ করলাম। বাধাগুলি এই : প্রথমতঃ, মুখ্য সচিবের সঙ্গে যে সব ইউরোপীয় ভদ্রমহোদয়ের পরিচয় আছে, তাঁদের পক্ষে নিয়ম মাফিক লাইসেন্স সংগ্রহ করা সহজ হলেও আমার মত সামান্য লোকের পক্ষে দরোয়ান এবং বেয়ারাদের অতিক্রম করে এই ধরণের উচ্চপদস্থ লোকের কাছে যাওয়া বেশ শক্ত। আমার মতে যা নিষ্প্রয়োজন সেই কাজের জন্য নানাধরণের লোকে পরিপূর্ণ পুলিশ আদালতের দরজা পেরোনোও কঠিন।

কথায় আছে	আ ক্রু কে বা-সদ্ খুন-ই জিগর দস্ত্ দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা-ফারাশ্

অর্থাৎ যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে কেনা হয়েছে, হে মহাশয় কোনো অনুগ্রহ লাভের আশায় তাকে দরোয়ানের কাছে বিক্রী করো না। দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সামনে নিজের ইচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ এবং নিন্দনীয় বিবেচিত হয়।

তাছাড়া, সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যার জন্যে কাল্পনিক সত্বাধিকারী প্রমাণ করবার মত বে-আইনী এবং গর্হিত কাজ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি এবং হলফ্ করবার অসম্মানজনক কাজের পরেও সরকার লাইসেন্স কেড়ে নিতে পারেন এই আশঙ্কার জন্য সেই লোককে মনুষ্য সমাজে অপদস্থ হতে হবে এবং এই ভয়ে তার শান্তি নষ্ট হবে। যেহেতু মানুষ ভ্রমশীল, সত্য কথা বলতে গিয়ে তাকে হয়ত এমন ভাষা প্রয়োগ করতে হবে যা গভর্ণমেণ্টের কাছে অপ্রীতিকর বলে মনে হতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলার চেয়ে চুপ করে থাকা ভাল মনে করলাম।

গদা-এ গোশা-নশিনি ! হাফিজ ! মাখরোশ্
রুমুজ-ই-মস্লিহৎ-ই খেশ্ খুস্রোয়ান্ দানন্দ্

—হাফিজ। তুমি কোণঘেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ করে থাক। নিজের রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।

পারস্য এবং হিন্দুস্থানের যে সব মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করে 'মীরাৎ-উল্-আখ্বারকে সম্মানিত করেছেন, তাঁরা যেন উপরের বর্ণিত কারণ সমুদয়ের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাঁদের সংবাদ পরিবেষণ করবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য তাঁরা যেন আমাকে ক্ষমা করেন, এই আমার অনুরোধ। আমি আরো অনুরোধ করবো, আমি যেখানে যেভাবে থাকি না কেন, স্বীয় ঔদার্যে তাঁরা যেন আমার মত সামান্য লোককে সর্বদা তাঁদের সেবায় নিযুক্ত বলে মনে করেন।'

'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু উঁচু হয়ে রইল সংবাদিকের নিষ্ঠা, অন্যায়কে মেনে না নেবার সৎসাহস দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

(১) Calcutta Journal, dated 8 May 1822, p. 109
Do " 22 June 1822 P. 739
(২) Calcutta Journal, 1st April, 1822, p. 336
(৩) বাংলা সাময়িক পত্র (১ম)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ
(৪) Calcutta Journal, 20 April, 1822, p. 561

উত্তর রাঢ়ের লোকসংগীত

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

ভাদু

ভাদুগান সম্পর্কে ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের তাঁর 'বাঙলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের উদ্ধৃতিটি দেওয়া হল :—

জনশ্রুতিমূলক ক্ষীণ কাহিনী যদিও এই লোকসঙ্গীতের ভিত্তি তথাপি ইহার কাহিনী ইহার মধ্যে অত্যন্ত গৌণ—বাঙলার প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশই ইহার মুখ্য অবলম্বন। ভাদ্রমাসের সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই অঞ্চলের সকল শ্রেণীরাই প্রধানতঃ কুমারী মেয়েরা ভাদু নামক দেবীর প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া এই লোকসংগীত গাহিয়া থাকে। এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ভাদ্রের ভরা প্রকৃতির পটভূমিকায় কুমারীহৃদয়ের বিচিত্র সুখদুঃখের অনুভূতি ব্যক্ত হয়। এই শ্রেণীর লোকসঙ্গীত এই অঞ্চলের কুমারী মেয়েদের মধ্যে কি ভাবে উদ্ভূত হইল? এই অঞ্চলেরই সংলগ্ন ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে মধ্যভারতে গঁড়জাতি অধ্যুষিত সমতলভূমি পর্য্যন্ত যে দ্রাবিড় ও মুণ্ডাভাষী উপজাতি সমূহ বাস করে, তাদের মধ্যে ভাদ্রমাসে করম নামক এক বিশিষ্ট নৃত্যগীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।…যদিও ইহার একটি আচার অরণ্য হইতে করম্ (কদম্ব) বৃক্ষের শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে কাটিয়া আনিয়া তাহা কেন্দ্র করিয়াই নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান তথাপি ইহা সকল উপজাতির একটি প্রকৃতি উৎসব বা বর্ষা উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। মধ্যভারত হইতে বাঙলার পশ্চিমসীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া বর্ষা প্রকৃতি উপজাতীয় অধিবাসীর মনে যে আনন্দের স্পন্দন জাগাইয়া তোলে—তাহার তরঙ্গ বাঙলার পশ্চিম সীমান্তের মধ্যবর্তী কুমারীদিগের হৃদয়-তটে আসিয়া প্রতিহত হইবে—তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ সাংস্কৃতিক জগৎ ভৌগোলিক সীমাদ্বারা বিভক্ত নহে। কিন্তু হিন্দুসংস্কৃতির প্রভাববশতঃ বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলের নারীসমাজ সেই আনন্দ তাহার উপজাতীয় প্রতিবেশিনীদের মত করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। একদিকে বহিরাগত নবলব্ধ হিন্দু সংস্কৃতি ও অন্যদিকে প্রতিবেশী অনার্য সংস্কৃতি এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এই অঞ্চলের কুমারীগণ ইহার যে অভিনব রূপের কল্পনা করিয়াছে—তাহাই ভাদুপুজা নামে পরিচিত হইয়াছে।'

ভাদুগানের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও দুইটি গল্প প্রচলিত আছে। উভয়ক্ষেত্রে ভাদুকে অবশ্য পঞ্চকোটের রাজকন্যা হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে।

ভাদ্রমাসে এই রাজকন্যার জন্ম—তাই নাম হয়েছে ভাদু। ছেলেবেলা হতেই এই মেয়ের ঠাকুর-দেবতার প্রতি খুব অনুরাগ। রাজার মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের এক যুগলমূর্তি ছিল। রাজকন্যার ভগবৎপ্রেমের কথা কেউ জানতো না। বিয়ের অনেক সম্বন্ধ আসে কিন্তু রাজকন্যা কিছুতেই রাজী হয় না। রাজা মেয়ের এই আচরণ দেখে বিস্মিত হলেন। অনেকেই সন্দেহ করলো—তাহলে মেয়ে নিশ্চয়ই কাউকে ভালবাসে। তাই বিয়ের কথা শুনলেই কান্নাকাটি করে, বিরক্ত হয়—এমনকি

খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে। মেয়ের উপর নজর রাখা হয়। দেখা গেল—মেয়ে প্রতিদিন রাত্রে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়। একদিন গভীর রাত্রে রাজা নিজেই মেয়েকে অনুসরণ করলেন। দেখলেন মন্দিরের দরজা খোলা—ভিতরে প্রদীপ জ্বলছে। মেয়ে সেই মন্দিরে প্রবেশ করলো——তারপরই মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মেয়ে ভিতরে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে, হাসাহাসি করছে—মনের আনন্দে নাচগান করছে। রাজা ভাবলেন—পুরোহিতের সাথে বুঝি অবৈধ প্রেম চলছে। দরজা ভাঙ্গার আদেশ দিলেন। দরজা ভাঙা হলে দেখলেন দেববিগ্রহের সামনে মেয়ের বিগতপ্রাণা দেহ।

বিগ্রহের পাশেই প্রতিষ্ঠিত হলো ভাদুর মূর্তি। সেই থেকে ভাদুপুজা ও ভাদুর নাচগানের প্রচলন হলো দেশে। অনেকে বলেন—দেবী পার্বতী একবার মহাদেবের সাথে মনোমালিন্য হওয়ায় অভিমানে স্বর্গধাম ত্যাগ করেন ও পঞ্চকোটের রাজকন্যারূপে মর্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করেন। রাজকন্যা ক্রমে ক্রমে বয়োঃপ্রাপ্তা হয়, বিবাহযোগ্যা হয়। কিন্তু রাজার আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও বিবাহ আর হয় না। এমন সময় দেবর্ষি নারদ এসে রাজাকে রাজকন্যার সত্যপরিচয় জ্ঞাপন করেন ও অভিমানিনী পার্বতীকে মহাদেবের দুঃখকষ্টের কথা বলে আবার স্বর্গধামে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। রাজা প্রাণাধিকা এই কন্যার বিদায়ব্যাথায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন এবং দেশে কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ ভাদুপূজার প্রচলন করেন।

পূর্বপশ্চিম মানভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্দ্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম—এই অঞ্চল জুড়েই ভাদুগানের প্রচলন। বাউড়ী ও অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণীরই এই উৎসব। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রপূজা, 'করম্' পরব, ভাঁজো পূজা ও এই ভাদু পূজা সবগুলিই বর্ষাঋতুর এই 'ভরা ভাদরে'। তাই একের প্রভাব অন্যে এসে পড়েছে কারণ ইন্দ্রপূজা ছাড়া সবগুলিই আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণীর। কোন ক্ষেত্রেই সঙ্গীতে তত্বকথা নাই। শুধু সামাজিক ও প্রাকৃতিক রূপের সহজ, সরল বহিঃপ্রকাশ। ফলে একটিকে অন্যের পরিবর্তিত সংস্করণ অনুমান করা বিচিত্র নয়। পূর্বে ভাদ্রমাসের প্রতিসন্ধ্যায় ভাদুমূর্তির চারিদিকে সমবেত হয়ে গ্রামাঞ্চলের কুমারীরা নৃত্যগীত করতো। মন্ত্র পড়ে ভাদু পূজা হয় না। নৃত্যগীতেই ভাদুপূজার মন্ত্র। ভাদ্রমাসের শেষ দুই দিনে মহাসমারোহে এই উৎসবের সমাপ্তি হত।

বর্তমান ভাদুপূজার রূপ বদলেছে। এর উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিককালে একটি কিংবদন্তী শোনা যায়। 'আনুমানিক ১৮১৩ খৃঃ মানভূম জেলার পঞ্চকোটের রাজধানী কাশীপুরে নীলমণি সিংহ দেবশর্মা নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার ভদ্রেশ্বরী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল।' বাউড়ী ও অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি তাঁর মমতা ছিল। বয়স বেড়ে চললো—কিন্তু বিয়ের কোন সম্ভাবনা দেখা দিল না। রাজপ্রসাদের মধ্যে এই অনূঢ়া রাজকন্যার দিন কাটছিল। এইভাবেই রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরীর মৃত্যু হল। কেউ বলেন—রাজা এই কন্যাকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন তাই কন্যার অকালমৃত্যুর পর প্রচার করলেন তাঁর কন্যার স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রতি গ্রামে ভাদ্রমাসে কন্যার নামে উৎসব পালন করতে হবে। কেউ বলেন—কাশীপুরের বাউরী ও অন্যান্য উপেক্ষিত সম্প্রদায় রাজকন্যার স্মৃতিরক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করে।

পরবর্তীকালে এই মানভূম হতে বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমানে প্রসার লাভ করে। পঞ্চকোটের রাজ কাহিনীর সাথে ভাদুপূজার যোগাযোগ ঐতিহাসিক সত্য হলেও এই উৎসবের প্রচলন বাঙলাদেশে বহুপূর্বেই ছিল বলে অনুমান করা যায়।

ভাদ্রমাসের প্রথমদিনে ভাদুর মৃন্ময়ী প্রতিষ্ঠার সাথে এই উৎসব সুরু হয়। কুমারীগণ ভাদুর আগমন উপলক্ষ্যে আগমনী গীত গায়—

ভাদু নামলো দেশে
মুছাইব রাঙা চরণ মাথার কেশে
ভাদুমণি মা জননী গো
　　সলতে ধুমো আলাতে ১
জলতে জলতে নিবে গেল
ভাদুমায়ের বাঙলাতে ২

তারপর ভাদ্রমাসের প্রতি সন্ধ্যায় কুমারী মেয়েরা ভাদু গান গায়। ভাদু সম্পর্কে যে জনশ্রুতি তাতে দেখা যায় ভাদু কুমারী অবস্থায় মারা যায়। তার বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি তাই ভাদুর অধিকাংশ গানই বিবাহ সম্পর্কিত। যেমন—

ভাদুর আমার বিয়ে দোব ইষ্টিশনের বাবুকে
আসতে যেতে ভাল হবে যাবে রেলের গাড়িতে
আমার ভাদু মান করেছে মান ভাঙবার কে আছে?
যাদের ঘরকে আনলাম ভাদু তারাই তো মান ভাঙাবে।
বর্দ্ধমানের বণ্ডিল সুতো চালে চালে লাগাবো
রায়পুরের ঐ ছোকরাদিকে তানমানে নাচাবো।
ঘরের ধারে পেঁপে গাছটি ঝাড়ি ঝাড়ি জল দিও
একটি পেঁপে পাকলে পরে তারে ঘরে পাঠাইও।

অথবা

ওগো ভাদুর বিয়ে দিতে
বর মিলে না এ জগতে
হাজার টাকা নিলে কাকা
ওগো বিয়ে দিলে বুড়ো বর দেখে
ইচ্ছে হয় না—শরম লাগে
　　বুড়োর পাতে ভাত খেতে
ওগো ভাদুর ছোট ছেলে
বেড়াছে ওগো বিলে বিলে
শঙ্কর চিলে ছোঁ মেরেছে

১। প্রদীপের আলোয় ২। বৈঠকখানায়

মেক্কন পুঁটি মাছ বলে
ওগো ভাদুর……এ জগতে।

গ্রামের অন্ত্যজ শ্রেণীর মেয়ের জীবনে রেলগাড়িতে চাপা এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। চতুপার্শ্বস্থ গ্রামের চৌহদ্দির বাইরে যাওয়ার অধিকার বা প্রয়োজন নাই। তাই সারা জীবনে রেলগাড়িতে চড়া আর প্রায় হয়ে উঠে না। অনার্য সম্প্রদায়ের কুমারীমনের আশা, স্বপ্ন-এ সবের ছায়া পড়ে ভাদুর গানে। তাদের অবচেতন মনে ট্রেনে চেপে বহির্জগতের সাথে পরিচিত হওয়ার যে সাধ—তা পূর্ণ করে নিতে চায় মানস-কুমারী ভাদুর জীবনের মধ্যে। শুনেছে শহরাঞ্চলে বৈদ্যুতিক তারের কথা যা দিয়ে সহজেই সংবাদ পাঠানো যায় দূরের কোন দেশে। পেঁপে পাকার অকিঞ্চিৎকর সংবাদও পৌছে দিতে হবে এই তারের মাধ্যমে। দ্বিতীয় গানটিতে অনূঢ়া কন্যার বিপদজনক পরিণতির এক করুণ সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

ভাদুকে কখনও দুরন্ত গ্রাম্য এক কিশোরী রূপে কল্পনা করা হয়—গায়িকার দল স্নেহশীলা জননীসুলভ অভিভাবিকার ভূমিকা গ্রহণ করে, যেমন—

ভাদু চাপলো নতুন লাইনে
চললো বাঁশি বাজিয়ে
কি কর—কি কর—ভাদু
কদমতলায় দাঁড়িয়ে
কদমগাছে চাপলে ভাদু
কষা কদম পেরো না
পাকলে পরে সবাই খাবে
কেউ তো মানা করবে না।
কদমগাছে চাপালেন ভাদু
শিরায় শিরায় পা দিয়ে
নামবার সময় দেখ ভাদু
শিবের মাথায় ফুল দিও।
ভাদু নেমেছে দেশে।

'শিবের মাথায় ফুল' দেওয়ার আদেশে কুমারীহৃদয়ের পতি কামনার একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ভাদুকে মনের মত করে সাজাতে চায় কুমারীর দল। তাদের অন্তরের যে অপূরিত সাধ—যা অবদমিত অবস্থায় অবচেতনমনে গুমরে আছে তাই সফল হতে চায় ভাদুর মাধ্যমে। ভাদু তাদেরই ঘরের মেয়ে তাদের মধ্যে যা কুলায় তাই দিয়ে সাজিয়ে দেবে। ভাদুর কোন সাধ যেন অপূর্ণ না থাকে। তাই গান গায়—

ভাদু তোরে ভালবাসিয়া, ফুলে রাখিয়া
ফুলে ফুলে বেড়িয়ে এলাম কোন ফুল দোব চরণে
আমার ভাদু ছোট ছেলে গো কাপড় পড়তে জানে না।

ভাল করে পড়াও কাপড় পয়সা দেব দু-আনা ॥
এ ভাদুটি কে গড়েছে গো—হাতে দেয়নি তার বালা
ফাঁকি দিয়ে পয়সা নিলে গো মানুকে বাদ্দী মুখপোড়া ॥

অথবা

তোমরা দেখে যাও ভাদুর কানপাশা
হাওয়াতে দোলে না পাশা,
ভাদুর মনে বড় আশা।
কাল পূজেছি শতদলে আজ কেন গো নীলবরণ
আমার ভাদু মান করেছে কি দিয়ে মান ভাঙাবো
অন্ধকারে প্রদীপ জেলে জোড় হাত করে দাঁড়াবো।
ভাদ্রমাসে আনলাম ভাদু মাঠে হল জলটা
মাঠের মুনিষ খেটে খেটে ধরে গেল রাত কানা।

দ্বিতীয় গানে ভাদুর অভিমানিনী রূপও ধরা পড়েছে। তাছাড়া ভাদু আসার পর মাঠ জলে ভরে গেছে চাষী মনের আনন্দে চাষে মেতে উঠেছে। বর্ষা উৎসবের স্বাক্ষর এই গানে। আবার শোনা যায়—

'বর্দ্ধমানে দেখে এলাম গো মাছের কাঁটার মাকুড়ী
কোন মাকুড়ী নেবে বল খোল গলার মাদুলী

জবা বিল্বদলে দলে-মালা গাঁথা
দাও ভাদুর গলে
মালা মালা করছে ভাদু গো
তোমার কোন মালাতে সাধ আছে
এমন মালা গেঁথে দেব
যাতে রাধাকৃষ্ণের নাম আছে
কাপড় কাপড় করছো ভাদু গো
কোন কাপড়ে সাধ আছে
এমন কাপড় এনে দেব
যাতে চিক্ বসানো পাড় আছে।

'রাধাকৃষ্ণের নাম' দেওয়া মালাই সর্বোৎকৃষ্ট তাই দেবে ভাদুকে। রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের মানবিক রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়া সেই 'রাধাকৃষ্ণ' নামের প্রচ্ছন্ন প্রভাব যা বাঙলাদেশের সমস্ত লৌকিক গীতিকে একটি অখণ্ডতা দান করেছে।

সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ কুমারীমন বেড়িয়ে আসতে চায়—দেখতে চায় আসেপাশের জগতটাকে নিয়ে বাইরে যাবার সাধ ব্যক্ত করে বিভিন্ন সঙ্গীতে—

চল ভাদু চল খেলতে যাবো রাণীগঞ্জে বেলতলা
আসবার সময় দেখিয়ে আনবো কয়লা খাদের জল তোলা
রাণীগঞ্জের লোকে বলে—এটি তোমার কে বটে ?
লাজসরমে বলতে হল—বটঠাকুরের ভাই বটে।
ভাদ্রমাসে আনলাম ভাদু চন্দন কাঠের চৌদলে
ভাদু যদি করেন কৃপা—রাখবো সোনার মন্দিরে।

অথবা

ভাদু চল বেড়াইতে—ক্যানেল কাটা দেখিতে
পদ্মপুকুর টলমল, জাম গাঁয়ের লোক পালাইল
ভাগ্যে ছিল বড়দাদা—সাহেব নিয়ে পাঠাইল
ও রাম তুমি যেও না বনে
রামের মা বাঁচিবে কেমনে।
রাম ছেড়েছে যজ্ঞের ঘোড়া গো—অশোক বনের কাননে
আবার তাইতে ছিল লবকুশ—ধরে ঘোড়া আনাইল রে।
জয়দেব কেঁদুলী যাবো—রামের বিয়ে দেখিতে
সীতের সঙ্গে বিয়ে—অশোক বনের কাননে গো
ও রাম তুমি যেও না বনে।

দ্বিতীয় গানটির শেষ কয়টি লাইনে সঙ্গতি নাই কিন্তু এখানেও রামায়ণের প্রচ্ছন্ন প্রভাব। সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করেও ভাদু সঙ্গীত রচনা হয়। যেমন—

(১) ভাদুর ভাবনা কিসে ধান ভানা কল এসেছে দেশে
মালডিহের ঐ অক্ষয় মোড়ল ধানের মেসিন এনেছে
কোমরপুরের পূবধারে গো প্যাটেলনগর বসেছে
তারে তারে তার জুগিয়ে বিজলী বাতি জ্বেলেছে

(২) আসছে ক্যানেল মুসানজোর হতে
মুনিষের দাম পাঁচসিকে
হল ক্যানেল ভালই হল জমিতে ধান মরবে না।
ক্যানেল এল এঁকা বেঁকা মধ্যেতে তার দেয় শাখা
ধারে ধারে মগরা দিয়ে মাঠেতে জল ফেলাইল।

(৩) একটাকার চাল কিনতে গেলাম
দু-পাই বৈ আর পেলাম না
কণ্টোলের গম খেয়ে খেয়ে ভাবনাতে ঘুম হচ্ছে না
এ বছরকার বর্ষা কেমন পায়ে কাদা লাগলো না
যে দেশেতে নাইকো ক্যানেল—ভাবনাতে ঘুম হচ্ছে না

(৪) এবার হিসাব বুঝা দায় হল
নয়া পয়সা উঠিল
পঁচিশ পয়সায় চার আনা হয়
তাইতো গরমেণ্ট বুঝাইল।
একশো পয়সায় একটাকা হয়
তাইতো গরমেণ্ট জানাইল

মেয়েছেলে দোকানে গেলে
দোকানী মজা লুটিল

এই ভাদু বা বোলান গানে মাঝে মাঝে পাঁচালী নামে ছড়া বা গান শোনা যায়। এই গানে গ্রাম্যতা বা অশ্লীলতা দোষ থাকে। যেমন—

ও ঠাকুরপো—চোখের মাথা খাও
দেখতে পাও না কি
আমার চোখের ইসারা ?

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

শিখর রীতি

আগের সংখ্যায় শিখর মন্দির আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম শিখর রীতির মধ্যে জীবনীশক্তির এমন একটা সঞ্চয় নিশ্চয়ই ছিল যাহার জন্য রীতি হিসেবে ইহা কখনও পরিত্যক্ত হয় নাই। বাংলার নিজস্ব মন্দির রচনা পদ্ধতি লইয়া যখন সৃজনশীল নির্মাণ-কার্য্য ব্যাপকভাবে চলিয়াছে তখনও রীতি হিসেবে ইহার একটা বিশিষ্ট স্থান বিদ্যমান। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ওড়িশা প্রভাবিত অঞ্চলে পাথরে বা মাকরা পাথরে শিখর মন্দির যে প্রাচীন প্রথার অনুকরণ করিয়া টিকিয়া ছিল তাহা বোধ করি স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে; বাংলার নব-আন্দোলনের জন্ম ও বিস্তারের ক্ষেত্র হইতে তাহা যেন একটু দূরেই থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্যত্র, যেখানে বাংলার নিজস্ব পদ্ধতি সৃজনশীল কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া বিচিত্ররূপে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, সেখানে এই সুপ্রাচীন রীতিটি কি করিয়া যে তাহার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হারাইয়াও শুধুমাত্র তুঙ্গ গণ্ডীটিকে অবলম্বন করিয়া বার বার ঘুরিয়া আসিয়াছে তাহাই ভাবিবার বিষয়।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইটের মাধ্যমে যে শিখর মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে বর্তমান প্রবন্ধে সেইগুলিই আলোচনার বস্তু। ওড়িশার শিখর মন্দির, রেখ মন্দিরের সহিত ইহাদের গোত্রবন্ধন এতই শিথিল ও অঙ্গ বিন্যাসের নবতর পরিকল্পনায় ইহারা এতই আচ্ছন্ন যে সৃজনশীল প্রতিভার স্পর্শ থাকিলে এগুলিকে শিখর মন্দিরের বঙ্গীয় সংস্করণ বলিয়া উল্লেখ করা চলিত। কিন্তু সে সময় তো বহিয়া গিয়াছে—নবতর অঙ্গবিন্যাস দুর্ব্বল কল্পনায়, আত্মরক্ষা করিবার উপায় মাত্র।

সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির কথা আগে বলিয়া লই। রথকাসনের উপরেতেই ইহাদের অবস্থান, কিন্তু রথকাসনের স্থাপত্যগত প্রয়োজনীয়তা এখানে বিশেষ নাই। আসন পঞ্চরথ, সপ্তরথ বা নবরথ কিন্তু রথক উদ্গমনের ঘনত্ব অত্যন্ত অল্প, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামান্য কয়েক ইঞ্চি মাত্র। কেন্দ্রস্থিত রথটি অর্দ্ধেক বা অর্দ্ধেকেরও বেশি জুড়িয়া থাকে, উভয়পার্শ্বের বাকী অংশটুকুর মধ্যে অবশিষ্ট রথগুলির অবস্থান। ফলে পার্শ্বস্থিত রথকগুলির বিস্তার হয় সঙ্কীর্ণ। আবার মূল বর্গক্ষেত্র হইতে কেন্দ্রীয় রথকটি আগাইয়া থাকে সামান্য কয়েক ইঞ্চি তাই অন্যগুলির ঘনত্বও অত্যল্প।

রথকাসনের এই বিন্যাসের ফলে মন্দিরদেহের ভার অনেকটা লঘু হইয়া আসে বটে কিন্তু দৃঢ় গঠনের শক্তি-সম্ভাবনা লোপ পাইয়া যায়। ইটের মন্দিরে অবশ্য দৃঢ় গঠনের ভার আরোপ করিবার খুব একটা প্রয়োজনও যে ছিল এমন নহে। দেওয়াল অংশে অর্থাৎ বাড় ভাগে পাভাগ, জাঙ্ঘ, বান্ধনা, বরণ্ড প্রভৃতি বিভাগের প্রশ্নই আর উঠে না, কোথাও যদি দেওয়ালের গাত্র বাহিয়া দু'একটি আনুভূমিক রেখা ঘুরিয়া আসে তাহা ওড়িশার রেখ মন্দিরের স্মৃতি বাহিত নহে, অথবা কোন সর্বতো গ্রাহ্য নিয়ম হইতে উদ্ভূত, এমনও নহে—স্থপতির ইচ্ছায় আরোপিত একটি বন্ধনমাত্র; ইহার উপরে উঠিয়াছে বক্ররেখ শিখর; দু'এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটিলেও গণ্ডীর সমগ্র গাত্র ব্যাপিয়া

নিয়মিত বিরতির অন্তরে আনুভূমিক রেখার সারি ; একেবারে গণ্ডীর শেষ অবধি গিয়া তাহাকে একপ্রকার আচ্ছন্নই করিয়া ফেলে। গণ্ডীর বহিরেখার গতি সাধারণতঃ অনিয়ন্ত্রিত বলিয়া তাহার অন্তক্ষেত্র অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি। ফলতঃ বেকী হয় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং ক্ষুদ্র আর আমলক বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছুই থাকে না—পরপর কতকগুলি গোলাকৃতি বস্তু ধ্বজদণ্ডের পাদদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়া যায় ; অভ্যন্তর ভাগে, অন্তরা বিন্যাসের ক্ষেত্রে, গণ্ডী দেওয়ালের উপর হইতে উল্টাকাটনি ছাড়িয়া উঠিতে থাকে। কাটনি ছাড়িবার সময় ইটের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ—প্রায়ই দেখা যায় আধ ইঞ্চি মাত্র—বাহির করিয়া রাখা যায়। ভিতরের দিকে গণ্ডীর আকৃতি সুনিয়ন্ত্রিত—ঠিক দীর্ঘায়ত ত্রিভুজের মত।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি, বিশেষ করিয়া রথকাসনের এই বিন্যাস বরাকরের তিনটি মন্দিরে ও গৌরাঙ্গপুরের ইছাই ঘোষের দেউলে যে দেখা গিয়াছে একথা তো আগেই বলিয়াছি। কিন্তু সমস্ত-গুলি বিশিষ্টতা একত্রবদ্ধভাবে দেখা দিল ষোড়শ শতাব্দী ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নির্মিত কতগুলি মন্দিরে। মন্দিরগুলি হইল বর্দ্ধমান জেলার কুলীনগ্রামের গোপাল মন্দির ও বৈদ্যপুরের দেউল নামে পরিচিত একটি মন্দির, হুগলী জেলার বৈঁচীগ্রামের দেউল ও বর্তমান পূর্ব্ব-পাকিস্থানের যশোহর জেলার কোদালিয়া গ্রামের কোদালিয়া মঠ, মন্দিরগুলি প্রায় সমসাময়িক। বৈদ্যপুরের দেউলটির নির্ম্মাণকাল ১৫৩২ শকাব্দ বা ১৬১০ খৃঃ ও বৈঁচীগ্রামের দেউলটি গঠিত হইয়াছিল ১৫০৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে। গোপাল মন্দিরে অনেকগুলি লিপি আছে, কিন্তু একটিরও পুরা পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নহে। তবে একাধিক লিপিতে সত্যরাজ খাঁ এই নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। জনশ্রুতিতে শোনা যায় সত্যরাজ খাঁ এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। লিপিতেও তো দেখিতেছি তাহারই ইঙ্গিত। সত্যরাজ খাঁর জীবনকাল জানিতে অসুবিধা নাই। তাঁহার পিতা গুণরাজ খাঁ হইলেন সুবিখ্যাত মালাধর বসু। ১৪৮০ খৃঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করিয়াছিলেন। উপরিউক্ত তথ্যের ভিত্তিতে মন্দিরটি ষোড়শ শতকের প্রথমভাগের এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। উপরন্তু মন্দিরটির পূর্বদিকে প্রধান প্রবেশদ্বারের উপর পোড়ামাটির যে অলঙ্কার রহিয়াছে তাহারও ইঙ্গিত ওই সময়ের প্রতিই। কোদালিয়া মঠ সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁহার সভাকবি অবিলম্ব সরস্বতীর স্মৃতি রক্ষার্থে মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রবাদটির সাক্ষ্য সত্য বলিয়াই মনে হয়। এক্ষেত্রেও অলঙ্করণের বৈশিষ্ট্যই প্রধান যুক্তি ; ষোড়শ শতকের মন্দির অলঙ্করণে পোড়ামাটির শিল্প যে ধারায় বহিয়া চলিয়াছিল তাহাই এখানে স্ফুটমান।

গণ্ডীর রূপরেখার দিকে চাহিলে মন্দির চারিটিকে দুইটি নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করিয়া ফেলা যায়। একটি ভাগে কুলীনগ্রামের গোপাল মন্দির ও বৈঁচীর দেউল, আর বৈদ্যপুরের দেউল ও কোদালিয়া মঠ এই দুইটি লইয়া অপর বিভাগটি। গোপাল মন্দির ও বৈঁচীর দেউল এই দুইটি মন্দিরে গণ্ডী ডিম্বাকৃতি, প্রকৃতপক্ষে ডিম্বের দীর্ঘায়ত অংশটির মত। গোপাল মন্দিরে গণ্ডীর বহিরেখা যেন ডিম্বের গতি অনুসরণ করিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—কোথাও বাধা পাইয়া স্তব্ধ হইয়া যায় নাই। বৈঁচীর দেউলটীতে দেখিতেছি ডিম্বের আকৃতির মধ্যেই গণ্ডী কিছুটা উঠিবার পর ভিতরের দিকে একটু বেশী ঝুঁকিয়া গিয়াছে বলিয়া শেষের দিকে সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বহিরেখার গতিভঙ্গও

স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিতে পারে নাই; যেখানে বেশী ঝুঁকিয়াছে তাহার ঠিক আগেই যেন একবার থমকিয়া গিয়া তারপর দ্রুত আগাইয়া যাইতেছে। গণ্ডীর উপরে বেকী, আমলক প্রভৃতি উভয় মন্দিরেই একই প্রকার, প্রয়োজনাতিরিক্ত সজ্জা মাত্র।

বর্তমানে বৈঁচীর দেউলটি দ্বারপথের প্রায় অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত মাটিতে প্রোথিত। বাড় অংশের উপর বৈচিত্র্যায়নের জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। বাড়খণ্ডের দৃশ্যমান অংশের উপরে কয়েকটি সাধারণ আনুভূমিক রেখা রহিয়াছে মাত্র। দক্ষিণদ্বারী দেউলটির প্রবেশ-পথের উপরে ও পার্শ্বে পোড়ামাটির লতা, পাতা, ফুল ও অন্যান্য ডিজাইনের সজ্জা।

কুলীনগ্রামের গোপাল মন্দিরটির অঙ্গবিন্যাস স্বাভাবিক নহে। আসন পঞ্চরথ, বাড়খণ্ডে লম্বমান বিভাগও তদনুরূপ, কিন্তু গণ্ডীর উপরে পগরেখা সাতটি করিয়া। গণ্ডীটি আবার অন্যসব মন্দিরের মত বাড়ের সমগ্র ক্ষেত্র ব্যাপ্ত করিয়া উঠে নাই—চারিপাশে খানিকটা করিয়া অংশ ছাড়িয়া ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। দেওয়ালের উপর হইতে গণ্ডীর পাদমূল পর্য্যন্ত একটি সমতল ছাদ চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়াছে। গণ্ডীটি প্রকৃতপক্ষে গর্ভগৃহের আচ্ছাদন। এই অবস্থায় যাহা হওয়া স্বাভাবিক, দেওয়ালের স্থূলতা অত্যধিক, এই স্থূলতার মধ্যেই পূর্ব্বদ্বারী মন্দিরটির সম্মুখের দিকে একটি অন্তরাল কক্ষ। দক্ষিণ দিকে আরও একটি প্রবেশদ্বার…সুপরিসর দেওয়াল ভেদ করিয়া প্রবেশপথটি গর্ভগৃহে আসিয়া শেষ হইয়াছে। বাড ও গণ্ডীর এই অস্বাভাবিক সম্পর্কের কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে মূল মন্দিরের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া গেলে পরবর্ত্তীকালে পুনর্নির্মাণের সময় এই বৈষম্য ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু গণ্ডীর আকৃতি দেখিয়া অবশিষ্ট অংশের সহিত উহাকে সমসাময়িক বলিয়াই তো মনে হয়। পুনর্নিম্মাণ যদি হইয়াও থাকে তবে সময়ের ব্যবধান যে খুব বেশী হইবে এমন সম্ভাবনা কম। মন্দিরটিতে অলঙ্করণ বিশেষ নাই। বাড়ের পাদদেশে রথকসমূহের উপর কয়েকটি লম্বমান সূক্ষ্ম রেখা—বৈচিত্র্যায়নের প্রচেষ্টা ইহাতেই সীমাবদ্ধ। পূর্বদিকে প্রধান দ্বারপথের উপরে ও পার্শ্বে পোড়ামাটির কিছু অলঙ্করণ। আগেই বলিয়াছি সৌধটির কালনির্ণয়ে ইহার অলঙ্করণ অনেকটাই সাহায্য করিতেছে।

কোদালিয়া মঠে গণ্ডীর বহিরেখা কোথাও বেশী বাঁকিয়া যায় নাই। ইষৎ বক্রভাবে খানিকটা উঠিবার পর গণ্ডী ভিতরের দিকে একটু বেশী ঝুঁকিয়া গিয়াছে। সংস্কারের ফলে গণ্ডীর শেষ অংশ কিছুটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মনে হয় কিন্তু বহিরেখার গতিভঙ্গের দিকে চাহিলে বোঝা যায় বৈঁচী ও কুলীনগ্রামের মন্দিরের মত ইহার অন্তভাগ সঙ্কুচিত হইয়া যায় নাই। সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মস্তক অংশ অর্থাৎ বেকী আমলক প্রভৃতির কোন অস্তিত্ব আর নাই। সংস্কারের ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বৈদ্যপুরের দেউলটি। গণ্ডীর উপরে একটি চারচালা আচ্ছাদন তুলিয়া সংস্কারক তাঁহার দায়িত্ব শেষ করিয়াছেন, গণ্ডীর বহিরেখার গতিভঙ্গও তাই শেষ পর্য্যন্ত আর বুঝিয়া ওঠা যায় না। কিন্তু আদি রূপের যতটুকু এখনও রহিয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয় ইহার কোদালিয়া মঠের সমগোত্রীয় হওয়াই সম্ভব, বহিরেখার সেই নিয়ন্ত্রিত গতিভঙ্গই যেন ফুটিয়া উঠে।

কোদালিয়া মঠ ও বৈদ্যপুরের দেউলে আকৃতিগত ঘনিষ্ঠতা যেমন সুপরিস্ফুট অলঙ্করণ বিন্যাস

ও বৈচিত্র্য আরোপ করিবার ব্যাপারে কিন্তু আত্মীয়তা এতটা নিকট নহে। আগে বৈচিত্র রচনার কথাটাই বলিয়া লই। বৈদ্যপুর দেউলের গাত্র বাহিয়া আনুভূমিক রেখার সজ্জা বৈঁচী-দেউলটিরই অনুরূপ। কোদালিয়া মঠে কিন্তু আনুভূমিক রেখার প্রাবল্য অনেক বেশী। সংস্কৃত অবস্থায় দেখিতেছি ভিত্তিভূমি হইতে কিছুটা উঠিবার পরেই রথকবিভক্ত দেওয়ালের উপর আনুভূমিক বন্ধনীর সারি একেবারে গণ্ডীর শেষ অবধি বিস্তৃত। দুইটি রেখার মধ্যে বিরতি সামান্যই। বস্তুতঃ বৈদ্যপুর ও বৈঁচীগ্রামে যাহা প্রকৃতপক্ষে গণ্ডীর উপরে আবদ্ধ ছিল তাহাই এখানে সমগ্র মন্দিরদেহে বিস্তৃত হইয়া তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এই সর্বব্যাপী বিস্তার বাধা পাইয়াছে দুইটি স্থানে। সম্মুখভাগে প্রবেশদ্বারের জন্য নির্মিত আয়তাকার সুবৃহৎ কুলুঙ্গিটির উপর আর বাড় ও গণ্ডীর মধ্যস্থিত কার্ণিসটির মধ্যভাগের উপর কোন বন্ধনী-রেখা নাই।

বৈদ্যপুরে অলঙ্করণের উপকরণ হইল প্রধানতঃ লতা, ফুল ও বিভিন্ন ডিজাইন। দক্ষিণের দ্বারপথের উপরে ও পশ্চিমে ও উত্তরের আবদ্ধ দ্বার দুইটির খিলানের ধারে ধারে এগুলিকে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণ দিকের দ্বারপথের উপরে একসারি মূর্তি—রাম-রাবণের যুদ্ধ। কোদালিয়া মঠের অলঙ্করণ-বিন্যাস কিছুটা বিচিত্র। দেওয়ালের উপর দুইটি বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশে ও দ্বারপথের জন্য রচিত কুলুঙ্গির বন্ধনীর উপর মূর্তি, লতা, পাতা ও অন্যান্য ডিজাইন শূন্য অংশগুলিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আনুভূমিক বন্ধনী ও বিচিত্রপূর্ণ অলঙ্করণের প্রয়োগে সমগ্র দেওয়াল আবৃত করিয়া ফেলিবার পরিকল্পনা, যতদূর জানা যায়, এই একটি মন্দিরেই বিদ্যমান।

মন্দির চারটি সম্পর্কে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। গণ্ডীর উপর সারিবদ্ধভাবে কতকগুলি আয়ত ছিদ্র পাদমূল হইতে শেষ অবধি বিন্যস্ত। কি কারণে যে এগুলি প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা বলা দুষ্কর, হয়ত ভিতরে আলোর রশ্মি যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে তাহারই জন্য এই ব্যবস্থা। বস্তুতঃ ইহাদের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ছিল না, জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেও পারে নাই। পরবর্তী কোন মন্দিরে আর ইহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

বরাকর, গৌরাঙ্গপুর হইতে শুরু করিয়া কুলীনগ্রাম, বৈঁচী, বৈদ্যপুর, কোদালিয়ার মন্দিরগুলির মধ্য দিয়া ভাবকল্পনার একটা সুনির্দিষ্ট ধারা ক্রমশ রূপলাভ করিতেছে মনে হয়। পরবর্তীকালে ইটের মাধ্যমে যত শিখর মন্দির নির্মিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই এই ভাবকল্পনাকে অবলম্বন করিয়াই গঠিত। বর্হিরেখার গতিভঙ্গও সাধারণতঃ একদিকে কোদালিয়া মঠ ও বৈদ্যপুরের-দেউল ও অন্যদিকে কুলীনগ্রামের গোপাল মন্দির ও বৈঁচী-দেউল ইহারই মধ্যে আবর্তিত। তবে কুলীনগ্রাম বৈঁচীর গতিভঙ্গই যেন অধিকপরিমাণে স্বীকৃত ও গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর মন্দিরে পরিমাণ জ্ঞানের অভাবটাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। ক্রমহ্রস্বায়মান গণ্ডীর বর্হিরেখার গতিভঙ্গ প্রায়ই নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ও উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে নির্মিত বৈঁচীগ্রামের অপর তিনটি ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর মন্দির, বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর গ্রামের শান্তিনাথ শিব মন্দির ও ভদ্রপাড়ার কয়েকটি শিব মন্দির, সোনামুখী শহরের গিরিগোবর্দ্ধনের নিকটস্থ শিব মন্দির, বীরভুম জেলার সিউড়ীর নিকটে ভাণ্ডীরবনের ভাণ্ডীশ্বর শিব মন্দির, বর্দ্ধমান জেলার কালনা শহরের প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির, বর্দ্ধমান শহরের গোলাপ বাগের উত্তরদিকের

শিব মন্দিরগুলি ও রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকের শিব মন্দিরগুলি, বীরভূম জেলার হেতমপুর গ্রামের দেওয়ানজীর শিব মন্দির, কাটোয়ার উত্তরে সীতাহাটী গ্রামের শিখর মন্দির ও মানকর গ্রামের শিখর মন্দির সমূহ—এই সবগুলিতে বাড়ের দৈর্ঘ্যের তুলনায় গণ্ডী হইয়া গিয়াছে সংক্ষিপ্ত। নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যে গণ্ডীর উচ্চতা আবদ্ধ রাখিতে গিয়া কৃত্রিম উপায়ে বাঁকাইয়া দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ক্ষেত্র বিশেষে উর্দ্ধসীমা এতই কম যে গণ্ডীর আকৃতি অনেকটা গম্বুজের মত দেখায়। কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দিরে ও বর্দ্ধমান শহরের মন্দিরগুলিতে এই সমস্যাই প্রকট। এই সমস্যাই আরও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর শহরের মাহেশের সুবিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরে ও তমলুক শহরের হরির বাজারের হরি মন্দিরে। গর্ভের পরিমাপের তুলনায় সৌধের উচ্চতা অনেক কম, অথচ বাড় অংশে এ বৈষম্য নাই, যাহা কিছু ঘটিয়াছে সবটাই গণ্ডীকে লইয়া। দেওয়ালের উপর হইতে গণ্ডী এত দ্রুত বাঁকিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে যে সুপ্রশস্ত আসনের সহিত মন্দির দেহের কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কই গড়িয়া উঠে নাই। গণ্ডীর আকৃতি যে এই ভাবে খর্ব হইয়া উঠিতে পারে এ সম্ভাবনা ষোড়শ শতকের অন্তত একটি মন্দিরে—বৈঁচীর দেউলে—পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। কুলীনগ্রামের গোপাল মন্দিরে, বৈদ্যপুর দেউলে ও কোদালিয়া মঠে উচ্চতার সবটুকু সম্ভাবনা পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু বৈঁচীর দেউলে বহিরেখা ইহাদের তুলনায় দ্রুত বাঁচিয়া গিয়াছে বলিয়া—উচ্চতার সম্ভাবনা পূর্ণরূপ লাভ করিতে পারে নাই। এ দুর্বলতা দেখিতেছি রহিয়াই গেল। ক্রমে উচ্চতা আরোপের প্রশ্ন আর সমস্যা সৃষ্টি করিল না।

পশ্চাতদৃষ্টিতে শিশিরকুমার

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মরদেহ আজ থেকে ৭ বছরেরও বেশী আগে পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছে। শেষ নিশ্বাস ফেলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বোধহয় তিনি নাটকের কথাই ভেবেছেন; বাংলার নাট্যশালার উন্নয়ন, জাতীয় নাট্যশালার রূপরেখা—এইসব নিয়েই যখন মাথা ঘামাচ্ছেন তখন নবাগত তথা উদীয়মানরা তাঁকে বাতিলের দলে ফেলে নতুন কি করা যায় তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

১৯৪৩ সালকে বাংলা নাট্যশালার ক্ষেত্রে লক্ষ্যণায় বিভাজক বলে গণ্য করা হয় কারণ পঞ্চাশের মন্বন্তর আর নবান্ন একই সঙ্গে সমস্ত জাতের জীবনে একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। নবান্নর মঞ্চায়নের সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা চালু হয়ে গিয়েছিল যে, প্রাচীন পন্থাকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছিল এবং প্রাচীন পন্থীরা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। তাঁদের আর কোন ক্ষমতা নেই।

নাট্যাচার্য ঠিক এই সময়েই 'দুঃখীর ইমান' প্রযোজনা করে প্রমাণ করেছিলেন তিনি বাতিলের দলে নয়ই উপরন্তু নতুন যে আন্দোলন সেই সময় দানা পাকিয়ে উঠছিল তারও প্রথম সারিতে তাঁর সম্মানের আসন বাঁধা। কিন্তু নাট্যজগতে আত্মপ্রকাশ করার মুহূর্ত থেকে যে দুর্ভাগ্য তাঁকে জড়িয়ে রেখেছিল তারই চাপে আর এগোতে পারেন নি। না পারাটা যে বাংলা নাট্যশালার চরম দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক একথা কিন্তু কেউ স্বীকার করেন নি। এমনকি বর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকার যার উপর বর্তেছে বলে অনেকে মেনে নেন তিনিও অশ্লীলকণ্ঠাবদান নিয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করেছেন।

শিশিরকুমার এতে ব্যথা পেয়েছিলেন কি তা নিজের মনের গোপনেই রেখে দিয়েছিলেন। এবং নিজের সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের মধ্যে আপন প্রারব্ধ কার্য সমাপন করার কাজে নীরবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বারবার তাঁর প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছে, বার বার সাফল্যের স্বর্ণসম্ভাবনা তাঁর নাগালের মধ্যে এসে আবার মায়ামরীচিকার মত দিকচক্রবালে বিলীন হয়েছে। কিন্তু তবু তিনি বিরত হননি, থেমে যান নি, বারবার নব উদ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন, অন্ততঃ যেতে চেষ্টা করেছেন।

৭০ বছর বয়সেও তিনি নতুন রীতির কথা ভেবেছেন, বিদেশী লেখকদের নাটক পড়ছেন, বার্টোল্ট ব্রেখটের নাটকের প্রশংসা করছেন, বলেছেন একসেপশন এণ্ড দি রুল ভাল বই, বলেছেন ককেসিয়ান চকসার্কেল বাংলায় রূপান্তরিত করলে ভাল নাটক হয় (শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ব্রেখটের ঐ নাটকটির যে অনুবাদ করেছেন তার কতটা শিশিরকুমার অনুপ্রাণিত তা আমরা জানি না, তবে ব্রেখটের নাটক নিয়ে যে তাঁদের দু জনের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল এটুকু বলতে পারি।

এ প্রসংগ তোলার কারণ, ব্যাপারটির ওপর শ্রীচট্টোপাধ্যায় আলোকপাত করতে পারেন এবং তাতে শিশিরকুমারের চিন্তাধারার আভাস পাওয়া সম্ভব।) তাঁর যা বয়স হয়েছিল তাতে যদি তিনি মনের সব কটা প্রবেশদ্বার নিরুদ্ধ করে অতীতের মধ্যে নিমগ্ন থাকতেন, কেউ তাঁকে দোষী করত না। তবু নিজের মনের তাগিদেই বাইরের আলো হাওয়াকে মনের মধ্যে অবাধে ঢুকতে দিয়েছিলেন।

তখনো তাঁর ধ্যানজ্ঞান বাংলা নাট্যশালার উন্নতি। স্বাধীনতার পর নাট্যশালার সম্ভাব্য উন্নতির পথ না দেখতে পেয়ে তিনি ক্ষুব্ধ, কি ভাবে জাতীয় নাট্যশালার ব্যবস্থা করা যায়, কি তার ধরণ হবে, কি ভাবে ছাত্রদের সেখানো হবে, নাটক কি মঞ্চস্থ হবে, কি ভাবে হবে—এই সব কথা নিয়ে ভাবছেন।

হয়ত কতকটা ঐ নিয়ে ব্যস্ত থাকায়, হয়তো কিছুটা জনগণের কাছ থেকে সহযোগিতার প্রত্যাশায় নিজের নাট্যশালা হাত থেকে বেরিয়ে গেল। ভাগ্যনির্ভর মানুষ এর মধ্যে দৈবের খেলা দেখতে পাবেন, অন্যরা দেখবেন চরম অসতর্কতা। কিন্তু তিনি নিজে তখনও সুনিশ্চিত, নতুন করে থিয়েটার হবে তাঁর। তার জন্য হেন লোক নেই যার কাছে তিনি যান নি, হেন সংস্থা নেই যাদের কাছ থেকে সহযোগিতার প্রত্যাশা করেন নি; কিন্তু হায় সবই আশার ছলনা। ১৯৫৮র ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর আশা ছিল ১৯৫৯-এর গোড়াতেই নতুন করে নাট্যশালা সুরু করতে পারবেন।

তা তিনি পারেননি কারণ সেদিন তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা কেউ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান নি, কেউ বলেন নি—আমি আছি আপনার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে। যদি তাঁরা তা বলতেন নাট্যাচার্যের জীবনের শেষ কটা মাস আর একটু শান্তির হত। হয়ত শেষ কালের বড একটা ইতর বিশেষ হত না, তবু এইটুকু সান্ত্ব না থাকত যে তাঁর পতাকা বহন করবার লোক তাঁর পাশেই আছে।

সেদিন এক মহামহীরুহের পতন দূর থেকে সবাই লক্ষ্য করেছে, মনে মনে ভেবেছে, যাক যে আলো বাতাস এতদিন ওঁর দখলে ছিল এবার তা আমার ভাগে আসবে।

তারপর কালচক্র আপন আবর্তন পথে বছরের পর বছর কাটিয়ে গেছে, সেদিনকার উষ্ণ রক্তস্রোত অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছে, নতুন করে অতীতের মূল্যায়ন করতে বসেছেন অনেকেই। আজ তাই শুনছি, নবান্নর ওপর শিশিরকুমারের নাট্য প্রয়োগ পরিকল্পনার প্রভাব পড়েছে। শুনছি, শিশিরকুমারের নাট্যজীবনের বঞ্চনা তাঁর চেয়ে বাংলা দেশকে, বাংলাভাষাকে, বাংলাভাষীকে অধিকতর বঞ্চিত করেছে। যে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন তা শুধু তাঁকেই ব্যর্থ করেনি, বাংলা নাটককেও ব্যর্থ করেছে।

এতদিন পরে হঠাৎ এ কথার বলার অর্থ কি? যদি তাঁর জীবিতকালেই একথা মনে হয়ে থাকেত কেন তা প্রকাশ করা হয়নি? নাট্যশিক্ষক শিশিরকুমার সম্বন্ধে আজ যে সব প্রশংসা বাক্য বলা বা লেখা হচ্ছে তাত পূর্বে প্রচলিত ধারণার বিপরীত মেরুগামী নয়? অনেকবার অনেক প্রসংগে ত শুনেছি, শিশিরকুমার কাউকে শেখাতেন না, সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে প্রসংশার সিংহভাগও নিজে নিতেন। এ পর্যন্ত বলতে শুনেছি, কোন অভিনতা যদি একটু বেশী পরিমাণ প্রশংসা পেতেন তিনি তাকে বসিয়ে দিতে ইতস্ততঃ করেন না। (অবশ্য আমাদের ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতা থেকে এই সব প্রচলিত ধারণার কোন প্রমাণ পাইনি, যেমন পাইনি সম্পূর্ণ রিক্ত শিশিরকুমারের কাছে দীর্ঘদিন নাট্যাভিনয়ের ফলে জমিয়ে রাখা 'যখের ধনের' হদিশ। কিন্তু আমাদের কথা এখানে অবান্তর, অন্যদের কথা হচ্ছে।)

নতুন যারা বলছেন তাঁরা শিশিরকুমারের জীবনের শেষ দিকে কেন তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ান নি তার একটা সম্ভাব্য জবাব খাড়া করা কঠিন নয়—তাঁর কাছে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। স্বীকার করছি, তাঁর চার পাশে এমনই একটা পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল যা ভেদ করে তাঁর কাছে পৌছানো কঠিন ছিল। কিন্তু তা সত্বেও তাঁর কাছে পৌছানোর আন্তরিক কোনো চেষ্টা হয়েছিল কি?

ইতিহাসের বিচার বড নির্মম, সে কাউকে রেয়াত করে না। আজকে যে মহান রূপে পরিচিত হয়ত তাকেই ভবিষ্যৎ কাল অতি ক্ষুদ্র বলে রায় দেবে। সে বিচারেও শিশিরকুমারের স্থানচ্যুতির কোন আপাতঃ সম্ভাবনা নেই। তাই বুঝি তাঁর অতীত শিষ্যরা বুড়ি ছুঁয়ে রাখছে, 'দীন যথা রাজেন্দ্র সংগমে যায় দূর তীর্থ দরশনে' এই প্রত্যাশায়।

সম্পূর্ণ ভিন্ন পথগামী হলেও একই দিনে যে দুজন মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছিল তাঁদের শেষ জীবনে কিন্তু আশ্চর্য একটা সাদৃশ্য আছে। মহাত্মা গান্ধীকে জাতির জনক বলে প্রশংসা করলেও স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত আগে ও পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে সর্বাধিক অবহেলা পেয়েছিলেন। শিশিরকুমারের সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। দুজনের মৃত্যুটাও আকস্মিক। ইতিহাসের ভাগ্যবিধাতা দুজনকেই ভাঙনের শেষ ফল প্রত্যক্ষ করার জন্য জীবিত রাখেন নি, তা নাহলে আজকের ভারতের অবস্থা দেখে মহাত্মা গান্ধী যেমন মর্মাহত হতেন, বাংলা নাট্যশালার বর্তমান অবস্থা দেখে শিশিরকুমারও তেমনি ব্যথা পেতেন। তার চেয়ে নিতান্ত সুসময়েই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

তাঁর জন্মদিনে, এ আশা বোধহয় অন্যায় হবে না যে, নিন্দুকের প্রতিবেদন আর স্তাবকের প্রশংসা কিছুই নাট্যাচার্যের আসনে মালিন্যের দাগ দিতে পারবে না। শিশিরকুমার অমর রহে।

রবি মিত্র

সমালোচনা

বিদেশীদের চোখে বাংলা ॥ চণ্ডী লাহিড়ী ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং ॥ কলিকাতা—৭ মূল্য ৫·২৫

—ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জন সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না—সেদিনও সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্মমৃত্যু—সুখ দুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধূলিজালই তাহার চক্ষে আর সমস্তই গ্রাস করে, কারণ সে ঘরের ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে। সেইজন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা ঝড়ের কথাই পাই; ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না।—ভারতবর্ষের ইতিহাস : রবীন্দ্রনাথ

বিদেশীদের রচিত ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করিয়া তাই স্বদেশের ইতিহাস রচনা একটি কঠিন দায়িত্ববিশেষ। এখানে ঐতিহাসিককে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হয় যাহাতে ঘরের কথাই মুখ্য হয়ে উঠে, ঝড়ের নহে। সুখের বিষয় শ্রীযুক্ত চণ্ডী লাহিড়ী তাঁহার 'বিদেশীদের চোখে বাংলা'র উদাহরণের জন্য যদিও বিদেশীদের স্মৃতিচারণ গ্রন্থ বা ডায়ারি, রোজনামচা বা ভ্রমণবৃত্তান্তের উপরই মুখ্যতঃ নির্ভর করিয়াছেন, তবু তিনি সেকালের বাঙলা ও বাঙালীর জীবনচর্যার কথাই প্রধানতঃ বিবৃত করিয়াছেন—সেদিনের সমাজ ও মানুষ এখানে তাঁহার আলোচ্য যদিও অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই তৎকালীন ইঙ্গয়ুরোপীয়দের কথাও তিনি বাদ দেন নাই।

আজকাল বাঙলা সাহিত্যে, সাহিত্য—বা দৈনিক পত্রে তথাকথিত ঐতিহাসিক রচনার বান ডাকিয়াছে। তাহাতে অত্যন্ত দুঃখের কথা, রচয়িতার ঐতিহাসিক চেতনা ও সত্যসন্ধিৎসার যত না পরিচয় আছে, তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী আছে উদ্দাম কবিকল্পনার অবকাশ—যাহা দিয়া আর যাহাই হোক ইতিহাস রচনা করা যায় না। অপটু কলমের সেগুলি এক অক্ষম প্রচেষ্টা। তাহাতে বঙ্গ সাহিত্যের কোন সমৃদ্ধি তো ঘটেই নাই, বরঞ্চ ইতিহাসের প্রতি আমাদের বেদনাদায়ক অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীযুক্ত চণ্ডী লাহিড়ী এই ধরণের ব্যর্থতা হইতে তাঁহার গ্রন্থখানিকে আশ্চর্যভাবে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার সরল রচনাভঙ্গীর সহিত তাঁহার ঐতিহাসিক বক্তব্যের বেশ একটা মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়াছে। তবে কোথাও কোথাও তাঁহার ঐতিহাসিক তথ্যের কিছু কিছু যে ভ্রান্তি ঘটে নাই এমন নহে। লেখক ডুমতলাকে ধর্মতলা বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন।—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁহার সংবাদপত্রে সেকালের কথায় এসম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"কলিকাতার কোন অংশকে ডুমতলা বলিত তাহা অনেকের জানা না থাকিতে পারে। বর্তমান এজরা ষ্ট্রীটই ডুমতলার স্থান অধিকার করিয়াছে (পৃষ্ঠা ৪১২ প্রথম সংস্করণ) সতের শ' নিরানব্বই

সালে উইলিঅম বেলী কর্তৃক প্রকাশিত মার্কউডের কলকাতার নক্সাতেও ডুমতলা টেরিটিবাজার ও পোলক ষ্ট্রীটের মধ্যেই দেখান হইয়াছে।

তাছাড়া জেমস ডগলাস সাহেব যতই বলুন না কেন ব্রিটিশ ভারতে সতেরশ ছেষট্টি সালে প্রথম থিয়েটার নির্মিত হইয়াছিল, দেখা যায় যে তাহার আগেই কলিকাতায় একটা নাট্যশালা ছিল। সতেরশ তেপান্ন সালে উইলিঅম ওয়েলস সাহেবের আঁকা ফোর্ট উইলিঅম ও কলকাতার একাংশের যে মানচিত্র আছে তাহাতে সেকালের মেয়রস্‌কোর্ট এখনকার লাল গির্জার পূব-দক্ষিণ কোণে একটি প্লেহাউস দেখান আছে। খুব সম্ভবতঃ এই থিয়েটারটাকেই কোম্পানীর খরচে গির্জায় পরিণত করা হয়। রেভারেণ্ড লঙ-এর Selection of unpublished Records of Government Vol. I গ্রন্থে লিডেনহল ষ্ট্রীট থেকে কোর্ট অব ডিরেক্টরসদের লেখা তেসরা মার্চ সতেরশ আটান্নর একটি চিঠিতে রহিয়াছে—We are told that the building formerly made use of as a theatre, may with a little expense, be converted into a church or public place of worship ; as it was built by the voluntary contribution of the place of the inhabitants of Calcutta, we think there can be no difficulty in gettieg it freely applied to the before mentioned purpose, especially when we authorise to fit it up decently at the Company's expense as we hereby do.' ইহার পর বোম্বের দাবী টেঁকে কি করিয়া ?

গ্রন্থটির সম্পাদনার সময়ও যথেষ্ট যত্ন লওয়া হয় নাই বলিয়া মনে হয়। Writers place to Bengal wanted'—পাবলিক এ্যাডভারটাইজার-এর বিজ্ঞাপনটি পর পর ৯৬ ও ১১৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি পীড়াদায়ক। একবার ইহা উদ্ধৃতি করিয়া পরেরবার এই সম্বন্ধে উল্লেখ করিলেই কি লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না ? ভিন্ন ভিন্ন দুইটি প্রবন্ধ একত্র গ্রথিত করার সময় এইটুকু যত্ন লওয়া উচিত ছিল বলিয়া মনে করি।

কিন্তু এসব সামান্য ত্রুটির কথা বাদ দিলে বইটি অবশ্যই সকল রসিক পাঠককে আনন্দ দিবে। এই প্রসঙ্গে য়ুরোপের বিভিন্ন জাতির বাঙলাদেশে উপনিবেশ স্থাপনের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুলিখিত অধ্যায়টির কথা আসিয়া পড়ে। এই পথে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে কিন্তু ভবিষ্যৎ পথিকদের লাহিড়ীমশায়ের দেখান পথ যে অবশ্যই সাহায্য করিবে, সন্দেহ নাই। এছাড়া বিদেশীদের রুচি বিবর্তনের অধ্যায়টিও যথেষ্ট সুচিন্তিত। ইংরাজ আগমনের আদিযুগের লিবারেল মনোবৃত্তি কি করিয়া এক সময় সংকীর্ণ ও কঠিন হইয়া গেল, এই প্রবন্ধে তাহারই একটি হদিশ দিবার সাধু প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। বাঙালীর ইতিহাসের মধ্যেও আধুনিক পর্ব তাই আজও অলিখিত। এই দুঃখের দিনে 'বিদেশীদের চোখে বাঙলা' ইতিহাসরসিক বাঙালীকে অবশ্যই আনন্দ দিবে।

নারায়ণ দত্ত

বিলুপ্ত হৃদয়। আজহারউদ্দীন খান। ডি. এম. লাইব্রেরি। কলিকাতা। তিন টাকা।

'বিলুপ্ত হৃদয়' পুস্তকে জনাব আজহারউদ্দীন খান বিস্মৃতপ্রায় কয়েকজন সাহিত্যসাধকের কীর্তি স্মরণ করেছেন, যারা 'ঐতিহ্য সৃষ্টি করেননি, তুঙ্গশীর্ষ প্রতিভার অধিকারীও নন কিন্তু ঐতিহ্য গঠনে ও সাহিত্যের সম্প্রসারণে নিজেদের সাধ্যমতো সহায়তা করেছেন।' এরকম ব্যক্তির সংখ্যা সাহিত্যের ইতিহাসে নিতান্ত কম নয়, কিন্তু এই পুস্তকে লেখক যে কয়জনকে তাঁর আলোচনার উপজীব্য করে নিয়েছেন নিঃসক্ততম ইতিহাসকারের নিরাসক্ততম লেখনীমুখেও তাঁরা অন্তত কতিপয় চরণ আকর্ষণ করে নেয়ার আগে নিষ্ক্রান্ত হতে পারেন বলে মনে হয় না। এই বইয়ের বিশেষত্ব এখানে লেখক ইতিহাসকারের চেয়ে আন্তরিক হৃদয়ার্দ্র অনুরাগতাড়িত দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। ইতিহাসকার যাঁদের ত্বরিত স্পর্শ করে ও দ্রুত রায় দিয়ে নিরাবেগভাবে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতে পারেন, তাঁদেরও লেখক সযত্নে তপ্ত স্বজনকরস্পর্শের মতো আন্তরিকতায় উজ্জ্বলতরভাবে তুলে ধরেছেন।

মোট আটজন সাহিত্যসাধক আলোচ্য পুস্তকে আলোচিত হয়েছেন : মীর মোশারফ হোসেন, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, এস, ওয়াজেদ আলী, শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তাফা ও জসীমউদ্দীন। এঁরা কেউই আমাদের অপরিচিত নন, এবং প্রায় কেউই এখনো অবলুপ্ত হয়ে যাননি। অনেকে এখনো পর্যন্ত বিস্মরণযোগ্য প্রাচীনতা অর্জন করেননি। প্রথমজন, যিনি বয়সের দিক থেকে প্রাচীনতম, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসেই যে শুধু স্বনামধন্য তাই নন, আমাদের কালেও—বিষাদ-সিন্ধু পড়েছেন এবং অনুরাগভরে পড়েছেন এমন পাঠক অনেক মিলবে। 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'রও অন্যতম চরিত্র মীর মোশারফ হোসেন।

কায়কোবাদ ওরফে মোহাম্মদ কাজেম আলকোরেশী-র মহাকাব্য পড়তে আমি নিজেই একসময়ে উৎসাহী হয়েছিলাম।

মুনসি আবদুল করিমকে জানেন না কিংবা তাঁর কার্যকলাপের খবর রাখেন না, বাঙলা-বিদ্যায় অনুরাগী এমন একজনও আছেন বলে মনে হয় না। আর জসীমউদ্দীন—অন্তত জনপ্রিয়তায় জসীমউদ্দীন তাঁর সমকালের জনপ্রিয়তম কবিদের প্রতিযোগী, এতে আমার সন্দেহ নেই।

লেখকের আলোচনার ভঙ্গি আমার ভালো লেগেছে বলেই জানাই, লেখকের আলোচনা-পদ্ধতির সর্বাংশই আমার সমান স্বস্তিকর মনে হয়নি। বিশেষ স্থানে স্থানে তিনি যে-সব ইংরেজি সমর্থন ব্যবহার করেছেন অনেক জায়গাতেই তা আমার কাছে বাহুল্য বা অপ্রযুক্ত বলে মনে হয়েছে। তাঁর নিজের বিবেক এবং বিচারই আমাদের কাছে এতদূর উত্তীর্ণ যে ঐ হীনম্মন্য আপ্ত-সমর্থনগুলি ব্যবহার করে তিনি নিজের উপরেই অবিচার করেছেন বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাঁর দু-একটি মন্তব্যেও বিতর্কের অবকাশ আছে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিয়মাবলী

সমকালীন

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

পুজোয় চাই
জুতো
Bata

Regd No. C-315 Phone : 23-5155 October '66 (0·50) Central Regd.No.R.N.2602/57 SAMAKALIN

চতুর্দশ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৭৩
সমকালীন

বরানগর সম্মেলনী আয়োজিত

সংগীত সম্মেলন

স্থান : মহাজাতি সদন

১লা ডিসেম্বর—রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্যনাট্য
২রা " লোকগীতি ও নৃত্যনাট্য
৩রা " উচ্চাঙ্গ সংগীত
৪ঠা " আধুনিক সংগীত

সভাপতি
শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেন

উপদেষ্টা সভাপতি
শ্রীরামপদ মাজি

অভ্যর্থনা সভাপতি
শ্রীপ্রবোধবন্ধু অধিকারী

চতুর্দশ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক তেরশ' তিয়াত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর (২২শে অগ্রহায়ণ, ১২৬০ বঙ্গাব্দ) চব্বিশপরগণা জেলার নৈহাটী শহরে একটি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পরিবারে হরপ্রসাদের জন্ম হয়। ইঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। হরপ্রসাদের পিতার নাম রামকমল ন্যায়রত্ন। রামকমল তাঁহার কৃতবিদ্য পূর্বপুরুষদের ন্যায় ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন ও তাঁহাদের পারিবারিক চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেন।

হরপ্রসাদের পিতামহ শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার ও মাতামহ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার তাঁহাদের জীবদ্দশায় পাণ্ডিত্যের জন্য সমাজে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

হরপ্রসাদের বয়স যখন আটবৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। এই সময়ে হরপ্রসাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী নামক স্থানের এ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন। নন্দকুমার পিতৃহীন চতুর্থ সহোদরকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া কান্দী স্কুলে ভর্তি করাইয়া দেন। কান্দীর স্কুলেই হরপ্রসাদের ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। কান্দী স্কুলে হরপ্রসাদ 'শরৎনাথ ভট্টাচার্য' নামে ভর্তি হন। বাল্যকালে তিনি এই নামেই অভিহিত ছিলেন। পরবর্তী কালে কঠিন রোগমুক্তির পর তাঁহার নূতন নামকরণ হয় 'হরপ্রসাদ'। শিবের প্রসাদে রোগমুক্ত হইয়াছেন এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তাঁহার আত্মীয়গণ এই নতুন নামকরণ করেন। হরপ্রসাদের কান্দীর স্কুলে প্রবিষ্ট হওয়ার অল্পকাল পরেই নন্দকুমারের অকালমৃত্যু হয়। অগত্যা হরপ্রসাদ নৈহাটীতে ফিরিয়া আসেন এবং কয়েকবৎসর কাঁটালপাড়ায় টোলে ও স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ইংরাজী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে হরপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। হরপ্রসাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমার পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ

স্নেহভাজন ছিলেন, এই সূত্রে হরপ্রসাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহের ছাত্রাবাসে আশ্রয় লাভ করেন। অর্থাভাবও অন্যবিধ দুঃখ কষ্টের মধ্যে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিতে হইলেও হরপ্রসাদ ছাত্রাবস্থাতেই বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দান করেন ও পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য অনেকবার বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে হরপ্রসাদ উচ্চশ্রেণীর বৃত্তি পাইয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হরপ্রসাদ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম, এ, ডিগ্রী ও এই সঙ্গে সংস্কৃত কলেজ হইতে "শাস্ত্রী" উপাধি লাভ করেন।

এম, এ উপাধি লাভের পর হরপ্রসাদ কলিকাতা হেয়ার স্কুলে একটি শিক্ষকের পদ লাভ করেন। প্রায় পাঁচবৎসরকাল তিনি এই পদে কার্য করেন। ইহার মধ্যে একবৎসর কাল (১৮৭৮-৭৯) ছুটি লইয়া স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি লক্ষ্ণৌএর ক্যানিং কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের কার্য করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার ও ব্যাকরণের অধ্যাপকপদে যোগদান করেন। এই বৎরেরই সেপ্টেম্বরমাসে তিনি সরকারী অনুবাদক (A-st translator) নিযুক্ত হন। প্রায় তিন বৎসর এই পদে কার্য করার পর তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক (Librarian) পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে হরপ্রসাদ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ইহার পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হরপ্রসাদ এই অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার পর গভর্ণমেণ্ট মনস্বী হরপ্রসাদকে "Bureau of Information for the benefit of civil officers in Bengal in history, religion, customs and folklore of Bengal" নামক প্রতিষ্ঠানের প্রধানরূপে নির্বাচিত করেন। অবসরকালে এই কার্যের জন্য হরপ্রসাদ মৃত্যুকাল পর্যন্ত মাসিক ১০০ টাকার একটি বৃত্তি ভোগ করিতেন। এশিয়াটিক সোসাইটি মারফৎ এই বৃত্তি দেওয়া হইত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হরপ্রসাদকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জুনমাস হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত হরপ্রসাদ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।. ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাবত্তার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক (Honoris causa) D. Lit উপাধিতে ভূষিত করেন।

হরপ্রসাদ যখন সংস্কৃত কলেজে বি, এ, ক্লাসের ছাত্র তখন তিনি "ভারত-মহিলা" নামে একটি প্রবন্ধ পুস্তক (Essay) রচনা করিয়া মহারাজ হোলকার প্রদত্ত একটি পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রবন্ধ পুস্তকে সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত আদর্শস্থানীয়া মহিলাদের জীবন-কাহিনী আলোচিত হয়। এই রচনাটি প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়া (১২৮২, মাঘ-চৈত্র), ১২৮৭ বঙ্গাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। "ভারতমহিলা" প্রকাশ-সূত্রে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পরিচিত হন ও তাঁহার স্নেহলাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে বঙ্কিমচন্দ্রের একজন ভক্ত ও অনুরক্ত শিষ্য বলিয়া পরিচয় দান করিতে গৌরব বোধ করিতেন। "ভারতমহিলা" প্রকাশের পর

১২৮২ হইতে ১২৯০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত হরপ্রসাদের ২৫টিরও অধিক রচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে হরপ্রসাদ রচিত "বাল্মীকির জয়" নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়, ইতিপূর্বে ইহার কতকাংশ বঙ্গদর্শনেও প্রকাশিত হইয়াছিল। হরপ্রসাদ পরিণতজীবনে "কাঞ্চন মালা" (১৩২২) ও "বেণের মেয়ে, (১৩২৬) নামে দুইখানি ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস রচনা করেন—এই দুইখানি পুস্তক রচনা শৈলী ও বিষয়বস্তু গুণে বাঙ্গলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে তিনি "মেঘদূত ব্যাখ্যা" নামে একটি প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশ করেন। হরপ্রসাদ প্রধানতঃ একজন সুপণ্ডিত গবেষকরূপেই পরিচিত ছিলেন, তাঁহার প্রতিভার প্রধান পরিচয় তাঁহার গবেষণা-মূলক রচনাগুলিতেই নিবদ্ধ আছে। হরপ্রসাদের গবেষণাধর্মী রচনাগুলির কথা বাদ দিলেও বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার সৃজনধর্মী মৌলিক রচনাবলীর অপরিসীম মূল্য আছে। বাঙ্গলা গদ্যসাহিত্যের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ রূপে হরপ্রসাদ এদেশে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার ও কৃতবিদ্য সংস্কৃতজ্ঞ সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়তা করেন। সরকারী কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক পদের দায়িত্ব অতি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করিয়াও হরপ্রসাদ তাঁহার দীর্ঘজীবনের মধ্যে কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-পুরুষ রূপে পরিগণিত হইতেন, তাঁহার নায়কত্বে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই বিশেষ উন্নতি হয়।

তরুণ সংস্কৃতজ্ঞ হরপ্রসাদ শিক্ষাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন কর্ণধার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত পরিচিত হন। রাজেন্দ্রলাল এই সময় নেপাল হইতে আনীত সংস্কৃত-বৌদ্ধ পুঁথি সমূহের তালিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন। অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়াতে তিনি এই কার্যে হরপ্রসাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হরপ্রসাদ পরম নিষ্ঠার সহিত এই কার্যে তাঁহার সহায়তা করেন। রাজেন্দ্রলালের সংস্পর্শে আসিয়াই হরপ্রসাদ ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-চর্চায় আগ্রহান্বিত হন এবং এই সূত্রেই জীবনে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের আনুকূল্যে হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির ভাষাতত্ত্ব বিভাগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন (Philogical Secretary)।

এই পদাধিকারী রূপে সোসাইটির "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালার সংস্কৃত পুস্তকগুলি প্রকাশের দায়িত্বভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আজীবনের জন্য তিনি সোসাইটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময়ের মধ্যে তিনি দুইবার সোসাইটির সভাপতির পদেও বৃত হন (১৯১৯-২০, ১৯২০-২১)। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি সোসাইটির "ফেলো" শ্রেণীভুক্ত হন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর সোসাইটি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে হরপ্রসাদকে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ কার্যের পরিচালক নিযুক্ত করেন (Director of the oprations for search of Sanskrit Mss) এই কার্যের ভার-প্রাপ্ত হওয়ার পর হইতে হরপ্রসাদের অধিকাংশ সময় পুঁথি সংগ্রহ ও তাহাদের পরিচয় সমন্বিত তালিকা রচনাতেই ব্যয়িত হয়। পুঁথি সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত অধিকারী রূপে হরপ্রসাদ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বহু দূরবর্তী অঞ্চল ভ্রমণ করেন ও অজস্র পুঁথি সংগ্রহ করেন। পুঁথি

সংগ্রহ কার্যে তিনি চারিবার নেপাল রাজ্যে গমন করেন (১৮৯৭, ১৮৯৮-৯৯, ১৯০৭, ১৯২১) ও বহু দুষ্প্রাপ্য ও লুপ্ত পুঁথি সংগ্রহ করেন। শেষবার হরপ্রসাদ যখন নেপাল গমন করেন তখন তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর। পুঁথি সংগ্রহকার্যে হরপ্রসাদের অদম্য নিষ্ঠা ও উৎসাহ ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়। রাজেন্দ্রলালের দ্বারা সোসাইটিতে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Notices)দশখণ্ডে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয় (১৮৭০-৮০)। রাজেন্দ্রলাল দশমখণ্ডটির দ্বিতীয়ভাগ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। হরপ্রসাদ প্রথম পর্যায়ের দশমখণ্ডের দ্বিতীয়ভাগ সম্পূর্ণ করেন, ইহাতে ১০২৫টি পুঁথির বিবরণ ছিল, এতদ্ব্যতীত তিনি এই দশখণ্ড বিবরণীর একটি সূচী (Indices) আর একটি খণ্ডে প্রকাশ করেন (১ ক)। এই গ্রন্থমালার নবপর্যায়ের চারিটি খণ্ডে তিনি ১৪৭৩টি পুঁথির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন (১ খ)। পুঁথি সংগ্রহকার্যে ব্যাপৃত হইয়া হরপ্রসাদ এই বিষয়ে কয়েক খণ্ড প্রতিবেদন (Report) প্রকাশ করেন (২)। নেপাল ভ্রমণে গিয়া হরপ্রসাদ নেপাল রাজপরিবার পাঠাগারে রক্ষিত তালপত্র ও অন্যবিধ কাগজে লিখিত ১৫৮৮টি গ্রন্থের তালিকাও সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন (৩)। এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য পুঁথি সংগ্রহ, পুঁথি প্রাপ্তির প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াই হরপ্রসাদ ক্ষান্ত হন নাই। আজীবন পরিশ্রম করিয়া হরপ্রসাদ এইগুলিকে বিষয়ানুযায়ী বিন্যস্ত করেন এবং ১৪টি সুবৃহৎ খণ্ডে ১৪৬৮৬ পুঁথির বিবরণ সঙ্কলন ও লিপিবদ্ধ করেন। হরপ্রসাদের জীবদ্দশায় এই বিস্তৃত বিবরণীর ছয়খণ্ড প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদের দেহান্তের পর এই বিবরণীর বাকী খণ্ডগুলি এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক বিভিন্ন পণ্ডিতের সম্পাদনায় বিভিন্ন সময়ে হরপ্রসাদের নামেই প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। চতুর্দশ ও শেষতম খণ্ডটি ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্যবর্তী দ্বাদশখণ্ডটি (আয়ুর্বেদ পুঁথি) এবং ত্রয়োদশখণ্ডের দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হইলেই হরপ্রসাদ আরব্ধ এই বিস্তৃত পুঁথি বিবরণী প্রকাশ সম্পূর্ণ হইবে (৪)। সোসাইটির জন্য ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হরপ্রসাদ আট হাজারেরও অধিক পুঁথি সংগ্রহ করেন। বৌদ্ধ সাহিত্য, বৈদিক সাহিত্য, স্মৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, পুরাণ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, তন্ত্র, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এই পুঁথিগুলি লিখিত। এমন কি ক্রীড়াকৌতুক ও পক্ষী-শিকার বিষয়েরও পুঁথি হরপ্রসাদের চেষ্টায় সংগৃহীত হয়। হরপ্রসাদের সংগৃহীত পুঁথিগুলি ও তাঁহার দ্বারা সঙ্কলিত পুঁথি তালিকা, বিবরণ প্রভৃতি সংস্কৃত বাঙ্ময়ের ইতিহাস রচনায় অতি মূল্যবান উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই বিস্তৃত পুঁথি তালিকার (Descriptive Catalogue) কয়েকটি খণ্ডে হরপ্রসাদের স্বলিখিত বহু পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য পুস্তক সংগ্রহ ব্যতীত হরপ্রসাদ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট ও বডলেয়ন লাইব্রেরীর জন্যও বহু দুর্লভ পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দেন।

সোসাইটির জন্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়াই হরপ্রসাদের উৎসাহ ক্ষান্ত হয় নাই, এই পুঁথিগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও তিনি সম্যক জ্ঞান আহরণ করেন ও এই জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিয়া বহু মৌলিক তথ্য প্রচার করেন।

হরপ্রসাদ নিজের আবিষ্কৃত অনেকগুলি দুর্লভ ও অপ্রকাশিতপূর্ব গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ

করেন (৫-১৩)। এইগুলির অধিকাংশই সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকগুলির মধ্যে সন্ধ্যাকরনন্দী রচিত রামচরিত কাব্যটি শুধু সংস্কৃত কাব্য হিসাবেই নহে, প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস ও সমাজ-দর্শন হিসাবেও উল্লেখযোগ্য। "সৌন্দরনন্দ'' কাব্যটি কালিদাস পূর্ববর্তী কবি অশ্বঘোষের রচনা, এই কাব্যের নন্দ ভগবান বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সুন্দরী স্ত্রীর মোহজাল ছিন্ন করিয়া নন্দ কর্তৃক বুদ্ধের শরণ গ্রহণের আখ্যায়িকা এই মনোহর কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। "চতুঃশতিকা'' বৌদ্ধদর্শনের প্রাচীন পুঁথি। "অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ'' পুস্তকে বৌদ্ধদর্শন বিশেষতঃ বজ্রযান মতবাদ ২১টি নিবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "বল্লাল চরিত" গ্রন্থটি আনন্দভট্ট কর্তৃক সেনরাজ বল্লালসেনের রাজত্ব-কালের ৩০০ শত বৎসর পরে লিখিত হয়—এই বইটিতে বাঙ্গলার সেনরাজযুগের ইতিহাস পাওয়া যায়। শৈনিকশাস্ত্র গ্রন্থটির ৭টি অধ্যায়ে শ্যেনপক্ষী (বাজ) শিকারপদ্ধতি ও শ্যেনপক্ষীর বিবরণ আছে।

নেপাল হইতে হরপ্রসাদ সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম সুভাষিত সংগ্রহের একটি খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কার করেন, এই পুঁথিটির আখ্যাপত্র ও পুষ্পিকা না থাকায় ইহার নাম বা সঙ্কলন কর্তার নাম জানা যায় নাই। হরপ্রসাদ তাঁহার বিপুল পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার বলে সিদ্ধান্ত করেন যে এই সংগ্রহটি দশম শতাব্দীর সঙ্কলন, এবং ইহার লিপি বঙ্গাক্ষরের আদিরূপ, সুতরাং সঙ্কলনস্থান ও বঙ্গদেশ। নাম না থাকায় তিনি এই পুস্তকের নাম দেন "কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়।'' ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ইংরাজ ভারত-বিদ্ পণ্ডিত F. W. Thomas পুস্তকটি এই নামেই সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন (Bibliotheca Indica No. 208, 1912)। দীর্ঘকাল পরে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ পুঁথি তিব্বত ও নেপাল হইতে পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রের অধ্যাপক গোখেল ও ডাঃ কোশাম্বী সম্পূর্ণ গ্রন্থটি "সুভাষিতরত্নকোষ'' নামে সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (Harvard Oriental Series No. 42 1957) সম্প্রতি (১৯৬৫) এই গ্রন্থের Dr. Daniel Ingalls কৃত ইংরাজী অনুবাদ এই সিরিজের ৪৪ সংখ্যক পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুঁথির আখ্যাপত্র ও পুষ্পিকা ও আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে সংস্কৃত ভাষার এই আদিতম সুভাষিত সংগ্রহটি পাল-রাজ-যুগে উত্তর বঙ্গের (বরেন্দ্রভূমি) জগদ্দলমহাবিহারের অধিবাসী বিদ্যাকর নামক পণ্ডিতদ্বারা এই বিহারেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। "সুভাষিতরত্নকোষ'' সংগ্রহ বাঙ্গালীর কীর্তি এবং ইহার লিপি প্রাচীন বঙ্গলিপিরই একটি বিশেষ অভিব্যক্তি: স্বল্পপ্রমাণের ভিত্তিতে সহজাত প্রতিভাবলে হরপ্রসাদ এই সংগ্রহ সম্বন্ধে যে প্রাথমিক মত প্রকাশ করেন—সুভাষিতরত্নকোষের সুবিজ্ঞসম্পাদকত্রয় তাহা সাধারণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। হরপ্রসাদ আবিষ্কৃত বুদ্ধস্বামী রচিত বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ নামক বহুমূল্যবান গ্রন্থটি ফরাসী পণ্ডিত Felix Lacote কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয় (Paris, 1908-29)।

একদিকে এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মক্ষেত্রে হরপ্রসাদ যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের দুর্লভ রত্ন আবিষ্কার করেন এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নানামুখী সার্থক গবেষণা সম্পন্ন করেন অন্যদিকে তিনি তেমনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মক্ষেত্রে বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত ইতিহাসকে আলোকোদ্ভাসিত করিয়া যান। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হরপ্রসাদের এই সাধনাকে বাঙ্গলা সাহিত্যের "নষ্ট কোষ্ঠী" উদ্ধার কার্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

(ভূমিকা—হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার ১৩৬৩)।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল (১৩ ১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন বৎসর পর হরপ্রসাদ ইহার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার সহিত এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ছিল। বহু বর্ষ যাবৎ তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি (১৩০৪-১৩০৯, ১৩১৮-১৩১৯, ১৩২৩-১৩২৬, ১৩৩১, ১৩৩৭-৩৮) ও সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন (১৩২০-২২, ১৩২৬-৩০, ১৩৩২-৩৬)।

এতদ্ব্যতীত পরিষৎ ১৩:৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯০৯) তাঁহাকে পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য রূপে গ্রহণ করেন। এইটি পরিষদের সর্বোচ্চ সম্মান।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নেপাল ভ্রমণে গিয়া হরপ্রসাদ সংস্কৃতেতর ভাষায় লিখিত কয়েকটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টি বলে হরপ্রসাদ অপভ্রংশে লিখিত এই রচনাগুলিকে বাঙ্গলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন রূপে চিনিতে পারেন। এই পুঁথিগুলির মধ্যে ছিল সংস্কৃত" টিকা সহ চর্যাচর্য বিনিশ্চয়, সরোজবজ্রচরিত দোহা কোষ ও কাহ্নপাদ রচিত দোহা কোষ ও ডাকার্ণব। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে এই চারিখানি পুস্তক তৎকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া "বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামে পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয় (১৪)। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শহীদুল্লা, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রভৃতি ভাষাবিদ্‌গণের অক্লান্ত গবেষণায় "বৌদ্ধগান ও দোহার" অন্তর্ভুক্ত "চর্যাচর্য বিনিশ্চয়"এর ৪৭ পদযুক্ত পুঁথির ভাষা ও অক্ষর অভ্রান্ত রূপে বাঙ্গলা বলিয়া প্রমাণিত হয়। শুধু তাহাই নহে এই ৪৭টি পদের ২৪ জন পদকর্তাও বাঙ্গালী বলিয়া নির্দিষ্ট হন। এই পদগুলি বৌদ্ধসহজিয়া মতের সাধকদের রচিত সাধন সঙ্কেতমূলক গানের সমষ্টি। দুর্বোধ্য বিধায় এইগুলির সংস্কৃত টিকা রচনা করা হইয়াছিল। "বৌদ্ধগান ও দোহা" সম্বন্ধে হরপ্রসাদের প্রজ্ঞালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি তাঁহার সমসাময়িক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক সাধারণভাবে সমর্থিত হইয়াছে। চর্যাচর্য বিনিশ্চয় বর্তমানে 'চর্যাপদ' নামে খ্যাত হইয়াছে। হরপ্রসাদ এই মত প্রকাশ করেন যে পদগুলি ১০ম শতাব্দীতে রচিত, কারণ ইহার অন্যতম পদকর্তা লুইপা বা লুইপাদ অতীশ দীপঙ্কর অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ডাঃ শহীদুল্লা চর্যাপদগুলি আরও প্রাচীন কালের অর্থাৎ ৭ম হইতে ৮ম শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে করেন, ইনি স্বয়ং চর্যাপদের একটি উত্তম সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুনীতিকুমার ও প্রবোধচন্দ্র চর্যাপদের রচনাকাল ১০ম হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে বলিয়া মনে করেন। প্রবোধ চন্দ্র পরবর্তীকালে তিব্বতীয় অনুবাদের সহিত তুলনামূলক আলোচনান্তে চর্যাপদের নির্ভুল পাঠ স্থির করিয়া দিয়াছেন (Journal of the Dept of Letters, Cal. univ, Vol XXX, 1938)। চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের সহিত বৌদ্ধ গান ও দোহায় প্রকাশিত অন্যান্য পুঁথিগুলির ভাষা পশ্চিমা অপভ্রংশ, এইগুলি যে বাঙ্গলা তাহা অবশ্য প্রমাণিত হয় নাই। যাহাই হউক হরপ্রসাদ কর্তৃক চর্যাপদ (চর্যাচর্য বিনিশ্চয়) আবিষ্কারের ফলে বাঙ্গলা ভাষার বয়স যে অন্ততঃ সহস্র বৎসর ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রই বর্তমানে আজ এই বলিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারে যে তাহার মাতৃভাষা সহস্র বৎসরের ঐতিহ্য পূর্ণ। মনে রাখিতে হইবে বাঙ্গালীর এই অধিকার হরপ্রসাদের সাধনার দান। ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে চর্যাপদ

সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে "শুধু বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের নয় তাবৎ নবীন আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া এই পদগুলি অমূল্য।" (প্রথম খণ্ড; পূর্বার্দ্ধ, চতুর্থ সং, পৃঃ ৬৪)

শাস্ত্রী মহাশয় যেমন বাঙ্গলাভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনত্ব প্রমাণও তেমনি তাঁহার কীর্তি।

এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে পুঁথি সন্ধান করিতে গিয়া হরপ্রসাদ অনেক অজ্ঞাত প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথিরও সন্ধান পান ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই সব বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লিখিত পুঁথির বিবরণ তাঁহার Descriptive Catalogue-এর ৯ম খণ্ডে সঙ্কলিত আছে। বাঙ্গলায় মুসলমান অধিকার কালের পূর্বে বাঙ্গলাভাষায় অথবা বঙ্গাক্ষরে লিখিত কোন পুঁথি হরসপ্রাদের পূর্বে কেহ আবিষ্কার করেন নাই। বঙ্গাক্ষর যে অন্ততঃ দশম শতাব্দী হইতে প্রচলিত ছিল চর্যাপদ ব্যতীত নিজ আবিষ্কৃত অপর দশখানি সংস্কৃত ভাষায় বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথি হইতে হরপ্রসাদ তাহা প্রমাণ করেন। বঙ্গাক্ষরে দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত লিপিকৃত এই পুঁথিগুলির নাম :—কালচক্রযান, ঐ টিকা, ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি, বজ্রাবলী, কুট্টণীমত, হে বজ্রতন্ত্র, রামচরিত, ঐ টিকা, দোঁহাকোষ-পঞ্জী, অদ্বয়বজ্র ও অপোহসিদ্ধি। এই পুঁথিগুলির কোন কোনটি বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আবিষ্কৃত হয় এবং বাঙ্গলাদেশেই যে এইগুলি লিপিকৃত হয় তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাঙ্গলাদেশে এক সময়ে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত পুঁথি ও অন্যান্য সূত্র হইতে হরপ্রসাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। বঙ্গদেশের বিশাল সংখ্যক নরনারী যে এককালে বৌদ্ধ ছিল এবং বঙ্গের নিম্নবর্ণের মধ্যে ধর্মদেবতার পূজার মধ্য দিয়া তাহা এখনও যে প্রবহমান সাহিত্য পরিষৎ ও নারায়ণ পত্রিকায় অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া হরপ্রসাদ ইহা প্রতিপন্ন করেন। এই বিষয়ে তিনি একটি ইংরাজী পুস্তিকাও রচনা করেন (১৫)। রমাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজা সম্বন্ধীয় "শূণ্য-পুরাণ" নামক অতি প্রাচীন পুঁথিটিও হরপ্রসাদের আবিষ্কার। ইহা নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। (সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী, ১৩১৪) "চর্যাপদ" প্রকাশের পূর্বে এইটিই বঙ্গভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন রূপে পরিগণিত ছিল।

এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে Bibliotheca Indica গ্রন্থমালা সম্পাদনায় হরপ্রসাদ যে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতেও কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনেও তাঁহার সেই নৈপুণ্য ও মনীষা পরিদৃষ্ট হয়। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ "প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী" নামে একটি দ্বৈমাসিক পত্রের প্রবর্তন করেন, হরপ্রসাদ ইহা সম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ইহার ১১টি সংখ্যা সম্পাদন করেন (১৯০১-২) এই পত্রের প্রথম সংখ্যায় তিনি বিদ্যাপতির নব আবিষ্কৃত ১৮টি পদ (নেপাল হইতে প্রাপ্ত) প্রকাশ করেন (১৬)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে তিনি মাণিক গাঙ্গুলি কৃত ধর্মমঙ্গল ও কাশীদাসী রামায়ণের আদিপর্ব সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (১৭, ১৮)। কাশীদাসী মহাভারতের প্রাচীনতম পুঁথি অবলম্বনে শেষোক্ত গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়। বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সভায় সভাপতির ভাষণ ব্যতীত শাস্ত্রীমহাশয় পরিষদে আরও কতকগুলি বক্তৃতা দান করেন। এইগুলির নাম—বাঙ্গলার লিপিকথা (২৭শে চৈত্র, ১৩২৬, ১০ই বৈশাখ

১৩২৭), মহাদেব (২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮, পরিষৎ পত্রিকায় ২৮ বর্ষে প্রকাশিত), ব্রাত্য কাহাকে বলে (৪ কার্তিক, ১৩২৯), জয়দেব ও চণ্ডীদাস (১৫ পৌষ, ১৩২৯), বিদ্যাপতি (২৯ ভাদ্র, ১৩৩০), ও বৌদ্ধধর্ম (৬ ও ১৩ চৈত্র, ১৩২২, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩)। পরিষৎ পত্রিকায় হরপ্রসাদ রচিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এইগুলির নামও উল্লেখযোগ্য—রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল (৪র্থ বর্ষ, ১৩০৪); ধোয়ী কবির পবনদূত (৫ম বর্ষ); কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন পিত্তল ফলক (৪র্থ বর্ষ); বাঙ্গলা ব্যাকরণ (৮ম বর্ষ); বৌদ্ধ ঘণ্টা ও তাম্রমুকুট (১৭ বর্ষ); হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা, সভাপতির অভিভাষণ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে (বর্দ্ধমান) মূল সভাপতি ও সাহিত্য শাখার সভাপতির সম্বোধন (২১ বর্ষ); সম্বোধন (২৩ বর্ষ); চণ্ডীদাস (২৬ বর্ষ); বাঙ্গলার পুরাণ অক্ষর (২৭ বর্ষ); চণ্ডীদাস (২৯ বর্ষ); হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ (৩১ বর্ষ) আমাদের ইতিহাস (৩২ বর্ষ); বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করতেন (৩৩ বর্ষ), ভারতবর্ষের ইতিহাস কোথা হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত (সভাপতির অভিভাষণ, ৩৫ বর্ষ); বাঙ্গলার বৌদ্ধ-সমাজ (সভাপতির অভিভাষণ, ৩৬ বর্ষ); সভাপতির অভিভাষণ (৩৭ বর্ষ); কাশীনাথ বিদ্যানিবাস, চিরঞ্জীব শর্মা (৩৭ বর্ষ); বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, বৃহস্পতি রায়মুকুট, রত্নাকর শান্তি রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (৩৮ বর্ষ)।

হরপ্রসাদ বাঙ্গলাভাষার প্রাচীনতম পুস্তক আবিষ্কার করিয়া যে কৃতিত্ব দেখান মৈথিল ভাষার "নষ্টকোষ্ঠী" উদ্ধারেও তাঁহার সেই কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর রচিত "বর্ণরত্নাকর" নামে একটি কথকতার পুঁথি তাঁহার দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়া এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হয়। মৈথিল ভাষায় এ যাবৎ প্রাপ্ত পুঁথির মধ্যে প্রাচীনতম এই পুস্তকটি পণ্ডিত বাবুয়া মিশ্র ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ভূমিকা ও শব্দ সূচী সহ এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। হরপ্রসাদ মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত 'কীর্তিলতা' নামক নিজ আবিষ্কৃত ইতিহাস ও আখ্যান মূলক পুঁথিটিও সম্পাদন করিয়া বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন (১৯)।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে হরপ্রসাদ ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাস, জীবন-চর্যা, প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার, বৌদ্ধসাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতি বৈচিত্র্য পূর্ণ বহু বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে Calcutta Review, Dacca Review, Indian Antiquary, Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Journal of the Buddhist Text and Research Society, Indian Historical Quarterly, Epigraphica Indica প্রভৃতি পত্রিকায় ইংরাজী ভাষায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। Asiatic Society-র পত্রিকায় (Journal) ও কার্যবিবরনীতে (Procedings)এ তাঁহার পঞ্চাশটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় (দ্রঃ Index to publications of Asietic Society, Vol I, Part I, p. p. 271-2 ; Part II, p. p. 441-43)।

বাঙ্গলাভাষায় হরপ্রসাদের মৌলিক পুস্তক ও পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হরপ্রসাদ বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, বিভা, কল্পনা, নারায়ণ (৪৭টি), প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, ভারতী, পঞ্চপুষ্প, সাহিত্য, মানসী-মর্মবাণী প্রভৃতি

পত্রিকাতেও বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। হরপ্রসাদের বাঙ্গলা প্রবন্ধগুলির অনেকগুলির বিষয়বস্তু ছিল কালিদাস ও তাঁহার রচিত সাহিত্য। অসাধারণ রসবোধ ও পাণ্ডিত্যের সংযোগে কালিদাস সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়া হরপ্রসাদ বাঙ্গালী পাঠককে কালিদাস প্রীতি অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেন।

জীবদ্দশায় হরপ্রসাদের অসাধারণ মনীষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে দেশবাসী কুণ্ঠিত হন নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সেনট্রাল টেক্সটবুক কমিটির সদস্য মনোনীত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের উপযুক্ত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ঐকান্তিক চেষ্টা করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার Budhist Text and Reserch Society-র সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি C. I. E উপাধি লাভ করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বুদ্ধগয়ার মন্দির সংক্রান্ত কমিশনের সদস্য মনোনীত করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে তিনি রাজস্থানের চারণ কবিদের গাথা সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন। ১৯১৩ ও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম (বর্দ্ধমান) ও পঞ্চদশ (রাধানগর) অধিবেশনের সভাপতি পদে বৃত হন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনেও তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে সম্মানিত সদস্য (Hony, Member) শ্রেণীভুক্ত করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে নেপাল হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক তিনি বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই ভাদ্র "তাঁহার পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিনের স্মারকরূপে পরিষদের সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বহু বিদ্বজ্জন লিখিত ভারততত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ সংগ্রহ—'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালার প্রথম খণ্ড ও অমুদ্রিত ২য় খণ্ডের প্রবন্ধগুলি কারুকার্য খচিত একখানি রৌপ্য পাত্রে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শাস্ত্রীমহাশয়কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে মাল্যচন্দনে বিভূষিত করেন, ও ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে শুদ্ধ খদ্দরের ধুতি ও চাদর উপহার দেন" (দ্রঃ সাহিত্য সাধক চরিত মালা, নং ৭৩; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫৬)। হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্পাদন করেন ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি হরপ্রসাদের মৃত্যুর পর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের পরিশিষ্টে হরপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাঙ্গলা লেখপঞ্জী সঙ্কলিত হইয়াছে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে হরপ্রসাদ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শাখার সভাপতিত্ব করেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে হরপ্রসাদ লাহোরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের ৫ম অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। (দ্রষ্টব্য Proceedings of All India Oriental Conference, 2nd and 5th Sessions, 1922 ane 1928.)। এই অধিবেশনে তাঁহার ভাষণের বিষয় ছিল—আধুনিক ভারতে সংস্কৃত (দ্রঃ প্রবুদ্ধ ভারত, ৩০শ খণ্ড, ১৯২৯)।

১৯:৬ খৃষ্টাব্দে হরপ্রসাদ মথুরায় অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় সংস্কৃত সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আহুত নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভা অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহির্ভারতে ভারত সভ্যতার প্রসার সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য Greater India Society নামে কলিকাতায় যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে হরপ্রসাদ তাহার সভাপতির পদে বৃত হন।

হরপ্রসাদের মৃত্যুর পর Indian Historical Quaterly পত্রিকার ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ সংখ্যাটি (vol IX, No. 1) তাঁহার নামেই উৎসর্গীকৃত হয়। এই সংখ্যাটিতে তাঁহার লিখিত মোট ৩২১টি ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুস্তক পুস্তিকা, ও প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ হরপ্রসাদের বহু বিক্ষিপ্ত রচনা এই তালিকার মধ্যে ধরা পড়ে নাই। হরপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার কতকগুলি বিক্ষিপ্ত রচনা একত্রিত করিয়া প্রকাশ করা হয়, হরপ্রসাদের এই রচনাগুলি এবং কয়েকটি ইংরাজী পুস্তিকা ও পাঠ্য পুস্তকের নামও পাদটিকায় প্রদত্ত হইল (২০—২৯)। হরপ্রসাদ সম্বন্ধে তাঁহার অন্যতম শিষ্য ও কৃতী পণ্ডিত ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় লিখিয়াছেন "তিনি কেবল প্রাচ্যবিদ্যার সংগ্রাহক বা ভাণ্ডারী ছিলেন না, এই বিদ্যার আহরণে ও সদ্ব্যবহারেও অসীম উৎসাহী ছিলেন। বৌদ্ধ ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকগুলি নূতন গ্রন্থ সম্পাদন এবং বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্ম, ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতির কোন দিকই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই; এবং পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল ব্যাপী পরিশ্রম, আলোচনা ও বহু দর্শনের পরিণত ফল এই পুস্তক ও প্রবন্ধগুলির বহু সহস্র পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ...প্রাচীন লিপি ও শিলা লেখ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যুৎপত্তির পরিচয় Epigraphica Indica প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ পত্রিকায় পাওয়া যাইবে। পথিকৃৎ হিসাবে এবং প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কারের জন্য প্রকৃত পণ্ডিত সমাজে এই জ্ঞানতপস্বীর মর্যাদা কোন কালে ক্ষুন্ন হইবার নহে। পশ্চিম ভারতে যেমন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, পূর্ব ও উত্তর ভারতে তেমনি হরপ্রসাদ আধুনিক গবেষণার মূল পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গনাথ ঝা বলিয়াছেন—"He, of all people, has been the real father of Oriental Research in Northern India" (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫৫)।

হরপ্রসাদ অতিশয় উদার হৃদয়, সরল ও স্নেহপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতার জন্যও তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। বন্ধু-বান্ধব ও শিষ্য-সতীর্থদের তিনি নানারূপ সুখাদ্য স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া ভোজন করাইতে ভালবাসিতেন, এই গুণটি তাঁহার গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও ছিল। পরোপকারও তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ ছিল। অধ্যাপক জীবন ও সাহিত্য জীবনের শিষ্য-দিগকে জীবনে প্রতিষ্টিত করিতে তিনি সর্বদাই তৎপর ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি ও সাহিত্য পরিষদের কর্মক্ষেত্রে তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে বহু স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন। আলাপ আলোচনায় তাঁহার বৈদগ্ধ্য ও রসিকতা বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। হরপ্রসাদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সুলভ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ (১৭ই নভেম্বর, ১৯৩১) রাত্রি এগারোটার সময় হরপ্রসাদ

অকস্মাৎ তাঁহার কলিকাতা পটলডাঙ্গাপল্লীস্থ ভবনে পরলোক গমন করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সাধ্বী পত্নী হেমন্তকুমারীর মৃত্যু হয়। শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় ২৩ বৎসর কাল বিপত্নীক জীবন যাপন করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঁচপুত্র ও তিনটি কন্যা ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও ভারতী বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কবিগুরুকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। রবীন্দ্রনাথের ষষ্টিতম জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয় তাহাতে পরিষদের সভাপতিরূপে হরপ্রসাদ একটি মর্মস্পর্শী আশীর্বচন পাঠ করেন। এই আশীর্বচনে তিনি বলেন—"তোমার গুণে বাঙ্গালা তো চিরদিনই মুগ্ধ—ভারত গৌরবান্বিত, এখন পূর্ব ও পশ্চিম নূতন ও পুরাতন সকল মহাদেশই তোমার প্রতিভায় উদ্ভাসিত। আশীর্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সমস্ত পৃথিবী আরও উদ্ভাসিত কর।...তোমার মঙ্গল কামনা চরিতার্থ হউক, তোমার নাম অক্ষয় হউক, তুমি অমর হইয়া ভারতের মঙ্গল কামনা করিতে থাক। তুমি দিগ্বিজয় করিয়া, বাঙ্গলার মুখ উজ্জ্বল করিয়া, আবার সোনার বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিয়াছ, তুমি আমাদের ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের উপহার স্বরূপ এই পুষ্পমাল্য গ্রহণ কর।..."

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষ পূর্তির উৎসব (রবীন্দ্র-জয়ন্তী) পরিকল্পনায় হরপ্রসাদ স্বয়ং নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি "রবীন্দ্র-জয়ন্তী পরিষদের" সহ-সভাপতি ও নির্বাচিত হন। রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের (২৫শে ডিসেম্বর) অল্পদিন পূর্বে হরপ্রসাদ পরলোক গমন করায় জয়ন্তী অনুষ্ঠানে পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মানপত্র পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করেন।

হরপ্রসাদের সাহিত্য কৃতির যথার্থ মূল্যায়নে তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার মৃত্যুর পর বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত মন্তব্যটিও বিশেষণ প্রণিধান যোগ্য...হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধির প্রভাবে সংস্কার মুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন ক'রে নিতে চেয়েছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোন দিন সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা সেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই,—অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশী মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর ছিল দর্শন শক্তি।

যে কোন বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় হাতে নিয়েছেন, তাকে সুস্পষ্ট করে দেখেছেন ও সুস্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না। বিদ্যার সংগ্রহ ব্যাপার অধ্যবসায়ের দ্বারা হয়, কিন্তু তাকে নিজের ও অন্যের মনে সহজ করে তোলা ধী-শক্তির কাজ। এই জিনিষটি বড়ো বিরল। তবু, জ্ঞানের বিষয় প্রভূত পরিমাণে সংগ্রহ করার যে পাণ্ডিত্য তার জন্যও দৃঢ় নিষ্ঠার প্রয়োজন; আমাদের আধুনিক শিক্ষাবিধির গুণে সেই নিষ্ঠার চর্চাও শিথিল।...অল্প জানাকে তুমুল করে ঘোষণা করা এখন সহজ হয়েছে। তাই বিদ্যার

সাধনা হল্‌কা হয়ে উঠ্‌ল, বুদ্ধির তপস্যাও ক্ষীণবল। যাকে বলে মনীষা, মনের যেটা চরিত্রবল, সেইটের অভাব ঘটেছে।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য পরিষদে হরপ্রসাদ অনেক দিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন, সাহিত্য পরিষৎকে তারই পরিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ করে রেখেছিলেন। যাঁদের কাছ থেকে দুর্লভ দান আমরা পেয়ে থাকি, কোনো মতে মনে করতে পারিনে যে, বিধাতার দাক্ষিণ্যবাহী তাঁদের বাহুকে মৃত্যু কোনোদিনই নিশ্চেষ্ট করতে পারে। সেইজন্যে যে বয়সেই তাঁদের মৃত্যু হোক্‌, দেশ অকাল মৃত্যুর শোক পায়, তার কারণ আলোক-নির্বাণের মুহূর্তে পরবর্তীদের মধ্যে তাঁদের জীবনের অনুবৃত্তি পাওয়া যায় না। তবু বেদনার মধ্যেও মনে আশা রাখতে হবে যে, আজ যাঁর স্থান শূন্য, একদা যে আসন তিনি অধিকার করেছিলেন সেই আসনের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে গেছেন এবং অতীত কালকে যিনি ধন্য করেছেন ভাবীকালকেও তিনি অলক্ষ্য ভাবে চরিতার্থ করবেন।"…[হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা দ্বিতীয় ভাগ (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) হইতে উদ্ধৃত]

(১) (ক) Notices of Sansk. Mss—1st Series, Vol X, Vol XI (1870-1895)
    (খ) „ „ 2nd Series, Vol 1—IV (1898-1911)

(২) (ক) Report on the Search of Sansk. Mss for 1895-1900 (1901)
    (খ) „ „ „ for 1901-1902 to 1905-06 (1905)
    (গ) „ „ „ for 1906-07 to 1910-11 (1911)
    (ঘ) Preliminary Report on the operation in search of mss of Bardic Chronicles—1913
    (ঙ) Report on a tour in Western India in search of mss of Bardic Chronicles—1913.

(৩) A catalogue of palmleaf mss and selected paper mss belonging to the Darbar Library of Nepal (2 Vols), 1905-1915

(৪) Descriptive Catalogue of the Sansk. Mss in the Govt. Colleges under the care of Asiatic Society :—Vol 1 : Budhist Mss (1917) Vol 2, Veda (1923); Vol 3—Smriti 1923, Vol 4—History and Geography (1923); Vol 5—Purana (1928), Vol 6—Vyakarana (1931), Vol. 7—Kavya (1934), Vol. 8, Tantra (2 Parts) 1939-40, vol 9--Vernacular (Parts I & II)—1941, Vol 10—jyotisa (2 Parts) 1945-48; Vol. 11. Philosophy, 1957, Vol 13 Jaina Mss Part I, 1951, Vol 14 Miscellaneous.

(৫) বৃহদ্ধর্ম পুরাণ (Bibliotheca Indica No. 120),. 1888-1897

(৬) বৃহৎস্বয়ম্ভু পুরাণ　　„　　„　133), 1894-1900
(৭) আনন্দ ভট্ট রচিত বল্লাল চরিত　　„　　„　164), 1904
(৮) Six Buddhist Nyaya Tracts　　„　185), 1910
(৯) সৌন্দর নন্দ—অশ্ব ঘোষ　　„　192), 1910
(১০) শৈনিক শাস্ত্র　　„　193), 1910
(১১) রাম চরিত (সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত) (Memoirs of Asiatic Society, Vol, III, No. I) 1910
(১২) চতুঃ শতিকা (আর্যদেব)　　Vol. III　1914
(১৩) অদ্বয় বজ্র সংগ্রহ (Gaekwar's Oriental Series No. 40) 1927
(১৪) হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা, পরিষৎ গ্রন্থাবলী ৫৫ কলিকাতা, প্রথম সং শ্রাবণ ১৩২৩, নূতন সং অগ্রহায়ণ ১৩৩৬
(১৫) Discovery of Living Budhism in Bengal, Calcutta 1897
(১৬) প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংখ্যা. অক্টোবর, ১৯০৮
(১৭) শ্রীধর্মমঙ্গল (পরিষৎ গ্রন্থাবলী নং ৮), ১৩১২
(১৮) মহাভারত (আদিপর্ব)—কাশীদাস, পরিষৎ গ্রন্থাবলী ৭৫, ১৩৩৫
(১৯) কীর্তিলতা, হৃষীকেশ সিরিজ, কলিকাতা, ১৩৩১
(২০) প্রাচীন বাঙ্গলার গৌরব, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৪৬
(২১) বৌদ্ধধর্ম (প্রবন্ধসঙ্কলন), কলিকাতা, ১৩৪৮
(২২) ভারতবর্ষের ইতিহাস (পাঠ্য পুস্তক)—কলিকাতা, ১৮৯৫
(২৩) Vernacular Literature of Bengal before Introduction of English Education (16 P. P.)—1891
(২৪) The Study of Sanskrit 1897
(২৫) The educative influence of Sanskrit, 1916
(২৬) Bird's eyeview of Sanskrit Literature, 1917
(২৭) Magadhan Literature (six letures delivered at the Patna Univ. 1920-21)
(২৮) Lokayata, Dacca Univ. Bulletin No : 1, Dacca, 1925
(২৯) Absorption of the Vratyas, Univ. Bulletin No : 6 Dacca 1926
(৩০) History of India (Text Book), Calcutta, 1895

বৈদিক যুগে বন

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আর্য্যেরা বৈদিক যুগের সুরুতে প্রধানতঃ সিন্ধু উপত্যকায় এবং পাঞ্জাবে বসবাস করতেন। পরে তাঁরা ধীরে ধীরে পূর্বদিকে অধুনা উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং বাংলা দেশে পরিধি প্রসারণ করেছেন। তাঁদের বাসের সীমানা আদিতে ঠিক কোথায় ছিল স্পষ্ট করে বলা আজ মুস্কিল কিন্তু ঋক্‌বেদে বর্ণিত নদীগুলির থেকে কিছু আন্দাজ করা যেতে পারে—"হে গঙ্গা, হে যমুনা ও সরস্বতী ও শতদ্রু ও পুরুষিত্ত (রভি নদী)—আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্লীসংগত (চিনাব) মরুতৃষ্ণা নদী, হে বিতস্তা (ঝিলাম) ও সুষমাসংগত আর্জীকীয়া নদী তোমরা শ্রবণ কর। হে সিন্ধু তুমি প্রথমে তৃষ্টানা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে, পরে সুমর্তু ও রসা ও শ্বেতীর সংগে মিলিলে, তুমি ক্রুমু ও গোমতীকে, কুভা ও মেহেভন্থর সহিত মিলিত করিলে, এই সকল নদীর সহিত এক রথে অর্থাৎ একত্রে যাইয়া থাক। এই দুধর্ষ সিন্ধু সবলভাবে যাইতেছেন, তাহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল তিনি অতি মহৎ ; তাঁহার জল সকল মহৎবেগে যাইয়া চতুর্দিক পরিপূর্ণ করিতেছে। যত গতিশালী আছে তাহার তুল্য গতিশালী কেহ নাই। তিনি ঘোটকীর ন্যায় অদ্ভুত—ইনি স্থূলকায়া রমণীর ন্যায় সৌষ্ঠবদর্শনা। সিন্ধু চিরযৌবনা ও সুন্দরী, ইহার উৎকৃষ্ট রথ, উৎকৃষ্ট ঘোটক ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে। ইনি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছেন, ইহার বিস্তর অন্ন আছে, ইহার তীরে সীলামা গড় আছে। ইনি মধুপ্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত।" (১০।৭৫।৪-৯), এই চমৎকার শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে ঋক্‌বেদের লেখক সিন্ধু এবং পাঞ্জাব সম্পর্কে, বিশেষ করে সিন্ধু নদীর ভূগোল সম্পর্কে প্রধানতঃ বলেছেন নিজের দেশ বর্ণনায়। বৈদিক যুগের আদিতে তাই বনসম্পর্কে যা কিছু জানা যাবে ঋক্‌বেদ থেকে তা পাঞ্জাব সিন্ধু অঞ্চল সম্পর্কেই বিশেষ করে প্রযোজ্য। ঋক্‌বেদের কোন স্থানেই ধানের উল্লেখ নেই। যেহেতু অধুনা লক্ষ্ণৌকে ধানের সীমা ধরে নেওয়া হয়, মনে হয় আদিযুগে আর্য্যেরা এইস্থান পর্য্যন্ত তাদের বাসস্থান এবং কর্মস্থান সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অথর্ববেদের সময় ধানের কথা বলা হচ্ছে এবং সেই সময় তা'রা গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে পূর্বদিকে এগিয়ে এসেছেন।

এই সমস্ত অঞ্চল তখন বনে পরিপূর্ণ। ঋক্‌বেদে একটি অরণ্যের সুন্দর বর্ণনা আছে—"হে অরণ্যানী (বৃহৎ বন), তুমি দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যাও (অর্থাৎ কতদূর চলিয়াছ স্থির করা যায় না), তুমি কেন গ্রামে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করনা ? তোমার কি একাকী থাকিতে ভয় হয় না ? এক জন্তু বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছে, আর এক জন্তু 'চী চী' ইত্যাকার শব্দ করিয়া তাহার উত্তর দিতেছে। যেন ইহার বীণায় ঘটায় ঘটায় (পর্দায় পর্দায়) শব্দ নির্গত হইয়া অরণ্যানীকে বর্ণনা করিতেছে। অরণ্যানীর মধ্যে কোথায় যেন গাভী ক্রন্দন করিতেছে, এইরূপ ভ্রম হয়। কোথাও যেন একটি অট্টালিকার মত দৃষ্ট হয়। সন্ধ্যাবেলায় যেন উহার মধ্য হইতে কতশত শকট নির্গত হইয়া আসিতেছে। তবে কি সেই এক ব্যক্তি গাভীকে আহ্বান করিতেছে ?

তবে কি এই আর এক ব্যক্তি কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে ? অরণ্যানীর মধ্যে যে ব্যক্তি থাকে সে জ্ঞান করে সন্ধ্যাবেলা কেহ চীৎকার করিয়া উঠিল। বাস্তবিক অরণ্যানী কাহারও প্রাণবধ করেন না। অন্য অন্য পশু না আসিলে কোন আশংকা নাই। তাহার সুস্বাদু ফল আহার করিয়া অতি সুখে কাল যাপন হয়। মৃগনাভীর ন্যায় অরণ্যানীর সৌরভ, কত আহার তথায় আছে। কৃষকলোক একেবারে নাই। অরণ্যানী হরিণদের জননীস্বরূপ, এই রূপে আমি অরণ্যানীর বর্ণনা করিলাম (১০/১৪৮), অরণ্যসম্পদে এই উদাস সৌন্দর্য্যের বর্ণনা প্রায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সামিল মনে হলেও একথা ঠিক যে বেদে অরণ্য প্রধানতঃ অগ্নির খাদ্য হিসেবেই অথবা ছেদনের জন্যেই উল্লেখিত। একেবারে প্রথম দিকে যদিও আর্য্যেরা প্রধানতঃ পশু পালক ছিলেন, পরে তারা ধীরে ধীরে কর্ষণ করতে শিখেছেন। এবং কৃষি কার্য্যের জন্য জমির প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়েছে। ঋক্‌বেদে বো'ধ করি তাই অগ্নির মহিমা কীর্তন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।—"তিনি (অগ্নি) দেখিতে জ্যোর্তিময়, তাঁহার কান্তি অতি মহৎ, তিনি দুরন্ত দীপ্তিসহকারে যাইতে যাইতে শোভা ধারণ করেন। সেই অগ্নি, বৃক্ষের কাষ্ঠ অন্নস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অমর অর্থাৎ অনির্ব্বাণশীল হইয়া উঠিলেন।" (১০।৪৫।৮) অথবা—"এই অগ্নি, বনে জন্মিয়া এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছেন, যেন সরল রজ্জুদ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক দ্রুতগামী কতকগুলি ঘোটক রথে যোজনা করিয়া, এই বন্ধু কাষ্ঠস্বরূপ বন পাইয়া বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছেন। ইনি বৃক্ষগ্রাস করতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিপুলমূর্তি হইয়াছেন।" (১০।৭৯।৭)

মনে হয় গাঙ্গেয় উপত্যকা সিন্ধু উপত্যকা ইত্যাদি যেখানে আগত আর্যদের বাস সেখানে অরণ্যের প্রাধান্য এবং তা অগ্নিসংযোগে পুড়িয়ে তাঁরা প্রথম কৃষির সৃষ্টি করেছেন। যদিও উদ্ধৃত পংক্তি থেকে এরকম কোন বিচার করা সম্ভব নয়, তবু ঋক্‌বেদের পঠন থেকে একথা স্পষ্ট। ঋক্‌বেদে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রীর কথা আছে। বার্লি চাষ, কর্ত্তন, তুঁষের থেকে শস্য পৃথকের কথা, কোন কোন জায়গায় মাটি খুঁড়ে জল দিয়ে জল সেচ; শস্য রাখার জন্য উর্দ্দুর (গোলাঘর) ইত্যাদির ইঙ্গিত বিভিন্ন শ্লোকে দেখা যায়। তাছাড়া পশু পালক হিসেবে আর্য্যদের তখনও লাগতো চারণভূমি, বাঁচার জন্য তাই আর্য্যদের বন পুড়িয়ে নতুন জমি উদ্ধার করা একটা বিশেষ কাজের অঙ্গীভূত ছিল। বনকর্তন করে চাষের জমি তৈরীর ইতিহাস পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই আদিম ইতিহাস। আর তাই দেখা যায় আজ যে সেই সমস্ত দেশ যেখানে যেখানে মানুষের সভ্যতা জন্ম নিয়েছে তা আজ প্রায় মরুভূমি, বেদের একটি শ্লোক এই স্থানে তাই অত্যন্ত প্রযোজ্য সিম্বল হিসেবে—"মেরুদেশ আর ছেদন করিবার উপযুক্ত অরণ্য প্রদেশ এই উভয়ই কত যোজনই বা বা অন্তর? এই বৃষোকপি নিকটবর্তী লোকালয়ের আশ্রয় গ্রহণ কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।" (১০।৮৬।২০)

শুধু তাই নয়, বন ছেদনের আরো অনেক কারণ ছিল। তা হ'ল তাদের গ্রাম ও বাসস্থান তৈরীতে, যুদ্ধের রথ নির্মাণে, বিভিন্ন গ্রামের যোগাযোগের সড়ক নির্মাণে, যজ্ঞের যুপকাষ্ঠের জন্য, তীর ধনুকের জন্য, অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রের জন্য, নৌকা, জাহাজ নির্মাণে। ষ্টুয়ার্ট পিগট্ Pre-Historic India-তে বলেছেন—আর্যদের সমস্ত বাড়ীগুলিই বোধ করি ছিল কাঠের

তৈরী, মাথার আচ্ছাদন খড়ের বাড়ীগুলিতে অনেকগুলি ঘর থাকতো এবং মনে হয় যে একই ছাদের তলায় মানুষ এবং গবাদি পশু। এই সমস্ত গ্রাম কে তৈরী করতো বলা মুস্কিল, তবে—Carpentar has an important and honoured trade working with an axe or adze or making five carved work for chariots or to enrich the door posts of a house" (Stuart Piggott).

যুদ্ধের রথ নির্মাণের কথা উল্লেখিত বেদে। এই রথগুলি ছিল সামনে এবং পেছনে খোলা, বোধকরি বেতের বুনুনীতে জারি-কাটা। এই রথের বসবার জায়গা ছিল কাঠের আর তার মাঝমাঝি দিকে থাকতো চামড়া দিয়ে বাঁধা অক্ষদন্ত যার দুধারে চাকা, এই চাকাগুলি ছিল এক কাঠের থেকেই বাঁকানো যার প্রমাণ—

"I bend with song, as bend wright his felloe of solidwood. (VII-32)

এই সমস্ত রথের কয়েকটি অঙ্গের মাপ পর্যন্ত দেওয়া আছে যা উদ্ধৃত করছি Stuart Pigott থেকে, মাপগুলি সব অঙ্গুলির এককে। প্রতি অঙ্গুলি যদি আধ ইঞ্চি ধরা হয় তবে কাঠের খুঁটিটি প্রায় ৭-১০, অক্ষদণ্ড ৪-৭, জোয়ালটি ৩-৭—যার থেকে বোঝা যায় রথগুলি মোটামুটি বড় আকারের ছিল। চাকার মাপটি ছিল ২-৬ থেকে ৩ অঙ্কের।

ঋকবেদের সময়ের শেষের দিকে কাঠের ব্যবহার ছিল সামুদ্রিক যানেও। '২৫।৭' শ্লোকে বলা হয়েছে, যে বরুণ সমুদ্রের সমস্ত রাস্তা জানতেন যা ধরে অন্যান্য সমুদ্রপোত যাতায়াত করে। '১।১১৬।৩ শ্লোকে বলা হয়েছে কেমন করে তুগ্র এবং তার পুত্র ভুজ্য বহুদূরের কোন দ্বীপে শত্রুর জন্য সমুদ্রপোতে যাবার সময় জাহাজ ডুবি হয়েছিলেন।

এই সময়ের সামুদ্রিক বাণিজ্য বোধকরি চলতো চালডিয়া, মিশর এবং ব্যাবিলয়নের সঙ্গে। এসিরিওতাত্ত্বিক ডক্টর সইস্ বলেছেন তার বইয়ে যে, প্রায় ৩০০০ খৃঃ পূঃ থেকে ব্যাবিলন এবং ভারতের সঙ্গে ব্যবসার লেনদেন চলেছে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি সেগুনকাঠের চিহ্নে উর (ur)-এর ধ্বংসাবশেষ পেয়েছেন। মনে হয় যে এই সেগুনগাছের গুঁড়ি মালাবারের উপকূল থেকে সামুদ্রিক নৌকাতে গিয়েছিল সেদিনের উরে। এইসব জাহাজ সামুদ্রিক পোত কিসে তৈরি ছিল তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তবে বোধকরি হাল্কা অথচ শক্ত কাঠের তৈরী ছিল। যাই হোক্ এই বাণিজ্যের পরিমাণ নিশ্চয়ই ছিল অল্প, নয়তো আরও অনেক প্রমাণ থাকতো তার এবং স্বভাবতঃই তখন বাণিজ্যের জন্যে কাঠের প্রচলন খুব একটা বিশেষ বেশী ছিল না বললেই চলে।

কাষ্ঠের আরও একটি ব্যবহার দেখা যাচ্ছে, যুপকাষ্ঠ হিসেবে। যেমন ১০।৯০।১৫ তে—"দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করিলেন। তখন সাতটি পরিধি অর্থাৎ বেদি নির্মাণ করা হইল এবং তিন সপ্তসংখ্যক যজ্ঞকাষ্ঠ হইল।

আবার অক্ষনির্মাণেও কাষ্ঠের ব্যবহার ছিল, যেমন ১০।৩৪ "মুজবান নামক পর্বতে চমৎকার সোমলতা জন্মে, তাহার রস পান করিলে যেমন প্রীতি জন্মে, বিবিধ কাষ্ঠনির্মিত অক্ষ আমার পক্ষে তেমনি প্রীতিকর ও তদ্রূপ আমাকে উৎসাহিত করে" ইত্যাদি।

আর্যেরা সেই যুগে বনের ওষধি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং ওষধির ভিন্ন ভিন্ন নাম

থাকায় মনে হয় যে তারা ওষধির বিভিন্ন গাছগাছরা পৃথক পৃথক ভাবে চিনতেন এবং তার ব্যবহার জানতেন।

১০।৯০।১—২০ "ওষধিগণ দেবতা, অথবা পুত্র ভিষক ঋষি, হে জননীস্বরূপা ওষধিগণ—তোমরা মৃত্তিকাতে রোহন কর অর্থাৎ উৎপন্ন। তোমাদের একশত এমনকি এক সহস্র স্থান আছে। তোমাদিগের ক্রিয়া শতপ্রকার, তোমরা আরোগ্য বিধান কর। (২) হে পুষ্পবতী ফল প্রসবকারিণী ওষধিগণ তোমরা রোগীর প্রতি সন্তুষ্ট হও। (৪) হে ওষধিগণ, অশ্বত্থবৃক্ষে তোমরা উপবেশন কর, পলাশবৃক্ষে তোমরা বাস কর। (৯) হে অশ্ববতী, সোমবতী, উর্জয়ন্তী, উদোজান প্রভৃতি তাবদ ওষধি সংগ্রহ করিয়াছি অভিপ্রায় যে এই ব্যক্তির আরোগ্যবিধান করি। (১৯) আমাদিগের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে দ্বিপদ হোক্ (ভৃত্য), চতুষ্পদ হোক সকলই যেন নীরোগ থাকে। (২২) হে ওষধি তুমি শ্রেষ্ঠ, যেখানে যত বৃক্ষ আছে সকলই তোমার নিকট হীন।

এতক্ষণ ধরে আমরা বেদের সম্বন্ধে যা কিছু আলোচনা করলাম তাতে বোঝা যায় যে আর্যরা অরণ্যকে অনেকভাবে ব্যবহার করতে শিখছেন কিন্তু এখনও অরণ্য সম্পর্কে কোন বিস্তৃত ধারণা জন্মায়নি। জমি তৈরীর কাজে, রথ বা যুদ্ধসামগ্রী কর্ষণের সামগ্রীর জন্য অথবা যুপকাষ্ঠ বা আরও পরে সামুদ্রিক যানের ব্যবহার করেছেন—"ছেদন করিবার উপযুক্তঅরণ্য প্রদেশকে" শুধু ওষধি সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা রয়েছে। মোটামুটি অরণ্য তাদের কাছে একটা বিরাট বিশাল এবং ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও বেদের অরণ্যের উদ্ধৃত বর্ণনায় অরণ্যকে আঁকা হয়েছে সুন্দর করে, তবু সমস্ত কল্পনায় একটা ভীতির ছাপ।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদের কাল বেদের পরে এবং ধরা হয়ে থাকে মোটামুটি ১৪০০ খৃঃ পূঃ থেকে ৭০০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত। এই সময়ে আর্যেরা বন সম্পর্কে অনেক বেশী জ্ঞান অর্জন করেছেন। কোন কোন জায়গায় বনের পশু আর সভ্যতার মানুষের মধ্যে যে একটা বিভেদ তা লক্ষ্য করছেন।

"অতঃপর, অপরাহ্নের পরে এবং অস্তগমনের পূর্বে আদিত্যের যে রূপ উহাই উপদ্রব। অরণ্যবাসী পশুগুণ আদিত্যের ঐ রূপে অনুগত। তাহারা আদিত্যের ঐ উপদ্রবায়বের ভজনা করে বলিয়াই মনুষ্যদর্শনে অরণ্য ও গুহাকে ভয়হীন মনে করিয়া অভিমুখে উপদ্রুত (অর্থাৎ ধাবিত) হয়।" কিন্তু একই সঙ্গে আমরা দেখছি যে জড়পদার্থের সঙ্গে ওষধি এবং বনস্পতি, অন্ন অর্থাৎ ব্রীহি, যব, তিল মাষ সৃষ্ট হচ্ছে কল্পিত এক সৃষ্টির থিওরিতে। ছান্দোগ্য ৫।২০।৫৫ "অর্থাৎ তাহারা আকাশকে প্রাপ্ত হন, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন, বায়ু হইতে ধূম হন, ধুম হইতে অভ্র হন, অভ্র হইতে মেঘ হন, মেঘ হইয়া বর্ষণ করেন। অনন্তর উক্ত জীবগণ এই লোকে ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল মাষ ইত্যাদি রূপে জাত হন" ইত্যাদি।

সৃষ্ট জীবদের একটা বিভক্তি করার চেষ্টা আছে উপনিষদে।...'ক্ষুদ্রজীবানিচ, জারুজানিচ, গবা অশ্ব পুরুষা হস্তিন যৎ কিমেঞ্চদং প্রাণি জঙ্গমংচ অর্থাৎ ক্ষুদ্র জীব, বীজ, সচল, অচল সমস্তই অর্থাৎ অন্ডজ জরায়ুজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ জীব এবং অশ্ব গো মনুষ্য এবং হস্তিসমূহ এবং যে সকল প্রাণী পায়ে চলে, আকাশে উড়ে অথবা যাহারা অচল ইত্যাদি। উদ্ভিদদের সম্পর্কে আর্যদের জ্ঞান

এমনকি তাদের জন্মের প্রকরণ পর্যন্ত যার প্রমাণ রয়েছে ৬।১৩।১-২তে—

পিতা—'এই সুবিশাল বটবৃক্ষ হইতে একটি বটফল আহরণ কর।"

শ্বেতকেতু—"এই যে ভগবান্।"

পিতা—"ভাঙ্গ।"

শ্বেতকেতু—"ভগবান ভাঙ্গা হইয়াছে।"

পিতা—"ইহাতে কি দেখিতেছ?"

শ্বেতকেতু—"ভগবন্, অণুর ন্যায় এই বীজসকল।"

পিতা—"ইহাদের একটি ভাঙ্গ।"

শ্বেতকেতু—"ভগবন্, ভাঙ্গা হইয়াছে।"

পিতা—"ইহাতে কি দেখিতেছ?"

শ্বেতকেতু—"কিছুই না ভগবন্।"

পিতা তাঁহাকে বলিলেন—"হে সৌম্য, বীজের এই যে সূক্ষ্মাংশটি দেখিতেছ না, এই সূক্ষ্মাংশ হইতেই উৎপন্ন হইয়া এই মহাবটবৃক্ষটি এইরূপে বিদ্যমান আছে। হে সৌম্য, শ্রদ্ধা অবলম্বন কর।' উপনিষদ লেখা হইয়াছে দর্শনচর্চার জন্যে, স্বভাবতঃই সেখানে বনের বা বৃক্ষের সম্পর্কে কোন বিরাট খবর মিলবে না। তবু উপরিউদ্ধৃত পংক্তিগুলো থেকে বোঝান হল যে এই সময়েও বনের সম্পর্কে, উদ্ভিজ্জ সম্পর্কে পঠন পাঠন বা অন্ততপক্ষে তাদের অনুসন্ধিৎসা জেগেছে।

সভ্যতা বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বন, এবং উদ্ভিজ্জ যা আদিতে শুধু প্রয়োজনের তাগিদেই বর্তমান তা ধীরে ধীরে বিজ্ঞান পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে উপনিষদের কালে, এর পরে পাণিনি এবং কৌটিল্যে দেখা যায় যে উদ্ভিদ এবং বনবিজ্ঞান আরো অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিচার্য্য।

টেভর নিঅর ও সতীদাহ

নারায়ণ দত্ত

জন ব্যাপ্তিস্তা টেভর নিঅর বোধকরি একমাত্র বিদেশী ভ্রমণকারী যিনি বারবার ছয়বার তাঁর দেশের সমুদ্রতট ছেড়ে ভিনদেশ বিশেষ করে তুর্কদেশ হয়ে পারস্য এবং এই প্রাচ্যদেশেই পাড়ি দিয়েছিলেন। এবং তাঁর দেশের নিভৃত গৃহকোণ, প্রেয়সীর বিহ্বল আঁখির আশ্রয় দূরে ফেলে অন্য দেশের মাটিতেই একদিন তাঁর যাত্রার সমাপ্তির রেখা টেনেছিলেন। অবশ্য এ নিয়ে অনেক রহস্য আছে। আগে অনেকে মনে করতেন যে টেভরনিঅর ব্যারন অফ অবন নাকি বাস্তিলের প্রস্তর-কারায় বন্দীজীবন যাপন করেছিলেন। সাম্প্রতিক আলোচনায় ঐতিহাসিকরা মনে করেন, এই ধারণা ভ্রান্ত। (১) টেভরনিঅর নামে এক ব্যক্তি কারাজীবন যাপন করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এক ভিন্ন ব্যক্তি। এই দ্বিতীয় টেভরনিঅরের নিবাস অন্যত্র। ভিলিআরস-লে-বেল।

অনেকে মনে করতেন, জাত-পর্যটক টেভরনিঅর নাকি মস্কোতে দেহরক্ষা করেছিলেন। এমনকি অনেকে তাঁর সমাধিক্ষেত্র—একটা শিলাস্তম্ভও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু মস্কোর সুইশ রেসিডেন্টের সদ্য-আবিষ্কৃত একটি পত্রের দৌলতে জানা গেছে যে টেভরনিঅর মারা যান, মস্কোয় নয়, মস্কোর পথে। স্মলেনস্কে।

কিন্তু টেভর নিঅরকে নিয়ে রহস্য যতই থাকুক না কেন, তাঁর সম্বন্ধে যেটা দিবালোকের মত স্পষ্ট এবং যেটা সচরাচর অন্যান্য সমকালীন পর্যটকদের মধ্যে দেখা যায় না সেটা হচ্ছে তার সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ শক্তি। এবং এর ফলেই তাঁর পক্ষে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে সতীদাহের যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল, সেগুলি গ্রন্থন করে তার একটা গোটাগুটি ছবি উপস্থাপিত করা সহজ হয়ে উঠেছে। জানি টেভর নিঅরের বক্তব্য অনেকেই বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারেননি (২)। সম্রাট ঔরঙ্গজেব কতদূর মাদক বিদ্বেষী ছিলেন সেটাও একটা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। কিন্তু টেভরনিঅর তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে স্পষ্টই এই অভিযোগ করেছেন যে তিনি একবার নয় বার বার তিনবার সম্রাটকে মাতাল অবস্থায় দেখেছিলেন। টেভর নিঅর ছিলেন জহুরী। তিনি শুধু বিদেশ ভ্রমণই করেননি। ব্যবসাও করেছিলেন। মুঘল দরবার ও খান্দানী মহলে তাঁর যাতায়াত ছিল। কাজেই চট করে তাঁর বক্তব্যকে উড়িয়ে দেওয়া সর্বতোভাবে সমীচীন নাও হতে পারে। এবং যখন এটাও দেখা যায়, টেভর নিঅর সেকালের মানুষদের সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করেছেন, সেগুলি বেশ সংস্কারমুক্ত—খুব একটা একদেশদর্শী নয়। এই প্রসঙ্গেই ভারতীয় সামাজিক চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর সশ্রদ্ধ সিদ্ধান্তের কথা এসেই পরে। টেভর নিঅরের মন্তব্যটা এই—'Adultery is very rare among them and one never hears unnatural crime (sadomy ?) sporen of. (৩) পুনশ্চ ভারতীয় দাম্পত্য-সম্বন্ধে তাঁর ধারণা জীবন When married they are rare unfaithful to theirs wives. ভারতীয় সমাজজীবন সম্বন্ধে তাঁর এই উচ্চমনোভাব সতীদাহ ব্যাপারেও লক্ষ্য করা যায়।

তীক্ষ্ণদর্শী এই জহুরীটি শুধু ভারতবর্ষের মণিমুক্তা চেনেননি, তার মানুষদেরও কিছু কিছু

চিনেছিলেন, অন্ততঃ চেনবার চেষ্টা করেছিলেন। এবং মনে হয়, এরই ফলশ্রুতি সতীদাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা সহানুভূতিশীল ধারণার। সতীদাহে তিনি বেদনা পেয়েছেন, এই ভীষণ প্রথার অন্যতম সাক্ষী হিসেবে তিনি আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছেন, কিন্তু এর পেছনে হিন্দুদের মনে যে বিশ্বাস সক্রিয় ছিল তাকে তিনি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উড়িয়ে দেননি। বিদ্রূপ করেননি। ডক্টর গিলক্রিস্টের মত ঠাট্টা করে বলেননি—'Relationship with a sustee gave a certain rank in India in the estimation of the natives. The son of a woman who had performed suttee ranked as a knight; if he could boost that his sister had also burned herself, he would be considered as a baronet, if he had other relations, who had also sacrificed themselves, he would rank as a baron; and so on up even to the dignity of a king, according to the numbers of females of his family who hand performed suttee!"

ঐতিহাসিকদের মতে, সতীদাহ ভারতের নাকি একটি প্রাচীনতম প্রথা। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের বর্ণনায় গ্রীক ঐতিহাসিক ভারতীয় রাজপুতদের মধ্যে এই সতীদাহের অনুষ্ঠান লক্ষ্য করেন। তাঁর কাহিনীতে জানা যায় যে কোন ভারতীয় সামন্ত নৃপতির দুইটি স্ত্রীর মধ্যে কে যে সতী হবে তাই নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদ হয় এবং তাঁদের মধ্যে তীব্র আলোচনার পর কনিষ্ঠা স্ত্রীর ভাগ্যেই এই মহৎ সুযোগ লাভের অবকাশ ঘটে। এই ব্যর্থতায় প্রথমা পত্নীর সে কি আকাশফাটা চিৎকার। শায়কবিদ্ধ বিহগীর মত তাঁর কি মর্মন্তুদ বিলাপ। বিহ্বলা বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তণী। বিললাপ বিকর্ণমূর্দ্ধজা। আর কনিষ্ঠা পত্নীর সে কি উল্লাস। স্বামীর চিতায় সহগমনের আনন্দে নববধূর মত তাঁর সে কি মোহন সজ্জা। চিতাশয্যা নয়, সেত তাঁর বাসরশয্যা। কিন্তু এঁরা কেউই এই প্রথাটিকে বর্বরতার অনুবৃত্তির বেশী কিছু ভাবতে পারেননি। তাঁদের গ্রীক আইনে যে এর চলন নেই, সেটাই জাঁক করে বলতে ইতিবৃত্তকার ব্যস্ত!

টেভরনিঅর কিন্তু তা করেননি। তিনি একটা নিরপেক্ষ দ্রষ্টার মত এই শোকাবহ ঘটনাগুলি দেখে গেছেন এবং য়ুরোপীয় নির্লিপ্ততায় সেগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই, সেকালের সতীদাহের ইতিহাস রচনায় তাঁর কাছে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, এই আলেখ্য সেকালে দুর্লভ। এই প্রসঙ্গে সচক্ষে দেখা একটি সতীর সুবিপুল নিষ্ঠার কথা তিনি দক্ষতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

ঘটনাটা পাটনার। পাটনা তখন সুবে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত। দিল্লীর তখত্-ই-তাউসে সে সময় পঞ্চম মুঘল সম্রাট শাজাহান। পাটনার সুবেদার অশীতিপর বৃদ্ধ। দু'হাজারী মনসবদার। অনেকেই জানেন মুঘলরা সতীদাহের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন না। সম্রাট আকবর যে দীনইলাহী নবধর্মের প্রবর্তন করেন তাতে সতীদাহের নিন্দা করা হয়। শাহানশাহ জয়মল্লের বিধবা পত্নীকে সতী হতে ত সরাসরি বাধা দেন এবং প্ররোচনা দানের জন্য তাঁর পুত্রকে বন্দী করে রাখেন। জাহাঙ্গীর বাদশা আর এক পা এগিয়ে সতীদাহের জন্যে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারী করেন। শাহজাহানও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করেন। (৪) তবে সরাসরি ভাবে কোন মুঘল সম্রাটই সতীদাহ

বন্ধের জন্যে উঠে পড়ে লাগেননি। অন্ততঃ তাঁদের 'আইন থাকলেও সে আইন ঠিক বোধ করি প্রয়োগ হত না। কেননা তরুণ জার্মান পর্যটক মেণ্ডেলস্লো পর্যন্ত সাক্ষী দিচ্ছেন তাঁর সচক্ষে মুঘল সুবেদারকে সতীদাহের অনুমতি দিতে দেখেছেন। এবং প্রায় সর্বত্রই মুঘল শাসনকর্তারা প্রথমতঃ বারণ করলেও, পীড়াপীড়ি করলে সতী হতে অনুমতি দিতেন হিন্দু মেয়েদের।

সে যাই হোক। পাটনায় সচক্ষে একটা সতীদাহ দেখলেন টেভরনিঅর। একদিন তিনি মুঘল দরবারে বসে আছেন, এমন সময় একজন বছর বাইশের অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী ঢুকলেন সেখানে। অবশ্যই এই অসামান্যার আকস্মিক প্রবেশে সবাই একটু নড়েচড়ে বসলেন। হ্যাঁ, স্বয়ং টেভরনিঅর পর্যন্ত। গৌরী মেয়েটির তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণের উজ্জ্বল মুখখানি এক দৃপ্ত গরিমায় যে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। সে মুখে বিষাদ আছে। কিন্তু বিষাদের গ্লানি নেই। দুঃখ আছে। কিন্তু তার মসীলেখা সে মুখে দাগ কাটেনি। সুবেদার তাঁর আলবোলার সটকা নামিয়ে রাখলেন। সভাসীন পারিষদবর্গের সব কয়টি চোখ গিয়ে পড়ল সেই মেয়েটির দিকে। আর এই সময়, এই অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা ভেঙে বেজে উঠল সেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর। তরুণী বললেন, 'সুবেদার সাহেব, আমি সতী হতে চাই। আমায় অনুমতি দিন। আমি আমার স্বামীর চিতায় সহমৃতা হব। কণ্ঠে আশ্চর্য এক দৃঢ়তা। নিরুত্তেজ এক শপথের অঙ্গীকার।

সুবেদারের ললাটে বলীরেখায় পাশাপাশি কয়েকটা দাগ কাটল। তাঁর স্থির দৃষ্টি কেমন যেন কোমল হয়ে উঠল করুণায়। সুবেদারসাহেব বললেন, 'তা কি হয় বেটি। এ বয়সে তুমি মরবে কেন? এই পাগলামি পরিত্যাগ কর।

মেয়েটি কোন জবাব না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শান্তদৃষ্টিতে মুঘল শাসনকর্তার দিকে একবার তাকাল তারপর বোঝা গেল সেই ফর্সা রঙে একটা নতুন আভা ভেসে আসছে। সে আভা ক্রোধের। আহত ফণিনী যেমন করে গর্জন করে ওঠে তেমনি এক অসহ্য ক্রোধে ভেঙে পড়ল মেয়েটি। বলল, সুবেদারসাহেব আমি সতী হতে চাই। আমার স্বামী আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমায় হুকুম দিন আপনি।'

সুবেদারসাহেব অনেক বোঝালেন। ব্যাপ্টিস্তে টেভরনিঅর বলছেন, তাঁর সামনে যে নাটকের অভিনয় হচ্ছিল, সেটি অভিনব। অশীতিপর বৃদ্ধ যত মেয়েটিকে নিষেধ করেন, দুর্জয় ক্রোধে মেয়েটি ততই তার সঙ্কল্প পুনরাবৃত্তি করে। শেষবেশ অধৈর্য সুবেদার চিৎকার করে উঠলেন —আগ্ কিসকা বোলতা হ্যায়, তুমহারী মালুম হ্যায়—আগুন কাকে বলে তুমি জানো? আগুন যখন তোমার দেহ পুড়িয়ে দেবে, সে দাহিকাশক্তি, জ্বালা, সে বেদনা তুমি আন্দাজ করতে পার? জীবনে কখনও আঙুল পুড়িয়ে ফেলনি।

—না, না। মিথ্যে এ-সব ভয় আমায় দেখাচ্ছেন আপনি। সব জানি আমি। সব জেনেই আমি আপনার অনুমতি নিতে এসেছি। দৃঢ় কণ্ঠে বললে মেয়েটি। আর এইখানেই শেষ করলে না। বললে, ঐ ত আপনার মশাল জ্বলছে। প্রতিহারীকে একটা এগিয়ে আনতে বলুন। আগুন আমার কেমন মিত্র, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সুবেদার শুধু মেয়েটির কথাই শুনলেন না। তার চোখে কিসের যেন আগুন দেখলেন তারই ত্রাসে বুঝি তিনি কেঁপে উঠলেন। তাড়াতাড়ি

বললেন, তুমি যেতে পার, তুমি জাহান্নামে যাও। তোমাকে আমি অনুমতি দিলাম।

সুবেদার তো অনুমতি দিলেন। কিন্তু বাবু যত কহে পারিষদগণ কহে তার শতগুণ। উঠতি যত ওমরাহ সেখানে বসে ছিলেন, তাঁরা মেয়েটিকে একটু বাজিয়ে দেখতে চাইলেন। দরবারের প্রহরীকে একটি জলন্ত মশাল এগিয়ে এনে মেয়েটির সহ্যশক্তি পরীক্ষা করাতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, 'ভাববেন না জনাব, বলা আর করা এক কথা নয়। আগুনে হাত পোড়াতে কখনই সাহস করবে না মেয়েটি, সুবেদার প্রথমে রাজী না হলেও আমীরদের পীড়াপীড়িতে অগত্যা রাজী হলেন। মশালটি আনা হল। আর তৈলাক্ত কাপড়ের সেই লেলিহান শিখায় মেয়েটি স্বচ্ছন্দে তার শুভ্র গৌর করপল্লবটি এগিয়ে দিলে। একটুও শব্দ করলে না। হাতটি ধীরে ধীরে পুড়তে লাগল। একসময়ে চামড়া পোড়া দুর্গন্ধে সারা দরবার বিষাক্ত হয়ে গেল আর উৎফুল্ল মেয়েটির চোখের আশ্চর্য এক হাসি দেখে আমীর মনসবদার সবাই সন্ত্রাসে তাঁদের চোখ ঢাকলেন। হ্যাঁ, বিদেশী পর্যটক টেভরনিঅর নিজেও। পাটনার সেই ডাচ ফ্যাক্টর যার ঘরে টেভরনিঅর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও।

সমসাময়িক আরও দুটি সতীকাহিনী টেভরনিঅর তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের তৃতীয়খণ্ডে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এবং এই ক্ষেত্রেও ভারতীয় সতীধর্মকে তিনি ঘনিষ্ঠ সহমর্মিতার চোখেই দেখেছেন। তাঁদের মনের দৃঢ়তা, তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের ঐকান্তিকতার প্রতি তিনি তাঁর বিদেশী মনের সহানুভূতি গোপন করেননি।

অনেকেই জানেন কৃষ্ণা নদীর আটমাইল উত্তরে বিখ্যাত টালিকোটার যুদ্ধে বিজাপুর, বিদর, গোলকুণ্ডা ও আহমদনগর রাজ্যের সম্মিলিত আক্রমণে বিজয়নগর রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি রামরাজা, ভেঙ্কটাদ্রি ও টিরুমল সহ সম্যকভাবে পর্যুদস্ত হন। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে খোরসানী অশ্বারোহী সৈন্যদলের বিদ্যুৎগতি আক্রমণে রামরাজা বিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং আহমদনগরের নবাব পুসেন হুসেন নিজাম শাহের একটি হস্তীর আক্রমণে তাঁর পাল্কীর (সিডান চেয়ার) বাহকেরা তাঁকে ফেলে পালায়। বিখ্যাত গোলন্দাজ ছেলাবী রুমিখান তাঁকে বন্দী করেন এবং হুসেন নিজামশাহের কাছে নিয়ে আসেন বন্দী করে। আনার সঙ্গে সঙ্গে নিজাম স্বহস্তে তাঁর মস্তকচ্ছেদন করেন এবং একটা বর্শায় তাঁর কাটা মাথাটা গেঁথে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের দেখবার জন্যে তুলে ধরেন। (৫)

কিন্তু টেভরনিঅরের কাহিনী রামরাজার এগারটি পত্নীদের নিয়ে। বিজাপুরের জয়লাভের খবর শুনেই এঁরা ঠিক করলেন, তাঁরা স্বামীর সহমৃতা হবেন। নিজামশাহের কাছে খবর যেতেই তিনি বলে পাঠালেন তাঁরা অন্তঃপুরবাসীদের ওপর কোনরূপ অন্যায় আচরণ করবেন না। কাজেই তাঁদের অগ্নিগর্ভে আত্মবিসর্জনের কোন প্রয়োজন নেই। নিজামশাহ বললেন ঠিকই, কিন্তু, যাদের বললেন তাঁরা এসব কথা কানে নেওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করলেন না। তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। নিজামশাহ তখন তাঁদের প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখলেন যাতে তাঁরা সতী হবার কোন অবকাশ না পায়। মহিলারা সব বুঝে নিজামশাহের প্রতিহারীদের বললেন, যে তাঁদের কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট করার মিথ্যাই চেষ্টা করছেন নিজামশাহ। তাঁদের সতীহবার সুযোগ না দিলেও তাঁরা প্রাণ রাখবেন না।

নিজামশাহ হাসলেন। কেননা রক্ষীপরিবৃত এই প্রকোষ্ঠের চার দেওয়ালের বাইরে যাওয়া অসম্ভব। কাজেই তাঁদের সতীহওয়া অসম্ভব। রামরাজার শেষকৃত্য সমাপ্ত হল কৃষ্ণানদীর তীরে তাঁর নশ্বর দেহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল আর নিজামশাহের প্রতিহারী এসে সেই বন্দীশালার দ্বার খুলে দেখল সেখানে এগারটি সুন্দরী মহিলার মৃতদেহ সারি সারি শুয়ে আছে। তাঁদের জীবনের কোন লক্ষণ নেই। কেবল তাঁদের মুখে বুঝিবা কোন বিজয়িনীর হাসি। রামরাজাকে হারালেও এগারটি সতীমেয়ের কাছে সত্যি সত্যি হেরে গেলেন নিজামশাহ।

অপর কাহিনীটি খাস মুঘল দরবারের। ষোলশ' চুয়াল্লিশ। পাঁচই আগষ্ট। সম্রাট শাহজাহান তখন ময়ুর সিংহাসনে। পাত্র-মিত্র-সভাসদ আমীর মনসবদারদের ভিড়ে দেওয়ানীখাস লোকে লোকারণ্য। অকস্মাৎ সেখানেই একটা মস্ত নাটক হয়ে গেল। এক নিষ্ঠুর রক্তাক্ত দৃশ্য। একটি নয় পর পর দুইটি হত্যাকাণ্ড। সলাবৎ খাঁ তখন সম্রাট শাজাহানের 'মাষ্টার অব সেরিমনিজ'। দরবারী আদবকায়দা—আচার অনুষ্ঠানের প্রধান নিয়ামক। সেই সময় রাজস্থানের দুই রাজপুত নৃপতি তাঁদের পনর ষোল হাজারের বাহিনী নিয়ে এসেছিলেন আগ্রা। সম্রাট শাজাহান তখন সিংহাসনে। রাজপুত নরপতির রক্তে মেবারী মরুভূমির মধ্যাহ্নের তাপ। ধান দিলে খই হয়। আত্মসম্মানের পান থেকে চুন খসলেই একেবারে তলোয়ারের ডগায় তার হিসেব। এবং এমনই দুর্বিপাক—সলাবৎ খাঁ তাদের মানে খোঁটা দিয়ে কি একটা কথা বললেন। ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম। সম্রাটকে তেমন মাথা নামিয়ে তসলিম করেননি রাজপুত নরপতি। কি এত বড় কথা একজন নফরের? রাজপুত নরপতি তাঁর তীক্ষ্ণ তরবারি আমুল বসিয়ে দিলেন সলাবৎ এর বুকে। সলাবৎ খাঁ তাঁর ভাই-এর বুকে গড়িয়ে পড়লেন। সলাবৎ-এর ভাই যেমনি তাঁর ভ্রাতার হত্যাকারীকে আক্রমণ করতে গেলেন রাজপুত রাজার ভাই তক্ষুনি তাকে আক্রমণ করে হত্যা করলেন। এ সবই ঘটল সম্রাট শাহজানের চোখের সামনে। বিরক্ত সম্রাট দরবার ছেড়ে উঠে গেলেন আর অন্যান্য আমীররা সবাই দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করলে হত্যাকারী রাজভ্রাতৃদ্বয়কে। আর অচিরেই তাদের টুকরো টুকরো করে ফেললে।

ক্রুদ্ধ সম্রাট শাজাহান বলেছিলেন সেই রাজপুত নৃপতিদের খণ্ডবিখণ্ড মৃতদেহ যমুনার জলে ভাসিয়ে দিতে। কিন্তু সাময়িকভাবে তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন যে তাঁর দরবারে সেই রাজপুত-সর্দাররা একা আসেননি। তাদের সঙ্গে পনর ষোল হাজারের এক রাজপুত বাহিনী এসেছিল। এই অপমান মুখ বুঁজে সহ্য করার মত মেরুদণ্ডহীন তারা নয়। কাজেই বদলে গেল মতটা। তাঁদের মৃতদেহ রাজপুত অক্ষৌহিনীর হাতেই সঁপে দেওয়া হল। আর তারপরই অনুষ্ঠিত হল সতীদাহ। বল সাহেব টেভরনিঅর-এর ভ্রমণকাহিনীর এই অংশটি অনুবাদ করে লিখেছেন—As they went to burn them they beheld thirteen wowen of the house holds of these two Rajas approaching, dancing and laping, whoforthwith encircled the funeral pile, holding one another by the hand, mounted it, and being immediately enveloped in the smoke, which suffocated tbem they all fell together into the fire. The Brahmans then threw upon them a quantity of wood, pots of oil, and

other drugs, according to the oustom, in order that the bodies should be quickly consumed.

টেভরনিঅরের বর্ণিত এই কাহিনী রাজপুতদের এই সতীদাহ প্রথার বিবরণ। প্রসঙ্গান্তরে তিনি মুখ্যতঃ গুজরাটবাসী এবং আগ্রা ও দিল্লীর সতীদাহের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন। তাতে দেখা যায় যে সেখানকার করম কারণ সব আলাদা। সেসব জায়গায় নদী বা পুষ্করিণীর নদীতটে প্রায় বারফুট চারচৌকা একটা কুঁড়েঘর তৈরী করা হত। কাঠকড়ি দিয়ে তৈরী এই ঘরে কিছু তেল ও অন্যান্য নানা দাহ্য সামগ্রী রাখা হত যাতে শবসহ এই বিচিত্র চিতা সহজেই পুড়ে যায়। এই কুঁড়েঘরের ভেতরে সতী থাকতেন অর্ধশায়িত হয়ে। তাঁর উপাধান হত কয়েক বাণ্ডিল কাষ্ঠ। আর তাঁর পিছনে একটি খুঁটিতে তাঁর কোমরের কাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিত কোন ব্রাহ্মণ। এই ব্যবস্থাটা টেভরনিঅর বলছেন, পাছে দহন জ্বালায় সতীরমণীটি শবশয্যা ছেড়ে উঠে পড়েন। সেই ভয়ে। এই অবস্থায় তাঁর কোলে মৃত স্বামীর দেহটি রেখে সারাক্ষণ পান চিবোতেন। প্রায় আধঘণ্টা এই অবস্থায় কাটবার পর তাঁর পুরোহিত ব্রাহ্মণ ঘর থেকে বেরিয়ে যেত এবং মেয়েটি ডেকে তাঁকে সেই গৃহে অগ্নিসংযোগ করতে বলতো। বলার যা অপেক্ষা, পুরোহিত, রমণীটির আত্মীয় স্বজন এবং সখীরা পাত্র করে ঘৃত বা তৈল নিক্ষেপ করে সেই ঘরে এবং এক সময়ে আগুনও জ্বেলে দিত! দগ্ধাবশেষ যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রখণ্ড থাকত, তা সবই তাঁর আত্মীয়রা গ্রহণ করত।

উনবিংশ শতকের মহিলা আগন্তুক এম্মা রবার্টস তাঁর 'হিন্দুস্থান' গ্রন্থে যে সতীদাহের ছবি এঁকেছেন, তার সঙ্গে এই চিত্রের বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। কেবল তিনি কুটীরের জায়গায় চিতার কথা বলেছেন। কৌতূহলী পাঠকেরা এই গ্রন্থে সেকালের সতীদাহের মর্মন্তুদ দৃশ্যের আশ্চর্য এক একরঙা ছবি লক্ষ্য করে থাকবেন। টেভরনিঅর কোরমণ্ডল উপকূলে সতীদাহের অন্য এক প্রকার বিবরণ দিয়েছেন। অবশ্য, টার্সন সাহেব তাঁর কাসটস্ এণ্ড ট্রাইবস্ অব সাউথ ইণ্ডিয়া গ্রন্থে মালাবার উপকূলে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ সমাজে সতীদাহের অনুপস্থিতির জন্য বলেছেন। মাতৃতান্ত্রিক এই সমাজের নারী জাতির প্রতি এই নিষ্ঠুরতা সমর্থন না করাই স্বাভাবিক।

সে যাই হোক, কোরমণ্ডল উপকূলে সতীদাহের জন্য একটা নয়-দশ ফুট গভীর এবং পঁচিশ ত্রিশ ফুট চৌকা এক গর্ত তৈরী করা হ'ত। তাতে আগে বহু কাঠ এবং বহুতর দাহ্য পদার্থ ফেলে সেটা যাতে সহজে জ্বলে যায় তার ব্যবস্থা করে রাখা হত। যখন সেই ভূমধ্যস্থ চিতা বেশ জ্বলে উঠত, মৃত ব্যক্তিকে সেই গর্তের ধারে শুইয়ে দেওয়া হত। এরপর তাঁর সতীস্ত্রী আসতেন তাঁর সখীজন পরিবৃতা হয়ে। নৃত্যপরা হয়ে আসতেন তিনি। তাঁর মুখে তাম্বূল বিহার। আর সঙ্গে সঙ্গে বাজত ভেরী, পটহ, মৃদঙ্গ। সতীরমণী তিনবার সেই গর্তটি প্রদক্ষিণ করে এবং প্রতিবার প্রদক্ষিণ সেরে তাঁর সখী ও আত্মীয়স্বজনকে আলিঙ্গন করত। তিনবার ঘোরার পর ব্রাহ্মণরা মৃতদেহটি আগুনে ফেলে দিত এবং রমণীটি সেই চিতার দিকে পিছু ফিরে দাঁড়ান। এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণরা তাঁকে ঠেলে সেই আগুনে ফেলে দিত। অন্যান্য আত্মীয়জন ও শ্মশানে বন্ধুরা সেই অগ্নিগর্তে তখন ঘৃত ও তৈল নিক্ষেপ করতে থাকত যাতে শব ও সতী খুবই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।

কোরমণ্ডল উপকূলে আর একরকম সতীদাহের কথা বলছেন এই ফরাসী ভ্রমণকারী যাতে

দহনের কোন বালাই নেই। এই প্রথায় ব্রাহ্মণ নরনারীর সাধারণ দৈর্ঘ্যের এক ফুট বেশী গর্ত করত। তখন সেই গর্তে মৃতকে খাড়া করে রাখা হত। আর তার পাশে গিয়ে দাঁড়াত তার স্ত্রী-যে নাকি ইহকালে চিরদিনই তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তারপর তার বন্ধুস্বজনরা সেই জন্মমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়ান দম্পতির ওপর বালির বোঝা ঢালতে থাকত। এক সময়ে গর্ত বুজে যেত তখনও বালি ঢালা হত। এবং মাটির ওপরে বালি ঢেলে একটা ঢিপি করা হত আর তখন স্বরু হত তার ওপর আত্মীয়স্বজনদের নৃত্য। সমসাময়িক অন্য এক বিদেশী পর্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও এই প্রথার উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু সবচেয়ে নাটকীয় সতীদাহ দেখেছিলেন টেভরনিঅর এই পোড়া বঙ্গদেশে। এখানে সতীদাহ হ'ত একমাত্র গঙ্গাতীরে। এবং সেজন্য কি নিদারুণ কষ্ট ভোগই না করতেন সেকালের বাঙালীরা। টেভর নিঅর বলছেন, কোন কোন সময়ে দীর্ঘ কুড়িদিন ধরে হেঁটে তবে তাঁরা গঙ্গার তীরে পৌঁছিতে পারতেন। ততদিনে সব পচে উঠত। দুর্গন্ধ বেরোত। কিন্তু তাই নিয়ে কারও কোন মাথাব্যথা ছিলনা। গঙ্গার তীরে এসে তারা সবদেহকে সুচারুরূপে স্নান করিয়ে চিতায় তুলত। টেভরনিঅর বলছেন তিনি সুদূর ভুটান থেকে এক রমণীকে সতী হবার উদ্দেশে বঙ্গদেশে গঙ্গাতীরে আসতে দেখেছিলেন।

এখানেও যথেষ্ট নৃত্যবাদ্যসহকারে সতী উঠতেন স্বামীর চিতায়। এবং তারপর তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা একে একে এসে এসে তাঁকে নানা উপহারদ্রব্য দিয়ে যেত। কেউ একটা পত্র, কেউবা একপ্রস্থ কাপড়, কেউবা একগুচ্ছ ফুল আর কেউ একটুকরো সোনা বা রূপো। উদ্দেশ্য সতীরমণীটি যেন এই উপহারগুলি স্বর্গে তাদের প্রিয়জনদের কাছে পৌছে দেন। এই পর্ব শেষ হলে মেয়েটি তিনবার ডেকে জিজ্ঞাসা করত আর কারও আর কিছু দেবার আছে কিনা। কোন জবাব না পাওয়া গেলে তিনি একখণ্ড রেশমী বস্ত্র তাঁর কোমর থেকে তাঁর বিগত স্বামীর শবের কোমর পর্যন্ত বিছিয়ে দিতেন। তারপর বলতেন পুরোহিতকে চিতায় অগ্নি সংযোগ করতে।

টেভর নিঅর বলেছেন সেকালে বাঙাদেশে জ্বালানী কাঠের নাকি ভারী অভাব ছিল। তাই শবে বেশী করে তেল আর ঘি ঢালা হত আর অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হ'ত। কুমীরে তা' খেয়ে ফেলত। মনে হয় টেভর নিঅর বাঙালী শেষকৃত্যের একটি প্রথাকে ভুল বুঝেছিলেন।

সে যাই হোক, টেভর নিঅর আশ্চর্য সততায় সেকালের সতীদাহের বিচিত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাতে একটা বিষয়নিষ্ঠ মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কোন জায়গাতেই তিনি তাঁর নিজস্ব বিরূপ অভিমতে এই বিবরণ কণ্টকিত করেন নি। এ এক দুর্লভ সংযম। বিশেষ করে সেকালের খৃষ্টান বিদেশী পর্যটকদের পক্ষে। এবং এই একটিমাত্র কারণেই তাঁর সতীদাহের কাহিনীর বিশেষ মূল্য আছে। এবং বোধহয় তাই তাঁর প্রভাব পাঠকমনে অসীম। তাঁর নীরবতাই বাঙ্ময় হয়ে এই পৈশাচিক প্রথাকে বহুমুখে নিন্দা করার প্রেরণা দেয়। নারীহত্যার এই অপচয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বিবরণ পাঠের পর এই হিংস্র প্রথার যে অচিরে বিলোপ চাই—সেই প্রার্থনা মনে মনে অবশ্যই জেগে ওঠে টেভর নিঅরের সতীদাহ বিবরণের সেইখানেই সার্থকতা।

উত্তর রাঢ়ের লোকসংগীত

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

ঘেঁটু

পশ্চিমবাংলায় প্রধানতঃ বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলায় এবং হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলার কোন কোন অঞ্চলে ঘেঁটু পূজা উপলক্ষ্যে লোকসঙ্গীতের প্রচলন আছে। ঘেঁটু খোসপাচড়া হ'তে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য এক লৌকিক দেবতা এই ধারণা। চৈত্র মাসের চতুর্দ্দশীতে কাঠের মূর্তি গড়ে এই পূজা হয়। পূজার কয়েকদিন পূর্ব্ব হ'তেই অন্ত্যজ শ্রেণীর বালকেরা গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী এই পূজার জন্য চাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে। ঘেঁটু খোসপাচড়ার দেবতা—তাই রূপটি কুৎসিৎ। রূপ বর্ণনায় ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত একটি গীতির উল্লেখ করা হল :—

সাধের মালা রইল গাঁথা বরণ ডালাতে।
ঘেঁটুর রূপ দেখে আজ বিরূপ হ'লাম আমরা সবেতে ॥
আ মরি কি রূপের গঠন, (দেখে) গা-টা করছে কেমন।
গলা সরু মাজা মোটা টাক ধরেছে মাথাতে ॥
কম হ'য়েছে চোখের জ্যোতিঃ গোল হ'য়েছে বুকের ছাতি।
দাঁতগুলো সব নড়তেছে আর চুল নেই চোখের ভুরুতে ॥

ঘেঁটু মূর্ত্তিকে তেল সিঁন্দুর মাখিয়ে গৃহস্থের বাড়ী নিয়ে গিয়ে গান ধরে—

ঘেঁটু আয় দোরে
খোস বালাই নিয়ে যা দূরে
ঘেঁটু আয় দৌড়ি
হাতির কাঁধে চড়ি
হাতিরে গুড়গুড়ি বাজে
তা শুনতে ফলুই নাচে
ফলুরে জিও কাঁন্দি
রাম লক্ষ্মণ মন থোক বাঁন্দি
থোক্ থোক্ তিন থোক
চিলে নিলে এক থোক্
ওরে চিল নড়্চড়
দাঁড় করা পট্টঙ্গাসুতো
মাছ মেরেছি ঈষের গুঁতো
হ'রে ছোঁড়া প্রকাণ্ড
ঈষ লাঙ্গল বার ক'র

এ হাল কোথাকে যায়
রসুনহাটাকে যায়
রসুনহাটায় কি কি বিকায়
মার মার খাওার বিকায়
এই খাওার লোব।
ভাসুর বন্দক দোব ॥
ভাসুর ভাসুর ভুনিয়া।
কড়ি আন গা গুণিয়া
কড়া আনতে কড়ি ছোটে।
রাজার ঘরে লেঠু উঠে।
নেই কি? দেয় কি?
কড়াই ছুটিয়া ভাই।
এই যায় ওই যায়
ধোপার ঘাটে জ ল খায় ॥
ধোপার ঘাটে জল খেয়ে।

মোষ পড়লো ভুক্সম দিয়ে ॥
ঘেঁটু............যা দূরে ॥

ঘেঁটুর গান ছড়াধর্ম্মী। বোধহয় কিশোর কৃষকের কথা স্মরণ করেই এ জাতীয়গানের সৃষ্টি। ভাবের কোন গভীরতা নাই। সুরও অত্যন্ত সহজ। গান রচনার পদ্ধতিই গায়কদের তাল বজায় রাখতে সহায়তা করে নীচের গানটি শুনলেই বোঝা যাবে—

পিথম পিথম এলাম
ঘর গিরস্থর বাড়ী।
গিরস্থেরা রেঁধেছে
শাগনের খাড়ি ॥
শাগন গেল আগ্‌নে দিকে।
চোর পালালো গলি দিকে
চোর লয় জোয়া কাঁন্দর।
সাত সমুদ্দুর পলুই নাচে ॥
পলুই-এর ভিতর মাছ মারি।
মাছ মেরে খাকুই-এ ভরি ॥
খাকুই-এ ভরে স্বর্গে উঠি
স্বর্গে উঠে রাজ করি ॥
রাজে রাজে জোড়ালাম
চন্দন কাঠ চিলালাম
চন্দন কাঠের আগে ফোরা।
বার করবো ছিরা মিরা ॥
ছিরা মিরা কদ্দুর যায়।
লালমোল ভেজে খায় ॥
লালমোলের টামটুমি
বুড়ি আনলে গামগুমি।
গামগুমিয়ে ভাঙ্গলে দাঁত
বুড়ি আনলে চৈত মাস।
চৈত মাসে চতুর্দ্দশী
বুড়ির কপালে চন্দন ঘষি ॥
চন্দন ঘষে পড়লো টোপা।
এই বুড়ি তোর সাত বেটা ॥

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

শিখর রীতি

অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের যতগুলি মন্দিরের কথা বলা হইয়াছে সবগুলিই ক্ষুদ্রাকৃতি। আকৃতির এই সঙ্কুচিত দৈন্য কাটাইয়া উঠিয়াছে একটি মাত্র মন্দির—বর্দ্ধমান জেলার দেবীপুর গ্রামের লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দির, সুউচ্চ ভিত্তি অধিষ্ঠানের উপর অবস্থিত ১৮৪৪ খৃঃ নির্ম্মিত। মন্দিরটির তুঙ্গ শিখরের বিপুল বিস্তার উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের এই অংশে একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। ভাব কল্পনার গোত্রবন্ধন তো একই। তাহাকে অবলম্বন করিয়া স্থপতি যে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বিস্তারের মোহ ছিল বলিয়া মনে হয় না। বরং সমগ্র দেহটিকে সুষম করিয়া তুলিবার সচেতন প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটির সম্মুখে অবস্থিত একটি সঙ্কীর্ণ মণ্ডপ (বা দালান) ইহাকে একটু বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এই সময় বাংলাদেশের ইটের শিখর মন্দিরের সম্মুখে ভদ্র দেউল বা অন্য কোন প্রকার প্রকোষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া দিবার পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই। দু'এক ক্ষেত্রে দেখা যায় মন্দিরের সম্মুখে একটু দূরে সমতলছাদ বিশিষ্ট একটি মণ্ডপ। কুলীন গ্রামের গোপাল মন্দিরে, তমলুকের হরি মন্দিরে, মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে। এ মণ্ডপও আবার মন্দিরের সহিত সম-স্তরে নহে, মণ্ডপের মেঝে মন্দিরের মেঝের অনেক নীচে। প্রকৃতপক্ষে মন্দিরের ভিত্তি অধিষ্ঠানের সহিত সমান স্তরে ইহার অবস্থান। এ ধরণের মণ্ডপ শুধু শিখর মন্দিরে নহে, চালা ও রত্ন রীতির মন্দিরেও থাকে। লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দিরটির সম্মুখে যুক্ত অবস্থায় রহিয়াছে একটি দোচালা আচ্ছাদন বিশিষ্ট আয়তাকার কক্ষ—ইহাই মন্দিরটির মণ্ডপ বা দালান। মূল মন্দির দেহে কোন অলঙ্করণ নাই, সজ্জা যাহা কিছু সবই এই দালানের উপর।

এতক্ষণ যে মন্দিরগুলির কথা বলিলাম তাহাদের সবগুলিই একটা সাধারণভাবে গৃহীত ভাবকল্পনার প্রবাহপথ বাহিয়া আসিয়াছে। এইবার এই ধারা হইতে কিছুটা সরিয়া আসিয়াছে এমন কতগুলি মন্দিরের কথা বলিয়া ইটের শিখর মন্দিরের এই শ্রেণীর কথা শেষ করিব। আগেই বলিয়াছি ইহাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল গণ্ডীর উপর ঈষৎ উদ্গাত রেখার বন্ধন। বাঁকুড়া জেলার কোতলপুরের যে মন্দিরগুলির নাম একটু আগেই করিয়া আসিয়াছি তাহাদের গণ্ডীতে কিন্তু উদ্গাত রেখার বন্ধনীর পরিবর্তে ঈষৎ নিম্নায়ত আনুভূমিক খাঁজের সারি গণ্ডীর পাদমূল হইতে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। খাঁজগুলি উদ্গাত রেখার মত ঘনসংবদ্ধ নহে, পরস্পরের ব্যবধান একটু বেশী। বৈচিত্র্যায়নের পদ্ধতি হিসাবে খাঁজের ব্যবহার আর বিশেষ কোথাও স্থপতির চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই—কোতলপুরের বাহিরে শুধুমাত্র বর্দ্ধমান জেলার অমরাগড়ের দুগ্ধেশ্বর শিব মন্দিরের গণ্ডীগাত্রেই ইহার ব্যবহার ঘটিয়াছে। আর একটি প্রাচীনতর মন্দিরে—কোতলপুরের অনতিদূরে ময়নাপুর গ্রামের হাকন্দ মন্দিরে—গণ্ডী একটি খাঁজের দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত। এই মন্দিরটির কথা একটু পরেই বলিতেছি।

আর একটি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত সিউড়ী সহরের ছয় মাইল পশ্চিমে ময়ূরাক্ষীনদীর তীরবর্তী ভাণ্ডীরবনের ভাণ্ডীশ্বর শিব মন্দিরের সহিত গোত্রবন্ধন তাহাদের অত্যন্ত শিথিল বটে কিন্তু বাড় বা দেওয়ালের শেষ প্রান্তে যে ভাবেই হোক না কেন বারণ্ড রেখা রচনা করা হইয়াছে—লম্বমান দেওয়ালের অবসান বাহির হইতে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্যই ইহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে মন্দিরটিতে বাহিরের দিকে বাড় ও গণ্ডীর বরণ্ড রেখা তো একেবারে অনুপস্থিত। সমগ্র দেহের বহিরেখা যেন একটি টানে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রচেষ্টার ফল ভাল হয় নাই। মন্দির দেহ হইয়া উঠিয়াছে নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন আর বহিরেখার উপর নিয়ন্ত্রণও হইয়া গিয়াছে শিথিল।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী সহরের অদূরে পাঁচথুপী গ্রামে একটি অভিনব মন্দির সংস্থানের সাক্ষাৎ মিলিতেছে। সংস্থানটি পরিচিত নবরত্ন শিবমন্দির বলিয়া। মন্দির প্রসঙ্গে নবরত্ন বলিতে রত্নরীতির একটি বিশিষ্ট বিভাগের কথাই মনে হয়। কিন্তু শব্দটির ব্যবহার এখানে সম্পূর্ণ অন্য অর্থে। এই স্বাতন্ত্র্যটুকু বুঝিতে হইলে সংস্থানটির একটু পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুউচ্চ ভিত্তি-অধিষ্ঠানের চারিকোণে চারিটি ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর, মধ্যস্থলে প্রধান শিখরটি। কেন্দ্রস্থিত মন্দিরটির আসন পঞ্চরথ কিন্তু অভ্যন্তরে গর্ভগৃহ অষ্টকোণাকৃতি। আটটি দেওয়ালের একটি পূর্ব্বদিকে—ইহাকে ভেদ করিয়াই প্রবেশদ্বার, অবশিষ্ট সাতটি দেওয়ালের চারিটির উপর আভূমি লম্বিত সুবৃহৎ কুলুঙ্গি; প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করিয়া শিব লিঙ্গ। গর্ভগৃহের কেন্দ্রস্থলে আর একটি বিগ্রহ। মূল মন্দিরের পাঁচটি আর চারিটি পার্শ্বমন্দিরে সমসংখ্যক শিব লিঙ্গ—সংখ্যা দাঁড়াইল নয়। বিগ্রহের এই সংখ্যা হইতেই নবরত্ন নামটির উদ্ভব। মন্দির-সংস্থানের যে বিন্যাস এখানে দেখিতেছি তাহা বাংলাদেশে অন্য কোথাও নাই। রাজপুতানায় পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থান প্রচলিত প্রথার মধ্যেই পড়ে। এই ধরণের সংস্থানে প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণের চারিকোণে চারিটি পার্শ্বমন্দির আর মধ্যস্থলে থাকে সর্ব্বোচ্চ মূল মন্দিরটি। পাঁচথুপীর নবরত্ন মন্দির-সংস্থান একটি সুউচ্চ ভিত্তি-অধিষ্ঠানের উপর বিন্যস্ত। পরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণ ও ভিত্তি-অধিষ্ঠানের পার্থক্য সত্ত্বেও যদি বিন্যাসের প্রশ্নটাই বড় করিয়া ধরা যায় তবে পাঁচথুপীর নবরত্ন মন্দিরটিকে পঞ্চায়তন মন্দির সংস্থান বলিতে দ্বিধা থাকে না।

ষোড়শ শতক হইতে ইটের শিখর নির্ম্মাণে যে স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের কথা এতক্ষণ বলিলাম তাহারই সমসাময়িক কালে একই উপাদানে আর এক শ্রেণীর শিখর মন্দির নির্ম্মাণের ধারা বহিয়া চলিয়াছিল। আকৃতি দেখিয়া মনে হয় ষোড়শ, সপ্তদশ শতকে পাথরে ও মাকরা পাথরে গঠিত শিখর মন্দিরের প্রত্যক্ষ প্রভাব হইতে ইহাদের উদ্ভব, সর্ব্বত্র না হইলেও অধিকাংশ দৃষ্টান্তেই আসনে রথক-উদ্গমন প্রথম শ্রেণীর মন্দিরগুলির তুলনায় ঘন এবং প্রশস্ত। ক্ষেত্রবিশেষে বাড়খণ্ডে বিভাগ আরোপিত হইয়াছে আর গণ্ডী ঘন-সন্নিবিষ্ট আনুভূমিক রেখায় আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই। গণ্ডীর বহিরেখার গতিভঙ্গও অনেক সংযত। রূপরচনায় এগুলি তো পাথর ও মাকরা পাথরের সমসাময়িক শিখর মন্দিরেই বিদ্যমান। পরিণাম প্রভাবও পাথরের মন্দিরের অনুরূপ—দৃঢ়বদ্ধ গঠনের একটা ভাব ইহাদের অঙ্গে ফুটিয়া উঠে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে নির্ম্মিত এই শ্রেণীর শিখর মন্দিরের উদাহরণ

মিলিবে হুগলী জেলার খানাকুলের নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণনগর গ্রামের রাধাবল্লভ মন্দিরে, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরের কেশব রায় ও নিকুঞ্জবিহারী মন্দিরে, বীরভূম জেলার করিধ্যা, চিনপাই প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামের শিখর মন্দিরে।

গণ্ডীর রূপ বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবিলে এই শ্রেণীর কয়েকটি মন্দির, বর্দ্ধমান জেলার জৌগ্রামের জলেশ্বর শিব মন্দির, হুগলী জেলার খানাকুলের নিকটবর্তী উবিদপুরের ঘণ্টেশ্বর শিব মন্দির, তমলুক শহরের ধোপাপাড়ার রামচন্দ্র মন্দির, একটু স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। বর্গাকার বাড়ের উপর হইতে গণ্ডী সামান্য ঝুঁকিয়া অগ্রসর হইতেছে বটে কিন্তু সাধারণ শিখর মন্দিরের মত বর্তুলাকৃতির আভাস ইহাতে বিশেষ নাই। বর্গাকার আকৃতি যেন সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে। দৈর্ঘ্যের প্রায় শেষ অবধি এইভাবে টানিয়া আনিয়া সামান্য বাঁকাইয়া গণ্ডীর উপরে ছাদ রচনা করিয়া দেওয়া। জৌগ্রামের জলেশ্বর মন্দিরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া মন্দিরটি অতিশয় প্রাচীন বলিয়া ধারণা হয়। গণ্ডীর বর্তমান রূপ পুনর্নির্ম্মাণের ফলে উদ্ভূত অথবা ক্রমাগত সংস্কারের ফলে আদি রূপ একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বাড় অংশেও সংস্কারের অভাব হয় নাই। তবে মূল দেহের পরিবর্তন খুব একটা ঘটে নাই। দ্বারপথটির সঙ্কীর্ণ ত্রিভুজাকৃতি রূপ, দেওয়ালের ঘনত্ব ও রথক উদ্গমনের বিস্তার ও গভীরতা সবই প্রাচীনতার দ্যোতক। ইহার সুদৃঢ়বদ্ধ দেহের বিপুল শক্তি-সম্ভাবনা ইটের মন্দিরে অস্বাভাবিক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু রূপকল্পনায় যে ঐশ্বর্য্য থাকিলে এই শক্তি সুষমামণ্ডিত হইতে পারিত তাহারই অভাবে দৃঢ়বদ্ধ দেহ অতিরিক্ত ভাবের সহিত নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। ঘণ্টেশ্বর ও রামচন্দ্র মন্দিরে দেহের মধ্যে এতটা দৃঢ়বদ্ধতা ও গুরুভারের আভাস ফুটিয়া উঠে না।

এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরের দুইটি খর্ব্বাকৃতি শিখর মন্দিরের কথা মনে পড়িয়া যায়। দুর্গ প্রাকারের উত্তর প্রান্তে পাথর দরজার নিকটে শ্যামকুণ্ড নামে একটি পুষ্করিণীর ধারে অবহেলিত অবস্থায় দুইটি পরিত্যক্ত মন্দির আছে। মন্দিরদ্বয়ের একটি ছিল কৃষ্ণের অপরটি বলরামের। বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ মন্দিরের মত নির্ম্মাণকাল নির্দ্দেশ করিয়া কোন লিপি ইহাদের গাত্রে প্রোথিত নাই। তবে শৈলীগত ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কারণে মন্দিরদ্বয় সপ্তদশ শতকের বলিয়াই বিশ্বাস হয়। পাথরের শিখর মন্দিরের ধারায় নির্ম্মিত ইটের শিখর মন্দিরগুলির গাত্রে বা গণ্ডীতে রথ-পগ রেখার উচ্চাবচ অবস্থান ছাড়া বৈচিত্র রচনার আর বিশেষ কোন পরিচয় নাই। বাড় অংশে সজ্জা বিষ্ণুপুরের নিকুঞ্জবিহারী ও কেশব রায় মন্দিরে কিছু আছে কিন্তু সুচিন্তিত বিন্যাসের পরিচয় তাহাতে নাই— অত্যন্ত সাধারণ ভাবে সজ্জার কিছু উপকরণ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এই শ্রেণীর মন্দিরে পাথরের মন্দিরের মতই অনলঙ্কৃত দেহের প্রতি প্রবণতাটাই যেন বেশী। কৃষ্ণ ও বলরামের মন্দিরে এই ধারার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ইহাদের কথা একটু বিশদ করিয়াই বলি। রথক উদ্গমন প্রশস্ত এবং ঘনত্ব যুক্ত। কয়েক সারি উদ্গত রেখায় পাভাগ রচিত এবং একই উপায়ে দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে বান্ধনা বিভাগ। তলজাঙ্ঘে ও উপর জাঙ্ঘে প্রতিটি পার্শ্ব রথকের উপর একটি করিয়া ক্ষুদ্র মন্দিরের অনুকৃতি, কেন্দ্রীয় রথকের উপর রহিয়াছে দুইটি করিয়া। বাড়ের শেষ প্রান্তে একসারি উদ্গত রেখায় বলরাম মন্দিরের বরণ্ড। কৃষ্ণ মন্দিরে কিন্তু বেশ কয়েকপ্রস্থ আনুভূমিক রেখায় বরণ্ড

রচিত। মন্দির দুইটিতে মূর্তি-সজ্জাও আছে। মূর্তিগুলির অবস্থানক্ষেত্র একটু অস্বাভাবিক—পাভাগ রেখার মধ্যে মধ্যে। বাড়ের গাত্রে সজ্জার বিষয়বস্তু সামান্যই কিন্তু একটা পরিকল্পিত বিন্যাস পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাজাইয়া তোলা।

উভয় মন্দিরেই বক্ররেখ গণ্ডীর গতিভঙ্গ নিয়ন্ত্রিত। কোথাও বেশী বাঁকিয়া গিয়া—শেষের দিকে অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে নাই; গণ্ডীর ছাদও তাই প্রশস্ত। কিন্তু বেকী ও আমলক এই সময়ের পাথরের মন্দিরের মতই, কোন বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

কৃষ্ণ ও বলরাম মন্দিরের গণ্ডী সমসাময়িক শিখর মন্দিরের মত অনাবৃত বা আনুভূমিক রেখায় বদ্ধ নহে। পগরেখা বাহিয়া টালির ছড় নামিয়াছে। বলরাম মন্দিরে কনিক পগ বাহিয়া আর কৃষ্ণ মন্দিরে অনুরথ পগ অর্থাৎ মধ্যবর্তী রাহাপগের ঠিক পার্শ্ববর্তী পগদ্বয় বাহিয়া। এতদ্ভিন্ন আনুভূমিক রেখার প্রয়োগে রাহা পগটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। পগ প্রবাহ বাহিয়া টালির ছড় নামাইয়া আনা তো প্রাচীন যুগের দেউলিয়া মন্দিরে ও জটার দেউলে গণ্ডীর অঙ্গসজ্জার একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। যে কালের কথা বলিতেছি সে সময়ও ছড় নামান পদ্ধতি হিসাবে বাঁচিয়াছিল কিন্তু মন্দিরের উর্দ্ধাংশে তাহার আর স্থান হয় নাই। নিম্নাংশে অর্থাৎ দেওয়ালের উপরে চারি কোণে নিয়মিত ব্যবধানের অন্তরে একটি বা দুইটি করিয়া টালি বসাইয়া ছড় রচনা করাই ছিল স্বীকৃত পদ্ধতি। বিষ্ণুপুরের মন্দির দুইটিতে প্রাচীন যুগের একটি অপ্রচলিত রীতি যে কি ভাবে আসিয়া পড়িল তাহা বলিতে পারি না। স্থপতির খেয়াল মাত্র এমনও হইতে পারে।

উপাদানের অন্তর্নিহিত গুণে যে রূপ ভেদ ঘটিতে পারে এ সম্ভাবনার কথা তো আলোচনা প্রসঙ্গে আগেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু স্থপতির উপাদান বিশেষ কাজ করিবার—অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাতে ও ওই একই সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। উপাদানের পরিবর্তন ঘটিলে স্থপতি তাহার অভ্যস্ত উপাদানে নির্ম্মাণের অভিজ্ঞতা অতিক্রম করিতে পারিবে না ইহাই স্বাভাবিক। ইটের মন্দিরে যেখানে পাথরের মন্দিরের রূপ-পরিণাম ফুটিয়া উঠে, সন্দেহ হয়, স্থপতির শিক্ষা ও অভ্যাস পাথরে বা মাকরা পাথরে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া। সেই অভিজ্ঞতাই সে ইটের মাধ্যমে মন্দির নির্ম্মাণ করিবার সময় বহন করিয়া আনিয়াছে, তাই বোধ করি দৃঢ়বদ্ধতা ও স্থূলতার আভাস ইটের মন্দিরেও থাকিয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত শিখর মন্দিরে গণ্ডীর যতগুলি প্রকারভেদ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি তাহাদের সবগুলির সহিত সম্পর্কশূন্য দুইটি মন্দিরের কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। মন্দির দুইটিই বাঁকুড়া জেলায়, একটি দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী পিঙরুই গ্রামে শ্যামচাঁদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত আর একটি হইল ময়নাপুর গ্রামের হাকন্দ মন্দির। প্রথমটি ইটে নির্ম্মিত দ্বিতীয়টির নির্ম্মাণ উপকরণ মাকরা পাথর। শ্যামচাঁদ মন্দিরের গাত্রালঙ্কারের সাক্ষ্য ষোড়শ শতকের শেষ দিকে ও সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকের প্রতি নির্দেশ করিতেছে। শৈলীগত বিচারেও তো দেখিতেছি ইঙ্গিত ঐ একই সময়ের প্রতি। হাকন্দ মন্দিরেও প্রাচীনত্বের কোন লক্ষণ নাই; বিভিন্ন অঙ্গের রূপ ও বিন্যাস দেখিয়া ইহাকেও তো সপ্তদশ শতকের কাছাকাছি কোন এক সময়ের বলিয়াই মনে হয়। মন্দির দুইটির

অভিনবত্ব ইহাদের গণ্ডীর লম্বমান ত্রিভুজাকৃতি রূপ। শিখর মন্দিরের ক্রমহ্রস্বায়মান গণ্ডী বক্ররেখায় বিধৃত হইবে ইহাই স্বতসিদ্ধ। শ্যামচাঁদ ও হাকন্দ মন্দিরে গণ্ডী ক্রমহ্রস্বায়মান বটে কিন্তু কোথাও বাঁকিয়া যায় নাই! লম্বমান ত্রিভুজের সুকঠিন বন্ধনে বহিরে্খার রূপ স্থির ও সুনির্দিষ্ট। বর্গাকার বাড়ের উপর গণ্ডীও মূলতঃ বর্গাকার হয়, কিন্তু শিখর মন্দিরের আদিকাল হইতেই বর্গাকৃতি রূপের কাঠিন্য মার্জ্জনা করিয়া বর্তুলায়িত কোমলতার আভাস ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সৃজনশীল কালের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, তাহার পরবর্ত্তী যুগে যে দিন ভাবকল্পনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে সে দিনও গণ্ডীর এই মার্জ্জিত রূপটি হারাইয়া যায় নাই। একটু আগে তিনটি মন্দিরের কথা বলিয়া আসিয়াছি। জৌগ্রামের জলেশ্বর, উবিদপুরের ঘণ্টেশ্বর ও তমলুকের রামচন্দ্র মন্দির, ইহাদের গণ্ডীতেও মূলীভূত বর্গাকারই প্রশ্রয় পাইয়াছে কিন্তু সে ক্ষেত্রেও মার্জ্জনার অভাব সম্পূর্ণ ঘটে নাই। গণ্ডীর রূপও এতটা কঠিন হইয়া উঠে নাই। শ্যামচাঁদ ও হাকন্দ মন্দিরে মার্জ্জনার প্রচেষ্টা মাত্র হয় নাই। শিখর মন্দিরের আদিযুগে ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে দেওগড় বিটারগাঁও মন্দিরে গণ্ডীর গাত্রে মার্জ্জনা ছিল না—মূলীভূত বর্গের কাঠিন্য অতিক্রম করিবার সময় তখনও আসে নাই। বোধনায়া মন্দিরের আদি ও বর্তমান উভয়রূপের মধ্যেই এ কাঠিন্য বিদ্যমান তবে অতিক্রম করিবার সচেতন প্রচেষ্টা দৃষ্টি এড়াইয়া যায় না। সপ্তম হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ব্যবধান তো সহস্র বৎসরের। এতদিন পরে শ্যামচাঁদ ও হাকন্দ মন্দিরের স্থপতিরা সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার বিপরীত একটা কিছু করিবার প্রেরণা যে কোথায় পাইলেন তাহা বলা কঠিন।

গণ্ডীর অভিনব আকৃতি সত্ত্বেও পিঁড়রুই-মন্দির বাংলার সেই সমস্ত ইটের শিখর মন্দিরের—যাহাকে আমরা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি—সাধারণ ধারার সহিত সংযুক্ত। লঘুভার মন্দিরটির অন্তরা রচনা ক্রমান্বয়ে উল্টাকাটনি ছাড়িয়া, বাহিরের দিকেও গণ্ডীর উপর আনুভূমিক রেখার সন্নিবেশ। রেখাগুলির পারস্পরিক দূরত্ব প্রচুর, সংখ্যায় সমগ্র গণ্ডীর উপর মাত্র সাতটি।

ময়নাপুরের হাকন্দ মন্দিরের গণ্ডী দুইটি অংশে বিভক্ত। ঠিক মধ্যস্থলে গণ্ডীটিকে বেষ্টন করিয়া একটি স্বল্পগভীর খাঁজ—ইহাই বিভাজক রেখা। কোতলপুরের শিখর মন্দির আলোচনা প্রসঙ্গে এই ধরণের খাঁজ কাটিবার প্রবণতার কথা বলিয়া আসিয়াছি। ময়নাপুর হইতে কোতলপুরের দূরত্ব অধিক নহে। মনে হয়, গণ্ডীদেহে বৈচিত্র্য আরোপ করিবার এই পদ্ধতি এই অঞ্চলে, দীর্ঘদিন ধরিয়াই প্রচলিত ছিল—ময়নাপুরের হাকন্দ মন্দির তাহার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

এ পর্য্যন্ত ব্যতিক্রমের কথা যাহা বলিয়াছি তাহার সহিত শিখর মন্দিরের মূলগত সমস্যার কোন সম্পর্ক নাই। আসনের রূপ পরিবর্তন করিয়া শিখর মন্দির নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা সামান্যভাবে হইলেও দু'এক ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল। সাধারণতঃ মূল বর্গক্ষেত্রকে অবলম্বন করিয়া রথক উদ্গমনের সাহায্যে আসন যোগচিহ্নাকৃতি করিয়া তোলা হয়। কুলীনগ্রামের নিকটে দত্তপাড়া গ্রামের একটি শিব মন্দিরে আসনের রূপ সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার—অষ্টকোণাকৃতি। আসনের প্রভাবে দেওয়াল আটটি, গণ্ডীর প্রাথমিক ভাগও আট। প্রতিটি ভাগ আবার ত্রিরথ। দেহের এই অভিনবত্বের প্রভাব গণ্ডীর বহিরে্খায় পরিদৃশ্যমান কিন্তু সাধারণ ধারা হইতে বিশেষ সরিয়া আসিতে পারে নাই।

মানদণ্ড

নাট্যবিষয়ে আলোচনা প্রসংগে কয়েকটি প্রশ্ন হয়েছে মনে, তবে সেগুলো নাট্যবিষয়ে নয় সাধারণ সমাজ বিষয়ে। বর্তমানে সেগুলি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করছি, অবশ্য প্রসংগান্তরে অনধিকার প্রবেশের জন্য পূর্বাহ্নেই সহৃদয় পাঠকের মার্জনা ভিক্ষা করে রাখছি।

সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটা মনে উদয় হচ্ছে, তাহল, আমাদের অর্থাৎ জনগণের বিচারের মানদণ্ড কি ঠিক আছে? শিশিরকুমারের সাক্ষ্য হল, ভাল জিনিস দিলে লোকে নেয়। অগ্রবর্তী নাট্যদল হিসাবে যাদের পরিচিতি তাঁরাও কিছুটা অনুরূপ সাক্ষ্যই দেন। যারা মৌখিক বলেন না তাঁদেরও অবস্থার পরিবর্তন থেকে জন সমর্থনের প্রমাণ পাওয়া যায়। দক্ষিণ কলকাতার মুক্ত অংগন মঞ্চে যারা নাটক মঞ্চস্থ করে থাকেন তাঁদের অনেকের মুখেই শুনেছি, সেখানে দরজায় ৫০।৬০ টাকার টিকিট বিক্রি হওয়া অতি সাধারণ ঘটনা।

অথচ বিপরীত সাক্ষ্যও পাওয়া যায়! অন্যতম অগ্রবর্তী নাট্যদল রূপকারের প্রাণপুরুষ শ্রীসবিতাব্রত দত্ত বলেছেন যে, কলকাতার চেয়ে বোম্বাই-এ তিনি অধিকতর জনসম্বর্ধনা লাভ করেছেন। পরিস্ফুট বিভ্রান্তি সত্যেও এ উক্তির মূলে সত্যের কণামাত্রও থাকার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা চলে না।

তারপর পেশাদারী মঞ্চের অবস্থা থেকেও কিছুটা বিপরীত প্রমাণ মেলে। নাটক হিসাবে যেগুলি অপকৃষ্ট সৃষ্টি বলে রসিকজন রায় দিয়েছেন জনগণের দাক্ষিণ্যের আশীর্বাদ কিন্তু তাদের ওপরই অজস্রধারে ঝরে পড়েছে। অন্যপক্ষে যার নাট্যমূল্য স্বীকৃত হয়েছে তা জনতার বিরূপ রায়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়েছে।

আবার ভিন্ন পরিবেশে যা সম্বর্ধিত অন্য পরিবেশে তা পরিত্যক্ত এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। বহুরূপীর 'রক্তকরবী' নিউএম্পায়ারে সকল আসন পূর্ণ করেছে অথচ পেশাদারী মঞ্চে মঞ্চস্থ হবার সময় নট-নটীদের গাড়ীভাড়া তথা জল খাবারের খরচ ওঠেনি বলে জনশ্রুতি। লিটল থিয়েটার দল মিনার্ভা মঞ্চে পাকাপাকি অভিনয় শুরু করার পর তাঁদের পূর্ববর্তী সফল নাট্য সম্ভারগুলি মঞ্চস্থ করে লাভবান হতে পারেননি।

অবশ্য উপরিউক্ত দৃষ্টান্তের কোনটিই ধর্মাধিকরণে প্রমাণ করা যাবে না, বড় জোর 'ধূমাৎবহ্নি' বলে ছেড়ে দিতে হবে।

কিন্তু আমাদের প্রশ্নটির জবাব তাতে মিলছে না। বিচারের সর্ববাদী সম্মত মানদণ্ডের হদিস এ তাবৎ পাওয়া যায়নি, অদূর ভবিষ্যতেও যাবে না। কোন কোন প্রাজ্ঞ লোক এমন উক্তি করে থাকেন। কথাটা সামগ্রিক বিচারে অবশ্যই সত্য কিন্তু আপেক্ষিক বিচারে নয়। 'এক কা

বুলি, দুসরে কা গালি,' এটা মেনে নেওয়া হয়েছে সুতরাং একজনের কাছে যা কোহিনূর, অন্যের কাছে তাই পাঁচ পায়জার।

তাহলে কি ধরে নিতে হবে, জনসাধারণ (বা ভিন্ন নামে জনগণ) বলে কোন বস্তুই নেই ? তাহলে পত্রিকায় জনগণের রায় বলে যা উল্লেখ করা হয় সে বস্তুটা কি ?

প্রসংগতঃ, সহযোগী এক পত্রিকায় সাধারণ মানুষকে বা কোথায় তার দেখা মেলে এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। এবং সে প্রশ্নের সর্বশেষে যে উত্তর পাওয়া গিয়েছিল, তাতে এই দাঁড়ায় যে, সাধারণ মানুষ বলে কিছু নেই।

শরীরবিজ্ঞানীরাও এ কথা স্বীকার করেন। তাঁরা অবশ্য সাধারণের কথা বলেন না, বলেন স্বাভাবিকের কথা। তাঁদের মতে স্বাভাবিক বলতে ধরে নিতে হবে দুই প্রান্তবর্তীর মধ্যে, অর্থাৎ অমি যদি বলি বাঙালীর উচ্চতা সাড়ে পাঁচফুট তাহলে গড় উচ্চতা বুঝছি। সে হিসাবে একদিকে যেমন সাড়ে সাতফুট লম্বা দৈত্যাকার মানুষ, অন্যদিকে তেমনি আছে ৪ ফুট বামন। তবে এরা ব্যতিক্রম সুতরাং এদের কথা বাদ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাড়ে পাঁচফুট উচ্চতা যে অধিকাংশ মানুষের এমন কথাত জোর করে বলতে পারব না। বড় জোর বলতে পারি ৫ ফুট থেকে ৬ ফুটের মধ্যেই শতকরা ৯৯ জন বাঙালীর উচ্চতা।

আবার যদি বলা যায় যে, মেয়েরা প্রতিদিন আধছটাক চিনি খায় তাহলেও সেই একই কথা কারণ কেউ হয়ত আধপো খায়, আবার কেউ খায় আধছটাক।

তবে এগুলোর মধ্যে সমতা থাকার যতটা সম্ভাবনা, কোন কিছু মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তা কখনই সম্ভব হয় না। কারণ প্রতিটি মানুষের প্রবণতা ভিন্নতর হওয়াটাই স্বাভাবিক। একই পিতামাতার দুই সন্তানের প্রবণতা সর্বক্ষেত্রে এক হয় না, এমনকি সদৃশ যমজ ছাড়া অন্য যমজদের পর্যন্ত ভিন্ন মতাবলম্বী হতে পারে।

এমত অবস্থায় সর্বজনস্বীকৃত মানদণ্ড নির্ণয় অসম্ভব। মোটামুটি একটি আভাসমাত্র দেওয়া সম্ভব এবং সেই আভাসকে পূর্ণায়ত চিত্র করার জন্য ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই রূপায়িত করতে হয়। অর্থাৎ মোদ্দা কথা দাঁড়াচ্ছে, সার্বজনীন মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অর্থহীন।

তাহলে বিচার করার কোন মাপকাঠি কি থাকবে না ? অবশ্যই থাকবে তবে সেটা কিছুটা বিশেষজ্ঞের হবে। নাট্য বিষয়ে নাট্য রসিকরা যথোচিত চিন্তার পর একটা মানদণ্ড স্থির করবেন। তবে স্থানীয় অবস্থা ও পরিবেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরাই এ কাজে উপযুক্ত বিবেচিত হবেন। বিদেশীরা যত পণ্ডিতই হন না কেন, এ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তবে গৃহীত হবে। অন্যথায় যে কারণে এতদিন বিচারের কোন মানদণ্ড সৃষ্ট হয়নি ঠিক সেই কারণেই কোন বিচারের মানদণ্ড কোন দিনই সৃষ্ট হবে না। আমাদের পশ্চিমাভিমুখীনতা যদি না দূর হয়তো সে সম্ভাবনা যে সুদূর পরাহত একথা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সে বস্তুকে অদূর করার চেষ্টাও দেখি না।

রবি মিত্র

রাজা নাটকের গান

'রাজা' রবীন্দ্রনাথের যখনকার রচনা তখন তাঁর মধ্যে স্বভাবতই একটা সুরের প্লাবন চলছিল। কবিগুরু এই সময়ই তাঁর প্রখ্যাত গীতিকবিতার ডালি গীতাঞ্জলি রচনা করেন। গীতাঞ্জলি রবীন্দ্র সঙ্গীতের এক মনিময় কক্ষ। আধ্যাত্মিক চেতনার এতবড় বিশাল বিপণী রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের রচনার মধ্যে আর দুটি নেই। গীতাঞ্জলির গানগুলির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভগবৎ সান্নিধ্যকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেছেন এবং নানা ছন্দে নানা বর্ণে সেই সান্নিধ্যকে, ভগবানের স্বরূপকে প্রকাশ করতে তৎপর হয়েছেন। গীতাঞ্জলির কবি গেয়েছেন :—

'এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয় হরণ,
এই-যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ।
এই যে মধুর আলস-ভরে মেঘ ভেসে যায়
আকাশ 'পরে,
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ—
এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয় হরণ।
প্রভাত আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ঐ নুয়েছে, মুখে তোমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ।'

এই গানটির ভাব যেন একটু লক্ষ্য করলেই রাজা নাটকটির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। সুদর্শনা রাজার যে রূপ বর্ণনা করেছেন তার সাথে উক্ত গানটির একটি ভাবগত ঐক্য ধরা কষ্টকর ব্যাপার নয়।

রাজা ॥ কী রকম দেখেছ?

সুদর্শনা ॥ সে তো একরকম নয়। নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষপ্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি ঐরকম —এমনি নেমে আসা, এমনি ঢেকে দেওয়া, এমনি চোখজুড়ানো, এমনি হৃদয় ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে থাকা। আবার শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূড়ে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয় তুমি স্নান করে তোমার শেফালি বনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার মাথায় হালকা সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তখন মনে হয় তুমি আমার পথিক বন্ধু; তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি তাহলে দিগন্তে

দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতরমহলে প্রবেশ করব। আর যদি না পারি তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন এক অনেকদূরের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠতে থাকবে, কেবলি দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাতবনের পথশ্রেণী আর অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধের জন্যে বুকের ভেতরটা কেঁদে কেঁদে ঘুরে ঘুরে মরবে। আর বসন্তকালে এই যে সমস্ত বন রঙে রঙিন। এখন তোমাকে আমি দেখতে পাই কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বাসন্তীরঙের উত্তরীয়, হাতে আলোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার বীণার সবকটি সোনার তার উতলা। এগুলি যেন কথা নয়। এও যেন গান। সুরেলা কথা মাত্রেই গান। রাজা নাটকখানি এই গানের মোড়কেই যেন মোড়া।

নাটকের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত গানের অভাব নেই। সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা, বাউল দল, পাগল, রাজা, সুদর্শনা, প্রায় প্রতিটি কণ্ঠই গানে ভরা। কোন কথাকেই যেন গান ছাড়া অভিব্যক্ত করতে পারে না কেউ।

অথচ রাজাকে আমরা গীতিনাট্য বলতে পারি না। রক্তকরবীর মতন এটিও তত্ত্বাশ্রয়ী নাটক। এখানকার তত্ত্বটি হলো যে প্রভু কোন বিশেষরূপে বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নেই, যে প্রভু সকলদেশে সকলকালে ; আপন অন্তরের আনন্দরসে তাকে উপলব্ধি করতে হয়।

এই যে তত্ত্বটি এটি ঠাকুরদার কণ্ঠের গানের মধ্যে নিবিড় ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। সুধী সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত যদিও বলেছেন যে, সাংকেতিক নাটকের সমস্ত সংকেত প্রদত্ত বিস্তৃতি ও সীমাহীনতার আভাস ঠাকুরদার কণ্ঠের গানের জন্যে খণ্ডিত হয়েছে, তাতে আমি একমত নই। তাছাড়া নাটকের স্বচ্ছন্দ গতি ঠাকুরদার যখন তখন গান গাওয়ার ফলে ব্যাহত হয়েছে একথাও আমি মানতে পারলুম না। কেননা রবীন্দ্রনাথই হচ্ছেন আজ পর্যন্ত বাংলাভাষার একমাত্র নাট্যকার যিনি সিচুয়েশান বুঝে কুশীলবের মুখে গান সংযোজন করে থাকেন। কয়েকটি নমুনা দিলেই বিষয়টি বুঝতে আর কোন কষ্ট হবে না।

রাজা নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের কথা ভাবা যাক। এ দৃশ্যের নাম পথ।

এই পথ সম্পর্কে পথিকদের মধ্যে রীতিমত গোলযোগ দেখা দিয়েছে। এই গোলযোগ তাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি লাভ করল না। ভবদত্ত কৌন্তিল্য, আর জনার্দন প্রমুখ পথিকেরা নানা তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়েও কোন সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারল না। তারা চলে গেলে সেই পথে বালকদল সহ এসে ঢুকলো ঠাকুর্দা।

ঠাকুর্দার কণ্ঠে আমরা প্রথম গান শুনতে পেলাম—

'আজি দখিন দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
দিব হৃদয় দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।

নব শ্যামল শোভন রথে
এসো বকুল বিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
এসো ঘন পল্লবপুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
এসো বনমল্লিকা কুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।'

এই গানটির মধ্য দিয়ে কি এই নির্দেশ পাইনি যে এই পথ দক্ষিণের উন্মুক্ত দরজার দিকে? সেই পথে, সেই সিংহদ্বারের মুখ দিয়েই আসুক বসন্ত। আর এই বসন্ত কে? এই হচ্ছে আনন্দ রসের অনুপম অভিব্যক্তি। উপলব্ধির পরমা জ্যোতি—রাজা নাটকের নায়ক বসন্ত। আর বসন্ত হলো হৃদয়ের আনন্দানুভূতির রূপক। প্রভুও আনন্দময়। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—এই গভীর দার্শনিক বিষয়টাকে বোঝাবার জন্য ঠাকুরদার কণ্ঠের এই সহজ সুরের গানটির অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। মনে তো হয় ঠাকুরদার গান ব্যতিরেকে অখণ্ডতা প্রদানের জন্যই ঠাকুরদার কণ্ঠের গানের প্রয়োজন আছে। গনের এই আধিক্য না থাকলেই নাটকটি বহুলাংশে খণ্ডিত হতো।

ঠাকুরদার কণ্ঠের যে গানের মুখটিতে আছে—

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে
(আমরা সবাই রাজা)"

তারমধ্যেই যেন সমগ্র নাটকটির মর্মবাণী দাঁড়িয়ে আছে। প্রভু যে সর্বচরাচরে, সর্বজীবে, সর্বভূতে বর্তমান—এ গভীর তত্ত্বটি এ গানের মধ্যে যেমন পরিচ্ছন্নভাবে পরিস্ফুট হয়েছে এমন আর কোন গানের মধ্যে হয়েছে বলে মনে হয় না। রক্তকরবীর বিশুপাগলের গান, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—আর রাজা নাটকের ঠাকুরদার গান, "আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে—" দুটি ধ্রুপদ যেন। নাটক দুটি যেন এই গানদুটির মধ্য দিয়েই মুখর ব্যঞ্জনা লাভ করে।

তারপর বাউলদের গান—

"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়ন তারায় আলোক ধারায়, তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে ॥

ভগবৎ অনুভূতিকে আরও যেন পরিস্কার করে দিল। হৃদয়রাজের সন্ধান যেন আরও বিশদ ও ব্যাপক করে মেলে ধরলো। রাজা নাটককে বুঝবার পথে এ কুঞ্চিকাটিকে অপ্রয়োজনীয় বলে ভাববার স্বপক্ষে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। কোন গভীর তত্ত্বকে যখন কোন ঘটনা সংযোজনার মধ্য দিয়ে, সংলাপের দৃঢ় পিনদ্ধতার মাধ্যমে, সঙ্গীতের আশ্রয়ে নাট্যকার বোঝাবার চেষ্টা করেন তখন তাকে কার্যকরী বলেই মনে হয়।

পাগল যখন গান গেয়ে ওঠে—

"তোরা যে যা বলিস ভাই
আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপল চরণ
সোনার হরিণ চাই ॥
সে যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
যায় না তারে বাঁধা,
তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে
লাগে চোখে ধাঁধা,
তবু ছুটব পিছে মিছে মিছে
পাই বা নাহি পাই
আমি আপন মনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই ॥
তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস
রাখিস ঘরে ভরে,
যাহা যায়না পাওয়া তারি হাওয়া
লাগল কেন মোরে?
আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা
যা নেই তারি ঝোঁকে,
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস বুঝি
মরি তাহার শোকে!
ওরে আছি সুখে হাস্যমুখে
দুঃখ আমার নাই।

আমি আপন মনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে যাই ॥"

তখন ভগবৎ অন্বেষণের স্বরূপটি যেন খুবই স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় আমাদের কাছে। ভগবানের সাধনার পথে কখনো পুঁজি ফুরোয় না ভক্তের। তার জন্যে তার শোক নেই। ব্যথা নেই। বেদনা নেই।

কুঞ্জবনের দ্বারে ঠাকুরদা ও উৎসব বালকগণ যে গান গেয়ে উঠেছে, সে গান গেয়েছে ঠাকুরদা ও বালকগণ, "এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ—তার মধ্য দিয়ে নাটকখানি ক্রমশ নিবিড় ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। তারপর নাচের সাথে ঠাকুরদার গান—

"মম চিত্তে নিতি নৃত্য কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ ॥"

নাটকের সামগ্রিকতার দিক থেকে এটিকে মন্দ লাগে না। তবুও সমস্ত নাটকখানি ভাবগত ঐক্যের দিক থেকে এর খুব প্রয়োজন ছিল বলে আমার মনে হয় না। এটি যেন একটি Excess। এটিকে বাদ দিতে পারলে মনে হয় যেন নাটকটি খুব compact হতো। টমসন বর্ণিত musical feast এ ছাড়াও বেশ দানা বাধতে পারতো। কিন্তু ঠাকুরদা যখন গেয়েছে—

"বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে ?
দেখিসনে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলারে।
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে ?'

তখন আর এই গানটি কোন মতেই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতে পারি না। কেননা ভগবৎ সান্নিধ্যের চিরায়ত প্রসঙ্গটি গানের রাজা এর মধ্যে সুন্দর অভিব্যক্ত করে দিয়েছেন।

তারপর যেখানে সুদর্শনা বালকগণকে ডেকে গান গাইতে বলছেন—"এসো, এসো, তোমরা সব মূর্তিমান কিশোর বসন্ত, ধরো তোমাদের গান ধরো। আমার সমস্ত শরীর মন গান গাইছে অথচ আমার কণ্ঠে সুর আসছে না। তোমরা আমার হয়ে গান গেয়ে যাও," বালকগণ গায়—

"বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে।
গভীর রাগিনী উঠে বাজি বেদনাতে
ভরি দিয়া পূর্ণিমা নিশা
অধীর অদর্শন-তৃষা।
কী কারণ মরীচিকা আনে আঁখিপাতে।
সুদূরের সুগন্ধ ধারা বায়ুভরে
পরাণে আমার পথহারা ঘুরে করে।
কার বাণী কোন্ সুরে তালে
মর্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীরাদি সাথে সাথে ॥"

তখন মনে হয় এরমধ্যে যেন সুদর্শনার হৃদয়ের সুগভীর আর্তিটুকুই ছড়ানো। তার পরেই সুদর্শনার সংলাপ—"আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার যো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। এমনি করে খোঁজার মধ্যেই সমস্ত পাওয়া যেন সুধাময় হয়ে আছে। কোন্ মাধুর্যের সন্ন্যাসী তোমাদের এই গান শিখিয়ে দিয়েছে গো—ইচ্ছে করছে চোখে দেখা কানে শোনা ঘুচিয়ে দি—হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহনপথের কুঞ্জবন আছে সেইখানকার ছায়ার মধ্যে উদাস হয়ে চলে যাই।"

গানই রাজা নাটকের মূল অবসেসন: এখানকার বাণী প্রধান গানগুলি নাটকীয় সংলাপের যেখানে ঘাটতি আছে তাকে পরিপূর্ণ করে দেয়। বিস্তার করে দেয়। কুঞ্জদ্বার, করভোদ্যান অন্ধকার কক্ষ সমস্ত যেন এই গানের পরিবেশে ভরে ওঠে। রাজার সাথে রাণীর পরিচয় কি ভাবে সম্ভব তাও যেন এই গান থেকেই বুঝতে পারি আমরা।

সুদর্শনা॥—এখন আর যে তোমার সঙ্গে তেমন পরিচয় হতে পারবে তা মনে করতেও পারিনে।

রাজা॥—হবে রাণী হবে। যে-কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালবাসা কিসের।

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না ভালবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো গান দিয়ে দ্বার খোলাব।

সুরঙ্গমার গানগুলির মধ্যে ভক্তি নিবেদনের একটি মাধুর্যময় দিক ফুটে উঠেছে। অন্ধকার কক্ষে তার গান, ভয়েরে মোর আঘাত কারো / ভীষণ, হে ভীষণ! / কঠিন করে চরণ' পরে প্রণত করো মন; আমি তোমার প্রেমে হব সবার / কলঙ্কভাগী / আমি সকল দামে হব দামি; আমি কেবল তোমার দ্যাস। (অন্তঃপুরের গান); অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে। কখন তুমি এলে, হে নাথ, মৃদু চরণ পাতে? (পথের গান); ইত্যাদি গানগুলি রাজা নাটকের সামগ্রিক ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে অনিবার্যরূপে সহায়তা করেছে। তাছাড়া সুরঙ্গমার গানগুলির মধ্যদিয়েই ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কটি নিবিড়রসে দানাবেধে উঠেছে।

রাজা নাটকে গানের বেশ আধিক্য রয়েছে। এরমধ্যে কয়েকটি গান স্বচ্ছন্দে বাদ দিতে পারতেন গানের রাজা। তাতে নাটকটির খুব একটা অঙ্গহানী ঘটতো বলে মনে হয় না। বরং তাতে যেন নাটকটি আরো সংহত হতে পারতো। তবে ঠাকুরদার গানকে বাদ দেওয়ার কথাই উঠে না। ঠাকুরদা, পাগল, বালকদল, বাউল—এরাই রাজা নাটককে ভক্তিমার্গের পরপারে একবারে মানবাত্মা পর্যন্ত উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

রাজা নাটককে গান ছাড়া প্রতিষ্ঠিত করা যেতনা হয়তো বা। কিংবা যদি যেতো তবে তার আবেদন বর্তমান নাটকের মতন কখনোই এতদূর গভীর সঞ্চারী হতো না।

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

স মা লো চ না

ফেরা ॥ অন্নদাশংকর রায়। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সনস প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা মূল্য ৫.৫০

একসময়ে বাংলাদেশে পথেপ্রবাসের লেখক অন্নদাশংকর রায় তাঁর রচনাভঙ্গী ও দৃষ্টির নবীনতার জন্য প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ দিকপালদের সপ্রশংস স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। সেদিনকার তরুণ সুদীর্ঘকাল পরে আবার য়ুরোপে গেছেন। যুদ্ধপূর্ব সেই মহাদেশকে আবার খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই একথা যেমন জানা ছিল তেমনি এও জানা ছিল যে যুদ্ধের বিধ্বংসী ক্ষমতা যতই প্রবল হোক কোথাও না কোথাও সেই য়ুরোপকে খুঁজে পাওয়া যাবে, যে চিরতরুণ, চিরনবীন, যার আত্মা ক্লিষ্ট, পীড়িত, লাঞ্ছিত কিন্তু পুনর্জাগরণের আনন্দে উদ্ভাসিত। সঙ্গীতে, সাহিত্যে, নাট্যচর্চায় নতুন নতুন ধারার প্রবাহ আজকের য়ুরোপে যে নবজীবনতরঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছে তারই মধ্যে পঁয়ত্রিশ বছরের হারানো যৌবনকে ফিরে পাবার স্বপ্ন নিয়ে অন্নদাশঙ্কর আবার য়ুরোপ যাত্রা করেছিলেন।

য়ুরোপ সম্বন্ধে আমাদের দেশে কোন মহলে একটা প্রবল উন্নাসিকতার ভাব আছে। ওয়া জড়বাদী, ওরা বস্তুর উপাসক, ওরা কলকারখানার চুড়া উচ্চ করে যে সভ্যতা গড়ছে তার মধ্যে আত্মা নেই, ধর্মবোধ নেই—এ সব কথা আমরা অনেক শুনেছি। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারী মনে করে নিজেদের অহংকারের চশমা পরে য়ুরোপকে দেখেছি। কিন্তু গত শতাব্দীর যারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্বন্ধ নিয়ে যারা চিন্তা করেছেন তাঁরা সকলেই এই একদেশদর্শী সংকীর্ণতার প্রভাব থেকে মুক্ত—রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে এ কথা বারবার বলেছেন যে অবিদ্যা থেকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে য়ুরোপের প্রতি সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি সঞ্চালন করতে হবে এবং তাঁর অন্তরাত্মার বাণীটিকে গ্রহণ করতে হবে।

অন্নদাশংকর রায় য়ুরোপকে শ্রদ্ধার চোখ দিয়ে, বরং আরো সত্য বলা হবে যদি বলি ভালবাসা দিয়ে দেখেছেন। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে গড়ে উঠছে জার্মানী ; শুধু ঘরবাড়ি নয়, কল কারখানা নয় ; গড়ছে স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গড়ছে গীর্জা। সঙ্গীতপ্রিয় জার্মানজাতি বীঠোফেনের ঐতিহ্য, বাক মোসার্টের সৃষ্টিকে যেন নতুন করে আস্বাদন করছে।

অন্নদাশংকর তাঁর ফেরার অনেকটাই লিখেছেন শুধু জার্মনী নিয়ে। তিনি তো সবটাই নতুন দেখছেন না। অনেকটাই তো আগে দেখা। তাই এ লেখার যে রোমান্টিক রস তা অপরিচয়ে বিস্ময়জাত নয় তা অতীতের স্মৃতিমন্থনের স্বাদ মিশ্রিত। ইংলণ্ড, ফ্রান্সকে তিনি বেশি জায়গা দেননি। কিন্তু স্বাদ একই।

তবু একথা ঠিক, 'ফেরা' 'পথে প্রবাসে' নয়। এ বই অনায়াসে অনর্গল পড়া যাচ্ছে না।

নানা তথ্য নানা তত্ত্ব হঠাৎ মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে, ভ্রমণের মেজাজের সঙ্গে তারা যদি সম্পূর্ণ মিলে যেতো তা হলে চমৎকার হতো। কিন্তু তারা যেন প্রক্ষিপ্ত ভ্রমণের আনন্দাবেগে নিতান্ত বোঝা। এ কথা প্রমাণ করার জন্য উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। লেখক যে বহুদর্শী, জীবনের নানা বিষয়ে তাঁর ইন্টারেষ্ট এ কথা লেখায় থাকা ভাল কিন্তু কথাটা রাখার জন্য কোন চেষ্টা আছে এ সন্দেহ ভাল নয়।

নতুন গড়ে ওঠা য়ুরোপের মতিগতি, তার নানা প্রেরণা তার আত্মপ্রকাশের চেষ্টা লেখক নিপুণ শিল্পীর মত হৃদয়ের রস লাগিয়ে পাঠক চিত্তের সামনে ধরেছেন। ইতিহাস আর সাহিত্যরস এক সঙ্গে মিলেছে। এক রসগ্রাহীর পক্ষে অন্যটা উপরি পাওনা।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥ শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। মূল্য দশটাকা।
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম ॥ লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল বিরচিত। শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন কর্তৃক সম্পাদিত মূল্য বারো টাকা জিজ্ঞাসা—১ কলেজ রো, ৩৩ কলেজ রো কলিকাতা-৯

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১৯০৯ সালে আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯১৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক কাহিনীর চেয়ে লৌকিক অংশ এতে বেশি থাকায় বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেনি এবং সাধারণ কাব্যরসিক পাঠকমহলেও বিশেষ সাড়া দেখা যায়নি। পণ্ডিত মহলে অবশ্য নানা মতের ও নানাধরণের আলোচনার সূত্রপাত হয়—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাল, নামকরণ, লিপি, কৃষ্ণচরিত্রের পৌরাণিকতা ইত্যাদি নানা তর্কের অবতারণা হয়।

এ কথা প্রথমেই স্বীকার করতে হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যতালিকা-অন্তর্ভুক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা পাঠরত ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত যদিও সে পরিচয়ের ফলে আদ্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পাঠ করেছেন এমন ছাত্রের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। আলোচনাও এ পর্যন্ত যা হয়েছে তা পরীক্ষার উপযোগিতার কথা মনে রেখেই। এই ছাত্রসমাজের বাইরে দেশের যে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের দল তাঁদের মনে এ নিয়ে বিশেষ ঔৎসুক্য জাগেনি। প্রধানতঃ তার ভাষার জন্য-ই এই ব্যবধান। দ্বিতীয়তঃ একটি মোটামুটি তথ্যসহ সরল সংস্করণের অভাব যার দ্বারা কাব্যরস গ্রহণের কোন অসুবিধা না ঘটে।

শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি ছাত্রপাঠ্য নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘভূমিকায় তিনি নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন যা ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের নানা কৌতূহল তৃপ্ত করবে। ভূমিকায় নতুন তথ্য নেই; কিন্তু পূর্বসূরীদের মতামত প্রয়োজন মত উদ্ধৃত করে সাধারণভাবে যা যা জ্ঞাতব্য তা সবই সম্পাদক জুগিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এমন পরিচ্ছন্ন একটি সংস্করণ যে পদসংকলন অংশে কেবলমাত্র ব্যবসায়িক লক্ষ্য নিয়েই সম্পাদিত হয়েছে এতে আনন্দিত হতে পারিনি। সম্পাদক বলেছেন বংশীখণ্ড এবং রাধাবিরহের পদ সমগ্র সংকলিত হয়েছে। দানখণ্ডের কুড়িটি এবং অন্যান্য খণ্ডের দশটি করে পদ আছে। সমগ্র

কাব্যটি না দেওয়ায় এই গ্রন্থের মূল্য অনেক কমে গেছে। নামকরণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন না করে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদসংগ্রহ' জাতীয় একটা কিছু হওয়া উচিত ছিল। বংশীখণ্ড এবং রাধাবিরহ কি এখন এম, এ পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য ?

কাব্য আলোচনা অংশে সম্পাদকের কৃতিত্ব এই দিক থেকে স্বীকার করি যে পাণ্ডিত্যের ব্যবধান তুলে সম্পাদক পাঠকদের চমকে দেবার চেষ্টা করেন নি। রচনাভঙ্গী সরল এবং সংক্ষিপ্ত তাই বিষয়বস্তু সহজেই পাঠকের বোধগম্য হয়। পাঠকদের সুবিধার জন্য আলোচনার বস্তুগুলির উল্লেখ করা গেল।

প্রাচীন সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের কথা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব পদাবলী কাব্য পরিকল্পনায় পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব, নাটকীয় গুণ ও উপাদান, গীতিলক্ষণ হাস্যরস, উপমা, প্রবাদ ও প্রবচন, আখ্যানভাগ, চরিত্রবিশ্লেষণ, সমাজচিত্র, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন না শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—চণ্ডীদাস সমস্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃতশ্লোক—রাগরাগিণী—অলংকার ও ধ্বনি, আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও তাহার ব্যাকরণ, পাঠ পরিচয়।

পরিশিষ্টে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ পরিচয় সংযোজিত হয়েছে।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য বিল্বমঙ্গল লীলাশুকের কৃষ্ণকর্ণামৃতের আবৃত্তি শুনে ১১২টি শ্লোক লিখিয়ে আনেন পুরীতে। সপাষদ মহাপ্রভু এই পদগুলি চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবির পদের সঙ্গে শুনতেন। পরে বৃন্দাবনের গোপালভট্ট 'কৃষ্ণবল্লভা' নামে, চৈতন্যদাস সুবোধনী নামে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'সারঙ্গরঙ্গদা' নামে টীকা রচনা করেন এই কাব্যের। তাছাড়া দাক্ষিণাত্যে পাপয়ল্লয় সুরির 'সুবর্ণচষক' নামেও টিকা আছে। এছাড়া আছে যদুনন্দের ভাবানুবাদ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উপরে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রভাব অল্প নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের মাধুর্যভাবাশ্রিত ভক্তিতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের দ্বারা অল্প প্রভাবিত নয়। ডক্টর সুশীলকুমার দে এই গ্রন্থের প্রভাব সম্বন্ধে বলছেন—

The importance of Krishna Karnamrta to Bengal Vaisnavism is explained by the legend, narrated by Krisnadas Kaviraj of Chaitanya's discovers of this work during his south Indian pilgrimage. Chaitanya was so struck by its high devstional value that he brought back the work with him, and it became the source of the emotional religious experience of himself and his diciples. There can be no doubt that it exercised a great influence on the emotionalism of the Bengali faith.

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই কাব্যের সম্বন্ধে চরিতামৃত মধ্যভাগে বলছেন—

কৃষ্ণকর্ণামৃতসম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে
যাহা হইতে হয় কৃষ্ণ প্রেমরসজ্ঞানে ॥
সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যে এই গ্রন্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন টীকাগুলিই তার প্রমাণ। গোপালভট্ট কৃষ্ণবল্লভা টীকা সম্বন্ধে অবশ্য কৃষ্ণদাস চরিতামৃতে কোন উল্লেখ করেন নি তিনি চৈতন্যদাসের সুবোধনী টীকার উপরেই জোর দিয়েছেন।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। শুধু বৈষ্ণব নন, যারা সাহিত্যরসিক তাঁরাও এই সংস্করণ থেকে উপকৃত হবেন। এতে আছে মূল শ্লোকগুলি যদুনন্দন দাসকৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজের সারঙ্গরঙ্গদা টীকার অনুবাদ। শ্রীচৈতন্য কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রথম আশ্বাসের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের বিভিন্ন পুঁথিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আশ্বাস আছে। সেগুলি থেকে যথাক্রমে ১১১টি ও ১০৩টি শ্লোকের অনুবাদ এই সংস্করণে স্থান পেয়েছে।

সম্পাদক একটি অতি উপাদেয় ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কবির কালনির্ণয়, কবির রচিত গ্রন্থাদি, কবির ব্যক্তিগত জীবন ও মতবাদ, পূর্ববর্তী টীকাকারগণের পরিচয় কৃষ্ণকর্ণামৃতের ছন্দ ও পূর্বপ্রকাশিত সংস্করণাদির পরিচয় এই ভূমিকায় আছে।

তথ্যঘটিত যাবতীয় আলোচনাই আছে। সেই অনুপাতে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রেমভাবনার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার সম্পর্কটি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। তত্ত্ব আলোচনার মধ্যে শ্রীমজুমদার যেতে চাননি—গেলেও পাঠকের লাভ বই লোকসান ছিল না।

বাংলাদেশে যারা বৈষ্ণব ধ্যানধারণার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তাঁদের কাছে এ গ্রন্থ যে আদৃত হবে তা বলাই বাহুল্য। যারা বৈষ্ণব নন অথচ বাংলাদেশ সম্পর্কে উৎসাহী তাঁরাও বাঙ্গালীর মনোগঠনের ইতিহাস সন্ধান করতে গেলে এই গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হবেন।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

Regd.No. C-315 Phone : 23-5155 November'66 (0'50) Central Regd.No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

চতুর্দশ বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩

পশ্চিমবঙ্গের শহরে ও গ্রামে কোথায় কিভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে সে-সব খবর জানতে হলে নিয়মিত পড়ুন

ডব্লিউ. বি. আই অ্যাণ্ড পি. আর এ ডি ভি-ভি ২৪২৮৮/৬৬

আপনার যদি থাকে র‍্যালে সাইকেল— গর্বে মাটিতে পা পড়বে না

হ্যাঁ, সাইকেল হ'ল র‍্যালে ! যেমনি চলন, তেমনি গড়ন। চড়ে গেলে লোকে তাকিয়ে দেখে। হবে না ? দুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল। র‍্যালের কদরই আলাদা। যার র‍্যালে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র‍্যালে যদি আপনার বাহন হয়, গর্বে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না।

আমরা আমাদের কলকারখানার কর্ম্মীগণের জন্য গর্ব্ব অনুভব করি। তাঁরা দৃঢ় মনোভাব নিয়ে তাঁদের মেসিনে কাজ করে যাচ্ছেন এবং উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার জন্য ক্রমেই বেশী জিনিসপত্র উৎপাদন করছেন। তাঁরা জানেন যে যুদ্ধ এখন থেমে গেলেও পাকিস্তান ও চীনের দিক থেকে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা এখনও রয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের শিল্প কর্ম্মীগণ জাতির সেবা করছেন! আপনি ?

এক মহান দেশের
এক মহান জনসমাজ

DA 65/F8 (Beng)

নিয়মাবলী

সমকালীন

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ২৩-৫১৫৫

চতুর্দশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ তেরশ' তিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

মধুসূদন ও "দেবকী"

সুখময় মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্পে পড়েছিলাম—"কারণ"-রসিক এক জমিদার ঘটা করে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও আসলে তাঁর কোন মেয়েই ছিল না।

এটা নিছক গল্প। শুধু গল্প নয়, হাসির গল্প। কিন্তু গুরুগম্ভীর গবেষণার ক্ষেত্রেও অনেকটা এই ধরণের একটি বিষয় অবতারিত হয়ে আসছে বহু বছর ধরে। বিষয়টি এই—মধুসূদন দত্ত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা "দেবকী"র প্রেমে পড়ে খ্রীষ্টান হয়েছিলেন ও তাঁকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন; শেষ অবধি অবশ্য এ বিবাহ হয়নি। (কেন হয়নি, সে সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন, মধুসূদন মদ্যপান ত্যাগ করতে রাজী না হওয়ায় কৃষ্ণমোহন তাঁকে কন্যা দান করতে সম্মত হন নি; আবার কেউ কেউ বলেন, কৃষ্ণমোহনের স্ত্রী খ্রীষ্টান হয়েও ব্রাহ্মণত্বের গৌরব ছাড়তে পারেন নি, তাই তিনি কায়স্থের পুত্র মধুসূদনকে জামাতা করার প্রস্তাব কার্যে পরিণত হতে দেন নি।)

এই বিষয়টি প্রথম লিপিবদ্ধ করেন নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর 'মধু-স্মৃতি' গ্রন্থে। মধুসূদনের ধর্মান্তর গ্রহণের তিনটি কারণ নগেন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন; তার মধ্যে একটি এই—

"রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবকী নাম্নী রূপবতী, বিদুষী দ্বিতীয়া কন্যার সহিত মধুসূদন পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতী হইয়া মধুসূদন তাঁহার পাণিগ্রহণে একান্ত অভিলাষী ছিলেন। এ বিবাহে কন্যার পিতারও আপত্তি ছিল না; কিন্তু তিনি মধুসূদনকে সুরা-পান ত্যাগ করিতে বলেন। মধুসূদন কিছুতেই পান-দোষ ত্যাগ না করায় এ বিবাহ হয় নাই।" (মধু-স্মৃতি, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৪-৪৫)

এর বহু পরে বনফুল তাঁর 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে এই বিষয়টিকে অন্যতম উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেন। বনফুলের পরে আরও কয়েকজন নাট্যকার মধুসূদনের জীবনী নিয়ে নাটক লেখেন, তাঁরাও দেবকীকে ও মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর প্রেমকে নাটকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেন।

সম্প্রতি মধুসূদন-দেবকীর প্রেম 'সিরিয়াস' গবেষণার মধ্যেও স্থান লাভ করেছে এবং কয়েকজন মনস্বী গবেষকের কাছে এই প্রেম ঐতিহাসিক ব্যাপার বলেই স্বীকৃত হয়েছে। এঁদের মধ্যে শ্রীমতী বাণী রায় (মধুজীবনীর নতুন ব্যাখ্যা, পৃঃ ৯০-১০১ দ্রষ্টব্য), ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত (কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, পৃঃ ২৫-২৯ দ্রষ্টব্য) ও শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের (সমকালীন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩, পৃঃ ৯৭ দ্রষ্টব্য) নাম উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন আগে কলকাতার একটি বিশিষ্ট প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান 'মধুসূদন রচনাবলী' প্রকাশ করেছেন, তারও সম্পাদক পূর্বোক্ত ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত। এই 'রচনাবলী'র সম্পাদকীয় ভূমিকায় (পৃঃ চৌদ্দ) ক্ষেত্রবাবু লিখেছেন, 'মধুসূদনের খ্রীষ্টান হবার অন্যতম শক্তিশালী কারণ যে দেবকী, তাতে সন্দেহ নেই।'

ক্ষেত্রবাবুর এই উক্তির গুরুত্ব মোটেই খর্ব করা চলে না। কারণ হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকা 'মধুসূদন রচনাবলী' পড়বেন, তাঁদের অনেকেই যে ক্ষেত্রবাবুর এই উক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মধুসূদন-দেবকীর প্রেম-কাহিনীকে নির্ভেজাল বলে সত্য মেনে নেবেন, তাতে কোন সংশয় নেই।

কিন্তু আসলে এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। বিভূতিভূষণের গল্পে বর্ণিত "কারণ" রসিক জমিদারের "মেয়ের বিয়ে" যতটা সত্য, মধুসূদন দেবকীর প্রণয়-প্রসঙ্গও ঠিক ততখানিই সত্য। নীচের আলোচনা থেকেই তা বোঝা যাবে।

মধুসূদন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে খ্রীষ্টান হন। ঐ সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (জন্ম ২৪শে মে, ১৮১৩ খ্রীঃ) বয়স মাত্র ৩০ বছর। তাঁর স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবীর (১) (জন্ম সেপ্টেম্বর, ১৮২০ খ্রীঃ) (২) বয়স মাত্র ২৩ বছর। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের বিবাহ হয়। কৃষ্ণমোহন ও বিন্দুবাসিনীর যে সমস্ত সন্তান হয়েছিল, তাদের সম্বন্ধে দুর্গাদাস লাহিড়ীর লেখা 'আদর্শ-চরিত। কৃষ্ণমোহন (১২৯২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে প্রকাশিত) বইয়ে (পৃঃ ২৬-২৭) এই সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়।

"...কৃষ্ণমোহনের চারি কন্যা। ইতিপূর্বে তাঁহার একটি পুত্রসন্তানও জন্মিয়াছিল ; কিন্তু অতি শৈশবেই তাহার মৃত্যু হয়। কন্যাচতুষ্টয়ের জ্যেষ্ঠার নাম কমলমণি ও মধ্যমার নাম দৈবকী।...অপর কন্যাদ্বয়ের তৃতীয় কন্যার নাম মনমোহিনী ও চতুর্থ কন্যার নাম মিলি।...কৃষ্ণমোহনের এই কন্যাগুলি সমধিক লাবণ্যবতী। জ্যেষ্ঠা কমলমণির লাবণ্যজ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাকে বিবাহ করেন।(৩) অপর কন্যাত্রয়ের মধ্যমা দৈবকী সেল সাহেবের, তৃতীয় কন্যা মনমোহিনী প্রসিদ্ধ হুইলার সাহেবের এবং চতুর্থ কন্যা মিলি ষ্টুয়ার্ট সাহেবের সহিত পরিণীতা হন। কৃষ্ণমোহনের কন্যা কয়টিই সুশিক্ষিতা। তন্মধ্যে মনমোহিনী শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিতা, স্ত্রী-বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শিকা।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচ্য কন্যার প্রকৃত নাম 'দৈবকী'—

'দেবকী' নয়। তিনি কৃষ্ণমোহনের দ্বিতীয় কন্যা এবং জনৈক 'সেল সাহেবের' সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

এখন দেখা যাক, দৈবকীর সঙ্গে মধুসূদনের প্রেম সংক্রান্ত কাহিনীটি ইতিহাসের বিচারে টেঁকে কিনা।

কৃষ্ণমোহনের স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবী ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; সুতরাং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের আগে গর্ভে সন্তান ধারণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়; কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কৃষ্ণমোহনের কাছে ছিলেন না, পিতৃগৃহে ছিলেন; ১৮৩১ থেকে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে তাঁর মিলন কোনমতেই সম্ভব ছিল না, কারণ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কৃষ্ণমোহন হিন্দু-সমাজের বিরাগ উদ্রেক করে সমাজচ্যুত ও আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন, এর এক বছর দু'মাস পরে—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং তারও তিন বছর বাদে—১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইনের সাহায্য নিয়ে বিন্দুবাসিনী দেবীকে তাঁর পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে আসেন ও তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। (৪)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণমোহন ও তাঁর স্ত্রী ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে একত্র বাস করতে সুরু করেন। তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলমণিই যদি তাঁদের প্রথম সন্তান হয়, তাহলে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে তার জন্ম হতে পারে না। যদি ধরা যায়, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দেই কমলমণির জন্ম হয়েছিল এবং তার ঠিক পরের বছর (১৮৩৭ খ্রীঃ) দৈবকীর জন্ম হয়েছিল, তা হলে মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সময় (১৮৪৩ খ্রীঃ) দৈবকীর বয়স হয় মাত্র ছ' বছর। বলা বাহুল্য, মধুসূদন ছ' বছরের মেয়ের প্রেমে পড়ে খ্রীষ্টান হতে পারেন না।

আসলে, দৈবকী যে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দেরও পরে জন্মগ্রহণ করেছিল, তার প্রমাণ আছে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তারিখের 'সমাচার-দর্পণ'-এ প্রকাশিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পত্রের (৫) (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৩৯-৪১ দ্রষ্টব্য) সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, কৃষ্ণমোহনের প্রথম সন্তানই ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিল। ঐ পত্রে কৃষ্ণমোহন—ভারতীয়রা নারীদের সন্তান প্রসবের সময় ইউরোপীয় ডাক্তারদের, এমনকি 'অনভিজ্ঞ কপিরাজেরও' সাহায্য না নিয়ে মূর্খ দাইদের সাহায্য নেয় বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং লিখেছেন—

"ক'এক দিবস হইল আমার ভার্য্যার অপত্যপ্রসব কাল প্রাপ্তে কি কর্ত্তব্য ইহাতে আমার কোন সন্দেহ জন্মে নাই।"

এরপর কৃষ্ণমোহন লিখেছেন যে, স্ত্রী আসন্ন প্রসবা জেনে তিনি 'মাকষ্টন' নামে জনৈক ইউরোপীয় ডাক্তারের সাহায্য নেন এবং ঐ ডাক্তারের সুচিকিৎসার গুণে "দশ দিনের মধ্যে প্রসূতিকা ও প্রসূতি সুস্থ হইয়াছিল।"

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চের 'কএক দিবস' আগে কৃষ্ণমোহনের এই সন্তানটি জন্মগ্রহণ করে; সন্তানটি যে কন্যা, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ কৃষ্ণমোহন তাকে 'প্রসূতিকা' বলে অভিহিত করেছেন। এর মাত্র বছর দেড়েক আগে কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর প্রথম মিলন ঘটে। সুতরাং

এইটিই যে কৃষ্ণমোহনের প্রথম সন্তান, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণমোহনের এই সন্তানটি যে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলমণি, তার আরও প্রমাণ আমরা পেয়েছি। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল-মে, ১৮৫২ খ্রী:) কমলমণির সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিবাহ হয় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ৭২ সংখ্যক গ্রন্থ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৪৪, পাদটীকা)। কমলমণি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জন্মগ্রহণ করে থাকলে বিবাহের সময় তার বয়স হয় পনেরো বছর এক বা দুই মাস। কমলমণির যে তখন ঠিক এই বয়সই ছিল, তা জানা যায় তার বিবাহ উপলক্ষে লেখা এবং বিবাহের সময় প্রকাশিত তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায়ের (চন্দ্রকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র) একটি ব্যঙ্গ-কবিতা থেকে। কবিতাটির কয়েকটি চরণ আমরা নীচে উদ্ধৃত করছি—

ভূতির মা বলে দিদি রয়েছিস্ কি সুখে।
বড় হলো মিসি বাবা * * উঠলো বুকে ॥
বিবি বলে সাহেব কি মোর রয়েছে চুপ করে।
জ্ঞানেরে অজ্ঞান করে আনিয়াছে হরে ॥

(মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র, মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৬১ থেকে উদ্ধৃত)

বলা বাহুল্য, এই কবিতায় উল্লিখিত 'মিসিবাবা' = কমলমণি, 'বিবি' = বিন্দুবাসিনী দেবী, 'সাহেব' = কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'জ্ঞান' = জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। কবিতাটির 'বড় হলো মিসি বাবা * * উঠলো বুকে'—চরণটিতে * * দিয়ে যে শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে, সেটি অনুমান করে নেওয়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। এই চরণটি থেকে বোঝা যায়, কমলমণির দেহে তখন সবেমাত্র যৌবনসঞ্চার হয়েছে, অর্থাৎ বিবাহের সময় কমলমণির বয়স পনেরো বছরের মত।

সুতরাং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কমলমণির জন্ম হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। অতএব তার অনুজা দৈবকীর জন্মসাল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী নয়।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক লেখক দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁর 'আদর্শ-চরিত। কৃষ্ণমোহন বইয়ে (পৃঃ ২৬) লিখেছেন যে দৈবকীর এবং কৃষ্ণমোহনের আরও কোন কোন সন্তানের জন্মস্থান 'হেদুয়ার ধর্মালয়' অর্থাৎ ক্রাইস্ট চার্চ। ক্রাইস্ট চার্চ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ৭২ সংখ্যক গ্রন্থ, পৃঃ ৪২ দ্রষ্টব্য) এবং কৃষ্ণমোহন ১৮৩৯ থেকে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তার অধ্যক্ষ ছিলেন, চার্চের সংলগ্ন বাসাতেই তিনি থাকতেন। সুতরাং দুর্গাদাস লাহিড়ীর উক্তি অনুসারে ১৮৩৯ থেকে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দৈবকীর জন্ম হয়। দুর্গাদাস লাহিড়ী যখন 'আদর্শ-চরিত। কৃষ্ণমোহন' লেখেন (১৮৮৫ খ্রী:), তখন দৈবকী সশরীরে জীবিতা। (৬) সুতরাং দৈবকীর জন্মস্থান এবং জন্মসময় সম্বন্ধে দুর্গাদাস ভুল কথা লিখতে পারেন বলে ভাবা যায় না।

এ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করলাম, তার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সময়ে দৈবকীর বয়স তিন চার বছরের বেশি ছিল না। ঐ সময়ে দৈবকীর জন্ম হয়েছিল কিনা, তা-ই সংশয়ের বিষয়।

যারা 'দেবকী'র প্রেমে পড়ে মধুসূদনের খ্রীষ্টান হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস করেন, তাঁরা

গৌরদাস বসাক ও যোগীন্দ্রনাথ বসুর কোন কোন উক্তিকে নিজেদের মতের সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করেন। কিন্তু গৌরদাস ও যোগীন্দ্রনাথ কোথাও এ কথা লেখেন নি যে, মধুসূদন কৃষ্ণমোহনের কন্যার প্রেমে পড়েছিলেন; এরকম অসম্ভব কথা লেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁরা মধুসূদন, কৃষ্ণমোহন ও দৈবকীর সমসাময়িক ব্যক্তি। 'দেবকী'-বাদীরা গৌরদাস ও যোগীন্দ্রনাথের উক্তিকে নিজেদের খেয়ালখুশিমত ব্যাখ্যা করেছেন। এঁরা একটা কথা ভুলে যান যে, মধুসূদন যদি সত্যিই কৃষ্ণমোহনের মেয়ের প্রেমে পড়ে খ্রীষ্টান হতেন তাহলে তিনি কৃষ্ণমোহনের কাছেই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিতেন; কিন্তু তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন আর্চডীকন ডীলট্রির কাছে। মধুসূদনের দীক্ষাগ্রহণের সময় কৃষ্ণমোহন সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাত্র। কৃষ্ণমোহন মধুসূদনের যে স্মৃতিকথা লিখেছিলেন, তা পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মধুসূদনের খ্রীষ্টান হওয়ার ব্যাপারে কৃষ্ণমোহনের ভূমিকা ছিল নিতান্তই গৌণ। আর একটা কথা। খ্রীষ্টান হওয়ার আগে যে মধুসূদন কোন বাঙালী মেয়েকে বিবাহ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং 'বাঙ্গালীর মেয়ে রূপে-গুণে কখনই ইংরেজ মেয়ের শতাংশের এক অংশ হইতে পারে না' বলতেন, তা যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (পৃঃ ১২০) থেকে জানা যায়। এর থেকেও বোঝা যায়, খ্রীষ্টান হবার আগে মধুসূদন দৈবকী বা আর কোন বাঙালী মেয়ের প্রেমে পড়েন নি। আরও একটি জিনিস ভেবে দেখতে হবে। কৃষ্ণমোহন যদি সত্যই মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিবাহ দিতে প্রত্যাখ্যান করতেন, তাহলে মধুসূদনের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের সৌহার্দ্য নিশ্চয়ই ক্ষুন্ন হত। কিন্তু মধুসূদনের মৃত্যু পর্যন্ত সে সৌহার্দ্য অক্ষুন্ন ছিল। এমনকি খ্রীষ্টান হবার কয়েক বছর পরে একবার মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে মধুসূদন কৃষ্ণমোহনের বাড়িতেই উঠেছিলেন। এর অল্পকাল আগে এই কৃষ্ণমোহনই যদি মধুসূদনকে কন্যা দান করতে অস্বীকার করতেন, তাহলে মধুসূদন কখনই তাঁর বাড়িতে উঠতেন না।

যা হোক, দৈবকীর জন্ম সময় সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ ইতিপূর্বে উপস্থাপিত করেছি, সেগুলি থেকে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যায় যে দৈবকীর প্রেমে পড়ে মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার প্রসঙ্গ অলীক রূপকথা মাত্র। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই অলীক রূপকথাই আজ জীবনীকার, নাট্যকার ও গবেষকদের স্বীকৃতি লাভ করে ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হতে চলেছে!

১। কৃষ্ণমোহনের স্ত্রীর নামকে বহু লেখক ভুল করে 'বিন্ধ্যবাসিনী দেবী' লিখেছেন।

২। বিন্দুবাসিনী দেবীর এই জন্ম তারিখ তাঁর সমাধি-ফলক থেকে সংগ্রহ করেছি। বিন্দুবাসিনী দেবীকে তাঁর মৃত্যুর পর শিবপুরের বিশপ্‌স্ কলেজের সমাধি প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করা হয়। বর্তমানে এই সমাধি-প্রাঙ্গণ বেঙ্গল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সীমার মধ্যে—ক্লক-টাওয়ারের ঠিক উত্তরে অবস্থিত। এই সমাধি-প্রাঙ্গণের উত্তর দিকের দেওয়ালের ধারে বিন্দুবাসিনী দেবীর সমাধি রয়েছে (কৃষ্ণমোহনের সমাধি এর পাশেই); এর উপরে মর্মর-ফলকে লেখা আছে—

'IN MEMORY OF
BINDU BASHINI DABEE
WIFE OF REV. DR., KRISHNAMOHUN BANERJEA. D. L,
BORN SEPTEMBER 1820, DIED 8TH MARCH 1866,
AGED 45 YEARS, 6 MONTHS.'

৩। পরম আশ্চর্যের বিষয়, ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন, 'জ্ঞানেন্দ্রমোহনের (খ্রীষ্টান হয়ে কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করার ব্যাপারে) সাফল্য এ বিষয়ে তাঁকে (অর্থাৎ মধুসূদনকে) উৎসাহ যুগিয়েছে।' কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রমোহন মধুসূদনের ন' বছর পরে—১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান হন এবং তারও এক বছর পরে—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করেন। সুতরাং তাঁর 'সাফল্য' এ বিষয়ে মধুসূদনকে উৎসাহিত করতে পারে না। গবেষণায় রত হবার আগে বিভিন্ন ঘটনার সাল-তারিখগুলো একবার দেখে নিলে ক্ষেত্রবাবু ভাল করতেন।

৪। কৃষ্ণমোহনের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার যে সমস্ত সাল-তারিখ এখানে ও এই প্রবন্ধের অন্যত্র নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলি এই তিনটি প্রামাণিক বই থেকে সংগ্রহ করেছি।

(ক) 'আদর্শ-চরিত। কৃষ্ণমোহন' দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত (১২৯২ বঙ্গাব্দ)।

(খ) A Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjea, by Ramachandra Ghosha (1893).

(গ) সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৭২ সংখ্যক গ্রন্থ, যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত (২য় সংস্করণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ)।

৫। অধ্যাপক নীতিশকুমার বসু তাঁর 'মধুসূদন হইতে শ্রীমধুসূদন' বইয়ে সর্বপ্রথম এই পত্রটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৬। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত A Biographical sketch of the Rev. K. M. Banerjea বইয়ে রামচন্দ্র ঘোষ (Ramachandra Ghosha) কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে লিখেছেন, 'By his wife he had several children of whom three are still living. His eldest daughter preceded him last in his departure to another world.' এর থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণমোহনের জীবদ্দশাতেই তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলমণি পরলোক গমন করেছিলেন, কিন্তু অন্য তিনজন কন্যা—দৈবকী, মনোমোহিনী ও মিলি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন। কমলমণির মৃত্যুর কথা দুর্গাদাস লাহিড়ীও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'কিছুদিন হইল…কমলমণির কাল হইয়াছে।' ('আদর্শ-চরিত। কৃষ্ণমোহন', পৃঃ ২৬, পাদটীকা)

রমেশচন্দ্র দত্ত

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট কলিকাতার রামবাগান পল্লীর সুপ্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারে রমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। রমেশচন্দ্রের পিতা ঈশানচন্দ্র হিন্দু কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইনি ডেপুটি কালেক্টরের চাকুরী করিতেন। বাল্যকালে রমেশচন্দ্র পিতার সহিত বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ইহাতে তাঁহার শিক্ষার ব্যাঘাত হইতে থাকায় তাঁহার পিতা তদীয় অনুজ তদানীন্তনকালের সুবিখ্যাত ইংরাজী-লেখক শশীচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় রাখিয়া তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। রমেশচন্দ্র পিতার মধ্যমপুত্র ছিলেন। তাঁহার অনুজের নাম ছিল অবিনাশ।

রমেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলে (পরে ইহার নাম হয় হেয়ার স্কুল) প্রবিষ্ট হন। রমেশচন্দ্রের বয়স যখন ১৩ বৎসর তখন তিনি পিতৃহীন হন, ইহার দুই বৎসর পূর্বেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র জুনিয়ার গ্রেড্ বৃত্তিসহ এণ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ হইতে সিনিয়র গ্রেড্ বৃত্তি সহ এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করার সময় রমেশচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে গিয়া ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতামহ পীতাম্বর দত্ত জীবিত ছিলেন। রক্ষনশীল পিতামহ ও পরিবারের অন্যান্য পরিজনবর্গ সমুদ্র যাত্রায় সম্মতি দিবেন না আশঙ্কা করিয়া রমেশচন্দ্র দেশত্যাগ করার সঙ্কল্প করেন। অগ্রজ যোগেশচন্দ্রের রমেশচন্দ্রের এই বিদেশ যাত্রায় সম্মতি ছিল, তিনি গোপনে অর্থসংগ্রহাদি করিয়া ভ্রাতার উচ্চাভিলাষ পূরণে সহায়তা করেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে রমেশচন্দ্র গোপনে তাঁহার অপর দুইজন বন্ধু ও সহাধ্যায়ী বিহারীলাল গুপ্ত ও পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত দেশত্যাগ করেন।

লণ্ডন পৌছিয়া রমেশচন্দ্র আই, সি, এস পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই কলেজে রমেশচন্দ্র অধ্যাপক হেনরী মার্লির নিকট ইংরাজী সাহিত্য ও সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ থিয়োডোর গোল্ডস্টুকরের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ইতিপূর্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালেই রমেশচন্দ্র মনোযোগ সহকারে সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিন বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রমের পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র ৪৮ জন নির্বাচিত ছাত্রের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া শিক্ষানবিসী সহ আই-সি-এসের অন্তিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষিত হন। বাঙ্গলা, সংস্কৃত পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য তিনি তিনটি বিশেষ পারিতোষিকও লাভ করেন। এই বৎসর আই-সি-এস পরীক্ষায় প্রথমস্থানের অধিকারী

হন উত্তরকালের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট আর্থার স্মিথ (১৮৪৮-১৯২০)। রমেশচন্দ্রের সহযাত্রী অপর দুই বন্ধু বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথও যথাক্রমে ১৪শ ও ৩৮তম স্থান অধিকার করিয়া এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হন।

এই বৎসরেই ইনার টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রমেশচন্দ্র সেপ্টেম্বর মাসে বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনান্তর রমেশচন্দ্র প্রায় দশবর্ষকাল বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টারের পদে কার্য করেন। ইহার পর প্রায় বার বৎসরকাল বিভিন্ন স্থানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য করার পর তাঁহাকে বর্দ্ধমান বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। বাঙ্গালীদের এমনকি ভারতীয়দের মধ্যে রমেশচন্দ্রই সর্বপ্রথম এই উচ্চপদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র উড়িষ্যার বিভাগীয় কমিশনার নিযুক্ত হন। প্রায় দুই বৎসর কাল এই পদে কার্য করার পর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে রমেশচন্দ্র ছুটি লইয়া ইংল্যাণ্ড গমন করেন। অবকাশকাল শেষ হইলে তিনি আর রাজকার্যে যোগদান করেন নাই, বাৎসরিক একসহস্র পাউণ্ড পেন্সন সহ তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে সাহিত্যক্ষেত্রে ও ভারতবিদ্যা চর্চায় তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্যসেবা ও দেশসেবার উদ্দেশ্যেই তিনি কার্যকাল শেষ হইবার নয় বৎসর পূর্বেই অবসর গ্রহণ করেন।

সিভিলসার্ভিসের কর্মীরূপে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সেবাই রমেশচন্দ্রের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল, তিনি যখন যে স্থানেই সরকারী কর্মচারীরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেইখানেই তিনি জনসাধারণের দুঃখ মোচনে ও ন্যায় বিচার সাধনে তৎপর হইতেন। প্রজাদের স্বার্থ যাহাতে কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয় এদিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার শাসিত জেলায় শিক্ষা বিস্তার ও অন্যান্য জনহিতকর কার্যেও তিনি অগ্রণী হইতেন। দক্ষ প্রশাসক হিসাবে রমেশচন্দ্র সাতিশয় খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নিদারুণ ঝঞ্ঝাবাতের পর তাঁহার চেষ্টায় ও গভর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে (অবিভক্ত) বঙ্গের বরিশাল জেলাটি পুনর্গঠিত হয়। তিনি যে সব সদর বা জেলার ভারপ্রাপ্ত শাসক থাকিতেন সেখানে তাঁহার সুশাসনের গুণে দুষ্কৃতির সংখ্যা আশাতীতরূপে হ্রাস পাইত। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। সরকার মনোনীত সদস্যরূপেও ব্যবস্থাপক সভায় তিনি সর্বদাই প্রজাকল্যাণমূলক কর্মধারার অনুসরণ করিতেন। এই সময়ে রাষ্ট্রনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু মহাশয়দ্বয়ও এই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। রমেশচন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতা তাঁহাদের দেশবাসীর হিতসাধনরূপ অভীষ্ট সিদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী হইত। প্রশাসকরূপে রমেশচন্দ্রের অসাধারণ দক্ষতা ভারতের গভর্ণর জেনারেলেরও মনোযোগ এবং প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল।

সরকারী চাকুরীতে যোগদানের পর রমেশচন্দ্র বাঙ্গলার পল্লীগ্রামের দুরবস্থার কথা স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ পান। কৃষকদের অবস্থা ও ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধে চাকুরী জীবনের প্রথম যুগে তিনি ছদ্মনামে ইংরাজীতে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র রচিত "The peasantry of Bengal" পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ শাসনকালে

বাঙ্গালী প্রজাগণের দুরবস্থার কথা বর্ণিত আছে। এই দুরবস্থার প্রতীকরণার্থে রমেশচন্দ্র নিজের মতামত লিপিবদ্ধ করেন। সরকারী কর্মচারীরূপে সাহিত্যসাধনা অথবা স্বদেশের হিতচিন্তা করা যথেষ্ট পরিমাণে সম্ভব হইবে না চিন্তা করিয়াই সম্ভবতঃ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে যান এবং অবকাশান্তে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ শক্তিশালী হইতেছিল এবং রমেশচন্দ্র রাজকর্মচারী থাকা অবস্থাতেই ইহার কোন কোন প্রস্তাব প্রকাশ্য ভাবেই সমর্থন করেন। দশমাসের অবকাশকালে এবং অবসর গ্রহণান্তে দীর্ঘদিন তিনি ইংল্যাণ্ডে থাকিয়া ইংরাজ জনসাধারণের মধ্যে ও পার্লামেণ্টে ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড বাসকালে রমেশচন্দ্র তিন বৎসরের জন্য লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদটি ছিল অবৈতনিক পদ তবে ইহা সম্পূর্ণ আয়হীন ছিল না, কোন কোন বক্তৃতার জন্য প্রবেশ দক্ষিণাও বক্তার প্রাপ্য হইত। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের কার্য গ্রহণ করিলেও রমেশচন্দ্রের প্রচুর অবসর মিলিত; এই অবসরকাল রমেশচন্দ্র ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ব্যয় করিতেন। রমেশচন্দ্রের কোন কোন সমালোচনা ও পরামর্শ বিশেষতঃ ভারতের কয়েকটি প্রদেশে ভূমি রাজস্বের হার হ্রাস ইত্যাদি প্রস্তাব ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ও অনুসৃত হইয়াছিল। ভারতের স্বার্থের অনুকূলে ইংল্যাণ্ডে জনমত গঠনে রমেশচন্দ্রের ঐকান্তিক প্রয়াস তাঁহার দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে। একমাত্র ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র ইংল্যাণ্ডের বিভিন্নস্থানে ভারতে রাজদ্রোহ আইন, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির স্বাধীনতা হরণ ও ভারত সরকারের সীমান্ত নীতির সমালোচনা করিয়া প্রায় চব্বিশটি জনসভায় ভাষণ দান করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া স্বদেশে আসেন এবং ২৯শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ সহরে অনুষ্ঠিত এই পঞ্চদশ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় ভারতে ইংরাজ শাসনের ত্রুটিগুলি উদ্ঘাটন করিয়া রমেশচন্দ্র বলেন যে ইংরাজ সরকারের উচিত এই জাতীয় মহাসভার মতামতগুলি ভারতের জনসাধারণের মতামত বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং তদনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা। ইংরাজ কর্মচারীদের পরামর্শগুলি একদেশদর্শী ও তাহা জনমতের অভিব্যক্তি নহে। অধিবেশন শেষে রমেশচন্দ্র জন্মভূমি কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকে দুইটি জনসভায় বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। কয়েক মাস স্বদেশে বাস করিয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যান। ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া তিনি ভারতে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের প্রতিরোধ জন্য আন্দোলন করিতে থাকেন। এই বৎসরই তাঁহার লিখিত "Famines in India" পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। ভারতের দুর্ভিক্ষের কারণ ও প্রজার উপর ভূমিরাজস্বের গুরুভার সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি পত্র লেখেন, এইগুলিও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (open letters to Lord Curzon on Famines and Land Assessment in India—London 1900)। ১৮৯৭ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রমেশচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় তাঁর Speeches and papers on Indian question. (Calcutta, 1902) রচনায় পাওয়া যায়।

সরকারী প্রশাসকরূপে জনগণের জীবনযাত্রার সহিত রমেশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল। অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া রমেশচন্দ্র ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। এই সব তথ্যের ভিত্তিতে রমেশচন্দ্র ব্রিটিশ শাসনের সূচনাকাল হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের একটি অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড "E onomic History of India (1757-1837) নামে লণ্ডন হইতে দুইখণ্ডে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড "India in the Victorian age (1837-1900)" নামে লণ্ডন হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। রমেশচন্দ্রের অর্থনৈতিক রচনাবলী সমূহের প্রতিপাদ্য এই ছিল যে ভারতে বৃটিশ শাসনকালে অন্যান্য শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবাসীর অধিকার সঙ্কুচিত হওয়ায় দেশের পঞ্চমভাগের চারভাগ ব্যক্তিই কৃষি-নির্ভর হইতে বাধ্য হইয়াছে। এই কৃষি ব্যবস্থাও অনুন্নত এবং ভূমি রাজস্বের পরিমাণ অত্যধিক, এই জন্যই ভারতীয় কৃষকদের অপরিসীম দারিদ্র্য ভোগ করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে আজীবন তাহাদের ঋণভারে প্রপীড়িত থাকিতে হয়। প্রজারা যে পরিমাণ রাজস্ব দেয় তাহার বিনিময়ে তাহারা সরকারের নিকট হইতে প্রায় কিছুই পায় না। এই পুস্তকে উত্থাপিত যুক্তি ও তথ্যগুলি ইংল্যাণ্ডের বহু উদারপন্থী রাজনীতিজ্ঞ ও রাজনৈতিক কর্মীদের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে। বৃটিশ শাসন যে শোষণেরই নামান্তর এই তথ্যটি ভারতে ও ইংরাজের স্বদেশে তুলিয়া ধরা রমেশচন্দ্রের জীবনের একটি বিশেষ কৃতিত্ব। রমেশচন্দ্রের এই অর্থনৈতিক ইতিহাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান মিরর্ পত্রের তৎকালীন সম্পাদক এন, এন ঘোষ লিখিয়াছিলেন যে এইরূপ একটি গ্রন্থে দেশের যে কল্যাণ হয়, কংগ্রেসের ঝুড়ি বোঝাই বক্তৃতায় তাহা হয় না ("A book like this does more work than cart load of Congress speeches")।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রমেশচন্দ্র স্বদেশে আসিয়া আবার পরের বৎসর এপ্রিল মাসে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যান। এইবার তিনি দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁহার অর্থনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড রচনাকালে এই অভিজ্ঞতা বিশেষ সহায়ক হয়। রমেশচন্দ্রের ভারতে অবস্থানকালে তাঁহাকে সরকারী পুলিশ কমিশনের সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করা হয়। কর্মজীবনে রমেশচন্দ্র বহুবার পুলিশ বিভাগের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। এই কমিশনের নিকট রমেশচন্দ্র বলেন যে পুলিশ বিভাগে বেতন কম এইজন্য এই বিভাগে গুরুদায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ বাহুল্য ঘটে। অন্যায় করিলেও ইহাদের শাস্তি দেওয়া হয় না, ইহাদিগকে যে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা কোন মতেই উচিত নহে।

রমেশচন্দ্রের বিদ্যাবত্তা, কর্মদক্ষতা ও দেশহিতৈষণায় আকৃষ্ট হইয়া বরোদার উদারপন্থী ও মহানুভব মহারাজা সয়াজী রাও গায়কোয়াড় রমেশচন্দ্রকে স্বরাজ্যে রাজস্বমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। দেশবাসীর সেবা করার সুযোগ লাভ করিয়া রমেশচন্দ্র ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে বরোদার রাজকার্যে যোগদান করেন। তাঁহার সুশাসনে কয়েক বৎসরেরই মধ্যেই বরোদা রাজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। তাঁহারই চেষ্টায় এই রাজ্যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন, রাজস্বনীতির সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার এবং ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নতি সাধিত হয়। (দ্রষ্টব্য : রমেশচন্দ্র রচিত

Baroda Administration Report 1902-3, 1903-4, 1904-5, 1906, 1905-6-1907)।

বরোদার অমাত্য থাকার সময়ে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রমেশচন্দ্র কাশীতে অনুষ্ঠিত Indian Industrial Conference বা ভারতীয় শিল্প সম্মেলনের সভাপতির আসনে বৃত হন। সভাপতির ভাষণে তিনি জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্পবস্তু ব্যবহারের আবশ্যকতা বর্ণনা করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প সম্মেলনেও রমেশচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনবৎসর ধরিয়া বরোদার অমাত্যের পদে কার্য করার পর ভারত গভর্ণমেণ্ট রমেশচন্দ্রকে রাজকীয় বিকেন্দ্রীকরণ সদস্য নিযুক্ত করেন। সরকারী শাসন-ব্যবস্থা সংস্কার ও উন্নতি সম্পর্কিত পরামর্শ দানের জন্যই এই সরকারী কমিশনের সৃষ্টি হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই কমিশনের কার্য চলিয়াছিল। এ দেশের সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ শেষ হইলে সদস্যগণ ইংল্যাণ্ডে গিয়া বাকী কার্যটুকু শেষ করেন। এই সময় রমেশচন্দ্রও কমিশনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। রমেশচন্দ্রের চেষ্টায় এই কমিশন গভর্ণমেণ্টকে শাসন সংস্কার বিষয়ে উদার ও বাস্তব নীতি গ্রহণের পরামর্শ দেন। এই পরামর্শগুলি মিণ্টো মর্লি শাসন সংস্কার প্রবর্তনকালে বিশেষ কাজে আসিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডে আসিয়া রমেশচন্দ্র শুধু কমিশনের কাজেই লিপ্ত ছিলেন না, ভারতবর্ষের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে নানাস্থানে তিনি বক্তৃতা দান করেন। ইহার প্রায় এক বৎসর পূর্বে বরোদা হইতে ছুটি লইয়া কয়েক মাসের জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডে আসেন। এই সময় মহামতি গোখেলও এদেশে ছিলেন, এবারও গোখেলের সহিত একযোগে তিনি নানাস্থানে ভারতের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দেন ও ভারতের স্বার্থের অনুকূলে জনমত গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। রাজকীয় বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের কার্যকাল অন্তে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে রমেশচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইতোমধ্যে বরোদার দেওয়ানের (প্রধান অমাত্য) মৃত্যু হইলে সয়াজী রাওএর বিশেষ অনুরোধে ১লা জুন তারিখে মাসিক চারিহাজার টাকা বেতনে বরোদার প্রধান অমাত্যের পদে যোগদান করেন। ইহার কিছুদিন পর রমেশচন্দ্রের অনুরোধে সয়াজী রাও তাঁহার আবাল্যসুহৃদ অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্তকে রাজ্যের প্রধান আইন উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত করেন। দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু স্থির করেন যে ১৯১২ খৃষ্টাব্দর মধ্যভাগে তাঁহারা অবসর লইয়া বাঙ্গলাদেশে অবশিষ্ট জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করিবেন। অবসর গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলা দেশে বাস করার সুযোগ রমেশচন্দ্র পান নাই। স্বল্পকাল রোগ ভোগের পর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর রমেশচন্দ্র বরোদার প্রধানমন্ত্রীরূপেই দেহত্যাগ করেন। রমেশচন্দ্র চিরদিন ভারতীয় ঐক্যের সাধনা করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুতে বরোদার হিন্দু, মুসলমান ও পার্শী সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই শোকবিহ্বল হন। বরোদার জনসাধারণের নিকট রমেশচন্দ্র দরিদ্রের বন্ধুরূপে পরিচিত ছিলেন (গরীব কা দোস্ত)।

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সহকারে বরোদার রাজপরিবারের জন্য বিশেষভাবে রক্ষিত শ্মশান ভূমিতে রমেশচন্দ্রের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়। বরোদায় রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ ভাবে বঙ্গদেশে গভীর শোকের সঞ্চার হয়। ইংল্যাণ্ডেও রমেশচন্দ্রের বহু বন্ধু ছিলেন তাঁহারা

সকলেই রমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে শোকাকুল হন।

রমেশচন্দ্রের বয়ক্রম যখন ষোড়শবর্ষ মাত্র তখন তাঁহার বিবাহ হয়। মৃত্যুকালে রমেশচন্দ্র বিধবা পত্নী, চারিকন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া যান। রমেশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র অজয়চন্দ্র আইনের নিপুণ অধ্যাপক রূপে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। রমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা প্রমথনাথ বসু (কমলা দেবীর স্বামী) একজন প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সরলার সহিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিবাহ হয়। ইনি একজন আই-সি-এস কর্মচারী ছিলেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় রমেশচন্দ্রের একখানি অতি উত্তম জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন করেন ("Life and work of Ramesh chunder Dutta, 1911)। রমেশচন্দ্রের জীবনীপ্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "রমেশচন্দ্র দত্ত" নামীয় তথ্যবহুল পুস্তিকাটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য (সাহিত্যসাধক চরিতমালা, নং ৬৫)।

রমেশচন্দ্রের জীবনের একটি বিশেষ পরিচয় একজন স্বদেশ প্রেমিক রাজনীতিজ্ঞ ও কর্মী রূপে, তাঁহার দ্বিতীয় পরিচয় বঙ্গ ভারতীর একজন একনিষ্ঠ সেবক তথা বরেণ্য কথাশিল্পী রূপে এবং তাঁহার তৃতীয় পরিচয় একজন সুপণ্ডিত ভারত-বিদ্যা সাধকরূপে। রমেশচন্দ্রের এই ত্রিমুখী সাধনার প্রথম দিকের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল এবার তাঁহার বঙ্গসাহিত্য সাধনার কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করার পর রমেশচন্দ্র "Arcydae" (R. C. D) এই ছদ্মনামে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সম্পাদিত Bengal Magazine ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত Mookherjee's Magazineএ ইংরাজীতে প্রবন্ধ ও কবিতা লেখা আরম্ভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের পিতার পরিচিত বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশে রমেশচন্দ্র বাঙ্গলা রচনায় মনোনিবেশ করেন। ইতিহাস শাস্ত্রে রমেশচন্দ্রের প্রগাঢ় দক্ষতা ছিল। এই ইতিহাস জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি চারিখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়া প্রকাশ করেন—বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪, বাং ১২৮১) মাধবী কঙ্কন (১৮৭৭, বাং ১২৮৪) জীবন প্রভাত (১৮৭৮, বাং ১২৮৫) ও জীবন সন্ধ্যা (১৮৭৯, বাং ১২৮৬)। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রকাশ কাল হইতে এ যাবৎ বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ও বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে।

চারিখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পর রমেশচন্দ্র দুইখানি সার্থক সামাজিক উপন্যাস রচনাও প্রকাশ করেন। ইহাদের নাম সংসার (১৮৮৬, বাং ১২৯৩) ও সমাজ (১৮৯৪, বাং ১৩০১)। ঔপন্যাসিক হিসাবে রমেশচন্দ্রের মূল্য সম্বন্ধে এ কালের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন "...রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক ও সামাজিক দুই প্রকার উপন্যাসেই নিজ ক্ষমতার পরীক্ষা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তাঁহার 'জীবন প্রভাত' ও 'জীবন সন্ধ্যা' বঙ্গ সাহিত্যে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনেকগুলি গুণ আছে—তিনি বর্ণিত যুগের বিশেষত্বটুকু উপলব্ধি করেন, বীরত্ব কাহিনীর উন্মাদনা নিজ রক্তের মধ্যে অনুভব করেন ও বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য স্থাপন করিতে পারেন।...

সামাজিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের বিশেষ গুণ তাঁহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও পল্লীগ্রামের দুঃখদারিদ্র্য-পূর্ণ জীবনের প্রতি করুণ ও অকৃত্রিম সহানুভূতি (বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা পৃঃ ৫০-৫১ ; তৃতীয় সং, ১৯৫৬)

রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসদ্বয় সম্বন্ধে উক্ত সমালোচক আরও বলিয়াছেন " 'সংসার' ও 'সমাজে' রমেশচন্দ্র ইতিহাস হইতে শান্ত পল্লীর সৌন্দর্যের মধ্যে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কথায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুইখানি উপন্যাসে তিনি নতুন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা এতদিন ইতিহাসের সুবিশাল ক্ষেত্রে স্মরণীয় ঘটনা সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু তাঁহার শেষ উপন্যাসদ্বয়ে তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইতিহাসের বিশালও সমাজের সঙ্কীর্ণ, এই উভয়ক্ষেত্রেই তাঁহার তুল্য অধিকার ও সমান শক্তি আছে—" (তদেব, পৃঃ ৪৭)। রমেশচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস গ্রন্থাবলী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের দ্বারা সুসম্পাদিত হইয়া কিছু দিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে (রমেশ রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ কলিকাতা ১৯৬-)।

রমেশচন্দ্র সমগ্র বাঙ্গলা সাহিত্য কত অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও তাঁহার রস-বোধ কত গভীর ছিল তাঁহার লিখিত "The literature of Bengal" (1877) নামক পুস্তকটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতক পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অপূর্ব দক্ষতার সহিত বিশ্লেসিত হইয়াছে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১২৯২ হইতে ১৩০৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রমেশচন্দ্রের অনেকগুলি বাঙ্গলা রচনা নবজীবন, নব্যভারত, ভাণ্ডার, ভারতী, ভারতী ও বালক, মুকুল, সাধনা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রমেশচন্দ্রের বাঙ্গালা প্রবন্ধাবলীয় একটি সঙ্কলন কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে (রমেশচন্দ্র দত্ত—প্রবন্ধ সংকলন —সম্পাদক শ্রীনিখিল সেন কলিকাতা)।

বাঙ্গলা সাহিত্যে রমেশচন্দ্রের দানের আলোচনা করিয়া ভারতবিদ্যা সাধকরূপে অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সাধনার কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। কৈশোরকালেই রমেশচন্দ্র উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। যৌবনকালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থী রূপে লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে তিনি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ডাঃ থিওডোর গোল্ডষ্টুকারের নিকটও সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। কর্মজীবন আরম্ভ করিয়াও তিনি সংস্কৃত চর্চা অব্যাহত রাখিরাছিলেন। প্রাচীন হিন্দুর সাহিত্য প্রতিভার প্রাচীনতম নিদর্শন ঋগ্বেদ শুধু তাহাই নহে এ পর্যন্ত ঋগ্বেদই সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত সাহিত্যের সর্বপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন বলিয়া সাধারণভাবে স্বীকৃত। ইংল্যাণ্ড প্রবাসী জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুল্যর (১৮২৩-১৯০০) ১৮৪৯ হইতে ১৮৭৪ পর্যন্ত সায়নভাষ্য সহ সমগ্র ঋগ্বেদের মূল গ্রন্থ ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করেন, ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পূর্বে ও কিছু পরে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহার আংশিক বা পূর্ণ অনুবাদ ল্যাটিন, ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান প্রভৃতি ভাষায় সম্পন্ন করেন। মাক্সমুল্যরের ঋগ্বেদ প্রকাশের পর রমেশচন্দ্র ইহার অনুবাদ কার্যে ব্রতী হন, এবং দুইবৎসরকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া এই সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করেন (১)। রমেশচন্দ্র এই অনুবাদ কার্যে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও

বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ ও উৎসাহ লাভ করেন। ইতিপূর্বে বাঙ্গলাভাষায় এমন কি কোন ভারতীয় ভাষায় কেহই ঋগ্বেদের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। রমেশচন্দ্রের এই ঋগ্বেদ অনুবাদ ও প্রকাশ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন "রমেশচন্দ্রের এই কীর্তিটি চিরস্থায়ী হইবে।—বাঙ্গালী ইহার ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে না।"

১৮৮০-৯০ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ইংরাজী ভাষায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটি মনোজ্ঞ ইতিহাস ৩টি খণ্ডে রচনা করিয়া প্রকাশ করেন (২) এই পুস্তকটি ম্যাক্সমুল্যার, ভেবর, ইয়োলি, উইনট্যরনিৎজ, পিশেল, বার্থ, কার্ণ, ওল্ডেন বুর্গ প্রভৃতি ইংরাজ, জার্মান, ফরাসী ও ডাচ্ সংস্কৃতজ্ঞগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে এই পুস্তকখানির সংশোধিত সংস্করণ দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই বৎসর এই পুস্তকটির একটি ছাত্র পাঠ্য সংস্করণও প্রকাশিত হয় (৩)।

যৌবনকাল হইতে রমেশচন্দ্র ইংরাজী কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। খৃঃ পুঃ ২০০০ হইতে ১২০০ খৃঃ পর্যন্ত লিখিত ভারতীয় সাহিত্যের নির্বাচিত কতকগুলি অংশ তিনি ইংরাজীতে পদ্যাকারে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশ করেন (৪)। ইহার পর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাভারতের সংক্ষেপিত উপাখ্যান ভাগ ইংরাজীতে প্রকাশ করেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক ম্যাক্সমুল্যর ইহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। পরের বৎসর রামায়ণের সংক্ষিপ্ত আখ্যানটিও তিনি ইংরাজীতে প্রকাশ করেন (৫-৬)। এই শেষোক্ত পুস্তক দুইটি পরে Everyman' Library নামে গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (নং—৪০৩, লণ্ডন, ১৯৫৩)।

রমেশচন্দ্র শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন না, সংস্কারবাদী ও আধুনিক মতাবলম্বী হইলেও আর্য-ঋষি প্রচারিত প্রাচীন হিন্দুধর্মে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। হিন্দুশাস্ত্রের সার সঙ্কলন জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি "হিন্দুশাস্ত্র" নামে এক গ্রন্থমালা প্রবর্তন করেন। রমেশচন্দ্র এই গ্রন্থমালার দুইটি খণ্ড ৯ ভাগে মূল ও অনুবাদ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (৭)। এই গ্রন্থমালা সঙ্কলনের কার্যে কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহার সহায়তা করেন। এই শাস্ত্রমালার মধ্যে ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম ভাগ) ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ (২য় ভাগ), শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র (৩য় ভাগ) স্বয়ং রমেশচন্দ্র কর্তৃক অনূদিত হয়। "হিন্দুশাস্ত্র" প্রচারেও রমেশচন্দ্রের প্রধান উৎসাহ দাতা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র (৭)।

১২৯২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা হইতে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা পর্যন্ত ঋগ্বেদের দেবগণ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের ৭টি গবেষণা ধর্মী প্রবন্ধ "নবজীবন" পত্রে প্রকাশিত হয় (দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধ সঙ্কলন, নিখিল সেন সম্পাদিত কলিকাতা, ১৯৫৯)।

সুপ্রসিদ্ধ ভারতী পত্রিকায় হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার দুইটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হব (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮)। কালিদাস ও ভবভূতি রমেশচন্দ্রের প্রিয় কবি ছিলেন, ইহাদের সম্বন্ধে দুইটি আলোচনা যথাক্রমে ভারতী ও বালক (পৌষ, ১২৯৯) এবং সাধনা (মাঘ, ১২৯৯) পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল (দ্রষ্টব্য—তদেব)। সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া (১৯০২ সং) রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণদাস পাল ও রমেশ মিত্রের

জীবনীগুলি রমেশচন্দ্র কর্তৃক লিখিত হয়।

রমেশচন্দ্র রচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নামও উল্লেখযোগ্য :—

Three years in Europe (পত্রাবলীর সঙ্কলন—Calcutta, 1872, Rambles in India, 1871-1895, Calcutta 1895 ; Reminiscesof a workman's life (poems) Calcutta 1893 ; England and India (1785-1885), London, 1897 ; The lake of palms—London, 1902 ; Indian Poetry Selections rendered into Eng verse, London, 1905 The slave girl of Agra—London, 1909 ; A brief history of Ancient and Mordern India (for schools) Calcutta, 1891 ; A brief history of ancient and modern Bengal (for schools) Calcutta, 1892 ; ভারতবর্ষের ইতিহাস (ছাত্র পাঠ্য)—কলিকাতা নভেম্বর ১৮৭৯।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত রমেশচন্দ্রের প্রথমাবধিই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৩০১ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৯৪, এপ্রিল, Bengal Academy of literature "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" রূপে জন্মলাভ করিলে রমেশচন্দ্র উহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রায় দুই বৎসর কাল সভাপতি থাকিয়া তিনিই এই নবজাত প্রতিষ্ঠানটিকে একটি সুস্পষ্ট রূপদানে সহায়তা করেন। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত করেন। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে রমেশচন্দ্র আর একবার এই সারস্বত-প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে রমেশচন্দ্র তাঁহার অমূল্য গ্রন্থভাণ্ডার (সংস্কৃত) পরিষৎকে দান করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল রয়াল কমিশনের কার্যশেষে রমেশচন্দ্র যখন স্বল্পকালের জন্য বাঙ্গলাদেশে আসেন তখন পরিষদের নবনির্মিত ভবনে তাঁহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে পরিষদ্ সংলগ্নভূমিতে "রমেশ ভবন" নামে একটি দ্বিতল স্মৃতি মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতার সহিত রমেশচন্দ্রের সম্পর্ক পিতা পুত্রীর ন্যায় ছিল। নিবেদিতা রমেশচন্দ্রকে ধর্ম-পিতা (God father) নামে অভিহিত করিতেন। রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর নিবেদিতা "মডার্ণ-রিভিউ" পত্রিকায় (জানুয়ারী, ১৯১০) তাঁহার জীবনাদর্শের কথা অতি সুনিপুণ ভাবে বর্ণনা করেন। রমেশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ ও স্নেহভাজন রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত অভিমতও উল্লেখযোগ্য, এই কয়ছত্রে রমেশচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের পরিচয় অতি সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

"তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্য, কি রাজকার্যে, কি দেশ হিতে, সর্বক্ষেত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু সর্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছেন—বস্তুতঃ ইহাই বলশালিতার লক্ষণ। এই কারণে সর্বদাই তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখিয়াছি—এই প্রসন্নত তাঁহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকীর্ণ। স্বাস্থ্য তাঁহার দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল—তাঁহার কর্মে ও মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে এই তাঁহার নিরাময় স্বাস্থ্য একটি প্রবল প্রভাব বিস্তার

করিত। তাঁহার জীবনের সেই সদা প্রসন্ন অক্ষুণ্ণ নির্মলতা আমার স্মৃতিকে অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে তাহার আসনটি গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই।" (১৬ই পৌষ ১৩১৬)

(১) ঋগ্বেদ সংহিতা (মূল)—১৮৮৫, কলিকাতা

(ঐ) বঙ্গানুবাদ—১৮৮৫-১৮৮৭, কলিকাতা (২য় সংস্করণ—কলিকাতা, ১৯০৯, ৩য় সংস্করণ জ্ঞান-ভারতী, কলিকাতা, ১৯৬৩)

(২) A history of civilization in ancient India based on Sanskrit literature, Vols 1-3, 1889—90, Calcutta Revised Edition in 2 Vols, London, 1983.

(৩) Ancient India, London, 1893.

(৪) Lays of Ancient India, London, 1894.

(৫) Mahabharat—condensed into Eng. verse, London, 1899.

(৬) Ramayana ,, ,, London, 1900.

(৭) হিন্দুশাস্ত্র (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা, ১৮৯৩-৯৭

১ম ভাগ—বেদ-সংহিতা। সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্ত

২য় ভাগ—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্—

৩য় ভাগ—শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র—

৪র্থ ভাগ—ধর্মশাস্ত্র—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

৫ম ভাগ ষড়দর্শন—কালীবর বেদান্তবাগীশ

হিন্দুশাস্ত্র (দ্বিতীয় খণ্ড)

৬ষ্ঠভাগ—রামায়ণ—হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

৭ম ভাগ—মহাভারত—দামোদর বিদ্যানন্দ।

৮ম ভাগ—শ্রীমদ্ভাগবদগীতা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দামোদর বিদ্যানন্দ।

৯ম ভাগ—অষ্টাদশ পুরাণ—আশুতোষ শাস্ত্রী ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী।

সিন্ধু সভ্যতায় বন

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বনের সংগে মানুষের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। আজ যদিও তা খুব প্রকট হয়ে চোখে পড়ে না, আদিম যুগে বিশেষ করে সভ্যতার প্রথম স্তরে মানুষের বাঁচার, বিকাশের জন্য বন ছিলো অপরিহার্য।

ভূতত্বের প্লাইস্টোসিন যুগের হিমানী আবহাওয়ার পর যখন পৃথিবীতে আবার দেখা দিলো নাতিশীতোষ্ণতা, তখন আজকের মানুষের পূর্বপুরুষের জন্ম। সেদিনের ইতিহাসের স্বাক্ষর আজ স্বভাবতই স্বল্প, কিন্তু তাদের তৈরী পাথরের হাতিয়ার এখনও পাওয়া যায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে। ভারতের এই সভ্যতার নিদর্শন মাদ্রাজ অঞ্চলে, রাজপুতানা অঞ্চলে, বাংলার সুবর্ণরেখায়, সিন্ধুনদ, নর্মদা নদীর ধারে ধারে।

বনের বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার শিকারী মানুষের খাদ্য। ঘন বিস্তীর্ণ বনের অসংখ্য ভীতিপ্রদ শক্তিশালী জীবজগতের সামনে প্রায় অস্ফুট মানবসমাজ তখন অবলুপ্তির সম্ভাবনায় পরিপ্লুত। পাথরের তৈরী ছোট ছোট হাতিয়ার আর বোধ করি কাঠের তৈরী অস্ত্রমাত্র দিয়ে তাদের বাঁচার সংগ্রাম। ফলে কিছু দিনের মধ্যে, বিশেষ করে মিশর এবং পারস্য দেশপুঞ্জগুলোতে বুদ্ধিজীবী মানুষ বুনো গম এবং বার্লি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছে আর ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে। ভারতে দেখা যায় প্রথমে বুনো গম এবং আরও পরে ধানের চাষ।

আদিম যুগে মানুষের সভ্যতা বিকাশের সংগে সংগে বনকে দূরে সরে যেতে হয় চাষের জমি তৈরীর তাগিদে। যদিও বন সরবরাহ করে কাঠ, খাদ্যের বনজ ফল, বনের কারণেই বাঁচা জন্তু জানোয়ারের মাংস, বনের প্রতি আদিম ভয়ে মানুষ সবসময় বন থেকে দূরে সরার চেষ্টা করেছে, ...আর যখনই তা চরমভাবে দেখা দিয়েছে তখনই সভ্যতা আবার মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। মধ্যএশিয়ার এককালীন শস্য শ্যামলা গ্রীস, ইস্রায়েল, মিশর সবারই ইতিহাস প্রায় অনুরূপ। ভারতের দিকে তাকালে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। পাঞ্জাবের রাজস্থান অঞ্চলে, যেখানে ভারতের সভ্যতার প্রকাশ মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার সহরে।

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, চাহ্নুদারো ইত্যাদি সভ্যতা পর্বের যুগ ধরা হয় তিন হাজার খৃষ্টপূর্ব অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় চার, সাড়ে চার, পাঁচহাজার বছর। এই পাথর সভ্যতার বিস্তৃতি আজ পর্যন্ত যা আবিষ্কৃত তাতে মনে হয় পাঞ্জাব এবং সিন্ধুতে সিন্ধুনদীর এবং তার কয়েকটি শাখার ধারে। আর সিন্ধুপ্রদেশ প্রায় মরুভূমি এবং জলসেচের দ্বারা একমাত্র ক্ষেত বা বন করা সম্ভব। পাঞ্জাবেও উপত্যকা অঞ্চল যথেষ্ট শুষ্ক এবং জংগল নেই বললেই চলে। কিন্তু মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার সময় ঠিক তা ছিল না, যথেষ্ট বনমালা বিস্তীর্ণ ছিল, আবহাওয়া অনেক আর্দ্র, তার প্রমাণ আছে।

হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো সহরে কয়েকটি জায়গায় এতলোক একসংগে বাস হতে বোঝা যায় যে এ অঞ্চলে স্বভাবতঃই কৃষি উৎপাদন হত সহরকে খাদ্যে পরিতৃপ্ত রাখবার জন্য। সহরের সমস্ত

বাড়ি পোড়া ইঁটের তৈরী। আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ সে যুগের ইঁটের স্তূপ পাওয়া যায়। এই ইঁট ভেঙেই তৈরী হয়েছে করাচী-লাহোর রেলের লাইনের জন্য ব্যালাষ্ট। এই সমস্ত ইঁট তৈরী হত ভাঁটিতে এবং তার জন্য স্বভাবতঃই প্রয়োজন ছিল লক্ষ লক্ষ মণ কাঠের। যদি আজকের মরুভূমি-প্রায় সিন্ধু, পাঞ্জাব তখন বনঅধ্যুষিত না হত তবে কোথা থেকে আসত এই লক্ষ লক্ষ মণ কাঠ। তাছাড়া এই জায়গাগুলোতে প্রাপ্ত সিল থেকে দেখা যায় যে সে যুগের লোকেরা বুনো মোষ, গণ্ডার, বাঘ, হাতীর সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল, এবং এই সমস্ত জানোয়ার যে সে সময়ে ছিল তার প্রমাণ হচ্ছে যে তাদের হাড় পাওয়া গেছে ভগ্নাবশেষ থেকে। বুনো মোষ, গণ্ডার, বাঘ হাতী স্বভাবতঃই বন না হলে বাস করে না তার প্রমাণ যে আজ কয়েকটি বাঘ ছাড়া এ অঞ্চলে আর এ সমস্ত জন্তুজানোয়ারের কোনটিই পাওয়া যায় না।

যদিও একথা সত্য যে একেবারে নিশ্চিত কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না। তবে, এই লক্ষ লক্ষ ইঁটের ভাঁটির জন্যে ব্যবহার করা কাঠ হাতী গণ্ডারের উপস্থিতি এবং খাদ্য তৈরীর সাফল্য থেকে মেনে নিতে প্রায় বাধ্য আমরা যে এই অঞ্চল সেদিন সত্যই বনে-জংগলে পরিপূর্ণ ছিল। আর তাছাড়া মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা সহরের গঠন এবং প্রতি রাস্তায় বেড খনন করা নালার প্রাদুর্ভাব দেখে মনে হয় যে সেদিন বৃষ্টিপাত বেশী থাকার জন্যই এত জলনিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সেই যুগে এই পোড়া ইটের ব্যবহার দেখা যায় উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবের রূপার অঞ্চলে, পূর্বে রাজপুতনার বিকানীর অঞ্চলে, কাথিওয়ারের রংপুর এলাকায়, যদিও তার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী মহেঞ্জোদারো এবং কতকটা চাহ্নদারো এবং লারকান অঞ্চলে।

ইট পোড়ানো ছাড়া কাঠের আরও ব্যবহার ছিল। বাড়ি প্রধানতঃই তৈরী হত ইটের। কিন্তু হরপ্পা ইত্যাদি অঞ্চলে কিছু কিছু কাঠের কড়ির ব্যবহার ছিল। পোড়া একটি পাইনের (*Pinus spp*) কড়ি পাওয়া গেছে হরপ্পার এই ভগ্নাবশেষ থেকে। মহেঞ্জোদারোতে ১৪ ফুট লম্বা শিশুকাঠের (*Dalbergia Sissoo*) কড়ির জন্য করা গর্ত লক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া দরজার লিনটেল হিসেবে কাঠ, স্নানাগারের যাওয়ার সিঁড়ির জন্য কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে। বাড়ির ছাদ বাঁশ এবং ঘাসের বুনুনী দিয়ে তৈরী হত, আর তাতে লেপা থাকত মাটি।

যানবাহনের জন্য ব্যবহৃত হত পশুটানা গাড়ি এবং এক্কা। এই দুয়ের গঠন এবং আকৃতি আজকের হরপ্পা অঞ্চলের গাড়ির মতই প্রায় ছিল। তার প্রমাণ প্রাপ্ত মাটির পশুটানা গাড়ি এবং এক্কা থেকে বোঝা যায়। এদের চাকাগুলো ছিল একেবারে ভরাট। আজকের মত spoke দেওয়া নয়। নৌকার চলন নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তার প্রমাণ সীমাবদ্ধ মাত্র আঁকা ছবি থেকে এবং একটি শিল থেকে। নৌকোগুলো বোধকরি পাল তোলা ছিল এবং কাঠের তৈরী। এই পর্বে মোটামুটি প্রমাণিত যে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পায় ব্যবসার সম্পর্ক ছিল। বালুচিস্তান, সুমের, তুর্কীস্তান, ইরান, এবং কাথিওয়ারের মধ্যে এই সমস্ত ব্যবস্থা ছিল সামুদ্রিক পোতে এবং প্রধানতঃ পারস্য উপসাগর দিয়ে। সামুদ্রিক পোত তৈরী কাঠের।

অতএব, আমাদের মহেঞ্জোদারো হরপ্পার সভ্যতার অবশেষ থেকে কতকগুলি আন্দাজ করা যেতে পারে, তা হচ্ছে যে, সিন্দু নদীর উপত্যকার ধারে আজকের সিন্ধু এবং দক্ষিণ পাঞ্জাবে,

পূর্বে বিকানীরে উত্তরে কাশ্মীরে এবং দক্ষিণে কাথিওয়ার অঞ্চলের জলবায়ু ছিল আর্দ্র। বনের পরিমাণ নিতান্ত কম ছিল না এবং কাঠের ধরণ ছিল শিশু দেওদার (*Cedrus diodara*), পাইন, কুল (চিহ্ন পাওয়া গেছে একটি কবরখানায়), রোজউড (*Daıbergia latifolsa*) (কারখানায়), ইত্যাদি। তাছাড়া ছিল বাঁশ এবং ঘাস, বোধকরি নদীর তীরে তীরে। এই সমস্ত কাঠের প্রধানতঃ প্রয়োজন ছিল ইটের ভাঁটিতে বাড়ি তৈরীর জন্য, গরুর গাড়ি এবং এক্কা তৈরীতে। এই সমস্ত গাছের জংগলে তখন যথেষ্ট জন্তুজানোয়ার ছিল, তার মধ্যে হাতী, গণ্ডারও উপস্থিত।

শিশুগাছ সাধারণতঃ জন্মায় নতুন পড়া পলি মাটিতে এবং প্রাপ্ত শিশুকাঠ থেকে বোঝা যায় এ সমস্ত অঞ্চলের কিছু কিছু জায়গায় সিন্ধুনদীর আনা পলির জমিতে জংগলের পত্তন হচ্ছিল ধীরে ধীরে সেই যুগে। কুল এবং রোজউড আজ মোটামুটি আর্দ্র ডাঙ্গাজমিতে পাওয়া যায় এবং সেই আমলের কুল, রোজউড হতে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এই সমস্ত অঞ্চল আর্দ্র ছিল কিন্তু মাটিতে পলির ভাগ বেশী, আর তাই বৃষ্টির জল জমা না হয়ে চলে যেত মাটির নীচে। পাইন, দেওদার গাছ অবশ্য কোনভাবেই এই সমস্ত জায়গায় জন্মাতে পারে না কারণ তারা ৪০০০´— ৬০০০´ ফুট উঁচু পাহাড়ে দেখা যায় প্রধানতঃ। তাই মনে হয় মহেঞ্জোদারোতে ব্যবহৃত এই সমস্ত কাঠ আনা হত জলে ভাসিয়ে কুলু কাশ্মীর অঞ্চল হতে।

মহেঞ্জোদারো হরপ্পা সভ্যতার পর এই একই ধরনের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে গংগার ধারে ধারে আজকের উত্তর প্রদেশে। তা থেকে বোঝা যায় যে এই সভ্যতা ক্রমে পূর্বমুখী হয়েছে। অবশ্য এই সমস্ত সভ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট অনুসন্ধান করা হয় নি যা দিয়ে তখনকার জংগলের অবস্থা সম্পর্কে কোন আন্দাজ করা চলে।

উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সহরাই (বাঁধনা)

বাঙলাদেশে বিশেষ করে উত্তর রাঢ়ের এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সাঁওতাল ও অন্যান্য উপজাতিদের বাস। আজও এরা আর্যেতর সভ্যতার সুপ্রাচীন রূপটি সমান গৌরবের সাথে বহন করে চলেছে। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর সাথেই এদের বাস। আর্য সামাজিকতায় এদের আচার ব্যবহারে বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে সত্য কিন্তু এদের সামাজিক উৎসব ও পূজাপার্বণে সেই অরণ্য আদিম নিকষ কালো রূপটি ফুটে উঠে। উৎসবের দিন সাঁওতাল পল্লী হতে ভেসে আসে মাদলের ধ্বনি। মহুয়ার নেশায় মাতাল পুরুষ মাদল বাজায়—তালে তালে নাচে সাঁওতাল রমণীর দল। এযেন তাদের নিজস্ব এক জগৎ। কোথাও ছন্দ পতন নাই।

সাঁওতালদের সারা বৎসর ব্যাপী যত ধর্মীয় উৎসব রয়েছে—তার মধ্যে 'সহরাই' বা 'বান্দনা' পর্বই অন্যতম। এই পর্ব উপলক্ষ্যে এদের 'ট্যাবু' বা সামাজিক অনুশাসন কিছুটা শিথিল হয়। ২৫শে পৌষ হতে ৩০শে পৌষ পর্যন্ত এই উৎসব চলে। সব সাঁওতাল কর্মীই এই উৎসব উপলক্ষ্যে নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসে। পূজার মন্ত্র আছে, পুরোহিত আছে কিন্তু উৎসবে এ সব গৌণ নাচগানই উৎসবের মুখ্য অঙ্গ। নাচগান ছাড়া কোন পূজা বা উৎসবের কথা এরা চিন্তা করতেই পারে না। প্রথম দিনের 'ভাঙ্গা পূজো ভগবানের নামে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত। অনুষ্ঠানের নাম 'সিনান' প্রতিটি বাড়ি হতে একসের করে চাল ও একটি করে মোরগ বা মুরগি চাঁদা নেওয়া হয়। পাড়ার সকলে মিলে পূজোর নির্দিষ্ট জায়গায় 'জাহির থানে' (শালগাছের তলায়) পূজার আয়োজন করে। সকাল প্রায় আটটা হতে চার ঘণ্টা পূজো চলে। পাড়ার সকলে মিলে যাকে পুরোহিত নির্বাচন করবে সে-ই পূজো করবে। বংশগত কোন দাবি নাই। পুরোহিতকে সাধারণতঃ বাৎসরিক পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। পুরোহিতকে এই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বাঁন্দনা, মানসিংহ ও সারন পূজা করতে হয়। পূজার উপকরণ হল—আতপ চাল এক সের, এক সের আতপ চালের গুঁড়ো, সিঁন্দুর ও মোরগ মুরগী। পূজার পর পুরোহিত মুরগী কাটবে ও মাংস রান্না হবে। তারপর ৭।৮ সের পচাই মদ পূজা হবে। পূজা শেষ হলে উপস্থিত পুরুষেরা সকলে সেই মদ ভাগ করে খেয়ে মাদল ও নাগরী বাজিয়ে গান করতে করতে গ্রামে চলে যাবে। মেয়েরা পূজার প্রসাদ পাবে না—তবে বাড়িতে যা ইচ্ছা খাওয়া বাধা নাই। সন্ধ্যায় মেয়েরাও মদ খাবে মাতাল মেয়েপুরুষের দল মাদলের তালে তালে নৃত্যগীত করবে প্রাঙ্গ গৃহে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও মাঝেমাঝে এই নৃত্যগীতে অংশগ্রহণ করে। মাদল, বাঁশি আর নাগরা বাজায় পুরুষেরা—গান সুরু করে মেয়েরা—

আশ্বিনী যায়তে কার্তিকা আওয়াই গো।
কাঁন্দাসাগে মুড়োরিয়া গাই আজ যরে॥

তুয়ে শিযে মাখাব তেলেরে সিন্দুর,
মাখাইত কুজুরিয়া তেল আজ যরে।

[আশ্বিন গেছে, কার্তিক এল। সাঁওতালদের বাঁধনা পর্ব সুরু হল। গোয়ালের গরু বাছুরের মাথায় তেল সিঁন্দুর দিতে হয় কিন্তু গরু-বাছুর সরষের তেল ও সিঁন্দুর লাগাতে অনিচ্ছুক। সেইজন্য গরুগুলি অনুরোধ করছে—বনে কচুরী নামে যে ফল আছে—তার তেল মাখাতে হবে]

আবার সেই উদ্দাম নৃত্য বিশ্বসংসার সব ভুলে গিয়ে সুধু নৃত্যগীতে কেন্দ্রীভূত ক্ষুদ্র এই জগৎ। সঙ্গীত সুরু হয়—

গাই মা চরায় বাবু শ্রীবৃন্দাবনে হো　　গাই মা আওয়াই বাবু বেলা মা ডুবি গেল
মহিষিনী চরায় গাঁগা পার আজ যরে　　মহিষিনী আওয়াই, আধা রাত আজ হে।

[পূর্বকালে আদিবাসীরা বৃন্দাবনে গরু চরাতো এবং আরপারে মহিষ চরাতো। আজ বাঁধনা পর্ব। বৃন্দাবন হতে গরুগুলি বাড়ি ফিরতে সূর্য ডুবুডুবু হয়েছে—আর মহিষগুলি ফিরতে প্রায় মধ্যরাত্র।]

দ্বিতীয় দিনে 'গোয়াল পুজো'। সকাল প্রায় আটটার সময় নিজের নিজের বাড়িতে একঘণ্টা ধরে পূজা করে। পূজার উপকরণ প্রথম দিনের মতই। মুরগী বলিদানের পর সেই মুরগীর মাংস ও মদ খেয়ে সারা দিনরাত সুধু নাচ আর গান—যতক্ষণ না ক্লান্ত হয় ততক্ষণ চলে। এইদিন যে গান হয় তার একটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল—

হোলা দলে উঁসিনা তল মাদল পুকুরিরে
তিহিন দলে বুঙা না দারা হারা
বাঙলা ওড়ারে।

(বাঁধা পুকুরে স্নান করলাম। কাল বাঙলা ঘরে গোয়াল পুজো করবো)

তৃতীয় দিনে 'গরু খোঁটা' পূজা। সকালের দিকে বাড়ি বাড়ি সকলে নাচগান করবে। বিকালের দিকে বাড়ির প্রবেশ মুখে দরজার কাছে বাঁশের বা কাঠের দুটি শক্ত খুঁটি পোঁতা হয়। দেড় হাত হ'তে দু'হাত গর্ত করা হয়। সেই খুঁটিকে কেন্দ্র করে চারিধারে গোবর জল দিয়ে ধুয়ে মুছে নেয়। তারপর আতপ চালের গুঁড়ি দিয়ে সেখানে আলপনা দেয়। গোরু মহিষের শিং-এ ও কপালে তেল সিঁন্দুর মাখিয়ে কয়েকটি চালের পিঠে তার কপালে বুলিয়ে শিং-এ বেঁধে রাখা হয়। নাগরা আর লাঠি হাতে পুরুষের দল পাড়ায় পাড়ায় আনন্দ করে সেই পিঠে ছিঁড়ে খাবে। সারা রাত নাচগান চলে। নেশায় উন্মাদনায় গেয়ে উঠে—

গৈহ যেমে ঘুণ্টেরিয়া
দাদা ইয়া কাড়া যেম ঘুণ্টেরিয়া
দাদা ইয়া দিলেম পিড়া দারা কোকানা।

[দুনিয়ার লোক দেখবে-গোরু খুঁটো দিবি-না-কাঁড়া (মহিষ) খুঁটো দিবি]

চতুর্থ দিন কোন পূজা নাই। শুধু গ্রাম প্রদক্ষিণ করে নাচগান। প্রতি বাড়ী হ'তে ৪ পাই করে ধান সংগ্রহ করা হয়। সেই সংগৃহীত ধান কোন বাড়িতে জমা রাখা হয় ও মানসিংহ পূজার

সময় গ্রামের সকলে রান্না করে খায়।

পঞ্চম দিন পুকুর হ'তে মাছ ধরে এনে খাওয়া হয় নিজের নিজের বাড়িতে।

ষষ্ঠ দিনে বনঝাড়া বা শিকার—ভোর পাঁচটায় গ্রামের পুরুষেরা নাগরা, তীরধনুক, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে বনে জঙ্গলে শিকারে বেড়িয়ে যায়। শিকার সহ বৈকালে সকলেই গ্রামে ফিরে আসে। শিকারে যা পাওয়া যায়—তা কাটার পর সকলকে সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। গ্রামের প্রধানের কাছে তৈরি একটিমাত্র চালের পিঠে থাকে। সেই পিঠেটিকে গ্রামের প্রান্তে একটি বাঁশের খুঁটির মাথায় রাখা হয়। তারপর প্রথমে পুরোহিত ও একজন একজন করে গ্রামবাসী সেই পিঠে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়বে। যার তীরে সেই পিঠে পড়ে যায়—তারই জয়। সেই জয়ী ব্যক্তিটিকে কাঁধে নিয়ে সকলে আনন্দ করবে। জয়ী ব্যক্তি মেয়েদের ছাড়া সকলকেই প্রণাম করবে। লাঠি নাগরা নিয়ে খেলাধূলা হবে। গ্রামের ভেতরে এসে প্রধান সকলকে মুড়ি, চিঁড়ে মদ ইত্যাদি খাওয়াবে। তারপর প্রতি বাড়ীতে আবার নাচগান শুরু হ'বে। আদিবাসি সাঁওতালের জীবনে পৌষের এই একটি সপ্তাহ বছরের অমূল্য সম্পদ। সব রকমের গতানুগতিকতার হাত হ'তে মুক্তি পায়-দুরন্ত সমাজ জীবন। বাঁধন হারা মাতাল মন গাইতে থাকে—

> অহায় পুরুব ঘনচোং অহাপোছিম ঘনচোং
> অহায় হয় মা লে॰গতে অহায় বাসদো সেটের এন্।

বাঁধনা পর্ব্ব পুর্ব্ব কি পশ্চিম দিক হ'তে আসে—কেউ অনুমান করতে পারে না। এই পর্ব্ব পূর্ব্ব পশ্চিম দিক হ'তে না এসে সকল দিকের মধ্যদিক হ'তে এসে উপস্থিত হয়েছে।

> এঁগা আপুং আতোরে তুমদা টামাক্ সাডে কানা
> বাবা গো
> অনা আঁজম জিউডী লোঃ কানা
> ইগাং বাড়ে তাঁহেন খান-গেল খজে খজেং আঃ
> বারেং বাড়ে তাহে কান গেল বার ক্রোশ বানিজ আগুয়াঃ। *

পিতামাতার গ্রামে আজ বাঁধনা পর্ব্ব—তাই শ্বশুর বাড়ীতে বিবাহিতা মেয়ের মন খারাপ করে বলছে: আমার যদি নিজের ভাই থাকতো—তা'হলে এই পর্ব্ব উপলক্ষ্যে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করতে পারতো। এখানে আমার কোন আত্মীয়স্বজন নাই

আদিম 'ট্রাইবের' সামাজিক ও ধর্ম্মীয় উৎসবে কৃষি ও পশুপালন নির্ভরতা অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করেছে। কৃষিকার্য্যের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত 'ডাঙ্গা', গরু ও গোয়াল তাই পূজ্য দেবতারূপে গণ্য হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে—উৎসব হ'তে তাদের সযত্নরক্ষিত আদিম বৈশিষ্ট্য সেই পশুশিকার বাদ পড়ে নি। এই শিকার চলে যৌথভাবে-শিকারলব্ধ সম্পত্তি বণ্টিত হয় সকলের মাঝে সমানভাবে। আজও কৃতী শিকারীর সম্মান দেওয়া হয়—আদিম প্রক্রিয়ায়। জীবন রক্ষার প্রয়োজনে—জীবিকার তাগিদে সারা বছরের নিরলস পরিশ্রম—এ ক'দিনের উৎসবের আনন্দে তার রসদটুকু সংগ্রহ করে নেয়—শুধু নাচ আর গান।

---

* গানগুলি হেবড়া পাহাড়ীর সিধু হাঁসদার কাছে সংগৃহীত

আদিবাসীদের পর্ব্ব ও লোকসংগীত

'সহরাহ' বা বাঁধনা পর্ব্ব সাঁওতালদের বছরের শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব। এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে তাদের যে পূজার্চ্চনা চলে প্রতিটির সাথেই জড়িয়ে আছে নৃত্যগীত।

বছরের প্রথমেই আষাঢ় মাসে বোঙ্গা পূজা হয়—এই উপলক্ষ্যে গান চলে—

তাঁহাবি তা নাহনা তার না
তাঁহারি তা নানা হো
আগে তো বুহনালাং নিড়িরে গুন্দলি
তাঁহার পিছু বুহনালাং রাইমনি ধান

অথবা— বনে কাট কাটলি
নাঙ্গল বোনালি।
চাষ করবি
কি ধান ফেলাবি।
এগুতে (১) ফিলাবো
এড়িরে গুন্দলি।
তার পিছু ফিলাবো
রাইমনি ধান॥
ছোলায় লো খামার
ধান হ'লো বনে ঝাড়ে।
কামারে লোহা গলায় রে॥

মাঘে যে মাঘি উৎসব হয় তার গান। পঁচিশ থেকে ত্রিশে মাঘের মধ্যে 'মানসিং পুজো' উপলক্ষ্যে এই উৎসব—

রাম কাঁন্দে বনে বনে
লক্ষণ কাঁন্দে গাঁয়ে
রামলক্ষণ গিলেই বানে বা
লক্ষণকে মারে গো
রামলক্ষণ গিলেই বানে বা।

পরের ফাল্গুন মাসেই আবার এসে পড়ে সারুল উৎসব মাদলের তালে তালে সাঁওতাল পল্লী হ'তে গান ভেসে আসে—দোলপূর্ণিমার দুদিন পরে তিনদিন ধরে চলে এই উৎসব—

চান্দ উঠে ঝিকি মিকি
সুরুজ উঠে জ্বালা
রাম বিন্দেরে মরা ঘরে
আলা আন্দারে
তেল নাই রে-বাতি নাই; মরা ঘরে
আলা আন্দারে।

'জাহির থানে' ঘর করে পূজা করে। গানই আচার গানই মন্ত্র।

তিহিং দ নাইকিং দ উকা ঘাট রে
হুম কানা হো
তোকা ঘাটে রে নাড়কা কানা হে।
তিহিং দ নাইকিং দ নিরাল ঘাটে রে
উম্ কানা হো
যত ঘাটয়ে নাড়কা বুহ্‌ইলেন

আজকে স্নান করলাম—কালকে পূজা করবো

তিহিংদ নাইকিং দ চিতিতে মু নিনাহ
তিহিংদ নাইকিং দ চিতিতে নাড়কা যেন
তিহিংদ নাইকিং দ তোয়াতে মু নিনাহ
তিহিংদ নাইকিং দ তাগিতে নাড়কা
বুহই লিনাহ্

আজকে দুধে স্নান করলো—আবার দই-এ মাথা ঘষলো।

বছরের শেষ হয় চৈত্রমাসের চড়ক উৎসবের মাঝে—এখানেও গান—

সাহার দিলাম গোবর দিলাম
কি ধান পুঁত্‌লি
কি ধান পুঁতে লালে লা
মা বল্ হে রেয়মনি ধান রে
বাব্‌হা বলে রৌলো ধান
কেরি কান্দার ধান।

বিশেষ লক্ষ্যণীয় এই সঙ্গীতগুলির মধ্যে অধিকাংশেই সেই আদিম শস্যকামনা-কৃষিকার্য্যের ইতিবৃত্ত। বৈষ্ণব সঙ্গীতে যেমন 'কানু ছাড়া গীত নাই' এদেরও তেমনি প্রায় বলা চলে 'কৃষি ছাড়া গীত নাই' দুটি গানে বাংলা লোকসঙ্গীতে অখণ্ডতাসাধনে অন্যতম যোগসাধনকারী রামায়ণের প্রভাব। সীমান্তের অধিবাসী এই আদিবাসী সম্প্রদায় বাঙ্গলী জাতির সহিত সংমিশ্রণে একটি মিশ্রভাষা গড়ে তুলেছে যাকে সাঁওতালী বাঙালা বলাই ভাল। অধিকাংশ সঙ্গীতে সেই সাঁওতালী বাঙলা ভাষা প্রয়োগ করেছে। এই জাতীয় লোকসংগীতে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক কোন প্রভাব নাই কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বাঙলার লোকসংগীত আঞ্চলিক চেতনায় গ্রহণ করে নিয়েছে।

১। আগে। গানগুলি চামুবেড়ার রাতু হাঁসদার নিকট সংগৃহীত

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

পীড়া বা ভদ্র দেউল ॥

শিখর রীতির পরেই আসে আর একটি প্রাচীন রীতি পীড়া রীতির কথা। পীড়া আচ্ছাদনের আদি-রূপ যে গুপ্তযুগের মন্দির স্থাপত্যের ক্রমবিবর্তনের একটি পর্যায়ে ধরা পড়িয়াছিল সে কথা তো আগেই বলিয়া আসিয়াছি। এই আদিরূপেরই সংস্কার ও মার্জনার ফল ক্রমহ্রস্বায়মান কতগুলি চালা বা পীড়ায় গঠিত ধ্বজ-কলস-আমলক শোভিত পীড়া আচ্ছাদন। বাংলাদেশের মন্দির-স্থাপত্যের ইতিহাসে এই সুপ্রাচীন রীতিটির স্থান কিন্তু অত্যন্ত অল্প। ভদ্র রীতির প্রচলন, বোধহয় বাংলাদেশে কখনও ব্যাপক হইয়া উঠিতে পারে নাই। যেটুকুও বা হইয়াছিল সে সম্পর্কেও উপাদানের বিশেষ অভাব। রীতি হিসাবে পীড়া মন্দিরের চর্চা ও তাহাকে লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত কিছু পরিমাণে হইয়াছিল কিন্তু ঐ আমলের একটি মন্দিরও আর আজ দৃষ্টিগোচর নহে। বিলুপ্ত মন্দিরগুলির পরিচয় ধরিয়া রাখিয়াছে পুঁথির উপরে অঙ্কিত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মন্দিরের চিত্র আর প্রতিমা-ফলকে সাধারণভাবে উৎকীর্ণ পীড়া মন্দিরের কয়েকটি প্রতিকৃতি। পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে যে কয়েকটি পীড়া মন্দির নির্মিত হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যাও নগণ্য। বাংলা দেশে পীড়া মন্দিরের ইতিবৃত্ত রচনায় এই সামান্য উপাদান মাত্র সম্বল।

বাস-রিলিফে দেবমূর্তি রচনা করিবার সময় মূর্তিটিকে একটি মন্দিরের প্রতিকৃতির মধ্যে স্থাপন করা প্রাচীন বাংলায় একটি সুপ্রচলিত প্রথা। এমনি কতকগুলি মূর্তির অবস্থান পীড়া দেউলের প্রতিকৃতির মধ্যে। কয়েকটি পুঁথিতেও অধুনা-বিলুপ্ত কয়েকটি পীড়া মন্দিরের প্রতিকৃতি চিত্রিত আছে দেখিতে পাই। প্রাক মুসলমান যুগে বাংলা পীড়া দেউল যে নির্মিত হইত এই প্রতিকৃতিগুলিই তাহার প্রমাণ। প্রতিকৃতির অভাব না থাকিলেই স্থাপত্যগত দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব দেখিয়া মনে হয় পীড়া দেউলের চর্চা প্রাচীন বাংলায় বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই—সীমাবদ্ধ-ভাবেই হইয়াছিল। পীড়া দেউলের রূপরেখা বাংলার ভাস্করদের মনোহরণ করিলেও স্থপতির চিত্ত জয় করিতে পারে নাই—পীড়া দেউল নির্মাণের কোন শক্তিশালী ঐতিহ্যও এখানে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এই ধারণারই সমর্থন মিলিতেছে মুসলমান যুগে নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে। ত্রয়োদশ শতক হইতে উনবিংশ শতক এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে নির্মিত পীড়া মন্দিরের সংখ্যা মাত্র ষোলটি। ওড়িশার পীড়া দেউলের অনুপ্রেরণাতেই ই[illegible]র জন্ম, অবস্থানও ওড়িশা প্রভাবিত অঞ্চলে।

সেন আমলের শেষ পর্যন্ত পীড়া দেউলের চর্চা যে কিছু হইয়াছিল তাহার প্রমাণাভাসের কথা একটু আগেই বলিয়া আসিয়াছি। ঢাকা জেলার অশ্রকপুরে প্রাপ্ত সপ্তম শতকীয় একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত স্তূপের গাত্রে কয়েকটি পীড়া মন্দিরের প্রতিকৃতির মধ্যে এই রীতির আদি রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্রমহ্রস্বায়মান দুইটি ঢালু চালা (ওড়িশায় ইহাই পীড়া নামে পরিচিত), মধ্যে একটি নিম্নায়ত খাঁজ। উপরের চালাটির শীর্ষে সুন্দর একটি চূড়াকে ধারণ করিয়া একটি অণ্ড। ক্রমে

পীডার সংখ্যা একটি করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে—গণ্ডীও হইয়াছে দীর্ঘতর। সর্বশেষ পীডার উপর সুবৃহৎ আমলক শিলা ধারণ করিয়া একটি বেকী। এই রূপরেখাই ধরা পড়িয়াছে দিনাজপুর জেলার হিলিতে প্রাপ্ত কল্যাণসুন্দর মূর্তিতে, চব্বিশ পরগণা-কুলদিয়া ও রাজসাহী-বরিয়ার সূর্যমূর্তির ফলকে, ঢাকা-বিক্রমপুরের রত্নসম্ভব মূর্তিফলকে, দিনাজপুর জেলার বিরলের উমা-মহেশ্বরের প্রতিমায় ও কর্পূরসিং গ্রামে প্রাপ্ত একটি মূর্তি ফলকের ভগ্নাংশে এবং রাজসাহী-কুমারপুরের একটি সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর উৎকীর্ণ প্রতিকৃতিতে। সমৃদ্ধ পীডা গণ্ডীর আরও বৈচিত্র ঘটিয়াছে গণ্ডী-শীর্ষে পরিমিত আকারের স্তূপ ও শিখর মন্দির সংযোগে। ক্রমহ্রস্বায়মান চালার সমাবেশে গঠিত পীড়া গণ্ডীর শীর্ষে পরবর্তী কালের দীর্ঘায়ত স্তূপ ও শিখর সৌধটির বহিরে'খাকে করিয়া তোলে আরও স্পষ্ট ও গতিশীল। স্তূপশীর্ষ পীড়া দেউলের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপির উপর অঙ্কিত নালেন্দ্র নামক স্থানের লোকনাথ মন্দিরের প্রতিকৃতিতে। শিখরশীর্ষ পীডা দেউলের প্রতিকৃতি রহিয়াছে ঢাকা জেলার মহাকালি গ্রাম হইতে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তির ফলকে ও পুণ্ড্রবর্ধনের বুদ্ধ মন্দিরের পাণ্ডুলিপি চিত্রে।

প্রতিমা কলক ও পাণ্ডুলিপি চিত্রের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া History of Bengal-Vol-I (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত) এর Architecture অংশে প্রাচীন বাংলার দেউলের ক্রম-বিবর্তনের ধারা নির্দেশ করা হইয়াছে। এ প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ অনেকটাই আছে। প্রতিমা ফলকে ও চিত্রে পীডা মন্দিরের বৈচিত্রসমৃদ্ধ যে রূপরেখা ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে মন্দিরের আকৃতি সম্পর্কে একটা আভাস তাহাতে পাওয়া গেলেও অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে খোদিত প্রতিকৃতিগুলির মূল্য স্থাপত্যের রূপ বিচারে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মন্দিরের আকৃতিকে মূর্তিফলকের অলঙ্করণের বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করিতে গিয়া স্থাপত্যের সমস্যা উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয় নাই—ভাস্কর্যের সীমার মধ্যেই তাহাকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। উপরন্তু পাল-সেন যুগের এই মন্দিরাকৃতিগুলিতে abstructionও হইয়াছে যথেষ্ট কিন্তু প্রতিকৃতি যখন মন্দিরের মূল মন্দিরের সহিত তাহার সাদৃশ্য একটা থাকিবেই। তবে সাদৃশ্য যে কতটুকু মূল মন্দিরগুলি আজ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বলিয়া তাহা বুঝিবার কোন উপায়ই নাই। উপরন্তু অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া স্থাপত্যের বিচারে ইহাদের মূল্য আরও সঙ্কুচিত হইয়া আসে। এই দিক দিয়া ভাবিলে মনে হয় প্রতিকৃতিগুলির সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন যুগের পীড়া রীতির বিবর্তনের ধারা খুঁজিতে যাওয়া উচিত হইবে না।

ত্রয়োদশ শতকের পর বাংলাদেশে যে সামান্য কয়টি পীড়া মন্দির নির্মিত হইয়াছিল তাহার প্রেরণা-স্থান ওড়িশা। ওড়িশায় পীড়া দেউল প্রকৃতপক্ষে পার্শ্বমন্দির—মূল মন্দির শিখর দেউলের সম্মুখে তাহার স্থাপনা; দেবতা ইহার মধ্যে বাস করেন না। ওড়িশার পূর্ণায়ত মন্দির-সংস্থানে মুল রেখ দেউলের সম্মুখে ক্রমান্বয়ে তিনটি পীডা দেউলের অবস্থান। মন্দিরে প্রবেশ করিতে গেলে সর্বপ্রথমেই পড়িবে ভোগমণ্ডপ। এইটিকে অতিক্রম করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে নাটমণ্ডপে। নাটমণ্ডপের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইলে জগমোহন—মূল মন্দিরে গম্ভীরায় প্রবেশের পূর্বে ইহাই সর্বশেষ কক্ষ। বাংলার ওড়িশা প্রভাবিত অঞ্চলে মন্দির সংস্থানের বিস্তার ওড়িশার পদ্ধতি অবলম্বন

করিয়াই হইয়াছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতেছি একটি পীড়া মণ্ডপেই তাহার শেষ। ইহার পরেও কক্ষ সংযোজিত হইলে তাহা অন্য রীতিতে নির্ম্মিত। একমাত্র ব্যতিক্রম শুধু মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী গ্রামের সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির। মন্দিরটির জগমোহন ও বারদুয়ারী-নাটমণ্ডপ উভয়েরই আচ্ছাদন পীড়া রীতির। সর্ব্বমঙ্গলার মূল মন্দিরটিও পীড়া দেউল। পীড় রীতিতে মূলমন্দিরের নির্ম্মাণ আরও দুইটি ক্ষেত্রে হইয়াছে। একটি কেশিয়াড়ীর কাশীশ্বর শিবের, অপরটি মেদিনীপুরের দাঁতন গ্রামে, অধিষ্ঠাতা দেবতা হইলেন শ্যামলেশ্বর শিব।

পীড়া দেউলের সংযোগে মন্দির সংস্থানের বিস্তৃতি মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই অঞ্চলের বাহিরে মূল মন্দিরের সমতলে তাহার সহিত সংযুক্ত অবস্থায় মণ্ডপ কয়েকক্ষেত্রে স্থাপিত হয়ত হইয়াছে কিন্তু তাহার একটিও পীড়া রীতির নহে। বস্তুত, যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বাহিরে পীড়া রীতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উল্লিখিত অঞ্চলের পীড়া রীতি মূল বিস্তার করিতে পারে নাই, বাহির হইতে আসা অনভ্যস্ত রীতিই থাকিয়া গিয়াছে। বাংলাদেশের মধ্যযুগে পীড়া দেউলের ইতিহাস তাই ক্রমবিবর্তনের ধারায় বদ্ধ নহে, বিস্তারও তাহার সংক্ষিপ্ত।

পীড়া রীতির বর্তমান দৃষ্টান্তগুলি লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিবার আগে এই রীতির বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচয়টা জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। শিখর দেউলের মত এক্ষেত্রেও নির্ভর ওড়িশার শিল্পশাস্ত্রের উপরেই। ওড়িশার শিল্পশাস্ত্রের বিধান ও ব্যবহারিক নিয়ম অনুসারে ভদ্র দেউলের অবস্থান রেখ দেউলের সম্মুখে। মন্দির সংস্থানের এই বিন্যাসের ফলেই ভদ্র বা পীড়া দেউলের অপর নাম মুখসালি। রেখ দেউল ও ভদ্র দেউলের সম্পর্ক নাকি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, স্বামী-স্ত্রীর মতই। উভয়ের সংযোগস্থলের ওড়িয়া নামও গঁইঠিআল অর্থাৎ বিবাহের সময় বর-বধূর বস্ত্রের বন্ধন-গ্রন্থি। রেখ দেউলের পিষ্ট অপেক্ষা—ভদ্র দেউলের পিষ্ট দৈর্ঘ্যেও প্রস্থে উভয়তই বৃহত্তর, ভদ্র দেউলের গর্ভগৃহও রেখ দেউল অপেক্ষা দীর্ঘতর। উচ্চতায় কিন্তু ভদ্র দেউলের বিস্তার অনেক কম। ভদ্র দেউলের বার পশ্চাদস্থিত রেখ দেউলের বারের তিন চতুর্থাংশে আসিয়া শেষ হইয়া যাইবে, এখান হইতে শুরু হইবে পীড়া গণ্ডীর ঊর্দ্ধযাত্রা। ক্রমহ্রস্বায়মান কতগুলি চালা বা পীড়া। পর পর সাজাইয়া গণ্ডীটির রচনা। একটি অত্যন্ত নীচু দেয়ালে পীড়াগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন—এই দেওয়ালই হইল কন্টি। ক্রমহ্রস্বায়মান পীড়ায় গঠিত গণ্ডীটির আকৃতি পিরামিডের মত। প্রতিটি উপরস্থিত পীড়া নীচেরটি অপেক্ষা অনেকটাই হ্রস্বতর। হ্রস্বায়নের যে বিধি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে গণ্ডীর বহিরেখা তাহার পাদমূলে গিয়া যে কোণ রচনা করিবে তাহার বিস্তৃতি হইবে ৪৫ ডিগ্রী অথবা কিছুটা কম সর্ব্বোচ্চ পীড়াটির আয়তন সর্ব্বনিম্ন পীড়াটির অর্দ্ধেক। পীড়া দেউলের উন্নততর রূপে দেখা যায় পীড়াগুলি দুই বা ততোধিক পোতলের মধ্যে সংবদ্ধ। পাঁচ অথবা ততোধিক পীড়া একত্রিত করিয়া একটি পোতলের গঠন। দুইটি পোতলের মাঝখানে থাকে একটি লম্বমান দেওয়াল, ইহারও পরিচয় কন্টি নামে। পীড় দেউলের মস্তক রচনায় যে অংশগুলির ব্যবহার সংখ্যায় তাহারা শিখরে মন্দিরের মস্তক অপেক্ষা অধিক। গণ্ডীর সর্ব্বোচ্চ স্তর হইতে প্রথমে উঠিয়া আসে একটি বেকী। ইহার উপরে ঘণ্টাকৃতি অংশটির নামও ঘণ্টা। ঘণ্টার উপর আবার একটি

বেকীর অবস্থান. ইহাই আমলকশিলা ধারণ করিয়া আছে। আমলকের উপর পর পর উঠিয়া গিয়াছে খপুরি, কলস ও আয়ুধ। দৃষ্টান্তে দেখা যায় ক্রমহ্রস্বায়মান মস্তকের উপর্যুপরি অংশগুলির ব্যাস এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে পিরামিডাকৃতি গণ্ডীর বহিরেখাকে তাহার আপন গতিপথে আয়ুধের শীর্ষবিন্দু অবধি বিনা বাধায় টানিয়া তোলা সম্ভব।

ওড়িশার প্রত্যক্ষ প্রভাবে নির্মিত হইলেও মেদিনীপুর বাঁকুড়া পুরুলিয়া অঞ্চলের একটি পীড়া মন্দিরেও কিন্তু ওড়িশার সমৃদ্ধ পীড়া আচ্ছাদনের বৈচিত্র্যময় রূপরেখা ধরা পড়ে নাই। সবগুলি পীড়া দেউলই ওড়িশা পীড়ার সরলীকৃত ও বিকৃত রূপ। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত ছাড়া সর্ব্বত্রই পীড়া দীর্ঘায়তও ভারী, কণ্টি বিভাগও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। কেশিয়ারীর সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির ও জগমোহন, এগরার মহাদেব মন্দিরের জগমোহন ও দাঁতনের শ্যামলেশ্বর মন্দিরে পীড়ার আকৃতি ক্ষীণ বটে কিন্তু পোতলে সংবদ্ধ নহে; কণ্টি বিভক্ত পীড়ার ছড় টানা উঠিয়া গিয়াছে। পীড়ার আকৃতি অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করিলে দীর্ঘায়ত পীড়ায় রচিত মেদিনীপুর-চন্দ্রকোনার রঘুনাথজিউ মন্দিরের জগমোহন, মেদিনীপুর-গড়বেতার সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরের মাঝমন্দির, মেদিনীপুর-কুঁয়োই গ্রামের কামেশ্বর মন্দিরের জগমোহন, পুরুলিয়া তেলকুপির একটি মন্দিরের মহামণ্ডপ, বাঁকুড়া এক্তেশ্বর গ্রামের এক্তেশ্বর মন্দির, বাঁকুড়া-বিক্রমপুরের গোপাল মন্দিরের মণ্ডপ, বাঁকুড়া-কোড়ারপুর গ্রামের শিবমন্দিরের মণ্ডপ, মেদিনীপুর কেশিয়ারী গ্রামের কাশীশ্বর শিবের মূল মন্দির ও জগমোহন, ঐ গ্রামের সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরের বারদুয়ারী নাটমণ্ডপ একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর একটি শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে মেদিনীপুর-কাঁথি অঞ্চলের উপর কথিত মন্দিরগুলি।

চন্দ্রকোণা সহরের ঠাকুরবাড়ী অঞ্চলে রঘুনাথ জিউ মন্দিরের জগমোহনটির আচ্ছাদন চারিটি পীড়ায় গঠিত। দীর্ঘায়িত পীড়াগুলি কিছুটা ঢালের সহিত উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু কণ্টির উচ্চতা অত্যন্ত অল্প, এতই যে দেখলে মনে হয় ক্রমহ্রস্বায়মান গণ্ডীর দেহে কয়েকটি নিম্নায়ত খাঁজ মাত্র। ঢালের গতি অনুসারে উপরের পীড়াগুলির প্রসার দ্রুত সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। নিম্নে বারের উচ্চতা অনুপাতে গণ্ডী আরও দীর্ঘ হওয়া উচিত কিন্তু না হইবার কারণ বোধ হয় মূল শিখর মন্দিরের সহিত সামঞ্জস্য হানির ভয়। বস্তুত পীড় দেউলের বার যদি নিয়ন্ত্রিত করা হইত তবে বার অপেক্ষা গণ্ডীকে হ্রস্ব করিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু গণ্ডীটিকে বার অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় চারিটি পীড়ায় রচিত গণ্ডীর বহিরেখার গাতভঙ্গ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। গাতভঙ্গে সাবলীলতার কারণ বোধ হয় অভগ্ন বহিরেখায় বিধৃত পীড়াগুলির পরিমিত বিন্যাস, বিক্রমপুর গ্রামের ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত গোপাল মন্দিরের মণ্ডপটির পীড়া-গণ্ডীর বিন্যাস ও রূপ পরিণাম চন্দ্রকোণার মণ্ডপটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। লঘুভার দীর্ঘায়ত পীড়াগুলির আকৃতি ও তিনটি পীড়ায় রচিত গণ্ডীর রূপরেখা চন্দ্রকোণা-মণ্ডপেরই অনুরূপ। তবে বার অংশের অনুপাতে গণ্ডীর হ্রস্বতা এখানে অনেক বেশী।

বার অপেক্ষা গণ্ডীর হ্রস্বতা চন্দ্রকোণার রঘুনাথ মন্দিরে ও বিক্রমপুরের গোপাল মন্দিরে যে অসঙ্গতি সৃষ্টি করিয়াছে একমাত্র কেশিয়ারীর সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরের বারদুয়ারী নাটমণ্ডপ ছাড়া বাংলার পীড়া দেউলের আর একটিও তাহা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে নাই। বারের অনুপাতে

গণ্ডী কতটা উচ্চ হইতে পারে এই ধারণাই সুনির্দ্দিষ্ট রূপ লাভ করিতে পারে নাই! বস্তুতঃ, পীড়া দেউল নির্ম্মাণের প্রকৃত ও মূল সূত্রটি স্থপতিদের আয়ত্বের বাহিরেই থাকিয়া গিয়াছে। পীড়া দেউলের আকৃতি হ্রস্ব হইবে এই ধারণা ছিল ঠিকই কিন্তু সে হ্রস্বতা যে সামগ্রিক রূপকল্পনা ও গঠন কৌশলের ফলশ্রুতি এ উপলব্ধি স্থান পায় নাই। হ্রস্বায়নের সবটুকু প্রচেষ্টাই হইয়াছে গণ্ডীর উপর, বার অংশ হইতে তাহাকে খর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছে। পীড়ার ঢাল তাই হইয়া উঠিয়াছে অধিক, ক্ষেত্রে বিশেষে অতিরিক্ত। ইহার সহিত আসিয়া যুক্ত হইয়াছে সঙ্কীর্ণ কটি। এই অসঙ্গতি প্রতিটি পীড়া দেউলকে করিয়া তুলিয়াছে দৃষ্টিকটু। কয়েকটি দৃষ্টান্তে গণ্ডীতো দেখিতেছি আচ্ছাদন মাত্র—মন্দির দেহের রূপরেখা রচনায় তাহার স্থান সেখানে গৌণ। এই অবস্থার নিদর্শন মিলিবে কেশিয়াড়ীর কাশীশ্বর শিব মন্দিরে ও তাহার জগমোহনে।

চন্দ্রকোণার রঘুনাথ মন্দির ও বিক্রমপুরের গোপাল মন্দিরে ক্রমহ্রস্বায়মান গণ্ডীর উপর্যুপরি পীড়াগুলি বিন্যাসে যে সঙ্গতি ও সাম্যের পরিচয় বিদ্যমান তাহারই অভাব ঘটিয়াছে কেশিয়াড়ীর কাশীশ্বর মন্দিরে, তেলকুপির মণ্ডপে ও কুঁয়াই গ্রামের কামেশ্বর শিবের মণ্ডপে। কাশীশ্বর মন্দিরের স্বল্পোচ্চ গণ্ডীতে উপরের পীড়া প্রসার নীচেরটি অপেক্ষা সঙ্কুচিত হইলেও উচ্চতায় কিন্তু উপরের পীড়াগুলি ক্রমশই বাড়িয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে বৈপরীত্য এখানেই শেষ হয় নাই। মস্তক অংশ অস্বাভাবিক দীর্ঘ—গণ্ডী অপেক্ষাও তাহার উচ্চতা অধিক-স্থূলতাও তাহার কম নহে। তেলকুপির মন্দিরটির পীড়া বিন্যাসে সুনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞানের অভাব সহজেই চোখে পড়ে। ক্রমহ্রস্বায়মান ধারায় উপরিস্থিত পীড়া দুইটি তাহাদের নিম্নস্থিত পীড়ার অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত নহে। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে উভয়তঃ বৈষম্য বিদ্যমান। বহিরেখার গতিও তাই সাবলীল হইয়া উঠিতে পারে নাই, বার বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কামেশ্বর শিব মন্দিরের তিনটি পীড়ায় রচিত গণ্ডীর ঢাল অনেক বেশী। উপরের পীড়াগুলি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে দ্রুত; এতটাই, যে সর্ব্বোচ্চ পীড়াটির প্রসার সর্ব্বনিম্নটি অপেক্ষা অনেক কম। গণ্ডীর শীর্ষদেশও প্রায় একটি বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। বেকী-আমল প্রধান মস্তকও তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

কুঁয়াই গ্রামের কামেশ্বর শিবের মণ্ডপে ও তেলকুপির মণ্ডপটিতে পীড়ার আকৃতি স্থূল, দৈর্ঘ্যও কিছুটা বেশী। গণ্ডী তাই একটু ভারী ও দীর্ঘ্য হইয়া পড়িয়াছে। গণ্ডীর এ আকৃতি অবশ্য সামগ্রিক রূপকল্পনারই ফল, উভয়ক্ষেত্রেই মন্দিরদেহ একটু ভারী করিয়া তুলিবার প্রবণতা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এই বিস্তারের সম্মিলিত পরিণাম-প্রভাব পশ্চাদবর্তী মূল শিখর মন্দিরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জন করিতে চাহিতেছে বুঝিতে অসুবিধা হয় না গড়বেতায় সর্বমঙ্গলার মাঝ মন্দিরের দেহেও এই প্রবণতা দৃষ্টিগোচর। মন্দির সংস্থানের মধ্যে শিখর মন্দির ও পীড় দেউলের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাবই বোধ করি এই অভি-নবত্বের কারণ।

গড়বেতার সর্বমঙ্গলা মন্দিরের মাঝ মন্দির, এক্তেশ্বর গ্রামের এক্তেশ্বর শিবের মন্দির ও কিভোর পুর গ্রামের শিব মন্দিরের মণ্ডপে পীড়ার সংখ্যা মাত্র দুইটি করিয়া। সর্বমঙ্গলার অতিশয় স্থূল ও দৃঢ়বদ্ধ মাঝ মন্দিরের গণ্ডী মাত্র দুইটি পীড়ায় শেষ হইয়াছে বলিয়া পীড়ার উচ্চতা অত্যধিক।

পীড়ার এই উচ্চতা সত্ত্বেও সমগ্র কক্ষটিকে আবৃত করিবার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে সুউচ্চ কন্টির। পীড়া দুইটির বিপুল বিস্তার মন্দিরদেহের স্থূলতার দ্বারা নির্দ্ধারিত। সুস্পষ্ট ঢাল, সুউচ্চ কন্টি ও বিপুলাকৃতি পীড়া সত্ত্বেও গণ্ডীর অবসান কিন্তু আকস্মিক বলিয়াই বোধ হয়। পীড় মন্দির নির্মাণের অনভিজ্ঞতার সহিত এখানে বোধহয় আরও একটি সীমাবদ্ধতা ইহার কারণ। পশ্চাদবর্তী মূল মন্দিরের আকৃতি অসঙ্গত রূপে হ্রস্ব, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পীড়া গণ্ডীকে এইভাবে শেষ করিয়া দিতে হইয়াছে। অথচ বার অংশকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় নাই। মাঝ মন্দিরের বার মূল মন্দিরের বার অপেক্ষা সামান্যই নীচু।

গড়বেতা-সর্বমঙ্গলার মাঝ মন্দিরে দেহ গঠনের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মত। ত্রিরথ আসন বিশিষ্ট কক্ষটির মধ্যবর্তী রথকটি অনেকটাই আগাইয়া আসিয়াছে। গণ্ডীতে আসিয়া নিম্ন-স্থিত পীড়ার রাহা পগ যেখানে শেষ হইয়া কন্টির পাদদেশের দিকে আগাইয়া গিয়া পাটাতনের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই উপর প্রত্যেক দিকে একটি করিয়া মস্তক। পগ প্রবাহের উপর মস্তক স্থাপন বোধকরি ওড়িশার শিল্পশাস্ত্রে কথিত নিয়মের স্মৃতি অনুসরণ করিয়া রচিত। শিল্পশাস্ত্র কথিত নিয়মের ও স্থাপত্য নিদর্শনে রাহাপগের উর্দ্ধাংশে বা উর্দ্ধাংশের একটি ভাগে থাকিবে ভদ্র মস্তকের অবস্থিতি।

গড়বেতার মাঝমন্দিরের মত একই ধরণের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার ফলে কোণ্ডারপুর গ্রামের শিব মন্দিরের পীড় দেউলটির উদ্ভব। মণ্ডপের ভিত্তি অধিষ্ঠানটিকে মূল মন্দিরের ভিত্তি অধিষ্ঠান হইতে নীচু করিয়া গড়া, বোধকরি অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি শিখরটির মণ্ডপ নামাইয়া দিলে সামঞ্জস্যের সুবিধা হইবে এই ধারণা হইতেই ইহা করা করা। ফলে মণ্ডপের বার মূল মন্দিরের বার অংশের তিন চতুর্থাংশে গিয়া শেষ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার উচ্চতা হইয়াছে সর্বাধিক। পশ্চাদবর্তী শিখর এতই হ্রস্ব যে বাংলা দেশের প্রচলিত পদ্ধতিতে গণ্ডী গঠিত হলেও শিখরের তুলনায় অসঙ্গত হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা। গণ্ডীটিকে তাই দুইটি অত্যন্ত ঢালু পীড়াতেই শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মধ্যবর্তী কন্টিও অত্যন্ত নীচু। গড়বেতায় সর্বমঙ্গলা মন্দিরের বিপুলাকৃতি পীড়া কিন্তু শিখর ও পীড়া উভয় মন্দিরের স্থূল দৃঢ়বদ্ধতা সত্ত্বেও কোণ্ডারপুরে স্থান পায় নাই। পীড়াগুলি লঘুভার, অতিরিক্ত ঢালের সহিত উঠিয়া, বারের বিস্তার অতিক্রম করিয়া, অনেকটাই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে দেখিতে সোজা ঢালের চালার মত।

পীড়ার সংখ্যা, আকৃতি ও বিন্যাসে গড়বেতা মাঝমন্দিরের সহিত একেশ্বর মন্দিরের সম্পর্কে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শুধু রাহাপগের উপরে অতিরিক্ত মস্তকের অনুপস্থিতিই একমাত্র ব্যতিক্রম। এ সাদৃশ্য [illegible]ন্তু একই প্রকারের ভাবনা-কল্পনা ও সমস্যা—সীমাবদ্ধতার ফল নহে, আকস্মিক ঘটনামাত্র। [illegible]ক্কেশ্বর মণ্ডপের বার সুউচ্চ। তাহার উপরে গণ্ডীর আকৃতি অস্বাভাবিক হ্রস্ব, বারের এক তৃতীয় অংশেরও কম। অনুপাতের এই অতি প্রকট বৈষম্য দেখিয়া মনে হয় বর্ত্তমান পীড়া গণ্ডী মন্দিরের আদি রূপের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল না। ১৮৭২-৭৩ খৃঃ বেগলার সাহেব তাঁহার রিপোর্টে অনুমান করিয়াছিলেন কোন এক সময়ে মন্দিরটির আদি গণ্ডী ভাঙ্গিয়া গেলে পুনর্নির্ম্মাণের সময় বর্ত্তমান পীড়া আচ্ছাদনটি গঠন করা হয়। আচ্ছাদন পুনর্নির্মাণের সময় তাহার আদিরূপের পরিচয় একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এ ধারণা সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। একেশ্বর মন্দিরের বারের

উচ্চতা সুউচ্চ গণ্ডী সমৃদ্ধ শিখর মন্দিরের প্রয়োজন অনুসারেই। তাহার উপর এত সংক্ষিপ্ত একটি গণ্ডী থাকিবার কথা নয়—বাংলার পীড়া মন্দিরের ধারায় নির্ম্মিত হওয়া সত্ত্বেও নয়। বেগলার তাঁহার রিপোর্টে মন্দিরটি তিনবার সংস্কার করা হইয়াছিল বলিয়াছেন। তাহার পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আরও একবার সংস্কার হইয়াছিল। এতবার সংস্কার সত্ত্বেও মন্দিরের বার অংশের মূলগত পরিবর্ত্তন যে খুব একটা সাধিত হইয়াছে এমন মনে হয় না। স্থূল ও অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ মন্দিরটির আসন ত্রিরথ। উদ্গত রথকটি গুরুভার, মন্দির দেহের গঠন অনুযায়ী স্থূল ও দৃঢ়বদ্ধ। বারের পাদদেশে পা-ভাগ উদ্গমন সমূহের দেহগত বৈশিষ্ট্যও ঐ একই, তবে কিছুটা সজীবতার স্পর্শ রহিয়াছে। বর্ত্তমান বান্ধনা রেখা বলিয়া কিছু নাই। বার-গাত্রে বৈচিত্র্যায়নের উপকরণ হইল কয়েকটি মূর্তি ও মন্দির-প্রতিকৃতি। অত্যন্ত হ্রস্ব বারের উপরে সুদীর্ঘ গণ্ডী ও মস্তক সম্বলিত মন্দির প্রতিকৃতিগুলি প্রত্যন্ত রথকসমূহের গাত্র বাহিয়া পা-ভাগের উপর হইতে বারের শেষ অবধি চলিয়া গিয়াছে। বারের অন্ত্যক্ষেত্রে বরণ্ডরেখা নাই। এক প্রস্থ খাঁজ কাটিয়া বারের অন্ত্য নির্দ্দেশ। ইহার পরেই উঠিয়াছে সংক্ষিপ্ত গণ্ডী।

একেশ্বর মন্দিরের নির্ম্মাণকাল জ্ঞাপন করিয়া লিপি নাই। ইহার উপর ক্রমাগত পুনর্গঠন ও সংস্কারের ফলে আদিরূপটাও গিয়াছে পালটাইয়া। তবুও ষোড়শ-সপ্তদশ শতকীয় মাকরা পাথরে নির্ম্মিত শিখর মন্দিরের ভাব-কল্পনা এবং পাভাগ ও গাত্র সজ্জার প্রকৃতি ও বিন্যাসের সহিত একেশ্বরের সাদৃশ্য এতই যে বর্তমান মন্দিরটিকে ঐ একই সময়ের বলিয়া বিশ্বাস হয়।

ওড়িশায় পীড়া মন্দিরের ভাব-কল্পনার সংস্কৃত রূপে পীড়ার আকৃতি হইয়াছে ক্ষীণ। ক্ষীণকায় কতগুলি পীড়াকে পোতল—সংবদ্ধ করিয়া ওড়িশার উন্নত পীডা দেউলের রূপরেখা রচিত। কেশিয়ারী গ্রামের সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির ও জগমোহন এবং কাশীশ্বর শিবের মন্দির ও জগমোহন, এগরা গ্রামের মহাদেব মন্দিরের জগমোহন এবং দাঁতনের শ্যামলেশ্বর শিবের মন্দিরে পীড়ার আকৃতি ক্ষীণ কিন্তু পীড়াগুলি পোতলসংবদ্ধ নহে—পাতলা পীড়ার ছড় টানা উঠিয়া গিয়াছে। ইহাদের গণ্ডী দেখিতেছি ভুবনেশ্বরের গৌরী মন্দিরের জগমোহনের অনুরূপ। কাঁথি মহকুমার এই নিদর্শনগুলিই দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত।

কেশিয়ারী গ্রামের সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির সংস্থানে মূল মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় জগমোহন, একটু দূরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আর একটি কক্ষ, ইহাই বারদুয়ারী-নাটমণ্ডপ। তিনটিই পীড়ারীতির নিদর্শন। পীড়ারীতিতে মূল মন্দির ও জগমোহন দেখিতেছি একমাত্র কেশিয়ারী গ্রামেই সম্ভব হইয়াছে। এই গ্রামের কাশীশ্বর শিবের মন্দিরেও ঘটনা অনুরূপ। সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির-সংস্থা[illegible] দুইটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। লিপি দুইটিই ওড়িয়া ভাষায়। প্রথমটি রহিয়াছে জগমো[illegible] প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বে। ইহার সাক্ষ্য অনুসারে—দেবী মন্দির ও জগমোহনের নির্ম্মাণকা[illegible] শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয়টির অবস্থান বারদুয়ারী-নাটমণ্ডপের সম্মুখের দেওয়[illegible] লিপিটির যেটুকু পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে তাহাতে জানা যায় ১৫৩২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬১[illegible] খৃষ্টাব্দে ইহা উৎকীর্ণ এবং সুন্দর দাস ও অর্জ্জুন মহাপাত্র নামে দুইজন পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর তত্ত্বধানে বনমালী দাস নামে স্থানীয় এক স্থপতি মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন। গম্ভীরায় দেবীর সিংহাসনে[illegible]

পার্শ্বে আর একটি লিপির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। লিপিটি পাঠে আরও কিছু নূতন সংবাদ পাওয়া যায়। কেশিয়ারী অঞ্চলের ভূমিপ শ্রীরঘুনাথ ভূঞার পুত্র শ্রীচক্রধর ভূঞা শ্রীমানসিংহ মহারাজের শুভরাজ্যে ১৫২৬ শকাব্দে (বা ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে) সর্ব্বমঙ্গলা প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিলেন। কামিলা ছিলেন রতুপাত্র। জগমোহনের লিপি ও সিংহাসন লিপি দুইটিই ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। মন্দিরটি তাই চক্রধর ভূঞার অর্থানুকুল্যে নির্ম্মিত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ওড়িশার উন্নত পীড়া দেউলের স্মৃতিতে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির ও জগমোহনের পীড়া ক্ষীণকায় হইয়াছে কিন্তু গণ্ডীর বহিরেখা উভয়ক্ষেত্রেই বাংলার চালা মন্দিরের মত বাঁকান ঢালের উপর তুলিয়া আনা। বক্রতা অবশ্য খুব বেশী নয়—সামান্যই। ওড়িশা ও বাংলার এই দুইটি রীতি লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার প্রচেষ্টা বাংলা দেশে আর কোথাও হয় নাই। বক্ররেখা পীড়া বিভক্ত গণ্ডীর উপর দিয়া পঞ্চরথ আসনের পগ প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। ক্ষীণকায় পীড়াগুলির ধারে ধারে অর্দ্ধবৃত্তাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রকল্পের সজ্জা। এই সব কিছু মিলিয়া গণ্ডীর বৈচিত্র্যায়ন পরিকল্পনা। বহিরেখার বক্রতা ভিন্ন বৈচিত্র্যায়নের এই ধারার প্রচেষ্টা দ্বিতীয় শ্রেণীর সবগুলি মন্দিরেই দৃষ্টি গোচর।

শিখর মন্দিরের আকৃতি পীড়া দেউলের উচ্চতা নির্দ্ধারিত করিয়াছে, আলোচনা প্রসঙ্গে একথা একটু আগেই বলিয়া আসিয়াছি। বর্তমান শ্রেণীতে এই সীমাবদ্ধতা রহিয়াছে এগরার মহাদেব মন্দিরের জগমোহন ও কেশিয়ারীর সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরের জগমোহনে। এগরার মহাদেব মন্দিরের জগমোহনে গণ্ডী সাতটি পীড়ায় বিভক্ত হইয়া সোজা ঢালের সহিত উঠিয়াছে কিন্তু শেষ হইয়াছে অকস্মাৎ। গড়বেতার সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরের মাঝ মন্দিরে গণ্ডীর আকস্মিক অবসান যে কারণে এখানেও দেখিতেছি তাহাই কিছুটা পরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান। কেশিয়ারীর সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরের জগমোহনে গণ্ডীর উচ্চতা মূল মন্দিরের প্রায় সমান। মস্তক অংশের উচ্চতা হ্রাস করিয়া জগমোহনকে কোনক্রমে মূল মন্দির অপেক্ষা হ্রস্ব করা হইয়াছে। দাঁতনের শ্যামলেশ্বর মন্দিরে গণ্ডীর ঢালটা একটু বেশী বহিরেখাও সাবলীল নহে, ক্রমহ্রস্বায়মান পীড়াগুলির সাহায্যে অভগ্ন বহিরেখা রচিত হয় নাই। ইহার উপরে বেকী-ঘণ্টা-আমলক-কলস-আয়ুধ সম্বলিত সুদীর্ঘ মস্তক। গণ্ডী হইতে তাহার উচ্চতা দীর্ঘতর।

পীড়া দেউলের মস্তক রচনার যে বিস্তৃত ব্যবস্থা ওড়িশার শিল্পশাস্ত্রে ও মন্দির-নিদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় বাংলাদেশে একমাত্র কাঁথি মহকুমা ভিন্ন অন্যত্র কোথাও তাহা স্থপতির চিত্তজয় করিতে [পা]রে নাই। কাঁথি অঞ্চলের অন্তত তিনটি মন্দিরে এগরার জগমোহনে ও কেশিয়ারীর সর্বমঙ্গলা সংস্থানের জগমোহন ও বারদুয়ারী নাটমণ্ডপে কিন্তু ওড়িশার পীড়া-মস্তক বিধি অনুসৃত হয় যে সব ক্ষেত্রে হইয়াছে সেখানেও কিছুটা পরিবর্তিত ভাবে, ঘণ্টাই আমলককে ধারণ [করি]য়া আছে দ্বিতীয় বেকী সর্বদাই অনুপস্থিত। কেশিয়ারীর সর্বমঙ্গলা মন্দিরে বিন্যাস একটু অভিনব। [খ]পুরির উপর আর একটি আমলক ধারণ করিয়া দ্বিতীয় বেকী। কলসের সংখ্যাও দুইটি। চন্দ্রকোণা [গ]ড়বেতা, কুঁয়াই, এগরা, কেশিয়ারী (সর্বমঙ্গলার জগমোহন ও বারদুয়ারী নাটমণ্ডপ), এক্তেশ্বর, বক্রমপুর, কোণ্ডারপুর ও তেলকুপি সর্বত্র পীড় দেউলের মস্তক অংশ বিন্যাসে ও আকারে সমসাময়িক

কালের মাকরা পাথরে নির্ম্মিত শিখর মন্দিরের মস্তকের অনুরূপ। শিখর মন্দির প্রসঙ্গে এই ধরণের মস্তকের আলোচনা হইয়া গিয়াছে নতুন করিয়া বিন্যাস ও আকৃতি সম্বন্ধে আর বলিবার কিছু নাই।

বার ও গণ্ডীর পারস্পরিক সম্পর্কে যেমন অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে গণ্ডী ও মস্তকের পারস্পরিক সম্পর্কও তেমনি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মস্তক রচনা করিবার সময় গণ্ডীর ক্রমহ্রস্বায়মান বহিরেখার গতিভঙ্গই অবলম্বন হইবে এবং ক্রমহ্রস্বায়মান মস্তকের বিভিন্ন অংশ তাহারই বন্ধনে বিধৃত থাকিবে ইহাই তো সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু রূপসৃষ্টির এমনি একটা সাধারণ নীতিও অধিকাংশ মন্দিরেই অস্বীকৃত। গণ্ডীর বহিরেখাকে তাহার স্বাভাবিক গতিপথের অনুসারে আয়ুধ পর্যন্ত বিস্তৃত করিলে মস্তকের বিভিন্ন অংশের ব্যাসের প্রসার রেখাটির বন্ধন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এ ঘটনা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর। কয়েকটি মন্দিরে আবার মস্তকের দৈর্ঘ্য গণ্ডীর উচ্চতাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এইরূপ অসঙ্গতির নিদর্শন দাঁতনের শ্যামলেশ্বর মন্দির ও কেশিয়ার'র কাশীশ্বর মন্দির।

প্রাচীন বাংলায় পীড়া দেউলের চর্চ্চা যে প্রচলিত ছিল এবং পীড়া রীতিকে অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাও যে হইয়াছিল তাহার প্রমাণাভাস আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে কিন্তু স্থাপত্যগত নিদর্শন একটিও নাই। প্রতিমা ফলক বা পুঁথিচিত্রের সাক্ষ্য হইতে বিবর্তন ধারা নির্দ্দেশ করা বা রূপ বিচার করা সঙ্গত নহে, সম্ভব বলিয়াও মনে হয় না। প্রাচীন পীড়া মন্দিরগুলির কথা তাই প্রায় অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ওড়িশার অনুকরণে নির্ম্মিত মন্দিরগুলিতে কল্পনার বিস্তার কোথাও নাই পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রচেষ্টাও বিশেষ ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে ভাবকল্পনা ও মন্দির দেহের বিবর্তনের প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। বাংলাদেশে পীড়া দেউলের আলোচনা তাই কতকগুলি মন্দিরের পৃথক পরিচিত ও বিবরণীতেই সীমাবদ্ধ—ইহার বেশী কিছু বলিবার কোন সুযোগ নাই।

কাব্যনাটক প্রসংগ

জ্ঞানী জনে বলেছেন, আবেগ প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম কবিতা। আধুনিক কবিরাও অনেকটা একই কথা বলেন। জীবনের সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশে নাটক যে সর্বোত্তম মাধ্যম এ তত্ত্বও সর্বজন স্বীকৃত। এমন অবস্থায় কাব্য নাটক যে কালোত্তর সৃষ্টিতে সবচেয়ে সার্থক হবে, এ সম্বন্ধেও দ্বিমতের অবকাশ নেই। পূর্ব পূর্ব যুগের নানাদেশের মহাকবিরা যে সফল নাট্যকারও ছিলেন, একথাও ত সর্বজনবিদিত। দৃষ্টান্ত উল্লেখ বাহুল্য মনে হলেও সেকসপীয়ার, গ্যেটে, কালিদাসের নাম এ প্রসংগে তোলা যেতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু ইদানীং পশ্চিমী জগতে কাব্য নাট্যের যে পুনরুত্থান ঘটেছে—ইলিয়ট, লোর্কা, ভাইলাওটমাস, ক্রিস্টোফার ফ্রাই, ব্রেগুা ও বেহাত প্রমুখের রচনাবলী থেকে তার পরিচয় এদেশের কবিরা ভাল ভাবেই পেয়েছেন—আর তারও পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় লেখা কাব্য নাটকের সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করা নিশ্চয় অসমীচিন হয় নি। কিন্তু হা হতোস্মি! বাংলা কাব্য নাটকের রূপ পুরোপুরি মরশুমী টবের ফুল হয়েই রইল।

তার প্রথম ও প্রধান কারণ দৈনন্দিন জীবনের এতরকম সমস্যা তথা সংকট বর্তমানকালের কবি মনে বোধহয় বিশেষ দাগ কাটে না। নিয়মিতভাবে আধুনিক বাংলা কবিতা পড়লে, এই ধারণাই বদ্ধমূল হবে যে নর-নারীর বিরহ-মিলনের সামান্য কথা ছাড়া কবিদের উপপাদ্য আর কিছু নেই। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম যে দেখা যায় না এমন নয় কিন্তু তা সম্পূর্ণতঃ আকস্মিক। হয়ত একটা উপলক্ষ জুটল (দৃষ্টান্ত স্বরূপ খাদ্য আন্দোলন বা ভিয়েতনামের কথা বলা যায়) অমনি গরম গরম কিছু কথা সাজিয়ে উপস্থিত করা হল। কিন্তু তা এত সাময়িক যে কাগজের ওপরে কালি শুকাবার আগেই কবি তাঁর উপস্থিত, অনুপস্থিত বা কল্পনাশ্রয়ী প্রেমিকার দেহ বর্ণনা দৈহিক মিলন অথবা তার অভাব বর্ণনায় ব্যস্ত। কোন কোন কবির কবিতা বেশ একটা মিষ্টত্বের স্বাদবাদী কিন্তু তারও মৌলতত্ত্ব এক রোম্যান্টিক ভাবুলতার সামান্য অভিব্যক্তি।

আজকের দিনে পুরোপুরি অলংকার শাস্ত্রানুগ রচনা প্রত্যাশা করা যায় না। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু পরিবর্তন আশা করা যায় কিন্তু তা প্রধানতঃ বহিরংগের। মানুষের মতের যা স্থায়ী ভাব, যথা রতি, শোক, ক্রোধ, বিস্ময় ইত্যাদি, তাত আর বদলায় নি। এমন কি ব্যভিচারী ভাবও আজ পর্যন্ত একই আছে। এখন এই সব স্থায়ী ভাবকে কি ভাবে বিভাব বা অনুভাবে রূপান্তরিত করা যায়, প্রচেষ্টার রূপান্তর সেখানেই হবার কথা। প্রকৃত প্রস্তাবে বিভাব বা অনুভাবকে যথাযথ রূপায়ণের প্রচেষ্টা এত অল্প যে, নাটকীয়তা দানা বাঁধতেই পারে না। উপরন্তু ইদানীং কাব্যনাট্য পূর্ণাংগ নাটক হয় না বললে, অত্যুক্তি করা হয় না। ব্যায়োগেরই

প্রচলন আছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে খণ্ডিত ভাবের প্রাবল্য।

আধুনিক একাংকিকায় যে অমোঘ দ্রুতি দেখা যায়, কাব্য নাটকে কিন্তু তা দেখা যাচ্ছেনা। কবিরা মনোবিকলনের কথা বলে থাকেন কিন্তু যে ক'টি কাব্য নাটক আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে, তাদের মধ্যে সুষ্ঠু মনোবিকলনের চিহ্নও দেখিনি।

কবিদের একটা যুক্তিই প্রায়ই শুনি, তাঁরা কবিতায় নাটক লিখছেন না নাটকাকারে কাব্য রচনা করেছেন। যাঁরা নাটক ভালবাসেন তাঁরা অবশ্য আপত্তি জানাবেন, যে নামেই অভিহিত করা হকনা কেন, নাটকের প্রধান কথা তার দৃশ্যগ্রাহ্যরূপ, আলংকারিকরা তাই নাটককে দৃশ্য কাব্য বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আধুনিক কাব্যনাট্যে দৃশ্যের দিকটা অনেকাংশে উপেক্ষিত। এই উপেক্ষায় দু'টি কারণ, প্রথমতঃ কবিদের নাট্যমঞ্চের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকা ও পশ্চিমী প্রভাব।

আমাদের দেশে নাট্যমঞ্চের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ থাকাটা উচ্ছন্নে যাবার সিংহদ্বার হিসেবে এত দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত যে, আজকে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তন ঘটলেও সে মনোভাব বদলায় নি। কাজেই মঞ্চের সুবিধা-অসুবিধা বিচার করে নাটক রচনা করা আর হয়ে ওঠে না।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সর্বগ্রাসী পশ্চিমী প্রভাব চিরাচরিত প্রথাসিদ্ধ রীতিকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। পশ্চিমী প্রভাব ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায়, এ প্রভাব পুরোপুরি পরিবেশানুগ নয়। আর নাটককে পরিবেশানুগ করতে না পারলে তার মূল্য বহুল পরিমাণে হ্রাস পেতে বাধ্য।

আজকের কাব্যনাটকের মূল্যও তাই অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অবশ্য কবিকুলের প্রতিবাদমুখর হবার সমূহ সম্ভাবনা। তাই প্রাচীন ও আধুনিক যুগের কয়েকটি কাব্যনাটকের দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করে আমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি।

প্রথমে পুরাতন নাট্যকারদের কথা প্রসংগে চারজনের নাম উল্লেখ করব পরে নতুন কবিদের চারজনের নাম করব।

প্রবীণদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যকার খ্যাতি কবি খ্যাতির চেয়ে অধিক, একথা সর্বদা স্বীকৃত। তা সত্ত্বেও এঁদের কবিতায় গাঁথা নাটকে কাব্য শক্তির অভাব আছে, একথা বলা চলে না। গিরিশচন্দ্রের জনা, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, বুদ্ধদেব প্রভৃতি নাটকের অনেকাংশ কাব্য-গুণ সমৃদ্ধ, একথা বাংলা সাহিত্যের শিক্ষার্থী মাত্রেই অবগত আছেন। বাহুল্য বোধে উদ্ধৃতি দিচ্ছিনা। ক্ষীরোদ প্রসাদের রঘুবীর বা নরনারায়ণ সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে।

অন্য দুজন মধুসূদন আর রবীন্দ্রনাথের কবি খ্যাতি সমধিক কিন্তু নাট্য রচনাতেও তাঁদের সামর্থ্যের কথা কেউ অস্বীকার করবেন না শর্মিষ্ঠা কি মালিনীর নাটকীয়তা কট্টর নাট্য সমালোচক যেমন মানবেন তেমনি কাব্য সমালোচকের কাছে তাদের কাব্যগুণ প্রশংসা লাভ করবে।

আধুনিক কবিদের মধ্যে রাম বসুর কথাই প্রথমে বলতে হয়। দীর্ঘদিন আগে (প্রায় ১০ বছর) তিনি অধুনা প্রচলিত কাব্যনাট্যের ধারাটির সূত্রপাত করেন। তাঁর ব্রীজ ও নীলকণ্ঠ যুগল কাব্য-নাট্য। যুগল বলার কারণ ব্রীজে যে ত্রিভুজ প্রেমের সমস্যার সূত্রপাত, নীলকণ্ঠ তাঁরই পরবর্তী

পর্ব, অবশ্য এতে তৃতীয়ভুজটি অনুপস্থিত। ব্রীজে নায়িকা প্রথম প্রেমিককে ভুলতে পারেনি বলে স্বামীকে ভালবাসতে পারেনি। আর নীলকণ্ঠের নায়িকা স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে প্রেমিককে বিয়ে করেছে, কিন্তু প্রথম স্বামীর স্মৃতি তাদের মধ্যে কাঁটার মত উঁচিয়ে আছে। দু'টি নাটকে বহিরাকর্ষণ নেই বললেই চলে কিন্তু সমস্যার আন্তর প্রকাশটিও সামান্যতা দোষ দুষ্ট।

রাম বসু আরও যে কাব্য নাট্য লিখেছেন তাতেও প্রথম দু'টির প্রভাব কাটাতে পারেন নি। পাত্র-পাত্রীর নাম বদলেছে, বদলেছে পরিবেশ। কিন্তু সমস্যা আর তার সমাধান হয়েছে একই ধরণের।

কৃষ্ণ ধর কাব্য মেজাজে প্রায় রাম বসুরই সহপথিক। তাঁর 'একটি রাত্রির জন্য' কাব্য নাটকে প্রেমের যে সমস্যা প্রকাশিত তাও ত্রিভুজ কিন্তু ভুজটি কোন ব্যক্তি নয়, নায়কের অন্ধত্বজনিত মানসিক বাধা। এক্ষেত্রেও মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ কাব্য সুষমামণ্ডিত হয়ে তার সামান্যতা অতিক্রম করতে পারে নি।

সজল বন্দোপাধ্যায় উদীয়মান কবি, পুর্বোল্লিখিত কবিদের তুলনায় তরুণতর। তাঁর কাব্য মেজাজও অনেকটা ভিন্নমার্গী অথচ তাঁর কাব্যনাট্যটি একেবারে পূর্বতনদের ছায়া। এখানে ত্রিভুজের তৃতীয়ভুজ নায়িকা গ্রহণে নায়কের অক্ষমতা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় তরুণদের মধ্যে অন্যতম শক্তিমান কবি তাঁর কাব্যনাট্য 'এরিয়া ৪৫' কিছুটা ভিন্নধর্মী এবং তার চরিত্রগুলিও অন্য ধরণের কিন্তু নাট্য-কথাকে দানা বাঁধাবার মত কেন্দ্রস্থ সত্য কিছু না থাকায় তা অসামান্য হতে পারে নি।

বহুল প্রচেষ্টা সত্বেও কাব্য নাট্যের ক্ষেত্রে আধুনিকদের ব্যর্থতার কারণই এই কেন্দ্রস্থ সত্যের অপ্রতিষ্ঠা। নাটকের কেন্দ্র কোন সত্য যদি না থাকে তো তার অন্তঃফল কিভাবে অসামান্য হবে? যে বীজে ফলের সম্ভাবনা নিহিত নেই তা শুধু মাত্র ফুল ফুটিয়েই ক্ষান্তি দেবে, এত অতি স্বাভাবিক কথা। বাংলার কাব্যসাহিত্যকে পূর্ণতা দিতে হলে, নাট্যসাহিত্যেও তার সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করতেই হবে। আধুনিক কবিদের প্রচেষ্টা থেকে মনে হয় তাঁরা এ পূর্ণতার দিকে এগোতে প্রস্তুত নয়। হয়ত তাঁদের এখনো প্রস্তুতিপর্ব চলেছে, যার অবসানে প্রোজ্জ্বল ভাস্করের আভায় তাঁদের সাধনার ফসল উঠবে।

তবে আমাদের সন্দিগ্ধ মন কেবলই কু গাইছে, তার মতে 'উঠন্তি মুলা পত্তনেই চেনা যায়।'

রবি মিত্র

দুই মণীষী ॥ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা। ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা। মূল্য ৬·০০

শতবার্ষিকী উৎসবগুলির একটা সুফল দেখা যাচ্ছে—সেই উপলক্ষে অনেকে মুখ খুলছেন, লিখতে সুরু করছেন, স্মৃতি সংরক্ষণের পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামছেন। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী থেকে এই যে উৎসবের প্রবাহ সুরু হয়েছে নানা মণীষীর জীবনকে কেন্দ্র করে তা আবর্তিত হচ্ছে। হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন এগুলি শতবার্ষিকা উৎসবের আলোচনার জন্যই রচিত হয়েছিল।

হিরন্ময়বাবু দর্শনশাস্ত্রের কৃতী ছাত্র, বাংলা দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়েয় উপাচার্য। পণ্ডিতজন বলে খ্যাতি আছে। সুতরাং তাঁর রচনা এই প্রত্যাশা নিয়েই পড়তে বসি যে এতে নতুন কিছু পাওয়া যাবে অন্ততঃ দৃষ্টিভঙ্গীতে এমন একটি নতুনত্ব থাকবে যাতে বহু আলোচিত বিষয়বস্তুও নতুন আলোকে দেখা দেবে। হিরন্ময়বাবুর এই গ্রন্থ আমাদের এই প্রত্যাশা পূরণ করেনি।

রবীন্দ্রনাথ অংশে ন'টি প্রবন্ধ রয়েছে—'শিশু সাহিত্য' 'লক্ষীর অভিশাপ' এবং 'শ্রীনিকেতনের আদর্শ' এই তিনটি ছাড়া আর সব প্রবন্ধই রবীন্দ্রকাব্যের কোন না কোন পংক্তিকে শিরোনাম হিসাবে ধারণ করেছে। এ পদ্ধতি অনেক সময় লেখকের সঙ্গে কাব্যের আত্মিক ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত দেয়— পাঠককেও লেখকের বলবার কথার মুল সুরটি ধরিয়ে দেয়। এই প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটির আলোচনায় যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু দু একটির কথা উল্লেখ করি। 'তোমার এমন শাণিত বচন' রচনাটি আমাদের হতাশ করেছে। এই ধরণের টুকরো রচনার প্রকৃতপক্ষে কোন দাম নেই। কালী-প্রসন্নের 'মিঠে কড়া', সমাজপতির 'সাহিত্য সমলোচনা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'কাব্যনীতি' ইতিমধ্যেই শতবার্ষিকীর পরেই পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে—সম্যক্ আলোচিত হয়েছে অন্যত্র। ডঃ আদিত্য ওহ দেদার রবীন্দ্র সমালোচনার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, ডঃ সুকুমার সেন 'মিঠে কড়া'র বিশদ আলোচনা করেছেন এবং রবীন্দ্র প্রসঙ্গ পত্রিকায় 'মিঠেকড়া' সম্পূর্ণটা, সমাজপতির সমালোচনা আগাগোড়া এবং দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কিত প্রবন্ধ পূর্ণমুদ্রিত হয়েছে। এই প্রবন্ধ ওই সব রচনারই দুর্বল পুনরুক্ত।

তৃতীয় প্রবন্ধ 'ওহে অন্তরতম'—জীবনদেবতা সম্পর্কিত। জীবন দেবতা বহু পুরণো বিষয়। অসিতকুমার চক্রবর্ত্তী জীবনদেবতা প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক আলোচনার অবতারণা করেছিলেন। তারপর থেকে খুব নতুন কথা আর বিশেষ কেউ বলেন নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে রচনাবলীর ৪র্থ খণ্ডে চিত্রার ভূমিকায় জীবনদেবতা নিয়ে আলোচনা করলেন। চিত্রার সেই সুচনাংশ থেকে লেখক প্রয়োজনমত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। জীবন দেবতা সম্বন্ধে সব সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'চিত্রায়

জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলন নাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোন নায়ক নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থলাভিষিক্ত নয়।' এই ইঙ্গিতটি অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাতে পারে। লেখক এটির উল্লেখ করেছেন কিন্তু এই ধারণার বিশদ ব্যাখ্যা করেন নি। জীবন দেবতা দার্শনিক তত্ত্ব নয়, উপলব্ধিজাত সত্য—এ কথা ঐ ক্ষুদ্র পরিসরে বার বার পুনরুক্ত হয়ে রচনার দীপ্তি ক্ষয়ের কারণ হয়েছে। অথচ এ একটা অতি প্রাথমিক কথা যা বারবার উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই।

এই প্রবন্ধগুলির আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। কারণ আগেই বলেছি যে নতুন কথা বা গভীর দৃষ্টির ঐশ্বর্য এগুলির মধ্যে নেই। কিন্তু সবচেয়ে হতাশ করেছে যে প্রবন্ধটি এবার তার উল্লেখ করি—সেটি হলো 'দুই মণীষী' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে হিরন্ময়বাবুর মূল বক্তব্য হ'লো এই যে "সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁদের সাধনার জীবন আরম্ভ হয়ে থাকলেও পরবর্তী জীবনে পরিণত আকারে তাঁদের জীবনদর্শন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এমন কি দেখা যাবে সাধন-জীবনের শেষ অধ্যায়ে উভয়ে যে উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন তা মোটামুটি একই ধরণের।" প্রথম জীবনে বিবেকানন্দ শঙ্করমার্গী মায়াবাদী—রবীন্দ্রনাথ তার ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু ক্রমে বিবেকানন্দকে আকৃষ্ট করলো বুদ্ধদেবের করুণার বাণী। রবীন্দ্রনাথ তো বুদ্ধভাবনায় সারা জীবনই ভাবিত ছিলেন। সুতরাং অদ্বৈত বেদান্তের আশ্রয় থেকে ব্যবহারিক বেদান্তের মধ্যে মুক্তি পেলেন বিবেকানন্দ—লেখকের সিদ্ধান্ত হলো তাই,—"উভয়ের হৃদয়ধর্মই সাধনার ক্ষেত্রে উভয়কে মিলনের পথে আকৃষ্ট করেছে।" এই ফরমুলা অতি সরলীকরণের চেষ্টাজাত। স্বভাবতঃই আমরা যাঁদের শ্রদ্ধা করি তাঁদের মধ্যে কোন পরস্পরবিরোধী চিন্তা কাজ করছে একথা আমাদের ভাবতেও ইচ্ছা করেনা। তাই আমরা রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের চিন্তাকে কোন একটি সীমান্তে এনে মেলাতে পারলেই খুসী হই। লেখক সে চেষ্টাই করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমরা প্রমাণ করতে ব্যগ্র উভয়ের মধ্যে কত মিল। যদি অমিল বেশি দেখা যায় তখন অন্ধ-গুরু-মানা-মন মাথায় হাত দিয়ে বসে। একজনকে সত্য মনে হলে আর একজনের মর্য্যাদা যে কমেনা একথা মনে মনে মানতে আমরা ভীত। ইতিহাসের ধারায় যদি এদের দুজনকে জানবার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো বোঝা যাবে জাতির চিন্তার জীবনে এদের স্থান কোথায় এবং পরস্পরের সম্পর্ক কি। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার মন্ত্রকে অন্তর থেকে স্বীকার করেন নি। ভূগোলের সকল বন্ধন ছিন্ন করে তিনি দেশদেশান্তরের মানুষকে এক গোষ্ঠী কল্পনা করেছিলেন। শুধু হিন্দু ধর্ম নয় কোন সঙ্ঘবদ্ধ ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তিনি নিজেকে একাত্ম করতে চাননি শেষ পর্য্যন্ত। বিবেকানন্দ নবজাগ্রত ভারতবর্ষকে উবুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন; তার প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল অংশের প্রতি বারংবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ থেকে আমাদের নিরস্ত করেছেন, আর আচার বিচারের বহু ক্ষুদ্রতাকে আঘাত করে একটি নতুন জীবন-বোধ জাগাবার চেষ্টা করেছেন। এই দুই শক্তিধর পুরুষের মধ্যে মিল ছিল প্রধানতঃ এই যে জীবন তাদের কারো কাছেই পুরানো শাস্ত্রবচনের সংকীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে সীমায়িত নয়। বলিষ্ঠ আনন্দোজ্জ্বল জীবন ছিল উভয়েরই কাম্য। দীন পীড়িত ভারত তার ক্লীবত্বের জড়তা থেকে মুক্ত হোক এই ছিল

উভয়েরই সাধনা। কিন্তু মিল যত অমিল তার চেয়ে অল্প নয়। এবং যদি উভয়কেই শ্রদ্ধার সঙ্গে জানতে চাই তাহলে জানতে পারি যে পরস্পরের চিন্তায় বহু সমুদ্রের ব্যবধান।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবনে উগ্র স্বাজাত্যবোধের দম্ভ এবং গোঁড়া হিন্দুয়ানীর প্রবল আন্দোলন দেখেছিলেন। তাঁর মনের কাঠামোটা মূলতঃ যুক্তিবাদী। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ন্যাশানালিজমের মন্ত্র তাঁকে কোনদিনই অভিভূত করতে পারেনি। এদিক থেকে তিনি রামমোহন, বিদ্যাসাগরের উত্তর সাধক। তিনি বার বার বিচার করার কথা বলেছেন, বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে বলেছেন। চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে উগ্র হিন্দুয়ানীর নানা অহংকৃত দাবী নিয়ে তর্ক করেছেন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের পাশ্চাত্ত্যের মুক্ত বিচার বুদ্ধির বার বার সমর্থন করে আমাদের শিক্ষায় সেই বিচার শক্তিকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্ত্যের যুদ্ধোন্মত্ততা ; কর্মব্যস্ততা ও জড়বাদের যতই নিন্দা করেছেন ততই প্রশংসা করেছেন তাদের উৎসাহের, সাহসের ও জীবনের প্রতি সজাগ সচল মমত্ববোধের। পাশ্চাত্ত্য যে আধ্যাত্মিকমূল্যে একেবারে হীন একথা নানা প্রবন্ধে তিনি যুক্তি সহকারে অস্বীকার করেছেন। আর্যামীর অহংকার, গুরুবাদ ও জাতিগত আত্মাভিমানের তিনি তীব্র সমলোচক।

প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের মিলনের কথা কখনও ক নও বিবেকানন্দের কণ্ঠে শোনা গেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে তখন সদ্যজাগ্রত দেশাত্মবোধ তাঁর নেতৃত্বে এমন প্রবল শক্তির সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করছে যে তারই প্রভাবে বিবেকানন্দ প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের কথা যখনই তুলেছেন তখনই আধ্যাত্মিক শক্তিহীন রজোগুণান্বিত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চেয়ে প্রাচ্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের কথা তাঁর মনে স্থান পেয়েছে। পাশ্চাত্ত্যের সভ্যতার পিছনে যে আধ্যাত্মিক শক্তির কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন বিবেকানন্দ কি তা কোথাও স্বীকার করেছেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিজয় অভিযান যে প্রাচ্যে কখনো ঘটবেনা একথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন—"What is in this life? You are Hindus and there is instinctive belief in you that life is eternal. Sometimes I have young men come and talk to me about atheism, I do not believe a Hindu can become an atheist. He may read European books and persuade himself he is a materialist but it is only for a time. It is not in your blood." (The Future of India) হিন্দুর আধ্যাত্মিক গৌরব বিবেকানন্দের কাছে শুধু প্রশ্নাতীত নয়। গুরুর মাধ্যমে পরম উপলব্ধির সম্ভাবনাতেও তিনি বিশ্বাসী। তিনি যে পাশ্চাত্ত্যের নানা স্থানে অদম্য সাহসে ভর্ৎসনা-বাণী শোনাতে পেরেছেন তার মূল এখানেই। প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর প্রথম proposition

রবীন্দ্রনাথ বংশগত যোগে কিছুকাল আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে যাকে institutional religion নামাঙ্কিত করা যায় এমন কোন বস্তুকে তিনি স্বীকার করেন নি। তাঁর কথার সুর উল্টো, অতীতের গৌরব কল্পনায় মুগ্ধ হয়োনা, পাশ্চাত্ত্য নিছক জড়বাদী নয় —যেখানেও মানবাত্মা আপনাকে নানা ভাবে সৃজন করছে প্রকাশ করছে। বিচার করো, বুদ্ধিকে মুক্তি দাও। অন্ধ প্রথার জড় দাসত্ব থেকে, বিচার করে ভুল করতে হয় তাও করো, কিন্তু কর্ত্তাভজা হয়োনা—এই হল রবীন্দ্রনাথের বাণী। গুরুবাদ তিনি কখনো মানেন নি।

দুজনের ধারা আলাদা। একজন হিন্দু সমাজের নেতা, অন্যজন কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের

সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে উক্তি এত অল্প এতে দুঃখিত বা বিস্মিত হবার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে পথ তাদের অনেকদূরে বেঁকে গেছে। সে কথা রমঁা বলঁার কাছে তিনি বলেছিলেন। উভয়ের সত্য সম্বন্ধে ধারণা যে এক নয় তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন।—

"It was because Vivekananda tried to go beyond good and evil that he could tolerate many religious habits and customs which have nothing spiritual about them,—My attitud towards truth is different. Truth cannot afford to be tolerant where it faces positive evil, it is like sunlight which makes the existence of evil germs impossible.

হিরন্ময়বাবু যদি এইসব সমস্যা আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করতেন তবে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথকে এক জায়গায় মেলাবার অতিসরলীকৃত চেষ্টা হয়তো এত সহজ হতো না। তবে হ্যাঁ এক জায়গায় দুই মণীষীর গভীর মিল আছে—দেশ তাদের কাউকেই গ্রহণ করেনি। এত লিখেও রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তাভজা মনোবৃত্তি থেকে দেশকে বাঁচাতে পারেননি—গুরুর পঙ্গপালে দেশ ছেয়ে গেল। এত বুঝিয়েও বিবেকানন্দ জাতের মোহ, ছেঁায়াছুঁয়ির বিচার কিছুই ঘোচাতে পারেন নি। দুজনকেই বাইরে ঘটা করে শ্রদ্ধা আর ভিতরে নিরন্তর অবজ্ঞা দেখিয়ে দেশ তাঁদের ত্যাগ করেছে। দেশের কাছে অবহেলিত হওয়াতেই দুজনের সবচেয়ে বড় মিলন।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

N

more DURABLE
more STYLISH

SPECIALITIES

Sanforized :

Poplins
Shirtings
Check Shirtings
SAREES
DHOTIES
LONG CLOTH

Printed :

Voils
Lawns Etc.

in Exquisite Patterns

Regd No. C-315 Phone : 23-5155 December '66 (0'50) Central Regd. No. R.N. 2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

চতুর্দশ বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৭৩

খরচা কমানো... উৎপাদন বাড়ানো

টাটা স্টীলের কারখানায় লোহা গলানোর ছ'টা ব্লাস্ট ফার্নেসকে কয়েক বছর অন্তর অন্তর ঢেলে মেরামত করতে হয়। কারখানার লোকেরা যাকে বলেন রিলাইনিং করা। এই রিলাইনিং একটা বিরাট কাজ এবং এতে হাজার হাজার টন রিফ্রাক্টরি ইঁট, ইস্পাত, ঢালাই লোহা, বহু মাইল ইলেকট্রিক কেবল আর পাইপ লাগে। আর লাগে ইঞ্জিনিয়ার আর পাকা কর্মীর বড় দল। এই কাজের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, প্রত্যেকটি ধাপ আগে থেকে ছ'কে নেওয়া হয় এবং তারপর দিনরাত্তির ইঞ্জিনিয়ার আর কর্মীরা একজোটে ঘড়ির কাঁটার মতন কাজ চালিয়ে যান যাতে যত কম সময়ে এবং কম খরচায় এই মেরামতির কাজটি নিখুঁতভাবে হয়।

এই কাজে টাটা স্টীল গত কয়েক বছরে অভাবনীয় উন্নতি করেছেন। যেমন ধরুন, ১৯৫৭ সালে একটি ব্লাস্ট ফার্নেস রিলাইনিং করতে ৯১ দিন সময় লাগে। ১৯৬৩ সালে সেই কাজ যখন ৭৪ দিনে করা হয় তখন অনেকে ভাবলেন যে এ রেকর্ড সহজে ভাঙা যাবে না। কিন্তু ছ'মাস না যেতেই আর একটি ব্লাস্ট ফার্নেসকে মাত্র ৬৪ দিনে রিলাইনিং করা হয়।

কিন্তু এই শেষ নয়। যে ব্লাস্ট ফার্নেসকে ১৯৫৭ সালে রিলাইনিং করতে ৯১ দিন লেগেছিল সেটাকে কিছুদিন আগে মাত্র ৫৭ দিনে রিলাইনিং করা হয়েছে। ফলে, মেরামতিতে যে সময়টা বাঁচলো তাতে প্রতিদিন দেশের অতি প্রয়োজনীয় আরও লোহা তৈরি হয়েছে।

ক্রমান্বয়ে কম সময়ে কাজ করা ও অক্লান্তভাবে রেকর্ড করার এই আপ্রাণ ও অবিরত চেষ্টার উদ্দেশ্য হ'ল টাটা স্টীলের ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র : খরচা কমানো, উৎপাদন বাড়ানো।

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে...
সবার মনোরঞ্জনে...
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

নিয়মাবলী

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ২৩-৫১৫৫

চতুর্দশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

পৌষ তেরশ' ছিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

লেখার লাবণ্য

নবেন্দু সেন

লাবণ্য সামঞ্জস্য'র নামান্তর একটি গুণ। মশলার সামঞ্জস্যে যেমন রান্নার স্বাদ। রাঁধুনীর গুণ। সব রাঁধুনীর সমান গুণ থাকে না। থাকে না তেমনি সকলের লেখার লাবণ্য। সব রূপসীই যেমন সুন্দরী হয় না। সকল লেখকের লেখাতে তেমনি থাকে না পারিপাট্য।

স্বীকার করতেই হবে, 'Art, after all, is a question of effect'. (১) বলা বাহুল্য এই এফেক্ট সৃষ্টির রহস্যের মধ্যেই নিহিত লেখার লাবণ্যর সৃষ্টি রহস্য। দেখা যাক, এই রহস্যভেদ সম্ভব কিনা। তিনটি বাক্য নেওয়া যাক প্রথমে।

১। তাহার পার্শ্বে হারাণবাবুর গতানুগতিক বক্তৃতা এবং উপদেশ আজ নিতান্ত প্রাণহীন, অন্তঃসারশূন্য এবং পঙ্গু বলিয়া মনে হইতেছে।

২। প্রেমেন্দ্রের নগর-বীক্ষা গদ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেকগুলি ছোট গল্পের মধ্যে,—কবিতায় অপেক্ষাকৃত কম হলেও 'প্রথমা'র 'রাস্তা'তে সম্রাটের 'পথ' এবং 'কাঠের সিঁড়িতে' তারই চিহ্ন আছে।

৩। গদ্য কাব্যের প্রবর্তনের পিছনে বিদেশী প্রেরণা থাকা স্বাভাবিক কিংবা, বলা যেতে পারে জীবনের আটপৌরে চেহারা প্রকাশের পরীক্ষামূলক রবীন্দ্রনাথের এ এক নিজস্ব পদ্ধতি।

এক নম্বর বাক্যটিতে 'বক্তৃতা' এবং 'উপদেশ' শব্দ দুটির পূর্বে একটি বিশেষণ (গতানুগতিক) এবং পরে তিনটি ('প্রাণহীন', 'অন্তঃসারশূন্য', 'পঙ্গু') বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই চারিটি বিশেষণ ব্যবহারে লেখকের বক্তব্যের স্পষ্টতা বিনষ্ট হয়েছে। হারাণবাবুর বক্তৃতা যদি 'গতানুগতিক'ই হয় তাহলে 'আজ' আবার নূতন করে 'প্রাণহীন, 'অন্তঃসারশূন্য, 'পঙ্গু' বোধ

হবে কেন? লেখকের 'গতানুগতিক' বিশেষণটিকেও অকেজো না বলতে হলে, ধরে নিতে হয় হারাণবাবুর বক্তৃতা পূর্বেও 'প্রাণহীন, 'অন্তঃসারশূন্য, 'পঙ্গু' ছিল। মেনে নিলে বাক্যটির অর্থ বোধের অস্পষ্টতা দুটি কারণে অস্পষ্ট থেকে যায়। (ক) লেখকের 'গতানুগতিক' এবং পরবর্তী তিনটি বিশেষণ একত্রে ব্যবহৃত হলে বাক্যটির মূল অর্থ, বিরোধে প্রকাশিত। লেখকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'হারাণবাবুর' বক্তৃতার স্বভাব ('গতানুগতিক') লেখকেরই ব্যবহৃত পরবর্তী বিশেষণ তিনটি দ্বারা অসমর্থিত হচ্ছে। (খ) সব মেনে নিলেও, 'বক্তৃতা' বা 'উপদেশ' কোন 'জীব বা প্রাণী নয় যে, দুর্ঘটনায়, বা অসুখে ভুগে প্রাণত্যাগ করবে, অথবা 'পঙ্গু' হয়ে পড়বে। 'প্রাণহীন' প্রাণ না থাকলে হয় না। ওটা, এবং 'পঙ্গু' প্রাণীবাচক বিশেষণ। সমাসক্তি অলঙ্কার ব্যবহার করে জড়, অচেতনে চেতনের গুণারোপ অনেক সময় করা হয় বটে; কিন্তু প্রায়ই সেটা কাব্যে বা কাব্যময় গদ্যে। এমন স্টেটমেণ্ট প্রকাশোপযোগী বাক্যে নয়। 'অন্তঃসারশূন্য' বিশেষণটির একক ব্যবহারই যথেষ্ট ছিল। অতিকথনের জন্যে পরবর্তী বিশেষণগুলির ব্যবহার অতিরিক্ত ভার হয়ে উঠেছে। বাক্যর সুষমা রূপের অসাম্যে আহত, লাবণ্যহারা। অতি ও ভুল কথনের জন্য বাক্যটির বক্তব্য অস্পষ্ট। অসতর্কতায় অতিশব্দ ব্যবহারে দুষ্ট দ্বিতীয় বাক্যটিও। লেখক লিখেছেন, 'প্রেমেন্দ্রের নগর-বীক্ষা গদ্যে প্রকাশিত তাঁর অনেকগুলি ছোট গল্পের মধ্যে'—বাক্যটির প্রথমাংশে ব্যবহৃত 'গদ্যে' এবং 'ছোট গল্পে' শব্দ দুটির প্রতি প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ছোট গল্প পদ্যে রচিত হয় না। গদ্যই তার ভাষা। সুতরাং 'গদ্যে প্রকাশিত' শব্দ দুটি অনর্থক, বাক্যের ভার, বক্তব্য বোধের অস্পষ্টতা। প্রকাশভঙ্গীতে যে প্রসাধন রীতি বাক্যটিতে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রধানত দুটি কারণে তা ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমত, একই বাক্যে প্রসাধন রীতি দু' প্রকার। কবিতার ক্ষেত্রে যেমন কবিতা গ্রন্থগুলির বা কবিতার নামগুলি উল্লেখ করে বাক্যের বক্তব্য বিষয়েরও প্রয়োজন মিটিয়েছেন, তেমনি ছোট গল্পের নামগুলিরও সদ্ব্যবহার ইচ্ছে হলে করা যেত এবং তাতে রীতির সামঞ্জস্য বজায় থাকতো। "কবিতায়……আছে" অংশে 'প্রথমার' 'রাস্তাতে' **'সম্রাটের পথ'** এবং **'কাঠের সিঁড়িতে'** তারই চিহ্ন আছে।'—অংশটি ব্যবহৃত শব্দগুলির মাধ্যমে যে রচনা-সুষমা লেখক সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন দুটি কারণে তা ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমত একই বাক্যের রূপরীতি দু' রকম হওয়ায় প্রথমাংশের সঙ্গে শেষাংশের সাম্য সুষমা বজায় থাকেনি। দ্বিতীয়ত, 'কাঠের সিঁড়িতে' যেমন, তেমনি 'পথে' 'চিহ্ন' পড়তে পারে; 'পথ' 'চিহ্ন' পড়তে পারে না। একটি এ-কারের জন্য শব্দ সজ্জায়ও অসঙ্গতি রয়ে গেছে। 'পথ' নয়, তাই 'পথে' দরকার। বক্তব্য স্পষ্টতর করতে 'প্রথমা' 'কাব্য-গ্রন্থের' 'পথ' কবিতা, 'কাঠের সিঁড়ি' কবিতা লিখলে আরও ভাল হয়। কাব্যগ্রন্থ, আর কবিতার অস্পষ্টতাও তাতে ঘুচে যায়।

তৃতীয় বাক্যর অস্পষ্টতার কারণ ভিন্ন ধরনের। শব্দ সজ্জায় স্বেচ্ছচারিতা এবং অস্পষ্ট শব্দ যোজনা এ বাক্যটির অর্থ অস্পষ্ট করেছে। "কিংবা বলা যেতে পারে জীবনের আটপৌরে চেহারা প্রকাশের পরীক্ষামূলক রবীন্দ্রনাথের এ এক নিজস্ব পদ্ধতি"—বাক্যটিতে 'পরীক্ষামূলক' বিশেষণটি 'রবীন্দ্রনাথে'র পূর্বে বসায় অর্থবোধে এই অস্পষ্টতা সৃষ্টি হ'য়েছে। "পরীক্ষামূলক রবীন্দ্রনাথের" হয় না। "পরীক্ষামূলক" বিশেষণটি যে শব্দটির সঙ্গ কামনা করেছে, সে 'রবীন্দ্রনাথ' নয়, 'পদ্ধতি'।

"পরীক্ষামূলক পদ্ধতি"। যেমন—শুভ বই, ভাল দৃষ্টি নয়। শুভদৃষ্টি, ভাল বই।

লেখার লাবণ্য সৃষ্টি সাধনা সাপেক্ষ। তার জন্য চেষ্টা চলে। পূর্ণ সিদ্ধি দুর্লভ। বাক্য তিনটি আলোচনার জন্য উদাহরণ মাত্র। এরূপ উদাহরণ বাংলা গদ্যের ইতিহাসে সংখ্যাতীত। আসলে এ ভুল নয়, অসতর্কতা। অনেক সময় সতর্কতায়ও অচেতন লেখার ফল। চোখে পড়ে না সাধারণত। ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধরা পড়ে। এগুলি যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভুল, রচনার সুষমা সৃষ্টিতে বাধা তা যে অজানা, তা নয়; লেখার সময় সে জ্ঞান যেন অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্ত্য মনীষীর সেই উক্তিটা, যেন কার্যকরী হয়ে ওঠে বেশি। "I know all but whenever I am asked to write I know not" ষ্টাইলের গোপন রহস্যও এখানে। ফ্লবেয়ার এই রহস্য জানতেন দেখেই ডিকেন্স অমন গদ্য রচনা করতে পেরেছিলেন। লরকার গদ্য তাই এত সুস্পষ্ট। দেবেন্দ্রনাথের গদ্য রামমোহনের, অক্ষয়কুমার দত্তের ও বিদ্যাসাগরের গদ্যের থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের গদ্যও রবীন্দ্রনাথেরই গদ্য। স্বতন্ত্র।

সাধনার জন্য লেখার কয়েকটি নীতি এ প্রসঙ্গে মেনে চলা যেতে পারে। লাভ আশু না হলেও লোকসানেরও এতে সম্ভবনা নেই। যেমন, অস্পষ্ট অর্থক শব্দ বর্জন ও বিশেষণ ব্যবহারে সংযম রক্ষা; (যার স্বভাব উদ্ঘাটিত করা দরকার ঠিক তারই অব্যবহিত পূর্বে বিশেষণটি ব্যবহার করার চেষ্টা করা; ভাব প্রকাশের জন্য, বক্তব্য জোরালো করার জন্যও সমার্থক, বা একই বিশেষণ বার বার ব্যবহার না করার চেষ্টা); বাক্য বিন্যাসে বাংলা ভাষার ক্রম (কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া) বজায় রাখবার চেষ্টা করা; সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না হয়ে নতুন শব্দ সাযুজ্য (Collocation) সৃষ্টি না করা; প্রকাশ রীতি একই বাক্যে দুরকম না করা; অলঙ্করণ বর্জন (বিশেষত, রূপক, উপমা প্রভৃতি)। পৃথিবীর বিখ্যাত ষ্টাইল সমালোচকের একটি মুল্যবান কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। ইনি লিখেছেন—

True metaphore, has very little to do even
with an act of comperison. । (২)

Danial Marderও একটি মুল্যবান অভিমত দিয়েছেন, তাঁর মতে—"Donot write so that your words may be understood, but write that your words must be understood" (৩)

লেখার লাবণ্য থাকলে পাঠক সহজে, স্বতস্ফূর্তভাবে পড়ে আনন্দ পায়। কিন্তু এ লাবণ্য সৃষ্টি সাধনা সাপেক্ষ। এ সাধনাও বড় কঠিন। একটু অন্যমনস্ক হলেই সমস্ত রচনাটিই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। একটি কমা, একটি সেমিকোলন, একটি পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন পর্যন্ত এর জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। এদিক, ওদিক হলেই অনর্থ, কদর্থ বা অন্যার্থ সৃষ্টি হয়। যেমন নীচের বাক্য তিনটির বিরতি চিহ্নগুলির অবস্থানে বাক্য তিনটির পৃথক তিনটি অর্থ হয়েছে।

১। রাম, শ্যাম এবং যদু = রাম এক পক্ষ, শ্যাম ও যদু আর একটি পক্ষ। মোট ২ পক্ষ।

২। রাম, শ্যাম, এবং যদু = রাম, শ্যাম, যদু প্রত্যেকে পৃথক পৃথক, মোট তিনটি পক্ষ।

৩। রাম ও শ্যাম, যদু—রাম ও শ্যাম এক পক্ষ; যদু আর এক পক্ষ; মোট ২ পক্ষ।

তেমনি, 'রূপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ'-দুটি বিষয়, অর্থ, ও তার ভেদকে বোঝাচ্ছে।

সুতরাং এই সর্ববিষয়ের সামঞ্জস্য সাধনে লেখায় লাবণ্য সৃষ্টি সম্ভব। নিঃসন্দেহে এ সাধনা সময়সাপেক্ষ। হয়তো পূর্ণ সিদ্ধিও দুর্লভ। কিন্তু লাবণ্য তো পূর্ণ হতে পারে না। পূর্ণতায় তার সীমা। সীমায় সৌন্দর্য্য আসে না, রূপ আসে। রূপসী আর সুন্দরী কি এক? রূপসীর জন্য বাসনা, কামনা থাকে। সুন্দরীর জন্য পিপাসা, আকাঙ্ক্ষা থাকে। লেখার জগতেও লেখকরা নাহয় লাবণ্যের পথ চেয়ে রচনার সৌন্দর্য সাধনাই করলেন; তাতে লাভ বই লোকসান নেই। বাংলা গদ্যর ইতিহাসে ভাষার সুষমা এতে একদিন অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। রূপসী মুখের আদর শুধু নয়, লাবণ্যময়ীর স্বভাবগুণেও বাংলা গদ্য ভাষা সেদিন বিশ্বে আদর্শ স্থাপন করতে পারবে। সে আনন্দ, সে গৌরব তো সকলের।

(১) Read Herbert, **'English Prose Style'** , London, 1928 (1956)

(২) Murry Middleton, **'Problem of Style'**, London, (1922) 1952, 12.

(৩) Marder **'The craft of technical writing'** U. S. A. 1960, 45-63.

উত্তর রাঢ়ের লোকসংগীত

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

মনসা পূজার গান

উত্তররাঢ়ে এমন খুব কম গ্রামই আছে যেখানে ধর্মরাজ, চণ্ডী বা মনসার পূজার প্রচলন নেই। বাউরী, বাগ্দী, লেট, ডোম ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণীদেরই মূলতঃ এই পূজা। অধিকাংশ মনসামঙ্গল রচয়িতাই রাঢ়ের অধিবাসী। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে বর্ধমানের এই অঞ্চলের কোথাও আদিম সর্পদেবতা, জাঙুলি ও বিষহরির পূজা মনসা পূজার রূপ নিয়েছিল। ধর্মরাজ পূজার প্রচলন প্রধানতঃ বর্ধমান জেলায় সীমাবদ্ধ। ধর্মঠাকুরের কামিন্যা মনসা দেবী সম্পর্কে অধ্যাপক সুকুমার সেন-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

'যে যে সূত্র ধরে ধর্মঠাকুরের মূলেই পৌছই সেই সব সূত্রের কয়েকটি ধরে ধর্মঠাকুরের সঙ্গিনী কেতকী মনসার কাছেও পৌছই।

প্রথমতঃ কেতকা-মনসা ধর্মের অনুজা, বেদের যমী যিনি ভগিনী হ'য়ে ভ্রাতাকে কামনা করেছিলেন পতিরূপে। কেতকাও ধর্মের কামিনী। (কামিন্যা)—

দ্বিতীয়তঃ কেতকা বারুণী। তাঁর প্রতীক জলভরা (আদিতে মদভরা?) ঘট, বেদের শ্বেত সোমকলস। তার থেকে নানা পথ বাঁক ঘুরে তিনি একদিকে হয়েছেন আরোগ্যের দেবতা বিষহরি, অপরদিকে শস্যদেবতা ইলা, শ্রী।

…মনসা পঞ্চমী দেবী, তাঁর পূজাতিথি হচ্ছে পঞ্চমী। ভগবতী ষষ্ঠী দেবী, তাঁর পূজাতিথি ষষ্ঠী। দেবী দুজনে মূলতঃ এক। তার প্রমাণ শীতল ষষ্ঠী। এদিনে বাস্তুদেবতার পূজা। বাস্তু শিল্পে ছেলে-কোলে মনসা ও ষষ্ঠী দুই-ই পাওয়া যায়।

…ধর্ম যিনি ধারণ করেন তিনিই বাস্তুদেব। নাগ পৃথিবী ধারণ করে আছেন। সুতরাং নাগ হ'লেন বাস্তুদেব। নাগের থেকে এলেন মনসা। তার থেকে এখন সিজের (মনসা গাছের) ডালে পৌছেছে। উনোনে মনসা গাছের ডাল রেখে এখন বাস্তুপূজা করা হয়।'

মনসা পূজার যা আচারানুষ্ঠান তা প্রায় সকলই অবৈদিক। অন্-আর্য্য সম্প্রদায়ই এই উৎসবের মূল উদ্যোক্তা। বগাপঞ্চমীর দিন অন্ত্যজ শ্রেণীরা ভক্ত্যার দল মা মনসার 'বারি' নিয়ে আসে, ঘট প্রতিষ্ঠা করে, পূজার শুরু হয়। প্রথমে মায়ের আবাহন হয়—

মা—কে আনতে চল যাই
ক্ষীরনদীর কূল
হাতে দেব হাতথালা
চরণে জবার ফুল।

আসরে মায়ের বন্দন হয়। লৌকিক দেবী, তাই লৌকিক প্রথাতেই দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়—

গ্রাম বন্ধন সুভা বন্ধন
বন্ধন বসুমতী।
লাক পার ঘাটে বন্ধন
দেবী সরস্বতী॥
গুণী ভেয়ের গুণী বন্ধন
নাটুয়ারই প্রাণ।
ছোট বড় গুণীনের
চরণে প্রণাম
পদ্মবনে থাকেন মাগো
পদ্ম নাল কুমারী।
তোমার লাল পাদপদ্মে
লাল জবা দিব আমি॥
ছুনিয়ারই অনাথিনী
না করিবেন হেলা।
আমার আসরে মা কমলা
তুমি কর খেলা॥
আমার আসর ছেড়ে মা গো
অন্য আসর যাও।
দোহাই আস্তিক মুনির
মাথা খাও॥

অথবা

লোহা করে ঝিকিমিকি পাথরে না দেয় টান
বাদীর বান কেটে করি নানাস্থান
যে মুখে আলি বান সে মুখেই যা
যদি বান ঘুরিস মোড়ে
ত্রিশূলধারীর দোহাই তোকে।
এ বন্ধন যদি নড়িস
ঈশ্বর মহাদেবের জট খ'সে পড়িস
কার দোহাই আমাদের কামিখ্যা মার দোহাই।

তারপর যৌথকণ্ঠে মায়ের বন্দনা সুরু হয়—

ভব বন্দনা করি বাঁকা শ্রীহরি
দয়া করো মা হস্তীতুয়ারী

প্রথমে বন্দি করি শিবের নন্দন
তারপরে বন্দি করি আমি গণেশের চরণ
পূবেতে বন্দি করি আমি গঙ্গা ভগীরথ
দক্ষিণে বন্দি করি ঠাকুর জগন্নাথ
পশ্চিমে বন্দি করি আমি গয়া গদাধর
উত্তরে বন্দি করি আমি কামিখ্যার চরণ
তারপরে বন্দি করি আমি মা মনসার চরণ
তারপরে বন্দি করি আমি বেহুলা লখিন্দর
তারপরে বন্দি করি আমি লোহার বাসরঘর
কার দোহাই মা মনসামঙ্গলের দোহাই।

উপবাসী 'ভক্ত্যার' দল সারারাত্রি গান করে একের পর এক—

লোহার আঁচিড় লোহার পাঁচির
　　লোহার বাসর ঘর।
বাসরঘর বানালি কামার
　　না রাখলি দুয়ার॥
বাসরঘরের ঈশানকোণে তুলা দিয়াছিল।
কালিনাগের নিঃশ্বাসে তুলা উড়ি গেল॥
ঢিকির প্রমাণ ছিল কালিনাগ
　　সুতার সঞ্চার হ'ল।
সুতার সঞ্চার হ'য়ে কালিনাগ
　　বাসরে সিঁধিল॥
বাসরে সিঁধি কালিনাগ
　　ভাবেন মনে মনে।
এমন সোনার বেনে
　　দংশিব কেমনে॥
ভাবিতে ভাবিতে কালিনাগ
　　পাশতলে দাঁড়াল।
আশমোড়া পাশমোড়া দিয়ে
　　কামড় হানিল॥
চাঁদ সূর্য্য দুটি ভাই
　　তোমরা থেক সাক্ষী।
গন্ধবেনের ছেলে হ'য়ে
　　দণ্ডে মেল লাথি

বেহুলা রাঁড়ী উচ্‌কপালী
চিরোল চিরোল দাঁত।
বাসরে খোয়ালী স্বামী
না পোহাল রাত॥
আশি হাজার বেনে জাগে
হাঁচাল নড়ি নিয়ে।
আসিবে মা মনসা
নাগ-মারবো বাড়ি দিয়ে॥

আবার—

পথে যেতে খেলি সাপা
তুমি খেলি আশে
মুখ মুছিলি ঘসে
ডানে যেতে বাঁয়ে মারি
ঘের দরদর খেয়ে ঝাড়ি
সাপের নাম লীলা
যেখানে খেলি সাপা
সেখানে বিষ মিলা
কার দ'য়—
মা মনসার দ'য়—
মা মনসার চরণ করি ধ্যান
বাজুক বিষম ঢাকি-চলুক ঝাঁপান।

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

চালা রীতি

এতদিন যে মন্দিরগুলির কথা বলিয়া আসিয়াছি তাহাদের একটিও বাঙ্গালীর নিজস্ব নহে, সার্বভৌম ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবাহ পথ বাহিয়া বাঙ্গালার মাটিতে পৌছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু চালা রীতির ইতিবৃত্ত অন্যরূপ। এই রীতি বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব স্থাপত্য ভাবনার ফল। তাই বাঙ্গালার মন্দির স্থাপত্যের ইতিহাসে তাহার স্থানও কিছু বিশিষ্ট।

চালা মন্দিরের উদ্ভবকাল যে কোন সময়ে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলিবার মত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব রহিয়াছে। তবে কতকগুলি প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে একটা আনুমানিক ধারণা করা হয়ত সম্ভব। প্রাক মুসলমান যুগে বাংলার মন্দির স্থাপত্যের যে পরিচয় বর্তমান সৌধ, চিত্র ও প্রতিমা ফলকে এবং মন্দিরদেহ অলঙ্করণে প্রস্ফুট তাহার মধ্যে কোথাও চালা রীতির কোন নিদর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় যুক্তিটি চালা মন্দিরের নির্মাণ-কৌশলের সহিত জড়িত। চালা রীতির চার চালা ও আট চালা মন্দিরের নির্মাণ-কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে দেখিতেছি মধ্যপ্রাচ্য হইতে আনিত অর্ধবৃত্তাকার খিলনি ও গম্বুজ। সমস্ত চার ও আটচালা মন্দিরের অন্তরা বিন্যাসে ইহাদেরই প্রয়োগ। প্রাক-মুসলমান যুগে যদি চালা মন্দির নির্মাণের কোন ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিত তবে চালা রীতির নির্মাণ-কৌশলেও প্রাক-মুসলমান ভারতীয় স্থাপত্যের পরিচয় একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারিত না। শিখর মন্দিরের উদাহরণ দিয়া কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে যেসব শিখর মন্দির নির্মিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশের প্রবেশদ্বারের শীর্ষ রচিত হইয়াছে ভঙ্গিকাটা খিলান দিয়া এবং কতক ক্ষেত্রে অন্তরা বিন্যাসে গম্বুজ ও অর্ধবৃত্তাকার খিলানের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় কিন্তু অধিকাংশ দৃষ্টান্তেই দেখিতেছি উল্টা কাটনি ছাড়িয়া যাওয়াই অন্তরা বিন্যাসের প্রধান অবলম্বন, সামান্য যে কয়টি ভদ্র মন্দিরের অস্তিত্ব আছে তাহাদেরও অন্তরা বিন্যাস ওই একই প্রকার। চালা মন্দিরে যে প্রাক-মুসলমান স্থাপত্য রীতির কোন অবশেষই নাই তাহা বোধহয় রীতি হিসাবে ইহার উদ্ভব মুসলমান অধিকারের অনেক পরে ঘটিয়াছিল বলিয়াই। এইবার হয়ত কিছুটা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই অনুমান করা চলে যে চালা রীতির উদ্ভব মুসলমান অধিকারের পরেই ঘটিয়াছিল।

বাঁশ ও খড়ির মাধ্যমে নির্মিত চালা গৃহের রূপটি ইটের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিবার প্রাথমিক প্রচেষ্টার কোন নিদর্শনও আজ আর নাই বলিলেই চলে।

শতাব্দী হইতে নির্মিত যে অসংখ্য চালা মন্দির আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে তাহার প্রায় সবগুলিই পূর্ণ বিকশিত রূপকল্পনার পরিচয়ই তুলিয়া ধরে। প্রচলিত মান যেন স্থির হইয়াই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

বাসগৃহ গঠনে চালা আচ্ছাদন নির্মাণের যতগুলি রূপভেদ তাহাদের অধিকাংশই মন্দির

নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুসৃত হইয়াছে। চালা আচ্ছাদনের সরলতম রূপটি মন্দিরের ক্ষেত্রে গৃহীত হয় নাই, বিস্তৃততম বার চালাও প্রায় বাদ পড়িয়াছে বলিলেই চলে। চালা মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টা প্রধানত দোচালা, চারচালা ও আটচালা এই কয়টি আকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই। ইহাদের মধ্যে আবার আটচালার সমাদরই দেখিতেছি সর্বাধিক।

চারচালা বাসগৃহে আচ্ছাদনের যে রূপটি দেখা যায় বাংলা দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই রূপটিই অনুসৃত। শুধুমাত্র নদীয়া ও বীরভূম জেলায় ও বীরভূমের প্রান্তবর্তী সাঁওতাল পরগণা জেলার মলুটি গ্রামের চারচালা মন্দিরে আচ্ছাদনটিকে উন্নত করিয়া ক্রমহ্রস্বায়মান তুঙ্গ শিখরে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। আটচালা বাসগৃহের সহিত আটচালা মন্দিরের পার্থক্য যে কোথায় এবং কতখানি রীতি প্রকরণের আলোচনায় সেকথা তো বিস্তারিতভাবেই বলিয়া আসিয়াছি।

বাসগৃহের আকৃতি হইতে রূপবৈষম্য যতই ঘটুক না কেন অস্থায়ী উপকরণে নির্মিত চালার বক্ররেখ কার্নিস ও আচ্ছাদনের কমনীয় বক্রগতি কিন্তু কখনও পরিত্যক্ত হয় নাই। সর্বত্রই বক্ররেখার বিশিষ্ট গতিভঙ্গিমাটাই চালা মন্দিরকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। চালা মন্দিরের বিবর্তনের সর্বোন্নত রূপেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। চালা মন্দিরের অন্তরা বিন্যাসে কিন্তু চালা গৃহের নির্মাণকৌশল বা তাহার কোন একটি বৈশিষ্ট্যও গৃহীত হয় নাই। হইতে যে পারে না উপকরণের পার্থক্যজনিত প্রভেদের কথা মনে রাখিলে তাহা সহজেই বুঝা যায়। চারচালা ও আটচালা মন্দিরের অন্তরা গঠিত অর্ধবৃত্তাকার খিলান ও গম্বুজ প্রয়োগ করিয়া। দোচালা মন্দিরের ভিতরের রূপটা কিন্তু দেখিতে দোচালা বাসগৃহের ভিতরের দিকের মতই। বক্রবাহুর তীক্ষাগ্রে খিলান একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সোজা চলিয়া যায়। ইংরাজীতে ইহার নাম হইল Vaulting।

দোচালা

একটু আগেই বলিয়া আসিয়াছি চালা আচ্ছাদনের সরলতম রূপটি ধরা পড়ে একচালার মধ্যে। একচালার বর্গাকার বা আয়তন একটি কক্ষের পশ্চাতের দেওয়াল অপেক্ষা সম্মুখেরটি হয় নীচু—পার্শ্বের দেওয়াল দুইটি পশ্চাতের দেওয়ালের সমতল হইতে ঢালুভাবে অগ্রসর হইয়া শেষ হয় আসিয়া সম্মুখের নীচু দেওয়ালটির সমতলে। একচালার পরেই আসে দোচালা, স্বাভাবিকভাবে দোচালা কক্ষের আসন হয় আয়তকার—মন্দিরের ক্ষেত্রেও তাহাই। দোচালা মন্দিরের আয়ত আসনে দৈর্ঘ্য হয় প্রস্থের দ্বিগুণ—আসনের মূলগত বৈশিষ্ট্য ইহাই। কোন মন্দিরে যদি বাহিরের দিকে কোথাও স্তম্ভ ও বৃথাস্তম্ভের সমাবেশ ঘটে—যেমন রহিয়াছে মুর্শিদাবাদ জেলার চারবাংলা মন্দির-গুলিতে—তবে আসনের উপর বৈচিত্র্য সঞ্চার হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মন্দিরদেহে অলঙ্করণের প্রয়োজনীয়তা হইতেই সে বৈচিত্র্যের উদ্ভব, আয়ত আসন বলিয়া সম্মুখ ও পশ্চাতের দেওয়াল দুইটিই হয় দীর্ঘতম। আচ্ছাদনের অধিকাংশ ভার বহন করে তাহারাই। দেওয়ালের উপর দুইটি আয়তাকার বক্ররেখ চালা পরস্পরের প্রতি ঝুঁকিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে, ঊর্ধ্বগতি ইহাদের সামান্যই—খানিকটা উঠিয়াই পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। বক্ররেখার গতি উভয়েই এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে উভয়ের সংযোগক্ষেত্রটি থাকে কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলের উপরেই। পার্শ্বের

যে দুইটি দেওয়াল তাহারা আচ্ছাদনের সামান্যই ধারণ করিতে পারে। বস্তুত বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে দোচালা গৃহের সহিত দোচালা মন্দিরের বৈষম্য ঘটিয়াছে অতি সামান্য দোচালা বাসগৃহের রূপকল্পনা যেন সম্পূর্ণভাবেই গৃহীত হইয়া গেছে। দোচালা মন্দিরের অন্তরা বিন্যাসের প্রসঙ্গ তো সারিয়া আসিয়াছি।

শিখর ও ভদ্র মন্দিরে বার অপেক্ষা গণ্ডী হয় উচ্চতর—শিখর মন্দিরের ক্ষেত্রে তো বিশেষ-ভাবে। চালা মন্দিরে কিন্তু অবস্থাটা ভিন্নরূপ। আচ্ছাদন ইহাদের ক্ষেত্রে দেওয়াল হইতে হ্রস্বতর হইতে পারে। আটচালা মন্দিরে ততখানি না হইলেও সাধারণতঃ চারচালা মন্দিরে ও বিশেষভাবে দোচালা মন্দিরে ইহাই নিয়ম। শিখর মন্দিরের বক্ররেখা রচিত হয় তাহার উর্ধ্বগতিকে অবলম্বন করিয়া কিন্তু চালা মন্দিরে বক্ররেখা তাহার সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া; আনুভূমিক ও লম্বমান উভয়েই তাহার সমান প্রভাব। চার ও আটচালা মন্দিরে আনুভূমিক ও লম্বমান উভয়দিকে বক্ররেখার বিস্তারে একটি ভারসাম্য বজায় রাখিবার প্রয়োজন আছে। আচ্ছাদনের সৌন্দর্য অনেকটাই নির্ভর করে এই ভারসাম্য সৃষ্টির উপর, দোচালায় আচ্ছাদন স্বল্পোচ্চ বলিয়া আনুভূমিক বিস্তারই সেখানে প্রাধান্য লাভ করে এবং তাহাই হয় নির্ধারক, এরূপ ক্ষেত্রে আচ্ছাদনের উপরে ও নীচে প্রবহমান বক্ররেখার গতিই রূপকল্পনার প্রধান অবলম্বন। দোচালার এই বক্ররেখার গতি এতই সহজ এবং সাবলীল যে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় চিত্রকর যেন তাহার তুলির একটি টানেই প্রথম হইতে শেষ অবধি আঁকিয়া দিয়াছে।

দোচালা মন্দিরের সংখ্যা বাংলা দেশে সামান্যই। মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগরের চারবাংলা নামে খ্যাত চারিটি মন্দির, হুগলী জেলার চন্দননগর সহরের লালবাগান পল্লীর নন্দদুলাল মন্দির, বীরভূম জেলার গণপুর গ্রামের কালী, করিধ্যা গ্রামের একটি ক্ষুদ্র মন্দির, মল্লারপুর গ্রামের মল্লেশ্বর মন্দির সংস্থানের অন্তর্ভুক্ত সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ও বীরভূমের প্রান্তবর্তী সাঁওতাল পরগণা জেলার মলুটি গ্রামের মৌলিখ্যা মন্দির—এই কয়টিই দোচালা মন্দিরের উদাহরণ। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলিতে বড়নগরের চারবাংলা মন্দির সংস্থান ও চন্দননগরের নন্দদুলাল মন্দিরটি। দুইটিই নির্মিত হইয়াছিল প্রায় সমসাময়িককালে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। দোচালা মন্দিরের বিবর্তন ধারা তাই শুধুমাত্র দোচালা মন্দিরগুলির মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠে না। দুইটি দোচালা একত্রে সংযুক্ত করিয়া গঠিত যে জোড়বাংলা, বাংলাদেশে দোচালা মন্দির অপেক্ষা তাহার নিদর্শন অধিকতর এবং চর্চাও হইয়াছে তাহার দীর্ঘকাল ধরিয়া। দোচালা মন্দিরের বিবর্তন ধারা জোড়বাংলা মন্দিরের আলোচনাতেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

বীরভূম ও মলুটির মন্দিরগুলিতে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য বলিতে কিছুই নাই—অক্ষম স্থপতির অপটু নির্মাণ মাত্র। এই ধারারই একটু উন্নত রূপ ধরা পড়ে চন্দননগরের নন্দদুলাল মন্দিরে। এই মন্দিরটিকে বর্ণনা করিলেই অপরগুলি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হইবে। অনতিউচ্চ ভিত্তি অধিষ্ঠানের উপর সম্মুখ ও পশ্চাতের দেওয়াল দুইটি খানিকটা উঠিবার পরেই অর্ধচন্দ্রের আকারে শেষ হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী দেওয়াল দুইটির শীর্ষভাগ ত্রিকোণাকৃতি। চালা আচ্ছাদনের বক্ররেখার কথা মনে রাখিয়াই সম্মুখ ও পশ্চাতের দেওয়াল দুইটির নির্মাণ আর পার্শ্বের দেওয়াল দুইটির

অগ্রভাগ যে ত্রিকোণাকৃতি হইয়াছে সে দুইটি চালার সংযোগে উদ্ভূত ত্রিকোণাকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য। দেওয়ালের উপর হইতে যে বক্ররেখ চালা আচ্ছাদন উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রকার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যায়ণের প্রচেষ্টা এমনভাবেই বর্জিত এবং রূপ কল্পনার ভিত্তি এতই শিথিল যে আচ্ছাদনের স্বতন্ত্র কোন মর্যাদাই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আয়ত কক্ষটিকে আবৃত করিবার জন্যই তাহার সৃষ্টি। চালা আচ্ছাদনের বক্রতা দেখিয়া মনে হয় যতখানি বাঁকিয়া গেলে ইহা সম্পূর্ণ এবং কমনীয় হইতে পারিত তাহার সম্ভাবনা পরিস্ফুট হওয়া সত্ত্বেও ততটা বাঁকাইয়া দেওয়া হয় নাই—পরিসমাপ্তির আকস্মিকতা দৃষ্টিকটু হইয়া উঠিয়াছে। গর্ভগৃহের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে চালা আচ্ছাদনের বিস্তার এবং উচ্চতা ও বক্ররেখার স্বাভাবিক গতিভঙ্গ ইহার একটি সম্পর্কেও স্থপতির ধারণা স্পষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয় না।

মন্দির দেহেও বৈচিত্র্য সম্পাদনের কোন প্রচেষ্টা নাই। দেওয়ালগুলি প্রায় নিরাভরণ। প্রবেশদ্বারগুলি অত্যন্ত সাধারণ এমনকি চূড়া পর্যন্ত যোগ করা হয় নাই। এইরূপ একটি দেহের উপর সর্বনিম্ন প্রয়োজনের আচ্ছাদন। মন্দিরদেহে না আছে গাম্ভীর্য না আছে এতটুকু লালিত্য।

এবার বলিতে হয় চারবাংলা মন্দিরের কথা। চারবাংলা জোড়বাংলার মত একাধিক একবাংলার সমন্বয়ে গঠিত কোন দেহ নহে—চারিটি বিচ্ছিন্ন একবাংলা এই নামে অভিহিত, এইমাত্র। বড় নগর ছিল নাটোরের রাজপরিবারের গঙ্গাবাস। এইখানেই পুণ্যশ্লোকা মহারাণী ভবানী অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। চারবাংলা মন্দির সংস্থানই তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। একটি বর্গাকার প্রাঙ্গণকে পরিবেষ্টন করিয়া চারিদিকে চারিটি প্রশস্ত দেবগৃহের অবস্থান। উত্তর ও পূর্বদিকের মন্দির দুইটির মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডই ভাগীরথীর দিক হইতে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার পথ। চারিটি মন্দিরই শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। প্রতিটিতে রহিয়াছে তিনটি করিয়া শিবলিঙ্গ—আয়তাকার দেবালয়ের মধ্যস্থলে একটি ও তাহার দুইপার্শ্বে আর দুইটি। প্রত্যেকটি বিগ্রহের সম্মুখে একটি করিয়া প্রবেশদ্বার। একটি মন্দিরেই তিনটি শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা ও পূজা এবং প্রতিটি বিগ্রহের জন্য স্বতন্ত্র প্রবেশদ্বার—পরিকল্পনা হিসাবে অভিনব সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ একটি মন্দিরে একটি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাই তো হইয়া থাকে, গর্ভগৃহে প্রবেশের দ্বারও হয় একটিই। চালা ও রত্ন মন্দিরে যে তিনটি করিয়া দ্বারপথ সে গর্ভগৃহের সম্মুখবর্তী দালানে প্রবেশ করিবার জন্য। দালান অতিক্রম করিলে তবে গর্ভগৃহে প্রবেশ—সেখানে দ্বার মাত্র একটি; ঐ তিনটি দ্বারের মধ্যবর্তীটির সমান্তরালে তাহার অবস্থান, গর্ভগৃহবাসী দেবমূর্তির ঠিক সম্মুখে। চারবাংলার মন্দিরগুলি গর্ভগৃহ ও দালান এই দুইভাগে বিভক্ত নহে। মন্দিরের সবটুকু জুড়িয়াই গর্ভগৃহ।

চারবাংলা মন্দির সংস্থানের চারিটি মন্দিরই সমসাময়িক, রূপকল্পনাও একই কেন্দ্র হইতে উৎসারিত। আসন বিন্যাসে ও দেহ গঠনে পার্থক্য ঘটিয়াছে সামান্যই। চারবাংলার প্রত্যেকটি মন্দির লইয়া তাই স্বতন্ত্র অলোচনার প্রয়োজন হইবে না—সাধারণ একটি আলোচনাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

প্রাঙ্গণ প্রান্তে একটি আবদ্ধ উচ্চ ভিত্তি অধিষ্ঠানের উপর মন্দিরদেহের অবস্থান। আয়তাকার আসনের বাহিরের দিকে দেওয়ালের উপর সন্নিবিষ্ট বৃথাস্তম্ভ ও তিনটি প্রবেশদ্বারের দুইটি স্তম্ভ ও সমসংখ্যক বৃথাস্তম্ভের উপস্থিতির ফলে আসনের সরলরেখা গিয়াছে ভাঙ্গিয়া। ভিত্তি অধিষ্ঠানের উপর হইতে উঠিয়া গিয়াছে লম্বমান দেওয়াল। দুই পার্শ্বের দেওয়াল দুইটির শীর্ষদেশ ত্রিকোণাকৃতি আর সম্মুখ ও পশ্চাতের দেওয়ালের উপরিভাগ গিয়াছে বাঁকিয়া। চন্দননগরের নন্দদুলাল মন্দিরে এই দুইটি দেওয়াল ছিল সম্পূর্ণ অর্ধচন্দ্রাকার কিন্তু বড়নগরে যেন দুইদিক হইতে সামান্য চাপ দিয়া অর্ধচন্দ্রের মধ্যস্থলকে একটু উঁচু করিয়া দেওয়া। মন্দিরদেহে বক্ররেখার এই রূপভেদ আরও বেশি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে কার্নিস রচনায় ও আচ্ছাদনের গতিভঙ্গে। বক্ররেখার এই গতি-বৈচিত্র্য আচ্ছাদনের রূপটিকে করিয়া তুলিয়াছে আয়ত আঁখি পল্লবের মতন। দেওয়ালের উপর অবস্থিত আচ্ছাদনটি দেওয়াল ছাড়াইয়া সামান্য একটু আগাইয়া আসিয়াছে। উপরে তাহারই প্রান্তভাগে দুইটি সঙ্কীর্ণ উদ্গত রেখা আচ্ছাদনের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বাহিয়া অগ্রসরমান। ইহার পরেই দুইটি স্বল্পোচ্চ চালা আচ্ছাদন পরস্পরের দিকে ঝুঁকিয়া উঠিয়া যাইতেছে। উপরের দিকে উঠিবার সময় সাধারণ চালা আচ্ছাদনের মত ইহা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বহির্বর্তুল নহে, বাহিরের দিকে একটু চাপা। এই আকৃতিটিকেই ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে মধ্যস্থলে ঈষৎ উচ্চায়ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখার বন্ধনে। দুইটি চালার সংযোগস্থলে অর্থাৎ আচ্ছাদনের সর্বোচ্চ স্থান বাহিয়া একটি ঈষৎ স্থূল উদ্ধত রেখা। রেখাটি নিরবচ্ছিন্ন নহে, ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি ও তাহার দুইপার্শ্বে দুইটি চূড়া। চূড়াগুলি আবার শিখর মন্দিরের আকারে গঠিত। ইহাদের আমলকশীর্ষ হইতে উঠিয়াছে একটি করিয়া ধ্বজদণ্ড। ইহারাই দেবতার আয়ুধ বহন করিতেছে।

বড়নগরের চারবাংলায় আচ্ছাদনের বক্ররেখা অন্যান্য দোচালা আচ্ছাদনের মত অর্ধচন্দ্রাকার গতিপথ বাহিয়া একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়া যায় নাই। দেখিলে মনে হয় দুইদিক হইতে দুইটি রেখা যেন একটু শ্লথতার সহিত অগ্রসর হইয়া কেন্দ্রস্থলে মিলিয়া গিয়াছে। একটু আগেই যে বলিতেছিলাম ইহাদের আচ্ছাদন মধ্যস্থলে ঈষৎ উচ্চায়ত, তাহার কারণ বোধকরি রূপকল্পনার এই বৈশিষ্ট্য। একটু ভাবিলেই বোঝা যায় চারচালা, আটচালা বা শিখর ও ভদ্রমন্দিরে আচ্ছাদনকে চারিদিক হইতে গড়িয়া তুলিয়া একটি বিন্দুতে মিলাইয়া দিবার যে পদ্ধতি দোচালার সীমিত সুযোগের মধ্যে তাহাকে প্রয়োগ করিবার প্রচেষ্টা হইতেই এই রূপকল্পনার জন্ম এবং রেখা প্রবাহের সংযত গতি। রূপ নির্ধারক বক্ররেখার এই গতিভঙ্গের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ করি আচ্ছাদনের বহির্ভাগ একটু চাপা, সাধারণ চালা আচ্ছাদনের মত বর্তুলায়িত নহে।

চারবাংলার চারিটি মন্দিরে রূপকল্পনা ও নির্মাণ-কৌশলে প্রকারভেদ না ঘটিলেও অলঙ্করণের দিক দিয়া প্রত্যেকটিরই কিছু স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। উত্তর দিকের মন্দিরটির অলঙ্করণই সর্বাধিক সমৃদ্ধ। ইহার মুখভাগ পোড়ামাটির অপরূপ মূর্তি ও ডিজাইনে একেবারে আবৃত করিয়া ফেলা। দুই পার্শ্বের দেওয়ালেও পোড়ামাটির মূর্তি সন্নিবিষ্ট। ইহার পরেই পশ্চিমের মন্দিরটি। ইহারও মুখভাগ পোড়ামাটির মূর্তি সজ্জায় অলংকৃত তবে পূর্ববর্তীটির মত অত বিস্তৃত নহে। দক্ষিণের

মন্দিরের দেওয়ালে মূর্তি সামান্যই, প্রস্ফুটিত পদ্মের সারিই তাহার মুখভাগের প্রধান সজ্জা। পূর্ব দিকের মন্দিরটিতে কিন্তু অলঙ্করণের মাধ্যম আর পোড়ামাটি নহে। পাথের পলস্তারার উপর অত্যন্ত নীচু রিলিফে মূর্তি ও ডিজাইন কাটিয়া তাহার অলঙ্করণ পরিকল্পনা।

বাংলাদেশের মন্দির স্থাপত্যের ইতিহাসে দোচালা মন্দিরের স্থান অতিশয় সঙ্কীর্ণ। জনপ্রিয়তা ইহা কখনই অর্জন করিতে পারে নাই। বাসগৃহের ক্ষেত্রেও দোচালার নিদর্শন খুব কমই চোখে পড়িবে। চালা রীতির এই রূপটির প্রতি অনীহা যে কি কারণে তাহা খুব স্পষ্ট নহে। কিন্তু স্বল্প বিস্তারের মধ্যেও চারবাংলা মন্দির সংস্থানের স্থপতিবৃন্দ রূপকল্পনা ও গঠন-নৈপুণ্যের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

পৌরাণিক ভারতে বনানী

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর বৈদিক কিন্তু প্রাক-মৌর্যযুগে (১৪০০ খৃঃ পূঃ থেকে প্রায় ৩০০ খৃঃ পূঃ অবধি) ভারতীয় বন সম্পর্কে অনেক খবর পাওয়া যায় বিভিন্ন পুরাণ অধ্যয়নে। রামায়ণ, মহাভারতে বিভিন্ন চরিত্রের বনবাস, ভ্রমণ ইত্যাদি থেকে বনের বিস্তৃতি, বিষ্ণুত্তোরপুরাণ থেকে ভারতের বিভিন্ন গভীর বনের সীমানা আহরণ করে সেই যুগের অরণ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে মোটামুটি অবস্থা জানা সম্ভব।

এ কথা আজ স্বীকার্য যে, রামায়ণ বা মহাভারতে কিছু কিছু অংশ উত্তরযুগে অন্তর্যোজিত, তাই আমরা রামায়ণ এবং মহাভারতের সেই সেই অংশ যাতে কোন যোজনার চিহ্ন নেই, তার থেকে বনের বিস্তৃতির ছবিটি তৈরির চেষ্টা করব।

মহাভারতের আদিপর্বে জতুগৃহ ভস্মসাৎ হবার পর পাণ্ডবগণ বারণাবত শহরে অবস্থিত জতুগৃহ থেকে পালালেন এবং ব্রাহ্মণের বেশে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার পর পাঞ্চালদেশে এসে দ্রৌপদীকে বিয়ে করলেন। তাদের এই বৃত্তান্তের মধ্যে তখনকার কালের এই অঞ্চলের বনের বিস্তৃতি সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা আসে। তাদের পথ ছিল মোটামুটি—'এদিকে পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে রজনীযোগে বারণাবত (বারানসী—কানিংহামের মতে) নগর হইতে বহির্গমনান্তর নৌকারোহণপূর্বক নাবিকগণের ভুজবল, নদীর স্রোতবেগ ও বায়ুর অনুকূলবশতঃ অতি ত্বরায় গঙ্গা পার হইলেন। পরে নক্ষত্র দ্বারা দিঙ্‌নিরূপণ করিয়া স্থলপথে ক্রমাগত দক্ষিণে গমন করিতে লাগিলেন।'…আবার এই যাত্রাতেই, 'অনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ বল্কলাজিন পরিধান ও জটাবন্ধনপূর্বক বনে বনে ভ্রমণ করতঃ মৎস্য (জয়পুর দেশ), ত্রিগর্ত (জলন্ধর দোরাব), পাঞ্চাল (বেরিলী অঞ্চল)…সত্বর গমনে চলিলেন।' এর পর ব্যাসদেবের সংগে দেখা হলে ব্যাসদেব তাদের অনতিদূরবর্তী এক সুরম্য নগরীতে থাকতে অনুরোধ করলেন। এর কিছুদিন পরে পাণ্ডবগণ সন্তুষ্টচিত্তে জননী কুন্তী দেবীকে অগ্রে লইয়া 'অবন্ধুর মার্গ অবলম্বনপূর্বক উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা দিবারাত্রি মধ্যে সোমাশ্রয়ায়ণ নামক এক তীর্থে গমন করিয়া জাহ্নবী তীরে উপনীত হইলেন।…'

'অতঃপর পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে সন্দর্শন করিবার মানসে জননী সমভিব্যাহারে দ্রুতপদে মহোৎসবময় জনপদে গমন করিলেন। পথিমধ্যে কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত তাহাদের দেখা হইল।' …ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'তোমরা অদ্যই পাঞ্চাল দেশে চল। ইত্যাদি—অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডবদের এই অজ্ঞাতবাস মোটামুটি এলাহাবাদ, জয়পুর, জলন্ধর, বেরিলী অঞ্চলে। এই অঞ্চলের বর্ণনা মহাভারতে আছে—তাহারা পথিমধ্যে বারণাবত (বারাণসী) শহর থেকে এসে গঙ্গার দক্ষিণে এলাহাবাদ অঞ্চলের এক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলেন।…ভীমসেনের গমনকালে তাহার উরুবেগে বনস্থ বৃক্ষ সকল শাখা-প্রশাখার সহিত কম্পমান হইতে লাগিল।' আবার ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ঐ সময়ে তাহারা আর এক বনানীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 'ঐ অরণ্যে

জল বা কোন প্রকার ফলমূল নাই।'...'হে মহারাজ, ঐ বনের অনতিদূরবর্তী বিশাল এক শালবৃক্ষ ছিল।' 'বনে বনে ভ্রমণ করতঃ মৎস্য, ত্রিগর্ত, পাঞ্চাল, কীচক প্রভৃতি নানা দেশ মধ্যবর্তী পরম রমণীয় কালপরম্পরা ও মনোহারিণী সরোজশালিনী সরসী নিরীক্ষণ করিয়া বলপূর্বক বহুবিধ মৃগ বধ করিতে করিতে সত্বর গমনে চলিলেন।' ইত্যাদি।

এই সমস্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে মনে হয় যে এই অঞ্চল যা আজ প্রায় বনশূন্য সেই সময়ে বনে যথেষ্ট পরিবৃত ছিল। যদিও নগরীর প্রমাণ যথেষ্ট রয়েছে এই অঞ্চলটুকুতে, তবু প্রতি নগরের মাঝে মাঝে যথেষ্ট লোকালয়ের অভাব এবং বনের প্রাদুর্ভাব। অন্যান্য পর্বাধ্যায় থেকে অবশ্য জানা যায় যে, মৎস্য অর্থাৎ জয়পুর, আলোয়ার এবং ভরতপুরের চারদিকের অঞ্চল ধীরে ধীরে শুষ্ক এবং মরুভূমিপ্রায় (মারুত) হয়ে আসছে।

খাণ্ডবদাহন পর্বাধ্যায়ে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন একদিন ইন্দ্রপ্রস্থে থাকাকালীন, 'গ্রীষ্মের অতিমাত্রায় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, অতএব আমরা সপরিবারে যমুনায় যাইয়া জলবিহার করিতে অভিলাষ করি। সায়ংকালে সকলে প্রত্যাগমন করিব। তোমার কি অভিরুচি হয়?' তাহারা সবাই যমুনার ধারে গিয়া নিকটস্থ খাণ্ডববন দহন করিলেন যা সবারই জ্ঞাত। তবে খাণ্ডববন যে বিস্তৃত এবং জন্তু-জানোয়ার সমাবৃত তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নীচে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তি থেকে।—

—"বৈশম্পায়ন কহিলেন, 'খাণ্ডব অরণ্য নিবাসী রাক্ষস, নাগ, তরক্ষ, ভল্লুক, মদস্রাবী হস্তী, শার্দুল ও সিংহ ইত্যাদি জন্তুগণ এবং প্রাণী সমুদয় শৈল পতনে ভীত হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। তেজস্ব রূপ গ্রহণপূর্বক ভগবান হুতাশন সপ্তশিখা বিস্তার করতঃ চতুর্দিকে প্রজ্জলিত হইয়া খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। কোন যুগান্তকালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আবার এইরূপে কৃষ্ণার্জুন কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ভগবান হুতাশন পঞ্চদশাদিবসে সেই বন দগ্ধ করিলেন। এই পঞ্চদশ দিনের মধ্যে তত্রস্থ সমস্ত জীবজন্তুই সেই প্রচণ্ডানলে দগ্ধ হইল।"
E. P. Sttebbing তাঁর বই 'The Forests of India'তে খাণ্ডবদহন সম্পর্কে বলেছেন, 'The ancient epic Mahabharat tells of the burning of the Khandaba forest. The forest appears to have been situated between the Ganges and Jmuna rivers and the description forms the first semi-historical evidence of the destruction of forests by the early settlers.

যাই হোক, অধুনা গঙ্গা-যমুনা অঞ্চল যথেষ্ট শুষ্ক এবং মোটামুটি বনহীন। তখন বোধ করি সবুজ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। "The burning of the forest was carried out with great difficulty owing to frequent rains which Indra poured down to quench the fire.' (—Stebbling). আরণ্যক পর্বাধ্যায়ে দেখা যায় যে, এই বনাঞ্চল ইন্দ্রপ্রস্থের আরও পশ্চিমে বিস্তৃত। বনবাস শুরুতে পাণ্ডবগণ—'কাম্যক বনবাস উদ্দেশ্যে জাহ্নবীকূল হইতে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। তাঁহারা ক্রমে সরস্বতী, দৃশবতী ও যমুনায় স্নান করতঃ ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে এক বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সরস্বতী তীরস্থ মরুস্থল সমীপে মুনিজনপ্রিয়

কাম্যকবন নিরীক্ষণ করিলেন (পৃঃ ৮)। কাম্যকবনের একটি ছোট বর্ণনা দিয়েছিলেন বিত্নর ধৃতরাষ্ট্রকে—'হে রাজেন্দ্র, দ্যূত-পরাজিত পাণ্ডবেরা ঐ স্থান হইতে নির্বাসিত হইলে তিন দিবস অহোরাত্র গমন করিয়া অতি ভীষণ নিশীথ সময় নরমাংসলোলুপ নিশাচরগণ সমাকীর্ণ কাম্যকবনে উত্তীর্ণ হইলেন।'···ইত্যাদি। এই স্থানেরই আশেপাশে আরও জঙ্গলের কথা বলা আছে, যেমন—কুরুজঙ্গল, অথবা 'সুখশীল নরেন্দ্রপুত্র পাণ্ডবগণ সরস্বতী তীরস্থ শালবনে অবস্থিতি করিয়া অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।' অথবা, 'অনন্তর ধর্মচারী পাণ্ডবগণ পবিত্র সরোমণ্ডিত সুরম্য দ্বৈতবনে (সরস্বতী নদীর ধারে—এইচ. রায়চৌধুরী) বাস করিবার অভিলাষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, বর্ষা প্রারম্ভে তমাল, তাল, আম্র, মধুক, নীপ, কদম্ব, অর্জুন, কানিকার প্রভৃতি মহীরুহ সকল প্রফুল্ল কুসুমসমূহে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে।' এই সরস্বতী, দৃশ্বতী নদী যা তখন দক্ষিণে প্রবাহিত হত আজ তার চিহ্ন নেই পশ্চিম উত্তর প্রদেশে অথবা রাজস্থানে। তারই স্থানে শুষ্ক মৃত বালিয়াড়ী ঘাঘ্‌ঘর নদী বহন করেছে সেদিনের শীতল জলের স্বাক্ষর। নল-দময়ন্তী উপাখ্যান থেকে চেদী, বিদর্ভ, নিষদ রাজ্যের অর্থাৎ অধুনা ইন্দোর, বিন্ধ্যপর্বত, ঔরঙ্গাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলের জঙ্গলের বিস্তৃতির খবর পাওয়া যায়। নল-দময়ন্তীকে বারে বারে চলে যেতে অনুরোধ করতে লাগলেন এই কথা বলে—'এই বহুসংখ্যক পন্থা, অবন্তীনগর ও বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ পথাভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে। এই নিবিড় বিন্ধ্যাচল, এই পয়োষ্ণী নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই পথ অবলম্বন করিয়া বিদর্ভ দেশে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং এই পথ কোশলায় গমন করিয়াছে। ইহার দক্ষিণে অবস্থিত দেশকে দক্ষিণাপথ বলে।' দময়ন্তী সেকথা শুনলেন না এবং নল তাঁকে পরিত্যাগ করলেন, নিষদরাজ প্রস্থান করিলে দময়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সেই বরবর্ণিনী জনশূন্য অরণ্যে আপনাকে একাকিনী ও পতিবিরহিণী নিরীক্ষণ করিয়া···।' ইত্যাদি। আবার, 'একাকিনী ভীষণ কাননে নানাবিধ ভয়ঙ্কর ও আশ্চর্য ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কোনস্থান ঝিল্লিকারবে পরিপূর্ণ, কোন স্থানে ভীষণাকৃতি সিংহ, মহিষ, দ্বীপী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও মৃগগণ বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে শাল, বেনু, অশ্বত্থ, তিন্দুক, ইঙ্গুদ, কিংশুক, অর্জুন' অরিষ্ট, স্যান্দন, শোনমল, পাদপে সমাকীর্ণ।' এই স্থান হইতে বোধ করি আরও পূর্বদিকে যেতে থাকলেন দময়ন্তী বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর দিয়ে এবং অপর এক অতি ভীষণ প্রদেশে উপস্থিত হলেন। তথায় অনেকানেক বৃক্ষ, নদী, পর্বত, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি অদ্ভুতদর্শন বস্তু দর্শন করিতে লাগিলেন। এর পর দময়ন্তী চেদী দেশে এসে পৌছলেন। এই উপাখ্যান থেকে বোঝা যায় যে বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে অর্থাৎ ইন্দোর, ভুপাল অঞ্চল যথেষ্ট জঙ্গলে সমাকীর্ণ ছিল। আমরা আগে বলেছি যে মৎস্য, ত্রিগর্ত থেকে শুরু করে পূর্বে যমুনা এবং গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে জঙ্গলের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। গোহরণ পর্বাধ্যায় থেকে বোঝা যায় যে মৎস্য দেশে যথেষ্ট গরু রাখা হত এবং হয়ত তাদের পশুপালনই প্রধানতম জীবন ধারণের উপায় ছিল। এই উপাখ্যানে কৌরবরা ত্রিগর্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে মৎস্যাঞ্চল থেকে প্রায় ষষ্ঠি সহস্র গোধন অপহরণ করেন। এই উপাখ্যানেই মনে হয় যে, এই অঞ্চল তখন হয়ত গোচারণের জন্যই জঙ্গলের অভাব ঘটতে শুরু করেছে এবং এই বিরাট বনাঞ্চল পশ্চিম সীমায় মৎস্যতে এসে ঠেকেছে। [মৎস্য—আধুনিক আলোয়ার এবং জয়পুর ভরতপুরের চারিদিকের অঞ্চল—কানিংহাম]

ভূতাত্ত্বিক যুগে রাজপুতানা অঞ্চল ছিল বনাকীর্ণ। উদ্ধার করা ফসিল থেকে বোঝা যায় যে সেখানে বৃষ্টিপাত খুব বেশি করে হত যাতে করে আবহাওয়া ছিল স্যাঁতসেতে এবং সমুদ্রের একটি শাখা প্রায় রাজস্থান অঞ্চল পর্যন্ত ঢুকে এসে ছিল। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার সময়ও এখানে জঙ্গল ছিল যথেষ্ট এবং সেই সমস্ত জঙ্গল কেটে কাঠ পুড়িয়ে তখনকার ইট তৈরি হত। মহাভারতের যুগে যেখানে সরস্বতী, দৃশদ্বতী নদী সুশীতল জল নিয়ে প্রবাহিত, কিন্তু আবহাওয়া শুষ্ক হতে আরম্ভ হয়েছে এবং সহস্র সহস্র গোচারণে যা কিছু জঙ্গল আছে তাও প্রায় বিনষ্ট হতে চলেছে। এর কয়েকশত বছর পরে সরস্বতী নদী শুষ্ক হয়ে গেল। সমস্ত বন কর্তিত। রাজপুতানা মরুভূমিতে রূপান্তরিত।

রামায়ণ উপাখ্যান থেকে পূর্বভারতের জঙ্গলের উপস্থিতি সম্পর্কে খবর পাওয়া যায় বালকাণ্ডতে। বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে অযোধ্যার সরযু (আজকের ঘর্ঘরা) থেকে পূর্বে এসে গঙ্গা-ঘর্ঘরার সঙ্গম স্থানে রাত্রি বাস করলেন এবং এখানেই গঙ্গা অতিক্রম করে দক্ষিণে গেলেন (অর্থাৎ আধুনিক সাহাবাদ বক্সর অঞ্চলে—কানিংহাম) এবং তারকাবধ করলেন। এখানের জঙ্গলের সম্পর্কে বাল্মীকি বলেছেন—"অতঃপর তাঁহারা গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবতরণপূর্বক দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। ইক্ষাকুকুলনন্দন রাম সম্মুখে এক ভীষণ বন দেখিয়া মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবান, একি ভীষণ বন দেখিতেছি। এ যে অতি দুর্গম, ইহা ঝিল্লীরবে মুখরিত এবং ভয়ঙ্কর শ্বাপদসমূহে সমাকীর্ণ। নানাবিধ বিহঙ্গকুল বনমধ্যে ভৈরবরবে নিরন্তর চীৎকার করিতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, হস্তীযুথ চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছে। অশ্বকর্ণ (শাল) কুম্ভ বিল (বেল) তিন্দুক, পাটল ও বদরী প্রভৃতি পাদপসমূহে উহা পরিব্যপ্ত। এই বিরাট বনোপত্তির কারণ কি?"

পালামৌ অঞ্চলের আজকের জঙ্গল তখন বোধকরি আরও বিস্তৃত ছিল উত্তরে গঙ্গার ধার পর্যন্ত। গাছের বিবরণ দেখে মনে হচ্ছে যে তখনকার বনের প্রকৃতি আজকের থেকে খুব একটা ভিন্ন নয়। এই একই ভ্রমণবৃত্তান্তে আমরা দেখতে পাই যে বিশ্বামিত্র রামকে শোন নদীর ধারে এসে বন সমৃদ্ধ কৌশাম্বী রাজ্যের (অধুনা পাটনার) কাছ দিয়ে মিথিলায় নিয়ে আসেন। বিশালা পুরীর নিকট দিয়ে (বিশালা—মজফরপুর জেলায়)। এই স্থান সম্পর্কে বাল্মিকী বলেছেন যে, সাহাবাদ (আরা অঞ্চল) যথেষ্ট বনসমৃদ্ধ। কিন্তু শোন নদীর ধার দিয়ে দিয়ে ক্ষেত আছে "উহার উভয় তীরস্থ ভূমি উর্বর, উহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। (বালকাণ্ড)

বনবাস পর্বে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা কোশল রাজ্য ধরে দক্ষিণদিকে প্রথমে তমসা, পরে গোমতী এবং তারও পরে গঙ্গা অতিক্রম করলেন এবং বৎস্য দেশে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে প্রয়াগে গিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের চিত্রকুট পর্বতে বসবাস করলেন, সেখান থেকে পশ্চিমে গিয়ে পরে বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে দণ্ডকারণ্যে রইলেন। এইখানে থাকার সময় ইতঃস্তত গমনকালীন তাঁরা পৌঁছলেন পঞ্চবটীতে। পঞ্চবটী গোদাবরী নদীর ধারে অবস্থিত অধুনা নাসিকের কাছাকাছি। সীতা অপহরণের পর তারা সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে মাদ্রাজের পম্পা সরোবরের ধারে ঋষ্যমূক পর্বতে গমন করলেন। অর্থাৎ রামের অরণ্যনিবাসের পর্বে দেখা যাচ্ছে তিনি মোটামুটি অধুনা

অযোধ্যা থেকে এলাহাবাদ, এলাহাবাদ থেকে দণ্ডকারণ্যের মধ্য দিয়ে, গোদাবরীর প্রায় উৎপত্তিস্থল এবং পরে মাদ্রাজ অঞ্চলে গমন করেছেন। সুগ্রীবের সাথে এই জায়গা থেকে তারা কিষ্কিন্ধ্যাতেও গেছিলেন বালির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে। অরণ্যকাণ্ডের এই সমস্ত পর্বগুলো পড়লে দেখা যায় যে, কোশল রাজ্য (যা অধুনা গঙ্গার উত্তরের উত্তর প্রদেশ) অঞ্চল তখন যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিলো, "রাম লক্ষ্মণ কোশল দেশের মধ্য দিয়া চলিতেছিলেন। কোশল ধনধান্যে পরিপূর্ণ ও দানশীল ব্যক্তির বাসভূমি, তথায় কোথা হইতেও কখনো ভয়ের সম্ভাবনা নাই; কত কত চৈত ও যুপ শ্রেণীদ্বারা উহা সমালঙ্কৃত; তথায় অসংখ্য উদ্যান ও আম্রবন বিরাজমান, সরোবর সকল শোভমান ইত্যাদি" অর্থাৎ রামায়ণের সময়ে এই গঙ্গার উত্তরাঞ্চল যথেষ্ট লোকজন সমাকীর্ণ হয়ে কৃষিক্ষেত্র এবং নগরী গ্রাম স্থাপন হয়েছে। শৃঙ্গবেরপুর (বর্তমান চুনারের গঙ্গার অপর পারে কোনো স্থান) অঞ্চলের কাছে রাম, লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হয়ে পশ্চিমে প্রয়াগের দিকে যেতে থাকলেন। "রাম, লক্ষ্মণ, সীতা সে-রাত্রি সেই বৃক্ষতলে অতিবাহিত করিয়া পরদিন সূর্যোদয়ে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, তাঁহারা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যেখানে গঙ্গা, যমুনার সম্মিলন হইয়াছে, সেই স্থান উদ্দেশ্য করিয়াই যাইতে লাগিলেন"। "আবার আমরা নিশ্চয়ই গঙ্গা, যমুনার সঙ্গমস্থলে আসিয়া পৌছিয়াছি। ঐতো নদীর জলের সংঘট্ট শব্দ শুনা যাইতেছে। ঐ দেখ, বনজীবীগণ কাষ্ঠদণ্ড বিদীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।" According to Ramayana. Kashi was a kingdom while Prayaga and the country around was still forests.—Cunningham." সঙ্গম থেকে যমুনার পশ্চিমে চিত্রকূট দিকে যাইতে যাইতে রাম কমলনয়না সীতাকে বললেন—"বৈদেহি, ঐ দেখ, বসন্তাগমনে কিংশুক তরুগণ স্বীয় প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহ দ্বারা যেন মাল্যধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঐ সকল পাদপ শ্রেণী দ্বারা পর্বতের চতুর্দিক যেন প্রজ্জলিত হইতেছে। দেখ দেখ পর্বতে মধুপেরা কেমন মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, উহাদের কৃত মধুচক্র সকল এক একটি প্রচুর পরিমাণে লম্বিত রহিয়াছে।" এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় যে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে তখনও কোশল রাজ্যের মত যথেষ্ট বসতি নেই বরং বন এবং মুনিঋষিদের বা কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের বসবাস ছিল। জঙ্গল কিছু কিছু তখনও পরিষ্কার হচ্ছে তা বিদীর্ণ পড়ে থাকা কাষ্ঠখণ্ডের উল্লেখ থেকে মনে হয়। তবে এই জঙ্গলের পরিমাণ এত যথেষ্ট ছিল যে তা বহুবছর ধরে কর্তিত হয়ে আজকে বনহীন হয়েছে। জাতকে দেখা যায় যে—"There stood near Benaras a great town of Carpenteri containing a thousand families" (Combridge translation of Jatake's)! চিত্রকূট থেকে পুতচিত্ত দুধর্ষ রামচন্দ্র এইবার যে মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন তার নাম দণ্ডকারণ্য। দণ্ডকারণ্য —বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ হইতে মাল্যবান পর্বত পর্যন্ত সুবিস্তৃত বিভাগ। এই অঞ্চলটি যথেষ্ট বন পরিপূর্ণ ছিল। কয়েকটি স্তবক তুলে দিয়ে তার প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে—"সেথায় নানা মৃগ বাস করিতেছে, বৃক্ষ, লতা ও গুল্মসকল ছিন্নভিন্ন রহিয়াছে", "তাহারা পথ চলিতে দূরে অদূরে কত শৈলগুচ্ছ, কত বনভূমি, কত রম্যনদী, কত নদী পুলিনবিহারী সারস, কত চক্রবাক কত সরোবর তদুপরি কত জলজাত বিহঙ্গ, কত মনোমত হরিণাযুথ, কত মহিষ, কত বরাহ বৃক্ষবৈরী হস্তী দেখিতে পাইলেন", গোদাবরী তীরের জনস্থান (বোম্বাই প্রদেশের আরব সাগরের পশ্চিম সংলগ্ন বিস্তৃত

ভূখণ্ড) মধ্যবর্তী পঞ্চবটীতে (পঞ্চবটীবন গোদাবরী নদীর উৎপত্তি স্থান সৌরাষ্ট্রের নিকটবর্তী, বর্তমান নাসিক জেলার কাছে) বন প্রাদুর্ভাব রয়েছে। তবে এইখানে এসে কিছু কিছু জনপদ ছিল বলে মনে হয়।

সীতাহরণের পর রাম লক্ষ্মণ সীতা অন্বেষণে—পঞ্চবটী নিকটস্থ কোন স্থান হইতে 'দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে এমন একটি ভীষণ দুর্গম বন্যপথে উপস্থিত হইলেন, যে সেথায় জনসমাগমের চিহ্নমাত্র নেই, অসংখ্য গুল্ম বৃক্ষ লতাজালে উহা সর্বদিকের সমাদৃত, জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে একটি নিবিড় বন বিদ্যমান। কি ভীষণ স্থান। ভয়ঙ্কর মৃগ, পক্ষী সকল চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছে, নানা জাতীয় বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, বিরাজিত, অতি ঘোর নির্জন অরণ্য, একটি পর্বত তথায় অবস্থিত"। কবন্ধ রামকে পম্পা নদীর সরোবরের রাস্তা সম্পর্কে বললেন—"পম্পা তীরে পৌছাইতে হইলে এই অতি উত্তম পথ। ইহার পশ্চিম দিয়া আশ্রয় করিয়া ঐ কত মনোরম পুষ্পিত পাদপ বিরাজ করিতেছে। জুন্দু, পিয়াল, পনম, ন্যগ্রোধ,—তিন্দুক, অশত্থ, কর্নিকার, নাগকেশর, তিলক, অশোক কদম্ব, করবী অগ্নিমুখ্য, রক্তচন্দন—প্রভৃতি বহু বৃক্ষ রহিয়াছে।...

আপনারা পর্বত ও পর্বতান্তরে, বন হইতে বনান্তরে যাইতে যাইতে বহু পঙ্কজশালিনী পম্পা নদী প্রাপ্ত হইবেন। (পম্পা—অধুনা তুঙ্গভদ্রা)।

বালিকে মারবার জন্য ঋষ্যমূক পর্বত থেকে (ঋষ্যমূক পর্বত তুঙ্গভদ্রার তীরে পূর্বঘাট পর্বত মালা এবং নীলগিরির মঝামাঝি কোন স্থান) কিষ্কিন্ধ্যার দিকে যেতে থাকলেন (কিষ্কিন্ধ্যা—বর্তমান বেলারি জেলা), এই রাস্তার বর্ণনায় বাল্মিকী বলছেন—"কোথাও নব তৃণাঙ্কুর ভোজী হরিণেরা নির্ভয়ে চড়িয়া বেড়াইতেছে। কোথাও পর্বত প্রমাণ শুভ্রদণ্ড ভীষণ বন্য গজগণ কাষ্ঠবিদারণ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন সিংহ, ব্যাঘ্রাদি নানা বনচর পশু ও আকাশবিহারী বহু বিহঙ্গম তাহাদের নয়নগোচর হইল।

রামায়ণ মহাভারতের পঠন থেকে অতএব আমরা তখনকার বনবিস্তৃতি সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সারা ভারতবর্ষেই প্রায় বনের প্রাদুর্ভাব রয়েছে এবং বনের ঘনত্ব যথেষ্ট। শহর, জনপদ, নগরী এবং লোকালয় গড়ে উঠেছে সব থেকে বেশি স্তরে ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লী), হস্তিনাপুর (মীরাট) থেকে পূর্বে অযোধ্যা পর্যন্ত। গঙ্গার দক্ষিণে এলাহাবাদ অঞ্চল থেকে শুরু করে বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর দিয়ে পশ্চিম সুরাট পর্যন্ত মাঝে মাঝে সামান্য সামান্য জনপদ। যথা—মৎস্য, বৎস্য, (আলোয়ার) পঞ্চবটী থাকলেও সমস্তই প্রায় ঘন বন ছিল আবার দক্ষিণে গোদাবরী থেকে তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত কিছু কিছু জনপদ ছাড়া বিস্তৃত বনের খবর পাওয়া যায়।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে রামায়ণ মহাভারত যুগের কিছু পরের সময়ের বনের বিস্তৃতির একটি সম্পূর্ণ তথ্য আছে। আটটি গজবনের (গজবন অর্থাৎ হাতীর প্রাধান্য যে বনে আছে) নির্দেশ; যথা—

১। প্রাচ্যবন—নেপাল, বিহার, উত্তর প্রদেশের বন।

২। করুষবন—বুন্দেলখণ্ড, বাঘেলখণ্ড, রেওয়া, মির্জাপুর।

৩। দশার্ণক বন—বেটিয়ানদীর দক্ষিণে ভূপাল ষ্টেট।

৪। বামনবন—গোয়ালিয়র ষ্টেট।

৫। কলেষাবন—নর্মদার দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যে।

৬। অপারণ্টক বন—উত্তর বোম্বাই।

৭। সৌরাষ্ট্র বন—সৌরাষ্ট্রের গির অঞ্চল।

৮। পঞ্চনদ বন—পাঞ্জাবের বন।

এ ছাড়াও ছিল দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্যের নাম নেই যার প্রমাণ অন্যান্য পুরাণে আছে।

এই বনসমৃদ্ধ ভারতবর্ষ কেমন করে ধীরে ধীরে বনজের অভাবে পৌছল সে এক বিচিত্র কাহিনী—কিন্তু তা অন্য বিষয়।

রাসীনের প্রথম বিশিষ্ট নাটক, যে নাটক সমগ্র দেশে সাড়া জাগিয়ে তোলে সে নাটক আন্দ্রোমাশে (Andramashe) নাটকের ঘটনাস্থল এচিলাসের (Achiller) পুত্র পীঢ়াসের (Pyrrhus) প্রাসাদ ; এচিলাস ট্রয় নগর অবরোধের সময় হেক্টরকে (Hector) হত্যা করেন ; পীঢ়াস হেক্টরের বিধবা পত্নী আন্দ্রোমাশে এবং তার পুত্র অষ্টিয়ানক্সকে (Astyanox) বন্দী করেন। এই নাটকের মধ্যে তিনটি স্পষ্ট বিভিন্ন প্রেম কাহিনী দেখা যায়। পীঢ়াসের প্রেম আন্দ্রোমাশের জন্য, টয় রাজ্যের হেলেনের (Helen) কন্যা হারমিয়ন (Harmione) পীঢ়াসের প্রেমাকাতনী। আবার ওরেস্টেস (Orestes) হারমিয়নের জন্য প্রেমাতুর। এই নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে চরিত্র চিত্রণে ভাব-গাম্ভীর্য্য এবং প্রেমের ভাবাবেগের রূপায়ণে অপূর্ব দক্ষতা এবং তার উপরে ভাষার যাদুস্পর্শ।

গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিসের মত রাসীনেও দেখা যায় নারীর প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা আর সেজন্য নারী চরিত্র অপ্রকাশে অপূর্ব দক্ষতা। এই নাটকের মধ্যে দেখা যায় নারী চরিত্রের বিভিন্ন ভাবের উদ্ঘাটন ও রূপায়ণ—প্রেমের আবেগ, ক্রোধের রুদ্র ভাব, ভক্তির নমনীয়তা এবং প্রতিশোধের হিংস্রতা। হারমিওনের জীবনে যে অন্যায় অবিচার এবং নির্যাতনের দুর্ভোগ ঘটেছে তার সুষ্ঠু প্রকাশে রাসীন যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাতে এই নারী-চরিত্র এক অপূর্ব গৌরব লাভ করেছে। অপর পক্ষে আন্দ্রোমাশের চরিত্রও স্বকীয় বৈশিষ্টে লক্ষণীয়—একদিকে তার বীরশ্রেষ্ঠ স্বামীর স্মৃতির প্রতি আনুগত্য অপরদিকে সন্তানের জন্য মাতৃ-হৃদয়ের বাৎসল্য। এই দুই ভাবধারার মধ্যে যখন সঙ্কট দেখা দিল তখন নারী হৃদয়ের দুঃখ-বেদনার অভিঘাতে আন্দ্রোমাশের চরিত্র অসামান্য গরিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠল।

পীঢ়াস আন্দ্রোমাশেকে বিবাহ করবার জন্য আগ্রহান্বিত। আন্দ্রোমাশে যদি বিবাহে সম্মত না হন তবে তার পুত্রকে সমর্পণ করে দেওয়া হবে গ্রীকদের হাতে—তারা ওকে বন্দী করে রাখবে, হয়তো হত্যাও করতে পারে। আন্দ্রোমাশে সম্মত হলে পীঢ়াসের বাগদত্তা হারমিয়নের প্রতি অন্যায় অবিচার করা হবে এবং স্বামী হেক্টরের স্মৃতির প্রতিও হবে ব্যভিচার। পীঢ়াসের সহিত বিবাহেও সম্মতি দেওয়া চলে না অথচ পুত্রটিকে রক্ষা করতে হবে। তখন আন্দ্রোমাশে হারমিয়নের নিকট জানালেন, তিনি যদি পীঢ়াসের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে রক্ষা করতে পারেন। আন্দ্রোমাশের আশা ছিল যে তার প্রতি পীঢ়াসের সাময়িক মোহ সত্ত্বেও হেলেনের সুন্দরী কন্যা হারমিয়নের আন্তরিক প্রেমও পীঢ়াস অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।

আন্দ্রোমাশে হারমিয়নকে বলছেন—তুমি কেন চলে যাবে ? হেক্টরের বিধবা পত্নী তোমার পদতলে অনুনয় জানাচ্ছে, এতেও তোমার মনে কোন সাড়া জাগে না ? কিন্তু আমার এ অশ্রু ঈর্ষার অশ্রু নয়—তোমার প্রেমের পাত্র সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র ঈর্ষা নেই। নিষ্ঠুর নিয়তি আমার দয়িতকে নিয়ে গেছে, একমাত্র সেই হেক্টরই আমার চিত্তে প্রেমের অগ্নি জ্বালিয়েছিলেন, যে অগ্নি তাঁর প্রয়াণের সঙ্গেই নির্বাপিত হয়েছে। তিনি রেখে গেছেন একটি সন্তান। একদিন তুমি জানতে পারবে সন্তানের জন্য মাতার অন্তরে থাকে কি দরদ ; কিন্তু সেই সন্তানের জীবন যখন বিপন্ন হয়ে ওঠে তখন কি মর্মন্তুদ বেদনা মাতৃহৃদয়কে মথিত করে তোলে—ভগবান না করুন, সে অভিজ্ঞতা যেন তোমার জীবনে না আসে।

হারমিয়নের সাধ্য কি যে পীঢ়াসকে বশীভূত করবে—আন্দ্রোমাশেকে বললেন—তোমার চেয়ে বেশি আর কে তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারবে। তোমার নয়নের দৃষ্টির যাদুতে তাঁর আত্মা বিক্রিত।

উপায়ান্তর না পেয়ে আন্দ্রোমাশে পীঢ়াসের পদতলে গিয়ে আবেদন জানালেন—দেখ, আমাকে কি অবস্থায় এনে ফেলেছ। আমার পিতার হত্যা আমাকে দেখতে হয়েছে, আমি দেখেছি অগ্নির লেলিহান আবর্তে আমাদের ঘর-বাড়ি প্রজ্জ্বলিত, সমস্ত পরিজনবর্গ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার স্বামীর শবদেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত, তাঁর একমাত্র সন্তান আমার সঙ্গে বন্দীদশায়। তারই জন্য এই বন্দীদশা স্বীকার করে এখনও আমি বেঁচে আছি; বেঁচে আছি এই আশায় যে অন্যত্র গেলে আমার সন্তানের যে দুর্দশা হতে পারত তার চেয়ে এখানে হয়তো সে নিরাপদ আশ্রয় পাবে—যেমন পেয়েছে অপরাপর বহু রাজপুত্র।

পীঢ়াস তখন প্রেমোন্মত্ত, তিনি জবাব দিলেন—তোমার অশ্রু সম্বরণ কর, তোমার সন্তানকে বাঁচাবার উপায় তো তোমার হাতেই আছে। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমার চোখে কি বিচারের দৃষ্টি, তোমাকে দুঃখ দানে যার তৃপ্তি? তোমার সন্তানের জন্যই বলছি, আমার প্রতি বিরূপ হয়ো না। তোমার সন্তানটি বাঁচাবে, সেজন্য কি আমাকে তোমায় প্ররোচনা দিতে হবে, তোমার সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য আমাকে তোমার পায়ে ধরে সাধতে হবে? আবার এবং এই শেষবার বলছি, তোমার সন্তানকে বাঁচাও এবং নিজেকেও রক্ষা কর। আমি জানি আমি তোমার জন্য কত বড় সত্য ভঙ্গ করছি এবং তাতে নিজের উপরে কি ধিক্কার ডেকে আনছি। হারমিয়নকে বিদায় করে দিচ্ছি; যে মুকুট তার জন্য নির্ধারিত হয়েছিল, সেই রাজমুকুট হবে তোমার শিরোভূষণ। এক বছর আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি, আর আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। আবার ভেবে দেখ, তোমাকে সময় দিলাম, আমি আবার যখন আসব তখন তোমাকে নিয়ে যাব ধর্ম-মন্দিরে—সেখানে হয় তোমার সন্তান তোমার চোখের সামনে প্রাণ হারাবে অথবা তোমাকে মুকুট পরিয়ে দিয়ে আমি তোমাকে রাণীর পদে ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করব।

আন্দ্রোমাশে উপায়ান্তর না দেখে পীঢ়াসকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হলেন। অনুষ্ঠান শেষে পীঢ়াস রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে অন্দ্রোমাশেকে রাণী বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু গ্রীসের জনসাধারণ একজন ট্রোজান (Trojan) রমণীকে দেশের রাণী বলে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হল না; উন্মত্ত জনতা পীঢ়াসকে হত্যা করল। তার প্রতি শত অন্যায় অবিচার সত্ত্বেও হারমিয়নের পক্ষে পীঢ়াসই ছিলেন পরম দয়িত। হারমিয়ন সংবাদ পেয়ে এসে পীঢ়াসের বুকের উপরে পড়ে একবার মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকালেন এবং পরক্ষণে নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে নিজের জীবনাবসান করলেন। অপর পক্ষে ওরেস্‌টেস্ ছিলেন হারমিয়নের জন্য প্রেমে অভিভূত। হারমিয়নের মৃত্যুতে ওরেস্‌টেসের উন্মত্ত বিলাপে নাটকের পরিসমাপ্তি।

আন্দ্রোমাশের পরে কবির একমাত্র কমেডী কাব্য লে প্লায়েদুব; তার পরে ব্রিটানিকাস, তার পরে তিনখানা ট্র্যাজিডী—বেরোনিস্, বায়াসেট এবং মিথ্রিদাতে। এই শেষোক্ত নাটকখানা প্রকাশিত হয় ১৬৭৩ সালে। এই সকল নাটকের মধ্যে আর কিছু না হোক যে ভাব সৌন্দর্য্য এবং

কবিত্ব মাধুর্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার জন্তও লেখক অমরতা লাভ করতে পারতেন।

১৬৭৩ সালে রাসীন ফরাসী আকাদেমীর সদস্য নির্বাচিত হন; তার পরবর্তী দুবৎসরে ১৬৭৪ এবং ১৬৭৫ সালে রচিত হয় তার দুখানা অমর ট্রাজিডী নাটক যথাক্রমে ইফিজেনী এবং ফীদ্রে। ইফিজেনী নাটক সম্পর্কে ভলতেয়ার মন্তব্য করেছেন যে এই নাটকখানা ট্র্যাজিডী নাটকের চরম পরাকাষ্ঠা। এই নাটকে ভাবাবেগ এবং কাব্য সৌন্দর্যের অভাব নেই, তথাপি এই কথাও না বলে পারা যায় না যে এই নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যা কিছু আছে তার জন্য রাসীন ইউরিপিডিসের নিকট ঋণী।

অপর পক্ষে ফীদ্র নাটকখানা এক অপূর্ব সৃষ্টি এবং অমর প্রতিভার পরিচায়ক—এই নাটকের সৌন্দর্যদীপিতে যেন আছে স্বর্গ থেকে আনত প্রমেথিয়ুসের অগ্নির ভাস্বরতা। একজন সমালোচক এই নাটককে আখ্যাত করেছেন ফরাসী রঙ্গমঞ্চের "হ্যামলেট" বলে। রাসীনের পূর্বে এই একই বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছিলেন ইউরিপিডিস এবং সেনেকা কিন্তু চরম অভিব্যক্তি ঘটে রাসীনের লেখনিতে—নাটকের ভয়াবহতা অবলুপ্ত হয় করুণায় এবং একটি গ্লানিকর ঘটনা থেকে অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠে মহৎ আদর্শের বাণী।

নাটকের নায়িকা ফীদ্রের জীবন একটা অস্বাভাবিক পাপের গ্লানিতে অভিশপ্ত—অথচ এই পাপের জন্য তিনি নিজে দায়ী নন। তার অন্তরে জেগে উঠেছে তার সপত্নী পুত্র হিপ্লোলিটাসের জন্য দুর্দমনীয় প্রেমের আবেগ; এর মূলে আছে দেবী ভেনাস কোন কারণে ফীদ্রের প্রতি বিদ্বিষ্টা হয়ে তার জীবনে এই অভিসম্পাত এনে দেন—গ্রীক জীবনের অদৃষ্টবাদও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দেবতার অভিসম্পাত বলেই ফীদ্রে অত্যন্ত অস্বাভাবিক হলেও এই প্রেমের আবেগ উন্মত্ততা থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। অপর পক্ষে এই অস্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি তাঁর মত মাতৃহৃদয়া রমণীর পক্ষে কত গ্লানিকর সে সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন।

নাটকে যখন তিনি এসে প্রথম অবতীর্ণ হলেন তখন ফীদ্রে অত্যন্ত কাতরতায় অবসন্ন, অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর তিন দিন-রাত্রি কেটে গেছে। এমন অন্তর বেদনা কারও কাছে প্রকাশ করাও চলে না। তার অন্তরঙ্গ পরিচারিকা ঈনোনে জানতে চাইল, কি তার অন্তর বেদনা।

ঈনোনে—নিশ্চয়ই তোমার হস্ত রক্ত কলঙ্কিত হয়নি।

ফীদ্রে—ভগবানকে ধন্যবাদ আমার হস্ত রক্ত কলঙ্কিত নয়। হায় আমার হৃদয়ও যদি অমনই অকলঙ্কিত থাকত।

ঈনোনে—কিসের বিষে তোমার হৃদয় জর্জরিত?

ফীদ্রে—ক্ষমা কর। আমি আর কিছু বলতে পারব না।

কিন্তু ঈনোনের আগ্রহাতিশয্যে ফীদ্রে মুখ বন্ধ করে থাকতে পারলেন না।

ফীদ্রে—প্রেমের দুর্মদ আবর্তে আমি জর্জরিত।

ঈনোনে—কার প্রেমে?

ফীদ্রে—শুনলে তোমরা স্তম্ভিত হবে। আমি ভালবাসি এই কথা উচ্চারণ করতে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে—কি নিদারুণ অভিসম্পাত যে আমি ভালবাসি।

ঈনোনে—কাকে ভালবাস ?

ফীদ্রে—তোমরা জান সেই রাজপুত্র যাকে আমি নির্যাতিত করেছি।

ঈনোনে—হিপ্পোলিটাস ? ভগবান !

ফীদ্রে—তুমিই নামটি উচ্চারণ করে ফেললে !

ফীদ্রে ঈনোনেকে জানালেন তিনি এই অস্বাভাবিক চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধে কি করে সংগ্রাম করে চলেছেন, হিপ্পোলিটাসকে তিনি নির্বাসনে পাঠিয়েছেন যাতে তার সহিত প্রত্যক্ষ সাক্ষাত না ঘটে। তিনি ভেনাসকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাঁর সম্মানার্থে মন্দির তৈরি করে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু নিয়তি তাঁর বিরুদ্ধে। এই পাপের গ্লানি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন।

এক সময়ে ফীদ্রে শুনতে পেলেন, হিপ্পোলিটাস আর কাউকে ভালবাসে ; তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ তারা ভালবাসতে পারে বটে, তারা তো নিষ্পাপ।

আবার এক সময়ে তিনি কল্পনা করতে লাগলেন, এ জীবনের পরপারে যেখানে তার পূর্বপুরুষগণ সকলে সমবেত সেখানে গেলে তার পাপ কাহিনী সকলকে লজ্জায় অভিভূত করবে। পাপের গ্লানিতে অভিভূত হয়েও আমি বেঁচে আছি। এই যে সূর্য—সকল দেবগণের পিতৃস্থানীয় এই সূর্য আমার পূর্বপুরুষ, স্বর্গরাজ্য পৃথিবী—সকল ক্ষেত্রেই আছেন আমার পূর্বপুরুষগণ—কোথায় গিয়ে আমি লুকিয়ে থাকতে পারি ? নরকের অন্ধকার রাজ্যে ? সেখানে আমার পিতা মিনস সকল মানবাত্মার বিচারে নিয়োজিত। তিনি পিতা, কন্যাকে দেখে শিউরে উঠবেন যখন তিনি জানবেন তার পাপের কথা—যে পাপ নরকেও অজ্ঞাত।

ফীদ্রে যখন এরূপ মর্মন্তুদ যাতনায় প্রপীড়িত তখন ঈনোনে আবার মন্থরার ন্যায় কুমন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে পাপে প্ররোচিত করতে লাগল, তার ফলে ফীদ্রে পাপের আরও গভীরতর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু এই সুগভীর পাপ পঙ্ক থেকে তাঁকে উদ্ধার করলে কবির মহানুভবতা এবং সহানুভূতি। রাসীনের শিল্প কৃতিত্ব কল্যাণে ফীদ্রের চরিত্র এমনভাবে চিত্রিত হল যে, এ সকল পাপের গ্লানি ফীদ্রেকে স্পর্শ করতে পারল না, কারণ যেক্ষেত্রে তিনি দৈবাহত—নিয়তির কঠোর বিধানে অভিশপ্ত সেখানে ফীদ্রেকে পাপের জন্য দায়ী করা চলে না। ফীদ্রের উক্তিতে আছে—দেবতার অভিসম্পাত আমার অন্তরে জ্বালিয়েছে অনির্বাণ অগ্নিশিখা, সর্বনাশের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা এসে যুগিয়েছে ঈনোনের বিদ্বেষ বিষ। উপায়ান্তর না দেখে ফীদ্রে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেছে—দেবতার অভিসম্পাত থেকে মুক্ত হয়ে তিনি যেন নবজীবনের আলো দেখতে পেলেন—মৃত্যুর পরপারে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি নবজীবনের আলো, যে জ্যোতি সাময়িকভাবে তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল তাই যেন নতুন দীপ্তিতে ফিরে আসছে। যে চরিত্র পাপের অন্ধতম গহ্বরে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছিল কবি যে তাকে পরিয়ে দিলেন পবিত্রতার গৌরব মুকুট।

ভলতেয়ার মন্তব্য করেছেন—ফীদ্রের মত এমন আশ্চর্য চরিত্র রঙ্গমঞ্চে আর কোথাও দেখা যায় না। অপর একজন সমালোচকের মতে—বর্তমান যুগে অনুরূপ একটি চরিত্র চিত্রণের চেষ্টা দেখা যায় টমাস হার্ডির টেস, কিন্তু সেখানেও শেষ রক্ষা হয়নি।

সেক্সপীয়র একস্থানে স্বীকার করেছেন যে, রঙ্গমঞ্চের দূষিত আবহাওয়ায় এসে পড়ে তার প্রভাবে তাঁর আদর্শ চরিত্রের অবনতি ঘটেছিল। রাসীনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনার সংঘর্ষণ দেখা যায়। তাঁর চেহারা ছিল মনোমুগ্ধকর, তাঁর অন্তরে ছিল ভাবাবেগ, তাঁর চরিত্রগুণে তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র; কিন্তু রঙ্গমঞ্চের প্রভাবে প্রলুব্ধ হয়ে তিনিও পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত হলেন। সৌভাগ্যবশত পোর্ট রয়ালে যে সাত্ত্বিক জীবনযাত্রার প্রভাবে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন সেই সাত্ত্বিকতা ভাবনা তাকে পরিশুদ্ধ করে পাপ পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে আনল, তিনি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হলেন। তিনি সঙ্কল্প করলেন যে, তিনি আর নাটক লিখবেন না এবং যেগুলো লিখেছিলেন তার জন্যও প্রায়শ্চিত্ত করবেন আর অবশিষ্ট জীবন ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ করবেন। একজন ধর্মগুরুর উপদেশে তাঁর মন শান্ত হয় এবং তারই পরামর্শ অনুসারে তিনি বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেন ১৬৭৭ সালের ১লা জুন তারিখে। এর পরে পোর্ট রয়ালের আদর্শের সহিত পুনর্মিলন কঠিন হল না, তাঁর পূর্বতন শিক্ষক নিকোলে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে এসে আবার তিনি নাটক রচনায় মন দিলেন—সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের নাটক। এই সকল নাটকে ফুটে উঠল ধর্মজীবনের কথা। পূর্বেকার নাটকসমূহের প্রধান উপজীব্য ছিল সংসারী মানুষের প্রেম-জীবন; প্রেমের কাহিনী প্রসঙ্গে চরিত্র চিত্রণে রাসীনের শিল্প কৃতিত্বে ভাবাবেগের এমন গরিমাময় বিকাশ দেখা যায় ফরাসী রঙ্গমঞ্চে যা আর কখনও দেখা যায়নি। কিন্তু এখন যে সকল নাটক রচিত হতে লাগল তার প্রধান উপজীব্য হল প্রেমের পরিবর্তে দেশাত্মবোধ, কর্তব্য-দায়িত্ব, পাপের অপরাধ, ভগবৎ উক্তির গরিমা; আখ্যায়িকা গৃহীত হল ধর্মশাস্ত্র থেকে; সরল জীবনের কথা। রাসীনের মত শিল্পীর হাতে এসে পড়ে চরিত্র চিত্রণ হল সার্থক, তার সঙ্গে যুক্ত হল কাব্য-সঙ্গীতের অনবদ্য সুষমা; গ্রীক আদর্শ অনুসরণে 'কোরাস' দলের অবতারণা করে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষণে সংযোগ-সূত্রের ব্যবস্থা হল। এই সকল উপকরণের সমাবেশে যে সার্থক সৃষ্টি হল তাতেও ভলতেয়ারের মত বিচক্ষণ সমালোচক বলে উঠলেন—আশ্চর্য! অপূর্ব!

এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি নাটক: ১৬৮৯ সালে রচিত এস্‌থার এবং ১৬৯১ সালে রচিত আথালী।

এস্‌থার নাটকের লক্ষণীয় গুণ সমগ্র নাটকখানার রচনা-রীতির মনোহারিতা এবং সর্বোপরি নাটকের নায়িকার চরিত্র চিত্রণের অপূর্বতা। গ্যেটে তার ইফিজিনিয়া নাটক সম্পর্কে বলেছিলেন, আমার নাটকের নায়িকা এমন একটি কথাও বলবে না যা কোন সাধু-সন্ত বলতে পারেন না; এস্‌থার নাটকের নায়িকা সম্পর্কেও ওরূপ কথা বলা যেতে পারে। নাটকের আখ্যায়িকায় আছে ইজরায়েলের কন্যারা দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে নানা প্রকার অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে পরে আহাসুরসের রাজ্যে এসে আশ্রয় লাভ করলে রাজা এস্‌থারের সৌন্দর্য লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন এবং এস্‌থারের সাহচর্যে তাদের সকলের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন।

রাজা এস্‌থারকে সম্বোধন করে বলছেন—একমাত্র তোমার মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি সৌন্দর্য লাবণ্যের সহিত হ্রী, শ্রী এবং পুণ্য জ্যোতির অপূর্ব সম্মিলন—তোমার দেহের সৌন্দর্য লাবণ্যও যেমন

অক্ষয়, পুণ্যের জ্যোতির প্রভাবে সেই সৌন্দর্য লাবণ্য হয়েছে আরও নমনীয় এবং তার প্রভাব হয়েছে অমোঘ ; ফলে তোমার মধ্যে বিরাজ করছে পবিত্রতা এবং শান্তি।

এই উক্তিটির মধ্যে যেমন এস্থারের প্রতি রাজার প্রেমানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই এস্থারের দৈহিক সৌন্দর্য এবং তাঁর চরিত্রের মাধুর্যেরও আভাস আছে। আবার এস্থারের নিজ উক্তিতে পাওয়া যায় রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয়। রাজা আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে কঠোর চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপরে ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন—তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল কমনীয়তা এবং মাধুর্য আর তিনি নিজ হস্তে আমার মস্তকে মুকুট পরিয়ে দিয়ে আমাকে রাণী বলে স্বীকৃতি দিলেন।

এই নাটকেরই একস্থলে পৌত্তলিকতাকে তিরস্কার করে জেহোভার প্রশস্তিতে যে কথা ক'টি বলা হয়েছে তার মধ্যেও ভাবসৌন্দর্যের এবং প্রকাশ ক্ষমতারও পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি পরম-পুরুষ স্বর্গ-মর্তের অধীশ্বর, তোমাদের ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে তাঁর পরিচয় সম্ভব নয় ; তিনি চিরন্তন, এই পৃথিবী তাঁর সৃষ্টি ; নির্যাতিত অতি দীনতম ব্যক্তির দীর্ঘশ্বাসও তাঁর অগোচর থাকে না, একই আইন এবং একই মানদণ্ড দিয়ে তিনি সকলের বিচার করেন—রাজরাজরাও তাঁর বিচার থেকে অব্যাহতি পায় না।

এই শ্রেণীর নাটকসমূহের মধ্যে 'আথালী' সর্বশ্রেষ্ঠ ; তখন রাসীনের প্রতিভাও পরিণতি লাভ করেছে এবং এই নাটকখানা তাঁর বার বছরের চিন্তার ফল। সাধারণতঃ যে সকল চিত্তবৃত্তির উপরে নাটকের নির্ভর এই নাটকে সে-সব কিছুই ছিল না ; একজন পৌত্তলিক রাণী, একজন পুরোহিত ও একটি বালক—এই ক'টি প্রধান চরিত্র। কিন্তু কবি এই ক'টি চরিত্রই এমনভাবে রূপায়িত করেছেন যার ফলে নাটকখানা হয়েছে একটি বিশিষ্ট প্রতিভার এক সর্বোত্তম সৃষ্টি। নাটকের আখ্যানভাগ গৃহীত হয়েছে বাইবেল থেকে—Old Testament Second Book of Chronicles. মানুষের চিত্তে ধর্মাবলম্বী হিসাবে হিব্রু ভাষার কাব্য-সাহিত্যের যে চরমোৎকর্ষ দেখা যায় এই নাট্যকাব্যখানাতে যেন সেই গরিমাময় ভাব অনেকটা এসে পড়েছে। আহব এবং যেজেবেলের কন্যা আথালী ; ডেভিডের বংশকে উৎখাত করে জেহোভার পরিবর্তে বেয়ালের পূজার প্রবর্তন করতে উদ্যত—এই কাহিনীর উপরে নাটকের ভিত্তি।

রঙ্গমঞ্চে আথালীর প্রথম প্রবেশেই বেশ একটা নাটকীয় ভাব ফুটে উঠেছে। ইহুদী ধর্মমন্দিরে এক বিধর্মী রাণীর প্রবেশ। রাণী আথালী মণিমুক্তা স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত হয়ে গর্বিত পদক্ষেপে মন্দির প্রাঙ্গণে এসে প্রবেশ করলেন, তাঁর চোখের দৃষ্টিতেও গর্ব এবং উদ্ধত ভাব। 'বেয়াল' দেবতার একজন পুরোহিত মাত্তান তাঁর অনুচর। মন্দিরে প্রবেশ করতেই তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল একটি বালক—যোয়াশ। ইজরায়েলের ভাবী রাজা, যাকে তার জন্ম থেকেই এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, আথালীর বিদ্বেষ আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। আথালী এই বালককে দেখেই চমকে উঠলেন, তাঁর মনে পড়ল তাঁর এক অদ্ভুত স্বপ্নের কথা—একদিন গভীর নিশীথে আমার মা এসে আমাকে দেখা দিলেন ; মৃত্যুর পূর্বে যেমন ছিলেন, সেই রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, সেই গর্বিত ভাব ; আমাকে বললেন, আমার কন্যা, আমারই উপযুক্ত কন্যা, কিন্তু তুমি প্রস্তুত হও,

তোমার তুর্দৈব এসে পড়ল বলে, ইজরায়েলের দেবতার নিকট তোমাকে পরাভূত হতে হবে। তোমার জন্য আমি অনুকম্পা বোধ করছি। এই বলে তিনি আমার পালঙ্কের দিকে এগিয়ে এসে, মনে হল আমার দিকে নত হলেন। আমি তাকে আলিঙ্গন করবার অভিপ্রায়ে তু'হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য—শরীরের অস্থি-মাংস বিমর্দিত হয়ে পিণ্ডাকারে পরিণত এবং কর্দমে পরিপ্লুত, শরীরের খণ্ড খণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রুধিরে সিক্ত, যা নিয়ে কুকুরের দল কাড়াকাড়ি করছে। সেই স্বপ্নের মধ্যেই সেই বীভৎস দৃশ্যের অন্তর্ধানের পরে এসে দেখা দিল এক বালক যার কমনীয় মূর্তি দেখে তাঁর মনে বেশ একটা সান্ত্বনার ভাব এসেছিল। কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতেই সহসা তাঁর সর্বাঙ্গে যেন অভূতপূর্ব এক হিমশীতলতার ভাবের স্পর্শ এল এবং সেই বালক তাঁর বক্ষে ছুরিকাবিদ্ধ করে দিল।

এক্ষেত্রে আথালী এই যোয়াশের মধ্যে দেখতে পেলেন তাঁর স্বপ্নের সেই বালক মূর্তি। এই যুবক যোয়াশের মূর্তি এখনও তাঁর নিকট মনোমুগ্ধকর বোধ হল, নিজের ভীতিভাব দমন করে তিনি যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন।

আথালী—কে তোমার পিতা ?

যোয়াশ—আমি পিতৃমাতৃহীন ; জন্ম থেকেই আমি বিশ্বপিতার স্নেহচ্ছায়ায় আছি।

আথালী—কোথায় তুমি আবাসভূমি পেয়েছ সেটুকু অন্তত তুমি জান ?

যোয়াশ—এই মন্দির গৃহই আমার আবাসভূমি।

আথালী—শিশুকালে কে তোমায় প্রতিপালন করেছিল ?

যোয়াশ—আমাদের ভগবানের বিধানে তার সন্তানদের কখনও অভাবে পড়তে হয় না।

আথালী—প্রতিদিনে কি তোমার কর্মসূচী ?

যোয়াশ—ভগবানের পূজা এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠ।

আথালী—ভগবানের বিধান তোমাকে কি শিক্ষা দেয়।

যোয়াশ—ভগবান আমাদের প্রেম কামনা করেন এবং যারা তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে তাদের তিনি বিচার করেন।

আথালী—তোমার জীবনে আর কোনও আনন্দ নেই। তোমার জন্য আমার অনুকম্পা হয়। তুমি আমার প্রাসাদে আসবে, সেখানে আছে কত ঐশ্বর্য।

যোয়াশ—না, তাতে আমার ভগবানকে আমি ভুলে যাব।

আথালী—তোমার ভগবানকে আমি ভুলে যেতে বলব না।

যোয়াশ—কিন্তু তুমি তো আমার এই ভগবানের পূজা কর না।

আথালী—আমার দেবতা আছে আমি তার পূজা করি—যেমন তুমি তোমার দেবতার পূজা কর।

যোয়াশ—আমার দেবতাই দেবতা, তোমার দেবতা কিছু নয়। গ্রীক নাটকের অনুকরণে এই নাটকে "কোরাসের" প্রবর্তন করা হয়েছে—নাটকের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সৌকর্যার্থে এরা অনেকটা সূত্রধরের ভূমিকা গ্রহণ করে।

আথালীর প্রস্থানের পর "কোরাসে"র আবির্ভাব। এখানে লেভীজাতীয় যুবতী কন্যাদের দ্বারা 'কোরাস' গঠিত। তারা গাহিল কি জ্যোতি আমরা চোখে দেখতে পেলাম! কি অপূর্ব দীপ্তিতে এই যুবকের আবির্ভাব। কি দৃপ্তভঙ্গিতে কি ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল নারীর মোহ প্রলোভন। উচ্চ সফলতা আয়ত্তের জন্যই ওর জন্ম। কোরাসের একটি কণ্ঠ—

দুষ্প্রবৃত্ত রাণীর বিধানে শত সহস্র লোক "বেয়াল" দেবতার নিকট মাথা নত করল। কিন্তু একটি শিশুর কণ্ঠ অকুতোভয়ে চিরন্তন পরম দেবতার নাম।

ক্রমশঃ নাটক আগ্রহ সৃষ্টি করতে করতে উৎকর্ষের পথে চলতে থাকে অবশেষে 'বোয়াল' দেবতার উপাসকেরা পরাজিত হয় এবং আথালী নিহত হন। তাঁর কণ্ঠে শেষ বাণী, ও ইজারায়েলের দেবতা তোমারই জয় হল।

এই নাটকের বহুলাংশে ভাববৈচিত্র্যের বিচিত্রতা নাটকখানাকে আরও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। রাজপ্রাসাদের দ্যুতি অপরদিকে মন্দিরের ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধতা; প্রাসাদে আনন্দ উৎসবে কলকোলাহল, মন্দিরের প্রার্থনার নম্রনীরবতা, আথালীর পৌত্তলিকতার দম্ভ ও ঔদ্ধত্য এবং পুরোহিত ও বালকের দেবতার আরাধনায় নম্রতা। একস্থলে কোরাসের মাধ্যমে এই বৈপরীত্য সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

কোরাস—

আনন্দ উৎসব যেখানে লক্ষ্য সেখানে হাসি এবং সঙ্গীতই আমাদের উপচার—এই তো ধর্মহীন গোষ্ঠির বাণী—ভবিষ্যতের ভাবনা সে তো অর্বাচীন মূর্খের কাতরতা; আনন্দ উৎসবে প্রাণ ঢেলে দাও, যত সম্ভব সুফল আহরণ কর; বৎসরের পর বৎসর সময় বয়ে চলছে দ্রুত ধারায়। কে জানে আগামীকালের প্রভাতের আলো আমরা দেখতে পাব কি না। আজকার যা কিছু আছে জীবনের সৌরভ সম্পদ তাই ভোগ করে নাও।

কোরাসের একটি কণ্ঠ—

আমার দেবতা যার অন্তরে অধিষ্ঠিত তার শান্তিভঙ্গ করতে পারে কে? তোমার ইচ্ছাই চরম ধ্রুবতারার দীপ্তির মত, তার স্থিতি চিরন্তন। যে তোমাকে ভালবাসতে পেরেছে তার অন্তরে যে শান্তি, স্বর্গে বা পৃথিবীতে তার চেয়ে বেশি সুখের বার্তা আর কি হতে পারে।

রাসীনের জীবন যেমন ছিল দুঃখময় তেমন ছিল সমস্যাসঙ্কুল। রাজা চতুর্দশ লুই তাঁর উপরে অনেক কৃপা বর্ষণ করেছিলেন বটে কিন্তু শেষের দিকে কবিকে তিনি ত্যাগ করলেন বলা চলে, কারণ জনসাধারণের দিকে তাঁর পক্ষপাতিত্ব বিষয়ে কবি ছিলেন অকুতোভয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রতি তাঁর সমসাময়িকদের ঔদাসীন্যও কবিকে অত্যন্ত মর্মপীড়িত করল। রোগ জর্জরিত দেহের দারুণ বেদনা যাতনার পরিসমাপ্তি ঘটল তাঁর মৃত্যুতে—১৬৯৯ সালের ২১শে এপ্রিল তারিখে। মৃত্যুভয়ের দুর্ভাবনা তাঁর জীবনের চিরসঙ্গী ছিল বলা চলে, কিন্তু শেষ সময়ে তাঁর অন্তরে, জেগে উঠেছিল ভগবানের প্রতি বিশ্বাস এবং অমরতার আশ্বাস।

ফরাসী নাট্যকাব্যের ট্রাজিডির ক্ষেত্রে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা রাসীন। এক হিসাবে তিনি কর্ণেই-এর উত্তর সাধক। কিন্তু কর্ণেই-এর অবদানের পরেও তিনি সেই নাট্যকাব্য

সাহিত্যকে আরও জয়যুক্ত করেছেন। নারীর চরিত্র চিত্রণে তাঁর সহানুভূতির ফলে তিনি যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাতে কাব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে, তার উপরে শ্রেষ্ঠ গ্রীক প্রতিভার অনুসরণে চিত্তবৃত্তির প্রতিভার আদর্শ আরোপের ফলে, রঙ্গমঞ্চে উন্নীত হয়ে যেন সকল প্রকার মহৎ প্রবৃত্তি এবং ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের অনুশীলন ক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়েছে।

ফরাসী সাহিত্যে রাসীনের স্থান এবং সেক্ষেত্রে কর্ণেই-এর সঙ্গে তাঁর তুলনামূলক বিচার সম্পর্কে আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক, নলিনীকান্ত গুপ্ত যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হিসাবে এখানে উদ্ধৃত হল—"তবু এখানেও একজনকেই প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা যায়, তিনি হলেন রাসীন। রাসীনই ফরাসীর যে বিশেষ সৌন্দর্য মর্মের ধর্ম তার বিগ্রহ। কি সে জিনিস? এককথায় তা হল "শ্রী" সৌষ্ঠব ও লাবণ্য, কান্তি ও সুষমা, হৃদয়বত্তা ও প্রাণময়তা elegance and sensitiveness-এর পরাকাষ্ঠা। এ দিকটি ছাড়া ফরাসীর যে অন্যদিক নেই তা নয়। কর্ণেই দিয়েছেন সেই অন্য দিক—দার্ঢ্য ও বীর্য, উদাত্ত গাম্ভীর্য, তপোময় কাঠিন্য, কিন্তু বলা যেতে পারে এ হল ফরাসী ভাষার ও সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারার গুণ, একটা যেন অর্জিত সামর্থ্য কি হতে পারে তার পরিচয় কিন্তু অন্যটি রাসীন যা তা ফরাসী ভাষা স্বয়ং। তার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, তার অন্তরাত্মার স্বতঃস্ফূর্ত রূপায়ণ।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

[বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র ও চরিনামের আলোচনা বর্ণানুক্রম সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটি নামের প্রথম উপস্থিতি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য প্রথম কয়েকটিতে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে, পরেরগুলিতে সংক্ষেপ করা হয়েছে।]

অগ্নিবর্ণ (রাজসিংহ : ৭ম খণ্ড ২য় পরিঃ)।

পুরাণ প্রখ্যাত রাজা। রমণী-রূপে আকৃষ্ট হয়ে তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। শেষ পর্যন্ত যক্ষারোগে তাঁর মৃত্যু হয়। রাজসিংহ উপন্যাসে নির্মলকুমারীর প্রতি ঔরঙ্গজেবের অনুরাগ প্রসঙ্গে এর তুলনা দেওয়া হয়েছে।

অঞ্জনা-নন্দন (রজনী : ১ম খণ্ড ২য় পরিঃ)।

হনুমানের কথা বলা হয়েছে। বিশ্বামিত্রের শাপে কুঞ্জতনয়া নামে এক বিদ্যাধরী বানরজন্ম গ্রহণ করেন। অঞ্জনা এরই কন্যা। সুমেরুর রাজা কেশরীর সঙ্গে অঞ্জনার বিয়ে হয়। কিন্তু পবন দেবতার বরে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়। তাই হনুমান পবনপুত্র বলেই খ্যাত। হনুমান ছিল অসীম শক্তিশালী বীর।

রজনী উপন্যাসে, লবঙ্গ তার বৃদ্ধ স্বামী রামসদয়কে ফুল দিয়ে সাজিয়ে যখন রতিপতির সঙ্গে তুলনা দিত, তখন আত্মসচেতন রামসদয় নিজের সঙ্গে 'অঞ্জনা-নন্দনে'র উপমাটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করত।

অধিকারী (কপালকুণ্ডলা : ১ম খণ্ড ৮ম পরিঃ)।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কাপালিকের হাত থেকে রক্ষা করে যে দেবালয়ে নিয়ে আসেন, ইনি সেখানকার অধিকারী। অধিকারীর বয়স পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করেছিল, তাঁর মস্তক ছিল বিরলকেশ। এছাড়া অধিকারীর নাম বা কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। কপালকুণ্ডলার অলৌকিক রূপরাশি তাঁর ধর্মসংস্কারবদ্ধ মনে দেবী-মহিমার সূচনা করেছে। কিন্তু কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁর যথেষ্ট পিতৃসুলভ স্নেহও বিদ্যমান ছিল। কাপালিকের হাত থেকে নবকুমারকে রক্ষা করায় তিনি কপাল-কুণ্ডলার ভবিষ্যত সম্বন্ধে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে কপালকুণ্ডলার মঙ্গলের জন্যই ঘটকগিরি করে নবকুমারের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। নবকুমারের সঙ্গে বিবাহের কথোপকথনে তিনি যেভাবে অগ্রসর হয়েছেন তাতে ঘটকালির ব্যবসা এককালে তাঁর ভালই চলত মনে হয়। স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের ঘটকগিরিতে যে কৃতিত্ব অসীম তার পরিচয় রয়েছে সমগ্র উপন্যাসাবলীতে।

কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানে অধিকারী যতদূর সম্ভব হিন্দুশাস্ত্রকে

অনুসরণ করেছেন। কপালকুণ্ডলার বিদায়ের কালে অধিকারী দেবতার পূজার অর্থ থেকেই পাথেয় হিসাবে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। তারপর স্নেহার্ত পিতার মত কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছেন। কপালকুণ্ডলার পিতার অভাব পূরণ করেছেন এই অধিকারী। দেবস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও ইনি সাংসারিক জগৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ।

অনন্ত মিশ্র (রাজ: ৩।২)।

"অনন্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুলপুরোহিত। কন্যানির্বিশেষে, চঞ্চলকুমারীকে ভালবাসিতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত।"

চঞ্চলকুমারীর দৌতকার্যেই উপন্যাসে অনন্ত মিশ্রের প্রয়োজন। অনন্ত মিশ্র রসিকও বটেন। নিজ স্ত্রীর স্বভাব তিনি ভালোই জানেন। তাই স্ত্রী যখন দূরদেশে যেতে বাধা দিলেন তখন অর্থলোভ দেখিয়ে শান্ত করে তিনি রাজসিংহের কাছে যাত্রা করলেন। কিন্তু পথিমধ্যে দস্যুদলের কাছে চাতুরিতে তিনি হার মানলেন। ডাকাতদলের হাতে তাঁর দুর্ভোগের একশেষ হোল। কিন্তু তিনি এতই ভীতু যে রাজার সিপাইদের আসতে দেখে তিনি প্রাণপণে পালাতে লাগলেন। তাঁকে দেখে মনে হয়—'দুর্গেশনন্দিনী'র গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ কি বুড়ো হয়ে গেল ?

অভিরাম স্বামী (দুর্গে : ১।৫)।

বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেই একটি করে সন্ন্যাসী চরিত্র আছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিরামস্বামী চরিত্রে তার সূত্রপাত লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালের সন্ন্যাসী চরিত্রের মত এই চরিত্রে বঙ্কিম কোন অলৌকিকতা আরোপ করেন নি। অভিরাম স্বামী সাধারণের মতই দোষ-গুণাশ্রিত মানুষ। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে একবার মাত্র অভিরাম স্বামীর জ্যোতিস গণনার কথা আছে। তিনি গণনার দ্বারা জানতে পেরেছেন যে মোঘল সেনাপতির দ্বারা তিলোত্তমার অমঙ্গল হবে। তাই বীরেন্দ্র সিংহকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন মোঘলের সঙ্গে সন্ধি করতে। অবশ্য শেষপর্যন্ত তাঁর জ্যোতিষ গণনা ব্যর্থ হয়েছে। জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্তমার মিলন ঘটেছে। অভিরাম স্বামী যে অনেককে শিক্ষাদান করতেন তারও নির্দেশ আছে।

এই অভিরাম স্বামী ছিলেন গড়মান্দরণের অধিবাসী। তাঁর পূর্বনাম ছিল শশিশেখর ভট্টাচার্য তিনি বিদ্যাশিক্ষা করলেও দুশ্চরিত্র ছিলেন। ঐ গ্রামের এক বিধবার সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে তাঁর এক কন্যা জন্মে। সেই কন্যাই তিলোত্তমার মাতা। অপরদিকে গ্রাম ত্যাগের পর এক শূদ্রানী কন্যার গর্ভে তাঁর আর এক কন্যার জন্ম হয়, তার নাম বিমলা। শশিশেখরের দুই কন্যাকেই বিবাহ করেন বীরেন্দ্রসিংহ। এমনিভাবে বঙ্কিম অভিরাম স্বামীর পূর্ব চরিত্রকে কলঙ্কিত করে অঙ্কন করেছেন। যুবক বঙ্কিমের মনে সন্ন্যাসী ভক্তিতে সংশয় ছিল বলেই বোধহয় চরিত্রটি এরূপ হয়েছে।

এই উপন্যাসে অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রসিংহকে মন্ত্রণাদান করেছেন। তাছাড়া শেষ দৃশ্যে জগৎসিংহকে আনয়ন করে তিলোত্তমার সঙ্গে মিলিত করার কার্যও সাধন করেছেন তিনি। এই চরিত্রটির মধ্যে কখনও কঠোরতা কখনও কোমলতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যথার্থ মানুষরূপে গড়ে তুলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

অমরনাথ ঘোষ (রজনী ২।১)।

রজনী উপন্যাসের অমরনাথ ত্যাগে ও মহানুভবতায় একটি আশ্চর্যজনক চরিত্র। অমরনাথের বিদ্যা-বুদ্ধি ঐশ্বর্য সবই ছিল, কিন্তু যৌবনে একটিমাত্র ভুলের জন্য তাঁকে বহুদিন ছন্নছাড়া জীবন যাপন করতে হয়। যৌবনে লবঙ্গলতার রূপে আকৃষ্ট হয়ে গোপনে তার গৃহে প্রবেশ করাতে চপলা লবঙ্গলতার হাতে তাঁর লাঞ্ছনার চূড়ান্ত হয়। লবঙ্গলতা তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে অমরনাথের পিঠে 'চোর' লিখে দেয়। সেই অপমান এবং কলঙ্কের বেদনা নিয়ে আর লবঙ্গলতাকে না পাওয়ার তৃষ্ণা নিয়ে তিনি পথে পথে ভবঘুরে জীবন যাপন করেছেন।

অমরনাথের এই পরিচয় উপন্যাসে বিস্তৃত হয়েছে মাত্র। কিন্তু আখ্যানভাগে তাঁর যে পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, তার গুণের তুলনা নেই। পরোপকারবৃত্তিতে অমরনাথের আগ্রহ প্রচুর। কোথাকার কে রজনী, তার সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য অমরনাথের চেষ্টার অন্ত নেই। রজনীকে দুষ্টলোকের হাত থেকে উদ্ধার করে—তিনি তার বিষয়সম্পত্তিও উদ্ধার করেছেন।

অমরনাথ জীবন্ত হয়েছেন প্রেমে। দীর্ঘকাল পরে ব্যর্থপ্রেমের স্মৃতি ভুলে গিয়ে তিনি রজনীর কানা চোখের প্রেমে পড়লেন। কিন্তু সেই প্রেমের সার্থক রূপায়ণের জন্য রজনীর উপকারের সুযোগ নিলেন না। রজনীর সম্পত্তির প্রতিও তাঁর কোন লোভ ছিল না।

অবশ্য 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত অমরনাথের চরিত্র অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ছিল। সেখানে রজনীর বিষয় সম্পত্তি উদ্ধারের পরই অমরনাথ তাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া একটু বড়মানুষীর ভাণও করেছেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন রজনী দরিদ্র, তাই বড়মানুষী চাল দেখে বোধহয় একটু মুগ্ধ হবে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় বঙ্কিম এ ত্রুটি সংশোধন করেছেন।

অমরনাথ লবঙ্গলতাকে একবার তাঁর পূর্বকাহিনী রজনীকে বলতে বারণ করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর হৃদয়ের দেবতা জেগে উঠে তাঁকে প্রস্তুত করেছে রজনীকে সব কথা খুলে বলবার জন্য। রজনীকে তিনি যথার্থ ভালবাসলেও যখন তিনি জানলেন রজনী শচীন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা তখন স্বেচ্ছায় দূরে সরে গেলেন। প্রথম যৌবনের বেদনা, তীব্রতর হল শেষ বসন্তের আর এক আঘাতে। অমরনাথ আবার বেরুলেন পথে পথে। দীর্ঘকাল পরে ফিরে দেখলেন—না, তিনি হারিয়ে যান নি এ পৃথিবীতে, লবঙ্গলতার ইহকালে না হোক পরকালের স্বপ্নলোকে যেমন তিনি বেঁচে আছেন, তেমনি রজনী-শচীন্দ্রের উত্তরাধিকার 'অমর প্রসাদের' মধ্যে তাঁর আদর্শ বেঁচে আছে। অমরনাথের স্বার্থত্যাগের এটাই সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

'লাষ্ট ডে অফ পম্পাই' উপন্যাসে নিডিয়ার প্রেমজীবনের ব্যর্থতা রজনী উপন্যাসে অমরনাথকে সৃষ্টি করেছে।

অমরপ্রসাদ (রজনী ৫।৪)।

শচীন্দ্র ও রজনীর সন্তান। অমরনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই তারা পুত্রের এরূপ নাম দিয়েছিল।

অমলা (যুগ : ৫ম পরিঃ)।

অমলা গোপকন্যা। সে বিধবা। তার একটি কিশোরবয়স্ক পুত্র এবং কয়েকটি কন্যা। 'তাহার যৌবনকাল অতীত হইয়াছিল। সচ্চরিত্রা বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল।' রাজা মদনদেবের

সঙ্গে যোগসাজসে সে হিরন্ময়ীর মত স্বভাবাদির পরিচয় সংগ্রহ করেছে। অমলার কথাবার্তা সরল সাধারণ নারীর মত হলেও চতুরতায় কম দক্ষ নয়।

অমলা (ইন্দিরা ৯ম পরিঃ)।

ইন্দিরা যখন কলকাতায় আসছিল তখন সাত আট বছরের দুটি বালিকার গঙ্গার ঘাটে গাওয়া 'বাজিয়ে যাব মল' গানটি ইন্দিরার মনের মধ্যে গেথে গিয়েছিল। অমলা ও নির্মলা সেই বালিকাদ্বয়ের নাম।

অমিয়ট (চন্দ্রঃ ২।৫)।

অমিয়ট ঐতিহাসিক চরিত্র। কলকাতা কাউন্সিলের মধ্যে অমিয়টই ছিলেন মীরকাশেমের সর্বাপেক্ষা বিরোধী। 'সয়ের মুতাক্ষেরিন' (Sein Mutaqherin) থেকে জানা যায় মীরকাশেম প্রদত্ত আদেশবলেই অমিয়টকে হত্যা করা হয়। (দ্রঃ Syed Gholam Hossein Kham's Seir Mutaqherin. Translated by M. Raymond under the pseudomym : Nota-Manus. Reprinted by D. C. Kerr. Vol II, Sec XI P P 475-76, অথবা শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের 'উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম' ৫৬৩-৬৫ পৃঃ।)

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অমিয়টের ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা ঐতিহাসিক দিকটিই প্রধান করে তোলা হয়েছে। অবশ্য শৈবালিনীকে হরণ করতে গিয়ে দলনীহরণ প্রভৃতি ঘটনার দ্বারা উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীর সঙ্গেও তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু অমিয়টের প্রধান কাজ মীরকাশেমকে পরাজিত করে এদেশে ইংরাজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা।

অমিয়ট বীর, সাহসী এবং কর্তব্যপরায়ণ ইংরাজ। মৃত্যুকেও তিনি ভয় পান না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাই তিনি বলে ওঠেন—"মরিব। আমরা আজি এখানে মরিলে, ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইবে। আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।"

অমিয়ট ব্যক্তিচরিত্র নয়, শ্রেণী চরিত্র। এই শ্রেণীর দুঃসাহসিক ইংরাজদের জন্যই এদেশে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

অরুন্ধতী (মৃণাঃ ৪।১১)।

ইনি সম্পর্কে মৃণালিনীর মাসী হন। ছেলেবেলা থেকে তিনি মৃণালিনীকে লালন-পালন করেন। গোপনে যখন মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের বিবাহ হয়, তখন ইনিই কন্যাসম্প্রদান করেন। চরিত্রটির প্রাসংগিক উল্লেখ আছে মাত্র, কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় নি।

অলকমণি (দেবীঃ ১-১০)।

ফুলমণির ভগিনী অলকমণি। সে ফুলমণির কল্পিত প্রফুল্ল অন্তর্ধানের উপাখ্যান পাড়াময় রাষ্ট্র করেছে। অলকমণি কানপাতলা গ্রাম্য নারীর প্রতীক।

কেন লিখি

মাঝে মাঝে মনে হয়, কেন লিখি? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, সাদা কাগজ কালো করা কি ভালো—তা ঠিক বুঝতে পারছি না। নিজেকে এ নিয়ে বহুবার প্রশ্ন করেছি, সুষ্ঠু কোন উত্তর পাই নি। আজ তাই বসেছি কাগজে কলমে দফাওয়ারি আলোচনা করতে, কেন লিখি।

লেখার প্রথম ও প্রধান কারণ, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার আনন্দ। অনেক দিন অনেক জায়গায় নিজের নাম দেখার পর, আজো যে আনন্দ পাই না, এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। কিন্তু নামে যত লেখা বেরোয়, নাম ছাড়াও তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম বেরোয় না। কাজেই নামই একমাত্র কারণ নয়।

আমি অন্যের চেয়ে জ্ঞানী, এ বোধ থেকেও লেখার জন্ম হয়। আমার জ্ঞানকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখব না, পাঁচজনকে তা জানাবো, লোক শিক্ষা দেব—বহু মনীষীর লেখার এটা সর্বপ্রধান কারণ। দার্শনিক তাঁর মতবাদ জনসমাজে প্রচারের জন্য লেখেন। শিক্ষকে ছাত্রদের বোধ জন্মাবার জন্য লেখেন। আমি দার্শনিক নই (অবশ্য দুচোখ ভরে দেখাটা যদি দর্শন হয়, তবে আমি দার্শনিক। কিন্তু বিজ্ঞজনে দার্শনিকের ভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেন।) আমার দর্শন কিছু থাকে তো তা অন্ধের হস্তী দর্শনের নামান্তর মাত্র। আর জ্ঞানত সুদূর পরাহত। জ্ঞানের দুই বিভাগ—পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা—তার মধ্যে পরা বিদ্যায় তো প্রবেশাধিকারই ঘটেনি আর অপরা বিদ্যা? নিউটন যদি জ্ঞান সমুদ্রের ধারে ধারে উপলান্বেষী মাত্র হন তাহলে আমরা যে সমুদ্র গর্জন মাত্র শুনছি অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন কিছুতেই কথা বলবার অধিকার জন্মায় নি।

তবে কেন লিখি? হয়ত আত্মচিন্তাকে সংহত করতে, মনের মধ্যে যে সব সমস্যা জট পাকায় তাকেই প্রকাশ করে সমস্ত বস্তুটিকে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত করতে লেখার প্রয়োজন কিছুটা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাতে কি সর্বদাই চিন্তাটা দানা বাধে? যদি না বাঁধে কিভাবে তা বাঁধানো যায়?

ওয়াকিবহাল লোকেরা বলেন। মিছরীর কুঁদো বানাতে যেমন সুতো দিয়ে ছাঁচের মধ্যে বেঁধে রাখা দরকার যাতে সেই সুতো ধরে চিনির ঢেলাগুলি বেড়ে উঠে তেমনি মনের চিন্তাকে দানা বাঁধাবার জন্য চাই যুক্তির সুতো।

ভাল কথা, যুক্তির সুতো নাহয় লাগালাম কিন্তু যুক্তিটা কু না সু, সে বিচার করবে কে? বিচারকের জন্য ভবভূতি নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, গোল্ডস্মিথ ভবিষ্যত কালের ওপর চেক কেটেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রবল আত্মবিশ্বাস ছিল, তাঁরা জানতেন যে তাঁদের রচনার এমনই সুন্দর গুণ আছে যে, কোন না কোন রসিকজন তার থেকে রত্ন আবিষ্কারে

সক্ষম হবে। কিন্তু সে আত্মবিশ্বাসও আমার নেই। তাহলে আমার রচনার গুণাগুণ হবে কি করে?

পাঠকরা বলবেন, আমরা। কিন্তু তারা কি প্রকৃত বিচার করেন? আমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, সাপ বেঙ যা খুশি লিখে তলায় দস্তখৎ করে দিলাম, পাঠক অমনি শশব্যস্ত। আমি যদি সূর্য পশ্চিমে ওঠে, পাঠক চোখের ওপর সূর্যকে পূর্বদিকে উঠতে দেখেও বলবেন, উনি যখন বলছেন তখন হলেও হতে পারে। আর আমি যদি নাম-গোত্রহীন বনফুল হই তো যত মূল্যবান কথাই বলি না কেন, তা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া হবে। গ্যালিলিও প্রমাণ করে দেখালেন, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। নিরবধি কাল তাঁর কথা সমর্থন করলেও, সেদিনকার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরা ফতোয়া দিলেন, তত্ত্বটা শুধু যে ভুল তাই নয় ধর্মবিরুদ্ধও বটে, অমনি সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধকে ফাটকে পোরা হল এবং সত্যকে মিথ্যা বলে স্বীকার করার পর তবে তিনি রেহাই পেলেন। সেদিনকার জনগণেরা তাঁকে রক্ষা করে নি। আবার বিজ্ঞানী লাভয়সিয়ে একমাত্র জন্মসূত্রে অভিজাত বলে জনগণের রোষে প্রাণ দিলেন।

কাজেই পাঠক-সাধারণের বিচারের ওপরও পুরোপুরি নির্ভর করা সম্ভব নয়। তাহলে উপায়। ভক্তজনে বলবেন গীতার কথা, সর্বধর্মান পরিত্যজ্যান মামেকং শরণং ব্রজ। শাক্তরা আরো সরাসরি বলবেন, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী। 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ' হয়ত ঠিক কথা কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্ত হলে তো আর বাকি থাকে না কিছুই, সুতরাং এটা একেবারে শেষের সেদিনের জন্তই থাকুক।

এত কথার পরও প্রথম প্রশ্নের সমাধান হল না, কেন লিখি? লেখার কারণ সোজা রাস্তায় যখন বার করা গেল না তখন লেখ্য বস্তু থেকে বিচার করার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে।

ব্যক্তিগত প্রবণতার দিক থেকে লেখার বস্তু এক, কর্মসংস্থান থেকে আর এক, তাগিদ থেকে তৃতীয়, আত্মজিজ্ঞাসা থেকে চতুর্থ, আত্মবিজ্ঞপ্তি পঞ্চম—এই যদি লেখার তালিকা হয় তাহলে বিচার করা যাবে কি?

মনে করুন, আমি কবি অর্থাৎ কবিতা লেখাই আমার মনোমত কাজ, কর্মগত বিচারে আমাকে বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তি বিদ্যাগত প্রবন্ধ লিখতে হয়; বন্ধু-বান্ধবের তাগিদে, আমি নাটকের ওপর প্রবন্ধ লিখছি, আত্মজিজ্ঞাসা থেকে কেন লিখি তার কারণ অনুসন্ধান করছি, নিজেকে জাহির করার জন্য লিখছি গবেষণামূলক প্রবন্ধ (যার গবেষণা একমাত্র পূর্বপ্রকাশিত কোন লেখা থেকে কতটা নেওয়া যায় তাতেই সীমাবদ্ধ।) অর্থোপার্জনের জন্য লিখছি নাটক, উপন্যাস বা গল্প (সেগুলিও আবার বহু বিভিন্ন জাতের, বিচিত্র রীতির)—সবগুলির সমাহার থেকে হয়ত আমাকে এক বহুমুখী প্রতিভা বলে চিহ্নিত করবে কিন্তু কিসের জন্য লিখি তার কি কোন হদিস দেবে?

বহুমুখী প্রতিভা ছেলের হাতের মোয়া নয়, যে বিনা চেষ্টাতেই তা পাওয়া সম্ভব। হাজার বছরে হয়ত একজন এমন বহুমুখী প্রতিভার সন্ধান মেলে, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন যুগে ভাস কালিদাস, ভবভূতি কি গুণাঢ্য। আধুনিক যুগে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ—এ ক'টি নামের বেশি বলাই যাবে না। সুতরাং আমি শ্রীল শ্রীযুক্ত অমুকচন্দ্র অমুক মোটেই প্রতিভার কাছাকাছি পৌঁছাই না। আমরা পুরোপুরি সারস্বত ক্ষেত্রের দিনমজুর। আমাদের পরিশ্রমের ফসল তাই

যতই বিশাল বিপুল হোক না কেন, ঝাড়াই-বাছাই-এর পর বেশির ভাগই উবে যাবে (হয়ত শতকরা ১০০ ভাগই)।

অনেক ক্ষেত্রে ওজন দরে মূল্যই একমাত্র প্রাপ্তির আশা আর তার জন্য ভূষি মালই যথেষ্ট। কিন্তু যেখানে সে প্রাপ্তিটুকুও নেই সেখানে ? প্রশংসা হয়ত মিলতে পারে। আপনার লেখাটা পড়লাম মশায়, বেশ লিখেছেন। কথাটা শুনতে খারাপ লাগল না, কিন্তু সে তো সব সময়ে নয়। কেউ হয়ত বললে, কি যে লেখেন মশায় মোটেই বুঝি না। তখন মনের অবস্থা তো 'সসেমীরা'। নিন্দা-প্রশংসা দুই-ই যখন একইভাবে মেলে তখন কোন একটির জন্য তো লেখা যায় না। তবে কেন লিখি ?

অনেক ভেবে তার সদুত্তর পাই নি। বার বার যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করেও উত্তর মিলছে না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বলতে হয়, লেখার ভূত ঘাড়ে চেপে লেখাচ্ছে। কিন্তু সেটাও তো জবাব হল না সুতরাং সমস্যার কোন মীমাংসায় পৌঁছতে পারলাম না। পৃথিবীর বহু অমীমাংসিত সমস্যার মত এটাও অমীমাংসিতই রয়ে গেল।

রবি মিত্র

স মা লো চ না

কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বাক্-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ মূল্য পাঁচ টাকা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা গল্পলেখক। সুতরাং তিনি যখন রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য নিয়ে গুরুতরভাবে কিছু বলতে বসেন তখন আমাদেরও সমনোযোগে শোনবার কারণ ঘটে।

গ্রন্থের শুরুতেই লেখক জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্যের স্বল্পাক্ষর আলোচনাই বইটির উদ্দেশ্য। স্বল্পাক্ষর বলিতে কি বোঝাতে চেয়েছেন লেখক ?—সংক্ষিপ্ত, সম্ভবতঃ তাই। তা যদি হয় তাহলে বলতে হবে এ গ্রন্থ মোটেই সংক্ষিপ্ত নয়। আকারে সংক্ষিপ্ত হলেই যদি গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত হতো তাহলে পৃথিবীর বহু গ্রন্থই সংক্ষিপ্ত আকার নিয়ে পাঠকচিত্তকে তীব্র ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারতো না। নারায়ণবাবুর গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত নয়। শুধু ছাত্রসমাজের মুখ দেখে লেখা নয়। তাঁর নিজের বিদগ্ধ শিল্পীমন নিয়ে আর এক মহান স্রষ্টার কৃতকর্মের স্বরূপ উদ্দীপনার চেষ্টা আছে।

কিন্তু নারায়ণবাবু এই গ্রন্থে একটা কাজ ক্রমাগত করে গেছেন যার ভাল-মন্দ দুটো দিকই আছে। আমরা এতকাল ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই বিশ্বের নানা সাহিত্যের সঙ্গে নিজেদের সাহিত্যের তুলনা করেছি। এবার নারায়ণবাবু ফরাসী ভাষার ফরাসী সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে সোজাসুজি বহু উদাহরণ তুলে রবীন্দ্র সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। প্রথমটা মন বিরূপ হয়েছিল। ফরাসী প্রথম ভাগের বিদ্যা নিয়ে সব উদ্ধৃতির যখন মানে করা গেল না তখন মন বিরূপ হলো, মনে হলো এ যেন নেহাৎই পাণ্ডিত্য দেখানো হচ্ছে। কিন্তু পড়তে পড়তে সেই প্রাথমিক বিরূপতা কাটলো। দেখলুম সাধারণ ইংরেজী জানা পাঠকের অভিজ্ঞতার পরিধির বাইরে লেখক নিয়ে গেছেন আমাকে এবং এই প্রথম ইংরাজী ছাড়া আর একটি বিদেশী ভাষার প্রাঙ্গণে আমাদের রবীন্দ্রনাথের সহকর্মীদের সন্ধান পেলুম।

লেখক ছোট গল্প ও উপন্যাসের ধারা এই দুটি পর্যায় গ্রন্থটিকে বিভক্ত করেছেন। ছোট গল্পের মধ্যে লিপিকা, 'তিন সঙ্গী', 'সে', 'গল্প-সল্প'র আলোচনা আছে। উপন্যাস অংশ পূর্ব ও উত্তর দুই ভাগে বিভক্ত।

যারা রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠে উৎসাহী তাঁরা অবশ্যপাঠ্য এই গ্রন্থটি পড়লে আর একটু বিস্তৃত দৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে জানতে পারবেন।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

Regd No. C-315 Phone : 23-5155 January '67 (0·50) Central Regd. No. R.N. 2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

চতুর্দশ বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৭৩

সমকালীন

পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি

দেশ ভাগের পর নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের সার্থক তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। পনের বছরের পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের সুফল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ এবং সর্বোপরি খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট।

আমাদের চতুর্থ পরিকল্পনায় ব্যাপকতর কর্মপ্রচেষ্টা চলেছে

শিক্ষা

	১ম পরিকল্পনা	৩য় পরিকল্পনাকালে (৬৩-৬৪)
প্রাথমিক নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদি	১৩,১৩৬	৩২,৭৪১
উচ্চ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	৩,২২৭	৪,৬৯২
কারিগরী বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা (পলিটেক্নিকসহ)	২৯	২৩২
কলেজ (সাধারণ শিক্ষা)	৯৫	১৪৫
বিশ্ববিদ্যালয়	৩	৭

কৃষি

	১ম পরিকল্পনার শুরুতে	৩য় পরিকল্পনাকালে
চাল	৩৬ লক্ষ ২১ হাজার টন	৬৭ লক্ষ ৬৫ হাজার টন
আলু	২ ,, ৭০ ,, ,,	৭ ,, ৭৪ ,, ,,
পাট	৬ ,, ৭৫ ,, গাঁট	৩৬ ,, ১৭ ,, গাঁট

স্বাস্থ্য

হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডিস্পেন্সারী, ক্লিনিক প্রভৃতি চিকিৎসা সংস্থা	১,২০১	২,০৫৬ (১৯৬৫)
রোগীশয্যার সংখ্যা	১৭,৫৪৯	৩৩,১৬৭ (১৯৬৫)

বিদ্যুৎশক্তি

	১ম পরিকল্পনা	৩য় পরিকল্পনা (৬৫-৬৬)
উৎপাদনহার	৩৬৪ মেগা ওয়াট	৮৮৮ মেগা ওয়াট

এই পরিকল্পনা প্রতিটি নাগরিকের জন্যই এর সুফলও পাচ্ছে প্রতিটি নাগরিক

ইঞ্জিনটি যে ভালো এবং নির্ভরযোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।
তবুও এটাকে চালাতে হলে কখনও কখনও একটু ধাক্কা দিতে হয়।
ইঞ্জিনটি একবার চলতে সুরু করলে অবশ্য বেশ আরামে যেখানে খুসী
যাওয়া যায়।

বর্ত্তমানকালে আমাদের অর্থনীতির অবস্থাও তাই। ইস্পাত কারখানা, যন্ত্রপাতি তৈরীর মেসিন, বিদ্যুত উৎপাদন কারখানা ইত্যাদিগুলি হ'ল আমাদের অর্থ-নীতিতে সেই ধাক্কা। এইসব কারখানারূপী ধাক্কা দিয়ে অর্থনীতির ইঞ্জিন চালু করা হয়েছে, তবে অগ্রগতি হয়তো একটু আস্তে আস্তে হচ্ছে কিন্তু অর্থনীতিতে যে গতি সঞ্চারিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একেই বলা হয়
আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি

চতুর্দশ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ তেরশ' তিয়াত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বগজুড়ির কবি

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সেবার ১৮৯৮ সালের শেষ।

তারও বছর দুই আগে থেকে সহর কলকাতায় মড়ক দেখা দিয়েছে। কিন্তু আটানব্বই-এ এসে সে মড়ক তীব্র আকার ধারণ করল। তার চেয়েও বেশি ছড়াল গুজব। আর এ যে সে মড়ক নয়, প্লেগের মহামারী। প্রাণের ভয়ে লোক তাই সহর ছেড়ে পালাতে শুরু করল। কুম্ভমেলা বিশৃঙ্খল হলে অথবা সমুদ্র, তীর অতিক্রম করলে যে অবস্থা হতে পারে, অনেকটা সেইরকম। রেল-গাড়ীতে জায়গা নেই। পথে এত ভিড় যে চলা যায় না।

উত্তর-তিরিশ একজন ভদ্রলোক স-পরিবারে কোন রকমে ভিড় ঠেলে শিয়ালদা ষ্টেশনে এসে হাজির হলেন। অসুস্থ শরীর। ধীর পদক্ষেপে কোন রকমে গিয়ে দাঁড়ালেন ষ্টেশনের টিকেট-কাউণ্টারে। চারিদিকে লোক গিজগিজ করছে। জনতার মাঝে প্রায়ই তিনি হারিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর উস্কোখুস্কো চুলগুলি বাতাসে উড়ছিল মৃদু মৃদু। চাদরে একটু একটু বাতাস ধরছিল। তাঁর সারা মুখে বিষন্নতার ছাপ। আর রোগের যন্ত্রণায় কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে উঠছিলেন।—তবে তাঁর যে অসুস্থতা তা কিন্তু প্লেগের নয়। অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে তাঁর ঐ অবস্থা হয়েছে। এসেছিলেন কলকাতায় চিকিৎসা করাতে। চিকিৎসা করা হল না। প্লেগের ভয়ে পালাতে হচ্ছে কলকাতা থেকে। কিন্তু কোথায় যাবেন? ফরিদপুর? ফরিদপুরে তাঁর ভগ্নিপতি থাকেন। সেই উত্তর-তিরিশ ভদ্রলোকটি সেদিন ফরিদপুরেরই টিকিট কাটলেন।

এখন কৌতুহল হতে পারে কে এই যাত্রী? তাঁর বহু পরিশ্রমে লেখা গ্রন্থখানিই বা কি?—যাত্রীর নাম দীনেশচন্দ্র সেন। গ্রন্থখানির নাম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

আজ থেকে একশো বছর আগে 'আঠারো'শ ছেষট্টিতে তাঁর জন্ম। সহর কলকাতা থেকে অনেকদূরে পূর্ব্ববঙ্গের একটি ছোট্ট গ্রামে। পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার রোমাণ্টিক জগতে এই শিশুটি হল পরিবর্দ্ধিত।

সেকালে ঢাকা জেলার লোকের মুখে মুখে চার লাইনের একটি কবিতা শুনতে পাওয়া যেত। কবিতাটি এইরকম :

গণি মিঞার ঘড়ি,
নীলাম্বরের বড়ি
গোকুল মুন্সীর গোঁফে তা
গল্প শুনবি তো মৃতুঞ্জয় মুন্সীর কাছে যা।

আপনার ঘড়ি যদি বিকল হয়ে থাকে তবে গণি মিয়ার বাড়ি চলুন। যদি শরীর বিকল হয়, তবে নীলাম্বরের বড়ি খান। আর গোকুল মুন্সী! জেলাকোর্টের বাঘা উকিল ছিলেন তিনি। তাঁর পশার-প্রতিপত্তি সেকালে অনেক কিংবদন্তী সৃষ্টি করেছিল। যদি হুজ্জুতিতে পড়েন তাঁর স্মরণ নিন। আর মজাদার ও চটকদার গল্প শুনতে চাইলে মৃতুঞ্জয় মুন্সী তা আপনাকে শোনাতে পারেন।

এঁদের ভিতর তৃতীয় জন যিনি, সেই গোকুল মুন্সী হলেন দীনেশচন্দ্রের মাতামহ। তাঁর গোঁফের গাম্ভীর্যে সেকালে অনেক তা-বড়ো তা-বড়ো মরদ ভিরমি যেত। দুজন চাকর শুধু তাঁর গোঁফের পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত থাকত। লহরী খেলানো গোঁফ গালের ওপর ছুঁচালো করে নিয়ে তিনি কাছারীতে গিয়ে বসতেন।—এই মাতামহের ভিটেতে দীনেশচন্দ্রের জন্ম। ঢাকা জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রামের নাম বগজুড়ি। মর্তলোকে বগজুড়ির কাব্য এখানেই আরম্ভ।

দীনেশচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল কিন্তু যশোহরের সেনহাটিতে। তাঁরা ছিলেন কুলীন পদবাচ্য। হিঙ্গ সেন, শক্তি গোত্র। দীনেশচন্দ্রের বাবার নাম ঈশ্বরচন্দ্র সেন। ইংরেজী, বাংলা উভয় ভাষাতেই ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল সমান অধিকার। সেকালের ইংলিশম্যান পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ ছাপা হত। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের ভাবধারা তাঁর জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই মনে প্রাণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ব্রাহ্ম। 'ব্রহ্ম সঙ্গীত রত্নাবলী' নামে একটি ব্রাহ্ম গানের বই এবং 'সত্যধর্মোদ্দীপক' নাটক রচনা করেছিলেন তিনি। পেশায় প্রথম জীবনে ছিলেন শিক্ষক। ঢাকা জেলার ধামরাই স্কুলে। দীনেশচন্দ্রের জন্মের পর চলে আসেন ওকালতিতে। শেষ জীবনে মানিকগঞ্জের সরকারী উকিল পর্য্যন্ত তিনি হয়েছিলেন।

বাবার কাছ থেকে দীনেশচন্দ্র পেয়েছিলেন নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা। মায়ের কাছ থেকে ঘোর পৌত্তলিকতা। মামার বাড়িতে সাড়ম্বরে পূজা-অর্চনা হ'ত। দীনেশচন্দ্রের মা ছিলেন তাই গোঁড়া হিন্দু। সেখানে পান থেকে চুন খসবার জো ছিল না।—মাঝে থেকে বালক দীনেশ পড়ত ধোঁকায়। সে যখনই প্রতিমার পায়ে মাথা নত করে ভক্তি গদগদ চিত্তে প্রণাম করতে যেত। তখন বাবার একটি গান তার বারবার মনে পড়ত।

যেমন বালকগণে
বিচার শক্তি বিহীনে

পুত্তলিকা লয়ে করে সময় যাপন।
তেমনই জানিবে ভাই,
ঈশ্বরের রূপ নাই,
অজ্ঞ ক্রীড়ামাত্র তাহা হয়েছে সৃজন॥

পর পর ন'টি মেয়ের পর আরেকটি মেয়ের সঙ্গে যমজ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন দীনেশচন্দ্র। তাই আদরে আদরে তাঁর শৈশব কাটল।

গ্রামের নাম ছিল সুখপুরী। পরে উচ্চারণ বিকৃতিতে দাঁড়াল 'সুয়াপুর'। সেন রাজাদের কেউ হয়ত এককালে সুয়াপুরিতে রাজত্ব করতেন। মাটির তলায় সে অতীত ছিল চাপা পড়ে। তবে লোকের মুখে ছড়ানো ছিল অজস্র কিংবদন্তী। তারও আগে ওখানে ছিল বৌদ্ধবিহার। সেই পুরণো ইতিহাসের মাঝে প্রাচীন পুঁথির উদ্ধারকর্তার শৈশব হল অতিবাহিত।

পাঁচ বছর বয়সে হাতে খড়ি হল। বিশ্বম্ভর সাহার পাঠশালায় শিশু দীনেশচন্দ্র ছুটলেন চারু পাঠ নিয়ে। রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃত, বৈষ্ণব বন্দনা বলছে তখন মুখে মুখে।— পাঠশালা থেকে মাণিকগঞ্জ স্কুলে। সেখানে পূর্ণচন্দ্র সেনের মুখে বয়ঃসন্ধির ক্ষণে শুনলেন বৈষ্ণব কবিতা—

পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে।

সাত বছর বয়সে দীনেশচন্দ্র সরস্বতীর স্তব লিখেছিলেন পয়ার ছন্দে। আর যখন দশ, মেঘের ওপর একটি কবিতা লিখে 'ভারত সুহৃদ' নামক একটি মাসিক পত্রে ছাপিয়ে ফেললেন। সেদিন পাঠ্য বইএর ফাঁকে ফাঁকে চলল তথাকথিত বাজে বই। বঙ্কিমের উপন্যাস, নবীনচন্দ্রের অবকাশ রঞ্জিনী। আর চলল অবিরাম কবিতা লেখা।

যখন বয়স দশ, জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়ে গেল। কিশোর কবি নিজের নোট-বুকে লিখলেন, 'বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব যদি, না পারি তবে ঐতিহাসিক হইব। যদি কবি হওয়া প্রতিভায় না কুলোয় তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রম লব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে, কার সাধ্য ?'

এরপর কবিতা রচনার পালা যে শুরু হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ? ইতিমধ্যে সেক্সপীয়র, মিলটন ও বায়রনের কবিতায় কবির মন হল পরিশীলিত।

সেবার সম্ভবতঃ ১৮৮১ সাল। লর্ড রিপণ বাঙলা দেশ থেকে চলে যাচ্ছেন। তাই সারা বাঙলা দেশ জুড়ে চলেছে বিদায়-অভিনন্দনের পালা। ঢাকা সহরের জগন্নাথ স্কুলের একটি হলঘরে সভা বসল। সেখানে একজন বক্তাকে দেখলেন কিশোর দীনেশচন্দ্র। বক্তার চেহারা যেমন দীর্ঘ, তেমনি স্থূল। লম্বা তীক্ষ্ণ নাসা। উজ্জ্বল গণ্ড। বড় বড় চোখ দুটি প্রতিভায় উদ্ভাসিত। বিশাল গোঁফ। বক্তা যতক্ষণ বললেন তরুণ দীনেশচন্দ্র সারাক্ষণ একটি ঘোরের মধ্যে অভিভূত হয়ে শুনলেন। সে বক্তৃতার ভাষা অননুকরণীয়। 'পাহাড়-পর্বত নিক্ষেপকারী, দেবাসুরের ক্রীড়ার মত, অবাধস্রোতা ঐরাবত-বিজয়ী দুর্জ্জয় গঙ্গার মত—বিপুল দম্ভময় মেঘ গর্জনের মত, শিবের প্রণবধ্বনির বিজয় দুন্দুভির মত—বঙ্গ ভাষার ধ্বনি আর কোথাও শুনি নাই।' বক্তার নাম কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

দূর থেকে একজন বিরাট মণীষীর সাক্ষাতলাভ দীনেশচন্দ্রের জীবনে এই প্রথম। সারা জীবন তিনি এই স্মৃতি তাঁর মানসপটে ধরে রেখেছিলেন।

অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাকে দেন, তাঁর বক্ষে বেদনাও দেন অপার। কবি দীনেশচন্দ্রের জীবনে তাই চলল বিধাতার পরীক্ষা। পিতৃ বিয়োগ হল, আর তার ছ'মাসের ভিতরে মায়ের দেহান্তর। সংসারের সব দায়িত্ব এসে চাপল তাঁর কাঁধে। হঠাৎ ছাত্রজীবন থেকে আসতে হল কর্মজীবনে। হবিগঞ্জ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক হয়ে শিক্ষকতায় প্রবেশ করলেন দীনেশচন্দ্র। এরপর কুমিল্লার শম্ভুনাথ ইনস্‌টিটিউসনে প্রধান শিক্ষকের চাকরি নিয়েছিলেন। প্রথম স্কুলে মাইনে ছিল। চল্লিশ। সেখানেই ইংরেজী অনার্স নিয়ে বি, এ, পাশ করলেন। এখানে এসে দশ টাকা মাইনে বাড়ল। কিন্তু এরপরেও আবার বিদ্যালয় পরিবর্তন। ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা।

বাইরে এত ঝড় বইছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে চলেছে কাব্য রচনার পালা গান। এই দুঃসহ দিনগুলির কাব্যচর্চা প্রসঙ্গে কবি দীনেশচন্দ্র নিজেই লিখেছেন—'গৃহের অশান্তি,—শোক দুঃখ আমার উদ্যমকে দমিয়া দিতে পারে নাই। আমি অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছিলাম। আমার একখানি কাব্য 'কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ' কুমিল্লার এক প্রেস হইতে বাহির হইল।'—বইখানির প্রকাশ তারিখ ১০ই এপ্রিল, ১৮৯০।

কবির জীবনে সে এক আশ্চর্য স্মরণীয় মুহূর্ত্ত। এবার আর কাব্য রচনা নয়, রচিত কাব্যের আশ্চর্য একটি জগতে গিয়ে উপস্থিত হলেন কবি। সেখানে কত উৎকৃষ্ট কাব্যের অজস্র পুঁথি। এর বিবরণ দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন :

'আমার পুঁথি খোঁজার ইতিহাসটা একটা অদ্ভুত গোছের।...হঠাৎ একদিন কে আমায় 'মৃগলুব্ধ' নামক একখানি প্রাচীন হাতের লিখিত পুঁথির খোঁজ দিয়া গেল। সেই পুঁথিখানি সংগ্রহ করিতে যাইয়া জানিতে পারিলাম, সেরূপ আরও অনেক অপ্রত্যাশিত পুঁথি ত্রিপুরা জেলায় আছে। তখন আমি এই কাজে আমার প্রকৃতির সমস্ত ঝোঁকের সঙ্গে লাগিয়া পড়িলাম।'

সেদিন ঐ ঝোঁক নূতন কাব্যের যথার্থ ভূমিকা রচনা করল। কবির ভাষায়—'পুঁথির খোঁজা ব্যাপার লইয়া আমাদের যুব-চিত্তের কতই না নিগূঢ় নিভৃত কক্ষ পরস্পরের নিকট উদ্ঘাটিত হইত। সেই হাটে মাঠে ঘাটে পদ্মপলাশ লীলাময়ী বাণী, কুন্দ কোরকের মৃদু নিঃশ্বাসবাহী সুগন্ধি বায়ু, স্নানরতা পল্লীললনার অসম্বৃত ভাবে বস্ত্র-নিক্ষেপ-কারী অঙ্কলাশ্রিত দুরন্ত শিশু, হলহস্তে বিস্ময় চকিত দৃষ্টি কৃষক, রন্ধনশালার ধুম্রজড়িত দেবী প্রতিমার ন্যায় সুদর্শন গৃহ-লক্ষ্মীর উনুন জ্বালাইবার চেষ্টা, পদ্মপ্রভ কোমল শ্রীপদে নিপীড়িত ঢেকীর দ্রুত উত্থান পতন ও অবগুণ্ঠনবতীদের মৃদু মৃদু আলাপ ও ভূষণগুঞ্জন ..কত মূর্তি আমাদের চক্ষের নিকট বাইস্কোপের ছবির ন্যায় চলিয়া গিয়াছে...।'

সাধারণ মানুষ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। পুঁথি কি তারা সহজে দিতে চায়! পাঠে তারা নিস্পৃহ, কিন্তু পুঁথি তারা পুজো করে বিগ্রহের মতন।—দীনেশচন্দ্রকে তাই অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। চোখের ওপর পুঁথিকে তিনি নষ্ট হয়ে যেতেও দেখেছেন। যে পুঁথির সাহায্যে বাঙলা সাহিত্যের একটি দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারত, তার বিনষ্টি কবিকে কি ব্যথা দিতে পারে তা যে কোন সুধীজনেই উপলব্ধি করতে পারবেন।—দীনেশচন্দ্রের কবিহৃদয় তাই যন্ত্রণায় হয়ে

উঠেছে ব্যাথাতুর।

এ ত গেল মানসিক যন্ত্রণা। শারীরিক ক্লেশও তাঁর কম হয় নি। কবি তার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'একদিন রাত্রি দশটার সময় ত্রিপুরা জেলার গৈলারা গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথ হারাইয়া ফেলি; ভয়ানক বৃষ্টি, ঝড় ও অন্ধকারে বিরল বসতি জঙ্গলের পথে প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল যেভাবে হাঁটিয়াছিলাম, তাহা…আমার মনে চিরদিন মুদ্রিত থাকিবে।'

তবে দুঃখের সঙ্গে রোমান্সও ছিল বই কি! অনুরাগিণী কিশোরী বধুর সিন্দুর স্পর্শে দীনেশচন্দ্রের হাত একদা রাঙা হয়ে উঠেছিল।

ত্রিপুরা—নোয়াখালি—শ্রীহট্ট—ঢাকা প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের নানা জেলায় জেলায় ঘুরে চলল পুঁথি সংগ্রহের অভিযান। গ্রাম বাঙলার নিসর্গ চিত্র কবিকে বারবার অভিভূত করল এবং পথের ক্লেশ দিল মুছিয়ে।

এইভাবে একদিন নানা কাব্যের পুঞ্জীভূত সৌন্দর্যরূপ দিয়ে তৈরী হল একটি অপূর্ব সুন্দর গ্রন্থ। গ্রন্থটির নাম, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। বাঙ্‌লা সাহিত্যে এ তিলোত্তমা গ্রন্থের তুলনা বিরল।

কিন্তু সমস্যা রয়েই গেল। গ্রন্থ প্রস্তুত, এখন ছাপার খরচ দেবে কে?—অসহায় কবি চললেন ত্রিপুরায় রাজ সন্নিধানে। সে আরেক কাব্য। দীনেশচন্দ্র সে কাব্যের এ সর্গটি অনুপম ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—'একদা তরুণ যৌবনে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র পাণ্ডুলিপি হাতে লইয়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের নামে পুস্তকখানি উপহৃত করিবার অনুমতি ও উহা প্রকাশের ব্যয় প্রার্থনার জন্য—রাজদর্শন মানসে আগরতলায় গিয়াছিলাম। ১৮৯১ সনের মে মাস, গ্রীষ্মকাল,—হস্তিপৃষ্ঠে সেই পার্বত্য প্রদেশ ভ্রমণের কথা এখনও ভুলিতে পারি নাই। ছোট ছোট পাহাড়ের উপকণ্ঠে ক্ষুদ্র বনরাজি লীলা পল্লীগুলি 'ধারা-নিবদ্ধ কলঙ্ক রেখা'র ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল; হস্তীটি কাকচক্ষুর ন্যায় নির্মল সলিলা কত দীঘির পদ্মনাল ভাঙ্গিয়া তাহাদের কোরক-নিঃসৃত শীতল সুগন্ধ জলবিন্দু স্বীয় বিরাট দেহে উৎক্ষেপ পূর্বক পার্বত্য পল্লীপথে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে চলিয়াছিল; কখনও পশ্চিম গগনে ধূসর রক্ত মেঘমালা স্বর্ণরেণু যুক্ত নীলাঞ্জনের ন্যায় সূর্য্যাস্তের লোহিত ছটা পরিয়া সন্ধ্যাকে চন্দন রঞ্জিত করিতেছিল। তখন আমার বয়স পঞ্চবিংশতি মাত্র।'

পঁচিশ বছরের কবি তিরিশে পড়লেন। কত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে কত প্রতীক্ষার ভেতর দিয়ে সময় চলল এগিয়ে। তারপর প্রত্যাশিত শুভদিন এলো। ১৮৯৬ সালের ২রা ডিসেম্বর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হল প্রকাশিত।

প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটির ভাগ্যে যে সম্বর্ধনা জুটল তা অভাবনীয়। অযাচিত ভাবে রাশি রাশি প্রশংসাপত্র কবির ঠিকানায় আসতে থাকল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কবিকে চিঠি লিখে অভিনন্দন জানালেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেকালের আরেকজন বিখ্যাত মণীষী। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, কিন্তু সত্যভাষী। সত্যভাষণে তিনিও প্রগলভ হয়ে উঠলেন। সুদীর্ঘ আট পাতার একটি চিঠি লিখে তিনি দীনেশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করলেন। দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রাচ্য বিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু—কেউই বাদ গেলেন না। সেকালের বিবিধ বিখ্যাত পত্রিকায় এ গ্রন্থখানির বহু আলোচনা প্রকাশিত হল। সবগুলিতেই অজস্র প্রশংসা। 'সাহিত্য' পত্রে রিভিউ লিখলেন

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ‘প্রদীপ’ পত্রিকায় লিখলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ‘ক্যালকাটা রিভিউ-তে’ আলোচনা করলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

গ্রন্থখানিতে যে অসাধারণত্ব ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছিল আমাদের সামনে। লোকায়ত বাংলার প্রাচীন চিত্র এমন করে কেউ কোনদিন আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি। মূল গ্রন্থখানির প্রায় একযুগ পরে প্রকাশিত হয়েছিল। “হিস্ট্রী অব বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ য়্যাণ্ড লিটারেচার।” বাঙলা বইখানিরই উন্নততর সংস্করণ। সেই ইংরেজী বইখানিও ইংলণ্ডের সুধীজনের কাছে কম চাঞ্চল্য আনে নি। টাইম্‌স লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে দীনেশ চন্দ্র সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—‘He tells more about the Hindu mind than we can gather from 50 volumes of impressions of travel by Europeans.’ এথিনিয়ম পত্রিকা লিখেছিল,—‘In the middle age he has done more for the history of his national language and literature than any other writer of his own or indeed any time. স্পেক্‌টেটর পত্রিকার মন্তব্যটি ছিল আরো সুন্দর। পশ্চিমী জগত এই গ্রন্থখানিকে যে অসাধারণ একটি বই বলে মনে করেছিল, সে ইংগিত সুস্পষ্ট।—দীনেশচন্দ্র সম্পর্কে তারা লিখেছিল—‘Perhaps no other man living has the learning and happy industry for the task he has successfully accomplished.’

শুধু ইংলণ্ড নয়, ইউরোপের দেশে দেশেও বই খানিকে নিয়ে বিরাট চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল। জার্মানিতে ওল্ডেন বার্গ, ফ্রান্সের জুলে ব্লক সকলেই এ গ্রন্থখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ঐতি-হাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ, কলাশিল্পী রটেনষ্টাইন, মনস্বী গ্রিয়ারসন ও সিলভান লেভী—কেউই সেদিন মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। রটেনষ্টাইন একটি চিঠিতে অজস্র প্রশংসা করে দীনেশচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন —‘আপনার পুস্তক একখানি যাদু কার্পেটের ন্যায়, ইহাতে চড়িয়া আমি যেন আপনার প্রিয় দেশটি আবার প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। আপনার বই পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইল যেন আমি মন্দিরের আরতি ঘণ্টা শুনিতে পাইতেছি, গঙ্গার ঘাটে, নৌকারূঢ়া রমণীগণের কলধ্বনি যেন আবার আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে।’

সিলভান লেভীর প্রশংসাও ঠিক একই রকম। তিনি লিখেছিলেন, ‘ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কোনও পুস্তকেরই আপনার পুস্তকের সঙ্গে তুলনা হয় না। বইখানি পড়িতে পড়িতে মনে হইল—আমি আপনাদের সুন্দর দেশের ভিতর দিয়া, আপনার দেশীয় লোকদের হৃদয়ের অন্তস্থানে পৌঁছিতেছি। আপনার পুস্তকের মত কোন পুস্তকেই এমন জীবন্ত সাংসারিক ও সাহিত্যিক চিত্র আমি পাই নাই। আপনার দেশের সাহিত্য আপনার নিকট মৃত নহে,—ইহা যেন জীবন্তভাবে পরিপূর্ণ। বহুযুগের ভাব ও আদর্শ ক্ষণকালের জন্য গ্রন্থকার বিশেষে অভিব্যক্ত হইয়া পরিশেষে পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কিরূপে ছড়াইয়া পড়ে—আপনার পুস্তক তাহারই আলেখ্য। পণ্ডিত ও কৃষক, যোগী এবং রাজা, আপনার সৃষ্ট রঙ্গমঞ্চে সেক্সপীয়র—সৃষ্ট জগতের মত মিলিত হইয়াছেন। আমি আপনাকে আমার আন্তরিক প্রীতি, শুধু তাহা নহে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস জানাইতে—ব্যস্ত হইয়াছি।’

মোটকথা বগজুড়ির কবি বিশ্বসভায় বরেণ্য হয়ে উঠলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায়

আন্তর্জাতিক সুধীজনের কাছে দীনেশচন্দ্রের মূল্য যে অনেক বেড়ে গেছে সুদূর আমেরিকায় থেকেও তিনি তা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারলেন। তাই তিনি তাড়াতাড়ি চিঠি লিখলেন দীনেশচন্দ্রকে 'আমার মনে হয় ইংলণ্ডে আপনার লেখা ছাপাইবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ সেখানে আপনার ইংরেজী গ্রন্থটি প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। যে কেহ পড়িয়াছে সকলেই বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছে। অথচ ছাপা কদর্য এবং ছাপার ভুল অপর্যাপ্ত। যাহা হউক, সেখানে যখন আপনার আসন প্রস্তুত হইয়াছে, এখন এ দেশের দিকে না তাকাইয়া সেইদিকেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইবে।'

কিন্তু কবির পথ কি অনাবিল সুখের পথ? কবির কবিতা সুন্দর, কিন্তু কি দুঃসহ দুঃখের ভেতর দিয়ে তিনি কাব্যের কুসুম ফুটিয়ে তোলেন, সে কথা কি একবারও আমরা ভাবি! কবি দীনেশচন্দ্রকে বিশ্বজনের সামনে আমরা সমাদৃত হতে দেখলাম। কিন্তু কি অসাধারণ পরিশ্রমে গৌরব-আলোকের উজ্জ্বল মহিমায় তিনি এলেন, তার ইতিহাস খুঁজতে হলে আমাদের একটু পিছনের দিকে ফিরে যেতে হবে।

১৮৯৮ সালে অসুস্থ দীনেশচন্দ্র যখন কলকাতা ত্যাগ করছেন, তার বিবরণ আগেই দিয়েছি। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচনা করার পর তিনি ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সে এক আশ্চর্য ব্যাধি। আতঙ্কিত দীনেশচন্দ্র সে ব্যাধির বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—এতদিনের প্রাণান্ত পরিশ্রম, কলহ-অশান্তি, শোক ও মর্মবেদনার ফল আজ ফলিল। এত দীর্ঘকালের রাত্রি জাগরণ, সময় সময় পাহাড় পর্বতে অনাহারে ১৪।১৫ মাইল পর্যটন, এবং শরীরের প্রতি একান্ত নিগ্রহ ও অত্যাচারের ফল আজ ফলিল। আমার চক্ষু হইতে নিদ্রা চলিয়া গেল, আহারের রুচি চলিয়া গেল, লিখিবার পড়িবার ক্ষমতা গেল, স্মৃতিভ্রংশ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ও মনের সমস্ত বল হারাইয়া নিশ্চেষ্ট জড়পিণ্ডবৎ বিছানায় পড়িলাম।'—এ অসুখ দিনের পর দিন বেড়েই চলল। ছ'মাসেও যখন সারল না, তখন কবি পাড়ি দিলেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। পদ্মার ওপর বজরা ভাসল। অসহায় কবি শিশুর মতন বজরায় ঘুমিয়ে পড়লেন। পিছনে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-পরিজন সকলে পড়ে রইলেন।

এর আগেও কবি এসেছিলেন কলকাতায়। বিদ্যাসাগরের স্নেহ ও বঙ্কিমের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। কিন্তু এবারে তিনি যখন এলেন, তখন তাঁর পরিচিতি তৈরী হয়ে গেছে। তাই অসুস্থ অবস্থাতেও প্রভূত সুধীজনের সান্নিধ্য পেলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মণীষীরা এলেন কবিকে দেখতে। দুঃস্থ কবির জন্য অর্থ সাহায্য নিয়ে এলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কুমার শরৎকুমার রায় এবং আরো অনেকে। এ সময় তিনি যে প্রবন্ধগুলি লিখতেন তারাও কবিকে কম সাহায্য করত না। তবে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তাঁকে যে সাহায্য করল, সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে তা অপরিমেয়।

তবু কলকাতা কবিকে রাজটীকা দিল না। কলকাতায় এল প্লেগের আতঙ্ক। সে মহামারীর ভয়ে অসুস্থ দীনেশচন্দ্রকে পালাতে হল। চলে গেলেন ফরিদপুরে।

কিন্তু কলকাতা যাকে রাজটীকা দিয়ে বরণ করবে বলে ঠিক করেছে, তাকে কি অমন ভাবে পালিয়ে গেলে চলবে? তাই তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্ত কলকাতা প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে থাকল। সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নতুন ইতিহাস রচিত হতে চলেছে। স্যার

আশুতোষ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য। দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যার ভিত্তি সুদৃঢ় করেছেন। বাণীর বরপুত্র দীনেশচন্দ্রের ডাক পড়ল ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯০০ সালের শেষের দিকে ফরিদপুর থেকে কলকাতায় এলেন দীনেশচন্দ্র। এ বছর জুন মাসে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যু হল। তিনি ছিলেন বি. এ, পরীক্ষায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা ভাষার পরীক্ষক। তাঁর মৃত্যুর পর পরীক্ষার পদের প্রার্থী হলেন দীনেশচন্দ্র।

সে-এক রবিবারের সকাল। বেলা আটটা কি নটা। স্যার আশুতোষের কাছে দেখা করতে গেলেন দীনেশচন্দ্র। দুরু-দুরু চিত্ত। কি-হয় কি-হয় ভাব। দেখা মিলল।

স্যার আশুতোষ বললেন—'আপনি যদি না আসতেন তবে পরীক্ষক হতে পারতেন না।'

দীনেশচন্দ্র এ হেন কথা শুনে বিস্মিত হলেন। 'তার মানে ?'

বিরাট গোঁফজুটি ভেদ করে বিদ্যুতের মত এক ঝলক হাসি খেলে গেল। স্যার আশুতোষ হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনার বিস্তর বন্ধু জুটেছেন, তাঁরা তো হলফ করে বলছেন যে, আপনার মাথা একেবারে বিগড়ে গেছে, দীর্ঘকাল মাথার অসুখের দরুণ আপনি এখন মানুষ পর্যন্ত চিনতে পারেন না,—একেবারে শয্যাশায়ী হ'য়ে আছেন।...কিন্তু এখন তো আমি বুঝলাম, আপনি যখন এতটা পথ ট্রামে করে এসেছেন, তখন আপনি শয্যাশায়ী নন। আপনি পথঘাট লোকজন বেশ চিনতে পারেন, না হলে এখানে এলেন কিরূপে ? কথাবার্তায় বোঝা গেল—আপনার মস্তিষ্কের বিকৃতির কোন লক্ষণ নাই। সুতরাং এখন আর আপনার দাবী ঠেকিয়ে রাখে কে ? যান, বাড়ী যেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।'

নিশ্চিন্ত হয়েই বাড়ি ফিরলেন দীনেশচন্দ্র। বগজুড়ির কবি সেদিন থেকে বিশ্ববিদ্যার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন। এরপর ধীরে ধীরে যতই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত হতে থাকলেন, ততই তাঁর লেখায় এলো উৎসাহ এবং খ্যাতি পড়ল ছড়িয়ে। এদিকে ঢাকাতে নতুন বিশ্ব-বিদ্যালয় তৈরী হল, উপাচার্য হারটোগ সাহেব তাকে ডাক পাঠালেন। দ্বিগুণ মাইনে। বনস্পতি আশুতোষের আশ্রয় ছেড়ে দীনেশচন্দ্র ঢাকায় যেতে চাইলেন না।—দীনেশচন্দ্রের এই স্বার্থ ত্যাগে আশুতোষ খুব খুশি হলেন। তাঁর গোঁফ দুটি গ্রীষ্মকালের রৌদ্রজ্জ্বল কালো মেঘের মত হাসির ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

১৯০৯ এবং ১৯০৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার পদে মনোনীত হলেন তিনি। পরপর দীর্ঘ উনিশ বছরেরও বেশি সময় রামতনু লাহিড়ী পদকে তিনি অলংকৃত করলেন। ১৯২১ সালে তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিল ডি, লিট, উপাধি। সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করল। ১৯৩১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'জগত্তারিণী পদক' লাভ করলেন। আর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর মূল সভাপতির আসন তিনি একাধিকবার অলংকৃত করেছেন।

অনেকে হয়ত মনে করবেন, এ সম্মান বুঝি গবেষক দীনেশচন্দ্রের সম্মান। তখন আমাদের একটি প্রশ্ন আছে, তাই কি ? একথা সত্যি তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন সেই জগতে, যেখানকার আকাশে বাতাসে আছে বৈষ্ণব কবিতার খঞ্জনি ঝংকার, ভাসান গানের করুণ কান্না, কথকদের কণ্ঠ নিঃসৃত মঙ্গল ও পাঁচালি গান। রামায়ণ—মহাভারত—ভাগবতের বাঙলা দেশ। তিনি আমাদের

সেই ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডে নিয়ে গেছেন যেখানে দীঘির জল ভরতে এসে চাঁদের মতন ভিনদেশী কুমার দেখে কুমারী কন্যার পরথম যৌবন লাজরক্ত হয়ে ওঠে। যেখানে শীতল পাটী ও বাটা ভরা পান দিয়ে অতিথিকে স্বাগত জানানো হয়। এবং নিশীথ রাতের অতিথির জন্য নিদ্রাহীন কন্যা মনে মনে ভাবে—'আইত যদি সোনার অতিথ যৌবন করতাম দান।'—বলাবাহুল্য দীনেশচন্দ্র হলেন এই লোকায়ত জগতের কবি।

শুধু গবেষক হলে এ জগতের সঙ্গে কেবল তিনি আমাদের পরিচয়ই করাতে পারতেন, ভাব-রাজ্যের গভীরে টেনে নিয়ে যেতে পারতেন না। দীনেশচন্দ্র একসময় তাঁর নিজের লেখা সম্বন্ধে বলেছিলেন,…'যদি আমার এই লেখা একটি মাত্র তরুণ যুবককেও কর্মে উদ্বোধিত করিতে পারে, লক্ষ্য অনুসরণ করিবার পথে দৃঢ় সঙ্কল্পারূঢ় করিতে পারে,…নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া (তাঁহারা) আমার পুস্তকগুলিকে হীনশ্রী করিয়া ফেলেন, তাহলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে। যদি আমার সামান্য পুস্তকগুলি সেই সেই বিষয়ে দীর্ঘকাল আদর্শ পুস্তক হইয়া থাকে—তাহা অপেক্ষা বঙ্গ সাহিত্য সেবীর অপবাদ আর কি হইতে পারে?'

দীনেশচন্দ্র কবি বলেই একথা বলতে পেরেছিলেন, নিছক গবেষক হলে নিশ্চয়ই একথা তিনি ভাবতে পারতেন না। ভগিনী নিবেদিতা একদা তাঁর লেখা পড়তে পড়তে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, 'দীনেশবাবু, আপনি সত্যই একজন প্রধান কবি, আপনার লেখা গদ্য হইলে কি হইবে, আপনার ভাষা প্রকৃত কবির। আপনার সাহিত্যিক শক্তি অপূর্ব।'

তবে বলে রাখা ভাল, তিনি নগরের বা সহরের কবি নন। তিনি গ্রাম বাঙলার কবি। তিনি লোকায়ত রোমান্টিক চিত্তের কবি। প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের কবি। তাঁর কাব্য পড়তে পড়তে মনে হয়, সেকালের সমাজ জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। চরিত্রগুলি উঠেছে কথা বলে। 'রামায়নী কথা'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে বগজুড়ির কবিকে তাই চিনে নিতে রবীন্দ্রনাথের দেরী হয় নি। অকপটে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি লিখেছেন—'সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন তাঁহার এই রামায়ণ চরিত্র সমালোচনার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করেন। তখন আমার অস্বাস্থ্য ও অনবকাশ সত্ত্বেও তাঁহার কথা আমি অমান্য করিতে পারি নাই।…ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজা মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ তিনি ঘণ্টা নাড়িবার ভার দিলেন। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।'

রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসা সার্থক কবির ওপর যে বর্ষিত হ'য়েছিল, তাতে আর সন্দেহ কি!

ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবিল সোসাইটি ও দ্বারকানাথ

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

বিশপ টার্নার যখন কলিকাতার প্রধান ধর্মযাজক তখন তাঁরই উৎসাহে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবিল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা। এর উদ্দেশ্য যে ছিল "সর্বজাতিয় দরিদ্র লোকেদের উপকার" তা সমাচারদর্পণ মারফৎ জানা যায়। ঐ একই সূত্রে জানা যায় যে "ঐ সোসৈটিতে এক সাধারণ কমিটি এবং কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিমিত্ত সহকারী পল্লীয় এক এক কমিটি আছেন। সাধারণ কমিটির মধ্যে এই এই সাহেবরা নিযুক্ত—কলিকাতার শ্রীযুক্ত লর্ড বিশপ সাহেব ও সুপ্রীম কৌন্সেলের অন্তঃপাতি শ্রীযুক্ত সাহেবেরা ও সুপ্রীম কোর্টের শ্রীযুত জজ সাহেবেরা ও নানাপল্লীয় কমিটির অন্তঃপাতি লোকেরা এবং যে মহাশয়েরা বর্ষে বর্ষে ঐ সোসৈটিতে ১০০ করিয়া প্রদান করেন তাঁহারা।"

এই ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবিল সোসাইটির সঙ্গে দ্বারকানাথের যোগ প্রায় স্থাপনের সময় থেকেই। ১৮৩৩ সালের এপ্রিল মাসে পুরাতন গির্জাঘরে যে বৈঠক হয় তাতে সাধারণ কমিটির সভাপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ন সাহেবের প্রস্তাবক্রমে নির্দ্ধার্য্য হয় "যে কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দরিদ্র লোকেরদিগকে মুশাহেরা দেওয়া বা উপকার করণের পারিপাট্য হওনার্থ নানা পল্লীয় কমিটির অতিরিক্ত এক সব-কমিটি নিযুক্ত হল"। "পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পরামর্শ দিলেন যে কলিকাতা নগর দশ পল্লীতে বিভক্ত হয় এতদ্দেশীয় ষোলজন (১) কমিটি মহাশয়দের আর চারিজন বর্দ্ধিত হইয়া প্রত্যেক পল্লীর তত্ত্বাবধারণার্থ দুইজন করিয়া নিযুক্ত হন। এবং ঐ প্রস্তাব সফল হওনার্থ এইক্ষণে তাহার সকল নিয়ম হইতেছে।"

ঐ সভাতেই দ্বারকানাথ প্রস্তাব করেন যে অবস্থাপন্ন এদেশীয়রা যাহাতে এই সমিতিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন সেই উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবের নকল এই প্রদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে (সম্ভব হলে বিনা পয়সায়) প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হউক।

এই সময়েই ইণ্ডিয়া গেজেট থেকে জানা যায় "বহুকালাবধী দিস্ত্রিক্ত চ্যারিটেবল সোসৈইটির দ্বারা ন্যূনাধিক এতদ্দেশীয় দুইশত দরিদ্রলোক জীবিকা পাইতেছে। ঐ সমাজে এতদ্দেশীয় অনেক ধনবান্ মহাশয়েরা চাঁদার দ্বারা ধন বিতরণ করিয়াছেন এবং আরো অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরা ঐ সমাজের পৌষ্টিকতা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইণ্ডিয়া গেজেট লেখেন যে, "ধনি হিন্দুগণ পিত্রাদিশ্রাদ্ধে বহু-সংখ্যক মুদ্রাব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা না করিয়া দিস্ত্রিক্ত চ্যারিটেবল সোসৈটি দ্বারা ঐ মুদ্রাসকল প্রকৃত দীন দরিদ্রদের ক্লেশোপশমার্থ ব্যয় করেন এমত আমরা আশা করি।"

ইহার কিছুদিন মধ্যেই রামমণি ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তখন দ্বারকানাথ "তাঁহার জনকের ৺পদপ্রাপ্তি হওয়াতে শ্রাদ্ধের তামাসা ব্যয় না করিয়া দু হাজার টাকা ঐ সোসৈইটিতে উক্ত কার্য্যার্থে প্রদান করেন।(২)

এর পর বৎসর ১৮৩৩-১৮৩৪ সালের সোসাইটির কার্য্যকলাপের প্রশংসা করিয়া এবং চাঁদার খাতায় স্বাক্ষরকারীদের তালিকা দিয়ে সমাচার দর্পণে যে খবর বার হয় তা'তে দেখি যে লেডী বেন্টিংক পাঁচশত টাকা, বাবু বিশ্বম্ভর সেন দু'শ টাকা ও দ্বারকানাথ একশত টাকা দিয়েছেন।

সেই সময়ে "সারকুলার রোড অর্থাৎ চৌরাস্তার পূর্ব দিকে কুষ্ঠরোগীদের নিমিত্ত এক চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়া শ্রীযুত জক্সন সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীন" ছিল। তার খরচ চলিত নেটিভ হাসপাতালের জন্য দেওয়া টাকা থেকে। ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা হলে "নেটিভ হাসপাতালের অধ্যক্ষেরা জররোগীর নূতন চিকিৎসালয়ের বিষয়ের পৌষ্টিকতা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসালয় উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু এই অতিকর্মণ্য চিকিৎসালয় বজায় থাকা অত্যাবশ্যক বিষয়। অতএব গত সোমবারে দিস্ত্রিক্ত চ্যারিটেবল সোসৈটির সাধারণ কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল ও তদ্বিষয় এতদ্দেশীয় লোকদের অনুরাগ জননার্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্তজ কুষ্ঠির চিকিৎসালয়ের কমিটিতে নিযুক্ত হইলেন। ঐ চিকিৎসালয়ে মাসিক ছয়শত টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ইহাতে আমাদের ভয় হইতেছে যে এতটাকা চাঁদার দ্বারা প্রতিমাসে উৎপন্ন করা ভার হইবে।" (৩)

এই কুষ্ঠাশ্রম চালনার ভার সোসাইটি গ্রহণ করেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত অন্ততঃ এটি যে চালু ছিল তার প্রমাণ পাই। (৪)

দ্বারকানাথ যখন এই কুষ্ঠাশ্রমের কমিটিতে তখন যে নিয়মে চলিত তার কিছুটা সমাচার দর্পণে প্রেরিত এক পত্র থেকে জানা যায়।

"দয়াপাত্র কুষ্ঠরোগিসকল সেই স্থানে স্বচ্ছন্দে গৃহে বাস করিতেছে তাহাদিগকে স্বাস্থ্যজনক যথোচিত আহারাচ্ছাদনাদি দেওয়া যায় এবং যাহাতে তাহারা নিষ্কণ্টকে বাস করে এমত উদ্যোগ নিয়ত হইতেছে।" বিভিন্ন জাতির লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন ঘরে বাস করিত এবং চিকিৎসকের অনুমতি লইয়া বাহিরে যাইতে পারিত। রোগীদের পরিবার ইচ্ছা করিলে ঐখানে থাকিতে পারিত। থাকিবার অনুমতি দিলে পরিবারের ভরণ পোষণের ভারও সমিতি লইতেন। এ ছাড়া যাহাতে তাহারা সদুপায়ে কিছু লাভ করিতে পারে সেজন্য মুরগী প্রভৃতি পালন ও সুতা দড়ি প্রভৃতি তৈরী করিয়া বিক্রি করার ব্যবস্থা ছিল।

সোসাইটির কাজ যেমন বাড়িতে লাগিল তেমনি টাকার চাহিদাও বাড়িল। "এই বহুমূল্য সমাজের দ্বারা কলিকাতাস্থ ভূরি ভূরি দরিদ্রলোক উপকার পাইয়াছে ও অদ্যাপি পাইতেছে এক্ষণে তৎসাহায্যার্থ সাধারণ লোকের প্রতি ঐ সমাজস্থেরদের পুনর্বার প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে বিলক্ষণরূপেই তাঁহাদের সাহায্য হইয়াছে।" "শ্রুত হওয়া গেল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর অতিবদান্যতাপূর্বক এই সোসটের উপকারার্থ প্রতি বৎসরে আরো ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।"

এই খবরের কয়েকদিন বাদে বাংলা ১২৭৪ সালের বৈশাখ মাসে এক অগ্নিকাণ্ডে কলিকাতার বহুলোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদের অধিকাংশই ছিল খড়ের চালা ঘরের অধিবাসী। (৫) এই "অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপকারার্থ...কতিপয় পরামর্শ বিবেচনার্থ ১৮৩৭ সালের ৬ই মে তারিখ শনিবারে

টৌন হলে ঐ সোসৈটির বিশেষ বৈঠক” হয়। তাহাতে রস্তমজী কাওসাজী এক আবেদনে বলেন যে, “এই বৈঠকের বিবেচনার্থ অনেক অনেক বিষয় উপস্থিত আছে তাহাতে সকলের সম্মতি বা অসম্মতি হইতে পারে কিন্তু এই প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবেচনাতে আমার সঙ্গে সকলেরই ঐক্য আছে যে দীনদরিদ্র ব্যক্তিদের উপকারার্থ অতিশীঘ্র কোন উপকার না করিলেই নয়।” সেইদিন বৈঠকেই ৫০৭৫টাকা চাঁদা ওঠে তার মধ্যে রস্তমজী ও তাঁর এক বন্ধু দেন হাজার টাকা করে, দ্বারকানাথ ও দুইজন সাহেব দেন পাঁচশত টাকা করে।

এর কিছুদিন পরেই কলিকাতার ব্যবসায় মহলে দুর্যোগ দেখা দেয়—একাধিক পুরাতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ফেল মারে। সেই সময় দ্বারকানাথের ব্যবসায়ও টলমল করে উঠে। দ্বারকানাথের অক্লান্ত চেষ্টায় সেবার ব্যবসায় দেউলিয়া ত হলই না বরং আর ফেঁপে উঠল। এর জন্যে কতখানি দায়ী দ্বারকানাথের ব্যবসায়ী বুদ্ধি, আর কতখানি ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ তা বলা শক্ত। তবে এই সময়ে অন্ততঃ আংশিক ভাবে পরিশ্রম ও ভাবনার ফলে দ্বারকানাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারেরা হাওয়া বদল ও সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে বলায় দ্বারকানাথ মাঘ মাসের শেষের দিকে জলপথে পশ্চিমে যাত্রা করেন। তার অব্যবহিতপূর্বে ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিকে এককালীন একলক্ষ টাকা দান করে সকলকে চমকে দেন। দ্বারকানাথের জীবনী লেখক কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন “এরকম অপূর্ব বদান্যতা এদেশবাসী অন্য কেহ করেন নি। গরীব অন্ধদের উপকারার্থে এই টাকা দ্বারকানাথ ট্রাষ্ট করে দেন। এই ট্রাষ্টের ট্রাষ্টী ছিলেন পার্কার সাহেব ও প্রিন্সেপ সাহেব। পার্কার সাহেব দ্বারকানাথকে জানান—

“প্রিয় দ্বারকানাথ,

আপনার অসামান্য দান সম্বন্ধে ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবিল সোসাইটির সঙ্গে লেখাপড়া যা কিছু করার দরকার আমি মিঃ উইলিয়াম পার্কারের সঙ্গে একযোগে খুশির সঙ্গে তাহা করিব। আমার মহানুভব বন্ধুর নাম চিরস্মরণীয় করে রাখবে এরকম একটা কাজের সঙ্গে, যত সামান্য ভাবেই হউক জড়িত হওয়াকে আমি গর্বের বিষয় মনে করি।

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় বহুবৎসরের। আপনার দয়া, সাধুতা ও নিঃস্বার্থপরতা আমি জানি ও শ্রদ্ধা করি। আপনাকে এত বিশেষভাবে জানি বলিয়াই অন্যেরা আপনার এই রাজোচিৎ দানে যতই চমৎকৃত ও মুগ্ধ হউক আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হই নাই।”

সমাচার দর্পণ থেকে জানা যায় যে, “ঐ টাকার সুদের দ্বারা বহুতর দীন হীন ব্যক্তিদের আহার নির্বাহ হয় এতদর্থ ঐ টাকা সোসাটিকে উপযুক্ত বন্ধকস্বরূপ ভূমির দ্বারা দত্ত হইয়াছে। এই টাকা স্বতন্ত্র জমা থাকিবে এবং দ্বারকানাথ ফণ্ড নামে বিখ্যাত হইবে।

সেটা ব্রাহ্ম সমাজ ও ধর্মসভার দলাদলির যুগ। তাই দানও সে সময়ে একটা বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্দ্ধমানবাসী নাম দিয়ে একজন সমাচার দর্পণে (৬) লিখলেন যে “একবৎসর গত হইল রেভিনিউ বোর্ডের এক সাধারণ বিজ্ঞাপনপত্রে দৃষ্ট হইয়াছিল এতদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তিরা দেশের মঙ্গলার্থে অর্থদান করিবেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে রাজাবাহাদুর উপাধি দিবেন তাহাতে আরো লেখা লিখা ছিল রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদানের যে যে কারণ হইবে উপাধি প্রদানকালীন

তাহাও প্রকাশ করা যাইবেক। তাহার পরে কয়েক ব্যক্তি ঐ উপাধি পাইয়াছেন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের উপাধি প্রাপ্তির কোন কারণ প্রকাশ করেন নাই এ বিষয়ে আমার…জানিতে বাঞ্ছা যদি কোন ব্যক্তি কেবল কুকর্ম দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া দেশের মঙ্গলার্থ এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রদান করেন তবে কি তিনিও রাজা বাহাদুর উপাধির যোগ্য হইবেন। যাহা হউক এ বিষয়ে আমার অধিক লিখিবার অভিপ্রায় নয় কেবল জিজ্ঞাস্য এই যে দেশের মঙ্গলার্থ অর্থ ব্যয় করিলে যদি ব্যক্তিরা রাজা বাহাদুর পদপ্রাপ্তির পাত্র হবেন তবে শ্রীযুত বাবু দ্বারকনাথ ঠাকুর কি অপরাধ করিলেন।

ঐ বাবু পূর্বে কিরূপ সৎকর্মেতে কবে কি দিয়াছেন আমি তাহা জানি না কিন্তু হিন্দু কলেজের সৃষ্টি অবধি ১২৪৪ সালের ২৫শে মার্চ তারিখ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যখন যে বিষয় উপস্থিত হইয়াছে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহাতে সর্বাগ্রে অধিক দিয়া বসিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সম্প্রতি তাঁহার পশ্চিম যাত্রাদিনে ডিষ্ট্রিক্ট অফ চ্যারিটেবল সোসৈটিকে যে লক্ষ টাকা দিয়াছেন আমার বোধহয় এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে কেহ এরূপ মহাদান কস্মিনকালে করেন নাই।

আমি ঐ বাবুর সততার কার্য্য অনেক জানি তাহার মধ্যে এক বিষয় বলি বিলাত হইতে সতীদাহ নিবারণের চূড়ান্ত হুকুম আসিলে পর যে দিবস ব্রহ্মসভাগৃহে এতদ্দেশীয় লোকেরা সভা করেন সেই দিবস বাবু কটকের দুর্ভিক্ষের উপশমার্থ স্বয়ং চাঁদার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। এবং যে কয়েক সহস্র টাকার চাঁদা হইল আপন ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া পরদিনেই তাহা কটকে পাঠাইয়া দিলেন কিন্তু পরে ঐ টাকা সকলও আদায় হয় নাই।

ধর্মসভা নিয়তই ব্রহ্মসভার দ্বেষ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা যে গোময়লিপ্ত পবিত্রস্থানে ভোজনপাত্র রাখিয়া পীড়িতে বসিয়া ভোজন করেন আর পুষ্পবিল্বপত্রাদি বহুমূল্য দ্রব্য দেবদেবীর উদ্দেশে ফেলিয়া দেন। তাহাতেই বলেন আপনারা পরম ধার্মিক কিন্তু ধর্মসভা প্রকৃত ধর্মার্থ কিঞ্চিন্মাত্র ব্যয় করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। যদি কহেন সতী ভিক্ষার চাঁদায় তাঁহারা অনেক ধন দিয়াছেন একথা যথার্থ বটে কিন্তু সে টাকা বেথি সাহেবের ও চন্দ্রিকাকারের উদরায় স্বাহা হইয়াছে। তাহার এক মুদ্রাও প্রকৃত ধর্মার্থে ব্যয় হয় নাই। গতবৎসর আমার অনেক মিত্রেরা বলিয়াছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের হৌস আর থাকে না অল্পদিনের মধ্যেই দেউলিয়া হইবে। কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই এইক্ষণে ঐ বন্ধুগণ দেখুন তাহার ছয় সাত মাস পরেই হৌসকে স্বচ্ছন্দরূপ রাখিয়া ডিষ্ট্রিক্ট অফ চ্যারিটেবল সোসৈটিকে লক্ষ টাকা দিয়া বাষ্পীয় জাহাজে পশ্চিমে গমন করিলেন আমি শুনিতেছি বাবু পীড়িত হইয়া বায়ু সেবনার্থ যাত্রা করিয়াছেন এবং লক্ষ্ণৌতে কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া গ্রীষ্মকালে হিমালয়ে অবস্থান করিবেন।”

এরকম একটা তীব্র কটাক্ষ ধর্মসভা চুপ করে সহ্য করলেন না। তাঁদের একজন সংবাদ চন্দ্রিকায় উত্তর দিলেন (৭) “ঐ কথা যদি কেবল বাঙ্গালা সমাচার-পত্রে প্রকাশ হইত তবে উত্তর দিবার আবশ্যক থাকিত না; কেন না এতদ্দেশে বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং বর্ধমানাধিপতি, নাটোরের রাজা, মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর, দেওয়ান রামচরণ রায়, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, যশোহর নিবাসী মহারাজ শ্রীকণ্ঠ রায় বাহাদুর, দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুজ, বাবু মদনমোহন দত্তজ ও মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুর, বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকার প্রভৃতির দাতৃত্বশক্তি ও কীর্তি

সকলেই জানেন। গয়াধামের রামশিলা প্রেতশিলা ও চন্দ্রনাথ পর্বতের সোপান এবং কলিকাতাবধি শ্রীশ্রীক্ষেত্রধাম পর্য্যন্ত রাস্তা ও সেতুতে কত লক্ষ টাকা ব্যয় ইহার ইতিহাস কি ঐ পত্র প্রেরকের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই? যদি বল "বহুকাল গত হইয়াছে" ইহা সত্য; কিন্তু তাঁহার উচিত ছিল না যে "কস্মিনকালে কেহ করেন নাই" এমত লেখেন।

অতএব পূর্বের সঙ্গে তুল্য না হউক পরের কথা দুই তিন লক্ষ টাকা ব্যয় এক এক কর্মোপলক্ষে করিয়াছেন এমত মনুষ্যও অনেক হইয়া গিয়াছেন। এইক্ষণে লক্ষ বা পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া শ্রাদ্ধাদি কর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন ইহা তত্ত্ব করিলে অনেক পাইবেন। অপর ইঙ্গরেজদিগের ধারা মতে যে সকল চাঁদা হইয়াছে তাহাতেও ঠাকুর বাবু ভিন্ন অনেক হিন্দু ধার্মিক টাকা দান করিয়াছেন। পত্র প্রেরক সেই সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিলেন।

অপর ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন ইহা এক ব্যক্তিকে দিয়াছেন এমত নহে—নগর মধ্যে অন্ধ আতুর সহায়হীন দীনদুঃখীদের উপকারার্থে যে সমাজ স্থাপিত আছে তাহাতে অনেকেই দান করিয়াছেন সেই ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন; কিন্তু আমি শুনিয়াছি ঠাকুর বাবু আপন অভিপ্রায় লিখিয়া গিয়াছেন মাত্র। তাঁহার বিষয় নির্বাহকদিগের উপর ভার আছে তাঁহারা দিবেন কিন্তু কবে দিবেন, সে টাকা হইতে কাণাখোঁড়ার দিগের উপকার কবে হইবে, তাহার নিশ্চয় হয় নাই। বৈকুণ্ঠবাসি বাবু রামদুলাল সরকার দুই লক্ষ টাকা পুত্রদিগের নিকট স্বতন্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন—ঐ ধনের বৃদ্ধি হইতে দীনদরিদ্রগণ আহার পাইবেক তাহাতে নগর বা পল্লীগ্রামস্থের বিশেষ নাই—"আমি ক্ষুধার্ত" বলিয়া বেলগাছিয়ার বাগানে উপস্থিত হইলে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া দেন—ইহাতে কত লোকের উপকার হইতেছে তাহা কি ঐ মহাশয় জানেন না? তিনি ঠাকুর বাবুর প্রশংসা শতমুখে করুন তাহাতে দ্বেষ করি না কিন্তু এতদ্দেশীয় আর এমত কেহ নাই ইহা লেখা উচিত ছিল না।"

দ্বারকানাথ যে লক্ষ টাকা দান করেন তার মধ্যে কিছু ছিল নগদ টাকা ও কিছু ঐ মূল্যের সম্পত্তি। সম্পত্তির মধ্যে একটি ছিল কুমারখালির বাজার ও তৎসংলগ্ন জমি। সেখানকার লোকের এই ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী কি ব্যাপার তা' ঠিক মত ধারণা ছিল না। তাহারা ভাবিল যে সংস্থার ইংরাজী নাম যখন তখন নিশ্চয়ই এ বিলাতের সাহেব অন্ধদের উপকারার্থে। সেই শোনা-কথার উপর নির্ভর করেই কৃষক আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ বা ফিকির চাঁদ) রোজনামচায় লিখেছেন। (৮)

দ্বারিকানাথ ঠাকুর, ক্যার কোম্পানীতে যুক্ত হইয়া যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুমারখালিস্থ রেশম কুঠি ক্রয় করেন, তখন কোম্পানীর শেষ কার্য্যাধ্যক্ষ উইলিয়াম সাহেব ছিলেন। তিনি কুমারখালি বাসীদিগকে বড় ভালবাসিতেন। অধিক মদ্যপান করিয়া শেষাবস্থায় সাহেবের মস্তিষ্কও স্থির ছিল না। ইত্যাদি কারণে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্যার কোম্পানীকে কুমারখালীর কুঠি বিক্রয় করিলেও তিনি কুঠি ত্যাগ করিলেন না। আপন পরিচারকদিগের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। * * *

কুঠির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, দ্বারিকানাথ ঠাকুরের কোন লোক, কুঠির সীমায়

উপস্থিত হইলেই সাহেব গুলি করিতে আসিতেন। দ্বারিকানাথ ঠাকুর অতিশয় মিষ্টভাষী, সুচতুর, বুদ্ধিমান ছিলেন। প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি তাহার সহচরী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বয়ং কুঠির উত্তরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সাহেব প্রথম গুলি করিতে উদ্যত হইয়া যখন শুনিলেন, দ্বারিকানাথ বাবু তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, কুঠি দখল করিতে আসেন নাই, তখন তিনি সাম্য হইয়া সর্দার বেহারা দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। দ্বারিকানাথের ন্যায় কর্ম আদায় করিবার লোক দ্বিতীয় ছিল না। তিনি সাহেবকে সন্তুষ্ট করিতে নীচে বিনামা রাখিয়া শীতল কোঠার উপরে গমন করিলেন। সাহেব সাদরে তাঁহারে করপীডন করিয়া বসিতে আসন দিলেন। পরস্পর শিষ্টাচার অনেক কথাবার্তার পর, দ্বারিকানাথ বলিলেন, আমি কুঠি ক্রয় করিয়াছি সত্য কিন্তু ইহা আমার নহে, নিজস্ব মনে করিয়া আপনার যতদিন ইচ্ছা ইহাতে বাস করুন। আমি যদি রেশমের কার্য্য আরম্ভ করি, আপনার বাসগৃহ শীতল কোটার সহিত তাহার কোন সংশ্রব থাকিবে না। সাহেব শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট এবং দ্বারিকানাথকে কোন বস্তুদানে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তখন হাতে কিছুই ছিল না, অতএব বলিলেন, আমার স্থাপিত ও নিজস্ব বাজারটি তোমাকে দিলাম। আমি ঐ বাজার হইতে উৎপন্ন অর্থ অন্ধ, আতুর ও অনাথ বালক-বালিকাদিগকে দিয়া থাকি। দ্বারিকানাথ বাবু বলিলেন, আমিও এই সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনার কীর্তি রক্ষা করিব। কুমারখালীর, বর্তমান বাজারটি এইরূপে বিনামূল্যে দ্বারিকানাথের হস্তগত হইল। তিনি আপনার কাছারি খুরসিয়াদপুরে গমন করিলেন। উইলিয়ম সাহেবের দান ও দ্বারিকানাথ ঠাকুরের দানে এইমাত্র ইতরবিশেষ হইল যে, সাহেব কুমারখালী প্রদেশের নিকটবর্তী অন্ধ, আতুর ও অনাথদিগকে দান করিতেন। দ্বারিকানাথ বিলাতের "ব্লাইণ্ড ফণ্ডে" অর্থাৎ অন্ধদিগের সাহায্যার্থ দান করিয়া আপনার যশঃ বিস্তৃত ও গৌরব বৃদ্ধি করিলেন।"

এর বৎসরাধিককাল বাদে যখন কলিকাতায় ভিক্ষা-নিরোধ আইন সম্বন্ধে এই সোসাইটীতে আলোচনা হয় দ্বারকানাথ দেশীয়দের তরফ থেকে তখন বলেন যে এদেশে ভিক্ষা-নিরোধ আইন প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন আপত্তি ত' নেই—বরং এর আশু প্রয়োগই বাঞ্ছিত। তিনি বলেন যে সৎকার্য্যে চাঁদা দেওয়াতে এদেশীয়রা বিশেষ উৎসুক নয় দেখে তার কারণ জানবার জন্য এক সভা ডাকা হয়েছিল। সেখানে আলোচনায় বোঝা যায় যে বর্তমান ভিক্ষা দেওয়ার প্রথা লোকের পছন্দসই নয়। ভিখারীরা পথেঘাটে সকলের অসুবিধা তো' করেই, বাড়ী গিয়েও বিরক্ত করে। তা' ছাড়া এতে ঠকবার সম্ভাবনা এতবেশী যে অধিকাংশ লোকেরই এতে দানধর্ম হয় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সেইসূত্রে দ্বারকানাথকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে একটী ভিক্ষাগৃহ (Alms-house) খুলতে। এবং তাকে তার বন্ধু মতিলাল শীলমশাই উপযুক্ত একখণ্ড জমি দিতে অঙ্গীকার করেছিলেন এবং রুস্তমজী কাওয়াসজী বাড়ী তৈরীর খরচ বহন করতে প্রস্তুত ছিলেন। সেই সভাতেই স্থির হয় যে পথে ঘাটে ভিক্ষা করা বন্ধ করা প্রয়োজন। সেই আলোচনার কিছুদিনের মধ্যেই ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী বর্তমান প্রস্তাবটী এনেছেন। এর ফল কি হয় দেখবার জন্য দেশীয়রা আপাততঃ তাঁদের পূর্বোক্ত সভার কার্য্যকলাপ স্থগিত রেখেছেন।

এইসব আলোচনার পর সেইদিন দ্বারকানাথ ও ম্যাক্‌ফার্লেন সাহেবের প্রস্তাব মত ঠিক

হয় যে—

কেবলমাত্র আর্থিক সাহায্য দেওয়ার যে প্রথা বর্তমানে সোসাইটীর আছে তাহাতে ভিক্ষাবৃত্তি উৎসাহিত হবার এবং এই সুযোগের অপব্যবহারের সম্ভাবনা যথেষ্ট।

নিঃস্বদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, ভদ্র পোষাক ও উপযুক্ত আশ্রয় ব্যবস্থার বেশী কিছু জন সাহায্যের দ্বারা করিবার দরকার নাই। সুস্থশরীরে সাহায্য প্রার্থী যাহারা তাহাদের নিকট হইতে সর্বদাই উপযুক্ত পরিশ্রম দাবী করা হবে।

নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণ হইলেই ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর পরিচালনায় উপরোক্ত বিধিগুলি চালু করা হবে।

এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা যায় যে নিঃস্বদের জন্য একটী কর্মগৃহ (Work-house) ও ভিক্ষাগৃহ (Alms-house) স্থাপিত হউক। এর জন্য সহর মধ্যে উপযুক্ত একখণ্ড জমি দান করিতে সরকারকে অনুরোধ করা হউক এবং বাড়ী তৈরীর জন্য চাঁদার খাতা খুলা হউক।

এই সভা নিশ্চিত মনে করেন যে কলিকাতায় ভিক্ষা-নিরোধ আইনের আরও প্রয়োজন এবং সরকারকে অনুরোধ করা যায় যে পথে ঘাটে যথেচ্ছ ভিক্ষা করা আইনতঃ বন্ধ করা হউক নতুবা এই নুতন ব্যবস্থা চালু হইলে ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার প্রভৃত আশঙ্কা আছে।

এই সমস্ত প্রস্তাব কার্য্যকরী হইবার পূর্বেই দ্বারকানাথ বিলাত চলিয়া যান।

দ্বিতীয়বার বিলাত যাইবার পূর্বে ১৮৪৩ সালের ১৬ই অগষ্ট যে উইল করেন তাহাতে তিনি গরীব দুঃখীদের উপকারের জন্য এক লক্ষ টাকার ট্রাষ্ট করিবার নির্দেশ দেন (৯) পিতার উইলের এই নির্দেশমত দেবেন্দ্রনাথ পিতার সমুদয় ঋণ শোধ করিয়া এক লক্ষ টাকা ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর হাতে দেন। পিতার মৃত্যুর পর হইতে যতদিন এই লক্ষ টাকা দিতে বিলম্ব হয়, ততদিনের সুদও তিনি ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর হাতে অর্পণ করেন। এ টাকা সোসাইটী কিভাবে ব্যয় করেন তাহা খুঁজিয়া পাই নাই। ১৮৯২ সালের এক হিসাব সোসাইটীর বিভিন্ন মুনাফার হিসাবের ভিতর দ্বারকানাথের ১৮৩৮ সালের ফণ্ডের উল্লেখ আছে কিন্তু ১৮৪৬ বা তার পরে ঠাকুরবাড়ীর কাহারও নামে ফণ্ড নাই। (১০)

(১) রসময় দত্ত, বিশ্বনাথ মোতিলাল, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গোপীনাথ সেন, রাধাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল গাঙ্গুলী, রামলোচন ঘোষ, রুস্তমজী কাওয়াসজী, কাশীনাথ রায়, কালাচাঁদ বসু, রামকমল সেন, মথুরানাথ মল্লিক, গোপাললাল ঠাকুর, হরলাল মিত্র, হরচন্দ্র লাহিড়ী ও দ্বারকানাথ ঠাকুর।

(২) সমাচার দর্পণ ১৩ আশ্বিন ১২৪০

(৩) সমাচার দর্পণ ৪ঠা জুলাই ১৮৩৫

(৭) নিউম্যান কোম্পানীর "হ্যাণ্ড বুক অফ ক্যালকাটা।

(৫) তদানিন্তন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপ্টেন বর্বর হিসাব অনুসারে তখন কলিকাতায় পাকাবাড়ীর সংখ্যা ছিল ১৪৬২৩, খোলার ঘর ২০৩০৪ ও খড়ুয়া ঘর ৩০৫৬৭

(৬) সমাচার দর্পণ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮

(৭) সমাচার চন্দ্রিকা ১৭ই মার্চ ১৮৩৮ (পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া অন্যান্য) চিহ্ন আমার দেওয়া।

(৮) শারদীয় চতুষ্কোণ ১৩৭০

(৯) I will and direct that my said executors or the survivors or survivor of them shall set apart Companys Rupees One hundred Thousand out of such parts of my personal Estate as may legally be devoted to charitable purposes to be paid to and invested by certain Trustees to be named and appointed by my said Executors or the survivors or survivor of them in the purchase of real property or on mortgage upon Trust to stand possessed of and interested in the said principal sum of Company's Rupees one hundred Thousand or the securities upon which the same shall from time to time be invested and the interest Dividends and annual proceeds there of for the benefit of such charitable institutions and poor people and to be paid and distributed in such parts and proportions as my said Executors or the survivors or survivor of them shall from time to time direct."

(১০) That are thefollowing permanent endowments :—

Lady William Bentink's Fund. 1835
Dwarkanath Tagore's Fund for the poor blind, I838
Mrs Englis's Charity, 1840
Lokenath Fund for poor invalids 1854
Prince Jameeroodeen's charity 1856
Srimati Bama Sundari's Fund 1865
Radhamadhab Banerjee's Charity 1865
Babu Chamatkar Krishna Ghose's fund 1866
Babu Ishan Chandra Bose's Charity 1867
The "Cheke" Fund 1870

উত্তর-রাঢ়ের লোকসংগীত

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

বিয়ের গান

বিবাহের গীতকে ডা: আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যবহারিক গীতির পর্য্যায়ভুক্ত করতে গিয়ে বলেছেন : সামাজিক কিংবা পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক আচারানুষ্ঠান সম্পর্কে যে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায় তাহা ব্যবহারিক গীতি বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইংরেজীতে ইহাকে Functional Song বলা হয়। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার নির্দিষ্ট ব্যবহারিক ক্ষেত্র ব্যতীত ইহা অন্যত্র কদাচ গীত হয় না। বিবাহের গীতই ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। পল্লীর বিভিন্ন পরিবারের বিবাহানুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন উপলক্ষ্যে ইহাদের ব্যবহার নাই।

বাঙলার লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি, প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটেছে বাঙলার অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে ও অন্দর মহলে। এখনও পর্য্যন্ত সে সমস্ত লোকসংগীতের আলোচনা করা হয়েছে। একমাত্র 'ভাঁজো' ছাড়া তার প্রায় প্রতিটিতেই পুরুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা আছে। বাঙলার কৃষিব্যবস্থা মেয়েদেরই সৃষ্টি এবং উন্নততর ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত এই কৃষিকার্য্য মেয়েদেরই আয়ত্বাধীন ছিল। তাই শস্যকামনা ছিল নারীজগতের আদিম অধিকার। এর সাথে এসে মিশেছে সন্তানকামনা। শস্য ধারণে প্রকৃতির প্রজনন শক্তি ও সন্তান ধারণে নারীর প্রজনন শক্তি দুই-এরই লোকসঙ্গীতে অসামান্য প্রভাব। যে কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে যে আচার পদ্ধতি মেনে চলা হয়—তা অন্দরমহলের নিজস্ব। সন্তানের জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখদুঃখ, আনন্দবিরহের যে অনুষ্ঠান প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেয়েদের নিজস্ব আচার যুগাতীত কাল হতে চলে এসেছে। আদিম কোমবদ্ধ জীবনধারায় যে স্ত্রী-আচার—ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবল পরাক্রম আজও তা উচ্চবর্ণের সমাজের অন্দরমহল হতে মুছে দিতে পারে নি। এই একটিমাত্র লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি আদিবাসী রমণীর সাথে পল্লীগ্রামের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ রমণীর একাত্মতা, হিন্দু নারীর সাথে মুসলমান নারীসমাজের অদৃশ্য যোগাযোগ। আর্য্যব্রাহ্মণ্যধর্মের কোন অনুশাসনকে এরা অন্দরমহলে প্রবেশ করতে দেয়নি। অতি বড় শাস্ত্রজ্ঞ ও বেদজ্ঞ পুরুষকেও এই অন্-আর্য্য রীতিসম্মত অবৈদিক লৌকিক আচারকে মেনে নিতে হয়। শুধু এই স্থলেই বেদাচারের সাথে লোকাচারের অপূর্ব সহাবস্থান।

বিবাহের লৌকিক আচার ও গীত মেয়েদের নিজস্ব। সভ্যতার রূপান্তরের সাথে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে সত্য কিন্তু কাল হতে কালান্তরে স্ত্রী আচারের সেই আদিমরূপটির কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। বিবাহের প্রস্তাবনা হতে শুরু করে শ্বশুরগৃহে কন্যার বিদায় পর্য্যন্ত বৈদিক মন্ত্রের সাথে লৌকিক আচার সমান্তরালভাবে চলে। কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে বিবাহের অনুষ্ঠানকে শাস্ত্রসম্মত রূপ দেয়। কিন্তু স্ত্রী আচার ছাড়া কোন বিবাহই পূর্ণাঙ্গ নয়। প্রতিটি আচারের সাথে বরবধূর মঙ্গলকামনা ভাবীজীবনের ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে। অন্ত্যজ শ্রেণী ও আদিবাসীর জীবনযাত্রায় প্রতি স্ত্রী-আচারের সাথে মিশে আছে গীত। এই গীতই এদের

মন্ত্র। এদের বিবাহানুষ্ঠানে পুরুষের কোন ভূমিকা নাই বললেই চলে। বর্ষীয়সী মহিলার দল কখনও রসাত্মক ছড়ায় কখনও বা বিবাহিতা মেয়েদের সাথে প্রেমসঙ্গীতের মাঝে প্রতিটি লৌকিক আচার নিখুঁতভাবে সাঙ্গ করে যেন কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটে। যুবতীর দল প্রতিটি আচারই শিখে নেয় কারণ উত্তরকালে তাদেরকেই তো এ দায়িত্ব নিতে হবে।

বিবাহের এই অনুষ্ঠান যদিও একটি পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে—তবু এর পরিধি পারিবারিক গণ্ডীর বাইরেও সুদূর বিস্তৃত। পল্লীসমাজে বিবাহ একটি গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক অনুষ্ঠান। পঞ্চগ্রামের লোক মেতে ওঠে এক পরিবারের বিবাহকে কেন্দ্র করে। অন্ত্যজ শ্রেণীবা আদিবাসীর ক্ষেত্রে তো বিবাহ সেই গোষ্ঠীর একটি যৌথ অনুষ্ঠান।

সাওঁতালদের বিবাহের রীতি ও গীত সম্পর্কে পৃথকভাবে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হবে। বিবাহের ক্ষেত্রে বাউরী মেয়েদের তরজার মত পালাক্রমে গান গাওয়ার রীতি আছে।

ও মাসী মেসেনী' (১)
ফুল বাগানে গো মাঝে তুলে নি
ও দোকানী দোকান খোল
ওর গাঁয়ে মিলন হবে তুর

একপক্ষ বলে

খেল কদমে পাত কালো

অন্যপক্ষ বলে

আমি কালো গো
তু কত ভালো।

তার উত্তরে প্রথমপক্ষ জবাব দেয় :—

খেল কদমে—তুলেতে তুলেতে তুলেতে।

প্রত্যুত্তর এল :—

খেলবো না বেজের ধুলোকে।

ধাঙ্গরদের বিবাহকালীন গানের একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

ছোট বৌ পেরওয়া বড় বো পেরওয়া সামা—
দিক দিকে বাহসৈ জাতিরে কুটুম
বিগরে বাহসৈ সামা।
ছোট বৌ······সামা

বিষো কোশ গঙ্গা দশ কোশ যমুনা
যমুনাকে পার কর উধার দে দশ ভাই
গঙ্গাকে পার করে হু দারি দি
দশভাই না লাগিল সোনা না লাগিল রূপা
না ছাতি চাঁদোয়া রে লাগি।

'ঢেকাড়ো' নামে এক সম্প্রদায় আছে যাদের পদবী কর্মকার তাদের যে বিবাহানুষ্ঠান তাতে সঙ্গীত অপরিহার্য্য।

বাবা দুলালী গো বেটী আজ কেনে চন্দন মোহকে (২)
বাঁহাতে কাঁঙ্গানা দোলাওএ
রায় রেসা তেলা এসো বেটী
ভায় তু উ গোটা কুড়োপুতা
কাঙানা দোলাওএ
জিহদিনে বেটি গে তুহরো জনম
সেহ দিনে বেটি গে হামে স্বুবম্ গাল
বাঁজা মা বাহিনা বেটি হামে শুনম্ সাল
আঁচল পাতিয়ে বেটী হামে লিব গান

অথবা

শশুরা কে বুলচাল কে শুনা
মায়ের নিজেকের বাপ যেমান তে শুনা
ভেসরেকা বুলচাল কে শুনা
মায়ের নিজেকের ভাই যেসান তে শুনা
মেহমান কে বুলচাল কে শুনা
মায়ের টাঙ্গাঁকা ধরে যেমান তে শুনা

বিবাহকালে বাউড়ী সম্প্রদায়ের মেয়েরা সমসাময়িক বিবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করে গান করে যার সাথে অনুষ্ঠাণের আদর্শগত কোন সম্পর্ক নাই ও কোন ভাবগত ঐক্য নাই। কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

১। যা খেলাবি তাই খেলা
হেরিকেনের ভেতর আলা
২। তোদের জামাই এলো ভাঙ্গা ফুটো
গাড়িতে গো গাড়িতে
জল দোব না ভাল ঘটিতে
৩। ছেলে ধর্ গো ঝাল বাঁটি
মুরগিটো কেটে করলাম কি
৪। তারা তারা আকাশেরই তারা
ও মাগিছে ভালছে দেখ
যেন বেঙের পায়া।
৫। ক্যানেল কাটা কল এল
নতুন পয়সা নয়া পয়সা ওগো তাও চালু হল।

ওমা ব্রহ্মানী (৩)
তোমার গরম ভাঙলো ক্যানেল কোম্পানী
৬। মোশান জোড়ে দ্বারকা নদী বেঁধেছে
বেদোডাতে অজয় নদী বেঁধেছে
দেশে ক্যানেল ছুটেছে।

মুসলমান সাম্রাজ্যে বিবাহকালে স্ত্রী-আচার বিশেষভাবে মেনে চলা হয়। এক্ষেত্রেও স্ত্রী-আচারের সাথে সঙ্গীত ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে। সঙ্গীতগুলো বিষয়বৈচিত্রে অপূর্ব।

১। কদমতলায় দাঁড়িয়ে বাগাল
তুমি কতই লীলা করহে
আমার লেগে এনো হে বাগাল
এলিফুল আর বেলীফুল
ও তোর গরু গেল পালিয়ে
ও তোর ছাগল গেল পালিয়ে
আমি দুটো কথার গুণাগার

'কদমতলা' আর 'বাগাল' রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাবুদের বাঙলাতে লাগাবো
ফুলেরই বাগান
কন্যাকে দেখে লাগে চমৎকার
কালো ভোমরা ওড়ে পালের পাল
ঝাঁকে ওড়ে রে
ঝাঁকে বসে রে
আমার সকল মধু খেয়েরে
ভোরে হল কালা দেশান্তর
২। এক বাটাতে লঙ সুপারী
জোড় বাটেতে পান রে
খেয়ে যারে নও সাবালা (৪)
জোড় বাটার পানরে॥
আগে আছে ননদিনী
বড় লাগে লাজরে।
ছেড়ে দাও রে ছোট দেওরা
নদীর ঘাটে যায় রে।
পানিয়া কো যায় গরীয়া (৫)
কাঁখে নাচে গাগরী রে

৪। জামাই আসছে জামাই আসছে
গাছে পাকা আম—
জামায়ের লেগে রেখেছি বেটি
পূর্ণিমার চাঁদ
আলমতলায় (৬) দাঁড়িয়ে জামাই
চাইছে জামা জোড়া দান
আলমতলায় দাঁড়িয়ে জামাই
চাইছে শ্বাশুরীকে দান
কি বললি গোলামের বেটা
মুখে রুমাল বাঁধ
জামায়ের লেগে রেখেছি বেটি
পূর্ণিমার চাঁদ ॥

৫। তিনটে মালতীর পাত
তাতে দেব বড়া ভাত
কি বাণ মারিলি কালা
জ্বলে গেলাম রে
কি বাণ মারিলি কালা অঙ্গে।
জ্বলাবাণ মারিলি কালা
পোড়াবাণ মারিলি রে
তুমি ত' পরের পুত,
তোমার লেগে এত দুখ
দেশান্তরি হবো তোমার সঙ্গে।

উপরিউক্ত গীতগুলিতেও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। সুন্দরীর গাগরী কাখে নদীর ঘাটে জল আনতে যাওয়ার সেই অতি পুরাতন দৃশ্য। তার পূর্বে জামাইকে পান খাওরার প্রস্তাব করা হয়েছে। জামাইয়ের জন্য প্রতীক্ষমানা যে মেয়ে—সে যেন পূর্ণিমার চাঁদ। শেষ গানেও সেই 'কালার' কাছে আত্মসমর্পণ। 'কালা'র প্রেমে অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। তাই তো মন মানে না। কালার জন্যে দেশত্যাগিনী হবে মেয়ে।

১। গানটি শুকনা গ্রামের পূর্ণদাসী বাউড়ীর নিকট সগৃংহীত
২। গানটি রাসপুরের বিজয় সর্দারে নিকট সংগৃহীত
৩। গানটি রাসপুরের প্রভাকর কর্মকারের নিকট সংগৃহীত
৪। বর ৫। সুন্দরী ৬। ছাদ্নাতলা

যে বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে—

১। বাংলার লোকসাহিত্য—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

২। বাঙালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়

৩। লোকায়ত দর্শন—শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৪। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা—শ্রীগোপাল হালদার

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডাঃ সুকুমার সেন

৬। বাংলার লোকনৃত্য—মণি বর্ধন

৭। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

[বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র ও চরিনামের আলোচনা বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটি নামের প্রথম উপস্থিতি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য প্রথম কয়েকটিতে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে, পরেরগুলিতে সংক্ষেপ করা হয়েছে।]

আকবর (দুর্গেঃ ১-৩)॥

ভারতবর্ষের তৃতীয় মোগল সম্রাট। তিনি হুমায়ুন ও হামীদাবানুর পুত্র। তাঁর পুরা নাম আকবর আকুল ফতে জালালউদ্দীন মহম্মদ। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তাঁর জন্ম হয়। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর মাত্র ১৩-১৪ বৎসর বয়সে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যজয়, সুশাসন ও বিভিন্ন সংস্কারের দ্বারা আকবর ভারতের ইতিহাসে 'মহামতি আকবর' নামে সুপরিচিত। পুত্রদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার জন্য শেষবয়সে তাঁর জীবন অশান্তিতে কাটে। অবশেষে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ অথবা ২৬শে অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে আকবরের কথা ইতিহাস হিসাবেই স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশে মোগলশাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি মানসিংহকে নিযুক্ত করেন। বঙ্কিম এই প্রসঙ্গে আকবরের দূরদর্শিতা ও বিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রশংসাও করেছেন।

আকব্বর (রাজঃ ২১)॥

ঔরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র আকবর বা আকব্বর। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে তাঁর সম্বন্ধে আছে— "যেসকল ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে ঔরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র আকব্বর রাজবিদ্রোহী হইয়াছিল। পঞ্চাশ হাজার সেনা তাঁহার সহায় ছিল; ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে অল্প সেনাই ছিল, কিন্তু জ্যোতিবিদের গণনার উপর নির্ভর করিয়া আকব্বর সৈন্যযাত্রায় বিলম্ব করিলেন, ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব কৌশল করিয়া তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল করিলেন।"

এ সম্বন্ধে ইতিহাস বলে—ঔরঙ্গজেব মেবার আক্রমণ করলে রাজসিংহ আরাবল্লীর পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন ঔরঙ্গজেব আকবরের অধীনে চিতোর দিয়ে আজমীর আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর রাজপুতগণের আক্রমণে বিব্রত হয়ে চিতোর থেকে বিতাড়িত হলে তাঁর অন্য ভাই আজম মেবারে মোগলসৈন্যের ভার পান। এতে অপমানিত হয়ে আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ও রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের চেষ্টায় রাজপুতদের কাছে তিনি বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন হন। তখন তিনি প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। অবশেষে রাজ্যের নেতা দুর্গাদাস তাঁকে আশ্রয় দিলেন শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর কাছে। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

আনন্দস্বামী (যুগঃ ৩য় পরিঃ) ॥

তিনি হিরণ্ময়ীর ভাগ্য গণনা করে বৈধব্যযোগ দেখেছিলেন। কিন্তু কৌশলে তিনি দৈবের লিপিকে খণ্ডন করেছেন। হিরণ্ময়ীর প্রতি তাঁর স্নেহও বিদ্যমান। হিরণ্ময়ীর দারিদ্র্যদশা দেখে তিনি রাজাকে বোলে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আলমগীর (রাজঃ ১/২) ॥ দ্রঃ ঔরঙ্গজেব।

আলি ইব্রাহিম খাঁ (চন্দ্রঃ ২/১) ॥

এটি ঐতিহাসিক চরিত্র। তিনি ছিলেন মীরকাশেমের বিশ্বস্ত বন্ধু ও একান্ত সচিব। তিনি যে ইংরাজের সংগে বিবাদ বাধাতে ইচ্ছুক ছিলেন না, এটা উপন্যাস থেকে বোঝা যায়।

আয়েষা (দুর্গেঃ ২-১) ॥

"যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা।"— বঙ্কিমের এই উক্তি যথার্থ। পদ্মফুলের যেমন আভিজাত্য ও সৌন্দর্য্য দুইই আছে—আয়েষারও তেমনি। দেবপূজায় পদ্মফুল লাগে, আয়েষারও জীবনপদ্ম বিকশিত হয়েছিল জগৎসিংহের পূজার জন্য।

"আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক।" তিলোত্তমার মত আয়েষাও জগৎসিংহের প্রতি প্রথমদর্শনেই অনুরক্ত হয়েছিল, কিন্তু, তার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। প্রাণ দিয়ে আয়েষা জগৎসিংহের সেবা করেছেন, কিন্তু কখনো প্রেমনিবেদন করেন নি। এইজন্যই আয়েষা আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধার পাত্রী। প্রেমের কাঙালীপণায় নয়, প্রেমের আত্মনিবেদনেই আয়েষা সুন্দরী হোয়ে উঠেছেন। এমন কি, পাছে জগৎসিংহ মনে করেন আয়েষা তাঁর প্রতি অনুরাগবশতঃই ঘন ঘন তাঁর গৃহে আগমন করে, তাই জগৎসিহের রোগ সেরে গেলে তিনি যাতায়াত বন্ধ করলেন।

আয়েষার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আরও গভীর হয় এইজন্য যে একদিকে ওসমানের মত সুপাত্রের প্রেমনিবেদন তিনি বারবার প্রত্যাখ্যান করেছেন, অপরদিকে জগৎসিংহের মনে প্রেমিকা হিসাবে আয়েষার প্রাধান্য একটুও নেই। আরোগ্য লাভের পর জগৎসিংহের মনে আয়েষার চিন্তা তৃতীয় স্থান লাভ করেছে, তাও সেবাময়ীরূপে।

আয়েষা কোনদিনই হয়তো জগৎসিংহকে তাঁর মনের ভাব জানতে দিতেন না। কিন্তু ওসমানের অভিযোগের উত্তরে দৃঢ়তার সংগে তিনি স্বীকার করেছেন—"এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!" এরূপভাবে মনের ভার প্রকাশ করে ফেলার জন্য আয়েষার অনুশোচনাও কম হয় নি, তাই জগৎসিংহকে বলেছেন—"রাজপুত্র, তুমিও অপরাধ ক্ষমা কর।' যদি ওসমান আজ আমাকে মনঃপীড়িত না করিতেন, তবে এ দগ্ধ হৃদয়ের তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইত না, কখনও মনুষ্য কর্ণগোচর হইত না।"

একদিকে ওসমান, অন্যদিকে জগৎসিংহ—সর্বোপরি আয়েষার নিজ মনোবৃত্তির দোলায় চরিত্রটি দ্বন্দ্বসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। ক্রমে সেই প্রেম আত্মনিবেদনের ভক্তিমার্গে উন্নীত হয়েছে। তাই আয়েষা অনায়াসে বলতে পেরেছেন—'আমার যাহা দিবার তাহা দিয়াছি, তোমার নিকট প্রতিদান কিছু চাহি না।' দুঃখিনী আয়েষা জগৎসিংহ-তিলোত্তমার বিবাহে হাস্যমুখে উপস্থিত থেকেছেন। সবশেষে দৃঢ়তার সঙ্গে মৃত্যুবরণের লোভ সম্বরণ করে হৃদয়ে অনির্বাণ রেখেছেন বিরহের দুঃসহ জ্বালা।

আত্মত্যাগের এই সুকঠোর মন্ত্রে আয়েষা হয়ে উঠেছেন যথার্থই—"রমণীরত্ন" ।

আশমানি (দুর্গেঃ ১।৫) ॥

অনৈতিহাসিক চরিত্র। আশমানি প্রথমে ছিল মানসিংহের অন্তঃপুরের দাসী। সেখানে বিমলার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয় এবং বীরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে গড় মান্দারণে আসে। গজপতিকে বোকা কৃষ্ণ সাজিয়ে তার রাধিকারূপে কিছু স্থুল রসিকতা করেছে আশমানি। তারপর আর তার কোন বিশেষ কাজ দেখা যায় না। আশমানির সঙ্গে তিলোত্তমা কত্‌লুখাঁর আশ্রয় ত্যাগ করেছে, এবং তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের মিলনকালে বিমলার সঙ্গে কিঞ্চিৎ হাস্য পরিহাসরত অবস্থায় তাকে দেখা গেছে। আশমানি সাধারণ পরিচারিকা অপেক্ষা একটু বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। হাস্যরসেই তার স্বাভাবিক স্ফূর্তি।

আসিরুদ্দীন (রাজঃ ৬।৮) ॥

জেব-উন্নিসার এক বিশ্বস্ত খোজা। মবারকের সর্পদংশিত মৃতদেহ কবর থেকে তুলে বাঁচান যায় কিনা, সে বিষয়ে জেব-উন্নিসা ভার দিয়েছিলেন এর উপর।

ইন্দিরা (ইন্দিরা : ১ম পরিঃ) ॥ 'ইন্দিরা' উপন্যাসের নায়িকা ইন্দিরা একটি অসাধারণ চরিত্র। অসাধারণ এজন্য যে, তার জীবনে যেসকল ঘটনা ঘটেছে, সেগুলি সাধারণ মানুষের জীবনে সহজে ঘটে না। প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাবার পথে ডাকাতের অপহরণের পর নিজের চেষ্টায় ইন্দিরা যেভাবে স্বামীর সংগে পুনর্বার মিলিত হয়েছে তাতে তার জীবনের এক সংঘাতবহুল দিক প্রকাশিত।

ইন্দিরা ধনীর দুলালী। বাস্তবের সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ীতে যাবার পথেই প্রথম পরিচয়। কিন্তু উনিশ-কুড়ি বছরের যৌবনদীপ্ত মনে সে অনেক সাহস সঞ্চয় করেছিল। তাই ডাকাতের হাত থেকে পালাবার মতলব করেছিল। কিন্তু পারেনি। তারপর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সে কোলকাতায় এসে সুভাষিণীর বাড়ীতে রাঁধুনীর চাকরী গ্রহণ করেছে। তবে ইন্দিরা তার স্বগ্রামের একদিনের পথ ত্যাগ করে, কোলকাতায় খুড়ার খোঁজে আসার ঘটনাতে বোকামীর পরিচয় দিয়েছে।

ইন্দিরার জীবনে দুঃখের আঘাত তার হাস্যোজ্জ্বল মূর্তিটিকে ম্লান করতে পারে নি। বাড়ীর গৃহিণী এবং বামুন ঠাকুরাণীকে নিয়ে নিত্য-নূতন রসিকতায় সে নিজের দুঃখকে ভুলে ছিল। সুভাষিণীর সঙ্গে তার হাস্য-পরিহাস কিন্তু গভীরতার ভালোবাসায় সিক্তিত। দু'জনের হাসি বেদনা ও ভালোবাসায় অশ্রুসিক্ত।

ইন্দিরার মধ্যে আছে অকপট সারল্য। এই সরলতার দ্বারা সে নিঃসঙ্কোচে তার সমস্ত দোষ-গুণ, ন্যায় অন্যায় স্বীকার করেছে। ইন্দিরার সাধারণ মানুষের প্রতি দরদেরও অন্ত নেই। বৃদ্ধা বামুন ঠাকুরাণীর সঙ্গে সে রসিকতা কোরলেও তাকে যথেষ্ট ভালবাসে। শ্বশুরবাড়ী যাবার পথে গরীব সঙ্গী-সাথীদের বিশ্রাম করায় প্রথমে ইন্দিরা বিরক্ত হলেও, শেষপর্যন্ত নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে।

ইন্দিরা তার স্বামীর সঙ্গে যেভাবে প্রেমাভিনয় করেছে তাতে ওকে অসচ্চরিত্র বলে অভিহিত করা যেত কিন্তু প্রথম কটাক্ষটা অন্যায় হলেও, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্বামীকে চিনেছে। তাই এই

ভাগ্যবিড়ম্বিত শরীর স্বামীর সঙ্গে মিলনের আগ্রহাতিশয্যে কোন ব্যবহারকেই অন্যায় বলে মানা যায় না। কিন্তু নিজেকে ডাইনী প্রতিপন্ন করে উপেন্দ্র বাবুকে বিব্রত করার পিছনে তার রসিকা-মনের তৃপ্তি ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না।

সবশেষে এই উপন্যাসের কথক ইন্দিরার কাব্যকুশলতা ও চরিত্রবিশ্লেষণের দক্ষতার বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। সে তার দেখা সমস্ত জিনিসই খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছে। রূপসী, সাহসী, রসিকা ইন্দিরা নিজগুণে তার জীবনের কালো মেঘকে অপসারিত করেছে। তার স্নিগ্ধোজ্জ্বল চরিত্রটি সমগ্র উপন্যাসের এক অনন্য সম্পদ।

ইব্রাহিম লদী (দুর্গে : ১-৩)॥ 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে নামোল্লেখ মাত্র আছে। ইব্রাহিম লদী (লোদী) জাতিতে আফগান। ভারতবর্ষে সুলতানী আমলের তিনিই শেষ নিদর্শন। তাঁর রাজত্বকাল ১৫১৭ খ্রীঃ—১৫২৬ খ্রীঃ। অপক্ষপাত বিচারের জন্য তিনি অভিজাত আফগানদের বিরাগভাজন হন। তাঁরা বারবার ইব্রাহিমকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। অবশেষে তাঁরা বাবরকে দিল্লী আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে ভারতবর্ষে মোগলসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

ইম্‌লিবেগম (রাজঃ ৭-২)॥ ঔরঙ্গজেব নির্মল-কুমারীকে ইম্‌লিবেগম বলে ডাকতেন। (দ্রঃ নির্মলকুমার)।

ইলিস্ সাহেব (চন্দ্রঃ ২-৫)॥ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। আজিমাবাদ বা পাটনা কুঠির প্রধান ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন। এঁকে এবং এঁর কুঠিকে কেন্দ্র করেই প্রধানতঃ ইংরেজ ও মীরকাশেমের মধ্যে বিবাদ সুরু হয়। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে নামোল্লেখমাত্র আছে।

ইস্‌মাইল গাজি (দুর্গেঃ ১-৫)॥ পাঠান সম্রাট হোসেন শাহর বিখ্যাত সেনাপতি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ইনিই গড়-মান্দারণ দুর্গের নির্মাণ কর্তা।

ইসাবেলা (রাজঃ ২-২)॥ স্পেনের রাণী। তিনি স্বামী ফার্ডিনাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে ত্রিশ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—আমেরিকা আবিষ্কার এবং স্পেন থেকে মুরগণের বিতাড়ন।

পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষ ভারতবর্ষে মহিলা শাসকের আধিক্য দেখাতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এঁর নামোল্লেখ করেছেন।

উদিপুরী (রাজঃ ২।৫)॥

উদিপুরী বেগম ছিলেন ঔরঙ্গজেবের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা মহিষী। "সে একজন খ্রীষ্টিয়ানী; উদিপুরী নামে ইতিহাসে পরিচিতা। উদয়পুরের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া ইহার নাম উদিপুরী নহে। আসিয়া খণ্ডের দূরপশ্চিমপ্রান্তস্থিত যে জর্জিয়া এখন রুশিয়া রাজ্যভুক্ত, তাহাই ইহার জন্মস্থান। বাল্যকালে একজন দাসব্যবসায়ী ইহাকে বিক্রয়ার্থে ভারতবর্ষে আনে, ঔরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা ইহাকে ক্রয় করেন। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অদ্বিতীয় রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠিল। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া দারা তাহার অত্যন্ত বশীভূত হইলেন।" প্রথমে দারা উদীপুরীকে বিবাহ করেন। দারাকে ঔরঙ্গজেব পরাজিত করলে উদিপুরীকেও গ্রহণ করেন। বঙ্কিম উদিপুরী সম্বন্ধে এই

ঐতিহাসিক তথ্যটুকু পরিবেশন করেন।

ইতিহাসের সঙ্গে এ বর্ণনার গরমিল খুবই কম। যদুনাথ সরকারের বর্ণনায়—The Contemporary Venetian traveller Manucci speaks of her as a Georgian slave-girl of Dara Shukoh's harem, who, on the downfall of her first master, became the concubine of his victorious rival. She seens to have been a very young woman at the time, as she first became a mother in 1667, when Auranzib was verging on fifty. She retained her youth and influence over the Emperor till his death and was the darling of his old age. Under the spell of her beauty he pardoned the many faults of Kam Bakosh and overlooked her freaks of drunkenness, which must have shocked so pious a Muslin." (Sarkar : History of Auranzib Vol I, chap. IV, P. 64) তবে যদুনাথের মতে উদিপুরী ঔরঙ্গজেবের বিবাহিতা ছিলেন বলে মনে হয় না।—"That Udipuri was a slave and no wedded wife is proved by Auranzib's own words. When her son Kam Bakhsh intrigued with the enemies at the siege of Jinji, Auranzib angrily remarked,—

'A slave-girl's son comes to no good
Even though he may have been begotten by a King.'

(Ibid. P. 64, F. N.)

'রাজসিংহ উপন্যাসে বর্ণিত উদিপুরী চরিত্রটি একরঙা। পাপে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত পঙ্কলিপ্ত এই চরিত্র।' উদিপুরীর যেমন অতুল্যরূপ, তেমনি অতুল্য মদ্যাসক্তি। উপন্যাসে দেখান হয়েছে ঔরঙ্গজেবের উপর উদিপুরীর প্রভাব অসীম। এ তথ্য মানুচীর বর্ণনায় আছে। —"The other wives and concubines were jealous that Aurengzib was so fond of Udipuri." (Manucci's Storia do Magor, vol II, Translated by William Irvine, P. 107-8)

উদিপুরীর গর্ব ও অহঙ্কার চঞ্চলকুমারী ও নির্মলকুমারীর দ্বারা আহত হয়েছে। শেষপর্যন্ত তাঁকে রাজকুমারীর তামাক সাজতে হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা পাঠকের কিঞ্চিৎ উল্লাস জাগলেও, উদিপুরীর চরিত্রে কোন পরিবর্তন আসে নি। শেষপর্যন্ত তিনি একই রকম উন্নাসিক থেকে গেছেন।

উপেন্দ্র (ইন্দিরা ১ম পরিঃ)॥

উপেন্দ্রবাবু ইন্দিরার স্বামী। তিনি যেভাবে অর্থোপার্জন করবার জন্য, সেই রেলহীন কালে, সুদূর পাঞ্জাবে গিয়ে সাফল্য লাভ করেন, তাতে করে এই ভদ্রলোকের চরিত্রের দৃঢ়তার ও কর্মদক্ষতার পরিচয় মেলে। কিন্তু তিনি উপন্যাসমধ্যে যেভাবে ইন্দিরার রূপসাগরে হাবুডুবু খেয়েছেন, ইন্দিরার সাজানো ডাইনীর গল্পে বিশ্বাস করেছেন এবং শ্যালিকা ও পাড়া প্রতিবাসীদের হাতে বিপর্যস্ত হয়েছেন, তাতে তাঁকে নিতান্তই গোবেচারা ধরণের লোক বলে মনে হয়। মনোরমা বেশী ইন্দিরার কাছে যেভাবে তিনি রূপপিপাসা ব্যক্ত করেছেন, তাতে তাঁর চরিত্রহীনতার পরিচয় মেলে। তবে রক্ষা এই বঙ্কিম সেই রূপলালসাকে ব্যভিচারে পরিণত হতে দেন নি, প্রেমে সিদ্ধ

করে নিয়েছেন। আর উপেন্দ্রবাবুর মনে ইন্দিরার স্মৃতিটা বেঁচেছিল বলেই তবু চরিত্রটির মান রক্ষা হয়েছে।

উর্ব্বশী (রাজঃ ২।৩) ॥

স্বর্গের অপ্সরী। বিভিন্ন পুরাণে উর্ব্বশী সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। পদ্মপুরাণে আছে ইন্দ্রের উরু থেকে উর্ব্বশীর জন্ম। আবার কোন কোন পুরাণের মতে তিনি সমুদ্রমন্থনজাত। পুরুরবা ও উর্ব্বশীর বহুকাহিনী এদেশে প্রচলিত।

উর্ম্মিলা দেবী (দুর্গেঃ ২।৭) ॥

'মহারাজ মানসিংহের কণ্ঠে অগণিতসংখ্যা রমণী রাজি গ্রথিত থাকিত।' 'যোধপুর সম্ভূতা উর্ম্মিলা দেবী' তাঁদের একজন। জগৎসিংহকে লেখা আত্মপরিচয় সম্বলিত পত্রে বিমলা জানিয়েছেন যে তিনি কিছুদিন এই উর্ম্মিলা দেবীর পরিচারিকার কাজ করেছিলেন।

এদ্‌মন্দ্‌ বর্ক (দেঃ চৌঃ ১-৮) ॥

Edmand Burke একজন আইরিশ রাজনীতিবিদ, বাগ্মী এবং সাহিত্যিক। তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের ডাবলিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যু হয় ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসকে অভিযুক্ত করে তিনি যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন তা Inpeachment of Warren Hastings নামক গ্রন্থে লেখা আছে। এই গ্রন্থে দেবী সিংহের অত্যাচারের কথাও তিনি বলেছেন। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে দেবী সিংহের অত্যাচারের বর্ণনা প্রসঙ্গে বার্ক-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

এলিজাবেথ (রাজঃ ২।২) ॥

ইংলণ্ডের রাণী। রাজত্বকাল ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর সময়ে ইংলণ্ডের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়েই বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার সেক্সপীয়রের জন্ম হয়। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে নামোল্লেখ মাত্র আছে।

অচলায়তন নাটকের গান

অচলায়তন নাটকের গানগুলিতে এমন একটি জাগরণের মন্ত্র আছে যা' আমাদের তথাকথিত স্থাবর জীবন বোধের রুদ্ধ দ্বার প্রান্তে এক প্রচণ্ড আঘাত হেনে যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথ একজন প্রচণ্ড বিপ্লবীর মতন সমস্ত সমাজ ব্যবস্থার কঠোর ও নির্মম দুর্গ প্রাকারে জঙ্গম শক্তির ঘা দিয়েছেন। একটু লক্ষ্য করলেই এ বিষয়টা পরিষ্কার হতে পারে। যারা এই গানগুলির মধ্যে প্রেমমূলক লিরিক ও নিগূঢ় প্রতীকের অন্বেষণ করেন তাঁরা এই নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে তার যথার্থ বিচার করেন না।

অচলায়তন মানে প্রতিক্রিয়াশীলদের দুর্গ। শাসক সম্প্রদায়ের শিবির। এই শিবিরকে ভেঙে না ফেলা পর্যন্ত কোন একটা নোতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কোনো আপোষ আলোচনায়, হৃদয়ের বিনিময়ে এর মধ্যে পরিবর্ত্তনের স্রোত বইয়ে দেওয়া যায় না। কেননা প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে হৃদয় নামক বস্তুটি একেবারেই নির্বাসিত।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে-বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস তৎ কবয়ো বদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয় ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি—" তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা নায়মাত্মা বলহীনের লভ্যঃ। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।"

—আমার ধর্ম, প্রবাসী ১৩২৪, পৌষ ২৯৭ পৃঃ।

হৃদয়হীন অচলায়তনের অবয়বটি গড়ে উঠেছে মৃত আইন, মৃত আচার, অনুষ্ঠান ও মৃত মানুষ নিয়ে, যা' শ্রমকে এবং শ্রমজীবী মানুষকে পায়ের নীচে পিষে রাখে, তরুণ ও বৃদ্ধকে শোষণ করে এমন কি নিষ্পাপ শৈশবকেও হত্যা করে। আর এ সবই করা হয় পবিত্রতা, ঈশ্বর ও প্রতিষ্ঠিত আইন শৃঙ্খলার নামে।

এই প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ ব্যবস্থা বিরাট প্রাচীর তুলে ব্যবধান রচনা করে তাদের ও জনসাধারণের মধ্যে। আর আক্রমণ চালায় যখন তখন শ্রমজীবী মানুষের উপর। স্বীয় স্বার্থনাশের ভয়ে সর্বত্র সন্ত্রস্ত এই প্রতিক্রিয়াশীলদের দল ভয় পায় খোলা আকাশ ও মাঠকে। এই ভয় থেকেই তারা একের পর এক সব কিম্ভূত কিমাকার আইন শৃঙ্খলা ও আচার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করে। আপনাদের এই আত্মরক্ষার্থে সৃষ্টি একাদেশদর্শী আইন যদি নির্দোষ শিশুটিও ভঙ্গ করে তাহ'লে তার কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যবস্থা করে তাকে খুন করা হয়।

এই অচলায়তনে যে কোন প্রকারের বাহ্যিক শক্তির প্রবেশ ঘটে না তা' আমরা নাটকের

বালক দলের সংলাপের মধ্য দিয়ে জানতে পেরেছি। কিন্তু অচিরেই যে এই অচলায়তনের দুর্গ ভেঙে যাবে একজনের আবির্ভাবে সে বার্তা আমরা পেলাম পঞ্চকের কণ্ঠের গানে—

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
　　কেউ তা' জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
　　কেউ তা' মানে না।
ফিরি আমি উদাস-প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে
তোমার মত এমন টানে
　　কেউ তো টানে না।

এই গানই অচলায়তনের দুর্গভাঙার ডাক। এই একটি মাত্র গানেই অচলায়তনের ব্যথা ও অচলায়তন থেকে উত্তরণের আবশ্যকতার কথাটি মর্মরিত হয়ে উঠেছে যেন। গানটি অত্যন্ত সু-প্রযুক্ত।

পঞ্চকের কণ্ঠের দ্বিতীয় গান—

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর
　　কেউ তা হানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা,
বাতাস বহে কার বারতা
এ পথে সেই গোপন কথা
　　কেউ তা আনে না।
তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
　　কেউ তা জানে না।

প্রথম গানেরই বিস্তার।

"তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না"—যেন কোন পালা গানের শেষের ধুয়ার মতন। সমস্ত নাটকটির প্রতিপাদ্য যেন এই একটি মাত্র পংক্তিতেই দাঁড়িয়ে আছে। রক্তকরবীর যেমন, 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে', তেমনি অচলায়তনের 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না' সমগ্র নাটকটির Persistant Background Song.

পঞ্চকই অচলায়তনের রুদ্ধ গুমোট আবহাওয়াতে বয়ে এনেছে এক ঝলক বাসন্তী বাতাস। তথাকথিত জড় আচার ও আইনের বিরুদ্ধে পঞ্চকই প্রথম ও প্রখর প্রতিবাদ। কিন্তু এই প্রতিবাদ কোন প্রচণ্ড বিপ্লবীর প্রতিবাদ নয়। পরন্তু এ যেন সহনশীল সত্যাগ্রহীর প্রতিবাদ। যে প্রতিবাদ চৈতন্যকে বিহ্বল মাতোয়ারা করে দিয়ে যায় তার গানে—

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে।

তারপর পঞ্চক গান গেয়েছে পাহাড় মাঠে। পঞ্চকই অচলায়তন নাটকের মূল গায়েন। রক্তকরবীর যেমন বিশু পাগল, মুক্তধারার ধনঞ্জয় বৈরাগী, রাজার ঠাকুর্দা। কিন্তু বিশুর মধ্যে যে প্রতিনিধিত্ব ছিল, ধনঞ্জয়ের মধ্যে যে নির্দেশনা ছিল, এমন কি ঠাকুর্দাও যেমন একটা স্থির লক্ষ্যে ইঙ্গিত করেছেন রাজা নাটকের পঞ্চক তেমনটি পেরেছে বলে মনে হয় না। পঞ্চকের গানে যে বাউলের ব্যাকুলতা আছে তাতে অচলায়তনের দুর্গ ভেঙে বেরিয়ে আসবার কথাটা পরিষ্কার হলেও ভাঙার কাজ কিন্তু খুব বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি। মোট কথা পঞ্চকের *গানগুলি কোন রকম সক্রিয় সংগ্রামে ইন্ধন জোগাতে পারে নি।* এগুলি যেন বড় বেশী passive.

তার চেয়ে শোণ পাংশুদের গান—

আমরা চাষ করি আনন্দে

এবং—

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন,
ও তার ঘুম ভাঙাইনুরে।

উপজাতীয় শ্রমিকদের কর্ম সম্বন্ধে একটা স্থির চিত্র আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরে। আমরা জানতে পারি যে এই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ই আসলে এই পৃথিবীর সমস্ত রহস্য জাল ছিন্ন করে ক্রমশ মুক্তির দিগন্ত নির্দেশ করছে। এদের কর্ম বিধির সম্বন্ধে আরো পরিষ্কার সত্যে উপনীত করে দেয় নীচের এই গানটি—

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধা বাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি—
কেবল, ভাঙি, গড়ি, যুঝি—
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি নাইবা পারি,
না হয় জিতি কিম্বা হারি
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি—থাকি তার মাঝেই।

গ্রন্থের গহনে সকল সমস্যার সমাধান নেই। কাজের মধ্য দিয়েই ক্রমশ উন্মুক্ত হয় মুক্তির দিগন্ত। শোণপাংশু ও পঞ্চকের ইতস্তত সংলাপের মধ্য দিয়ে সেইটি ফুটে ওঠে। পঞ্চক ক্রমশ পুঁথি ও মন্ত্রোচ্চারণ ছেড়ে খোলা আকাশের আমন্ত্রণে বার হয়ে আসতে চায়। আলোতে ভরা নীল আকাশ তার রক্তের মধ্যে কথা কয়। এই সমস্তই পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় পঞ্চক যখন

গান গায়—ঘরেতে ভ্রমর এলো গুণগুণিয়ে।

পঞ্চকের কণ্ঠে গানের শেষ নেই। তার প্রতিটি গানের মধ্যেই আছে বন্ধনমুক্তির আকুতি।

বাহির বিশ্বের ডাক— আমি কারে ডাকি গো,
আমার বাঁধন দাও গো টুটে।

কিংবা—

আজ যেমন করে গাইছে আকাশ
তেমন করে গাও গো।
যেমন করে চাইছে আকাশ
তেমন করে চাও গো।

ইত্যাদি প্রতিটি গানের মধ্যেই পঞ্চকের সীমাকে অতিক্রম করে গিয়ে সীমাখণ্ডিত হবার বাসনা। এই বাসনা তীব্র হয়েছে নীচের এই গানটিতে—

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দেরে, দেরে!
যেমন ছাড়া বনের পাখি
মনের আনন্দেরে!
ঘন শ্রাবণ ধারা
যেমন বাধন হারা
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে!
হা রে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কে রে।
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে!
বজ্র যেমন বেগে
গর্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্য সকল বিঘ্ন বাধার বক্ষ চেরে!

তারপর যেখানে আচার্য বলেছেন—

"গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম—তার শুকনো পাতায় ক্ষুধা যতই মেটে না ততই পুঁথি কেবল বাড়াতে থাকি। খাদ্যের মধ্যে প্রাণ যতই কমে তার পরিমাণ ততই বেশি হয়। সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে! অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই! এবার দিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী! প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।"

এবং পঞ্চক (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা—আয়রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়—তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুন্‌ছনা, আকাশে ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে। "আজ নৃত্য কর, রে, নৃত্য কর।"

পঞ্চকের এই কথার মধ্যে যে মুক্তির ডাক তাকে আরও স্পষ্ট করে দেয় তার কণ্ঠের গান—

ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে,
তারে আজ নামায় কেরে!
সে যে আজ আকাশ পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কেরে!

এই গানটি অত্যন্ত উত্তেজক গান। বর্তমানকালে পাশ্চাত্ত্যদেশে একপ্রকারের গানের উদ্ভব ঘটেছে যা' এমনই উত্তেজনা সৃষ্টি করে যে কোন গায়ক একবার সেই গান গাইতে শুরু করলে তারই গানের তালে তালে সমস্ত পার্শ্ববর্তী শ্রোতারাও গান গেয়ে ওঠে। এটি সেইরূপ গান। এই গানটির উত্তেজনা এতদূর গভীর সঞ্চারী যে এই গানের তালেই প্রথমে জয়োত্তম পরে বিশ্বম্ভর সঞ্জীব নৃত্যগীত আরম্ভ করে। এই গানের ছন্দেই অচলায়তনের পাথর খসে পড়বে—এমন ধারণা শুধু পঞ্চকের নয়, মহাপঞ্চকের ও মনে জেগে উঠেছে। কিন্তু তারপরেই আবার পঞ্চকের গান—

ওরে ভাই, নাচরে ও ভাই, নাচরে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচরে—

মনে হয় যেন অত্যাবশ্যক নয়। এটি এই মুহূর্তে excess।

তারপর দর্ভকপল্লী। অচলায়তন থেকে পঞ্চকের নির্বাসন এখানে। কিন্তু নির্বাসিত মানবাত্মার কণ্ঠের যে গান পঞ্চক গেয়েছে—

এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে
তোরা আমায় বলে দে, ভাই, বলে দেরে।

গানটি অত্যন্ত সু-প্রযুক্ত বলেই মনে হয়।

তারপর নিপীড়িত মানবাত্মার যে গান দর্ভক পল্লীর প্রথম দর্ভকের কণ্ঠে—

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি!
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরাণের বঁধু!
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা
ও চয়নের সুখ, ও মরমের ব্যথা,
ও ভিখারির ধন ও অবলার বোল
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল!

একটি প্রার্থনা সঙ্গীতের মতন। এই গানটিতে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে অধমের গান, অক্ষমের কান্না বাক্‌বদ্ধ করেছেন তার কোন জুড়ি মেলে না।

দর্ভক দলের অন্য আরেকটি গান—

আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথি
তারেই করি টানাটানি দিবারাতি।

গানটি যেন নির্যাতিত মানবাত্মার অনুপম সারল্যকে বহুদূরে দিগন্তচারী করেছে।

তারপর আচার্যদেবের কণ্ঠের গান—

পারের কাণ্ডারী গো, এবার ঘাট কি দেখা যায়?
নামবে কি বোঝা এবার ঘুচবে কি সব দায়?

অচলায়তনের পাষাণ ভার যেন অসহ প্রচণ্ডতায় নাড়া দিয়ে যায়। আচার্যদেব নিজেই বলেন—

'……এমন সময় ওরা সন্ধ্যাবেলায় ওদের কাজ থেকে ফিরে এসে সকলে মিলে গান ধরলে—পারে কাণ্ডারী…সব দায়?' শুনতে শুনতে মনে হল যেন একটা পাথরের দেহ গলে গেল।

তারপরও পঞ্চকের গান—

সকল জনম ভ'রে
ওগো মোর দরদিয়া!
কাঁদি কাঁদাই তোরে
ও মোর দরদিয়া!

যেন মানবতার কান্নাকে অনুপমভাবে সঞ্চারিত করে দেয়। এটি একটি আশ্চর্য effect music এর সৃষ্টি করেছে। গানটির সঞ্চারীর অংশ—

সেথা আসন হয় নি পাতা,
সেথা মালা হয় নি গাঁথা;
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া

যেন মানবাত্মার প্রতিষ্ঠাই করে দিল সর্বোপরি।

তারপর দর্ভকদলের একটি গান আছে—

উতল ধারা বাদল ঝরে

এবং আচার্য্যের গান—

ভুলে গিয়ে জীবন মরণ
লব তোমায় করে বরণ

ও সমবেত সংগীত—

উতল ধারা বাদল ঝরে—
দুয়ার খুলে এলে ঘরে

ইত্যাদি গানগুলিতে যেন নির্যাতিত মানবের মুক্তির দিগন্তই উন্মুক্ত হয়েছে।

ক্রমশঃ অচলায়তনের কঠিন বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসছে মানবকুল। সমস্ত আকাশটা যেন

ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে। সমস্ত কুসংস্কার ও পুরাতন আচার নিষ্ঠার হাত থেকে ঘটেছে মুক্তি। সমস্ত অচ্ছুৎনীতির উর্ধে উড়ছে বিজয় পতাকা। মনে হচ্ছে ছুটি…ছুটি!

এই ছুটির আনন্দকে অভিব্যক্ত করবার জন্য, এই মানবমুক্তিকে সঞ্চারিত করবার জন্য এখানেও একটি গান জুড়েছেন গানের রাজা—

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবন ভরা!
আলো নয়ন-ধোয়া আমার
আলো হৃদয় হরা।

অচলায়তনে আলো আসছে। নির্যাতিত মানবকুল জাগছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অচ্ছুতনীতির পরিপোষক মহাপঞ্চক টলছে না। কিন্তু তাকেও কিভাবে টলতে হবে মানবজোয়ারের সম্মুখে তা বোঝাবার জন্য নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ নীচের সংলাপটি জুড়েছেন—

মহাপঞ্চক ॥ উপাধ্যায়,, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে নাকি?

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তাহলে প্রণাম করব বই কি, তা নইলে যে—

মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করবো না।

দাদাঠাকুর ॥ তুমি আমাকে প্রণাম করবে না, আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক ॥ তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর ॥ আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক ॥ তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর ॥ এরা আমার অনুবর্ত্তী, এরা শোণপাংশু।

সকলে ॥ শোণপাংশু!

মহাপঞ্চক ॥ এরাই তোমার অনুবর্ত্তী?

দাদাঠাকুর ॥ হঁ্যা।

মহাপঞ্চক ॥ এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল!

দাদাঠাকুর ॥ ক্ষমা তো তোমাদের মন্ত্র এদের শুনিয়ে দাও। এদের কর্মকাণ্ড কিরকম তাও ক্রমে দেখতে পাবে। এতক্ষণ ধরে যে কথাবার্ত্তা চলল তাতে যেন কোনরকমের তীব্রক্রিয়া সঞ্চারিত হল না। এই নিছক সংলাপের মধ্য দিয়ে দর্শকমন আলোড়িত হল না। কিন্তু যখন এই শোণ-পাংশুদের গান শোনা গেল—

যিনি সকল কাজের কাজি, মোরা
তারি কাজের সঙ্গী।

তখন মনে হলো ম্লেচ্ছদের স্বভাবধর্মকে। মনে হলো তাকে আর কোন অচ্ছুৎনীতির বশে অধীন ত করে রাখা যাবে না।

এরপরে মহাপঞ্চকের গান—

আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাইরে…।

এরপরে আর গান নেই নাটকটিতে।

দুটি একটি গানকে বাদ দিলে অচলায়তন নাটকটির গানগুলিকে অত্যাবশ্যক না বলে উপায় নেই। রাজা নাটকে কিছুটা হয়তো musical feast-এর ব্যবস্থা ছিল। তাই কিছুটা obsession সেখানে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অচলায়তনের গানগুলির অধিকাংশই প্রয়োজনে গীত হয়েছে। এখানে তাই musical necessity-ই সম্পূর্ণ হয়েছে।

সুখরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বিশ্ব সাহিত্যের রূপরেখা ॥ নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী। এ, মুখার্জি এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

বিংশশতাব্দীর সাহিত্য-সঙ্গম ॥ সুনীলকুমার নাগ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

উল্লিখিত দুখানি নূতন গ্রন্থ বিশ্ব সাহিত্য ও তার সমালোচনার আকারে সম্প্রতি পরিবেশিত হয়েছে। প্রথমখানি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ এবং দ্বিতীয়খানি গোটা পাশ্চাত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রথীদের রচনার সমালোচনা। দুখানি গ্রন্থই সুপরিবেশিত এবং দুখানারই প্রকাশক কলকাতার দুই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান।

বাংলা সাহিত্যে যাঁরা পদচারণা করেছেন তাঁদের একটা বড় অংশের কাছে বিদেশী সাহিত্য বহু আগেই শ্রদ্ধেয়, পঠনীয় এবং অনুকরণীয় হয়ে উঠেছিল। বস্তুত:, বাংলা সাহিত্যে যতটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যতটুকু নতুনের স্বাদ ও আকর্ষণ, তার মূলে রয়েছে কৃতী বিদেশীদের চিন্তা ও রচনাশৈলী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইংরেজীর মারফত দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কৃতীর পরিচয় বাংলা সাহিত্য-পাঠক পেয়ে আসছেন। অনুবাদ যেমন হয়েছে (যদিও পর্যাপ্ত বলা যায় না), তেমন সমালোচনা-প্রবন্ধেও তাদের পরিচয় পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু তবু, বাংলা সাহিত্যের সঞ্চয় রাজরাজেশ্বরী ইংরেজীর বৈভব ভাণ্ডারের অনুরূপ ভাণ্ডার তো দূরের কথা, তার সঙ্গে কোনও রকম তুলনীয় ভাণ্ডারই গংড় তুলতে পারে নি। (যদিও 'সাহিত্য' কথাটা ব্যবহার করছি। তবু এখানে গোটা ভাষাকেই আমি বোঝাতে চাইছি।)

সুতরাং নানা কারণেই আন্তর্জাতিকতার প্রতি বাংলা সাহিত্যসেবীদের সাম্প্রতিক অনুরাগ শুধু উল্লেখনীয়ই নয়, প্রশংসনীয়ও বটে।

এ, এম পরিবেশিত নির্মলেন্দু রায়চৌধুরীর 'বিশ্ব সাহিত্যের রূপরেখা' একখানি মূল্যবান সাহিত্য সঞ্চয়ন। ছত্রিশখানি বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস বা নাটকের সংক্ষেপিত গল্পরূপ। অনুবাদ বলা যায় না। লেখক বা প্রকাশকও তা বলেন নি। সুতরাং মূল রচনার বিষয়বস্তুটি পরিবেশিত হলেও ঠিক কি ধরণের 'টেকনিক্' মূল লেখক ব্যবহার করেছিলেন তার ভাব ও কল্পনাকে উপস্থিত করতে, তার পরিচয় মিলবে না। তবু, একথা সত্য, নির্মলেন্দুবাবু বাঙ্গালী মাটির হাড়িতে হলেও খাদ্যবস্তুগুলি যথাসাধ্য সুপাচ্য করে পরিবেশন করতে ত্রুটি করেন নি। প্রতিটি লেখাতেই তিনি একই রকম স্বকীয় 'রিদ্‌মিক ষ্টাইল ব্যবহার করে গেছেন। ফলে পর পর পড়ে গেলে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে মূল লেখক কি এইভাবে লিখেছিলেন? সেই সত্বেও পাঠক পরিতৃপ্ত হয়ে

ওঠেন প্রতিটি রচনা পাঠের পরই। নির্মলেন্দুবাবুর কৃতিত্ব সেইদিক থেকে অবশ্যই স্বীকার্য। মূল লেখকের প্রকাশভঙ্গীর ঘোরপ্যাচের মধ্যে না গিয়ে তিনি যথাসম্ভব সরস বাংলায় সহজ করে বিশ্ববিখ্যাত রচনাগুলি পরিবেশন করেছেন। গল্পাংশ ছাড়া এই সঞ্চয়নের আর একটি উল্লেখ্য দিক হচ্ছে ছত্রিশজন মূল লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজন।

সুনীল বাবুর "বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সঙ্গম" উপরের গল্পসঞ্চয়ের দার্শনিক উৎস। সুনীল বাবুর লক্ষ্য শুধু গল্পরসিক পাঠক-পাঠিকা নয়, সেই পাঠক-পাঠিকাদের মননের ক্ষেত্র, যাঁরা তৈরী করেন তাঁরাও অর্থাৎ চিন্তাবিদ্‌রাও। একখানি গ্রন্থের মধ্যে পঁচিশজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিকের সাহিত্যজীবন তথা সাহিত্য কর্মের যথাসম্ভব সুবোধ্য সরস পরিচয় তিনি উপস্থিত করেছেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিকেরা যেমন আছেন, তেমনি আছেন অন্যান্য খ্যাতিমান কৃতী লেখকরা, যদিও প্রধানতঃ উপন্যাসিক ও নাট্যকারদেরই তিনি বেছে নিয়েছেন।

মূলতঃ সমালোচনা হলেও গ্রন্থখানিকে ইতিহাস বললে অন্যায় বা অযৌক্তিক হবে না। বস্তুতঃ বাংলা সমালোচনা সাহিত্য ভাণ্ডারে গ্রন্থখানির মর্যাদা সম্ভবত সেইদিক থেকেই। লেখকদের কল্পনা ও চিন্তার পরিচয়ই শুধু নয়, মানুষ হিসাবেও তাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় তিনি যথাসাধ্য উপস্থিত করেছেন। দেখাবার চেষ্টা করেছেন, এঁদের ব্যক্তিগত জীবন কিভাবে এঁদের কল্পনা ও চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পাথিব বাহ্যিক সম্পদে অতিশয় দরিদ্র হলেও আত্মিক মানস সম্পদে কেউ কেউ অপরিসীম বিভবশালী হিসাবে স্ব স্ব পরিচয় দিয়ে গেছেন। ঠিক এই জিনিষটিই আমাদের জানার দরকার, শেখার দরকার, বোঝার দরকার। আমাদের দেশের প্রকাশকবর্গকে আমরা সমষ্টিগতভাবে গালাগালি করতে মোটেই ইতস্ততঃ করি না। অথচ সারা পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবত বাংলা ভাষার প্রকাশকেরাই পরম উদারতার সঙ্গে (সময় সময় তা নিম্নতম মানেরও নিচে নেমে যায়) নবীন লেখকের রচনাও প্রকাশ করে থাকেন। এই বস্তুটি অন্য দেশে দুর্লভ না হলেও পুরাপুরি সুলভ নয়। নবীন লেখক যথেষ্ট শক্তির পরিচয় ও প্রতিশ্রুতি না দিলে প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা পাশ্চাত্ত্যে বেশ কঠিন।

সুনীলবাবু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যরথীদের প্রথম জীবনের ঐ সব পরিচয় উপস্থিত করে আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন।

অবশ্য, সুনীলবাবুর গ্রন্থের এটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকটি লেখকের রচনার ক্রম অভিব্যক্তি, রচনাগুলির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, সমকালীন সমালোচকদের সমালোচনা এবং সর্বোপরি মাঝে মাঝে তাঁর নিজের বক্তব্য দিয়ে এক একটি পূর্ণ আলেখ্য তিনি তুলে ধরেছেন জিজ্ঞাসু পাঠার্থীর সম্মুখে। ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের "বিশেষ" ছাত্রদের পক্ষেও গ্রন্থখানি যথেষ্ট উপযোগী হয়ে উঠেছে।

ত্রুটির প্রসঙ্গে সুনীলবাবু নিজেই বলেছেন, "ত্রুটি অবশ্য আরও অনেকই আছে, যেমন বিদেশী লোক বা জায়গার নামের উচ্চারণে।" এ ত্রুটিটা বাংলা ভাষার লেখকদের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বজনীন। দুর্ভাগ্যবশতঃ লেখকরা নিজের জ্ঞান বা ধারণার বাইরে গিয়ে অন্বেষণের উদ্যোগ করেন খুব কমই। ফলে এইসব ত্রুটি থেকে যায়। যেমন, সুনীলবাবুর বইতেই ধরুন চিরপরিচিত

Regd No. C-315 Phone : 23-5155 February'67 (0'50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

চতুর্দশ বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৭৩

Statement In From IV of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956.

SAMAKALIN

1.	Place of Publication	Calcutta.
2.	Periodicity of its Publication	Monthly.
3.	Printer's Neme	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
4.	Publisher's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
5.	Editor's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
6.	Name and address of individuals who own the newspapers and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.	Anandagopal Sengupta. *Proprietor.* 24, Chowringhee Road, Calcutta-13.

I, Anandagopal Sengupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Sd.) A, G, SENGUPTA.
Signature of Publisher.

Dated, 1st March, 1967,

চতুর্দশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন তেরশ' তিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচী পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

নিয়মবলী

সমকালীন

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে) বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীন'এর গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান** ও **সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন ২৩-৫১৫৫

মহামহোপাধ্যায় কুপুস্বামী শাস্ত্রী

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কুপুস্বামী মাদ্রাজ রাজ্যের তাঞ্জোর জেলার গণপতি অগ্রহারম্ নামক গ্রামে এক সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল সেতুরাম আয়ার। কুপুস্বামী পিতার চতুর্থ পুত্র ছিলেন। অতি শৈশবেই কুপুস্বামীর সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। কথিত আছে যে কুপুস্বামীর বয়স যখন তিন বৎসর তখন মাতামহের আবৃত্তি শুনিয়া তিনি নিজে সংস্কৃত "মূকসপ্তশতী"র ৫০০টি শ্লোক আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বাল্যকালে তিনি ইংরাজী বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতজ্ঞ আত্মীয় ও অন্যান্য পণ্ডিতদের নিকট নিয়মিত সংস্কৃতও অধ্যয়ন করিতেন। এই ভাবে প্রাচীন প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়া যৌবনকালের পূর্বেই কুপুস্বামী কাব্য, ন্যায়, বেদান্ত ও মীমাংসা দর্শন এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন ও শাস্ত্রী আখ্যা পান। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিরুবাডি বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কুপুস্বামী তাঞ্জোর কলেজের ছাত্ররূপে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকত্ব লাভ করেন, দর্শনশাস্ত্র তাঁহার বিশেষ অধিতব্য বিষয় ছিল। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কুপুস্বামী কিছুদিন মাদ্রাজ রাজস্ব বোর্ডে করণিকের কর্ম করেন। এই কার্য মনোমত না হওয়ায় তিনি পুনরায় ছাত্ররূপে আইন ও এম. এ. পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ডিগ্রী অর্জন করেন।

তরুণ কুপুস্বামী অবসর সময়ে নানাস্থানে বেদান্তশাস্ত্র বিষয়ে ভাষণ দিতেন। এই সূত্রে তিনি মাদ্রাজের বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯ ৬ খৃষ্টাব্দে ময়লমপুরে (মাদ্রাজ) একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণস্বামী আয়ারের আমন্ত্রণে তিনি এই কলেজের

অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কলেজের অধ্যক্ষতা করার পর কুপুস্বামী তিরুবাড়ি রাজ কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। ইহার পর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কুপুস্বামী মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিংশ বর্ষেরও অধিককাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কুপুস্বামী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী কলেজে অধ্যাপকের কার্যে যোগদানের পাঁচ বৎসরের মধ্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপন নৈপুণ্যের জন্য তাঁহাকে ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ পর্যায়ে (Indian Educational Service) উন্নীত করা হইয়াছিল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই কুপুস্বামীকে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের পুঁথি সংগ্রহশালার অধ্যক্ষের পদও গ্রহণ করিতে হয় (Curator, Madras Govt. Oriental Mss. Library)। কুপুস্বামীর পূর্বে অধ্যাপক রঙ্গাচারী এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। রঙ্গাচারীর কার্যকালে এই পুঁথিশালায় সংগৃহীত পুঁথি সমূহের সাধারণ বিবরণাত্মক ও ত্রৈবার্ষিক তালিকার আটটি খণ্ড (Descritive catalogue of Mss.) সঙ্কলনে কুপুস্বামী সহায়তা করেন। রঙ্গাচারীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কুপুস্বামী এইরূপ সাধারণ বিবরণাত্মক তালিকা, ত্রৈবার্ষিক তালিকা ও পুস্তকের নাম সূচী ৫৮টি সুবৃহৎ খণ্ডে সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন (১)। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নিজের চেষ্টায় কুপুস্বামী স্বয়ং বহু দুর্লভ পুঁথি সরকারী পুঁথি সংগ্রহশালার জন্য সংগ্রহ করেন। ভারতীয় পণ্ডিতেদের মধ্যে বিবরণাত্মক পুঁথি তালিকা সঙ্কলনে ও পুঁথি সংগ্রহ কার্যে কুপুস্বামী একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

যৌবনকালের মধ্যেই কুপুস্বামী সুদক্ষ অধ্যাপকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শুধু মাত্র অধ্যাপকরূপে নহে একজন বিশিষ্ট শিক্ষা-বিদ্ ও শিক্ষা-সংগঠক হিসাবেও তিনি সুপরিচিত হন। সুদীর্ঘকাল যাবৎ তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া নানাভাবে এই প্রদেশের শিক্ষা-সংস্কার কার্যে সহায়তা করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে মাদ্রাজের সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি মাদ্রাজ প্রদেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাচীন ধারার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। মাদ্রাজ প্রদেশে প্রাচীন চতুষ্পাঠী পরীক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়ের জন্য তিনি শিরোমণি পরীক্ষার প্রবর্তন করেন। নব্যন্যায় প্রবর্তক বাঙ্গলার নবদ্বীপের পণ্ডিত রঘুনাথের উপাধি ছিল শিরোমণি। তিনি তাঁহার 'দীধিতি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি তাহার সার নির্ণয় করিয়াছেন, অতঃপর গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রণীত তত্ত্ব চিন্তামণি অধ্যয়ন করিয়া বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক নিজে এই "দীধিতি" রচনা করিয়াছেন (অধ্যয়ন ভাবনাভ্যাম্ সারং নির্ণীয় নিখিল তন্ত্রানাম, দীধিতিমাধি চিন্তামণিতনুতে তার্কিক শিরোমণি শ্রীমান্)। বাঙ্গলার রঘুনাথ শিরোমণি সর্বশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। তাঁহার ব্যবহৃত উপাধির ঐতিহ্য রক্ষার্থে কুপুস্বামী 'শিরোমণি' উপাধি লাভেচ্ছু ছাত্রদের জন্য অতি উন্নতমানের প্রবর্তন করেন এবং অন্যান্য বিষয়ের সহিত বেদ, স্মৃতি, ন্যায় ও মীমাংসা দর্শন অবশ্য পাঠ্য করিয়া দেন।

১৯১৩, ১৯১৮, ১৯১৯, ১৯২৭, ১৯২৯, ১৯৩৫ ও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কুপুস্বামী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি ভাষণ দেন। তাঁহার এই বক্তৃতা মালার বিষয় ছিল বিভিন্ন হিন্দুদর্শন বিশেষভাবে মীমাংসা দর্শন, সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার ধারা ও উপাদান, ভারতীয় আস্তিক্য চিন্তা, মীমাংসা ও ন্যায় দর্শনের চিন্তা প্রণালী, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বস্তু, আত্মা ও ঈশ্বর, অদ্বৈতবাদী চিন্তা প্রভৃতি। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে চিদাম্বরমের আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সংস্কৃত সাহিত্যালোচনা সম্বন্ধেও তিনি কতকগুলি বক্তৃতা দেন, এইগুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত (৮-৯১)।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শেষে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর, কুপুস্বামী আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে থাকিয়া তিনি স্বীয় জন্মপল্লী গণপতি অগ্রহারম্-এ শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। এই স্থানেই ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তাঁহার দেহান্তর হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গমস্থ বাণীবিলাস প্রেস হইতে শঙ্করাচার্যের সম্পূর্ণ রচনাবলী ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ ল' জার্নাল প্রেস হইতে বাল্মীকি রামায়ণ প্রকাশে কুপুস্বামী বিশেষ সহায়তা করেন। বিশেষ যোগ্যতার সহিত তিনি বুদ্ধ ঘোষ রচিত পদ্যচূড়ামণি, জৈমিনী মীমাংসা সূত্র, আনন্দবর্ধন রচিত ধ্বন্যালোক, মণ্ডন মিশ্র রচিত ব্রহ্মসিদ্ধি ও বিভ্রম বিবেক প্রভৃতি পুস্তক বহু পরিশ্রম সহকারে টিকা, টিপ্পনি সমেত সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (২-৬)। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় তর্কবিদ্যা বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় তাঁহার একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (৭)।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পুনরায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের (All India Oriental Conference) প্রথম অধিবেশনে কুপুস্বামী লৌকিক সংস্কৃত ও আধুনিক ভারতীয় ভাষা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের দর্শন শাখার সভপতিরূপে কুপুস্বামী মীমাংসা দর্শন সম্বন্ধে ভাষণ দেন (দ্রঃ—Proceedings of Seceond A. I. O. C., P. P. 407-12)। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের দর্শনশাখার জন্যও তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে মহীশূরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের পণ্ডিত পরিষদে কুপুস্বামী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংস্কৃত সম্মেলনে সভাপতির আসন কুপুস্বামী গ্রহণ করেন ও সংস্কৃতে ভাষণ দেন (দ্রঃ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলিকাতা, ১০ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ১৮৫-১৯৫)। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ালটেয়ারে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত দর্শন কংগ্রেসের দশম অধিবেশনে কুপুস্বামী ভারতীয় দর্শন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন, এই অধিবেশনে তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল ভারতীয় চিন্তাধারায় পুরাণের স্থান (দ্রঃ—Proceedings P. P. 45-54)। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কুপুস্বামীকে সমাবর্তন ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ করেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কুপুস্বামীর উদ্যোগে একটি প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয় (Oriental Research Institute)। এই বৎসরই তিনি মাদ্রাজে একটি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করেন (Sanskrit Academy); তিনিই এই সংস্থার প্রথম সভাপতি

নির্বাচিত হন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কুপুস্বামী Journal of Oriental Research নামে একটি প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত পত্রিকা প্রবর্তন করেন। এই পত্রিকায় তাঁহার লিখিত কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত থিওডোর আউফ্রেখটের (১৮২২-১৯০৭) Catalogus Catalogarum-এর আদর্শে New Catalogus Catalogorum নামে সংস্কৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের নির্ঘণ্ট সঙ্কলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর পরিশ্রমের পর ১৮৯১ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুবৃহৎ তিন খণ্ডে পণ্ডিত আউফ্রেখট্ এই তালিকা সঙ্কলন করেন। পূর্বে এই অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়েও বহু নূতন নূতন তথ্য জানা যায়। Aufrecht-এর গ্রন্থটির অনুরূপ আর একটি আধুনিক তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কুপুস্বামীকে প্রস্তাবিত পুস্তকের প্রধান সম্পাদক মনোনীত করেন। কুপুস্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক ডাঃ রাঘবন এই কার্যের ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ রাঘবনের সম্পাদকতায় New Catologus Catalogorum-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৬৬)।

কুপুস্বামী অন্যের রচিত বহু গ্রন্থের জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রেও তাঁহার রচিত বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, ইহার মধ্যে তাঁহার রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (Sri Ramkrishna and the Message of Hinduism, Triveni, No. 10, Vol 10, April, 1937,)

প্রাচীন ভারতীয় এবং আধুনিক এই উভয়বিধ ধারায় সুশিক্ষিত কুপুস্বামীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময় স্থল ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের কোন বিভাগই তাঁহার অনায়ত্ত ছিল না। বিশেষভাবে ন্যায় মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন এবং ব্যাকরণ কাব্য, নাটক ও অলঙ্কারশাস্ত্রে সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁহাকে অগ্রগণ্য মনে করা হইত। ৩৫ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া দক্ষিণ ভারতে কুপুস্বামী সংস্কৃত শিক্ষা ও চর্চার মান প্রভূত উন্নত করিয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের বহু কৃতবিদ্য সংস্কৃতজ্ঞেরই তিনি শিক্ষাগুরু ছিলেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর ভারত ধর্মমহামণ্ডল কুপুস্বামীকে 'বিদ্যাবাচস্পতি' উপাধি দান করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিতে ভূষিত করেন। কামকোটি পীঠের ও পুরী গোবর্ধন মঠের শঙ্করাচার্যদ্বয় কুপুস্বামীকে যথাক্রমে 'দর্শনকলানিধি' ও 'কুলপতি' উপাধি দানে সম্মানিত করেন। কুপুস্বামীর চরিত্রে বিপুল পাণ্ডিত্যের সহিত বিনয়, তেজস্বীতা, নির্ভীকতা, সত্যপ্রিয়তা, নীতি ও নিয়ম-নিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের সমাবেশ ছিল।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কুপুস্বামীর সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর তাঁহার গুণমুগ্ধ শিষ্য ও সতীর্থেরা তাঁহার সম্মানার্থে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটিতে খ্যাতনামা দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতদের দ্বারা ভারত বিদ্যা বিষয়ক অনেকগুলি মূল্যবান নিবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

(Kupuswami Sastri Commeration Volume Studies in Indology by friends and Pupils—1955)

কুপুস্বামীর দেহান্তের পর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গুণমুগ্ধ শিষ্য, সতীর্থ ও বান্ধবেরা মাদ্রাজ নগরে "কুপুস্বামী শাস্ত্রী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট" নামে একটি প্রাচ্য-বিদ্যা-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠান হইতে কুপুস্বামী রচিত কয়েকটি পুস্তক নূতন ভাবে অথবা পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই প্রতিষ্ঠান কুপুস্বামী প্রবর্তিত Journal of Oriental Research পত্রিকাটি পরিচালনের দায়িত্ব ১৫ তম খণ্ড হইতে গ্রহণ করিয়া এ যাবৎ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন।

(১) A descriptive Catalogue of Sanskrit Mss, An alphabetical index of Sanks Mss, A Triennial Catalogue of Mss in the Govt. Oriental, Mss. Library Madras—58 Vols upto 1936.

(২) বুদ্ধ ঘোষ—পদ্যচূড়ামণি ১৯২১

(৩) জৈমিনি মীমাংসা সূত্র, অধ্বর মীমাংসা কুতুহল বৃত্তি সারসংগ্রহ, শ্রীরঙ্গম ১৯০৮

(৪) আনন্দবর্দ্ধন কৃতধ্বন্যালোক (উপলোচনটিকা সহ), ১৯৪৪

(৫) মণ্ডন মিশ্র-ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৯৩৭

(৬) মণ্ডন মিশ্র-বিভ্রমবিবেক, ১৯৩২

(৭) A Primer of Indian Logic 1932

(৮) Compromise in the history of Advaitic Thought—Madras, 1940

(৯) High ways and By ways of literary criticism in Sanskrit—Madras, 1945

ঐতিহ্য ও লোক-সংস্কৃতি

ফণিভূষণ বিশ্বাস

প্রতিপাদ্য বিষয়টি যেমন বিশদ, তেমনি ব্যাপক। বিষয়টা যেন ত্রি-কালের সীমানা ছুঁয়ে আছে। তার চারিদিকে অখণ্ড কাল-প্রবাহ। পিছনের দিকে অন্ধকার তটরেখা, পায়ের নিচে এক চৈতন্যময় দ্বীপ,—সামনের দিকে অজানা, অগোচর দিগন্ত, পিছনের অলক্ষ্য স্রোতে দ্বীপের চারদিকে এসে জড় হচ্ছে পলল মৃত্তিকা আর ফেনপুঞ্জ। অন্যদিকে দ্বীপের ক্রম-বিস্তার ঘটছে সামনের দিকে। আর ক্রমশঃ ঐ দিগন্তের ব্যবধানও কমে আসছে। স্পষ্ট হয়ে উঠছে যেন একটা দূরের পূর্বাশা। নতুন দ্বীপের আবাদী ফসল উঠছে যুগের ভাঁড়ার ঘরে। সেটাই যেন সাধনার ধন, উদ্যমের অবদান।

রূপকটির বক্তব্য এই : পলল মৃত্তিকা হচ্ছে ঐতিহ্য, ফেনপুঞ্জ হচ্ছে অতীতের বিলীয়মান স্মৃতিসম্ভার। দ্বীপ হচ্ছে ঘটমান বর্তমানের মানবিক চেতনার উপনিবেশ। সেখানকার ভাঁড়ারজাত ফসল হচ্ছে সংস্কৃতি। আর অদৃশ্য দিগন্ত হচ্ছে অনাগত ভবিষ্যৎ।

বক্তব্যটা আরও স্পষ্ট করতে হলে, 'ঐতিহ্য' ও 'সংস্কৃতি' কথা দুটোর বাচ্যার্থে ফিরে যেতে হবে। প্রথমে ঐতিহ্য কথাটার সংজ্ঞার্থ করি। ইংরাজী tradition কথাটার প্রতিশব্দ হিসাবে ঐতিহ্য কথাটি গ্রহণ করেছি। কেননা, tradition কথাটার ঠিক আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ করা যায় না। ইংরাজী 'ট্র্যাডিশন' কথাটা ব্যাপকতর। ওর অর্থের ঝোলায় কিংবদন্তী, 'জনশ্রুতি' আর বহুকালের প্রথা প্রভৃতি অর্থ ঢুকে, অনর্থ বাঁধিয়েছে। তাই ওগুলোর একটু পাশ কাটিয়ে মূল কথাটার ভাবার্থবহ ঐতিহ্য শব্দটাকে গ্রহণ করেছি। এই ঐতিহ্য কথাটার আভিধানিক অর্থ হলো : পরম্পর আগত উপদেশ বাক্য। ট্র্যাডিশনেরও ব্যাপক অর্থ হলো বহুকালের চালু প্রথার উত্তরাধিকার। কাজেই এহেন বৈশেষিক অর্থে ঐতিহ্য কথাটা গ্রহণ করাটাই সমীচীন হবে।

এবার ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটার বাচ্যার্থ বিচার করা যাক। ট্র্যাডিশন কথাটার বিশেষ অর্থে প্রচলন হয়েছে হাল আমলে। আদিম সমাজে, এমন কি সভ্যতার গোড়ার দিকে ঠিক আজকের অর্থে কথাটার কোনদিন প্রয়োগ হয় নি। সেদিনকার মানুষের মনে এই অর্থ-বোধ ছিল না। ঐতিহ্য বলতে তাঁরা হয়তো বুঝতেন পারিবারিক ইতিহাসকে—উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বংশপরম্পরাগত বিধি-বিধানগুলোকে। তার কারণও আছে। কেননা, ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতিগত উত্তরাধিকারের স্মৃতি। এই অর্থে ঐতিহ্যের এক অনাহত, অনন্ত ব্যাপ্তি আছে। একটা ক্রম সঞ্চারমান অপরিমেয় প্রবাহমানতা আছে। সেই ধারা পরিবার থেকে পরিবারে, সমাজ থেকে সমাজে, যুগ থেকে যুগে চলে এসেছে। সেই প্রাথমিক অবস্থায় এর পিছনে কিন্তু কোন ধর্মের নির্দেশনা ছিল না।

কিন্তু পরবর্তী যুগে যখন নতুন ভাব ধারা সনাতন সমাজনৈতিক ধারণাগুলোর মূলে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছে, যখন সেই ভাব-তরঙ্গ সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে,

তখন সেই নতুন প্রতিপত্তির কবলে পড়ে প্রাজ্ঞ মানবগোষ্ঠি আপন আধিপত্যের মস্নদচ্যুতির আশঙ্কায় ভীত হয়ে যেন আত্মরক্ষার জন্য বিগত ঐতিহ্যকে পবিত্র বলে সবলে আঁকড়ে ধরেছে।

পক্ষান্তরে আর একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তখনকার সমাজ-মানস কোন নতুনের আবির্ভাবকে স্বাগত জানায়নি। বরং নতুন ভাবাদর্শের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে। যে মতবাদের পায়ের নিচের প্রাচীন ঐতিহ্যের মাটি নেই, তাকে গৃহ-প্রবেশের অধিকার দেয় নি। এ কিন্তু ঘরোয়া কথা নয়, ঐতিহাসিক ঘটনা। তাই দেখা গেছে, যখন কোন দেশের তরুণ সম্প্রদায় সেই দেশের অতীত ঐতিহ্যের প্রামাণ্য মতবাদগুলোকে বাতিল করে দিয়ে আপন প্রজ্ঞার স্বাক্ষরে ফরমান জারী করতে চেয়েছে, নিজ অভিজ্ঞতার আলোয় নতুন পথের দিকে পা বাড়াতে চেয়েছে, তখন প্রাচীন সমাজ তার উত্তরাধিকারের ঝাণ্ডা নিয়ে তাদের গতিরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু যখন এই ঐতিহ্যের মন্দির-থেকে ধর্মের ঘন্টা বেজে উঠেছে, তখন পারিবারিক মানুষের জাতীয় মনটা চন্‌মন্‌ করে উঠেছে। তখন একান্ত পারিবারিক সমাজের উঠোন পেরিয়ে সেকালের সমাজ মানস গিয়ে হাজির হয়েছে ধর্মের নাট মন্দিরে। এইভাবে সমাজ মানসের একটা দরজা খুলে গেছে দেউলের দিকে, তার অন্য একটা নির্জন বাতায়ন মুক্ত হয়েছে চিত্ত-লোকের নিত্য কালের হাসি কান্নার দিকে। সেই অনুপ্রেরণায় শুরু হয়েছে সাহিত্যের নান্দী পাঠ। অর্থাত একটি মেনেছে বিধি-বন্ধনকে, অন্যটি চেয়েছে নন্দনের আনন্দকে।

এই কারণে যে কোন দেশের শিক্ষিত সমাজ-মানসের নেপথ্যে শোনা গেছে, বিগত ঐতিহ্যের দ্বৈত কণ্ঠস্বর : এক কণ্ঠে শাস্ত্রের হিতোপদেশ, অন্য কণ্ঠে জীবনের গান। পক্ষান্তরে অশিক্ষিত-সমাজ-মানসে চেতনায় জাগ্রতি আসে বহুলাংশে প্রাচীনদের বিগত ঐতিহ্যের স্মৃতির রোমন্থনে। প্রাচীনত্ব প্রাপ্তির ক্রমানুসারী বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ থেকে দুটি বিষয় জানা যায়, প্রথমতঃ তথাকথিত গোঁড়ামী সাধারণ মানুষকে দেয় একটা আত্মতুষ্টি, আর আচরণগত রীতিনীতি। আর বয়স্কদের প্রামাণ্য নজির এই গোড়ামিত্বকে জোরদার করে তোলে।

আচরণবাদীরা বলেন যে, মানুষের কোন সামাজিক আচরণই নিজস্ব বা মৌলিক নয়। কারণ বংশগতির প্রভাব, পরিবেশের আদব কায়দা, ঐতিহ্যের আদর্শ—এই সবের যোগফলের প্রকাশ ঘটে মানুষের আচরণগত অভ্যাসে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ নিজস্বতা বলতে আজকের সুসভ্য মানুষের কিছু নেই। আজকের মানুষের মানসিকতা যেন অনেক ভাব-প্রভাব, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-রাজনীতি, শ্রুতি-স্মৃতির আর সংস্কৃতির সমন্বয়ের যোগফল। জাতিধর্ম নির্বিশেষে আজকের সুসভ্য মানুষের মানসিকতা যে এক অখণ্ড সমন্বয়ের গাণিতিক অঙ্কে সত্য, সেই কথার প্রতিধ্বনি করে একজন আধুনিক কবি বলেছেন যে, এক অদৃশ্য মানব-ঐতিহ্যের ফল্গুধারা আমার আমিত্বের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে।

চৈতন্যবাদীরা কিন্তু ঐতিহ্যের অন্ধ, নির্জীব সংক্রমণকে ঠিক সমর্থন করেন নি। বলেছেন যে, তীরের সংবাদ তরঙ্গই বয়ে আনে। এপারের চঞ্চল ঢেউ ওপারের তটে গিয়ে আছড়ে না পড়লে, যেমন পরিচয়ের কল কল্লোল ওঠে না, নদী-তটের ঘুম ভাঙে না, ঠিক তেমনি অতীতের-ঐতিহ্যের তরঙ্গ এসে যদি আমাদের ঘুম ভাঙাতে না পারে, তবে সে নির্জীব ঐতিহ্যের আবেদন নিরর্থক এবং

মানুষের অস্তিত্বও নিস্তরঙ্গ আবদ্ধ জলপাত্রের জলের মত অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই তাঁরা বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সক্রিয় সংযোগের পক্ষেই ওকালতি করেছেন। তাঁরা আরও বলেছেন যে, অতীত যদি তার গৌরব, অপরাধ, উপদেশ আর সতর্ক বাণী নিয়ে তার উত্তরসাধকদের কাছে উপস্থিত না হয়, তাহলে বর্তমান সময়ের যে 'কড়িডোবে' আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তার কাল-সংযোগও ছিন্ন হয়ে যায়। কাল-পটভূমিকায় আমাদের অবস্থিতিও নিরর্থক হয়ে পড়ে। আর মোহগ্রস্থ সেই নির্জীব সমাজ রক্তশূন্য য়্যানিমিক রোগীর মত আসন্ন মৃত্যু যন্ত্রণাকেও উপলব্ধি করতে পারে না, এমন কি মানবিক প্রজননের অর্থকেও সে সমাজ ভুল বোঝে। তা যদি হয়, তবে কি সমাজ অনড় অচল অবস্থায় স্থাণু হয়ে থাকতে পারে ? এই দিন রাত্রির পরিবর্তন, ভাবান্তর এত ঋতু বিবর্তন সত্ত্বেও কি সময় স্রোত তালা বন্ধ অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট কালের প্রকোষ্ঠে নিশ্চল হয়ে থাকতে পারে ? তা কখনই সম্ভবপর নয়। তাই চৈতন্যবাদী ফ্যেকনার জীবনের সংজ্ঞা দিয়ে গিয়ে বলেছেন যে, জীবন হচ্ছে একটা চৈতন্যময় জাগরণ। যে চেতনা অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে রচনা করেছে একটা অচ্ছেদ্য যোগসূত্র। তা না হলে যে এই জীবনপ্রবাহের কোন অর্থ থাকে না।

অথচ এই প্রবাহমানতার চেতনা সব যুগের মানুষের মনে ছিল না। সভ্যতার যুগে অপেক্ষাকৃত ভাবুক সমাজে এই বোধ দানা বেঁধে উঠেছে। প্রাক্-কৃষি যুগের যাযাবর মানুষের মনে এই ভাবনার অঙ্কুরও ছিল না। তখনকার অর্থনীতি তাদের ভাববার স্বল্পই সুযোগ দিয়েছে। সেযুগের তরুণ সমাজের তারুণ্যের যে উত্তেজনা, যৌবনের যে বিদ্রোহ, তা যেন দৈহিক প্রয়োজনেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এই কারণে দেখা দিয়েছিল, অনগ্রসর সমাজে শিশু কেবল অন্ধভাবে অনুকরণই করেছে; জীবনকে যাচাই করে দেখবার কোন সুযোগই পায়নি। তাদের জীবন প্রস্তুতির পর্বও ছিল সংক্ষিপ্ত। তখনকার শিশুরা বয়ঃসন্ধি পার হতে না হতেই হঠাৎ যেন যৌবনে পদার্পণ করেছে, অথচ তার আগে স্বাধীনভাবে কোন কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার কোন সুযোগই তারা পায়নি।

পক্ষান্তরে প্রগতিশীল সমাজের পরিস্থিতি বিপরীত, তার ব্যবস্থাপনাও আলাদা। সেখানে স্বাধীনভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুযোগও মেলে। কারণ সেই সচেতন সমাজ জানে যে, যে তরুণ সমাজ, নতুন জনগোষ্টির ধারক হবে, বয়স্কদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাদের প্রস্তুতির উপযুক্ত সুযোগ দিতে হবে। অন্যদিকে শিল্পাঞ্চলের সমাজব্যবস্থা সেখানকার শিশুদের প্রলম্বিত শৈশব যাপনের সুযোগ দেয়; এমনকি তাদের অশিক্ষিত মাতাপিতাদের ভাগ্যেও সে সুযোগ মেলে। সেখানে গোষ্টিপ্রীতি আর গোষ্টি-স্মৃতিও নৈর্ব্যক্তিক কলাকৌশলের মাধ্যমে জাগ্রত হয়ে উঠে।

এই গোষ্টিপ্রীতি ও গোষ্টি-স্মৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটে সাহিত্যের মাধ্যমে। প্রাচীন মহাকবিদের কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার হিসাবে যে সব মহাকাব্য, উপাখ্যান, নীতিকথা পেয়েছি, তা থেকে আমাদের মনে প্রথম ঐতিহাসিক চেতনার জন্ম হয়েছে। এর থেকে অবশ্য উদ্দেশ্যমূলক শক্তিরূপে একটা গতিবাদের ধারণাও পেয়েছে বয়স্ক মানুষ। যদিও সে আবেদন পৌরাণিক, প্রকৃত প্রস্তাবে ঐতিহাসিক নয়। এই বোধই মানুষকে করেছে rational এবং তার প্রাচীন ঐতিহ্য-প্রীতিকে

জোরদার করে তুলেছে। এখানে কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের বিশ্লেষণী এবং অনুসন্ধানী মন সবকিছুই মূল্য যাচাই করবার সুযোগ পেয়েছে। এবং তারই ফলে ইতিহাস চেতনা এবং বস্তু-তান্ত্রিকতার জন্ম। এই বক্তব্যটাই টি-এস-ইলিয়ট বিশদভাবে উপস্থাপন করেছেন। বলেছেন যে, Writers not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole literature of his country has a simultaneous existence and composo a simultaneous ordor. অর্থাৎ লেখকরা যে কেবল তাঁদের অতীত পুরুষদের স্মৃতি মজ্জায় বহন করেন তা নয়, তাঁরা অন্তরে অন্তরে স্বদেশের সমগ্র সাহিত্য কর্মের অক্ষুণ্ণ ধারাকে উপলব্ধি করেন এবং একটা সঞ্চারমান ভাবধারাকে সৃষ্টি করে যান।

মানুষের এই ঐতিহ্য-প্রীতি বহুকালের। একটা অদৃশ্য প্রবাহের মত যেন এই ভাব ধারা চলে আসছে। বিবর্তনের প্রথম স্তরে যখন এই ঐতিহ্যের প্রভাব মানুষের মনে প্রবল এবং মুখ্য ছিল, তখন পরবর্তী বংশধরদের হাতে তাদের যুগের কিছু নজিরপত্র দিয়ে যাওয়ার প্রথাটা ছিল যেন জাতীয় কর্তব্যের সামিল। কিন্তু তার অনেক পরবর্তী কালে যখন ইতিহাস চেতনার সৃষ্টি হলো, তখন সমাজ-সচেতন মানুষের মনে আর একটা নতুন বোধের জন্ম হলো। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, প্রত্যেক মানবগোষ্ঠিই কেবল সেই বিগত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী মাত্র নয়, তারাও নতুন ঐতিহ্যের নির্মাতা, নতুন ভাবনা-ভাবের পথিকৃৎ। তার ফলে মানুষের মনে একটা inherent contradiction বা উত্তরাধিকার বিরোধিতার ভাব উদ্ভব হ'লো। তার কারণ পুত্র যখন টের পেল যে, তাকে বাপ হতে হবে, বাপের মনেও যখন এই স্মৃতি প্রকট হয়ে উঠল যে, সে তার প্রপিতামহ তস্য পুত্রের সন্তান, তখন বর্তমান দুই পুরুষের মনে নানা সন্দেহের ঝড় উঠল। একজন যখন 'হতে' চায়, অন্যজন তখন 'পেতে' চায়—এই নিয়ে—সৃষ্টি আর সংরক্ষণের—বিরোধ উপস্থিত হলো। গ্রীক বিয়োগান্ত নাটক থেকে এই বোধের জন্ম, ওডিপাসের গল্পে তার নজির রয়েছে।

অতীতকে ঐতিহ্যের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা চলেছে অনেকদিন। এই নিথর সময়-বোধের মরীচিকা প্রায় শতবর্ষ ধরেই মানুষের মনে অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই প্রভাব-তন্দ্রার ঘোর কাটল ঐতিহাসিক চেতনার ধাক্কায়। সময় যে একমুখী এবং ধীর মন্থর নয়, এই ধারণার মূলে সজোরে নাড়া দিল বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী পদ্ধতি, নানা বিপ্লব আর জনচিত্ত উদ্বেল করা ঘটনাবলী। সেই ধ্বংসাত্মক ঘটনা, নানা সংকট, মানুষকে বিচলিত, বিহ্বল করল। এতদিন যে অতীতের সামিয়ানার নীচে, এক নিশ্চিন্ত শান্তির শিবিরে সে চোখ বুঁজে ছিল, সে প্রথম চোখ মেলে দেখল সেই তাঁবু কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। মাথার উপরে দেখতে পেল অবাধ মুক্ত আকাশকে। অতীতের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপনের যে অভিজ্ঞতার মধ্যে সে এতদিন এগিয়ে এসেছে, সে যেন সহসা দেখতে পেল কোথাও তার কোন চিহ্ন নেই। রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার মনে এক নতুন সময় চেতনাবোধ জাগ্রত হয়ে উঠল। তবুও তার মনে কেমন যেন একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব থেকে গেল। কেননা, সেই প্রাচীন সময় ধারণাবোধ কিছুটা লুপ্ত হলেও, তা' এখনও যেন অন্তঃ সলিলা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হ'চ্ছে আমাদের প্রত্যেকের ধমনীতে। এই অলক্ষ্য চেতনা আমাদের মধ্যে কাজ

করছে, তাকে আমরা বলতে পারি অতীত-বর্তমান। যার মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্য যেন জীয়ান আছে। তাকে ঐতিহাসিকরা বলেছেন living tradition এখানেই যেন অতীত যথার্থ বর্তমানের তটকে স্পর্শ করে আছে। বর্তমানের আবর্তকে আমরা পাচ্ছি জীবন-বোধের মধ্যে দিয়ে, নিত্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে; যাকে হৃদয়ঙ্গম করছি ভবিষ্যতের দিকে ক্রমান্বয়ে পা বাড়িয়ে। একেই চৈতন্যবাদীরা বলেছেন চলন্ত প্রবেশ দ্বার, a moving thoreshold'—যার প্রবাহ কখন দ্রুত প্রবল, কখনও বা ধীর।

এই সময় চেতনা যেন ক্রমেই জাগ্রত হয়ে বিস্তৃততর হচ্ছে। এই ধারা-প্রবাহটা অংশ্চ পাশ্চাত্য জগতের সেই রেনেসাঁস যুগকে অতিক্রম করে আজকে আমাদের ভাবনা-ভাবে আশ্রয় নিয়েছে। তার ধারা আজও অব্যাহত। হাজার রকম উদ্যম আর প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য দেশের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে—সেই অভাবনীয় প্রগতির কথা—ইতিপূর্বে আমরা কখনও কল্পনা করতে পারতাম না। অনেক ক্ষয় ক্ষতি, দ্বন্দ্ব-দ্বেষ, দুর্যোগ-দুর্ভাবনাকে অতিক্রম করে প্রায় পনের পুরুষ ধরে—ইউরোপের সারারাজ্যে বিরাজ করছে অনন্ত-বসন্ত। সেটাই আজ তার সৃজনী-শক্তির উৎস।

যদিও অনেক রাষ্ট্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে, অপরিমেয় মানবিক ক্ষুধা-কামনার ভিতর দিয়ে আজ যে ভাবধারা পথ করে নিয়েছে, কোন বাধাই তাকে ব্যাহত করতে পারিনি। ইউরোপের নানা কর্মক্ষেত্রে আজ যে আধুনিকতার রূপায়ণ ঘটেছে, তার ভাবী বিকাশ ভবিষ্যৎকে নিশ্চয় সমৃদ্ধ করবে।

বিগত এক শ' বছর ধরে সতর্ক পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছে নাগরিকতার ক্রমবিকাশ। এই অগ্রগতির নামাকরণ করা যেতে পারে নাগরিকতার উৎসারণ। ব্যক্তিগত ভাব-বিপ্লবের দ্বারা যার সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন ঘটেছে, তার জীবন-রসের যোগান এসেছে অতীতের গ্রামীন সমাজ থেকে। এই নগর সভ্যতায় জড় হয়েছে ভাব-ভোগ্য অনেক লৌকিক সমগ্রী। এই উপচারের অন্যতম হলো লোক-সংগীত। এই সংগীতের মধ্যে যা সময় উত্তীর্ণ হয়ে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, নগর-সভ্যতা তাকে লোক-ঐতিহ্যের ধারা থেকে সংগ্রহ করে সযত্নে তার সংরক্ষণ করেছে। ভাবুক নগরবাসীরাই মানুষকে আবর প্রকৃতির ক্রোড়ে ফিরে যাওয়ার পথ দেখিয়েছে, প্রেরণা যুগিয়েছে।

এই লৌকিক ভাব-মহলের আর একটি দরজা হলো সংগীত। গানের মধ্যে দিয়ে আনন্দের মর্মলোকে প্রবেশ করা যায়। লোক চিত্ত-রঞ্জনের একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে সংগীতই পেয়েছে জাতীয় ঐতিহ্যের স্বীকৃতি। কালক্রমে পবিত্র বিশুদ্ধ গানই ধর্ম-সংগীতের স্থান অধিকার করেছে। আবার যন্ত্র-সংগীতের স্থান নিয়েছে কণ্ঠ সংগীত। এই স্বর-সংগীতকে যা যা সমৃদ্ধ করতে পারে, তা সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছে এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

সাহিত্যই হলো এই উদ্যমের দ্বিতীয় পন্থা। বিশেষ করে গাথাকাব্যের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। এই কাব্য-কাহিনী রচনার প্রচেষ্টা মানুষের মনের নিভৃত দরজাগুলো খুলে দিয়েছে নানা দিকে। এ এক হৃদয়ের আশ্চর্য রাজ্য। যেখানে অন্তরের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার অনন্ত ঐশ্বর্য ছড়ানো; সেখানে শিশু-স্বপ্নের কল্পলোক, কত প্রজ্ঞার আলো, কত অফুরন্ত কল্পনা, কত অসম্ভব-সম্ভব-গল্প—যা লোক-গাথাকে নানা বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয় করে তুলেছে—যেখান থেকে গল্প-

পাগল মন আজও তার ভাবনার রসদ সংগ্রহ করে। এই সূত্র ধরেই নাটকের উদ্ভব। নাটকই জাতীয় মানসের প্রতিভাস। নাটক আদতে লোকবৃত্ত।

একেই বলা যেতে পারে যে, চিত্ত-মনের পরিক্রুতি পর্ব। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সব কিছুরই সংরক্ষণ এবং রূপ-রূপান্তর চলে এসেছে—বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে। সেই সঙ্গে সর্বস্তরের শিল্পাশ্রিত জীবনে চলেছে দূরীকরণের প্রচেষ্টা—পার্থিব এবং নৈতিক মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে।

এখানে একটুখানি ভারতীয় ঐতিহ্য প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করি। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারতীয় ঐতিহ্য ধর্মীয় দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। মনুর বিধানে গড়ে উঠেছে আমাদের সমাজের বুনিয়াদ। আমাদের অদৃষ্ট ভীতি, আর ঐতিহ্য-প্রীতিও প্রবল। আমরা—বিশেষ করে বাঙালীরা—ভেদ-অভেদের সমন্বয় ঘটিয়েছি, মেনেছি জন্মান্তর ও অদৃষ্টবাদকে, অনেক গোড়ামিকেও স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছি; কিন্তু কোনদিন অশোভন অশিষ্টকে এতটুকু প্রশ্রয় দিইনি। কারণ আমাদের শোণিতে এক সনাতন ঐতিহ্যের ধারা আজও প্রবাহমান। এই সত্যটাই এক কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে :

মুনির বিধানে গঠিত সমাজে বেঁধেছে অদৃষ্টে,—
আচার বিচার মেনেছি হাজার, মানে নি অশিষ্টে।
বিভেদ-অভেদে মিলেছি দিব্যি, গোঁড়ামিও আছে ঢের,—
তারি মাঝে এক ঐতিহ্যের আমরা পেয়েছি টের।

এবার সংস্কৃতির প্রসঙ্গে আসি। সংস্কৃতি কথাটাও ঠিক ইংরাজী 'Calture' কথার প্রতিশব্দ নয়। কালচার শব্দের উৎপত্তি জার্মানী কুলটুর শব্দ থেকে। ঐ কথাটার অর্থ শিক্ষা এবং সভ্যতা। ইংরাজী কালচার শব্দের অর্থ আরও ব্যাপকতর। তার অর্থ পরিধির মধ্যে এগ্রি-সেরি-হর্টি থেকে মায় ব্লাড কালচার পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। সংস্কৃতি শব্দের এহেন বারোয়ারী প্রয়োগ নেই। একটা বৈশেষিক অর্থে সংস্কৃতি কথার প্রয়োগ।

সংস্কৃতি কথার বুৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকের ধারণা সংস্কৃত শব্দ থেকে সংস্কৃতি কথাটা এসেছে। সংস্কৃতি কথার তিনটি অর্থ। শোধিত, মন্ত্রপুত এবং সজ্জিত। সংস্কৃতি কথার মধ্যে ঠিক ঐ সমধর্মী কথার ব্যঞ্জনা আছে। আবার কেউ কেউ ধারণা করেন যে, সংক্রিয়া কথা থেকেই সংস্কৃতি শব্দের উৎপত্তি। সংক্রিয়া কথাটার অর্থ সংস্কার বা শোধন। কিন্তু ও দুটোর কোনটাই সংস্কৃতির পূর্ণ অর্থবহ নয়। এই কারণে সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ করতে গেলে ও দুটো শব্দকেই আনতে হবে একটা মেল-বন্ধনে। তাহলে সংক্রিয়া কথার সঙ্গে সংস্কৃত শব্দার্থের শোধিত আর 'সজ্জিত' অর্থটা জুড়ে দিলে বোধহয় সংস্কৃতি কথার একটা চলনসই অর্থ সংশিত হবে। সেটাই হবে সংস্কৃতি আখ্যার একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা।

আদতে সংস্কৃতি হচ্ছে জাতির চিৎ-প্রকর্ষের ব্যঞ্জনাময় সামগ্রিক প্রকাশ। জাতির যুগ যুগান্তরে স্বপ্ন ও সাধনা, তার ভাব-লোকের গৌরব-সমুন্নতি, তিলে তিলে দান করে, সৃষ্টি করে, সংস্কৃতির বহমান জীবন্ত-ধারা যে ধারা জাতীয় জীবনের উৎস। সেই উৎস থেকে জাতি তার

জীবনীশক্তি এবং চিৎ-শক্তির প্রেরণা লাভ করে। মানুষের প্রাণকেন্দ্র যেমন হৃৎপিণ্ড, সংস্কৃতিও তেমনি জাতীয় জীবনের একটি স্বাস্থ্যকর প্রাণকেন্দ্র—যেখান থেকে তার প্রতিটি ধারা জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবাহিত করে দেবে এক বিশুদ্ধ রক্তের প্রবাহ, তার সমস্ত প্রচেষ্টার স্নায়ুতে যোগান দেবে শক্তি, তার অনুভূতির মুখে দেবে ভাষা; আর তার শিল্পকৃতি এবং আদর্শে পৌঁছে দেবে একটা প্রাণস্পন্দন। তাহলে মোদ্দাকথা হলো: Culture, in a nustshell, is the healthy heart of a nation that circulates pure blood to all its people, vigour to its interprise, thought to its feelings and palpitates through its arts and ideals.

টি-এস-ইলিয়ট আরও ব্যাপকতর অর্থে কালচার বা সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সংস্কৃতি হচ্ছে সমন্বয়ের, অগ্রগতির সুচিহ্নিত ইতিহাস। কেননা, বহু বিচিত্র উপদানেই সংস্কৃতির সৃষ্টি। আদিম জ্ঞান এবং প্রচেষ্টার সামান্যতম নৈপুণ্য থেকে শুরু করে জগৎ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও জীবন-তথ্য পর্যন্ত—যার উপরে সমাজ গড়ে উঠেছে—সংস্কৃতির অন্তর্গত। ইলিয়টের ভাষায় বলতে গেলে—This culture is composed of various elements. It runs from rudimentary skill, and knowledge up to the interpretation of the universe and of man by which the community lives.

তাহলে সংস্কৃতি একটা প্রভাবশীল শক্তি। তার স্বরূপ যে কি, তা জানা দরকার। প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতির তিনটি রূপ: ভাবরূপ, কর্মরূপ আর মর্ম-রূপ। এই ভাবরূপের প্রকাশ দেখি কাব্যে সাহিত্যে নাটকে। কর্মরূপের প্রকাশ শিল্প-ভাস্কর্যে। আর মর্ম-রূপের প্রতিফলন দর্শন চিন্তায়। এই ত্রি-বিধ রূপের সমন্বয়ে সংস্কৃতির সমৃদ্ধি। আর সেই ঐশ্বর্যেই সভ্যতার পরিমাপ।

এই সংস্কৃতির ত্রি-মুখী বিকাশ। ব্যক্তিক, দলীয় এবং সামাজিক। এই বিকাশ-ধারা, এই উদ্ভাসনের প্রবাহ ব্যক্তি থেকে শ্রেণীতে, শ্রেণী থেকে সমগ্র সমাজে ক্রমশ সঞ্চরণশীল। সংস্কৃতি স্থিতিশীল হলে, ধাপে ধাপে এই প্রগতি সম্ভব হত না। ব্যক্তি বিশেষের সংস্কৃতি, শ্রেণী-সংস্কৃতিকে করে প্রভাবিত এবং দলের প্রভাব ব্যক্তির সমষ্টি সেই সমগ্র সমাজেরও পর্যাপ্ত রূপান্তর ঘটায়।

তাহলে সাংস্কৃতিক পরিণতির ধাপও তিনটি। ব্যক্তি উন্মেষের দুয়ার খুলে, শ্রেণী উদ্ভাসনের পথ হয়ে, সে পরিণামের ধারা গিয়েছে সমগ্র সমাজ বিকাশের দিকে। এই প্রবাহের নিঃশব্দ পদ-সঞ্চার চলেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। নগণ্যতম প্রাণ ধারার মধ্যেও রয়েছে এই উদ্জীবনের সংস্কৃতি।

এই ক্রম বিকাশের ধারার সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্যের সংযোগ আছে। এই প্রবাহমান ভাবধারা কখনও কখনও কোন এক মহান প্রাণ-তরঙ্গে উদ্বেল হয়ে নতুন দিকে বাঁক ফেরে। কোন এক যুগে ভগীরথ তার প্রতিভার শঙ্খ বাজিয়ে লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যের গঙ্গাকে আপন প্রদর্শিত পথে চালনা করেন। তখন সংস্কারের জহ্নু মুনি আর তাকে ধরে রাখতে পারে না। কেননা তখন সে আর ভাব-গঙ্গা নেই, সে তখন নতুন প্রাণের উদ্দীপনায়, সৃষ্টির উজ্জ্বলতায় ভাগীরথী হয়ে গেছে। এমনি করে গতানুগতিক ঐতিহ্য, কোন এক মহান প্রতিভার আলোয় পরিশোধিত হয়ে সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়। এই কথার প্রতিধ্বনি করে ইলিয়ট বলেছেন যে, Tradition, being filtered

though authores own personality, his creative genius—is a new culture.

এ পর্যন্ত 'ঐতিহ্য' আর সংস্কৃতির প্রসঙ্গই আলোচনা করছি। ও দুটোর সংজ্ঞার্থের সূত্র ধরে মোটামুটি একটা তত্ত্ব-ব্যাখ্যার চেষ্টাও করেছি। এবার লোক-সংস্কৃতির কথায় আসি। আলোচনার গোড়াতেই বলতে হয় যে, লোক-সংস্কৃতি কথার প্রচলনও হয়েছে খুবই হাল আমলে। বিগত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের আগে ও কথাটা শোনাই যায় নি। অবশ্য তত্ত্বানুসন্ধানীদের অভিমত এই যে, গত পঞ্চাশ বছর আগেই ঐ শব্দটির প্রয়েগে দেখা গেছে। তবে ঠিক আজকের অর্থে শব্দটার প্রচলন ছিল না।

লোক-সংস্কৃতি বলতে আমাদের মনে যে বিশুদ্ধ সারস্বত ভাবের উদয় হয়, ঠিক সেই অর্থে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ঐ কথাটা ইউরোপে চালু হয় নি। বরং লোকচর্চা বা জনসংযোগ এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনেই ও-দেশে শব্দটার ব্যবহার হয়ে আসছে। জনগণের মধ্যে যে একটা ইতিহাস-সচেতন-সৃজনী শক্তি আছে, তা যখন বিপ্লবপন্থী মার্কসবাদীদের চোখে প্রথম ধরা পড়ল, তখন তারা সেই জনশক্তির কাছে আবেদন পেশ করলেন ব্যাপক জনসংযোগের জন্য। তাঁরা জনতাকে মূলতঃ দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করলেন। যথা—(১) অবিবেকী হৃদয়হীন পশুবৎ জনতা (২) আর দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত হলো শ্রেণী-সচেতন-দরিদ্র শ্রমজীবীর দল। শ্রেণী নির্বাচনের পর ঠিক হলো যে, পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে একটা বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে এই দ্বিতীয় দলের লোকদের নিয়ে কাজ আরম্ভ হবে। এই উদ্দেশ্যেই একদিন জার্মান শ্রমিকদের সম্পর্কে এফ. য়্যাঙ্গেলস্ বলেছিলেন যে, তারাই হচ্ছে দর্শন চিন্তার ন্যায্য উত্তরসাধক, তারা যেন এই সত্য জানার জন্যই প্রেরিত হয়েছে যে, তাদের জীবনে একটা পরিবর্তন দরকার।

এখন অবশ্য জনতা বলতে আমরা অনেক জনসমাগম—এই সমাবেশকেই বুঝি। অনেক লোকের দ্বারা গঠিত এই যে মানবিক সংগঠন, তার স্থান অধিকার করেছে 'জন-প্রতিষ্ঠান' এই নামটা। যা কেবল সামরিক সংস্থার মতই হুকুম তামিল করে, বিধি-নিষেধকে মেনে চলে, নির্দেশ ছাড়া কিছুই করে না।

শিল্প উৎপাদনের একটি বিশেষ পর্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই 'জনতা' কথার অন্য একটা ধারণাও পাওয়া যায়। উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যমান তখনই নির্ধারিত হয়, যখন সেই জিনিসের চাহিদা স্বল্প সময়ের মধ্যেই হু-হু করে বাড়তে থাকে। এই যারা সাধারণ ক্রেতা—যাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার উপরই উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যমান নির্ধারিত হলো, পরোক্ষভাবে সেখান থেকে জন-রুচির একটা সাধারণ ধারণাও পাওয়া গেল। এই জন-রুচি থেকেই সেই অঞ্চলের গণ-মানসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা ধারণাও জন্মাল। এখন এই গণ-মানসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি যে কি, তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

(১) এই কেনা-কাটার ব্যাপারে জন-মানসের চারটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নতুনের প্রতি সাধারণ মানুষের লিপ্সা। বাজারে যা কিছু নতুন উপকরণ সামগ্রী উঠবে, সর্বাগ্রেই তা' তার চাই-ই। অন্যথায় তার মনে হীনমন্যতার ভাব জাগবে। এই কেনার সামর্থেই তার সামাজিক অস্তিত্বের উপলব্ধি, কোন কারখানার কর্মী হিসাবে না। (২) তাদের সময়

সম্পর্কিত ধারণাও অপেক্ষাকৃত স্থূল। তাদের কাছে পিছনের দিকটা নেই, কেবল সামনের দিকটাই আছে। তারা নতুনত্বের আস্বাদনের জন্য যেন অনাগত ভবিষ্যতের দিকে উড়ে যেতে চায়। এ ছাড়া তার মন জুড়ে আছে অসম্ভব প্রত্যাশা, অভাবনীয় সুখ-আনন্দ লাভের প্রচেষ্টা, ভবিষ্যতের একচেটিয়া অধিকারের ইচ্ছা—তাই কোনসূত্রে অতীতের উত্তরাধিকারী হওয়ার কোন বাসনাই তাদের নেই। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সমাজ মানসের অনেক রূপান্তর ঘটেছে।

বিগত এক পুরুষের মধ্যেই যেন দ্বৈত-স্মৃতির উত্তরাধিকার, ঐতিহ্যের শেষ স্মৃতি আমাদের মন থেকে যেন অবলুপ্ত হতে চলেছে। অনেক দিন পর্যন্ত সচেতন মানুষের মনে মানব ঐতিহ্যের দ্বৈত-উত্তরাধিকার সক্রিয় ছিল। অর্থাৎ পিতার অর্ধেক, নিজের অর্ধেক—এই দ্বৈত-উত্তরাধিকারের স্মৃতি সূত্র একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে হাল আমলে। ফলে, আমাদের পিছনের স্বপ্ন, ঐতিহ্যের স্বর্গ মন থেকে চিরতরে মুছে গিয়েছে। অতীত এখন আমাদের কাছে অবাস্তব প্রতিশ্রুত দেশ মাত্র।

এতদিন লোক-সংস্কৃতির যে লক্ষ্য-বিন্দু নির্দিষ্ট ছিল, সেটা যে ভ্রান্ত-পথের নির্দেশনা, আজ তা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ সেখানে সময় বিশেষের উপর গুরুত্ব না দিয়েই যুগধর্মকে অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই আদি যে সাধারণ মানুষ স্থান কালের ধারণা-বিচ্ছিন্ন হয়ে একটিমাত্র নিটোল সময় বোধের মধ্যে বাস করছে, তাদের জন্য চাই অভিনব কৃত্রিম জন-সংস্কৃতি। যে লোক সংস্কৃতি দেশের জনসাধারণকে দেবে নিত্য নতুনত্বের স্বাদ, অনন্ত যৌবনের আকর্ষণ, গৃহবাসের পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা, অতিমানবীয় শক্তি ও সৌন্দর্যবোধ এবং অতি গোয়েন্দা বুদ্ধির প্রাখর্য।

পরিশেষে আজকের এই যুগ সাধনার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে স্মরণ করতে হবে যে, আমরা যেন এক মহান্ সারস্বত উদ্ভাসনের প্রতীক্ষায় আছি। আমরা এমন একটা কাল-সেতুর উপর এসে পা দিয়েছি, যার আরম্ভ আছে, অথচ শেষ নেই। তাই তার ওপারে যাবার আগে, প্রত্যেককেই অনেকক্ষণ ধরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবতে হ'বে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হ'বে যে, এমন একটা ব্যাপকতর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে, যা, সমগ্র ভূখণ্ডের সকল অধিবাসীরই মন জয় করবে; যে লোক-সংস্কৃতির ধারাকে কোন ক্ষুধার তাড়না, কোন রাষ্ট্র বিপ্লবই আর প্রতিহত করতে পারবে না। এতদিন ধরে যা বার বার করে সাধারণ মানুষের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে তার সর্বপ্রকার উদ্যম আর প্রচেষ্টা গুলোকে ব্যর্থ করে দিয়ে ছিল। আমরা সেই সার্বভৌম সংস্কৃতির বিকাশের এক রাজছত্র ছায়াতলে সমস্ত ভূখণ্ডের মানুষের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়াতে চাই। *

* ম্যানেস স্পারবারের tradition and culture-এর ভাবানুসরণে লিখিত।

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

চালা রীতি : জোড়বাংলা।

দোচালা মন্দিরের আলোচনা প্রসঙ্গে জোড়বাংলার কথা আসিয়া পড়িয়াছিল। দুইটি দোচালা কক্ষ সমান্তরালভাবে স্থাপনাতে জোড়বাংলার রূপের সূচনা—জোড়বাংলার গঠন প্রকরণ সম্বন্ধে ইহাই প্রাথমিক কথা। একবাংলার আসন আয়তাকার, দুইটি একবাংলার সমান্তরাল অবস্থানে যে রূপের উদ্ভব তাহাও আয়ত। একবাংলা বা দোচালা কক্ষে প্রস্থ হয় দৈর্ঘ্যের অর্ধেক কিংবা সামান্য কম কিন্তু জোড়বাংলার কক্ষগুলিতে প্রস্থ দৈর্ঘ্যের অর্ধাংশের ব্যাপ্তি অতিক্রম করিয়া যায়। তবে দোচালা কক্ষের ভাবকল্পনার বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখিলে বুঝা যাইবে জোড়বাংলার আসনে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থের পারস্পরিক পার্থক্য খুব বেশি নয়—দৈর্ঘ্য সামান্যই বড়। একটি আয়তক্ষেত্রকে অবলম্বন করিয়া উঠিলেও দুইটি কক্ষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কিন্তু ভিতরে বা বাহিরে কোথাও সাধারণতঃ লোপ করিয়া দেওয়া হয় না। অভ্যন্তর বিন্যাসে কক্ষ থাকে সাধারণতঃ দুইটি, একটি সম্মুখে অপরটি পশ্চাতে। কক্ষ দুইটিকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে একটি বিভাজক দেওয়াল। সম্মুখের কক্ষটি প্রকৃতপক্ষে অন্তরাল কক্ষ ইহার পরিচয় দালান নামে, পশ্চাতেরটিতে দেবতা বাস করেন—ইহাই তাঁহার গর্ভগৃহ। দালানের মুখভাগে প্রথাগত পদ্ধতিতে তিনটি ভঙ্গীকাটা খিলানশীর্ষ প্রবেশদ্বার। দালান হইতে গর্ভগৃহে প্রবেশ করিবার পথ রচিত হয় মধ্যবর্তী বিভাজক দেওয়ালটিকে ভেদ করিয়া।

দুইটি কক্ষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আসনের বিন্যাসেই ধরা পড়ে। বাহির হইতে এই পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য উভয়ের সংযোগক্ষেত্রে আসনের বহিরেখা দুই পাশেই একটু ভিতরে ঢুকিয়া যায়। এই অন্তর্গত অংশটি কোন একটি বাংলাকে—সাধারণতঃ সম্মুখের দালানটিকে—প্রস্থে কিছুটা হ্রস্ব করিয়া রচনা করা। আসনের অনুবর্তী হইয়া উঠিয়া গিয়াছে লম্বমান দেওয়াল। দালানের সম্মুখের ও গর্ভগৃহের পশ্চাতের দেওয়াল চালা কক্ষের নিয়ম অনুসারে খানিকটা খাড়া উঠিবার পরে আয়ত আঁখিপল্লবের মত ধীর বক্ররেখায় বাঁকিয়া যায়। পার্শ্বের দেওয়ালগুলি পূর্বোল্লিখিত দেওয়াল দুইটি যতটা খাড়া উঠিয়াছে ততখানি খাড়া উঠিবার পর ত্রিভুজের আকৃতিতে ক্রমহ্রস্বায়মানভাবে শেষ হয় গিয়া একটি বিন্দুতে। দেওয়ালের আকৃতিতেই আচ্ছাদনের রূপরেখা নির্দিষ্ট হইয়া যায়। দালান ও গর্ভগৃহের সম্মুখ ও পশ্চাতের দেওয়ালের শীর্ষ রচনায় বক্ররেখার যে গতিবেগ আচ্ছাদনের আনুভূমিক ও লম্বমান বিস্তারে তাহার প্রভাব থাকিয়া যায় সর্বত্র। পার্শ্বের দেওয়ালের ত্রিভুজ শীর্ষগুলির উদ্বতাও নিরূপিত হইবে ওই বক্র-রেখার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই। চালা আচ্ছাদনের শীর্ষস্থ বক্ররেখা শেষ হইবে ত্রিভুজগুলির সর্বোচ্চ বিন্দুতে; তাহার পাদভাগের কোণগুলির অবস্থান ত্রিভুজের পাদমূলে। আচ্ছাদনের উচ্চতা তাই ত্রিভুজের উচ্চতার সমান। আসনের বহিরেখার যে অংশটি উভয় কক্ষের সংযোগ ক্ষেত্রে

ভিতরে ঢুকিয়া যায় তাহার ব্যাপ্তিটুকু অবলম্বন করিয়াই দালানের পশ্চাতের ও গর্ভগৃহের সম্মুখের দেওয়ালের স্বল্প পরিসর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। ইহাদের অবশিষ্ট অংশ হইল দুইটি কক্ষের মধ্যবর্তী বিভাজক দেওয়ালটি। ইহার কথা তো একটু আগেই বলিয়া আসিয়াছি।

কক্ষ দুইটির আচ্ছাদন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। দালানের সম্মুখের ও গর্ভগৃহের পশ্চাতের চালা থাকে বাহিরের দিকে। বিপরীত দিকের চালা দুইটি ভিতরের দিকে থাকিয়া উভয় কক্ষের সংযোগস্থলের উপর আসিয়া পরস্পরের সম্মুখীন হয়; অর্থাৎ অভ্যন্তরে যে বিভাজক দেওয়ালটি থাকে তাহার ঠিক উপরেই ইহাদের অন্ত্যক্ষেত্রের অবস্থান।

আসনে, দেওয়ালে, আচ্ছাদনে, অভ্যন্তর বিন্যাসে জোড়বাংলা মন্দিরের সর্বত্রই দুইটি কক্ষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যে স্বাভাবিকভাবে থাকিয়া যাইতেছে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার মধ্যে সেই কথাটিই স্পষ্ট হইয়া উঠে। একই রূপের দুইটি স্বতন্ত্র কক্ষকে সমান্তরাল ভাবে স্থাপিত করিয়া যে রূপের সৃষ্টি কৃত্রিমতা তাহাতে থাকিবে ইহা তো স্বতসিদ্ধ। একটি কৃত্রিম ভাব-কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া সংহত রূপসৃষ্টিই জোড়বাংলা গঠনের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পর্যায় জোড়বাংলা মন্দিরগুলির সৃষ্টি। শেষ অবধি তাই সর্বসম্মত সুনির্দিষ্ট কোন নীতি গড়িয়া উঠে নাই—পরীক্ষা নিরীক্ষাই চলিয়াছে।

জোড়বাংলা রূপ লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি পর্যায়—সম্ভবতঃ প্রথমতম পর্যায়ে—গঠিত হইয়াছিল মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা সহরের জোড়বাংলা মন্দিরটি। চন্দ্রকোনা সহরের গাছশীতলা মোড়ের দক্ষিণ পশ্চিমে একটি পতিত ভূমিখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত মন্দিরটির গর্ভগৃহে কোন দেবমূর্তি নাই; যে দেবতার আবাস বলিয়া ইহার নির্মাণ তাঁহার কথাও সম্পূর্ণ বিস্মৃত। তাই শুধু জোড়বাংলা বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিতে হইল। আয়তাকার আসনের যে দুইদিক হ্রস্বতর তাহাদের উপর স্থাপিত হইয়াছে—মন্দিরের সম্মুখ ও পশ্চাত ভাগ। দালানের প্রস্থ গর্ভগৃহ অপেক্ষা সংক্ষেপিত। আসনের বহিরূপের অন্তর্গত অংশটি ও উভয় কক্ষের মধ্যবর্তী বিভাজক দেওয়াল ইহারই অংশ লইয়া গঠিত বলিয়া প্রস্থে ইহা গর্ভগৃহের তুলনায় হ্রস্ব। আসনের এই বিন্যাসকে অবলম্বন করিয়া দেওয়ালে উঠিতেছে। দালানের সম্মুখ ও গর্ভগৃহের পশ্চাতের দেওয়াল কিছুটা উঠিবার পর যথারীতি বাঁকিয়া গিয়াছে। বক্ররেখাটি কিন্তু আয়ত আঁখিপল্লবের স্বচ্ছন্দ গতিবেগ অনুসারে রচিত নহে—মধ্যস্থলে একটু উঁচু। ইহার গঠনে বর্তুলাকৃতির প্রবণতা সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। দালানের সম্মুখের দেওয়ালই হইল মন্দিরের মুখ ভাগ। ইহার উপরে রহিয়াছে ভগ্নীকাটা খিলানশীর্ষ তিনটি সুদীর্ঘ প্রবেশদ্বার।

ত্রিভুজ-শীর্ষ পাশের দেওয়ালগুলির উচ্চতা দুইটি কক্ষেই সমান। ত্রিভুজের বাহুগুলি কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজ রচনা করিতেছে না। দালানের সম্মুখ ও গর্ভগৃহের পশ্চাতের বাহুগুলি হ্রস্বাকার, উঠিয়াছেও অনেকটা খাড়া ভাবে। ইহাদের বিপরীত দিকের বাহুগুলি (অর্থাৎ যে গুলি কক্ষ দুইটির সংযোগস্থলের দিক হইতে উদ্ভূত) অনেক বেশী ঢালের সহিত অগ্রসরমান, দৈর্ঘ্যও তাহাদের অধিক। কিন্তু পূর্ব কথিত বাহুগুলির গতি খানিকটা সোজা বলিয়া দেওয়ালের সর্বাধিক উচ্চতা নির্ধারিত করিয়াছে ইহারাই।

দেওয়াল গঠনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আচ্ছাদনের রূপরেখা নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। একটু আগেই বলিয়া আসিয়াছি দালানের সম্মুখের ও গর্ভগৃহের পশ্চাতের দেওয়ালের বক্ররেখা ঠিক আয়ত আঁখিপল্লবের মত নহে—মধ্যস্থলে একটু উঁচু করিয়া টানা। ইহাদের উপরের চালাগুলিও গঠিত হইয়াছে ওই রূপেরই অনুবর্তী করিয়া। চালা দুইটিকে তাই বাহিরের দিকে একটু বেশী বাঁকান বলিয়া মনে হয়। গর্ভগৃহের সম্মুখের ও দালানের পশ্চাতের চালা দুইটির দেহে বক্ররেখার বন্ধন অনেক শিথিল—দুইটি কক্ষের মধ্যবর্তী দেওয়ালটির উপরে তাহারা পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে অনেকটা সোজা ঢালের গতিপথ বাহিয়া। এই জন্যই আচ্ছাদন দুইটি পরস্পরের প্রতি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।

উভয় কক্ষেই আচ্ছাদনের ঠিক শীর্ষ বাহিয়া অর্থাৎ দুইটি চালার সংযোগস্থলের উপরে একটি স্থূল ত্রিকোণাকৃতি রেখা সমগ্র পরিধি ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান। দালানে এই রেখার স্থূলতা কিছুটা কম, গাত্রে ডিজাইন রচনা করিয়া বৈচিত্র্যায়নের প্রচেষ্টাও রহিয়াছে। উভয়ত্রই এই রেখাটিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া নিয়মিত দূরত্বের ব্যবধানে তিনটি করিয়া চূড়া। একটি স্থূল বেদীর উপরে বেকী, আমালক ও দণ্ড সাজাইয়া চূড়া ভাগের রচনা। দালানের চূড়াগুলি একটু বেশী স্থূল ও বিস্তারিত।

চন্দ্রকোনার জোড়বাংলা মন্দিরটির দিকে চাহিলেই বুঝা যায় আচ্ছাদনের আকৃতি ও বিস্তার নিম্নাংশের অনুপাতে অত্যধিক। দোচালা কক্ষের সীমাবদ্ধতা অনুসারে চালার আপাদ বিস্তার মন্দির দেহের সর্বাধিক উচ্চতার প্রায় অর্ধেক এবং আচ্ছাদিত কক্ষটির প্রস্থ দুইটি চালার মোট প্রস্থের এক তৃতীয়াংশ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এখানে দেখিতেছি উভয় কক্ষেই চালার আপাদ বিস্তার মন্দির দেহের সর্বাধিক উচ্চতার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। আচ্ছাদিত কক্ষের প্রস্থও দুইটি চালার মোট প্রস্থের প্রায় এক চতুর্থাংশ; দালানের প্রস্থ সংক্ষেপিত বলিয়া এই আনুপাতিক সম্পর্ক আরও বিষম হইয়া উঠিয়াছে।

মন্দির দেহের অনুপাতে চালা আচ্ছাদনের আকৃতি স্থির করিবার প্রশ্নে যে অনভিজ্ঞতার পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই সমর্থন পাইতেছি আচ্ছাদন দুইটির শীর্ষস্থ রেখা প্রবাহ ও গুরুভার চূড়া সংযোজনের মধ্যে। মনে হয় উপর হইতে চাপ দিয়া রাখিবার প্রয়োজনেই ইহাদের উদ্ভব। উপরন্তু ইহাদের অস্তিত্ব আচ্ছাদনটিকে গুরুভার করিয়া তুলিয়াছে।

সমান্তরালভাবে রক্ষিত কক্ষদ্বারের ভিতরের দিকের চালা দুইটি অর্থাৎ দালানের পশ্চাতে ও গর্ভগৃহের সামনের চালা ঝুঁকিয়া আসিয়া উভয় কক্ষের মধ্যবর্তী দেওয়ালটির উপর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। চালা দুইটি দৈর্ঘে অন্য চালাগুলির সমান; তাই মধ্যবর্তী দেওয়ালের দৈর্ঘ ছাড়াইয়া দুই দিকেই কক্ষের দৈর্ঘের সহিত সমান হইয়া ব্যাপ্ত। বাহির হইতে দুইটি কক্ষের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য যে অন্তর্গত অংশটি রহিয়াছে তাহার উপরে ভিতরের দিকের দুইটি চালার মিলনে দালান ও গর্ভগৃহের মধ্যবর্তী অন্তর্গত অংশে উদ্ভূত হইয়াছে দীর্ঘাকৃতি একটি মন্দিরের ডিজাইন। দুইটি কক্ষের দৈহিক পার্থক্য ইহাতে আরও যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

দালানের মুখভাগে ভঙ্গীকাটা খিলান শীর্ষ তিনটি দ্বারপথ। দ্বারপথগুলি সৃষ্ট হইয়াছে

দুইটি স্তম্ভ ও সমসংখ্যক বৃথাস্তম্ভ সমাবেশের দ্বারা। দেওয়ালটির দুই দিকেই কিছুটা অংশ ছাড়িয়া তাহারই গাত্রে সংলগ্ন করিয়া দুইটি বৃথাস্তম্ভ সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহার পরে নিয়মিত ব্যবধানে দুইটি স্তম্ভের অবস্থান। স্তম্ভ ও বৃথাস্তম্ভগুলির আকৃতি স্থূল ও খর্ব কিন্তু মধ্যদেশ সঙ্কীর্ণ ; ক্ষীণায়ত মধ্যদেশ হইতে উপর ও নীচের দিকে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে। শীর্ষে রহিয়াছে অর্ধ বৃত্তাকারে গঠিত ভঙ্গীকাটা খিলান। স্তম্ভ ও খিলানের গঠন বৈশিষ্ট্যে দ্বারপথগুলি দেখিতে হইয়াছে ঠিক দীর্ঘায়ত কলসের মত। স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে দ্বারপথগুলি সুদক্ষ স্থপতির সৃষ্টি বলিয়া মনে হইবে কিন্তু মন্দির দেহের ব্যাপ্তি ও উচ্চতার কথা ভাবিলে প্রবেশ দ্বারগুলির উচ্চতা অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের ফল বলিয়াই বোধ হইবে।

দুইটি কক্ষেরই পার্শ্বের দেওয়ালে সুউচ্চ আয়ত কুলুঙ্গির মধ্যে একটি করিয়া মন্দিরের প্রতিকৃতি। তাহার উপরে আবার দ্বারপথগুলির অনুরূপ আকারের প্রতিকৃতি। প্রবেশ দ্বারের মত কুলুঙ্গিগুলির উচ্চতাও মন্দির দেহের তুলনায় অত্যধিক। প্রায় সমগ্র দেওয়ালটিকে ব্যাপ্ত করিয়া একটি কুলুঙ্গির অবস্থান। এতদ্ভিন্ন দেওয়াল কোণে কোণে নিয়মিত বিরতির ব্যবধানে নামিয়াছে পাতলা টালির ছড়। পার্শ্বের দেওয়ালের ত্রিভুজশীর্ষের গাত্রে লম্বমান রেখা বহন করিয়া আনুভূমিক রেখা বিদ্যমান। রেখাগুলির অবস্থান ও বিন্যাস অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই রেখা বিন্যাস বাঁশ ও কাঠ দিয়া নির্মিত চালা কাঠামোর তীর ও বরগার কথাই মনে করাইয়া দেয়।

জোড়বাংলা মন্দিরের ভাবকল্পনার অন্তর্নিহিত কৃত্রিমতা চন্দ্রকোণার জোড়বাংলার সর্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কৃত্রিমতা সম্পর্কে স্থপতি যে সচেতন ছিলেন না তাহা নহে ; অতিক্রম করিবার প্রয়াসও তাঁহার কিছুটা ছিল। দুইটি কক্ষকেই যে ভিতরের দিকে একটু ঝুঁকাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা বোধকরি দুইটি স্বতন্ত্র কক্ষের সমবায়ে একটি একত্রবদ্ধ রূপ গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস হইতেই। বস্তুতঃ চন্দ্রকোনার জোড়বাংলা অনভিজ্ঞ অক্ষম স্থপতির রচনা নহে। পটুতার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে দালানের মুখভাগে প্রবেশদ্বার রচনায়। এগুলি যে কুশলী শিল্পীর সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। কিন্তু চালা আচ্ছাদন ও জোড়বাংলা নির্মাণের কোন অভিজ্ঞতা এই স্থপতির ছিল না—সম্ভবতঃ চালা আচ্ছাদন ও জোড়বাংলা গঠনের কোন আদর্শও তাঁহার জানা ছিল না। সেই কারণেই বোধকরি মন্দির দেহের সর্বত্র সামঞ্জস্যের অভাব—গঠন প্রকরণে অস্ফুট কল্পনার স্বাক্ষর।

জোড়বাংলা নির্মাণের অন্তর্নিহিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করিবার এক নবতর পদ্ধতি দেখা গেল গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র মঠের অন্তর্ভুক্ত, শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মন্দিরটিতে। মন্দির দেহে সংস্কার হইয়াছে প্রচুর। দেওয়ালের উপর, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে, সংযোজন ও পরিবর্ধন হইয়াছে আর আচ্ছাদনের উপর পড়িয়াছে পুরু পলস্তরা। ইহার ফলে পূর্বাস্য মন্দিরটির দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে এবং আচ্ছাদনে আদি রূপের পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সে পরিচয় পাইতে হইলে তাকাইতে হইবে উত্তর দিকে ও পূর্বদিকের মুখভাগে।

আয়ত আসনের প্রস্থের উপর উঠিবে মন্দিরের সম্মুখ ও পশ্চাত ভাগ এবং পার্শ্বদেশ

থাকিবে তাহার দৈর্ঘ আশ্রয় করিয়া ; আর দুই পার্শ্বে একটি অন্তর্গত অংশ দুইটি কক্ষের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া বিদ্যমান থাকিবে—জোড়বাংলা গঠনে এগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং নীতি হিসাবে ইহা প্রায় সর্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছিল। গুপ্তিপাড়ায় দেখিতেছি এ নীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আয়ত আসনের দৈর্ঘের উপর মন্দিরের সম্মুখ ও পশ্চাত ভাগ। পার্শ্বে, উভয় কক্ষের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া কোন অন্তর্গত অংশের সমাবেশ এখানে ঘটে নাই। দেওয়ালের খাড়া অংশও একটি মাত্র কক্ষের উপযোগী করিয়া নির্মিত। খাড়া অংশের শেষে, সামনে ও পিছনে দেওয়াল যেখানে বাঁকিয়া যাইতেছে সেই স্তর হইতেই পার্শ্ব দেওয়ালে দুইটি স্বতন্ত্র দোচালার জন্য ত্রিভূজশীর্ষের উদ্ভব। ত্রিভূজশীর্ষের রচনা ও বিন্যাসেই দুইটি চালা আচ্ছাদনের অস্তিত্ব ও রূপরেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সামনের দোচালাটি মন্দিরের যে অংশ আবৃত করিবে প্রস্থে তাহা পশ্চাতের অংশ অপেক্ষা বৃহত্তর। শীর্ষের বাহুগুলির চন্দ্রকোনার মতই অসমকোণী ত্রিভুজ রচনা করিয়াছে এবং যে বাহু দুইটি ভিতরের দিক হইতে উঠিয়া আসিতেছে তাহাদের ঢাল সোজা, গতিও দ্রুত। কিন্তু উভয় কক্ষেই সামনের বাহু পিছনেরটি অপেক্ষা কিছুটা বড়। দালানের মুখভাগে, দেওয়ালের উর্দ্ধাংশে বক্ররেখার গতি অত্যন্ত ধীর ও সংযত—আয়ত আঁখি পল্লব হইতেও টানা। আচ্ছাদনের রূপেও সংযত গতিভঙ্গের লক্ষণ বিদ্যমান। বক্ররেখার নির্ধারিত গতিভঙ্গে নির্দিষ্ট চালা আচ্ছাদন যেখানে বঙ্কিম রেখায় উঠিয়াছে সেখানে বেশী বাঁকিয়া যায় নাই, আবার যে অংশ সোজা ঢালের সহিত নামিয়াছে সেখানেও গতি খুব দ্রুত নহে।

শুধু চালার গতিবেগ নিয়ন্ত্রণেই নহে—আচ্ছাদনের সহিত মন্দির দেহের আনুপাতিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারেও গুপ্তিপাড়ার চৈতন্য মন্দিরে পরিণত অভিজ্ঞতার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। দোচালা কক্ষের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আচ্ছাদনটি সুসমঞ্জস করিয়া গঠিত করিবার প্রয়োজনেই চালার আপাদ বিস্তার মন্দির দেহের সর্বাধিক উচ্চতার প্রায় অর্ধেক করিয়া গড়া এবং আচ্ছাদিত অংশের প্রস্থ আচ্ছাদনকারী দুইটি চালার মোট প্রস্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হইয়া আসিয়াছে। ভারসাম্য বোধের যে অভাব চন্দ্রকোনার জোড়বাংলার সর্বাঙ্গ ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল গুপ্তিপাড়ায় স্থপতি তাহা অনেকাংশে কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছেন মনে হইতেছে।

চন্দ্রকোনার জোড়বাংলায় দেখিয়াছিলাম দালানটি প্রস্থে গর্ভগৃহ অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতর। আচ্ছাদনের ক্ষেত্রেও উভয়ের পার্থক্য হইয়াছে একই প্রকার। গুপ্তিপাড়ার চৈতন্য মন্দিরে বাহিরের দিক হইতে আসন একটি কক্ষের। ভিতরে একটি স্থূল বিভাজক দেওয়াল কক্ষটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে ; সামনে দালান পিছনে গর্ভগৃহ। দালান ও মধ্যবর্তী দেওয়ালের মিলিত প্রস্থ আবৃত করিয়া উঠিয়াছে সামনের দোচালা আচ্ছাদন। তাই পশ্চাতেরটি অপেক্ষা ইহা বৃহত্তর।

চৈতন্য মন্দিরের দেহ গঠনের যে বর্ণনা করিলাম তাহাতে জোড়বাংলা দেহের কৃত্রিমতা অতিক্রম করিবার প্রয়াস সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। একটি কক্ষের উপযোগী আসন ও দেওয়ালের খাড়া অংশ গঠন করিয়া এই সমস্যা সমাধানের যে প্রয়াস ভাবকল্পনার দিক দিয়া তাহার অভিনবত্ব

অনস্বীকার্য। সম্পূর্ণ দ্বিধাবিভক্ত আচ্ছাদনের কৃত্রিমতা তো ঘুচিবার নহে, কিন্তু তাহারই মধ্যে চলিয়াছে রূপানুসন্ধানের প্রচেষ্টা। চন্দ্রকোনার মত এখানেও ভিতরের চালা দুইটি সোজা ঢালের সহিত নামিয়াছে, ফলে আচ্ছাদন দুইটির ঝোঁক ভিতরের দিকে। কিন্তু দুইটি আচ্ছাদনের পিছনের ঢালা সামনেরটি অপেক্ষা বৃহত্তর। আপাতদৃষ্টিতে আচ্ছাদনের বিন্যাস পরস্পর বিরোধী কল্পনার ফলশ্রুতি বলিয়াই ধারণা হইবে। কিন্তু এই আপাত বৈসম্যের মূল নিহিত রহিয়াছে রূপানুসন্ধানের প্রচেষ্টার মধ্যে। ভিতরের দিকে সুস্পষ্ট ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও আচ্ছাদনদ্বয়ের দেহে একটি অখণ্ড রেখার প্রবহমান গতির মাধ্যমে পশ্চাতের দিকে বিপরীতমুখী আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া দ্বিধাবিভক্ত আচ্ছাদনের মধ্যেও সংহত রূপ সৃষ্টির প্রয়াস জোড়বাংলা মন্দিরের ভাবকল্পনায় চৈতন্য মন্দিরের স্থপতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান।

মন্দিরটির মুখভাগে বিশেষ করিয়া ভঙ্গীকাটা খিলানগুলির পার্শ্বে পোড়ামাটির কিছু অলঙ্করণ রহিয়াছে। বাংলা দেশের ষোড়শ শতকের শেষ পাদে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে অলঙ্কার সজ্জার যে রূপ ও বিন্যাস এখানে তো তাহারই পুনরাবৃত্তি দেখিতেছি। Bengal District Gazetteers : Hooghly গ্রন্থের তথ্য অনুসারে মন্দিরটির নির্মাতা হইলেন সম্রাট আকবরের রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী রাজা বিশ্বেশ্বর রায়। গ্রন্থটির এই সংবাদের সূত্র ছিল গুপ্তিপাড়ার একজন পণ্ডিতের নিকট রক্ষিত দলিলপত্র। Hooghly Gazetteer-এর তথ্য অনুসারে মন্দিরটির নির্মাণ কাল ষোড়শ শতকের শেষ পাদ ও সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকেই পড়ে। মন্দিরটির অলঙ্করণের ইঙ্গিতও ঐ সময়ের প্রতিই। চন্দ্রকোনা হইতে গুপ্তিপাড়ার উন্নত ভাবকল্পনার রূপগত ব্যবধান প্রচুর। নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া এই ব্যবধান অতিক্রম করিতে হইয়াছে ; নিঃসন্দেহে সময়ও লাগিয়াছে প্রচুর। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চন্দ্রকোনার জোড়বাংলাটি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্মিত হইয়াছিল এরূপ ধারণা বোধকরি খুব অসংগত হইবে না।

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

[বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র ও চরিনামের আলোচনা বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটি নামের প্রথম উপস্থিতি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য প্রথম কয়েকটিতে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে, পরেরগুলিতে সংক্ষেপ করা হয়েছে]

ওয়ারেন হেষ্টিংস (চন্দ্রঃ ৬-৩) (আনন্দঃ ৩-১) ॥

ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলার প্রথম গভর্ণর জেনারেল। ১৭৩২ খ্রীঃ ৬ই ডিসেম্বর ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড প্রদেশের চার্চ্চিল নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৫০ খ্রীঃ কেরাণীরূপে তিনি এদেশে আসেন। দীর্ঘকাল বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে, ১৭৭২ খ্রীঃ তিনি বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হন। এদেশে কোম্পানীর প্রচুর ঋণ হয়েছিল। সেই ঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্য তিনি নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বাদশাহের বৃত্তি বন্ধ, বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহের বেগমদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ, নন্দকুমারের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি কুকীর্তির তিনি নায়ক। ১৭৮৫ খৃঃ তিনি এদেশ ত্যাগ করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে বিচার চলে। তাঁর বিরুদ্ধে বিখ্যাত বাগ্মী বার্কের একাদিক্রমে বিশদিনের বক্তৃতা Burke's Inpeachment of Warren Hastings নামে খ্যাত। অবশেষে হেষ্টিংস নির্দোষ প্রতিপন্ন হন। ১৮১৮ খ্রীঃ ২২শে আগষ্ট হেষ্টিংস-এর মৃত্যু হয়।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে স্ত্রীলোকের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করতে দেখা যায়। তিনি নবাবের কাছে কুল্‌সম সম্বন্ধে যে পত্র দিয়েছিলেন, তা এই—"এ স্ত্রীলোক কে, তাহা আমি চিনি না, সে নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া মিনতি করিল যে, কলিকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিই, তবে সে রক্ষা পায়। আপনাদিগের সঙ্গে আমাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের জাতি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে না। এজন্য ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। ভাল মন্দ কিছু জানি না।" (৬-৩)

বঙ্কিমচন্দ্র হেষ্টিংসকে একটু সুনজরে দেখেছেন। ঐতিহাসিকরা কিন্তু বঙ্কিমের এরূপ সিদ্ধান্ত মানেন না।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনে হেষ্টিংস-এর চিন্তা ও কিঞ্চিৎ তৎপরতা বর্ণিত হয়েছে।

ওয়াটসন (আনন্দঃ ৩-১০) ॥

কাপ্তেন টমাসের সহযোগী একজন ইংরাজ লেপ্টেনাণ্ট।

ওসমান (দুর্গেঃ ১।১৮) ॥

যদুনাথ সরকার ওসমানের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেছেন। (বঃ শতঃ সং-এর ভূমিকা)। ওসমানের পিতা খাজা ঈসা ছিলেন কুৎলুর দেওয়ান। এছাড়া তিনি আরও জানিয়েছেন—"বঙ্কিমের অজ্ঞাত, ১৯১৯ সালে আমার দ্বারা আবিষ্কৃত একখানা ফার্সী হস্তলিপি হইতে ওসমানের বীরচরিত্র সত্য ইতিহাসের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির নাম বহারিস্তান্-ই-খাইবী" ইহা মির্জাশথন্ নামক একজন মুঘল কর্মচারীর আত্মকাহিনী এবং ইহাতে জাহাঙ্গীর বাদশার প্রায় সমস্ত রাজ্যকাল ব্যাপিয়া (১৬০৮-১৬২৫ পর্যন্ত) বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা ও আসামের ঘটনবলীর অতি বিস্তৃত বিবরণ আছে ; কারণ, এই সমস্ত সময় শথন্ বঙ্গদেশে সেনাপতির কাজ করিতেন। জগতে ইহার একমাত্র পুঁথি আছে, তাহা প্যারিস নগরীর সরকারী পুস্তকালয়ে রক্ষা পাইয়াছে। দুই বৎসর গত হইল, ঢাকার অধ্যাপক ডাক্তার বোরা ইহার ইংরেজী অনুবাদ ছাপিয়েছেন।

যদুনাথ সেই কপির যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন তা ওসমানের বীরত্ব সম্যক্ উপলব্ধির জন্য উদ্ধারযোগ্য—"এদিকে বাদশাহী দক্ষিণ বাহুর নেতা ইফ্তিখার খাঁ কয়েকজন মাত্র অনুচর লইয়া জলা পার হইয়া (ওসমানের শিবিরের দিকে) পৌছিয়া ওসমানের ভ্রাতা ওলীকে এমন কাবু করিলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হন আর কি।

"ওসমান কেন্দ্র হইতে ইহা দেখিয়া ওলীকে ছেলেমানুষ বলিয়া গালি দিয়া, ও নিজ পাশে সজ্জিত দুই তিন হাজার পরিপক্ক সৈন্য ও বিখ্যাত রণহস্তীগুলি লইয়া আফগান রণ-নাদ "হু" "হু" গর্জন করিয়া, ছুটিয়া ইফ্তিখার খাঁকে আক্রমণ করিলেন।···আফগানেরা রণ-শৃঙ্গার নামক বিখ্যাত বাদশাহী হস্তীকে চারিদিকে ঘিরিয়া শত আঘাতে কাবাবের মাংসের মত করিয়া কাটিয়া ফেলিল, মুঘলদের ঘোড়াগুলির পায়ের রগ কাটিয়া নিমেষে আরোহীদের ধরাশায়ী করিল।

"একজন আফ্গানের সহিত ইফ্তিখার খাঁর দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি এক আঘাতে উহাকে ভূমিশায়ী করিলেন, কিন্তু উহার ভাই ছুটিয়া আসিয়া তরবারি ছুঁড়িয়া খাঁর বাম হস্তের চর্মসহিত কব্জা কাটিয়া ফেলিল তখন ইফ্তিখারের একজন অনুগত সৈন্য প্রভুর দুর্দশা দেখিয়া, নিজের ঘোড়া ছুটাইয়া, ওসমানের হাতীর সম্মুখে পৌছিয়া তাঁহার মুখ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। তীরটি ওসমানের বাম চক্ষু দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। কিন্তু ওসমানের নিক্ষিপ্ত বর্শা বুকে বিদ্ধ হইয়া শেখ পড়িয়া গেল।···

"নিজ সৈন্যগণ যেন তাঁহাকে জখম দেখিতে না পায়, এজন্য ওসমান এত মারাত্মক আঘাত পাইবার পরও দুই হাতে তীরটি টানিয়া বাহির করিলেন, তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুও ঐ সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল ; কারণ দুই চোখের রগগুলি একত্রে জড়িত থাকে। বাম হাতে রুমাল লইয়া নিজমুখ ঢাকিয়া, ওসমান মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমর ! সুহায়েৎ খাঁর সৈন্যবিভাগ কোন দিকে ?"··· সে উত্তর করিল, "মিয়া, সালামৎ ! ঐ যে সামনে মহুয়া গাছ দেখিতেছেন, তাহার নীচে পতাকা দেখা যাইতেছে। সুজায়েৎ খাঁ নিশ্চয়ই উহার নীচে দাঁড়াইয়া আছেন।" ওসমানের তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল না ; দক্ষিণ হস্ত মাহুতের পিঠে রাখিয়া সেখানে হাতী চালাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

তাহার পর অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলিল, মুঘলেরা অনেকে হতাহত হইলেও পরাস্ত হইল না; আফগানদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে ওসমানের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পুত্র মুমরেজ পিতার মৃতদেহ হস্তীপৃষ্ঠে সঙ্গে লইয়া আবার মুঘলদের সম্মুখীন হইল।......।"

ওসমান সম্বন্ধে যে উপরিউক্ত ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া গেছে বঙ্কিম তার কোথাও কোথাও পরিবর্তন সাধন করলেও, তাঁর কল্পনা অনেকাংশে ইতিহাসানুসারী হয়েছে। তিনি ওসমানকে কতলুখার ভ্রাতুষ্পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন।

গড়-মান্দারণ দুর্গজয়ে ওসমান পাঠান সেনাপতি হিসাবে যেমন কৌশল দেখিয়েছেন, তেমনি সাহসিকতারও পরিচয় দিয়েছেন। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে দুর্গজয় তাঁর চতুর রণনীতির পরিচয়। ওসমান যথার্থ বীর, তাই বীরের মর্যাদা তিনি দিতে জানেন। কতলুখার আদেশ অনুসারে জগৎ-সিংহকে তিনি পিতার কাছে গিয়ে সন্ধিপ্রস্তাব করতে বলেছিলেন, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে বীর হিসাবে জগৎসিংহের এরূপ কাপুরুষ ভাব চাননি। তাই জগৎসিংহ যখন এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না তখন—"ওসমানের মুখভঙ্গীতে, সন্তোষ অথচ ক্ষোভ উভয়ই প্রকাশ হইল,..."

এই উপন্যাসে ওসমান ব্যর্থপ্রেমিক। কিন্তু সেই ব্যর্থ প্রেমিকের জন্য আমাদের মনে কোন বেদনাবোধ জাগে না—এইটাই আশ্চর্য। তার কারণ ওসমান প্রেমের আদর্শলোকে বিচরণ করে হতাশার অন্ধকারে ডুবে যেতে চাননি, তিনি বাস্তবের মাটিতে প্রেমকে বীরের মত কেড়ে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাই জগৎসিংহ ও আয়েষাকে নিভৃতে আলাপরত দেখে হিংসায় ফেটে পড়া ও শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছে। এই ঈর্ষার বশেই অবশেষে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছেন। এই প্রেমিক বীরপুরুষটি সাধারণ মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি।

ঔরঙ্গজেব (রাজঃ ১।২)॥

ইতিহাসখ্যাত মোঘলসম্রাট ঔরঙ্গজেবকে বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসে প্রতিপক্ষের নায়ক-রূপে দাঁড় করিয়েছেন। সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব ১৬১৮ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অসুস্থতার সুযোগে ভ্রাতাদের দমন করে ১৬৫৮ খ্রীঃ "আলমগীর" অর্থাৎ "জগৎবিজেতা" নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। সুদীর্ঘকালের রাজত্বে তাঁর হিন্দুবিদ্বেষ এবং মারাঠা ও রাজপুতদের সঙ্গে সংঘর্ষ সুবিদিত। ১৭০৭ খ্রীঃ অত্যন্ত অশান্তির মধ্যে আহমদনগরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

ইতিহাসের সুস্পষ্ট একটি চরিত্রকে উপন্যাসে গ্রহণ করার অনেক অসুবিধা আছে। সাধারণত এসবক্ষেত্রে সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক সত্যের ব্যতিক্রম করলে উপন্যাসের রসহানি হবার সম্ভাবনা আছে, আলঙ্কারিকেরা যাকে বলেন সিদ্ধ রসের ব্যতিক্রম। বঙ্কিমচন্দ্রকে এজন্য বর্তমানকাল অবধি অনেক বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হলেও, ঔরঙ্গজেবের চরিত্র অঙ্কনে তিনি ঐতিহাসিক সত্য ও ঔপন্যাসিক কল্পনার সার্থক সমন্বয় ঘটাতে পেরেছেন।

ইতিহাসের ঔরঙ্গজেবের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ তাঁকে পরধর্মবিদ্বেষী, সঙ্কীর্ণচেতা ও

ও কূটকৌশলী বলে অভিহিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও 'রাজসিংহ' উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবকে পরধর্ম-বিদ্বেষীরূপে অঙ্কন করেছেন। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর আরোপ, হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও গো-হত্যার আদেশ তাঁর ধর্মদ্বেষের প্রমাণ দেয়। কিন্তু তাঁর অন্তঃপুরে রাজপুত মহিষীর হিন্দু আচরণ বা নির্মল-কুমারীর প্রতি সম্রাটের ব্যবহারের দ্বারা পরধর্মবিদ্বেষের রূপটি ততটা উগ্র হয়ে ওঠেনি। মানুষীর বর্ণনায় ঔরঙ্গজেব এক মহিষীর বাদশাহের অসুস্থতার সময় দেবদেবীর পূজার উল্লেখ আছে। কিন্তু তার ওপর ভিত্তি করে বলা যায় না যে ঔরঙ্গজেব অন্তঃপুরে হিন্দুয়ানী সর্বদাই সহ্য করতেন। তাছাড়া উপন্যাসের দিক দিয়েও ঘরে বাইরে ঔরঙ্গজেবের এরূপ বিপরীত আচরণ বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ঔরঙ্গজেব যেভাবে রাজসিংহের সঙ্গে সর্তভঙ্গ করে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, নিজ অন্তঃপুরের কলঙ্কমোচনের জন্য মবারকের প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়েছেন, তাতে তাঁর সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য ঔরঙ্গজেব যে সমস্ত কূটকৌশল প্রয়োগ করতেন তার দ্বারা তাঁর কুখ্যাতি ও সুখ্যাতি দুইই লাভ হয়েছে।

ঔরঙ্গজেবের উপর যেভাবে উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসার প্রভাব দেখান হয়েছে তাতে তাঁকে স্ত্রৈণ এবং স্বাধীনবুদ্ধিহীন সম্রাট বলে মনে হয়। কিন্তু এই ঘটনা যে একেবারে অনৈতিহাসিক তা নয়। ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে সম্রাট শাহজাহানের প্রতিনিধি ছিলেন তখন এক নর্ত্তকীর প্রতি তাঁর আসক্তি জন্মে। এই নর্ত্তকীর নাচ-গানে ও তার সঙ্গে সুরাপানে তিনি দিনরাত মত্ত থাকতেন। এই নর্তকীর মৃত্যুর পর তিনি নাকি মদ্যপান বর্জন করার এবং সঙ্গীত শ্রবণ না করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। (দ্রঃ Manucci's Storia de Mogor, vol. I, P. 231 Translated by William Irvine)

যদুনাথ সরকার, হীরাবাঈ নামক এক ক্রীতদাসী-কন্যার প্রতিও ঔরঙ্গজেবের দুর্বলতার কাহিনী বর্ণনা করেন। (দ্রঃ Sarkar, History of Aurangzib vol I, chap IV, P.65-66)। এই দুটি ঘটনাই ঔরঙ্গজেবের ৩৫ বৎসর বয়সের সময় দাক্ষিণাত্যে থাকাকালীন ঘটেছিল। সুতরাং পরবর্তী জীবনে তাঁর স্ত্রৈণ হওয়া অসম্ভব নয়। তাই একজন নির্মলকুমারীর প্রতি বৃদ্ধ ঔরঙ্গজেবের আসক্তির (প্রেমই বলা চলে) সম্ভাব্যতাকেও অস্বীকার করা যায় না। বরং এই ঘটনার দ্বারা ঔরঙ্গজেবের জীবনের ব্যর্থতা ও হতাশার রূপটিই যেন ফুটে উঠেছে। সব পেয়েও তিনি রিক্ত। পরবর্তীকালের ব্যর্থতার বীজ যেন তাঁর অন্তরের মধ্যেই সঞ্চিত ছিল!

উদিপুরীর প্রতি ঔরঙ্গজেবের দুর্বলতার বর্ণনা মানুষীর গ্রন্থে দেওয়া আছে।

রাজসিংহ কর্তৃক সঙ্কীর্ণ পার্বত্যপথে ঔরঙ্গজেব যেভাবে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তাকে অনেকে অনৈতিহাসিক এবং বঙ্কিমের মুসলমান বিদ্বেষের পরিচয় রূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বঙ্কিম বলেছেন তিনি এ ঘটনা অর্ম এবং মানুষীর বর্ণনা থেকে নিয়েছেন। সুতরাং ঘটনার সত্যাসত্য নিয়ে ঐতিহাসিকরাই মাথা ঘামাবেন। (দ্রঃ Orme: Historical Fragments of the Mogul Empire P. 85 83 এবং Mannucci's Storia De Mogor vol II 236-42 Translated by William Irvine)

উপন্যাসের দিক থেকে এ ঘটনার বর্ণনা যথাযথ হয়েছে। বাদশাহও যে মানুষ, তাঁরও যে প্রাণে ভয় আছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে তা' মুষিকের ন্যায় বন্দী ঔরঙ্গজেবের আচরণে যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনটি আর অন্য কোথাও হয়নি। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে ঔরঙ্গজেব যেভাবে সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করেছেন তাতে তাঁর চরিত্র আরও মসীলিপ্ত।

ঔরঙ্গজেবের ইতিহাসসম্মত চরিত্রবৈশিষ্ট্য অপেক্ষা, নির্মলকুমারীর প্রতি তাঁর অনুরাগ, মবারকের প্রতি ক্রোধ, ক্ষুধার্ত অবস্থায় নিষ্ফল আক্রোশ প্রভৃতি মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলিই, আমাদের অধিকপরিমাণে আকৃষ্ট করে। বঙ্কিমের হাতে ইতিহাসের ঔরঙ্গজেব সজীব হয়ে উঠেছেন।

কতলু খাঁ (দুর্গেঃ ১।৩) ॥

পাঠান নবাব কতলু খাঁ ঐতিহাসিক চরিত্র। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে তাঁর উপস্থিতি মাত্র তিনবার। অন্যান্যদের মুখে মুখেই তাঁর চরিত্র বর্ণিত হয়ে গেছে—তিনি অত্যাচারী ও লম্পট। বীরেন্দ্রসিংহের বিচারের দৃশ্যে কিন্তু আমরা কতলু খাঁকে দেখেছি রাজোচিত গাম্ভীর্যের মধ্যে। নিজের জন্মদিনে সুরাপানোন্মত্ত কতলু খাঁকে আমরা বিলাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে দেখলাম। এ দৃশ্যটি যেন অত্যন্ত নাটকীয় মনে হয়। সবশেষে কতলু খাঁর মৃত্যুদৃশ্যে হঠাৎ এ চরিত্রের একটা মহান দিক দেখা গেল। তিনি জগৎসিংহকে বলে গেলেন তিলোত্তমা 'পবিত্রা'। অবশ্য এর পিছনে তাঁর কন্যা আয়েষার হাত কতখানি সে বিষয়ে সঠিক ধারণা করা যায় না। কারণ কতলু খাঁ যখন জগৎসিংহের সঙ্গে সন্ধিপ্রস্তাবে কৃতকার্য হলেন, তখন স্বস্তিলাভ করলেন। সেখানে বঙ্কিম এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন—"জগৎসিংহ চলিয়া যান, আয়েষা মুখ অবনত করিয়া পিতাকে কি কহিয়া দিলেন। কতলু খাঁ খাজা ইসার প্রতি চাহিয়া আবার প্রতিগমনকারী রাজপুত্রের দিকে চাহিলেন। খাজা ইসা রাজপুত্রকে কহিলেন, "বুঝি আপনার সঙ্গে আরও কথা আছে।"

এই বর্ণনা থেকে বোঝা মুশকিল যে তিলোত্তমার পবিত্রতার কথা জগৎসিংহকে জানানতে কতলু খাঁ, না আয়েষা—কার প্রয়োজন বেশি ছিল।

যাই হোক, এই উপন্যাসে স্বল্প উপস্থিতির মধ্যেও দোষে-গুণে মিশ্রিত কতলু খার চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কন্দর্প (রাজঃ ২।৩) ॥

প্রণয়ের দেবতা। এর সৌন্দর্যের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ইনি কামদেব মদন নামেও পরিচিত। এর পত্নী রতি। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। হরকোপানলে ইনি ভস্মীভূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে রুক্মীণীর গর্ভে প্রদ্যুম্নরূপে ইনি পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন।

কপালকুণ্ডলা (কপাঃ ১।৫) ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নায়িকা এবং প্রাণকেন্দ্র হোল কপালকুণ্ডলাচরিত্র। বঙ্কিম তার সমস্ত শিল্পকর্মের মাধুর্য দিয়ে এই চরিত্রটিকে গড়ে তুলেছেন। আবার বঙ্কিমের আদর্শের

অভিজ্ঞতা হিসাবেও কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য।

কপালকুণ্ডলার চরিত্ররচনার পূর্বে বঙ্কিমের মনে একটি তত্ত্বের উদয় হয়েছিল। সে তত্ত্বটি হল প্রাকৃতিক পরিবেশে গঠিত নারীকে জন সমাজে এনে স্থাপন করলে তার অবস্থাটি কেমন দেখায় তার পরীক্ষা। তিনি এ সম্বন্ধে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ও বন্ধু দীনবন্ধুকে প্রশ্ন করেন। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র ব্যাপারটিকে পরিহাস করে উড়িয়ে দেন। (দ্রঃ বঙ্কিমজীবনী : শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। তারপরই বঙ্কিম তাঁর চিন্তার পরীক্ষারূপে সৃষ্ট করেন এই চরিত্রকে। এ পরীক্ষা বঙ্কিমের পূর্বে অনেকেই করেছেন। কালিদাসের শকুন্তলা তপোবনের শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতিতে লালিত পালিত। সেই প্রকৃতির কাছে স্থৈর্যের শিক্ষালাভ করে পরবর্তী জীবনের আলোড়নে শকুন্তলা স্থির থাকতে পেরেছে। সেক্সপীয়রের 'টেম্পেষ্ট' নাটকের মিরাণ্ডাও নির্জন দ্বীপে অনেক সময় কাটিয়েছে। তার জীবনেও নির্জনতা ও ব্যর্থতার হাহাকার এনে দেয় নি। কিন্তু কপালকুণ্ডলার চরিত্র অন্যতর পরিণামমুখি হয়েছে।

সাধারণভাবে কৌতূহল তৃপ্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারীর দ্বারা কপালকুণ্ডলার পূর্ববৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন—"ইনি ব্রাহ্মণকন্যা।...ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এ সমুদ্রতীরে ব্যক্ত হয়েন।...কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন। ইনি এ পর্যন্ত অনূঢ়া ; ইহার চরিত্র পরম পবিত্র।" (১।৮)

কপালকুণ্ডলার প্রথমজীবনে আছে প্রকৃতির পরিবেষ্টনী ভয়ঙ্কর কাপালিকের সান্নিধ্যে কপালকুণ্ডলা মানুষ হয়ে উঠলো সমুদ্রতীরবর্তী নির্জন অরণ্যে। কপালকুণ্ডলার দেহসৌন্দর্যের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন সেই প্রকৃতির রূপ। তার অবিন্যস্ত কেশরাজির বারংবার বর্ণনা আমাদের প্রকৃতির অবিন্যস্ত কেশরাজির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তার সৌন্দর্য ও স্বভাবের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির স্নিগ্ধ শ্যামলিমা। কাপালিকের চরিত্র তার উপর প্রভাব বিস্তার করেনি, তবে কোথাও খানিকটা ছায়াপাত করেছে। কাপালিকের সান্নিধ্যে থেকেই কপালকুণ্ডলার ঈশ্বর বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। তাই স্বামীগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে দেবতার বিরূপতা তার মনকে বিষণ্ণ করে। আবার আকাশে ভবানীর প্রতিরূপ দর্শন করে তার মন আত্মাহুতি দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। তা ছাড়া কপালকুণ্ডলার নির্ভিক চিত্ততা এবং দৃঢ় অনমনীয় মনোভাবও মনে হয় কাপালিক সূত্রে প্রাপ্ত।

সরলতা কপালকুণ্ডলা চরিত্রের অন্যতম দিক। মতিবিবির দেওয়া মহার্ঘ গহনাগুলি অনায়াসে ভিখারীকে দান করে দেওয়ায় তার সংসার অনভিজ্ঞতা ও সরলতার পরিচয় পাই। নবকুমারকে কাপালিকের হাত থেকে রক্ষা করার ঘটনা একদিকে কপালকুণ্ডলার সরলতা ও সহানুভূতিশীল মনোবৃত্তির পরিচায়ক!

কপালকুণ্ডলা চরিত্রের আর একটি দিক হল তার পরোপকারের প্রবৃত্তি। এই পরোপকারের বৃত্তির ফলেই ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে নবকুমারের বিবাহ হয়েছে। আবার শ্যামার সুখের জন্য রাত্রিকালে ঔষধ সন্ধানের সময় নবকুমারের মনে সন্দেহ উৎপাদন করেছেন। শেষপর্যন্ত মতিবিবির উপকার সাধনের জন্যই কপালকুণ্ডলা স্বামীর উপর অধিকার ত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়েছে।

কপালকুণ্ডলার মধ্যে কি শেষপর্যন্ত স্বামীপ্রেম জেগেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট

করে কোথাও দেননি। নবকুমারকে বিবাহ করার মধ্যে কপালকুণ্ডলার যে হৃদয়বৃত্তির তাড়না ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়না। অধিকারীর তাগিদই এখানে প্রধান। অধিকারীর কাছে বিবাহ সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ নিয়েই (তাও সে ভালভাবে বুঝেছে মনে হয় না) তার সংসারীজীবনের সুরু।

সংসারীজীবনে প্রবেশের মুখে অজ্ঞাতকুলশীলা এই রমণীকে নিয়ে, সংসারে যে আলোড়নের সুযোগ ছিল, সেরকম কিছুই হয়নি। ননদিনী শ্যামার সুমধুর সান্নিধ্যে দিনগুলি বেশ কাটছিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মনে প্রণয় ও পত্নীভাবের সাক্ষাৎ তখনো কোথাও পাওয়া যায় না। চতুর্থ খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদে একবার বঙ্কিম 'কপালকুণ্ডলার হৃদয়সমুদ্রে যে তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল' তা গণনা করার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু সেখানেও কাপালিকের ছবি। আবার চতুর্থ খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা—"অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় তো নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না।" জীবনের শেষলগ্নে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কপালকুণ্ডলা নবকুমারের জন্য কোন আবেগ প্রকাশ করেননি। তাই বঙ্কিমপ্রদত্ত 'মৃন্ময়ী' নাম সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়।

কিন্তু, কপালকুণ্ডলার মধ্যে এই প্রণয়, পত্নীভাব ও মাতৃভাবের অভাব দেখা গেলেও তাকে শুষ্ক-কঠোর মনে হয় না। এ অভাব পূরণ করেছে—তার সরলতা, পবিত্রতা ও করুণা।

কপালকুণ্ডলা ঘরণী নয়, যোগিনী। সত্য নয় স্বপ্ন। কপালকুণ্ডলা রোমান্টিক কবি মানসের রোমান্টিক নায়িকা।

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে সৌন্দর্যতত্ত্ব

কণিকা সিংহ

সুন্দরের প্রতি মানুষের সহজ ও চিরন্তন আকর্ষণ। কিন্তু মানুষ কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য উপভোগ করেই নিবৃত্ত হয় না। তার বিশ্লেষণধর্মী মন সৌন্দর্যের রহস্য উদ্ঘাটন করে তার বিচার বিশ্লেষণ করে তার কৌতুহল চরিতার্থ করতে চেষ্টা করেছে। সৌন্দর্যের তত্ত্বান্বেষণের এই অনন্ত প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করেই সৃষ্ট হয়েছে নন্দনতত্ত্বের রত্নভাণ্ডার।

সৌন্দর্য সম্বন্ধে মনে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নের উদয় হয় তা হ'ল সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ কি? এই প্রশ্নটি নন্দনতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'লেও এ সম্বন্ধে কোন স্থির মীমাংসায় পৌছান সম্ভবপর হয় নি। সৌন্দর্য-রহস্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেছেন—"সৌন্দর্য-রহস্যকে বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করবার অসাধ্য চেষ্টা করব না।"

বাস্তবিকপক্ষে আজ পর্যন্ত সৌন্দর্যের কোন সংজ্ঞাই পণ্ডিত সমাজে সর্বসম্মতরূপে গ্রাহ্য হয় নি। পাশ্চাত্য দার্শনিক Bosanquet তাঁর A History of Aesthetics গ্রন্থে বলেছেন—"There is no definition of beauty which can be said to have met with universal acceptance."

আরও দুঃখের বিষয় এই যে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌গণ সৌন্দর্য সম্বন্ধে প্রায় কোন ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক ও সুসংবদ্ধ আলোচনা করেন নি। একমাত্র সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ সৌন্দর্য সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্ত অপ্রচুর। জগন্নাথের আগে যাঁরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অভিনব গুপ্ত, ক্ষেমেন্দ্র, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বনাথ, কুন্তক প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে চমৎকার, রমণীয়, সৌন্দর্য, শোভা, চারুতা, প্রভৃতি শব্দ সৌন্দর্যের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

অভিনব গুপ্ত ধ্বন্যালোকের বিখ্যাত টীকা 'লোচনে' রসকে চমৎকার স্বরূপ এবং আনন্দকে তার পর্যায় শব্দ বলে বর্ণনা করেছেন। সমগ্র 'লোচনে' "চমৎকার" শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। অভিনব গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমেন্দ্র তাঁর "কবি কণ্ঠাভরণ" নামক গ্রন্থে কাব্যকে চমৎকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। চমৎকারকে তিনি অবিচারিত রমণীয়, বিচারিত রমণীয়, সমস্ত মুক্তব্যাপী, সূক্তৈকদেশদৃশ্য, শব্দগত, অর্থগত, শব্দার্থগত, অলংকারগত, রসগত এবং প্রখ্যাত বৃত্তিগত—এই দশ ভাগে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু তিনি চমৎকারের কোন সংজ্ঞা নির্ণয় করেন নি। তাঁর মতে চমৎকারবিহীন কাব্য, অকাব্য। অতএব প্রকৃত পক্ষে ক্ষেমেন্দ্র চমৎকারের ওপরই কাব্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

বিশ্বেশ্বর তাঁর 'চমৎকারচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম এ সম্বন্ধে খানিকটা সুসংবদ্ধ আলোচনা

করেছেন। তাঁর মতে কাব্যপাঠ করবার ফলে সহৃদয়ের চিত্তে যে আনন্দের অনুভূতি হয়, তারই নাম চমৎকার। চমৎকারের অবলম্বন স্বরূপ তিনি রীতি, গুণ, রস প্রভৃতি পদার্থ স্বীকার করেছেন। অতএব তাঁর মতে রস চমৎকারাত্মক নয়, চমৎকার প্রতিপাদক।

ক্ষেমেন্দ্র চমৎকারকে চিত্তের বিস্তাররূপে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে বিশ্বনাথও ক্ষেমেন্দ্রর মত অনুসরণ করে বলেছেন—"চমৎকারাশ্চিত্ত বিস্তাররূপঃ।" কাব্যপাঠের ফলে আনন্দের উপলব্ধি হওয়ায় আমরা লৌকিক হেতু পরিত্যাগ ক'রে সেই আনন্দানুভূতির জনক কোন লোকোত্তর হেতুর অনুসন্ধান করি। এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত চিত্তের যে বিস্তৃতি ঘটে তা-ই চমৎকার।

চমৎকার শব্দটির ঋতুগত কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ডঃ রাঘবনের মতে চমৎকার শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ থেকে। কোন অম্লদ্রব্য আস্বাদন করবার পর জিহ্বা এবং তালুর সংস্পর্শে যে একটি শব্দ করা হয় তা থেকেই চমৎকার শব্দটি কালক্রমে উৎপন্ন হয়েছে। সুন্দর-শব্দটির অর্থ যা চিত্তকে দ্রবীভূত করে (সুষ্ঠু উনত্তি আর্দ্রী-করোতি ইতি সুন্দরম্—শব্দ কল্পদ্রুমঃ)।

চমৎকার, সৌন্দর্য, বা রমণীয়তার স্বরূপ সম্বন্ধে নানা রকম মতভেদের অবকাশ থাকলেও সাহিত্য বা শিল্পের সৌন্দর্য যে লৌকিক বা ব্যবহারিক জীবনের সৌন্দর্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সে সম্বন্ধে সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে মতদ্বৈধ নেই। লৌকিক অনুভূতির সঙ্গে সর্বদাই কোন না কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকে। কিন্তু সাহিত্যে তথা শিল্পে সৌন্দর্যানুভূতি ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ যুক্ত একটি লোকোত্তর বস্তু। কেবল মাত্র তাই নয়, প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণা দিয়ে সাহিত্যে সৌন্দর্যের মান নির্ণয় করা যায় না। লৌকিক জীবনে আমাদের পক্ষে যা দুঃখকর অর্থাৎ যা ইষ্টের সঙ্গে বিয়োগ এবং অনিষ্টের সংগে সংযোগ ঘটায়—তাকে অসুন্দর বলে মনে হয়। এইজন্যই প্রিয়জনের মৃত্যু, মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ অথবা অপরিচ্ছন্ন পথের দৃশ্য আমাদের আনন্দ দেয় না। এদের আমরা অসুন্দর বলি। কিন্তু সাহিত্যে আমরা বিয়োগান্ত ঘটনা দেখে আমরা আনন্দ পাই এবং আনন্দ পাই বলেই বার-বারই তা দেখতে যাই। এইজন্য সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন—

করুনাদাবপি রসে জায়তে যৎপরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥

এইজন্য যখন এই সমস্ত দুঃখদায়ক বা অপ্রীতিকর ঘটনাকে আমরা কাব্যের মাধ্যমে দেখি তখন সে গুলোও একটি সুন্দর গোলাপের মতই আমাদের আনন্দ দেয়। এই রকম প্রচলিত ধারণার উর্দ্ধে উঠতে পারে বলেই সাহিত্যে সৌন্দর্যের পরিধি বিস্তৃততর।

এই "রমণীয়তা" বা "চমৎকার" কাব্যের বাইরের অঙ্গবিন্যাসমাত্র নয়। নারীদেহে লাবণ্যের মত তা এমন একটি আন্তর বস্তু যা কাব্যের বিভিন্ন অবয়বগুলিকে পরিব্যাপ্ত করে থাকলেও তাদের অতিরিক্ত একটি পদার্থ—"লাবণ্যং হি নামাবয়বসংস্থানাভিব্যন্দ্য মবয়বাতিরিক্তং ধর্মান্তরমেব।" —(ধ্বন্যালোক)। এই হিসেবে দেখতে গেলে সৌন্দর্য বস্তুধর্মী অখণ্ড একটি তত্ত্ব। এই মতের

সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতবাদের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তিনি বলছেন—"অনুভূতির বাইরে দেখতে পাই, সৌন্দর্য অনেকগুলি তথ্যমাত্রকে অর্থাৎ ফ্যাক্ট্‌স্‌কে অধিকার করে আছে। সেগুলি সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়। গোলাপের আছে বিশেষ আকার—আয়তনের কতকগুলি পাপড়ি, বোঁটা, তাকে ঘিরে আছে সবুজ পাতা। এই সমস্তকে ঘিরে বিরাজ করে এই সমস্তের অতীত একটি ঐক্যতত্ত্ব, তাকে বলি সৌন্দর্য।"—(সাহিত্যের পথে, সাহিত্যতত্ত্ব)।

অতএব দেখা গেল সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌দের মতে সৌন্দর্য বস্তুধর্মী। একমাত্র রাজনক কুন্তকের ক্ষেত্রে এই মতবাদের ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। তাঁর বিচারে সৌন্দর্যের ব্যক্তিধর্মিতা পরিস্ফুট। গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় রসের তত্ত্বের মধ্যে এই বস্তুধর্মিতার বীজ নিহিত আছে। ব্রহ্মকে বলা হয়েছে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ এবং আমাদের জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এই সত্য শিব সুন্দরেরই বিবর্তন। দার্শনিক চিন্তাধারা বাদ দিয়েও মনস্তাত্ত্বিক জগতেও আমরা একই বিবর্তন লক্ষ্য করতে পারি। সুন্দরেরই ক্রমবিবর্তন মানবহৃদয়কে নানাপ্রকার রসভাব সমন্বিত করেছে। মনস্তাত্ত্বিক জগতে এই রসভাবের আস্বাদন একটি বাস্তব ঘটনা। আলংকারিকদের মতে এই রসাস্বাদনের মূলে আছে সহৃদয়তা, অর্থাৎ সাহিত্য পাঠ করে রসের আস্বাদগ্রহণ তখনই সম্ভবপর হয় যখন পাঠকের হৃদয়ে কবির হৃদয়ের অনুরূপ অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। অভিনব গুপ্তের ভাষায় পাঠকের তখন তন্ময়ীভবন ঘটে। কবির হৃদয়ের সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ের এই সাযুজ্য আছে বলেই সাহিত্য পাঠ করে আমরা আনন্দ পাই। যাদের মধ্যে সহৃদয়তা নেই, আলংকারিকদের মতে তারা সাহিত্যপাঠের অনধিকারী। এই সহৃদয় সংবেদ্যতাই কাব্যে রসবত্তার অন্যতম প্রমাণ এবং এই রসরূপ সৌন্দর্য আয়ত্ত করবার জন্য কবি এবং পাঠক উভয়কেই অনুরূপ যত্নবান হতে হবে।

জগন্নাথ সৌন্দর্যকে রসাত্মক বলে স্বীকার করেননি। সৌন্দর্য্য বা রমণীয়তার পরিধি তাঁর মতে রস অপেক্ষা বিস্তৃততর এবং রমণীয়তার উপরই তিনি কাব্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। কাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথের মত খণ্ডন করে বলেছেন—"যত্তু রসবদেব কাব্যম্—ইতি সাহিত্য দর্পণে নির্নীতম্ তন্ন, বস্তলংকার প্রধানানাং কাব্যানামকাব্যত্বাপত্তেঃ" (রসগঙ্গাধর) অর্থাৎ কেবলমাত্র রসবত্তার উপরই যদি কাব্যের ভিত্তি স্থাপন করা যায় তবে বস্তুপ্রধান এবং অলংকার প্রধান যে সমস্ত রচনা রসবাদীদের মতেও কাব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে, তারা কাব্য-পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। আবার এ-ও বলা চলে না যে প্রত্যেক বাক্যেই কোনো না কোনো-রকমভাবে রসের স্পর্শ অবশ্যই থাকে, কারণ তা না হলে আমাদের লৌকিক বাক্যগুলোও কাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। অতএব রসবত্তা কাব্যের লক্ষণ হলে লক্ষণটি অব্যাপ্ত দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। এইজন্য তিনি কাব্যের লক্ষণ স্থির করেছেন "রমণীয়ার্থ প্রতি-পাদকশব্দঃ কাব্যম"—(রসগঙ্গাধর) অর্থাৎ যে শব্দসমষ্টি রমণীয় অর্থ প্রতিপাদন করে তাকেই বলা হয় কাব্য।

নন্দন তত্ত্বের গোড়ার কথা হল অন্তর্নিহিত কোন একটি বিশেষ ভাবের অনুভূতি। যা এই অন্তর্নিহিত ভাবকে জাগ্রত করে অনুভূতির সামগ্রী করে তোলে তাকেই বলা যেতে পারে শিল্প। শিল্পমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম হল লোকের হৃদয়ে আনন্দদান করবার ক্ষমতা। একেই জগন্নাথ বলেছেন

রমণীয়তা। তিনি রমণীয়তার লক্ষণ করেছেন লোকোত্তরহ্লাদজনক জ্ঞান-গোচরতা। রমণীয়তা একটি বিশেষ জ্ঞান। এর অনুভূতি লৌকিক আনন্দানুভূতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি স্বতন্ত্র জাতি অর্থাৎ প্রকার বিশেষ। একটি কেবলমাত্র সহৃদয় সংবেদ্য অর্থাৎ সহৃদয়ের হৃদয়ানুভূতি ব্যতীতও এটি অন্য কোন লৌকিক প্রমাণগণ্য নয়। জগন্নাথের মতে রমণীয়তা আনন্দাত্মক নয়। রমণীয়তা কারণ, আনন্দ তার কার্য।

রমণীয়তা সম্বন্ধে আলোচনায় জগন্নাথ আর বেশী দূর অগ্রসর হন নি। কিন্তু সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে জগন্নাথই সর্বপ্রধান, যিনি সৌন্দর্যের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এবং সমস্যাটিকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এর সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। এইদিক থেকে ভারতীয় সাহিত্য-তত্ত্ব জগন্নাথের কাছে প্রভূত পরিমাণে ঋণী।

পরিশেষে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় চিন্তাধারা বিশ্বের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে একমাত্র ব্রহ্মরূপ সত্যকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে। আগে বলা হয়েছে বিশ্বের এই অনন্ত বৈচিত্র ব্রহ্মার সুন্দর রূপেরই প্রকাশ মাত্র। এই সৌন্দর্যকেই কবি প্রকাশ করেন কাব্যে, শিল্পী প্রকাশ করেন চিত্রে, সঙ্গীতে নৃত্যের ছন্দে। মানব মনেতেও এই পূর্ণ সৌন্দর্যেরই প্রকাশ। কাব্য বা শিল্পের সৌন্দর্য মানবমনের অন্তর্নিহিত এই সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করে, এবং তাকে শুদ্ধ চৈতন্যে উদ্‌বোধিত করে। অতএব এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে কাব্যের সৌন্দর্য মানুষকে পূর্ণতার স্বরূপের পথে নিয়ে যায়। এইজন্য ভারতীয় কাব্য তত্ত্ববিদ্‌গণ যখনই সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করেছেন তখনই তা শুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে অতিক্রম করে শুদ্ধ দার্শনিক চিন্তাধারায় পর্যবসিত হয়েছে।

সাহিত্য পাঠের প্রারম্ভিক কথা

সাহিত্য পাঠের প্রারম্ভেই পাঠকের জানা উচিত যে সাহিত্য বলতে কোন ধরণের রচনা-কাজকে বোঝানো হয়।

এ বিষয়ে বলা যায় যে সাহিত্যের প্রথম লক্ষণীয় জিনিস হচ্ছে তার বিষয়বস্তু—সেই বিষয়বস্তু উপস্থাপনের রীতি যেন সাধারণ মানুষের স্বার্থ-অনুসারী হয়; আর এ বিষয়ে দ্বিতীয় লক্ষণীয় জিনিস হচ্ছে, সেই বিশেষ উপস্থাপন ভঙ্গির ফলে জাত আনন্দের ধরণের বৈশিষ্ট্য।

একটি সাহিত্যগত রচনার সঙ্গে অন্য একটি বস্তুগত রচনার তুলনা করলে ওপরের বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে। যেমন দেখা যায়, একখানি দর্শনশাস্ত্রের অথবা ইতিহাসের কিংবা জ্যোতির্বিদ্যার বইয়ের সঙ্গে একখানি উপন্যাস বা নাটক অথবা ছোট গল্পের বইয়ের মূল তফাতই হচ্ছে, প্রথমোক্ত বইগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান বিতরণ করা এবং সে জ্ঞান সর্বসাধারণের পক্ষে বোধগম্য নয়, বিশেষ শ্রেণীর বোদ্ধার পক্ষেই তা আয়ত্ত করা সম্ভব; বিপরীতক্রমে শেষোক্ত ধরণের রচনার আবেদন যাতে নারী-পুরুষ নির্বিচারে সকল মানুষের কাছে এবং জ্ঞান বিতরণ নয়, বিষয়বস্তু উপস্থাপনের বিশেষ ভঙ্গির সাহায্যে মানুষের সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তি সাধনেই হয় এই শ্রেণীর রচনার চরিতার্থতা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষ সাহিত্য পাঠ করতে ভালবাসে কেন? মুখ্যত্য সাহিত্য হচ্ছে শিল্পীর লেখনী দিয়ে আঁকা মানুষের জীবনের প্রতিফলন মাত্র। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পাঠক এই বিরাট জগতের বৃহৎ মানবগোষ্ঠির সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হয়; কারণ সাহিত্য তো ভাষার মাধ্যমে জীবনের ছবি আঁকা! আর এইখানেই হচ্ছে সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির মূল তফাত। অর্থাৎ সাহিত্য জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে জাত। অথবা এই কথাটাকেই অন্যভাবে বলা যায় যে জীবন থেকেই সাহিত্যের উৎপত্তি; অথবা বলা যায়, জীবনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সৃষ্ট বিচিত্র মানসিক অনুভূতিতে সৃষ্টি হয় বিচিত্র ধরণের সাহিত্যরাজি। এর থেকে বোঝা যায়, সাহিত্যের যে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে সেগুলির মূলে আছে তাদের রচনার পটভূমিতে অবস্থিত সাহিত্যিকের মানসিক অনুভূতির বিচিত্রতা এবং সেই বিচিত্রতার মূলে আছে—প্রথমত, নিজেকে প্রকাশের ইচ্ছা। দ্বিতীয়ত, আশেপাশের মানুষ এবং তাদের কাজকর্মের বিষয়ে আগ্রহ। তৃতীয়ত, একই সঙ্গে বাস্তব জগত ও কল্পনার জগতের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ। চতুর্থত, রূপকল্পের প্রতি একান্ত অনুরাগ।

আরো বিশদভাবে এই কথাগুলো বলতে হলে বলা উচিত যে, স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক মানুষ চায় তার নিজের ভাবনা-চিন্তার বৈশিষ্ট্যটি খুব বড় করে সকলের সামনে তুলে ধরতে। তারই ফলে, সাহিত্যের মধ্যে খুব স্পষ্ট করে পাওয়া যায় সাহিত্যিকের আপন ধ্যান-ধারণার কথা।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক মানুষেরই অদম্য কৌতূহল থাকে অপর মানুষ বা মানুষ-সমাজের জীবনরীতি, তাদের আবেগ-অনুভূতি, তাদের আচার-আচরণের কথা জানবার। তারই কারণে সাহিত্যিক উৎসাহী হয় মানুষের জীবন এবং কাজকে ভাষার ফ্রেমে ধরে রাখতে।

তৃতীয়তঃ কল্পনার জগতে মানুষের বিচরণ তার আপনার কাছেও বড় মনোহর, চমকপ্রদ; তাই মানুষের রচনায় স্বাক্ষরিত হয় তার আপন কল্পনাশক্তির নৈপুণ্য; সাহিত্য হয় বর্ণনাময়।

আন্তরিক তাগিদে, অদম্য কৌতূহলে, কল্পনার বিচিত্র রঙে আঁকা এই সাহিত্য অবশ্য 'যথার্থ সাহিত্য' হয়ে ওঠে সৌন্দর্য অনুভূতির মহৎ রসায়নে; এবং সেইগুণেই সাহিত্য হয়ে ওঠে শিল্পকলা বা অর্থ।

সাহিত্য রচনার পটভূমিতে বর্তমান যে চারটি তাগিদের কথা এতক্ষণ আলোচিত হলো তার মধ্যে শেষ সূত্রটি সাহিত্যের সকল বিভাগ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু আগের তিনটি সূত্রের অবস্থিতি সকল প্রকার সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবশ্যিক নয়। এবং এই তিনটি সূত্রের ইতর বিশেষ বা উপস্থিতি অনুপস্থিতির নিরিখেই লিরিক কবিতা ও এপিক কবিতা, বা নাটক ও বর্ণনাত্মক প্রবন্ধের পার্থক্য স্থিরীকৃত হয়; সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ নিরূপণের মূলে থাকে সাহিত্যিকের এই অনুভূতির কথা।

অবশ্য এই অনুভূতির নিরিখ মূল কথা হলেও মুখ্য কথা নয়, অথবা সব কথা নয়।

সাহিত্য রচনার পটভূমিতে বিরাজমান সাহিত্যিকের অনুভূতির বিষয় যেমন জানা দরকার; বিচার্য সাহিত্যের বিষয়বস্তুর প্রতিও তেমনি লক্ষ্য করা দরকার। যেমন, সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিলিখন; অথবা পাপপুণ্য, ভগবান, ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ইহকাল পরকাল, জন্মমৃত্যু ইত্যাদি বৃহৎ মানবচেতনার বিষয়; অথবা একের সঙ্গে অপরের বা বৃহত্তর সমাজের স্বার্থের বা সমস্যার প্রসঙ্গ; অথবা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক; অথবা বিভিন্ন পরিবেশে সাহিত্যিকের আপন অনুভূতির শৈল্পিক প্রকাশ সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। এই নিরিখে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, বিষয়বস্তুর বিচিত্রতার ফলে সাহিত্যের পাঁচ প্রকারের বৈচিত্র্য দেখা যায়।

আর এই বৈচিত্র্যের ওপর ভিত্তি করে মোটামুটিভাবে আরো বলা যায় যে ঐ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকাশ-ইচ্ছা থেকেই রচিত হয় গীতিকবিতা, লোক গাথা, সাধনসঙ্গীত, যুক্তিমূলক কবিতা আপন মতামত অনুসারে লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ, শ্রীমণ্ডিত সাহিত্য-সমালোচনা ইত্যাদি। আর বৃহৎচেতনাসমৃদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত হয় গাথাকাব্য, মহাকাব্য, ইতিহাস, জীবনী রোমান্টিক গদ্য পদ্য, গদ্য বা পদ্যে লেখা গল্প, উপন্যাস, নাটকাদি। এবং একের সঙ্গে অপরের বা বৃহত্তর সমাজের স্বার্থ অথবা সমস্যার প্রসঙ্গ থাকে প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদিরূপ বিভিন্ন বর্ণনাত্মক রচনায়।

ওপরের এই বিশ্লেষণ-কাজ থেকে এই কথাটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে সাহিত্যিকের মনোগত ভাব-ভাবনার ধারা রচনার শ্রেণী নির্ধারণের অনেকখানি নিয়ামক হয়। অবশ্য রচনা থেকে রচকের মনের গতির এইসব প্রাথমিক খবর জানবার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা বিষয় জেনে রাখা দরকার যে

কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি সবরকম সাহিত্য রচনার পিছনে রচকের মননের আরো চারটি বিশেষ দিক ক্রিয়া করে। সেই দিকগুলি হচ্ছে, রচকের বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ প্রবণতা, কল্পনাশক্তি ও ষ্টাইল বা গঠননৈপুণ্য, অর্থাৎ যে কোন সাহিত্যগত রচনার কালে সাহিত্যিক তার নিজস্ব আবেগ অনুসারে তাতে আবেগ সঞ্চারিত করেন, যাতে রচকের সেই আবেগ পাঠকের হৃদয়টি আবেগাকুল করে তোলে। আর সাহিত্যে সাহিত্যিকের কল্পনাশক্তির প্রকাশ না ঘটলে সে রচনা নাটকের কল্পনাপ্রবণতার উদ্বোধন করবে কেমন করে? এছাড়া সাহিত্যের গঠননৈপুণ্যের যে উল্লেখ করা হয়েছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। রচক যদি রচনাদক্ষ না হল, যদি তাঁর রচনা সমতা, সৌন্দর্য ও নিয়মের যোগে যথার্থ রমণীয় না হল, ষ্টাইল না থাকে তাহলে সে রচনার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতেই ব্যাঘাত ঘটে; তা হয় মৃতকল্প।

সাহিত্যের রস আস্বাদনই সাহিত্য-পাঠকের একমাত্র কাম্যবস্তু। কিন্তু সেই রস আস্বাদন কাজটি যাতে সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারে তার জন্য সাহিত্যের তত্ত্বগুলি আগে জেনে রাখা একান্ত কর্তব্য। সেইজন্য বর্তমান আলোচনার প্রথমেই সাহিত্যের ভাবাত্মক দিকগুলি সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া হয়েছে।

এবার সাহিত্যের মূল প্রসঙ্গের আলোচনায় আসা যেতে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধের মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে সাহিত্য হচ্ছে জীবনের প্রতিফলনমাত্র। অর্থাৎ সাহিত্যের উৎকর্ষতার অনেকখানি নির্ভর করে সেই সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনের পরমকান্তির ওপর। যে সাহিত্যে সূক্ষ্ম সংবেদনশীল দৃষ্টির অধিকারী সাহিত্যিক স্বচ্ছ বুদ্ধি ও গভীর আবেগের টানাপোড়েনে রচনা করেন পাতার পর পাতা, যার নতুন রঙের নতুন কারুকাজ পাঠকের দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে, হৃদয়কে উজ্জীবিত করে সেই সাহিত্যই পায় 'মহৎ' আখ্যা; সেই সাহিত্যিকই হন যথার্থ প্রতিভাধর ব্যক্তি।

এই কথাটা আরো সহজ করে এইভাবে বলা যায় যে, মহৎ সাহিত্য বলতে সেই সাহিত্যকেই বোঝায় যাতে কিছু অভিনব কথা অপূর্ব ভংগীতে অনপেক্ষভাবে বলা হয়েছে। আর এমনতর সাহিত্য কেবলমাত্র সেই প্রতিভাধরই রচনা করতে সক্ষম, যিনি অনন্যসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির গুণে দৃষ্ট জগৎকে রমণীয়রূপে পাঠকের দর্শন ও অনুভূতি গোচর করবার ক্ষমতার অধিকারী। এই কারণেই সাহিত্যের যথার্থ রস উপভোগ করতে হলে, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে হলে পণ্ডিত-সমালোচক হওয়ার আগে মর্মী-পাঠক হওয়া দরকার; নচেৎ সাহিত্য-পাঠকের সিদ্ধি হবে ব্যাহত।

সাহিত্য-পাঠকের কর্তব্য নির্দেশের কালে সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্বন্ধেও এখানে একটি বিশেষ কথা উল্লেখ করা উচিত যে শুধুমাত্র অভিনবত্বকেই সফল সাহিত্য রচনার একমাত্র চাবিকাঠি বলে যেন কেউ ভুল না করেন। অভিনবত্বের সঙ্গে থাকা চাই রচনার যথার্থতা, নিজস্বতা ও সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে সাহিত্যিক নিজে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তারই শৈল্পিক রূপদানে হয় সাহিত্য। অপরের অভিজ্ঞতা নিজের বলে চালিয়ে দিয়ে কেউ যদি চটকদার রঙচঙে সাহিত্য সৃষ্টি করেন তবে তা শিব হয় না, হয় বাঁদর; তার মেকিত্ব বোদ্ধা পাঠকের চোখে, রসিক পাঠকের চোখে নিশ্চয় ধরা পড়বে, প্রমাণিত হবে তার অসারতা।

সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে হলে সাহিত্য পাঠকালে যে রীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন এবার সে সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিতভাবে বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে যে সাহিত্য যাঁরা অধ্যয়ন করেন তাঁদের মধ্যে মোটামুটি দুই ধরণের অধ্যয়নকারী দেখা যায়। প্রথম দল তাঁদের অবসর সময়টুকু বিনোদনের জন্য হাতের কাছে যে বই পান তাই পড়ে থাকেন; অপর শ্রেণীর একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হয় সাহিত্যের যথার্থ রস আস্বাদন। সে কারণে প্রথম দলভুক্ত পাঠকদের মধ্যে কোন নিয়ম বা রীতির উৎপাত (!) নেই। কিন্তু শেষোল্লিখিত শ্রেণীর পাঠকেরা পাঠ করেন বিশেষ কোন লক্ষ্য অথবা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই তাঁরা সর্বদা বিশেষ একটা ধারা অবলম্বন করে, বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করে অধ্যয়নে তৎপর হন। এই দ্বিতীয় যে শ্রেণী তার পাঠকরাই হচ্ছেন যথার্থ সাহিত্যের মর্মজ্ঞ; তাঁদের অবলম্বিত পদ্ধতি নিঃসন্দেহে অনুসরণযোগ্য।

এখন প্রশ্ন, এই অনুসরণীয় পদ্ধতি কেমনতর?

এই পদ্ধতির প্রথম কথা হচ্ছে, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সাহিত্যপাঠককে প্রথমেই সেই সাহিত্যের স্রষ্টার সঙ্গে 'পরিচিত হবার' কারণে সাধারণতঃ দেখা যায়, সাহিত্যপাঠকেরা নিজের নিজের অভিরুচি অনুযায়ী সেই বিশেষ সাহিত্যিকের এক বা একাধিক রচনা পাঠ করে সেই সাহিত্যিক ও তাঁর রচনা সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেন। এটা কিন্তু যথার্থ পদ্ধতি নয়। প্রকৃত সাহিত্যপাঠকের উচিত, কোন একজন সাহিত্যিকের রচনা সম্বন্ধে যথার্থ স্থান লাভ করতে হলে, তাঁর রচনার ক্রম অনুসরণ করে সেগুলি পরের পর পাঠ করে দেখতে হবে উক্ত সাহিত্যিকের একটি রচনার সঙ্গে আরেকটির সম্বন্ধ কেমনতর, কিভাবে ধাপে ধাপে সাহিত্যিকের মেজাজ, তার আদর্শ রূপান্তরিত হয়েছে, বাস্তব অভিজ্ঞতা দিনে দিনে কেমনভাবে তাঁর চিন্তাধারাটি পরিবর্তিত ও প্রভাবিত করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপভাবে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে সাহিত্যপাঠ না করলে সাধারণভাবে পাঠের আনন্দ হয়তো পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু তাতে পাঠকের জ্ঞানের গভীরতা আসে না, সাহিত্যের মধ্য থেকে সাহিত্যিক মানুষটির খবর পাওয়া যেতে পারে না; তাঁর রচনার সম্যক তাৎপর্য সম্বন্ধে কোন ধারণা জন্মাতে পারে না। তবে প্রসঙ্গতঃ এখানে বলে রাখা যায় যে কোন সাহিত্যিকের সাহিত্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভেরজন্য সেই সাহিত্যিকের সমস্ত রচনাবলী পাঠের বিষয় যে বলা হচ্ছে সেই বিষয়ে স্মরণ রাখা দরকার, সমস্ত রচনাবলী বলতে যেন কেউ উক্ত সাহিত্যিকের ছেঁড়া কাগজের বাক্স থেকে, প্রকাশের অযোগ্য হওয়ায় বাতিল দেওয়ায় পাণ্ডুলিপির পাতা থেকে সংগৃহীত অংশটুকুও পড়বার কথা বলা হচ্ছে বলে মনে না করেন। সেই সব অফলা রচনা বা রচনাংশ মূল্য পায় কেবলমাত্র গবেষকদের কাছে; সাধারণ সাহিত্যরসিক পাঠককে তা নিয়ে ব্যস্ত হবার দরকার পড়ে না।

সাহিত্যরসিক পাঠকের পক্ষে পরবর্তী স্মরণীয় কথা হচ্ছে, বিশেষ সাহিত্যিকের রচনা পড়বার সময় শুধুমাত্র উক্ত সাহিত্যিকের রচনাগুলির প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখতে হবে, তা নয়। সেইসব রচনা পড়বার সময় স্বতঃই যাঁদের নাম মনে পড়বে তাঁদের বিষয়েও প্রয়োজনমত অল্পবিস্তর জানা ভাল। কারণ তাহলে উক্ত সাহিত্যিকের রচনা তুলনামূলকভাবে পাঠ করা সম্ভব হয়। যেমন রাজশেখর বসুর হাসির গল্প পড়বার সময় যদি ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি

মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির সরস রচনার বৈশিষ্ট্য পাঠকের স্মরণে থাকে ; অথবা কবি নজরুল ইসলামের কবিতা পড়বার সময় যদি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনার বৈশিষ্ট্যতা পাঠকের জানা থাকে তাহলে তিনি তুলনা করে করে রাজশেখর বসু বা কাজী নজরুলের রচনা আস্বাদন করতে পারবেন এবং সেই হচ্ছে সাহিত্যের রস উপভোগের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

সাহিত্যিকের কার্যকলাপ এবং মননের সঙ্গে পাঠকের পরিচিত হবার একটি বিশেষ সহায়ক 'জীবনী' সম্বন্ধে কিছু বলা এখানে নিতান্ত অবান্তর হবে না। প্রকৃত তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী সাহিত্যিক সম্বন্ধে মূল্যবান জ্ঞান দেয়,—সেই জ্ঞানের আলোতে মানুষ—সাহিত্যিককে বোঝা সহজ হয় ; তাঁর রচনার অন্তর্নিহিত সত্য অবলোকনের পথ সুগম হয়, তাঁর সঙ্গে সমসাময়িক কালের সমসাময়িক মানুষের সম্বন্ধ সরলভাবে বোঝা যায়। কিন্তু সাহিত্যপাঠককে স্মরণে রাখতে হবে, জীবনীমাত্রই সত্যভিত্তিক নয়। অনেক 'জীবনী'-ই সত্যের মতো করে লেখা নিছক মনোরম গল্পকাহিনী হয়ে থাকে। সেইসব ক্ষেত্রে ঐসব জীবনীকে সাহিত্যিকের রচিত রম্যকাহিনী বা কথাসাহিত্য হিসেবে বিচার করা দরকার। অবশ্য সাহিত্যপাঠক যাতে ভ্রমে না পড়েন তার জন্য এখানে আর একটি উল্লেখনের দরকার যে রমণীয়ভাবে রচিত হলেই যদি জীবনীকে জীবনীর মূল্য না দেওয়া হয় তাহলে সেটাও ভুল করা হবে। শুধুমাত্র নিরস কচকচি ভাষায় লেখাটাই জীবনী লেখার একমাত্র নিরিখ নয়। জীবনীও সাহিত্যের একটি বিভাগ। রম্যতা তার অন্যতম প্রয়োজনীয় অঙ্গ বটে। তবে প্রকৃত তথ্যের পরিবেশনই হচ্ছে জীবনীসাহিত্যের সর্বাধিক দায়িত্ব। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' এর ভাষা খুব সরস নয় বটে, কিন্তু তা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গল্পে পূর্ণ ভুল তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী ; অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' চারুভাষায় রম্যভংগীতে লেখা বিশেষ তথ্যপূর্ণ জীবনকথা।

এবিষয়ে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে কেবলমাত্র তথ্যসমৃদ্ধ জীবনকথা পাঠ করেই যেন কেউ তার উপর ভিত্তি করে সেই সাহিত্যিকের অন্যান্য রচনা বা তাঁর ব্যক্তিসত্বা সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনায় উদ্যোগী না হ'ন। জীবনী-সাহিত্য মানুষ-সাহিত্যিক ও তাঁর রচনা সম্বন্ধে ধারণা এনে দেবার বিশেষ সহায়ক হলেও কেবলমাত্র জীবনীপাঠই এবিষয়ে পূর্ণজ্ঞান দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না।

সাহিত্য রসিকের মননের সঙ্গে সাহিত্যিকের মননের সু-সম্পর্ক গড়ে তোলবার ব্যাপারে পরবর্তী জরুরী কথা হচ্ছে, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সাহিত্যিকের বিচিত্র ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়, তাদের কোনটার সঙ্গে আপনার-আমার মনের মিলন হয়, কোনটার সঙ্গে বা তা হয় না।

কিন্তু সেটাই তাঁদের রচনার বিচারের পক্ষে বড় কথা হতে পারে না। সেই বিচার কাব্য সার্থকতার সঙ্গে করতে হলে সাহিত্যরসিক-সমালোচকের উচিৎ প্রথমেই তাঁর আপন মানসিক গড়ন ঠিক করা, সহনশীলতার—অনুশীলন করা। সমালোচকের মনের সঙ্গে সাহিত্যিকের মনের মিল না ঘটলেও তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, তা' স্বীকার করতেই হবে ; বিপরীতক্রমে, সাহিত্যিকের মন বা মতের সঙ্গে মিল থাকলেও যদি সে রচনায় ত্রুটী থাকে তবে তা অবশ্যই পাঠককে জানাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সমালোচকের সমালোচনার রীতি হওয়া উচিত মোলায়েম এবং তার প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার সত্যের ওপর। সমালোচকের যথাক্রমে ভাল ও মন্দ লাগবার

নিরিখে সমালোচনা কেবলমাত্র প্রশংসাপূর্ণ অথবা নিন্দাপূর্ণ হলে চলবে না; যথার্থতাই হবে সমালোচনার মানদণ্ড এবং সমালোচনার পদ্ধতিতে গুরুর অনুশাসন অচল, যেখানে সাহিত্যরসিকের আস্বাদন কথাই সর্বেসর্বা। অতএব দৃষ্টির ও মনের প্রসারতা, রুচি ও বিচারবুদ্ধির সহনশীলতার চর্চা সমালোচকের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়; তা ব্যতিরেকে বিচিত্র মননজাত বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যের প্রকৃত রস অনুধাবন করা ও সাহিত্যের সার্থক সমালোচনা করা সম্ভব হতে পারে না।

সমালোচকের পক্ষে জ্ঞাতব্য সর্বশেষ কথা হচ্ছে, সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর রচনার ষ্টাইলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। রচনার ষ্টাইল, অর্থাৎ সাহিত্যিক তাঁর চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটান যেমন—ভাষায় যেমন—রূপে তাতে সাহিত্যিকের প্রতিভার বিশেষত্ব, চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়; সাহিত্যিকের বুদ্ধিগত, ভাবগত এবং শিল্পগত শিক্ষা-দীক্ষা ও রুচির পরিচয় দেয়। যত্নসহকারে রচনার ষ্টাইল নিরীক্ষণ করলে তার থেকে সাহিত্যিকের শিক্ষার প্রকৃতি, যে পরিবেশ এবং যাঁদের প্রভাবে ও সাহচর্যে উক্ত সাহিত্যিকের শিক্ষালাভ হয়েছে তার স্বরূপ, তাঁর প্রিয় পুস্তকাদি ও তাঁর পরিচিত মানুষদের প্রকার ইত্যাদি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সাহিত্যিকের রচনাগুলির রচনাকালের পারম্পর্য অনুসরণ করে যদি লেখাগুলি পরের পর পাঠ করা যায় তাহলে সেইসব রচনার ষ্টাইলের ক্রমপরিণতি থেকে তাঁর চিন্তার ক্রমিক গতি, জাগতিক সমস্যাদি সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টির ক্রমপরিবর্তন, শিল্প বিষয়ে তাঁর ভাব-ভাবনা ও মর্জির রূপ পরিবর্তন ইত্যাদির স্পষ্ট ফলন লক্ষ্য করা যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বনফুল, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যে-কোনো সাহিত্যিকের লেখার ষ্টাইল তাঁদের রচনার ক্রম অনুসরণ করে দেখলেই এ কথার গুরুত্ব বোঝা যাবে।

একই বক্তব্যকে একজন প্রকাশ করেন একরূপে, অপরজন প্রকাশ করেন অন্যরূপে। এখানেই রয়েছে ষ্টাইলের অবদান। আবার, সাধারণ মানুষ একটি বিষয়কে প্রকাশ করেন সাধারণভাবে, বিশেষ মানুষ সেই কথাটিকেই প্রকাশ করেন বিশেষভাবে; এর মূলে রয়েছে সাধারণ প্রতিভার সঙ্গে অনন্য সাধারণ প্রতিভার তফাৎ। সাধারণ প্রতিভা তাঁর সমসাময়িক লোকের ব্যবহৃত ভাষার রং-রূপ নিয়েই ভাষার ছবি আঁকেন; কিন্তু অনন্যসাধারণ প্রতিভা নিজের প্রয়োজনমত ভাষার নতুন রূপ দেন, সাধারণ ভাষাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে, দরকার মতো অলঙ্কার দিয়ে অথবা আভরণহীনা করে তাঁরা রচনার নতুন ষ্টাইল আনেন, ভাষার নতুন গড়ন দেন; যেমন করেছিলেন মধুসূদন অথবা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র অথবা অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। এঁরা যে-কথা বলেছেন তা হয়তো খুব সাধারণ কথা, কিন্তু প্রকাশনার বিশেষত্বে ষ্টাইলের গুণে তা হয়ে উঠেছে অসাধারণ কথা, তেমনতর কথা তাদের সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যে হয়ে উঠেছে তাঁদের নিজের কথা, ভাষার অপূর্ব সম্পদ।

ষ্টাইলের বৈশিষ্ট্য সাহিত্যিকের দোষগুণ দুয়েরই পরিচয় দেয়; সাহিত্যিকের চিন্তার অনন্যসাধারণতা অথবা দৈন্য, তাঁর দৃষ্টির প্রসারতা অথবা সঙ্কীর্ণতা, তাঁর মননশক্তির কৃত্রিমতা অথবা সৃজনীগুণ—সবকিছুরই খবর মেলে রচনার এই ষ্টাইলের মাধ্যমে তাই লেখার ষ্টাইল লেখকের ব্যক্তিত্বের সূচক; লেখকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ষ্টাইলের রয়েছে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক।

গীতা পাল

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য জিজ্ঞাসা

সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যোপলব্ধির গূঢ় ব্যাপারটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা প্রখর মনস্বীতার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করে গেছেন। বৈজ্ঞানিক ও নৈয়ায়িক পদ্ধতিতে এই ব্যাপারটিকে একটি সুস্পষ্ট সূত্রের মধ্যে উপস্থাপিত করে গেছেন। পৃথিবীর সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার ধারায় ভারতীয় পণ্ডিতদের এই অবদান অবিসংবাদিত কৃতিত্বের স্বাক্ষররূপে গণ্য। অবশ্য সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের বিভিন্ন আলোচনার বিস্তৃত সমুদ্রে তাঁদের উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টির এই আবিষ্কার আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, একথা অনস্বীকার্য। সাম্প্রতিককালে, যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে, সেই বিস্তৃত আলোচনার বিপুল জটিলতার মধ্যে থেকে যথার্থ সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়েছে। আমাদের সাহিত্য, যেহেতু ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ধারাকে অনুসরণ করে চলেছে, তাই দুইয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে আমাদের সাহিত্যের উপযোগী একটি তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রবণতাও লক্ষ্য করা গেছে।

সাহিত্য-তত্ত্বালোচনার দুটি দিক আছে। এক হলো সাহিত্যসৃষ্টির রহস্য। দ্বিতীয় দিকটি হলো, সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ ও তাদের বৈশিষ্ট্যালোচনা। সংস্কৃতে প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে এত বিস্তৃত ও জটিল আলোচনা হয়েছে যে সঠিক পথ হারিয়ে ফেলবার প্রভূত সম্ভাবনা। এতে করে যেমন উন্নত চিন্তাশক্তির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি ভারতীয় চিন্তাধারার cul de sac হওয়ার কারণও স্পষ্ট হয়েছে।

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। রসাত্মক বাক্যই কাব্য—এই হোল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের মূলসূত্র। রসং হ্যে বায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি। রসোপলব্ধির আনন্দে লেখক করেন সাধারণ ভাষার মাধ্যমে রসসৃষ্টি, পাঠক তা পাঠ করে করেন রসোপলব্ধি। রস হতে কাব্যের উদয়, রসেই তার বিলয়। আনন্দ হলো তার নামান্তর। সাধারণ ভাষার মাধ্যমে লেখক কি উপায়ে রসসৃষ্টি করেন? এর উত্তর বিভিন্ন মত ও পথ দেখা দিয়েছে।

কাব্য বাহ্যমলং কারাং—অলঙ্কার বাদ।

অতিশয়োক্তি। গুণ। নীতিবাদ। ঔচিত্য। বক্রোক্তিবাদ।

বক্রোক্তিবাদের মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির রহস্য তন্ময়ভাবে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা দেখা যায় এবং তাঁদের বিশ্লেষণ যথাযথ হয়েছে, বক্রোক্তির জন্যই বাক্য কাব্য হয় এতে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয় না। তাঁদের কথাতেই, কাব্যের শব্দার্থ গুণালঙ্কার প্রভৃতির বিশিষ্ট আস্বাদের সঙ্গে তাদের থেকে বিলক্ষণ একটি অপূর্ব আস্বাদ পাওয়া যায়। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, শব্দার্থ, ওষ্ঠ, রীতি, অলঙ্কার সমস্ত ছাড়িয়ে অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে কবি আমাদিগকে নিয়ে যেতে চান—কবির বাক্যসৃষ্টির এরকম একটি লক্ষণ আছে বলেই তা কাব্য হয়ে ওঠে। শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্—শব্দার্থের মিলনের মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির রহস্য সন্ধানের যে সূত্রপাত তার পরিসমাপ্তি ধ্বনিবাদের মধ্যে। রস লক্ষ্য, ধ্বনি উপায়—রস end, ধ্বনি means—রস ও ধ্বনির এই সম্পর্কটি অনেকে বোঝেন না, আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি।

বিভাবানুভাবব্যভিচারি সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তি :—ভরতমুনি এই রসসূত্রকে উপজীব্য করে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের সাহিত্যতত্ত্ব পর্যালোচনার অবকাশ রচিত হয়েছে। রসসূত্রে রসসৃষ্টির উপাদানগুলির উল্লেখ আছে কিন্তু একের মাধ্যমে কোন্ উপায়ে রসসৃষ্টি হয় তার সম্যক্ ব্যাখ্যা নেই। এর ব্যাখ্যা নিয়ে নানা মত দেখা দিয়েছিল। রসসূত্রের ব্যাখ্যায় ভট্টলোল্লটের "উৎপত্তিবাদ" গ্রাহ্য হতে পারে না, তাঁর মতে সামাজিকের রসাস্বাদ হয় আরোপমূলক অলৌকিক সাক্ষাৎকারে, কিন্তু তিনি সেই অলৌকিকত্বের স্বরূপ বা তার উদ্বোধক মাধ্যমের বিশেষ লক্ষণটি নির্দেশ করেননি। ভট্টশঙ্কুক রসপ্রতীতিকে অনির্বাচ্যস্বরূপ মনে করে তার অলৌকিকত্বের স্বরূপটি নির্দেশ করেছেন—এ হলো সম্যক, মিথ্যা, সংশয়, ও সাদৃশ্য এই চতুর্বিধ জ্ঞানের অতিরিক্ত চিত্রিত তুরগের মত এক অলৌকিক প্রতীতি এবং বাচ্যার্থের অতীত—তাই তিনি অনুমিতির সাহায্য নেন। অভিনবগুপ্ত আনন্দবর্ধন এই সূত্র অনুসরণ করে বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদ ও বৈয়াকরণ দার্শনিকদের সাকার শাব্দবিজ্ঞানবাদ অনুসরণ করে এ যে একান্ত মানসপ্রতীতি—ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ আত্মচৈতন্য "সাক্ষিভাস্য" বলে তার যথার্থ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। রস যে অলৌকিক তার আর একটি লক্ষণ আছে, ভট্টনায়কের 'ভোগীকৃতিতে' তার নির্দেশ পাওয়া গেলেও আনন্দবর্ধন অভিনবগুপ্তের "সাধারণীকৃতি" ব্যাপারটিতে তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। যে মানস সাক্ষাৎকার রসের স্বরূপ তা শুধু ব্যঞ্জনার দ্বারাই প্রকাশিত হতে পারে। শব্দ রচনা যখন ব্যবহারিক জগতের উর্ধে নতুন অর্থের দ্যোতনা করে, তখনই তা রসলোকে উত্তীর্ণ হয়।

এভাবে সাহিত্যসৃষ্টি, রসোপলব্ধি ও তার উপায় নির্দেশে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সূক্ষ্ম দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও তন্ময় বিন্যাসে অত্যাশ্চর্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব তথা প্রাণ-রহস্যটি তাঁদের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে কয়েকটি বিরুদ্ধ সমলোচনা আছে। প্রথমতঃ, সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় প্রতিটি শব্দ নির্বাচন, অলঙ্কার বিচার, ছন্দ আলোচনা, কাব্যাংশের রসনির্ণয় ইত্যাদি দেখা যায়, কিন্তু কাব্যের মানসিক বিচার লক্ষ্য করা যায় না। এ সম্পর্কে দুটি কথা আমাদের মনে হয়েছে। এক, তাঁরা মনে করতেন কাব্যশরীর বিশ্লেষণ ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা বেদ্য, কিন্তু তার আত্মা অনুভবগম্য। তাই কাব্যের আত্মা নির্দেশ করে তাঁরা কাব্যশরীর বিশ্লেষণে নিয়োজিত হয়েছিলেন। দুই, সংস্কৃত কালক্রমে মৃত ভাষায় পরিণত হয়—প্রবহমান ভাষাকে নিয়ে, চলতি ভাষাকে নিয়ে এর সৃষ্টি হত না, নিয়মকানুনবদ্ধ অপ্রচলিত ভাষাকে গঠন করে তবে সৃষ্টি করতে হত—তাই সাহিত্যিক ভাষা গঠনের নিয়মাবলীই প্রাধান্য লাভ করল। প্রচলিত ভাষার আরব্ধ সমগ্র সৃষ্টি নিয়ে তাঁরা সাহিত্য রহস্যকে এক সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। তাঁরা সাহিত্যগঠনের ভাষা বিশ্লেষণকে অনুসরণ করলেন। এইসব কারণে সাহিত্যালোচনার এই প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তাঁরা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে, সচেতন ছিলেন, কাব্যের অখণ্ড গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এমন কি, এরকম ধারণাও প্রকাশ পেয়েছে যে, কোন নাট্যে বা কাব্যে একটি প্রধান ভাব প্রারম্ভ থেকে পরিণাম পর্যন্ত সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে থাকে। তবে এটা ঠিক, কবিকৃতিত্ব অংশবিশেষে এমন এক দৈব প্রেরণার মত স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিম উজ্জ্বল ও নিটোল রূপ নিয়ে দেখা দেয় তা আমাদের

স্মরণীয় হয়ে ওঠে, আজকের Poetic Image বা Ambiguous form ইত্যাদিতে কবিত্বের প্রক্ষেপণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা চিরকালীন কৌতূহলের বিষয় ও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ডক্টর সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, "যে শাস্ত্র গুণের তারতম্য বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে তাহা শ্রেণী বিভাগ ও নামকরণের মধ্যেই পর্যবসিত হইবে এবং এই অনন্ত নামকরণের মধ্য দিয়া নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।" সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব চিন্তার এই পরিণতি হয়েছে ঠিক কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভারতীয় প্রবুদ্ধ চিত্তের আবদ্ধ হওয়াতেই এই দশা ঘটেছে। তবু এর মধ্যে যথার্থ দৃষ্টির প্রকাশ হয়েছে, সেটি খুঁজে নিতে হবে এবং তার পরিশুদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ডক্টর সেনগুপ্ত বলেছেন, "চরিত্রকে গৌণ করিয়া রসকে শিল্পসৃষ্টির কেন্দ্র করিলে নানা বিভ্রমের সৃষ্টি হয়।" রসের শ্রেণী বিভাগ এর জন্য বেড়ে চলে, চরিত্র কাব্যের মুখ্য বিষয় হলে সেই চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই প্রকৃত রসোপলব্ধি হইবে।" সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা চরিত্রের মহিমা ক্ষুণ্ণ করেন নি, তাঁরাই বলেছেন, "প্রত্যক্ষ নেতৃচরিতো রসভাবঃ সমুজ্জ্বলঃ।" একটি কাব্য বা সাহিত্য গ্রন্থ পাঠের ফলশ্রুতি রসসংবেদন, একথা অনস্বীকার্য। সমগ্র গ্রন্থ পাঠের পর সেই ফলশ্রুতি আমাদের মন অধিকার করে, ভাবিত করে। সেই ভাবের আশ্রয় যে বিভাব, একথাও ভুল নয়। বিভাবের সাধারণীকৃতির জন্য সেই ফলশ্রুতি। এর দ্বারা বিভাবের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না বা লুপ্ত হচ্ছে না। আসলে আলঙ্কারিকেরা এই তত্ত্বপ্রয়োগ করতে গিয়ে এক গোলক ধাঁধাঁয় আবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তাঁরাই সাহিত্য সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করে তাকে সূত্রবদ্ধ করে শেষে জানিয়েছেন—"স যৎভাবঃ কবিঃ তদনুরূপং কাব্যম্।" তাঁরা বলেছেন—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাঽস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ততে॥

সৃষ্টিলীলার চরম কথা এখানে বলা হয়েছে। রসসূত্র, বক্রোক্তিবাদ ও ধ্বনিবাদ মিলিয়ে সাহিত্যতত্ত্বের একটা মানসিক রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

Regd No. C-315 Phone : 23-5155 March'67 (0'50) Central Regd. No. B.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

চতুর্দশ বর্ষ ॥ চৈত্র ১৩৭৩

সমকালীন

LET UCO BANK

একটি দম্পতির ক'টি সন্তান থাকা উচিত ?

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতশিল্পে মূর্তি

মূল্য ১·০০

"ভারতীয় শিল্পে মূর্তিগঠনের মূল তত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য বুঝিবার পক্ষে অল্প পরিসরেও ইহা যথেষ্ট সহায়ক হইবে।"

—যুগান্তর

ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ

মূল্য ১·০০

"শিল্পীর প্রকাশ-বেদনা বা উদয়-বাসনা ছন্দে সংবদ্ধ হইয়া রসের সাহায্যে কিরূপে আত্মা হইতে চিত্রে এবং চিত্র হইতে আত্মান্তরে সঞ্চারিত হয়, অনুপম ভাষায় শিল্পাচার্য তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।"

—প্রবাসী

সহজ চিত্রশিক্ষা

মূল্য ১·০০

"অবনীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকাঠি দিয়ে শিশুর মনের ঘুমন্ত শিল্পীকে জাগিয়ে তোলার বন্দোবস্ত করেছেন।"

—চতুরঙ্গ

পথে বিপথে

মূল্য ৩·৫০

"গদ্য কতটা কাব্যধর্মী হতে পারে, বাংলা ভাষায় 'পথে বিপথে' নিঃসন্দেহে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।"

—চতুরঙ্গ

স্মৃতিকথা

ঘরোয়া

মূল্য ২·৫০

"ঠাকুর-পরিবারের, ও তাকে কেন্দ্র করে তদানীন্তন অভিজাত ও মধ্যবিত্ত বাংলা দেশের যে রূপ ঘরোয়ায় ফুটে উঠেছে তা ইতিহাসের পাতায় কিংবা অন্য কোনো বইএ পাওয়া যাবে না, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'য় ছাড়া।"

—চতুরঙ্গ

জোড়াসাঁকোর ধারে

মূল্য ৪·০০

"এ বইয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর শিল্পীজীবনের ক্রমবিকাশের কথা। অবনীন্দ্রনাথ শুধু রেখা-রঙের শিল্পী নন, ভাষাশিল্পীও, বাংলা গদ্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট আসনের অনুপেক্ষণীয় দাবি নিয়ে এসেছেন—জোড়াসাঁকোর ধারে।"

—কবিতা

অবনীন্দ্রনাথ ॥ লীলা মজুমদার

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকরূপে কতটা সাফল্যলাভ করেছেন এই গ্রন্থে তা আলোচিত হয়েছে। মূল্য ২·০০ টাকা।

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

চতুর্দশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

চৈত্র তেরশ' তিয়াত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

সুলেখা
ড্রইং এর
কালি
সুলেখা
প্রতিদিনের প্রয়োজনে
সুলেখা
ফাউন্টেন পেন-এর
কালি
অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম
সিকুরিটি
সিলিং
ওয়াক্স
সুলেখা
স্ট্যাম্প প্যাড
সুলেখা
ওয়ার্কস্ লিমিটেড
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা—৩২

গল্পকার বিভূতিভূষণ

তারাপদ পাল

বাঙলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের আবির্ভাব আড়ম্বর হীন। নিস্তব্ধতার পথে তাঁর পদধ্বনির সংঘর্ষও জাগেনি। শান্ত তাপস। সৌম্য-স্নিগ্ধ-শুভ্রতার জগৎ-সভায় তাঁর চিরন্তনের আসন পাতা। তিনি যেন ধ্যানগম্ভীর, তুষারময় গিরিরাজ হিমালয়। তাই বোধহয় আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের আবির্ভাব বিস্ময়ের, চমকের—কিন্তু জটিলতার নয়। তার আগের পরের ইতিহাস নেই।

বিভূতিভূষণ বাঙালী। বাঙলার কেন্দ্রবিন্দুতেই তাঁর আনাগোনা—আকর্ষণের টান। তাই বাঙলার নবজাগরণের কালে, শহর কলকাতার মৃগতৃষ্ণিকা ছেড়ে তিনি ছুটেছেন পল্লীপ্রকৃতির প্রাণ-খোলা সবুজের সমারোহে। যেখানে গাছ আর গাছ, মাঠ আর মাঠ, হাওয়া আর বাতাস—যেখানে শান্ত-শীতল রূপ তোমার আমার সবাকার। বাঙলার পল্লীপ্রকৃতি তাই বিভূতিভূষণের দর্পণ। সবুজের সমারোহের মধ্যেই তিনি তাই খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর আপন-সত্তাকে। দেহ থেকে দেহাতীতে যাত্রা। উৎস কেন্দ্রে ফিরে যাওয়ার দুশ্চর সাধনা।

বিভূতিভূষণের আত্মপ্রকাশ "কল্লোলের" কালে। কিন্তু 'কল্লোলে' নয়, "বিচিত্রায়।" এই শান্ত-সৌম্য বিভূতিভূষণের সঙ্গে প্রথম দেখার কথা বলেছেন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত: "বিভূতিভূষণের সান্নিধ্যে গিয়ে বসলে আধ্যাত্মিকতার একটা সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। আত্মার সঙ্গে আত্মার যখন কথা হয় মহৎ আর্ট তখনি জন্ম নেয়। 'বিচিত্রা'য় এসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্নিহিত হই। তখন তাঁর "পথের পাঁচালী" ছাপা হচ্ছে—মাঝে মধ্যে বিকেলের দিকে আসতেন "বিচিত্রা"য়। যখনই আসতেন মনে হত যেন অন্য জগতের সংবাদ নিয়ে এসেছেন। সে জগতে প্রকৃতির একচ্ছত্র

রাজত্ব—যেন অনেক শান্তি অনেক ধ্যানলীনতার সংবাদ সেখানে। ছায়া-মায়াভরা বিশাল নির্জন অরণ্যে যে তাপস বাস করছে তাকেই যেন আসন দিয়েছেন হৃদয়ে—এক আত্মভোলা সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে তিনিও যেন সমাহিত, প্রসন্নগম্ভীর। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য আত্মসংযোগ রেখেছেন বলে তাঁর ব্যক্তে ও মৌনে সর্বত্রই সমান স্বচ্ছতা, সমান প্রশান্তি। তাঁর মন যেন অনন্ত ভাবে স্থির ও আবিষ্ট। মনের এই শুক্লধর্ম বা নৈর্মল্যশক্তি অন্য মনকে স্পর্শ করবেই। যে মানবপ্রীতির উৎস থেকে এই প্রজ্ঞা এই আনন্দ তাই-তো পরম পুরুষার্থ। এই প্রীতিস্বরূপে অবস্থিতিই তো সাহিত্য। এই সাহিত্য বা সহিত-তেই বিভূতিভূষণের প্রতিষ্ঠা। স্বভাবস্বচ্ছধবল নিচিন্ত-নিস্পৃহ বিভূতিভূষণ।" ব্যক্তি বিভূতিভূষণ, ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ, গল্পকার বিভূতিভূষণ—এর স্বরূপ এই নিশ্চিন্ত নিস্পৃহতায়।

"পথের পাঁচালী" বিভূতিভূষণের জীবন-বেদ বা জীবন-কাব্য। যার শেষ দেখি অপরাজিতা"য়। 'পথের পাঁচালীর' নামকরণ আর অপুর জীবন-ধারা—এর মধ্যে দিয়েই বিভূতিভূষণ একবারেই ধরা পড়লেন সাধারণ মানুষের চোখে। তাই এর কোন পূর্বাপর ইতিহাসের প্রয়োজন হল না। আপনভোলা বিভূতিভূষণ আমাদের প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে দখল করে নিলেন চিরকালের আসন—অপর দিক দিয়ে এ-ও বলা যায় যে, তিনি তাঁর বাউল মনের দ্বারটা খুলে রাখলেন আমাদের জন্যে।

সাধারণের কাছে বিভূতিভূষণের পরিচিতি উপন্যাসকার হিসেবে তথা "পথের পাঁচালী"র স্রষ্টা বলে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের আবির্ভাব ছোট গল্পের মাধ্যমে। আগেই বলেছি বিভূতিভূষণ জীবনশিল্পী। তাই তাঁর বক্তব্য, তাঁর সৃষ্টির ধারা কেবল মাত্র উপন্যাসের মধ্যে সীমিত থাকেনি, এমনকি তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছে গল্পের মাধ্যমে।

জীবনশিল্পীর তালিকা মানব-জীবনের হাসি-আনন্দে, সুখ-দুঃখের পথে ছোট খাট বিচিত্র ঘটনার ছবি এঁকেছে সর্বপ্রথমে। রিপন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পর যখন তিনি হরিনাভিতে স্কুল মাষ্টারি করছিলেন, সেই সময় প্রথম গল্প লেখেন "উপেক্ষিতা"। গল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও তাঁর পরিচিতি এবং প্রতিষ্ঠা 'পথের পাঁচালী'তে; তাই হয়তো আমাদের ভুল হতে পারে যে, তিনি গল্পকার হিসেবে ততটা সাফল্য লাভ করেন নি—যতটা করেছেন উপন্যাসকার হিসেবে। আর যদি এই ধারণা প্রকৃত হয়, তবে বুঝতে হবে আমাদের দুর্ভাগ্য। উপন্যাসকার হিসেবে তাঁর যতটা খ্যাতি গল্পকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি তা'র থেকে কোন অংশেই কম নয়। তাঁর উপন্যাসের মতই গল্পগুলোর একটি অসামান্যতা আছে। 'তা' কোন দিনই গতানুগতিক পথ দিয়ে চলে না। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে যেমন মানুষের জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ থেকে বিশাল ঘটনা ধরা দিয়েছে, গল্পগুলির মধ্যেও তেমনি মানুষের ছবি শুচিসুন্দর ভাবে রূপায়িত হয়েছে। কেননা, তিনি মানুষকে দেখেছেন অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে, তেমনি প্রকৃতিকে দেখেছেন দু'চোখ ভ'রে। একদিকে তিনি কথাশিল্পী, অপরদিকে তাঁর মন কবি-মন। এই উভয় মননের অপূর্ব সমন্বয়ে সাহিত্যিক, জীবনশিল্পী বিভূতিভূষণের অসাধারণ সাফল্য।

যে কোন মানুষের জীবন যেমন বিরাট জীবন-কাব্য বা জীবনবেদ সৃষ্টির সম্ভাবনায় ভরপুর,

তেমনি ছোট ছোট গল্পেরও উৎস এবং গল্পে পরিপূর্ণ। অবশ্য যে-জীবনটাকে নিয়ে শিল্পী তাঁর রচনায় হাত দেবেন, সেখানে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিটাই বড় কথা। যে জীবনটাকে দেখছি তার বহিঃ-প্রকৃতির হুবহু প্রতিচ্ছবি হবে না তার অনন্তরূপকে প্রকাশ করা হবে? দ্বিতীয়টাই, মনে হয়, প্রকৃত-শিল্পীর কাম্য হওয়া উচিত। সেখানে তাই শিল্পীকে হতে হয় রোম্যান্টিক। ক্লাসিক শিল্পীর তুলিতে জীবনের অনন্তরূপের প্রকাশ যথাযথ বোধহয় হতে পারে না! কেন না সেখানে সেই উপলক্ষ্যটাই শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ রোম্যান্টিক শিল্পীর যেটা লক্ষ্য, সেখানে ক্লাসিক যায় না, এবং রোম্যান্টিকের কাছে যেটা উপলক্ষ্য সেটাই ক্লাসিক গোষ্ঠির লক্ষ্য। একে আমরা এই ভাবে বলতে পারি: যে জীবনটাকে নিয়ে ছবি আঁকা চলছে সে আসলে ষ্টুডিও-র মডেল নয়ত যুদ্ধক্ষেত্রের শিখণ্ডী—রোম্যান্টিক শিল্পীর চোখে। আর সেটাই ক্লাসিক শিল্পীর কাছে হয়ে ওঠে মুখ্যবস্তু। তাই যিনি সত্যিকারের শিল্পী তাঁর কাছে একটি বিশাল জীবনের ব্যাপক ছবি আঁকা যেমন, তেমনি ছোট ছোট ঘটনার গল্প বলাও সহজ। আর সেটি বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে সর্বৈবভাবে প্রযোজ্য।

গল্পকার বিভূতিভূষণের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর উপন্যাসের কথা বার বার এসে পড়ে। কেননা, তাঁর গল্প আর উপন্যাসের মধ্যে একটা ক্ষীণ সংযোগ রয়েছে আত্মলীন হয়ে। প্রকৃতি ও মানব চেতনার একটা ধারা তাঁর উভয় রচনার মধ্যেই বিদ্যমান। তাই তাঁর গল্পগুলির মধ্যে ছোট গল্পের রীতি অনুযায়ী চমকসৃষ্টি বা 'অঙ্গুলি নির্দেশে'র প্রকাশ দেখি না। সেগুলো তাই 'গল্প'। শুধু গল্পই বলি। বিভূতিভূষণ সমস্ত জীবন ধরে যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন—সেগুলি সবই গল্প। এই প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদারের অনুসরণ করা যেতে পারে: "তিনি (বিভূতিভূষণ) বড় ঔপন্যাসিক নহেন, একজন শক্তিমান সাহিত্য শিল্পীমাত্র"। এখানে সাহিত্য শিল্পী বলতে তিনি 'গল্পকার'ই বোঝাতে চেয়েছেন।

অনেকে বলেছেন যে, বিভূতিভূষণ গল্পও যথেষ্ট বলতে পারেন নি। অনেক জায়গায় তা, ডেস্‌ক্রিপটিভ্‌ রচনা হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের পরমতম লাভ বোধ হয় সেখানেই, যেখানে বিভূতিভূষণের রচনা ন্যারেটিভের পথ থেকে মাঝে মাঝে সরে এসেছে ডেস্‌ক্রিপটিভ্‌-এর রাজ্যে। যেখানে তাঁর শিল্পীমনটা আরও একটি অবকাশ পেয়েছে নিজেকে প্রকাশ করার। এখানে সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—যেখানে আপন মনের খেয়ালখুসি ডেস্‌ক্রিপটিভ্‌ রচনা সৃষ্টি করে, সেখানে গল্পের সার্থকতা কোথায়? এ-প্রশ্ন আমারও। কিন্তু একথা বোধহয় স্বীকার করতে অনেকেরই অসুবিধা হবে না যে, ঐ ডেস্‌ক্রিপটিভ্‌ রচনার মধ্যে দিয়ে সাহিত্যিকের বা স্রষ্টার শিল্পীমনটার পরিচয় বেশ সহজ হয়ে ওঠে।

যাই হোক, গল্পকার বিভূতিভূষণের সম্যক পরিচয় পেতে হলে, আমাদের তাঁর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আছে, সেগুলি একটু আলোচনা করে দেখা দরকার।

বিভূতিভূষণের আত্মপ্রকাশ বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে। সেই সময় দেশের মধ্যে সমস্যার ছড়াছড়ি। অর্থনৈতিক দুরবস্থা, মধ্যবিত্ত-জীবনের সমস্যা, রাজনৈতিক আন্দোলনের চরমরূপ প্রাপ্তি, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ-বিভাগ—এই সব নানা কিছুর ব্যাপকতা। কিন্তু এ সব

সত্ত্বেও বিভূতি-সাহিত্যে আমরা এই সব জিনিসের প্রভাব দেখতে পাই না। তাই সেই সময়ে 'পরিচয়' (কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'পরিচয়ে'র সেটা প্রথম দিক) কাগজে বিভূতিভূষণকে নিয়ে যথেষ্ট আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। পরবর্তীকালেও ঐ একই প্রশ্ন বিদ্যমান—পাঠক মনে, সমালোচকের কাছে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বা পেতে গেলে, সাহিত্য প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের বক্তব্য আমাদের অনুসরণ করা দরকার : "দুঃখ বেদনা হাসি অশ্রুত, সমস্যা বিজড়িত অপরূপ মানুষের জীবন এবং জগৎ তার (অর্থাৎ সাহিত্যিকের) মাল মশলা।' 'বাঙলা দেশের সাহিত্যের উপাদান বাঙলার নরনারী, তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক —বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগতগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাঙলার ঋতুচক্র, বাঙলার সন্ধ্যা-সকাল আকাশ-বাতাস, ফলফুল—বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখ-দুঃখকে রূপ দিতে হবে।' 'চারদিকের মানব-সমাজ সম্বন্ধে··· শুধু চিন্তা···নয়, এর অন্তরতম হৃদয়-স্পন্দনকে···একান্ত ভাবে অনুভবের চেষ্টা'—সাহিত্য স্রষ্টার পরমতম কাম্য।' 'গভীর রহস্যময় এই মানব-জীবন। এর সকল বাস্তবতাকে এক বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ দেওয়ার ভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে।' কবি সাহিত্যিক আপনার জন্যে লেখেন, সে হচ্ছে তার আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন।' 'বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর এক বৃহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে।' এর পরে সিদ্ধান্তে উপনীত হই—'প্রত্যেক লোকই তার নিজের অনুভূতি লেখবার অধিকারী। ফুল, ফল, পাখী, সমুদ্র, মা-বাপ, ছেলে-মেয়ে সব আছেই—আমি তাদের কি রকম দেখলাম, সেইটাই আসল কথা। জীবনটাকে আমি কি রকম পেলাম, সেইটাই সকলে জানতে চায়।···সাহিত্য শুধু জগতটাকে কে কি চোখে দেখছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী।" এর থেকেই বোঝা যাবে তিনি মনে-প্রাণে কি চেয়েছিলেন। আমাদের মতে তিনি যা চেয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যকর্মে ব্যক্ত করতে, তা' তিনি পেরেছেন সাফল্যের সঙ্গে।

বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে আর এক ধরণের অভিযোগ : 'বিভূতিভূষণে রবীন্দ্র প্রভাব সুস্পষ্ট। অথচ রবীন্দ্রনাথ থেকে বিভূতিভূষণের তফাৎ অনেক, এবং সে তফাৎ অনেকটা ইন্‌ফিরিয়র জাতের।' এর উত্তরে বলা যায় : কখনো কোন দু'জন স্রষ্টার মধ্যে একই জিনিস বর্তমান থাকার বা একই দৃষ্টি ভঙ্গির প্রত্যাশা করার নিশ্চয়তা পোষণ করা কখনই কোন রসবেত্তার পরিচায়ক নয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভূতিভূষণের যেমন অনেক সাদৃশ্য দেখেছি, তেমনি দেখেছি বৈসাদৃশ্যও। তা'ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা স্থির প্রজ্ঞার ভাব প্রকাশমান এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অভীপ্সা দেখা যায়। কিন্তু বিভূতিভূষণের মধ্যে কেবল উপলব্ধি এবং পর্যবেক্ষণ দৃশ্যমান। তিনি আগেই বলে দিয়েছেন যে, এটা তাঁর একেবারে ব্যক্তিগত দেখা। সুতরাং সেখানে বিভূতিভূষণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা পার্থক্য থাকবেই।

তাঁর অধ্যাত্মোপলব্ধিকে অনেকেই মনে করেন জীবনবোধের অগভীরতা। কিন্তু 'ইছামতী' পড়ে কি মনে হয় অগভীর জীবনবোধ? বা তাঁর 'আরণ্যক,' 'দৃষ্টিপ্রদীপ' পড়ার পরও কি ঐ প্রশ্ন

করার অবকাশ থাকে? কতকগুলো গল্পের মধ্যে দিয়েও তো আমরা তাঁর গভীর জীবনবোধেরই পরিচয় পাই। যেমন, 'কুশলপাহাড়ী,' 'পুঁইমাচা,' 'সিঁদুর চরণ,' প্রভৃতি।

তাই বলছিলাম, বাংলা সাহিত্যের চণ্ডীমণ্ডপে বিভূতিভূষণের আসন চিরন্তনের—তা' বলে তা' সঙ্গীত সভার উপেক্ষিত, অপাঙ্‌ক্তেও একতারার মতো নয়।

বিভূতিভূষণের গল্পের অবলম্বন : মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাট সুখ দুঃখের লীলাচাঞ্চল্য, সুখের ভিতর দুঃখের ছোঁয়া, দুঃখের মধ্যে আনন্দের ইংগিত—অনাড়ম্বর জীবন। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যে সব ছোটখাট ঘটনা ঘটে তা' দিয়েই বিভূতি-সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণ করলে বোধহয় সুফলই পাওয়া যাবে। এবং যাঁরা তাঁকে অবাস্তবতার দোষারোপ করে থাকেন—তাঁদের ভুলও ধরা পড়বে। আমার মনে হয়, যাঁরা জীবন সম্বন্ধে অনেক উপলব্ধির, অনেক অভিজ্ঞতার মনোহারি বক্তৃতা দেন—বাস্তবে জীবনোপলব্ধির প্রত্যক্ষ্যতা তাঁদের খুবই নগণ্য। বিশেষ করে পল্লী প্রকৃতির সম্বন্ধে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে একটা সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাকরণ তৈরী করতেই সচেষ্ট—প্রকৃত উপলব্ধিতে নয়। তাই পল্লীবাঙলার সাধারণ মানুষের, পল্লীপ্রিয় মানুষের কাছে বিভূতিভুষণের সাহিত্য যতই উপভোগ্য হোক না কেন—তথাকথিত ইন্‌টেলেকচুয়েল সমালোচকরা তাঁর ছিদ্র-সন্ধানে প্রবৃত্ত থাকবেনই। আমরা এখানে বিভূতি সাহিত্যের উপলব্ধিকে বড় করে দেখবো।

দেখা যায় মানুষের সেন্‌টিমেণ্টের দিকটিও বিভূতিভূষণের সাহিত্যে বেশ সুস্পষ্ট! যা' গ্রামীণ জীবনের সরল বন্ধুপ্রিয় বা প্রীতিবৎসল ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যারা একটু নির্জন প্রকৃতির (বিভূতিভূষণ—অপু লক্ষ্যণীয়) এবং এক পরমতম-লোকের আকাঙ্ক্ষা করে। তাদের মধ্যে ঐ সেন্‌টিমেণ্ট-এর প্রভাবও দেখা যায়। আমরা বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্পে ঐ সেন্‌টিমেণ্টেরই সন্ধান পাই।

বিভূতিভূষণের স্টাইল প্রসঙ্গে বলা যায়—তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যেই ললিত পদের ধ্বনি বিরাজিত। অপুর ছোটবেলায় যখন পাঠশালায় সে শ্রুতিলিখন নিচ্ছিল তখন সেই বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসের অংশের পদের ললিত মাধুর্য তার মনকে আকৃষ্ট করেছিল। সে বোঝেনি কিছু, কিন্তু মুগ্ধ হয়েছিল এর অপূর্বতায়। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে আমরা এই মাধুর্যের, অপূর্বত্বের সন্ধান পাই। 'এই স্টাইলের বিশিষ্টতা তার সারল্যে, 'সাদা-মাটা' ভাবে, স্নিগ্ধ মাধুর্যে, এবং স্মৃতিচারণের ঈষৎ করুণ মধুর এক মেজাজে। এখানে তাঁর ব্যক্তি-আত্মার প্রতিফলন এক নিখুঁত।' কিন্তু এত সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের ভাষায় একটা একঘেয়েমি রয়েছে। তার কারণ বোধহয় তার আত্মপরায়ণ ভাবমুগ্ধতা ; এবং সচেতনতার ও প্রযত্নের খানিকটা অভাব। অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় বিভূতি-সাহিত্যের দুর্বলতা দেখিয়ে তিনটি গুণের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন, (১) 'স্বচ্ছ ও অনায়াস', ( ) 'পাণ্ডিত্য প্রকাশনী কোটেশন বা এলিউশনের অভাব', (৩) 'দুর্লভ প্রসাদগুণ ও কবিত্ব শক্তি'।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যের পর্যালোচনায় একটি বিশেষ জিনিস চোখে পড়ে—তা' তাঁর ভাষার রূপ। প্রথমদিকের সাহিত্যে দেখি তিনি সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং শেষের

দিকে গিয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন চলিত ভাষা। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমাদের পাঠক মনে এই ভাষার রূপান্তর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। কারণ তাঁর বলার ভঙ্গিমা, লেখার স্টাইল বা রীতি উভয়ক্ষেত্রেই একই থেকে গেছে। তার ফলে আমাদের মন ঐ ভাষার রূপ-ছন্দ তরঙ্গেই দুলতে থাকে—আর তাই তাঁর ভাষার বদলটা আমাদের চোখে পড়ে না। এটি বিভূতিভূষণের শিল্পী-সত্তার আর একটি গৌরবের দিক।

সাধারণতঃ ছোটগল্পের লেখকেরা তাঁদের গল্পের মধ্যে একটা হঠাৎ চমক্ এনে ক্লাইমেক্স সৃষ্টি করেন। কিন্তু বিভূতিভূষণে আমরা সেইরকম কোন প্রচেষ্টা দেখি না। কেন না, 'তিনি জানেন দ্যুতি-কণা ছড়িয়া আছে আকাশের প্রতিটি সূর্যরশ্মিতে, মহাসমুদ্রের প্রতিটি জলবিন্দুতে। অতএব ধীরে চল, ঐ দ্যুতি কণাগুলি কুড়িয়ে নাও, ব্যস্ত হোয়ো না, ঐ প্রতিটি আলোক কণাতেই নতুন আবিষ্কারের বিস্ময় ও আনন্দ। কোন কোন পাঠকের কাছে এটা তুচ্ছ মনে হতে পারে, একঘেয়ে লাগতে পারে।' এবং বিভূতিভূষণের কাছে '...তুচ্ছ একঘেয়ে জীবনও রোমান্স, শুধু দেখার চোখটা চাই'। তাই বিভূতিভূষণের গল্পের মধ্যে আমরা দেখি গতির স্বাভাবিকতা, এবং তা কখনো বা মনে হয় একটু ঢিমে। এই জিনিসটা কিন্তু তাঁর বিষয়বস্তুর সঙ্গে বেশ খাপ খায়। সরল কাহিনী, যুগের জটিলতার ছাপহীন জীবনের গল্প। তাই তাঁর ঘটনা বিন্যাসের কৌশলটা খুব সাধারণ এবং তা সরলমার্গী। জটিল বা কলুষ জীবনের যেখানেই তিনি সুন্দরের সন্ধান পেয়েছেন, আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন সেখানেই ছুটে গেছেন।

মানুষ যখন খুব বেশী দুঃখ পায়—দুঃখ পেতে পেতে যখন তারই মধ্যে দিয়ে খানিকটা আনন্দের সন্ধান পায় সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—তার দু'চোখ ভরে ওঠে আনন্দের অশ্রুতে। বিভূতিভূষণের গল্পে আমরা এই ধরনের সেন্টিমেন্ট দেখতে পাই প্রচুর পরিমাণে। তাই মনে হয় বিভূতিভূষণের অধ্যাত্ম উপলব্ধি এবং পরমতম সত্তার সন্ধানের মধ্যে অন্তঃশীলা বেদনাবিলাসী স্রোত বহমান—'যা' বাংলার অধিকাংশ রোমান্টিক শিল্পীর মধ্যেই দেখা যায়।

গল্পগুলির মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় প্রচুর। তিনি যে জীবনের সঙ্গে পরিচিত এবং যে জীবনবাদকে স্বীকার করেছেন তার ব্যাপকতার মধ্যে থেকে অনেক ছোটখাট ঘটনা বৈচিত্র তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় তিনি ক্রমশঃ এক অন্তর্জগতে চলে যাচ্ছেন। মানুষের জীবনের ভাব সমৃদ্ধ, আবেগময় গল্প 'কিন্নর দল' থেকে আরম্ভ করে আমরা ক্রমশঃ 'কুশল পাহাড়ী' এবং 'নাস্তিকে' গিয়ে সম্পূর্ণ অন্তর্জগতের সন্ধান পাই। সন্ধান পাই সেই আনন্দময় সত্তার—সেখানে পৌছবার আকুলতা বিভূতিভূষণে বিদ্যমান। 'কুশল পাহাড়ী' এবং 'নাস্তিক' পূর্বকথিত সেই ডেস্ক্রিপ্টিভ জাতের। এদের বৈশিষ্ট্য এদের গল্পহীনতা। আর 'কুশল পাহাড়ী'ই যেন 'ইছামতীর' একটি ছোট্ট সংস্করণ। বা বলা যায় 'কুশলপাহাড়ী'ই সম্পূর্ণতা পেয়েছে 'ইছামতী'র ভেতর। এখানে এসেই দেখি বিভূতিভূষণের সম্পুর্ণতা। এখানে জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যের সন্ধান পাই না। কিন্তু সহজেই চেনা যায় বিভূতিভূষণকে, বিভূতি সত্বাকে। তাঁর জীবনের নির্জনতা, নিঃসঙ্গতার অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপন্যাস ও গল্পগুলির মধ্যের গভীরতায় একটা মিল বা সংযোগ থাকলেও বিভূতিভূষণের গল্পের মধ্যে উপন্যাসের মতো প্রকৃতিমুখিতার অভাব চোখে পড়ে। ছোটগল্পে বিভূতিভূষণের লক্ষ্য যাই হোক না কেন—অবলম্বন মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের ছোটখাট ঘটনা। সেখানে প্রকৃতি খানিকটা প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

তাই 'কিন্নর দলের' শ্রীপতির বৌ শুধু যে গ্রামের চটুল কন্যাদের মনের মধ্যে একটা চিরদিনের আসন দখল করল, তাই নয়, সেই সঙ্গে পাঠকদের মন হরণ করে নিয়ে জীবনানন্দের এক গভীরে নিয়ে যায়, যেখানে আছে সূক্ষ্ম অনুভূতির পরশ। কিন্নরদলের প্রতিটি চরিত্র'র একটা বৈশিষ্ট্য আছে তাদের স্বকীয়তার। তাদের অধিকাংশই গাঁয়ের বৌ-ঝি—কেবল কিন্নরদলকে বাদ দিয়ে। পাড়ার মেয়েদের প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের উক্তি: "মজুমদার বাড়িতে ভাঙা রোয়াকে পাড়ার মেয়েদের মেয়ে-গজালি হয়। তা'তে রায় গিন্নী, মুখুয্যে গিন্নী, বোস গিন্নী, চক্কত্তি গিন্নী, প্রভৃতিতো থাকেনই, পাড়ার অল্পবয়সী বৌয়েরা ও মেয়েরাও থাকে। সাধারণতঃ যে সব ধরণের চর্চা এ মজলিসে হয়ে থাকে, তা শুনলে নারীজাতি সম্বন্ধে লিখিত নানা সরস প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনার সত্যতা সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ যাঁর উপস্থিত না হবে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন খুব বড় ধরনের অপ্‌টিমিস্ট।" এই যে গিন্নীর দল তারা সম্পূর্ণভাবে বদলিয়ে গিয়েছে শ্রীপতির বৌ'র সংস্পর্শে এসে। প্রিয় মুখুয্যের মেয়ে শান্তির মতো মেয়েরাও সম্পূর্ণভাবে বদলিয়েছে—গল্পের মধ্যে। আর তারা শেষে কেঁদেছে শ্রীপতির বৌ-এর জন্য যার সম্বন্ধে প্রথম দিকে তারা বলতো: "তাই বল! নইলে এমনি কোথা কিছু নয় শ্রীপতি বিয়ে করলে একি কখনো হয়! কি জাত মেয়েটা! হিঁদু তো?" ধীরে ধীরে যখন তারা শ্রীপতির বৌ-এর সঙ্গে পরিচিত হতে থাকলো এবং তার বিভিন্ন গুণাবলীর পরিচয় পেল। তখন ক্রমশঃ হয়ে পড়লো তার ভক্ত। এই ধরণের চরিত্র চিত্রায়ণে সার্থক বিভূতিভূষণ। যথাযথ ভাবে বিশেষ করে গ্রামের মেয়েদের কোমলে হিংসায় মিশ্রিত চরিত্রগুলির বর্ণনা করেছেন, এবং তার মধ্য দিয়ে সার্থক ভাবে গল্পটির বক্তব্য নিজের গতি পেয়ে গেছে।

শ্রীপতির বৌ-এর মৃত্যুর পরে বিভূতিভূষণ যে চিত্রটি এঁকেছেন একটি প্রতীক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়, তা' প্রতীকতার দিক বাদ দিয়ে আমাদের অপূর্ব লাগে। তার মৃত্যুতে তার প্রতিবেশিনীদের মনের দুঃখ, শ্রীপতির মন-বেদনা অপূর্ব ভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন। এখানে চমক দেবার সুযোগ থাকলেও তিনি গ্রহণ করেন নি। এই বিপদটিকে, এই বেদনাটিকে এনেছেন শনৈঃ শনৈঃ—কিন্নরদলের ক্রম মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। শ্রীপতির বৌ মারা যাবার বেশ কিছুদিন পর, একদিন রাত্রে হঠাৎ গান শুনে সবাই চমকে গেল। শান্তি বেড়িয়ে পড়ল বিস্ময়ে। তখন, "রাত অনেক কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর পৌঁছেছে ফুটফুটে শরতের জ্যোৎস্নায় বাঁশবনের তলা পর্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে।

ঠিক যেন তিন বছর আগেকার সেই মহাষ্টমীর রাত্রির মতো।

শান্তির মা ইতিমধ্যে জেগে উঠে বলেন, ওকে গান করছে রে শান্তি? তারপর তিনিও তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন। শ্রীপতির বাড়ি তো কেউ থাকে না, গান গাইবে কে? ওদিকে

মণ্টুর মা, মণি, বাদল সবাই জেগেছে দেখা গেল।"—এতে শ্রীপতির বৌ-এর সম্পর্কে ওদের আগ্রহ এবং প্রীতির ছবিটা সুস্পষ্ট।

আর এক জায়গায় শান্তির অনুরোধে শ্রীপতি তার বৌ-এর গানের রেকর্ডটা যখন আবার বাজালো "পরক্ষণে একটি অতি সুপরিচিত, পরম প্রিয় সুললিত কণ্ঠের দরদ-ভরা সুরপুঞ্জে পাড়ার আকাশ-বাতাস, শুদ্ধ জ্যোৎস্নারাত্রিটা ছেয়ে গেল। মানুষের মনের কি ভুলই যে হয়! অল্পক্ষণের শান্তির মনে হোল তার কুমারী-জীবনের সুখের দিনগুলো আবার ফিরে এসেছে, যেন বৌদিদি মরে নি, কিন্নরের দল ভেঙে যায় নি, সব বজায় আছে। এই তো সামনে আসছে পুজো, আবার মহাষ্টমীতে তাদের থিয়েটার হবে, বৌদিদি গান গাইবে। গান থামিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বলবে—কেমন শান্তি ঠাকুরঝি, কেমন লাগলো?"—এই বর্ণনার ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে স্নেহবৎসল, গ্রামের সরল মানুষদের প্রাণের আকুতি, প্রিয়জনের বিরহজনিত বেদনা-বোধ অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে। শুধু শান্তির নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মনে পড়ে "কিন্নরের দল ভাঙেনি।" এখানে সেই সেন্টিমেন্ট-এরই প্রাধান্য—যেটা বাঙলা তথা বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ।

'মৌরীফুলে'র সঙ্গে কিন্নরদলের একটা মিল আছে। এই দুই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নারী। কিন্নরদলের নারী শহরের মেয়ে, আর মৌরীফুলের নারী গ্রামের সরলা-সুশীলা। মৌরীফুলের মধ্যে শহরের মেয়ের প্রবেশ ঘটেছে ক্ষণকালের জন্যে। এবং তারপর থেকেই মুখরা সুশীলার মধ্যে একটা পরিবর্তন চোখে পড়ে। সুশীলা গ্রামের সরলা মেয়ে, মুখরা, কিন্তু তার মধ্যের স্নেহবৎসল রূপটিও বিভূতিভূষণ আমাদের দেখিয়েছেন দরদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ঝগড়াটে একগুঁয়ে সুশীলার জীবনে প্রয়োজন ছিল একটু স্নেহস্পর্শের। আর তা পেলেই যে সে কত দূর সুন্দর হতে পারে তার প্রমাণ পাই যখন নৌকায় করে শিবতলার ঘাটে যাওয়ার সময়ে শহরের মেয়ের সঙ্গে তার ভাব হলো এবং তারা "মৌরীফুল" পাতালো। "কিন্তু সেটা তার জীবনে একটি দিনই মাত্র এসেছিল, তাই সুশীলার 'মৌরীফুল' পরিচয় শ্বশুরবাড়ীর লোকজনের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল চিরদিনের জন্যে, অথচ এটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। এইখানেই গল্পটির ট্র্যাজেডি যে 'মৌরীফুল হতে পারত, তার পরিচয় রয়ে গেল অলক্ষ নামে।"

মানবজীবনের একটি তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ ঘটনার বর্ণনার মধ্যদিয়ে মানুষ বিভূতিভূষণের মনের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর "তুচ্ছ" গল্পের মধ্যে। আমাদের সাধারণের দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশু কামারের মেয়ের আগমন এবং তার ব্যবহার যতই সাধারণ এবং তুচ্ছ হোক না কেন—সেই কচি মেয়েটার মধ্যে যে স্নেহের, ভালবাসার কাঙালপনা আছে তা' অপূর্বভাবে তিনি আমাদের দেখিয়েছেন। মানুষের মানসিক তৃপ্তির এমন সুন্দর ছবি যথার্থই কম পাওয়া যায়। "কতটুকু আর তেল দিলাম ওর মাথায়। কিন্তু কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদীজলে। উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট, সৌন্দর্যময় বাণী। অন্তরের ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল। চমৎকার দিনটা। সুন্দর দিনটা।"—এটা সম্পূর্ণ মনের উপলব্ধির জিনিস। কোন রীতি-নীতি দিয়ে তো এই উপলব্ধিকে বোঝান যায় না। এর কোন ব্যাকরণও তৈরী সম্ভব নয়।

'পুঁইমাচা' গল্পটির মধ্যে আমরা অল্পবিস্তর দুর্গার ছাপ পাই। ময়লা জামা-কাপড়, মাথায়

তেল নেই রুক্ষ। গ্রামের কিশোরী-মেয়ের স্বাভাবিক ছবি—সে লীলাচঞ্চল, খেতে ভালবাসে। তাই যেখানে যা' যেমন ভাবে পায় আদরের সঙ্গে নিয়ে আসে নিষ্কলুষ মনে! ক্ষেন্তির মৃত্যুর পর (?) অন্নপূর্ণার মনে সেই স্মৃতি ফিরে এসেছে। যে গল্পের সুরু সামান্য পুঁইশাক আনার মধ্যে দিয়ে, তার পরিণতি এসেছে সেই পুঁই-চারার মাচায়। "তিনজনে খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিন জনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল…যেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে…বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া ডুলিতেছে…সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!"

বিভূতিভূষণের মধ্যে এই ধরণের গল্পগুলি থেকে মনে হয়, স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে আনন্দ-বেদনার স্বাদ পান করার একটা প্রবণতা আছে, যেটাকে আমি আগে বেদনা-বিলাস বলেছি। 'কিন্নর দলে'র রেকর্ড চালা নয় ও এই একই জিনিস কাজ করেছে। আর একটা জিনিস আমাদের চোখে পড়ে। সেটা হলো: "সাধারণ মানুষ; আকাঙ্ক্ষাও তার সাধারণ; কিন্তু সেই তুচ্ছ আশাও অপূর্ণ থেকে যায়। রাজ্য ভাঙা-গড়ার মত বিরাট ঘটনা নয়, ট্র্যাজিক নায়কের সংগ্রাম-বেদনা-মথিত জীবন মহিমা হয়তো এর নেই। তবু তুচ্ছ আশা তার ব্যর্থতা ঐ সাধারণ ব্যক্তিটির কাছে কম নয়। বিভূতিভূষণের কাছে তার আবেদন গভীর।" এই জিনিস আমরা আরও দেখতে পাই "ভণ্ডুল মামার বাড়ী গল্পে।"

মাতৃরূপা স্নেহময়ী নারী বিভূতিভূষণের খুব প্রিয়। তাই তাঁর আর একটি গল্পের এক জায়গায় পাই: "মেয়েরা হচ্ছে আসলে মা, তারপরে অন্য কিছু।" "অপরাজিত"তেও এই রূপসন্ধান আছে। এই মাতৃরূপের চমৎকার একটি নিদর্শন আমরা পাই—তাঁর "আহ্বান" গল্পে। "সকল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উর্দ্ধে…মাতৃস্নেহ অকম্পিত দীপ্তিতে উজ্জ্বল।" তাই লেখক প্রথমে এক মুসলমান বুড়ির গায়ে পড়া স্নেহ বরদাস্ত করতে পারেন নি। কিন্তু পরে তিনি তার মাতৃ-হৃদয়কে উপলব্ধি করেছেন। আর তাই বলেছেন, "আমার মনে পড়লো বুড়ি বলেছিল সেই এক দিন—আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস্ বাবা। ওর স্নেহাতুর আত্মা বহুদূর বারাণসী থেকে আমায় কিভাবে আহ্বান করে এনেছে।…দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো অ-মোর গোপাল।"

"দ্রবময়ীর কাশীবাস" গল্পে আবার একটা অন্য ধরণের জিনিস লক্ষ্য করা যায়। দ্রবময়ীর মন সেখানে দূরপ্রসারী নয়। সংসারের কঠিন মায়ার বাঁধনে আষ্টে পিষ্টে বাঁধা। তাই দ্রবঠাকরুণ কাশী গিয়ে শান্তি পায়নি, তৃপ্তি পায়নি। বলেছে, "কাশী পেরাপ্তির দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়া কাশী।" সেই কারণেই—"বেলা যায় যায়—আষাঢ়ান্ত সুদীর্ঘ দিনমানের শেষে সূর্য *ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিকের নিবিড় বাঁশ বনের আড়ালে। ঘেঁটকোল ফুল কোথাও জঙ্গলে ফুটেছে, বাতাসে তার কটু উগ্রগন্ধ। দ্রব ঠাকরুণের মন শান্তিতে আনন্দে উৎসবে পূর্ণ হয়ে গেল।"*

বিভূতি-সাহিত্যের নারীর মন কেমন-যেন দূরপ্রসারী নয়, তবে গভীর, মনোজগতের…গভীর—অতলে তাদের অভিসার। এদের তুলনায় পুরুষ চরিত্রের মধ্যে দূরাভিসারের সন্ধান পাওয়া যায়। দরিদ্র, ছাপোষা মানুষ হলেও তারা দূরের স্বপ্ন দেখে। তাই "একটি ভ্রমণ কাহিনী'তে শম্ভু ডাক্তার আর গোপীকৃষ্ণ কত প্ল্যান করে দেশান্তরে যাবার। কিন্তু তারা পারে না। সংসারের শিকলে পড়েছে বাঁধা। কত ঝামেলা। তবুও দূরান্তরে যাবার নেশা তাদের কাটে না। তাই বারাসাত থেকে মাত্র দু'মাইল দূরের লাঙ্গল পোতায় তারা যায়।" স্মরণ রাখতে হবে বিভূতিভূষণ এদেরকে ব্যঙ্গ করেননি। কেননা, তারা ঠকেনি। আর লাঙ্গলপোতা "সত্যি বেশ জায়গা। অনেক কিছু দেখবার আছে। একটা পুরনো শিবমন্দির। চৌধুরীদের বড মজা দীঘি…মেটে রাস্তা।…হাট বসে—বেগুন-কুমড়ো ঝিঙে, রাঙাআলু বিক্রী হয়। রামায়ণ গান হোল নবমীর রাত্রে। পরদিন হোল গ্রামের দলের কেষ্ট যাত্রা।" এতেই তারা আনন্দিত, খুশী। গ্রামের ছোঁয়া তো তারা পেয়েছে তাই নাইবা হোল তাদের চিত্রকূট যাওয়া।

"সিঁদুর চরণ" গল্পেও আমরা এই পথের দেবতা'র প্রসাদ কণিকার সন্ধান পাই। 'মালিপোতা গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত ভ্রমণকারী, সিঁদুর চরণ—কেষ্টনগরের দু'ইষ্টিশান ওদিকে গেলেও—সে লেখকের সতীর্থ। লেখকের সহানুভূতি ও সমর্থন তা'তে সুস্পষ্ট!

যে-সব নারী আপাতদৃষ্টিতে সমাজের কাছে হেয়, অবহেলিত, নীচ, হীন ও পতিত, তাদেরও স্নিগ্ধ উজ্জ্বল নারী রূপটি—তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তিনি ব্যক্ত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যারা সত্যিকারের সৎ, যাদের চরিত্রের মধ্যে সরলতা আছে তারা কোনদিন মলিন হয় না। গতির গুণে নদীর জলে কোন ময়লা থাকে না। জীবনে সরলতাও ঐ ধরণের একটা গতি সম্পন্ন শক্তি, তাই পাপের মধ্যে বাস করলেও, সে কথনো পাপী হয় না। তাই "বিপদ" গল্পের হাজু তার সরলতা, তার পবিত্রতা দিয়ে জয় করেছে লেখককে। লেখক তাকে তিরস্কার করতে গিয়েও তাই থেমে গেছেন। তিনি সাফল্যের ইংগিত উচ্চারণ করেছেন ঐ গল্পটির মধ্যে। বিভূতিভূষণের চরিত্রের প্রশান্তির দিকটি এখানে লক্ষ্যণীয়। তিনি অদ্ভুত ভাবে, অনুত্তেজিত ভাবেই হাজুকে সমর্থন করলেন। কেননা ওর উৎসাহ দেখে, খুশী-আনন্দ দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। তাই যে কোনদিন ভোগ করেনি, তাকে ত্যাগের উপদেশ দিতে গিয়েও তিনি থেমে গেছেন।

"নসুমামা ও আমি" গল্পটির মধ্যে শৈশব স্মৃতির মন্থন চলেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান মিলে গিয়ে, জীবনের ভালবাসার দ্বন্দ্ব এসে এটিকে সম্পূর্ণ অন্যদিকে চালনা করেছে। নসুমামাকে ('আমি') নায়িকা ভালবাসার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছে এবং তার মহত্ত্বে নিজেও মহৎ হবার প্রেরণা পেয়েছে। "আবার ফাল্গুনে বনে বনে ফুল ফুটেচে, আবার কোকিলের ডাক পথে পথে। মুচকুন্দ চাঁপার সুগন্ধে ঘাটের রাণা ভুর ভুর করে। আমি একদিকে যেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। জ্যাঠামশাই-এর বৈঠকখানায় যোগবশিষ্ঠ শুনতে যাই রোজ বিকেলে। সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে রিক্ত হয়েই বোধহয় সেখানে পৌছতে হয়।" এ-টি একটি বিশিষ্ট ধরণের গল্প।

সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে, বর্ণনার মাধুর্যে অপূর্ব ছবি এঁকেছেন "ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল" গল্পে।

বিভূতিভূষণের গল্পগুলির মধ্যে মানুষের প্রাধান্য সে কথা আগেই বলেছি। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রকৃতি বর্ণনাও এসে গেছে। এবং শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁর কাছ থেকে "কনে-দেখা"র মতো গল্পও পেয়েছি। তাই মনে হয়—বিভূতিভূষণের সবুজ-প্রিয় মনটি এখানেও রয়ে গেছে। আর রয়ে গেছে বলেই বিভূতিভূষণ গড্ডালিকার স্রোতে হারিয়ে যান নি। 'কনে-দেখা'র নায়ক হিমাংশু তার প্রিয় পাম্‌কে মানুষের মতোই ভালবাসে। তাই অনেকদিন পর দুর্দশাগ্রস্থ পাম্‌কে অন্যের বাড়িতে দেখে তার মনে হলো—গাছটা তাকে চিনতে পেরেছে এবং বলছে, "আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি তোমার কাছে গেলে হয়তো এখনও বাঁচবো। ছেড়ে যেও না এবার। আমায় বাঁচাও।" শেষ পর্যন্ত সেই এরিকা পাম্‌কে উদ্ধার করে তবে সে শান্তি পেল এবং তাকে সংসারী করার সাধ হলো তার। 'তাই একটা ছোটখাট অল্প বয়সের, দেখতে ভাল পাম্ খুঁজছিলাম'। "হি-হি পাগল নয় হে, পাগল নয়, ভালবাসার জিনিস হোত তো বুঝতে।"—এই ভালবাসার উপলব্ধি এবং প্রকাশ বিভূতিভূষণেই সম্ভব।

অতিপ্রাকৃত বিষয় বস্তু নিয়ে লেখা "তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প"।

বিষয়বস্তু অতিপ্রাকৃত হলেও একেবারে ভুতুড়ে গল্প নয়। অতিলৌকিক জগৎ সম্বন্ধে তাঁর সরল বিশ্বাসের একটা ইংগিত পাওয়া যায় এতে।

বিভূতিভূষণের—ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা রোম্যান্টিক গল্পের উৎকর্ষতা আছে। এই পর্যায়ে আমরা উল্লেখ করতে পারি "মেঘমল্লার" গল্পের কথা। ইতিহাসের পটে লেখা। কিন্তু ইতিহাস খুবই ক্ষীণ। লেখকের রোম্যান্টিক কল্পনা প্রবণ মনই এর প্রকৃত ক্ষেত্র, প্রাণ। স্মৃতির সেতু বেয়ে পেছিয়ে যাওয়া যত পেছনে সম্ভব—অদেখাকে মূর্ত করে তোলা। এখানে যেন তাঁর তৃতীয় নেত্র কাজ করছে। কল্পনার রসে সঞ্জীবিত সে এক নতুন জগৎ। এখানে আর একটা লক্ষ্যণীয় হচ্ছে—বৌদ্ধযুগের প্রভাব। আমরা অবশ্য বিভূতিভূষণের বৌদ্ধপ্রীতির নিদর্শন অন্যত্রও পাই। "মেঘমল্লার" সরস্বতীর গল্প—সরস্বতী কলা-সৌন্দর্যের দেবী—তিনি বন্দিনী—এ কাহিনী তাঁর বেদনার রসে অভিসিক্ত। সরস্বতীকে মুক্তি দিতে প্রদ্যুম্ন হয়েছে প্রস্তরীভূত। বহির্জগতে এ তিরস্কৃত, ব্যর্থ হলেও অন্তর্জগতে পরম পুরস্কার তারা পেয়েছে, পেয়েছে তাদের পরম পাওয়াকে। 'জ্ঞান ও সৌন্দর্যের ব্যাপ্তিতে তাদের সিদ্ধি'। "যারা কলাদেবীকে নিজেদের নীচ স্বার্থ ও প্রলোভনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়, তাদের প্রতি বিভূতিভূষণের বিরাগ, আর যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে সরস্বতীর বিশুদ্ধ প্রাণ-সৌন্দর্যকে রক্ষা করবার জন্য, সেই সত্যকার শিল্পীদের প্রতি বিভূতিভূষণের মাথা আনত।" বিভূতিভূষণ স্বয়ংও সেই জাতের। তাই প্রদ্যুম্নর আত্মত্যাগে তিনি সশ্রদ্ধ।

সৎ ও সরল লোকদের প্রতি বিভূতিভূষণের একটা আকর্ষণ ছিল, ঝোঁক ছিল। তাই তাঁর রচনায় ঐ জাতের লোকদেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তাই তাঁর সাহিত্যে দেখি সততা ও সারল্যের সঞ্চয়।

উত্তমপুরুষে গল্পের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে—তাঁর রচনায়। তাই এই ভঙ্গিতে অন্তরংগতার স্পর্শ থাকলেও মাঝে মাঝে কেমন যেন একঘেয়ে বলেও মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। তা' হলেও এই

গল্প পড়তে পড়তে আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্বাদ—তা সত্যি হোক বা মিথ্যে হোক—পাই। বিভূতিভূষণকে ভাল লাগার এটিও বোধহয় আর একটি কারণ—গল্পের বক্তব্যের মাধ্যমে সকলকে আপন করে নেওয়া। আর আমার মনে হয়: একজন গল্পকার সেখানেই সার্থক, যেখানে তার বলার ভঙ্গিমা পাঠককে একাত্ম করে নিতে পারে।

এই প্রবন্ধটি লেখার সময় নিম্নলিখিত রচনাবলীর থেকে সাহায্য নিয়েছি:

১। শ্রেষ্ঠগল্প—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। সাহিত্যের কথা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। স্মৃতির রেখা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। জাল—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। কল্লোল যুগ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
৬। সাহিত্য বিতান—মোহিতলাল মজুমদার।
৭। বিভূতিভূষণ—চিত্ত ঘোষ।
৮। পরিচয়—শ্রাবণ, ১৩৩৯।
৯। স্মৃতিচিত্রণ—পরিমল গোস্বামী।
১০। শনিবারের চিঠি। কার্তিক—চৈত্র, ১৩৫৭।

বাংলার মন্দির

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

জোড়বাংলা

চন্দ্রকোণায় ও গুপ্তিপাড়ায় জোড়বাংলা মন্দিরে ভাবকল্পনা রূপসৃষ্টির যে সম্ভাবনা লইয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল তাহাই পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিল বাঁকুড়া জেলার মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত জোড়বাংলায়। কিন্তু বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলাটি মন্দির নির্মাণের স্থানীয় ভাবকল্পনার সহিত এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে ইহার গঠন প্রকরণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে বিষ্ণুপুরের আঞ্চলিক মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টার একটু পরিচয় আবশ্যক হইয়া পড়ে।

সুবিখ্যাত মল্লরাজ কুলের পৃষ্ঠপোষকতায় বিষ্ণুপুরে মন্দির নির্মাণ প্রচেষ্টা প্রধানতঃ যে রীতিকে অবলম্বন করিয়া আবর্তিত হইয়াছিল তাহা রত্ন রীতি; তাহার মধ্যে আবার এক রত্নই প্রধান। বর্গাকার মূল আসনের ভিতর রচিত হয় অভ্যন্তরের জটিল কক্ষ বিন্যাসে। গর্ভগৃহের চারিদিক ঘিরিয়া সঙ্কীর্ণ আয়তাকার কক্ষ। মুখভাগে ও দুই পার্শ্বে অবস্থিত কক্ষগুলিতে বাহির হইতে প্রবেশ করিবার জন্য থাকে ভঙ্গীকাটা খিলানশীর্ষ তিনটি করিয়া প্রবেশ পথ। পশ্চাতের কক্ষটিকে সাধারণতঃ বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখা। গর্ভগৃহে প্রবেশ পথ সাধারণত দুই দিকে মুখভাগে ও মুখভাগের দক্ষিণ দিকে। এই দুইদিকে দালান কক্ষ ও গর্ভগৃহের মধ্যবর্তী স্থূল দেওয়াল ভেদ করিয়া সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথ এবং তাহার পার্শ্বে দেওয়ালের মধ্যে পার্শ্ব কক্ষের অবস্থান। মুখভাগে যে প্রবেশ পথ তাহার বাম দিকের কক্ষের মধ্য হইতে উপরে যাইবার সোপানাবলীর প্রারম্ভ। গর্ভগৃহের বামদিকের দেওয়াল ভেদ করিয়া সোপানশ্রেণীর ঊর্ধ্বযাত্রা। কেন্দ্রস্থলবর্তী চতুরস্র গর্ভগৃহের উপরে একরত্ন মন্দিরের রত্ন-শিখর, পঞ্চরত্ন হইলে প্রধান রত্নটির অবস্থান।

বিষ্ণুপুরের আঞ্চলিক মন্দির গঠনে কক্ষ-বিন্যাসের যে সাধারণ প্রথা তাহার কথাই এতক্ষণ বলিলাম। কক্ষ বিন্যাসের এই সাধারণ প্রথার সহিত জোড়বাংলার মূলগত রূপবৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টায় বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলায় কক্ষ সমূহ যে ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে তাহার অভিনবত্ব লক্ষ্য করিবার মত। মন্দিরটির আসন আয়ত। মুখভাগ পশ্চাতের প্রসার পার্শ্বের তুলনায় হ্রস্বতর। বাহির হইতে দুইটি কক্ষের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া অন্তর্গত অংশটির অবস্থান হইতে বুঝা যায় সম্মুখের কক্ষটি পশ্চাতের বাংলাটির তুলনায় প্রস্থে বৃহত্তর। আসনকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়া গিয়াছে লম্বমান দেওয়াল আর অভ্যন্তরে হইয়াছে বিচিত্র কক্ষ-সমাবেশ। কক্ষ বিন্যাসের পরিকল্পনায় দুইটি বাংলার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সবটুকুকে একটিমাত্র লব্ধ ক্ষেত্রের মত ধরিয়া নিয়া শুরু হইয়াছে কক্ষ বিন্যাসে। মুখভাগ ও পশ্চাতের টানা দালানের অবস্থান। পশ্চাতের দালানটি বাহিরের দিক হইতে পশ্চাতের যে বাংলাটির অস্তিত্ব বুঝা যায় তাহার সবটুকু জুড়িয়া ব্যাপৃত। সম্মুখের বৃহত্তর বাংলাটি ও উভয় বাংলার মধ্যবর্তী

অন্তর্গত অংশটুকুর যে ক্ষেত্রে তাহার মধ্যে রহিয়াছে গর্ভগৃহ ও অন্যান্য পার্শ্ব কক্ষগুলি। ইহারই সম্মুখে মুখভাগের আয়তাকার দালান আর পশ্চাতে ঠিক কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে চতুরস্র গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের দুই পার্শ্বে দুইটি আয়তাকার কক্ষ। ডানদিকের কক্ষটিতে সম্মুখ ও পশ্চাত উভয়দিকের দালান হইতেই প্রবেশ করা সম্ভব কিন্তু বামদিকের কক্ষটি ও সম্মুখের দালানের মধ্যে প্রবেশ পথের কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। চারিদিকের আয়তকার কক্ষগুলির মধ্যে শুধুমাত্র সম্মুখেরটি'তেই প্রবেশ করিবার জন্য রহিয়াছে ভঙ্গীকাটা খিলান শীর্ষ তিনটি দ্বারপথ। পশ্চাতের কক্ষটির ডান দিকে একটি দ্বারপথ বাহিরের সহিত ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে।

দক্ষিণদ্বারী মন্দিরটির মুখভাগের দ্বারপথ তিনটি উন্মুক্ত রহিয়াছে সম্মুখের দালানের দিকে। দালানটি অতিক্রম করিলেই দেখা যাইবে দেওয়াল ভেদ করিয়া একটি সঙ্কীর্ণ অলিন্দপথ গর্ভগৃহে গিয়া শেষ হইয়াছে। গর্ভগৃহটি চতুঃশাল কক্ষ অর্থাৎ ইহার প্রধান চারিটি দিকেই সন্নিবিষ্ট দ্বারপথ। পার্শ্বের আয়তাকার কক্ষগুলির সহিত গর্ভগৃহের প্রত্যক্ষ সংযোগ এই দ্বারপথগুলির মাধ্যমেই। প্রধান প্রবেশ পথ—সম্মুখের অলিন্দ পথটি যে দেওয়াল ভেদ করিয়া গর্ভগৃহ ও সম্মুখের দালানের সংযোগ সাধন করিতেছে তাহার বামদিকের ক্ষুদ্র দ্বারপথটি দিয়া প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে সারি-বদ্ধ সোপান উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে।

চতুরস্র গর্ভগৃহের বর্গাকারে দেওয়াল একটি বিশাল স্তম্ভের মত উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। তাহাকে ঘিরিয়া দালান ও পার্শ্ব কক্ষগুলির দেওয়াল। দেওয়ালগুলি শেষ হইয়াছে দোচালা আচ্ছাদনের অন্তরাস্থিত ভল্টের গাত্রে। ইহাদের শীর্ষদেশও তাই রচিত হইয়াছে ভল্টের প্রয়োজনানুসারে অর্থাৎ কখনও বা ধনুকাকৃতিতে বাঁকায় কখনও বা সোজা ঢালের উপর অবস্থিত সরলরেখায় পর্যবসিত।

অভ্যন্তর বিন্যাসে বিষ্ণুপুরের স্থপতিরা জোড়বাংলা আসনের সহিত আঞ্চলিক পদ্ধতির মিলনে মিশ্রণে দুইটি বাংলার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। একক সংস্থানের প্রচেষ্টা গুপ্তিপাড়াতেও হইয়াছিল কিন্তু সে জোড়বাংলার মূলগত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বহিরূপে দুইটি বাংলার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বিষ্ণুপুরে দেখিতেছি ভাবকল্পনা সংহত হইয়া উঠিয়াছে—বাহির হইতে জোড়বাংলা আকৃতির মূলগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিয়া একক সংস্থানের কল্পনা রূপ লাভ করিতেছে।

মন্দিরটিতে পার্শ্বের দেওয়ালের অন্ত্যক্ষেত্রে ত্রিভুজের পরিমিত উচ্চতা দেওয়ালের খাড়া অংশ অপেক্ষা বহুলাংশে হ্রস্ব। সম্মুখে ও পিছনে দেওয়াল শেষ হইয়াছে আয়ত আঁখিপল্লবের মত বক্র-রেখায় বিধৃত হইয়া। ইহার উপরে বাঁকান কার্ণিসের গতিভঙ্গও অনুরূপ। কার্ণিসটি দেওয়ালের উপর হইতে স্তরে স্তরে উঠিয়া আসিয়া বক্রাকৃতি আচ্ছাদনের পাদদেশে মিশিয়া গিয়াছে। ধীর বক্ররেখায় বিধৃত দেওয়ালের শীর্ষ, আয়ত আঁখিপল্লবের মত কার্ণিস ও বক্ররেখ আচ্ছাদন, ক্রমান্বয়ে আগত মন্দিরদেহের এই অঙ্গগুলি ক্রম পরিণতির বন্ধনে আবদ্ধ—কোথাও অসঙ্গতির কোন অবকাশ নাই।

উভয় বাংলাতেই সম্মুখের চালা দুইটি ধীর বক্ররেখায় বাঁকাইয়া দেওয়া। কিন্তু পশ্চাতের

চালা দুইটি অপেক্ষাকৃত সোজা ঢালের সহিত একটু দ্রুত নামিয়া গিয়াছে—আকারেও তাহারা সম্মুখের গুলি অপেক্ষা বৃহত্তর। দ্বিধাবিভক্ত আচ্ছাদন একত্র সংহতরূপে ধীর বক্ররেখায় উঠিয়া খানিকটা সোজা ঢালের সহিত নামিয়া গেল, আবার ধীর বক্ররেখায় বিধৃত হইয়া উঠিবার পর যখন নামিতেছে পূর্বের মত খানিকটা সোজা ঢালের উপরেই তাহার গতিপথ। দুইটি পৃথক কক্ষেও চালা আচ্ছাদন এখানে একটি প্রবহমান রেখার বন্ধনে বিধৃত। রূপ বৈচিত্রের পথে কৃত্রিমতার জড়তা অতিক্রম করিয়া জোড়বাংলার দ্বিধাবিভক্ত চালা আচ্ছাদনদ্বয় একটি অখণ্ডরূপের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নৃত্যমুখর উর্মিমালার মত দুইটি চালা আচ্ছাদনের ঠিক মাঝখানে রহিয়াছে চতুরস্র গর্ভগৃহের উপরে অবস্থিত অনুরূপ আকৃতির একটি বেদী। উচ্চতায় ইহা চালা আচ্ছাদনের সামান্য উপরেই। বেদীটির উপরে রহিয়াছে মন্দিরটির চূড়া, চারচালা আচ্ছাদনে আবৃত ক্ষুদ্রাকৃতি একটি চতুঃশাল কক্ষ।

দেওয়ালের উচ্চতার অনুপাতে চালা আচ্ছাদনটিকে আরও কিছুটা উচ্চ করিয়া গঠন করা চলিত কিন্তু সে অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছে আচ্ছাদনের উপরিস্থিত চতুরস্র বেদীটি ও তাহার শীর্ষস্থিত চারচালা চূড়া। প্রবহমান ধরিয়া আগত চালা আচ্ছাদন দুইটির ঠিক মধ্যস্থলে এই বিচিত্র চূড়ার অবতারণা আচ্ছাদনের সমগ্র সত্বাকে আরও সংহত করিয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই।

সংহত রূপকল্পনার আর একটি প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় মন্দিরটির গাত্রালঙ্কার সজ্জায় ও তাহার বিন্যাসে। দুইটি কক্ষেরই প্রায় সমগ্র গাত্র ব্যপ্ত করিয়া লম্বমান রেখা প্রবাহ ও তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে আনুভূমিক রেখার সারি। বিপরীতমুখী রেখা প্রবাহের সমাবেশে উদ্ভূত বন্ধনীগুলির মধ্যে পোড়ামাটির অসংখ্য মূর্তি বিচিত্র কার্য্যকলাপে লিপ্ত। মন্দিরের মুখভাগে—প্রকৃতপক্ষে ভঙ্গীকাটা খিলানের উপর ও স্তম্ভগাত্রে—অলঙ্করণ বিন্যাস কিছুটা পৃথক। এ পার্থক্য অবশ্য স্থাপত্যগত কারণেই। উভয় কক্ষেরই প্রতিটি কোণে প্রান্ত বাহিয়া নামিয়াছে পাতলা টালির ছড়। ইহার কিছুটা পরেই ইষৎ উদ্গত কৃশকায় বৃথাস্তম্ভ কক্ষগুলির পার্শ্বদেশে তীর বরগার কাঠামোর অলঙ্করণ ধারণ করিয়া বিরাজমান। অনুরূপ সজ্জায় অলঙ্কৃত দেওয়ালগুলিতে বন্ধনীধৃত সারিবদ্ধ মূর্তিফলক অনুসরণ করিয়া দৃষ্টি অত্যন্ত সহজভাবে আগাইয়া যায়। পার্শ্বদেশে যেখানে উভয় বাংলার পার্থক্য নির্দেশ করিয়া অন্তর্গত অংশটি বিদ্যমান সেখানেও দৃষ্টি বাধা পাইয়া থামিয়া যায় না। অন্তর্গত এই অংশটি তাহার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হারাইয়া সর্বব্যাপী অলঙ্করণের পরিণাম প্রভাবে তাহার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

আসন পরিকল্পনা, অভ্যন্তর বিন্যাস, আচ্ছাদন গঠন, অলঙ্করণ রচনা, সবকিছু মিলিয়া বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলার যে রূপটি ফুটিয়া উঠে একটি সুসংহত রূপকল্পনা হইতে যে তাহার জন্ম তাহাতে সন্দেহ নাই। একমাত্র অভ্যন্তরের কক্ষ বিন্যাস ছাড়া অন্যকোথাও জোড়বাংলার মূলগত বৈশিষ্ট্য এতটুকুও ক্ষুন্ন হয় নাই। দুইটি বাংলার পৃথক অস্তিত্ব আসনে, মন্দির গাত্রে, আচ্ছাদনে সর্ব্বত্রই সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর। কিন্তু পার্থক্য কোথাও স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে পারে নাই—সামগ্রিক রূপকল্পনায় একাঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা নির্মিত হইয়াছিল ৯৬১ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে। ইহার

পূর্বে মাত্র দুইটি জোড়বাংলার কথা আজ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। চন্দ্রকোণা ও গুপ্তিপাড়ায় সমস্যা সচেতনতা ও রূপসৃষ্টির প্রয়াস অবশ্যই ছিল। তত্রাচ, বিষ্ণুপুরে যে পরিণত ভাবকল্পনা ও রূপ সচেতন শিল্পীচিত্তের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে গুপ্তিপাড়ার চৈতন্য মন্দির হইতে সেই শীর্ষে কোন পথ বাহিয়া উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল তাহার কোন পরিচয়ই আজ আর আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও তাহার পরে উনবিংশ শতকে নির্মিত জোড়বাংলার যে কয়টি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার একটিতেও সামগ্রিক রূপকল্পনার পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জোড়বাংলার মূলীভূত সমস্যা সমাধানে বিষ্ণুপুরের অভিজ্ঞতা যেটুকু প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল তাহার পরিমাণ সামান্যই। জোড়বাংলার কৃত্রিমতা অতিক্রম করিবার নবতর কোন প্রচেষ্টা একটি মন্দিরেও দৃষ্টিগোচর নহে। রূপকল্পনা দেখিতেছি আচ্ছাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহাও বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ মন্দিরদেহের কৃত্রিমতা অতিক্রম করিবার কোন প্রয়াস বিশেষ ভাবে কোথাও করা হয় নাই। অষ্টাদশ শতক হইতে নির্মিত জোড়বাংলাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে সামগ্রিক ভাবকল্পনা বিহীন প্রথাগত রূপের প্রতি আকর্ষণটাই স্পষ্ট হইয়া ওঠে। সৃষ্টিশীল কল্পনার যুগ দেখিতেছি বিষ্ণুপুরেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

অষ্টাদশ শতকের জোড়বাংলাগুলির মধ্যে নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা-বীরনগর গ্রামের মুস্তৌফী বংশের কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশ্যে সমর্পিত মন্দিরটির, জোড়বাংলা দেহের অন্তর্নিহিত সমস্যা সমাধান করিবার প্রশ্ন এক্ষেত্রে স্থপতির ভাবনা-কল্পনাকে খুব একটা প্রভাবিত করিয়াছিল এমন নহে। চন্দ্রকোনা ও গুপ্তিপাড়ার পদ্ধতিই এখানে অনুসৃত হইয়াছে অর্থাৎ ভিতরের দিকের চালা দুইটি নামিয়াছে খানিকটা বেশী ঢালের সহিত। বক্ষ দুইটিও তাই পরস্পরের দিকে একটু ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।

জোড়বাংলার কক্ষ দুইটির পৃথক অস্তিত্ব স্থপতি প্রায় পূর্ণভাবেই স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যর্থতাই কৃষ্ণচন্দ্রের আবাসগৃহ সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। মন্দিরদেহের নিম্নাংশ ও আচ্ছাদনের সামঞ্জস্যপূর্ণ বণ্টন ও চালা আচ্ছাদনের ধীর বক্রগতির মধ্যে রূপকল্পনার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। মন্দিরটির আচ্ছাদন সম্পূর্ণ বহিবর্তুল। আয়ত আঁখি পল্লবের মত কার্ণিসে বক্ররেখার যে গতিভঙ্গ তাহাই আচ্ছাদনের সমগ্র দেহের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। আচ্ছাদনটি দেখিতে হইয়াছে ঠিক হস্তিপৃষ্ঠের মত। বস্তুত দোচাল আচ্ছাদনের বহিবর্তুলতা অন্যকোন জোড়বাংলায় এতটা স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। বক্ররেখার সুনির্দিষ্ট গতিবেগে যতটুকু সম্ভাবনা ছিল তাহার সবটুকুই উপলব্ধ হইয়াছে এবং সম্পূর্ণভাবে। এই রূপেরই আর একটি উদাহরণ হইল পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্গত পাবনা সহরের অষ্টাদশ শতকীয় জোড়বাংলাটিতে।

জোড়বাংলার আচ্ছাদন বিন্যাসে বিষ্ণুপুরের স্থপতি যে রূপকল্পনা করিয়া ছিলেন তাহার অনুকৃতি ঘটিয়াছে বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চননগর গ্রামের শিবদুর্গা মন্দিরে। তবে মন্দিরটি একটি অনুকৃতি মাত্র স্বাধীন স্থাপত্য ভাবনার কোন পরিচয় ইহাতে নাই। মন্দিরদেহের পার্শ্বদেশে ত্রিভুজশীর্ষের উচ্চতা দেওয়ালের খাড়া অংশের অনুপাতে অতিরিক্ত হ্রস্ব। আচ্ছাদনের উচ্চতাও

হইয়াছে তদনুরূপ। আচ্ছাদন ও দেওয়ালের মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক তাই সামঞ্জস্য হীনতায় দ্বিধাগ্রস্থ বিষ্ণুপুরের সমাধান স্থপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও তাহাকে রূপবদ্ধ করিতে যে অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তির প্রয়োজন ছিল তাহার অভাবে কাঞ্চননগরের জোড়বাংলা অক্ষম অনুকৃতির অগৌরবে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

দেহের নিম্নাংশের সহিত আচ্ছাদনের সামঞ্জস্য ঘটে নাই বটে কিন্তু শুধুমাত্র আচ্ছাদন রচনায় রূপকল্পনার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিবার মত। হ্রস্বাকৃতি লঘুভার চালা আচ্ছাদনে বক্ররেখার গতি লম্বমান ও আনুভূমিক উভয়েই ধীর এবং সংযত। প্রতিটি চালার নীচের দিকে, ঠিক মধ্যস্থলে আচ্ছাদন ধীর বক্ররেখায় সামান্য বহির্বর্তুল। ইহাকে ঘিরিয়া সমগ্র চালাটিই ঈষৎ চাপা। এ বৈপরীত্যে কিন্তু কোন বৈষম্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আচ্ছাদনের উপরে দুইটি চালাকে একত্রে বাঁধিয়া দিয়া চলিয়াছে লঘুভার ঈষৎ উদ্গত রেখার প্রবাহ। দেহের সহিত আচ্ছাদনের সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিয়াছে সত্য কিন্তু বৈচিত্র্যান্বিত লঘুভার চালাগুলিকে বিষ্ণুপুরের অনুকরণে প্রবহমান ধারায় সজ্জিত করিতে স্থপতি যে সক্ষম হইয়াছেন ইহা সত্য।

মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগর গ্রামের গঙ্গাধর শিব মন্দিরেও রূপসৃষ্টির প্রচেষ্টা ব্যাহত হইয়াছে আচ্ছাদনের সহিত দেওয়ালের আনুপাতিক সম্পর্ক নির্ণয়ে পরিমাণ বোধের অভাবে দোচালা কক্ষের দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রায় দ্বিগুণ। ইহার উপরে যে আয়ত আচ্ছাদন রচিত হয় তাহার উচ্চতা প্রস্থের পরিমাণ অতিক্রম করিলে মন্দির দেহের সহিত আচ্ছাদনের সামঞ্জস্য ব্যাহত হইয়া যায়। বড়নগরের জোড়বাংলাতে ঘটিয়াছে তাহাই। উচ্চতার সুনির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া আচ্ছাদন উর্দ্ধমুখে অত্যন্ত দ্রুতভাবে অনেকটাই উঠিয়া গিয়াছে।

কার্ণিসে ও আচ্ছাদনের দেহে বক্ররেখার গতি অত্যন্ত দ্রুত। কোণ হইতে চালার বহিরেখা ডিম্বের গতিপথ অনুসরণ করিয়া অত্যন্ত দ্রুততার সহিত উঠিয়া গিয়াছে এবং নামিয়াছেও সমান বেগের সহিত। বক্ররেখার গতিভঙ্গ প্রশ্রয় পাইয়াছে চালার আকৃতি ও বিন্যাসে। লঘুভার চালার আকৃতি কাঞ্চননগরের মতই। দুইকোণ হইতে চাপা ভাবে উপরের দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে —নীচের দিকের মধ্যমাংশটি শুধু বহির্বর্তুল। চালাগুলি উঠিয়াছে খাড়াভাবে অন্যান্য দোচালা আচ্ছাদনের মত ভিতরের দিকে একটু ঝুঁকিয়া নহে। উভয় কক্ষেই দুইটি চালার সংযোগস্থলের উদ্গত রেখাটি সুপরিসর চালা দুইটির তুলনায় ক্ষীণ ও সঙ্কীর্ণ। দ্রুতগামী বক্ররেখার বিধৃত লঘুভার চালার প্রখরতায় মন্দিরদেহের অন্য সমস্ত বৈশিষ্ট্যই প্রায় আচ্ছন্ন। আচ্ছাদনের প্রতি অতি সচেতনতা হইতেই মন্দিরদেহের সামঞ্জস্য হীনতার সূত্রপাত।

মন্দিরদেহে অসঙ্গতি সত্ত্বেও কাঞ্চননগরে ও বড়নগরে স্থপতির রূপসচেতন চিত্তের একটা পরিচয় আচ্ছাদন রচনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বোধ করি এই কারণেই কাঞ্চননগরের শিবদুর্গা মন্দির প্রাণহীন অনুকৃতি মাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই আর বড়নগরের গঙ্গাধর শিবের আবাসগৃহটি সজীবতার স্পর্শ লইয়া বিরাজমান।

বড়নগরের প্রায় সমসাময়িক কালে—১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত বর্দ্ধমান জেলার কালনা সহরের সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির ও তাহার প্রায় একশত বৎসর পরে, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হুগলী জেলার

সানিহাটি গ্রামের বিশালাক্ষী মন্দিরে স্থপতির রূপসচেতনতার কোন চিহ্নই দৃষ্টিগোচর নহে। প্রথাগত ভাবকল্পনার নবতর কোন বিকাশ ঘটে নাই। প্রথাগত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ দেহ গঠনেই স্থপতির কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ। হুগলীজেলার দশঘড়া গ্রামের বিশালাক্ষী মন্দিরে ও বর্তমান পূর্বপাকিস্থানের যশোহর জেলার মহেশ্বরপাশা গ্রামের মন্দিরটিতে ভাবকল্পনার শেষ স্পর্শ টুকুও মুছিয়া গিয়াছে।

জোড়বাংলা মন্দিরের কথা শেষ করিব একটি অভিনব দৃষ্টান্তের আলোচনা করিয়া। মন্দিরটি হুগলী জেলার দ্বারকেশ্বর নদ তীরবর্তী বালী গ্রামের রাউতপাড়ায় অবস্থিত। দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে সমর্পিত মন্দিরটির সুউচ্চ দেওয়ালের উপর অতি সংক্ষিপ্ত আয়তনের চালা আচ্ছাদন, আর দুইটি কক্ষের আচ্ছাদনদ্বয়ের মিলনস্থল জুড়িয়া একটি নবরত্ন কক্ষ। সুউচ্চ দেওয়ালের তুলনায় অতি সংক্ষিপ্ত চালা আচ্ছাদন আর তাঁহার উপরে চালার তুলনায় অতি বৃহৎ নবরত্ন শীর্ষ—সব মিলিয়া বালী গ্রামের দুর্গা মন্দিরটি কল্পনাহীন গঠনকর্মের এক অভিনব দৃষ্টান্ত হইয়া উঠিয়াছে। বোধকরি উর্দ্ধাংশ নির্মাণে বিষ্ণুপুরের অনুসরণ করিতে গিয়াই এই বিপর্য্যয়ের সূত্রপাত।

গ্যেটের উপন্যাস—"ওয়ার্থারের দুঃখ বেদনা"

সত্যভূষণ সেন

জার্মানীর সাহিত্য প্রতিভা গ্যেটে; গ্যেটের প্রতিভা গভীরতার দিকে যেমন ছিল অগাধ, ব্যাপ্তি বা প্রসারতার দিকেও তা ছিল তেমনিই অসাধারণ। জগতে এবং মানব জীবনে এমন কিছু প্রায় ছিল না যা তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার দৃষ্টিতে এসে ধরা দেয়নি। গ্যেটের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর নাট্যকাব্য "ফাউষ্ট," কিন্তু এতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় নিঃশেষিত হয়ে যায় নি, গীতিকাব্য রচনায়ও তাঁর প্রতিভার অপূর্ব উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক। তার উপরেও তিনি ছিলেন একজন মননশীল দার্শনিক এবং একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন যেন একজন দিকপাল।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় সত্ত্বেও গ্যেটে কবি এবং নাট্যকার হিসাবেই সমধিক পরিচিত। তাঁর সাহিত্য কৃতির তালিকায় কয়েকখানা উপন্যাসও আছে, কিন্তু গ্যেটের উপন্যাস সম্পর্কে সাধারণ লোকের আগ্রহ বা পরিচয় নেই বললেই হয়। কিন্তু গ্যেটের রচিত একখানা উপন্যাস আছে যাকে অগ্রাহ্য করলে গ্যেটে সাহিত্যের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিছু আগে আমেরিকা থেকে উপন্যাস খানার আর এক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক মন্তব্য করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্য নিষ্ঠার সহিত অধ্যয়ন করতে হলে এই উপন্যাসখানা বাদ দিলে চলবে না। গ্যেটে নিজেও তাঁর শেষ পর্য্যন্ত এই উপন্যাস খানাকে "ফাউষ্ট" এর পরেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে গৌরব বোধ করতেন।

উপন্যাসখানার নাম Die Leiden des jungen Werther (তরুণ ওয়ার্থারের দুঃখ বেদনা) উপন্যাসের মূল আখ্যায়িকা এইরূপ; তরুণ যুবক ওয়ার্থার লোত্তে নামক একজন তরুণীর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং প্রথম দর্শনেই তার প্রতি প্রেমানুরাগে আকুল হন; কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি জানতে পারেন যে লোত্তে অপর এক জনের (অ্যালবার্টের) বাগদত্তা। এতে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হল না। ওয়ার্থার অ্যালবার্ট লোত্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে গৃহীত হলেন। অ্যালবার্টের অনুপস্থিতিতেও ওয়ার্থার লোত্তের গৃহে যাতায়াত করতেন। অ্যালবার্টেরও এতে আপত্তি দেখা যেত না। একদিন অ্যালবার্টের অনুপস্থিতিতে লোত্তের প্রতি ওয়ার্থারের কামনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। লোত্তে বিরক্ত হয়ে যথাসময়ে অ্যালবার্টের গোচরে আনেন। ওয়ার্থারের উপরে কতকটা শাসন নিয়ন্ত্রণ হল, কিন্তু তিনি একেবারে পরিত্যক্ত হলেন না। পরস্পরের প্রীতির সম্পর্ক প্রায় পূর্বের মতই অব্যাহত ভাবে চলতে লাগল। অবশেষে পরিস্থিতি একদিন চরমে পৌছল। অ্যালবার্টের অনুপস্থিতিতে লোত্তের সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনার অবকাশে ওয়ার্থার প্রেমের আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে অকস্মাৎ লোত্তেকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে তাকে চুম্বনে অভিষিক্ত ও আচ্ছন্ন করে ফেলেন। লোত্তেও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে উঠে

ওয়ার্থারকে শাসন করেন এবং জানিয়ে দিয়ে যান যে তার সঙ্গে আর কখনও দেখা সাক্ষাৎ হতে পারবে না। ওয়ার্থার চরম নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে অ্যালবার্টের পিস্তল ধার করে এনে তারই আঘাতে আত্মহত্যা করেন।

উপন্যাসখানা প্রকাশিত হয় ১৭৭৪ সালে তখন কবির বয়স চব্বিশ বৎসর মাত্র—এর আগে তাঁর যে সকল রচনা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একখানা গদ্যে লিখিত নাটক গোটজ্ ফন বেরলিচিঙ্গেন" (Gotz von Berlichingen) 'ওয়ার্থার' উপন্যাসখানা প্রকাশিত হওয়া মাত্র সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে সাড়া পড়ে গেল ; এই একখানা পুস্তকের দৌলতে যেমন লেখক তেমনই জার্মান সাহিত্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করল ; গ্যেটে যেন একদিনে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠলেন, তাঁর জীবনে এমন প্রমত্ত খ্যাতি লাভ আর কখনও ঘটেনি। ইউরোপের প্রায় সকল ভাষায় এই উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হল বিশেষ করে ফরাসী এবং ইংরেজি ভাষায় ; ১৮০০ সাল পর্য্যন্ত একখানা ইংরেজি অনুবাদের ছাব্বিশটি বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসখানা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে চমকপ্রদ লক্ষণীয় সংবাদ যে গ্যেটের নিজ জীবনের ঘটনা থেকে এর উদ্ভব ; তাঁর জীবনের ঘটনার সহিত এই উপন্যাস এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত যে এটাকে তাঁর জীবন-উপন্যাসও বলা যেতে পারে। কবি সাহিত্যিক হিসাবে এবং মননশীলতা ও ব্যাক্তিত্ব গরিমার দিক থেকে গ্যেটে ছিলেন একজন বিরাট পুরুষ। অপর পক্ষে তাঁর দুর্বলতাও ছিল অসীম। নারীর দেহ সৌন্দর্য্য এবং যৌবন লাবণ্য তাঁর চিত্তে সকল ক্ষেত্রেই মোহ বিস্তার করত, এরূপে বহুবার তাঁর চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে, যখন তার বয়স পনেরো বৎসর মাত্র তখন থেকেই তাঁর প্রণয় কাহিনী আরম্ভ হতে দেখা যায়। তাঁর জীবনের এরূপ একটি প্রণয় কাহিনীর ভিত্তিতে এই উপন্যাসের উদ্ভব। কাহিনী সংক্ষেপত এইরূপ।

গ্যেটে আইন অধ্যয়ন করেন তাঁর পিতার আগ্রহাতিশয্যে এবং তাঁরই আগ্রহে তেইশ বৎসর বয়স্ক তরুণ ব্যারিষ্টার ১৭৭২ সালে ওয়েৎজলার (Wetzlar) নামক এক মফঃস্বল সহরে আইন ব্যবসায়ের জন্য আসন। গ্যেটের নিজ মন ছিল সাহিত্য অনুশীলনে উন্মুখ ; আইন আদালতে তাঁকে দেখা যেত কদাচিৎ। সহরটি ছিল অতি সঙ্কীর্ণ, কিন্তু সহরের বাইরে লান (Lahn) উপত্যকা সে মাসের ঋতু সৌন্দর্যে লাবণ্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তরুণ কবি চলে যেতেন বনে উপবনে ঝরণার ধারে এবং সেই মোহময় পরিবেশে বসে তিনি পড়তেন হোমার, পিণ্ডারের কাব্য, বহু জনগণের সহিত আলাপ আলোচনা করতেন চিত্রাঙ্কন করতেন এবং চিন্তা কল্পনা করতেন।

এরূপ পরিবেশে তরুণ তরুণীদের এক নৃত্যের আসরে উনিশ বৎসর বয়স্কা তরুণ লোত্তের সহিত গ্যেটের সাক্ষাৎ লাভ হয়। গ্যেটে নৃত্য আসরে যাবার পূর্বে আরও কয়েকটি তরুণীর সাহচর্য্যে লোত্তেকে নিয়ে যাবার জন্য তার বাড়ীতে যান এবং সেখানেই প্রথম এর দর্শন লাভ করেন। লোত্তেও নৃত্যের পোষাক পরে তৈরী ছিল সাদা রংএর ফ্রক এবং গোলাপী রংএর "বো" মাতার অভাবে পিতৃগৃহে সে-ই ছিল ছোট ছোট ভাইবোনদের মাতৃস্থানীয়া। সেই সময়ে সে সমবেত ভাইবোনদের রুটি কেটে দিচ্ছিল। লোত্তে অপরূপ সুন্দরী। নীল নয়না,

চেহারায় সৌম্য ভাব এবং চরিত্রের বিকাশও যেন ফুটে উঠেছে, উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলেও সকল বিষয়ে সচেতনতা ছিল। বয়সোচিত চাঞ্চল্য থাকলেও। হয়তো অবস্থার পরিবেশের ফলে। চরিত্রে গভীরতাও ছিল। গ্যেটে পরদিন আবার এসে লোত্তের সঙ্গে দেখা করেন এবং তার প্রতি প্রেমানুরাগে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। অনতিবিলম্বে গ্যেটে জানতে পারেন যে এই বালিকা অপরের বাগদত্তা। বর কেস্টনার নামে একজন সরকারী কর্মচারী। কেস্টনার লোত্তেকে গভীর ভাবে ভাল বাসতেন এবং লোত্তেও প্রেমের প্রতিদানে উন্মুখ ছিলেন। তাদের প্রেমে তেমন প্রমত্ততা ছিল না। ছিল এক প্রকার শান্ত অনাবিল ভাব যার উদ্দেশ্য ছিল গার্হস্থ্য জীবন রচনা; তারা অপেক্ষা কর ছলেন কেস্টনারের আর্থিক সামর্থ্যের জন্য।

কেস্টনার লোত্তের সংসর্গে গ্যেটে হয়ে পড়লেন তৃতীয় ব্যক্তি। গ্যেটে ছিলেন একজন গুণবান পুরুষ, তার দেহকান্তি ছিল অ্যাপলোর ন্যায় সুন্দর। তার ব্যক্তিত্ব গৌরব এবং স্বভাব মাধুর্য ছিল মনোমুগ্ধকর। কেস্টনার এবং লোত্তেও মুগ্ধ হলেন। এমন কি লোত্তের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিকটও গ্যেটের সঙ্গ অত্যন্ত প্রার্থনীয় হয়ে উঠল। কেস্টনার লোত্তে পরম সমাদরে তাকে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাবে গ্রহণ করলেন; তারা হয়তো জানতেন না গ্যেটের বিগত সব প্রণয় কাহিনীর কথা। এই সময়ের কিছুকাল আগেই একজন ধর্মযাজকের কন্যা ফ্রেডোরিকা নামে এক গ্রাম্য বালিকার সঙ্গে গ্যেটের প্রণয় সম্পর্ক ঘটে। হয়তো এর সঙ্গে বিয়েতে পিতার সম্মতি পাওয়া যেত না, হয়তো গ্যেটের অভিজাত সমাজে এই গ্রাম্য বালিকার সমাদর লাভ ঘটত না; যে কারণেই হোক গ্যেটে বিয়ে করতে অস্বীকৃত হয়ে একে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। এদের প্রণয় সম্পর্ক এমনই ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ফ্রেডেরিকা পরবর্তী প্রণয় প্রার্থীদের বলতেন যে হৃদয় একবার গ্যেটের ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছে তা আর কারও প্রাপ্য হতে পারে না।

এইরূপে তিনজনের জীবনধারা সম্মিলিত ভাবে চলতে লাগল; কাজ কার্য্যের প্রয়োজন প্রবাহে কেস্টনার অনেক সময় অনুপস্থিত থাকতেন, তখন একমাত্র গ্যেটেই লোত্তের সহচর। গ্যেটে লোত্তেকে গৃহকার্য্যে সাহায্য করতেন। ফল ফুল সংগ্রহ করতে দুজনে বাগানে ঘুরে বেড়াতেন। গ্যেটের তুলনায় কেস্টনার ছিলেন হীনপ্রভ; কেস্টনার প্রায়শঃ অনুপস্থিত, গ্যেটে নিত্য সহচর। এই অবকাশে এবং সুযোগে গ্যেটের অন্তরের আবেগ কখনও কখনও অবারিত হয়ে পড়ত। লোত্তে গ্যেটেকে ভালবাসতেন বটে। কিন্তু তার ধর্মবুদ্ধি প্রভাবে তিনি নিজকে যেমন সংযত করতেন তেমনই গ্যেটেকেও শাসন নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। একদিন আবেগে অভিভূত হয়ে গ্যেটে লোত্তেকে চুম্বনে অভিভূত করলেন। লোত্তে অতিমাত্রায় বিরক্ত হয়ে দ্বিধামাত্র না করে কেস্টনারকে বলে দিলেন।

কিন্তু তারা গ্যেটেকে পরিত্যাগ করলেন না। তারা স্থির করলেন তারা গ্যেটেকে আরও শাসন নিয়ন্ত্রণে রাখবেন; তার প্রয়োজনও হয়ে পড়েছিল কারণ তাদের এই ত্রিভুজাকার সম্পর্ক নিয়ে সমাজে কলঙ্ক গুঞ্জন আরম্ভ হয়েছিল। কেস্টনারও বিরক্ত হয়েছিলেন বটে কিন্তু কোনও বিষয়ে ক্রুদ্ধ হবার মত মনোবৃত্তি তার ছিল না; লোত্তে গ্যেটেকে শাসন করে দিলেন যে খাঁটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া তিনি যেন আর কিছু আশা না করেন। এই ব্যাপারে গ্যেটে যে বিব্রত বোধ

করলেন এবং যে মনোবেদনা তিনি ভোগ করতে লাগলেন তার জন্য কেস্টনার এবং লোত্তেরও সহানুভূতি বোধ ছিল। তারা প্রীতির আন্তরিকতায় তাকে শান্তি দান করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তারা গ্যেটেকে উপহার পাঠাতেন লোত্তের একখানা চিত্র। গ্যেটে লোত্তেকে যে পরিচ্ছদে প্রথম দেখতে পান সেই গোলাপী রংএর 'বো' ইত্যাদি; শুধু লোত্তে নয় কেস্টনারও উপহার পাঠাতেন।

এরূপ মোহময় পরিস্থিতি চার মাস চলেছিল। তার পরে গ্যেটে একদিন কাউকে না জানিয়ে অকস্মাৎ তাদের সংসর্গ ছেড়ে চলে গেলেন।

ঠিক তার পরেই অনুরূপ আর একটি ঘটনা। গ্যেটের জীবনে এসে দেখা দিলেন আর এক এক তরুণী ম্যাক্সিমিলিয়ানে নামে অপরূপ সুন্দরী কৃষ্ণনয়না এক রমণী। সম্প্রতি এর বিয়ে হয়েছিল বিপত্নীক এক ধনী ব্যবসায়ীর সহিত। প্রিটার ব্রেলটানো ম্যাক্সিমিলানে এই বিয়েতে সুখী হতে পারেন নি। গ্যেটে অনেক সময়ে এই রমণীর গৃহে এসে দেখা দিতেন; যেমন লোত্তের ভাইবোনদের সঙ্গে তেমনই এর স্বামীর পূর্বতন পাঁচটি সন্তানের সঙ্গেও খেলা করতেন। ম্যাক্সীর সঙ্গে সঙ্গীতে যোগদান করতেন—সম্পর্কের ঘনিষ্টতা হয়তো এতেই নিঃশেষ হত না। ব্রেলটানোর বিরুদ্ধতায় এই সম্পর্ক শেষ হল, গ্যেটে চলে আসতে বাধ্য হলেন।

গ্যেটের "ওয়ার্থার" উপন্যাস রচনায় এই ঘটনারও অনেকটা দান আছে। কিন্তু আরও গুরুতর প্ররোচনা এল আর একটি রোমাঞ্চকর চমকপ্রদ ঘটনা থেকে। ঘটনাটি ঘটে ওয়েৎপ্লাবেতে ১৭৭২ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে। কার্ল উইলহেলম যেরুজালেম নামে একজন সরকারী কর্মচারী পিস্তলের গুলির আঘাতে আত্মহত্যা করেন। এই পিস্তল তিনি বার করে নিয়েছিলেন গ্যেটেরই এক বন্ধু কেস্টনারের নিকট থেকে। যেরুজালেমও গ্যেটের বন্ধু ছিলেন, ওয়েৎপ্লাবেতে থাকা কালে তার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। এই আত্মহত্যার মূলেও ছিল প্রণয় কাহিনী; অপরের বিবাহিতা পত্নীর সঙ্গে প্রণয়ের ব্যর্থতা এবং সামাজিক সমস্যা সঙ্কট।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যে গ্যেটের জীবনের ঘটনা এবং এই উপন্যাসের ঘটনা প্রায় অভিন্ন; তার জীবনে আত্মহত্যার ঘটনা নেই বটে, কিন্তু উপন্যাসে নায়কের আত্মহত্যার কাহিনী একটি বাস্তব ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া হয়েছে। গ্যেটের নিজ জীবনের একটি প্রণয় কাহিনী যেন উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে। গ্যেটে তাঁর বিভিন্ন প্রণয় কাহিনী সম্পর্কে কখনও কোন প্রকার গোপনীয়তার আশ্রয় নেন নি। অকুণ্ঠিত চিত্তে সব প্রকাশ করেছেন। পাশ্চাত্য দেশে অনেকে আত্মজীবনীতে নিজ জীবনের অনেক গোপনীয় এমন কি অনেক কলঙ্ক কথাও যেন নির্লিপ্তভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়তো সর্বপ্রথম উদাহরণ রুসোর আত্মজীবনচরিত। কিন্তু নিজ জীবন কাহিনী হুবহু উপন্যাসে রূপান্তরিত করা এরূপ দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যেও দেখা যায় না। নিজ জীবনকে এমন নিঃশঙ্ক চিত্তে এরূপ অবারিত ভাবে উদ্ঘাটিত করা গ্যেটের মত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব। নায়িকার নামটি পর্য্যন্ত অপরিবর্তিত রূপে জীবন কাহিনী থেকে তুলে আনা হয়েছে-মাতৃহীনা কন্যা লোত্তে পিতার

সংসারে গৃহকর্ত্রী। গ্যেটে নৃত্যের আসরে এই মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্য সেই গৃহে উপস্থিত হয়ে যখন প্রথম তার দর্শন লাভ করেন তখন লোত্তে সমবেত ভাইবোনদের রুটি কেটে দিচ্ছিলেন তার পরিধানে ছিল সাদা রংএর ফ্রক এবং গোলাপী রংএর 'বো' উপন্যাসেও হুবহু এই চিত্র তুলে দেওয়া হয়েছে এবং উপন্যাসের সম্পর্কে এই দৃশ্যটি বহু ক্ষেত্রে চিত্রিত হয়েছে। বাস্তব জীবনে লোত্তে ছিলেন নীল নয়না কিন্তু উপন্যাসের লোত্তের কালো চোখ; গ্যেটের ঠিক পরবর্তী প্রণয়িনী ম্যাকসীর চোখের রং ছিল কালো। উপন্যাসের লোত্তের কালো চোখের মূলে হয়তো এই ম্যাকসীর স্মৃতি। উপন্যাসের লোত্তের বর অ্যালবার্ট কিন্তু গ্যেটের নিজ জীবনের লোত্তের বর ছিলেন কেস্টনার; আবার আত্মহত্যার জন্য যার নিকট থেকে পিস্তল ধার করা হয়েছিল তার নাম কেস্টনার; দুজনেই ওয়েৎজালারের লোক-এরা দু'জনে একই ব্যক্তি কি না সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করল তার নাম কার উইলহেলম্, উপন্যাসের চিঠিগুলি যাকে উদ্দেশ্য করে লিখিত তার নামও উইলহেলম। গ্যেটে ওয়েৎজ্লারে বসে যে সব চিঠিপত্র বা দৈনন্দিন জীবনের ডায়েরী লিখতেন তার অনেক কথা অপরিবর্তিত ভাবে উপন্যাসে স্থান পেয়েছে এমন কি তারিখ পর্য্যন্ত অপরিবর্তিত রয়েছে।

গ্যেটে এই কাহিনী লিখতে প্রবৃত্ত হয়ে প্রথমে ভেবেছিলেন নাটকাকারে লিখবেন। কিন্তু সেটা সন্তোষ জনক বোধ না হওয়াতে পত্রোপন্যাস করে তুললেন। উপন্যাসের এইরূপ তখন নূতন প্রবর্তন হয়েছে প্রবর্তকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইংরেজি সাহিত্যে রিচার্ডসন (Richardson) এবং ফরাসী দেশে রুসো। লক্ষ্য করবার বিষয় গ্যেটের এই উপন্যাসে একমাত্র নায়কই সব চিঠি লিখছেন। অপর পক্ষ থেকে উত্তরে কোনও চিঠি নেই, সম্ভবতঃ নায়কের ব্যক্তি মানসের একান্ত অনুধ্যানের অভিপ্রায়েই লেখক এ ব্যবস্থা করেছেন। এরূপ চিঠির আকারে উপন্যাস বর্তমান যুগে প্রায় অচল; বিশেষতঃ শেষের দিকে যে সম্পাদকীয় পরিশিষ্ট সংযোজন করা হয়েছে তাও বর্তমান যুগে সাদরে গৃহীত হবার সম্ভাবনা নেই।

বর্তমান প্রসঙ্গে উপন্যাসের রূপ বা আকার বা রীতি হয়তো অবান্তর; গ্যেটের এই উপন্যাসের মর্য্যাদা এবং খ্যাতির মূলে আছে উপন্যাসের ভাববস্তু বা "কনটেণ্ট" (thought content)। এই উপন্যাসে গ্যেটে তার নিজের জীবন কথা, তার অন্তরের গভীর ভাবাবেগ রূপায়িত করেছেন। সৌভাগ্য ক্রমে সময় ছিল অত্যন্ত অনুকুল সেজন্যই ব্যক্তিগত জীবনের এরূপ ভাবাবেগের কথা দেশের এবং জনগণের চিত্তে অপূর্ব সাড়া জাগাল। তখন ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের পূর্বক্ষণ; ফরাশী রাষ্ট্র বিপ্লব শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রেই বিপ্লব আনেনি, বরং জন মানসের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ফলেই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। অযথা সামাজিক বন্ধন নিয়ন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে ব্যক্তি জীবনের আকাঙ্ক্ষা দুঃখ বেদনাকে রূপ দান করবার জন্য জনমনে একটা আকুল উন্মুখতা জেগে উঠেছিল। গ্যেটের এই উপন্যাস খানা প্রসঙ্গে জার্মানীর বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক পরলোকগত টমাস মান (Thomas Mann) মন্তব্য করেছেন : স্বাধীন নগরী ফ্র্যাঙ্কফুর্টের একজন অতি সাধারণ লেখকের রচিত এই উপন্যাস, কিন্তু সকল দেশের জনচিত্ত যেন এমন একটা মুক্তির বাণীর বার্তাবাহী এই পুস্তক খানার জন্য আকুল আগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করে

আসছিল। সেজন্যই পুস্তকখানা প্রকাশিত হওয়া মাত্রই সমস্ত জগতে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল, যেন বারুদের স্তূপে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ এসে পড়ল, বহু ভাষায় বই খানার অনুবাদ হল। কিন্তু দেশের গোঁড়া সমাজ বিচলিত হয়ে উঠলেন যে এ ক্ষেত্রে অবৈধ প্রেমের জন্য আত্মহত্যাকে গৌরবান্বিত করা হয়েছে। পুস্তকের খ্যাতির মূলে আছে অবৈধ প্রেমের অমন রসপূর্ণ কাহিনী। এই পুস্তকখানা এমনই জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল যে তরুণদের মধ্যে অনেকে নায়কের সহিত একাত্মতার অনুভূতির আগ্রহে উপন্যাসে বর্ণিত নায়কের অনুরূপ পরিচ্ছদ পরতে লাগলেন হলুদ রংএর প্যাণ্ট ও ওয়েষ্ট কোট তার উপরে নীল রংএর কোট এবং অনেক ব্যর্থ প্রেমিক নায়কের অনুকরণে আত্মহত্যা করলেন। এই বইখানা যেন হয়ে পড়ল আত্মহত্যার প্ররোচক সেজন্য সত্য সত্যই লেখককে দায়ী বলে মনে করা হত; কিন্তু তারা এটুকু বিচার বিবেচনা করে দেখলেন না যে লেখক গ্যেটে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ঠিক অনুরূপ অবস্থায় আত্মহত্যার প্রবণতাকে জয় করে ঘটনাকে শিল্পরূপ দান করে নিজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন।

এই উপন্যাসের ওয়ার্থার-লোত্তের প্রেম কাহিনী সাহিত্য জগতের ঐতিহ্যময় চিরন্তন প্রেম কাহিনীর স্তরে গিয়ে স্থান লাভ করল। যেখানে আছে দান্তে-বিয়াত্রিচে, পেত্রার্ক-লরা, বোকাচ্চিও-কিয়ামেত্তা, রোমিও-জুলিয়েট, অবেলার্ড-হেলয়স্, পাও-লা ফ্রানসেস্কো।

এই উপন্যাসের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ ছাড়াও হয়তো চিত্র জগতেও ওয়ার্থার লোত্তে স্থান লাভ করেছিল; গ্যেটের নিজেরই একটি কবিতায় দেখা যায় যে চীন দেশের শিল্পীরা কাচের উপরে ওয়ার্থার-লোত্তের চিত্র অঙ্কিত করতেন Even the Chinese paint, with anxious hand, Werthar and Lotte on glass.

এই বইখানা তদানীন্তন কালের জনমানসে এমনই সাড়া জাগিয়েছিল যে স্বয়ং নেপোলিয়ন তাঁর মিশর অভিযানের সময়ে এই বইয়ের ফরাসী সংস্করণ তাঁর সঙ্গে রেখেছিলেন। তিনি বইখানা সাতবার পড়েছিলেন এবং এক অবসরে তিনি গ্যেটের সহিত এ বইখানা নিয়ে আলোচনাও করেছিলেন।

গ্যেটে বরাবরই তার এই পুস্তক খানায় জন্য দরদ এবং গৌরব বোধ করতেন; শেষ বয়সে তিনি এক সময়ে মন্তব্য করেছিলেন যে মানুষটি চব্বিশ বৎসর বয়সে ওয়ার্থার কাহিনী লিখেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই বাজে লোক নন।

প্রবীণ জার্মান সাহিত্যিক টমাস মান এই উপন্যাস আলোচনা করে তাঁর নিজ ভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন (১৯৪১ সালে) সেই প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে; তাতে তিনি মন্তব্য করেছেন, যৌবন এবং প্রতিভা এই পুস্তকের উপজীব্য বিষয়, অপর পক্ষে যৌবন এবং প্রতিভার সমন্বয়েই এর উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। It is a masterpiece in which devastating feeling and precocious artistic understanding acheive an almost unique combination. Youth and genius are its subject and out of yonth and genius it was created.

বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্র ও নাম সম্বন্ধীয় আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

[বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র ও চরিনামের আলোচনা বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটি নামের প্রথম উপস্থিতি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য প্রথম কয়েকটিতে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে, পরেরগুলিতে সংক্ষেপ করা হইয়াছে।]

কমলমণি (বিষঃ ৫ম পরি) ॥

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে নগেন্দ্রের ভগ্নি কমলমণি পদ্মের মতই শুভ্র সুন্দর সদাহাস্যময়ী। স্বামী শ্রীশচন্দ্রের প্রতি ভক্তি তার অসীম। কিন্তু সূর্যমুখীর স্বামীভক্তি যেমন নিরুচ্চার, কমলমণির তেমন নয়। স্বামীর সংগে তার মান অভিমান চুম্বন লেগেই আছে। কমলমণির স্নেহের ধন শচীশচন্দ্র তার মাতৃমহিমাকে উজ্জ্বল করেছে। বংকিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে কটি স্বল্পসংখ্যক মাতৃচরিত্র আছে আছে তার মধ্যে কমলমণি অন্যতম। কমলমণির সহজ-সরল সদাহাস্যময় ব্যবহারের জন্যে, তার আবির্ভাবে উপন্যাসের বিষবাষ্প বারবার উধাও হয়েছে। তবে কমলমণির জীবনে কোনদিন দুঃখের মেঘ এসে দেখা দেয়নি বলে সূর্যমুখীর বেদনার গুরুত্ব সে হয়তো সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি। অপরদিকে কুন্দের প্রতি তার অসীম মমত্ববোধ থাকলেও তার প্রতি মাঝে মাঝে সে অবিচার করেছে। আসলে কমলমণিকে উপন্যাসের কোন দুঃখবেদনাই স্পর্শ করতে পারেনি। তাই সে কেবলমাত্র হাল্‌কা হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছে। সূর্যমুখীর এবং কুন্দের মনের কথা প্রকাশ করবার জন্যই উপন্যাসে কমলমণির প্রয়োজন ছিল।

করিমন (চন্দ্রঃ ৬।২) ॥

এই দাসী তকি খাঁর আলয়ে দলনীর থাকাকালীন অর্থের লোভে দলনীকে বিষ এনে দিয়েছিল।

করিমবক্স (দুর্গেঃ ১।১১) ॥

ওসমান খাঁর একজন সৈনিক। সে গড় মান্দারণ দুর্গজয়কালে লুক্কায়িত তিলোত্তমার সন্ধান জানিয়ে দিয়ে পুরস্কার প্রার্থনা করেছিল। করিমবক্স আগে মোগল-সৈন্যবাহিনীতে ছিল বলে তাকে সকলে মোগল সেনাপতি বলে ডাকে। এই 'মোগল সেনাপতি' বিশেষণটি শুনে বিমলা শিউরে উঠেছিলেন কারণ অভিরাম স্বামী গণনা করে বলেছিলেন মোগল সেনাপতির দ্বারা তিলোত্তমার সর্বনাশ হবে। কিন্তু মোগলের সংগে বীরেন্দ্রসিংহ বন্ধুত্ব করায় তা' হয়নি। কিন্তু ভাগ্যের ফল অমোঘ—এটা দেখাবার জন্যই বোধহয় করিমবক্সকে 'মোগল সেনাপতি' জানিয়ে এবং তিলোত্তমার সন্ধান বলিয়ে দিয়ে, তার দ্বারা ভাগ্য গণনার কালটি সার্থক করে তুলেছেন।

কল্যাণী (আনন্দ: ১।১) ॥

কল্যাণী মহেন্দ্রের স্ত্রী। স্বামীর সুখ-দুঃখের সমান ভাগীদার। দুর্ভিক্ষের কালে পথে বেরিয়েছে নিজের প্রাণরক্ষার্থে নয়, যাতে স্বামী কন্যা বাঁচে সেই আশায়।

ডাকাতদলের হাতে পড়ে কল্যাণী ভীত হলেও, বিপদকালে বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি। তাই ডাকাতদের ঝগড়ার সুযোগে সে পলায়ন করেছে। তারপর আনন্দমঠের নিরাপদ আশ্রয়ে এসে স্বামীর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সত্যানন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধে কেবলমাত্র একটু পাদোদক পান করেছে। কল্যাণী সাধ্বী শিরোমণি।

কিন্তু মহেন্দ্রকে নিয়ে কল্যাণী যখন আনন্দমঠ থেকে বেরিয়ে এসেছেন তখন তাঁর জীবনে এক চরম আঘাত নেমে এসেছে। মহেন্দ্র সন্তানধর্মে দীক্ষা নেবার সংকল্প প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কল্যাণী বুঝেছে এ পথে একমাত্র বাধা সে। তাই স্বেচ্ছায় বিষপানে প্রাণত্যাগ করেছে। স্বপ্নে দেখা দেবতার নির্দেশ অপেক্ষা স্বামীর প্রতি অবিচল নিষ্ঠাই কল্যাণীর এই আত্মত্যাগের কারণ। মৃত্যুকালে কল্যাণীর কথায় স্বামীভক্তির সংগে বাঙালী বধূর সহজ সরল দেবভক্তিও মিশ্রিত হয়েছে।

মৃত কল্যাণীকে বাঁচাল ভবানন্দ। কল্যাণীর নূতন জন্মলাভ হোল বটে, কিন্তু নূতন মন গড়ে উঠল না। ভবানন্দের শত প্রলোভনের মধ্যেও স্বামী-কন্যার প্রতি তার আকর্ষণ প্রগাঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল। অবশ্য সেই সময় সত্যানন্দ ঠাকুরের কাছে পাঠগ্রহণ নিশ্চয়ই কল্যাণীর মনকে আরো শক্ত করে তুলেছিল।

সবশেষে স্বামীর সংগে মিলনকালে শান্তির সংগে যোগসাজসে কল্যাণী যেভাবে মহেন্দ্রকে বিপর্যস্ত করেছে—তার মাধ্যমে কল্যাণীর সুখময় জীবন আরো বেশি সুন্দর হয়ে উঠেছে।

আনন্দমঠের কল্যাণী আগাগোড়া বাঙালী গৃহস্থবধূর চরিত্র।

কাজীসাহেব (সীতা: ১।১) ॥

এই কাজী সাহেবের কাছে গঙ্গারামের বিচার হয়। তিনি লোক মন্দ ছিলেন না, কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামীর জন্য অন্যায় করতেও তিনি কসুর করেন না।

কাপালিক (কপা: ১।৪) ॥

আমাদের দেশে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী সম্বন্ধে যে সমস্ত ভয়াবহ কাহিনী প্রচলিত ছিল, বংকিমচন্দ্র সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। মেদিনীপুরে বাসকালে এক কাপালিক সন্ন্যাসীর সংগে বংকিমের পরিচয়ের কথাও অনেকে বলেছেন। তাই বংকিমচন্দ্র কাপালিক চরিত্র রচনায় কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবকেই স্থান দিয়েছেন সর্বাধিক।

কাপালিককে গড়ে তুলেছেন ভীষণদর্শন ও ভয়াবহ করে। নবকুমারই প্রথম কাপালিক আবিষ্কার করলেন—"তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কিনা, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দুলচর্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা পরিবেষ্টিত।"

কাপালিকের চরিত্রের মধ্যে কোথাও কোমলতা বা স্নেহ-মমতা নাই। নিজ সাধনায় সিদ্ধিলাভই তাঁর একমাত্র কাম্য। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি নবকুমারকে বলি দিতে চেয়েছেন। এবং বলি হাতছাড়া হওয়ায় ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত তাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন।

কপালকুণ্ডলাকে মানুষ করা কাপালিকের পক্ষে একটু আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হয়, সেই সংগে সন্দেহ হয়, বুঝি কাপালিকের মধ্যে খানিকটা স্নেহপ্রবণ মন ছিল। কিন্তু অধিকারীর মুখ থেকে জানতে পারি, কপালকুণ্ডলাকে সাধনকার্যের উপায় হিসাবেই কাপালিক বড় করে তুলেছিলেন। কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁর যে কোন মমতা ছিল না, তার আরও প্রমাণ রয়েছে কপালকুণ্ডলার মৃত্যু কামনায়। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে নিয়ে যাবার সংগে সংগেই কাপালিকের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কপালকুণ্ডলার নিধন, তখন থেকেই তিনি তাঁদের পিছু নিয়েছেন।

নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাপালিক নবকুমারের কাছে যে রকম ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন, তাতে তার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি অপেক্ষা পাঠকের ঘৃণা বর্ষিত হয়। কিন্তু তবুও কাপালিক ধর্মের নাম করতে ছাড়েননি। কপালকুণ্ডলার মৃত্যু নাকি মা ভবানীর কাম্য। স্বার্থপর, ধর্মধ্বজী, ভয়ানক এই চরিত্রটি উপন্যাসে বীভৎসরস সৃষ্টি করেছে, এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে চরিত্রটি সু-অংকিত। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কাপালিককে খল চরিত্র বলে মনে হয়।

কাপ্তেন টমাস (আনন্দঃ ৩।১)॥

ঐতিহাসিক চরিত্র। এর উপর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনের ভার পড়েছিল। বংকিম উপন্যাস মধ্যে একে যেভাবে অংকন করেছে তাতে লরেন্স ফস্টরের দ্বিতীয় সংস্করণ বলে মনে হয়। তবে টমাস লরেন্স ফস্টরের মত কাপুরুষ নন। দুঃসাহসী, অত্যাচারী টমাস মৃত্যুকালে দৃঢ়তার সংগে বলেছেন—"ইংরেজ! আমিত মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলণ্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও, তোমাদিগকে খ্রীষ্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার, তারপর এই বিদ্রোহীদিগকে মার।"

কাপ্তেন হে (আনন্দ : ৩।১০)॥

কাপ্তেন টমাসের সহযোগী একজন ইংরাজ সৈনিক।

কামাখ্যানাথ (রাধাঃ ২য় পরিঃ)॥

কামাখ্যানাথবাবু হাইকোর্টের উকীল। তিনি রাধারাণীদের বিষয় সম্পত্তির জন্য শেষ পর্যন্ত মামলা চালিয়ে জিতেছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থের সম্পর্ক নয়, রাধারাণী ও তার মার প্রতি তাঁর একটা অন্তরের টান লক্ষ্য করা যায়। রাধারাণীর মার মৃত্যুর পর তিনি রাধারাণীর বিষয় সম্পত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধি করেন। তিনি উদার চরিত্রের লোক ছিলেন। তাই রাধারাণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ না দিয়ে তার 'রুক্মিণী কুমার'কেই খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন।

কামিনী (ইন্দিরা ১ম পরিঃ)॥

ইন্দিরার ছোট বোন। ইন্দিরার মতই আমুদে। প্রধানতঃ তার উদ্যোগেই ইন্দিরার স্বামী উপেন্দ্রবাবুকে ভূত দেখিয়ে মজা করা হয়েছিল।

কালীচরণ বসু (রজনীঃ ১।১) ॥

রজনীর প্রতিবেশী। তিনি কায়স্থ। চীনাবাজারে তাঁর একখানি খেলনার দোকান ছিল। এঁর শিশুপুত্র বামাচরণের সংগে রজনীর ভাব ছিল।

ক্যাথারাইন (রাজঃ ২।২) ॥

ইতিহাসে ক্যাথারীন নামে দু'জন সাম্রাজ্ঞীর উল্লেখ আছে। রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারীন স্বামীর মৃত্যুর পর কিছুদিন রাজ্যশাসন করেন।

ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেন্রীর পত্নী ক্যাথারীনের রাজত্বকাল ১৫১৯-১৫৮৯ খ্রীঃ। নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা হিসাবে তিনি রাজ্যশাসন করতেন।

রাজসিংহ উপন্যাসে পাশ্চাত্য দেশে নারী শাসকদের উল্লেখ প্রসংগে এঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কুবের (রাজঃ ২।৩) ॥

যক্ষরাজ কুবের ধনাধিপ বলে খ্যাত। ঋষি বিশ্রবার ঔরসে ইলবিলার গর্ভে এঁর জন্ম। প্রথমে ইনি লঙ্কায় বাস করতেন, তারপর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ কর্তৃক বিতাড়িত হলে কৈলাস শিখরে বাস করেন। কুৎসিৎ হয়েছে বের (শরীর) যার এই অর্থে কুবের। কথিত আছে কুবেরের তিনখানি পা ও আটটি দাঁত।

কুমুদ (বিষঃ ১১শ পরি) ॥

সূর্যমুখীর এক দাসী। সূর্যমুখী কমলমণিকে এক পত্রে এই দাসী সম্বন্ধে লিখেছেন—"এখন একজন নূতন দাসী রাখিয়াছি। তাহার নাম কুমুদ। বাবু তাহাকে কুমুদ বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুদ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। আর কত অপ্রতিভ হন। অপ্রতিভ কেন?

নাট্যসাহিত্যের বিকাশ, রীতি নীতি ও নাট্যপ্রসঙ্গ

বয়সের বিচারে বাংলা নাটকের একশ পনের পূর্ণ হয়ে গেছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে মুদ্রিত হয়েছে এমন নাটকের সংখ্যা প্রচুর, তাদের মধ্যে কিছু কিছু প্রাচীন নাটক বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। বিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধাবলীতে সেগুলির নাম মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী বা বেসরকারী কোনপক্ষ থেকেই সেই মূল্যবান অতীত কীর্তিকে পুনরুদ্ধারের কোন প্রচেষ্টাই নেই।

অতি সাম্প্রতিককালে উনিশ শতকের মূল্যায়নের প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। অতীতকে না জানলে'ত বর্তমানকে বিচার করা যায় না, ভবিষ্যতও গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। আজকে মনে না থাকলেও একথা অনস্বীকার্য্য যে উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের সূত্রপাত নাট্য আন্দোলনের মাধ্যমে। ইংরাজী নাটকের বদলে যেদিন প্রথম বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হ'ল সেদিন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন।

১৮৫২ সালে প্রথম দুখানি বাংলা নাটক প্রকাশিত হল—তারাচরণ সিকদারের ভদ্রার্জুন ও যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের কীর্তিবিলাস। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে বোধহয় সেই প্রথম নাটক রচিত হল। অবশ্য বাঙালীর লেখা ইংরাজী নাটক—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের The persecuted এ দুটির বহু পূর্ববর্তী। কিন্তু সে যাই হোক, ভদ্রার্জুনই সংস্কৃত নাটকের বাঁধা ছকের বাইরে লেখা নাটক আর তার মাধ্যমেই বাংলাভাষায় মৌলিকনাট্য রচনার আধুনিক যুগের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রাহরণ থেকে এর কাহিনী গৃহীত। নাটকটি মূলত: শ্রব্যকাব্য। কীর্তিবিলাস বাংলাসাহিত্যের প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। সপত্নীপুত্রের প্রতি বিমাতার বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতা এবং তারই চরম পারণতি এ নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

ভদ্রার্জুন ও কীর্তিবিলাসের পর বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য নাটক, বাংলার প্রথম সামাজিক আখ্যান রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীন কুল-সর্বস্ব। কুলীন কুল সর্বস্বই সর্বপ্রথম মঞ্চায়িত হবার সৌভাগ্য লাভ করে, আর তাই পরবর্তী কালের নাট্যকার সৃষ্টি, নাট্যরচনা ও জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা জাগায়।

পৃথিবীর সব দেশেই নাটকের সূত্রপাত কোন না কোন ধর্মীয়তত্ত্ব বা কাহিনীর মাধ্যমে, তারপর ঐতিহাসিক কাহিনী পেরিয়ে সমকালীন সমাজ জীবন প্রতিফলিত হয়েছে নাটকে। এক সময় সামাজিক কোন ত্রুটি বিচ্যুতির সাধারণ রূপায়ণই ছিল রীতি—কিন্তু আজকের যুগের নাট্যকাররা ব্যক্তি মানুষের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই নাটকের প্রধান উপজীব্য হিসাবে উপস্থাপিত করছেন।

ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, সমাজ সংস্কার দেশ ও জাতিভেদে ভিন্ন হয়।

সুতরাং নাট্যবস্তু, গঠন, আঙ্গিককথা নাট্যাদর্শও ভিন্ন রূপ নিতে বাধ্য। আমাদের দেশে এ বিষয়ে যে পুরাতন আদর্শ ছিল, উনিশ শতকের পশ্চিমী ভাবধারার অনুপ্রবেশে তার অনেকটাই বাতিল হয়ে গেল। অবশ্য পুরাপুরি না যাওয়ায় দু'নৌকায় পা রইল। বাংলা নাটকের আদর্শ অংশতঃ ইউরোপীয় (ইংরাজী) আর অংশতঃ সংস্কৃতানুগ।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্যকে দুভাগে ভাগ করেছেন—দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। রূপকাদি অভিনয় সাপেক্ষ কাব্যই দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত, আর অভিনয় সাপেক্ষ কাব্যকেই নাটক বলা হয়ে থাকে। ভারতে নাট্যকলার উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুল প্রচারিত এক কাহিনীর উল্লেখ করি—, দেবতারা একদিন পিতামহ ব্রহ্মার কাছে চক্ষু ও কর্ণের উপভোগোপযোগী কোনো বস্তু প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা তাঁদের প্রার্থনা পূরণে উদ্যোগী হয়ে রঙ্গালয় নির্মাণে বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন আর প্রয়োগ কর্মের ভার অর্পণ করলেন ঋষি ভরতের উপর। শিব দিলেন তাণ্ডব, পার্বতী দিলেন লাস্য, চতুর্বিধ নাটকীয় পদ্ধতি আবিষ্কার করে বিষ্ণু নাট্যকলার প্রবর্তন করলেন, আর ভরত রচনা করলেন নাট্যশাস্ত্র।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে তিন ধরণের রঙ্গালয়ের উল্লেখ দেখা যায়—(১) দেবতাদের জন্য ১০৮ হাত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট (২) জন সাধারণের জন্য ৬৪ হাত দৈর্ঘ্য আর ৩২ হাত প্রস্থ বিশিষ্ট আয়তকার—কারণ, এতে নাটকের কথা ও গান সুখ শ্রাব্য হবে ও (৩) ৩২ হাত দৈর্ঘবিশিষ্ট ত্রিকোণ রঙ্গালয়। তিনের মধ্যে মধ্যম মণ্ডপকেই তিনি প্রশস্ত মনে করেছেন।

রঙ্গালয়ের একভাগ দর্শকদের বসার জন্য আর অপর ভাগ অভিনয়ের জন্য। দর্শকদের আসন বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন বর্ণের স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত—একেবারে সামনে শ্বেতবর্ণ স্তম্ভ ব্রাহ্মণদের, তারপর রক্তবর্ণ স্তম্ভ ক্ষত্রিয়দের, উত্তর পশ্চিমে পীতবর্ণ স্তম্ভ বৈশ্যদের আর উত্তর পূর্বের নীলকৃষ্ণ স্তম্ভ শূদ্রদের আসন চিহ্নিত করত।

দর্শকদের সামনে ৬৪ বর্গহাত পরিমিত স্থান অভিনয় স্থল বা রঙ্গ। চিত্র ও মূর্তিতে রঙ্গ সজ্জিত, এর শেষাংশের নাম রঙ্গশীর্ষ। রঙ্গের পশ্চাতে যবনিকা, পটি বা অপটি নামে অভিহিত। অন্তরালে নেপথ্য গৃহ।

যবনিকা সর্বদাই দ্বিখণ্ডে বিভক্ত, রক্তবর্ণ। তবে রসানুগ প্রয়োজনে আদিরসে শুভ্র, বীররসে পীত, করুণরসে ধূম্র, অদ্ভুত রসে হরিৎ, হাস্যরসে বিচিত্র, ভয়ানক রসে নীল, বীভৎস রসে ধূমল, রৌদ্ররসে রক্তবর্ণের যবনিকারও প্রচলন.ছিল।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন,—দৃশ্যকাব্য একাধারে দৃশ্য ও কাব্য। এর সাহায্যে বিভাব অনুভাব ও ব্যাভিচারিভাব—এই তিন উপাদানের সংযোগে জনচিত্তে রসের উদ্রেক হয়। রস ব্যতীত কোন অর্থ-ই বোধগম্য হয় না। তাই কোন নাটকের রস পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে হলে তার সার্থক অভিনয় দেখা দরকার। সামগ্রিক রূপায়ন তথা প্রযোজনা ছাড়া নাট্য রসাস্বাদন পূর্ণতা পেতে পারে না।

নাট্যকার নাটক লেখার সময় কল্পনায় তার মঞ্চায়ণ প্রত্যক্ষ করেন, পাত্র-পাত্রীদের স্বাভাবিক আচরণ মানসপটে প্রতিফলিত হয়। আর তাদের সে আচরণ জনমন গ্রাহ্য করবার জন্যই ঘটনা,

বাক্য ও কাহিনী বিন্যাস করেন তিনি। অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাঁদের অভিনয় মাধ্যমে সেগুলিকে জীবন্ত করেন। নাটকের কেন্দ্রস্থ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যও এদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এরাই চরিত্রগুলিতে ত্রিমাত্রিকতা অর্পণ করে।

একদিক থেকে কাহিনী ও ঘটনা যেমন চরিত্রগুলিকে পূর্ণতা দেয়, অভিনয় তেমনি তাকে প্রাণবান করে দর্শক মনে রস সঞ্চার করে।

নাট্যকারকে নাট্যরচনায় সতর্ক থাকতে হয় স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে, ঘটনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, সংলাপের আবশ্যকতা বিষয়ে। নিপুণ রাঁধুনী যেমন ব্যঞ্জনে কিছুই অতিরিক্ত দেয় না, আবার কিছু কমও দেয় না, নিপুণ নাট্যকারও তেমনি ঘটনা, সংলাপ, চরিত্র সৃষ্টি সব কিছুই যথোচিত প্রয়োজনানুযায়ী দিয়ে থাকেন।

নাট্যকাহিনী চারিত্রিক দ্বন্দ্ব আর বিপরীতের সংঘাতে দানা বাঁধে। নাটকের প্রাণও তাই। এই দ্বন্দ্ব সংঘাত নাট্যজাল বিস্তার করবে, নাটক এক চরম সঙ্কটের মুখোমুখি হবে এবং এক নিয়ন্ত্রিত পরিণতিতে সমাপ্তির মধ্য দিয়ে দর্শক মনে এক স্থায়ী ও অন্যান্য বিবাদী রসের সঞ্চার করবে। নাট্যকারের ব্যক্তিগত প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গী আর সামাজিক পটভূমিকা সংঘাতে লিপ্ত পক্ষ বিশেষের জয় ঘোষণা করবে। সাধারণতঃ দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনই সফল পরিণতির দ্যোতক।

নাটকীয় কাঠামোকে ৬টি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) ভূমিকা বা সূচনা (২) জটিলতার বীজ (৩) সংঘাতের সূত্রপাত (৭) চরমসঙ্কট (৫) ঘটনার অবরোহন (৬) সমাপ্তি বা পরিণতি।

(১) ঘটনাবলী সহজে অনুধাবনের জন্য যে সব তথ্য দর্শকের জানা প্রয়োজন সূচনায় তা জানানো প্রয়োজন। অভিজ্ঞান শকুন্তলমে যেমন—, রাজা দুষ্মন্তের ও শকুন্তলার পরিচয় প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। সাজাহানে বলা হয়েছে, পুত্রদের বিদ্রোহের কথা।

(২) যে ঘটনা বা কারণ জটিলতা বাড়িয়ে সংঘাতের সম্ভাবনা প্রকট করবে—প্রথম অঙ্কের কোন দৃশ্য থেকে। শকুন্তলাকে রাজার অঙ্গুরী প্রদান এমনি জটিলতার বীজ।

(৩) সে বীজ থেকে যে সংঘাত সৃষ্ট হল এবং কাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়ে গেল সংঘাত আরম্ভে তা উপস্থিত করতে হবে। প্রিয় চিন্তামগ্ন শকুন্তলার ত্রুটির জন্য দুর্বাসার অভিশাপ অভিজ্ঞান শকুন্তলমে সংঘাত আরম্ভ করে।

(৪) চরম সংকট নাটকীয় ঘটনাকে তুঙ্গে নিয়ে যাবে। যেমন—দুষ্মন্ত কর্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান নাটকের চরম সংকট অস্বাভাবিক বা অবাস্তব না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(৫) নাটক একবার তুঙ্গে উঠার পর তার অবরোহন সুরু হবে আর সে অবরোহনের গতি প্রকৃতি নাটকের নির্ধারিত পরিণতির উপরই সতত নির্ভরশীল। নাটকের শ্রেণী—ট্র্যাজেডি, কমেডি কি রোমান্স—তার অবরোহনকে নিয়ন্ত্রণ করে। রোমিও-জুলিয়েটের ট্র্যাজেডির সূত্রপাত সন্ন্যাসী প্রেরিত পত্র পাবার আগেই রোমিওর জুলিয়েটের মৃত্যু সংবাদ শোনা। পত্রটা আগে পেলে রোমিও জুলিয়েট রোমান্টিক কমেডি হয়ে দাঁড়াত।

(৬) উপরের ধাপগুলি পেরিয়ে নাটকের স্বাভাবিক পরিণতিই তার সমাপ্তি। দুষ্মন্তের সপুত্র শকুন্তলাকে পুনর্লাভ অভিজ্ঞান শকুন্তলমের স্বাভাবিক পরিণতি।

বিংশ শতকের চরম সংকট মুহূর্তে নাটক শেষ করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আজকের সমাজ জীবনের অস্থিরতা এর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

ইদানীং বক্তব্য মূলক নাটক মঞ্চায়নের একটা কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু নাটক মাত্রেরই একটা বক্তব্য থাকে এবং নাটকীয় দ্বন্দ্বের অধিকাংশই ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব। প্রথম দিকে মন্দের হাতে কাল নিপীড়িত হয়। দর্শক তখন ভালর সমব্যথী। শেষ পর্য্যন্ত ভালরই জয় সূচিত হয়, তখন দর্শক আনন্দিত, উল্লসিত মনে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করে।

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত কাহিনীতে এমনই বেগ সঞ্চার করবে যে দর্শক তার দ্বারা রসাপ্লুত হবে। কাহিনীর গতির সঙ্গে দর্শকের মনের গতি যদি মিলতে না পারে তাহলে রসের ভোজে ফাঁক থেকে যায়।

ইদানীং এই ফাঁকির কারবারই চলছে বেশী। আঙ্গিকের আতিশয্য অলঙ্কারের ভারের মত সম্পূর্ণ বাইরের জিনিষ হয়ে থাকে। যাদুকরের ভোজবাজিতে দর্শককে মোহিত করা যায়— কিন্তু তার ফল তাৎক্ষণিক। আমরা সবাই আজ এই তাৎক্ষণিকের মোহে মোহগ্রস্ত। বাংলা নাটক আজ তাই বিশ্বনাট্যশালার পঙক্তিভোজে আসন পায় না। কাঙালিনীর মত বাইরে থাকে।

পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নাটককে বিশেষ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এদেশে কিন্তু নাটক আজও অপাঙক্তেয়। সাহিত্যের অংশ হিসাবে নাটকের সামান্যতম অংশই ছাত্রদের পড়ানো হয়। সেটুকুও আবার সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচিত। ফলে, নাট্য রুচি গড়ে উঠবার কোন সুযোগই মেলে না। ফলে, নাট্য রচনা, সমালোচনা, অভিনয়, প্রযোজনা প্রভৃতি নাট্য সম্পর্কিত সর্ব বিষয়ের উন্নতি হচ্ছে না।

নাটক সাহিত্য একথা যেমন অনস্বীকার্য্য তেমনি তা যে প্রয়োগ সাপেক্ষ বিদ্যা এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। মহাবিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে নিয়মিত নাট্য প্রযোজনার ব্যবস্থা না করলে এ ফলিত বিদ্যার প্রকৃত অনুশীলন কি ভাবে সম্ভব ?

জ্ঞানী-গুণী, কৃতী শিক্ষাবিদ তথা শিক্ষানায়কদের কাছে অনুরোধ—তাঁরা সক্রিয় ও মিলিত প্রচেষ্টায় মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইয়েল থিয়েটার ওয়ার্কশপের মত নাট্য বিদ্যা অনুশীলন কেন্দ্র খুলুন।

বাঙালী একদিন গানের রাজা হয়েছিল, আজকের এই অধঃপাতিত দিনেও তার স্বীকৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীতের জাতে উঠা। বয়াটে বাউণ্ডুলেদের হাত থেকে নাটককেও জাতে তুলুন ; হয়তো অদূরভবিষ্যতেই বাঙালী নাটকের রাজা হয়ে বিশ্বনাট্যসভায় সম্মানের আসন দখল করতে পারবে।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষুদ্রাকারে যে প্রচেষ্টা চলছে তার বহুগুণ প্রসার করা আজ প্রয়োজন আর প্রয়োজন নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের অসম্পূর্ণ স্বপ্ন জাতীয় নাট্যশালাকে যথাযথ ভাবে রূপায়িত করা। এ বিষয়ে সকলে যদি সাধ্যমত চেষ্টা করি। তবেই বাঙালী তার অতীত ও বর্তমান নাট্যকীর্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ভবিষ্যতের সোনালী ফসল ঘরে তুলতে পারবে।

দেবকুমার বসু

সাহিত্যের রূপ

কেউ চায় ত্যাগ, কেউ চায় ভোগ। অথচ জীবন হলো ত্যাগ ভোগের সংমিশ্রণ। জীবনের কোথাও ফুল ফোটে, কোথাও বা পাঁক জমে। ফুল ফোটে, পাঁক জমে, আবার পাঁক জমে, ফুল ফোটে; তাই জীবন চলমান। জগতের সবকিছুকে বিচার করি জীবন দিয়ে। জীবন চলমান বলে সবকিছুই বুঝি বা আপেক্ষিক। মুভি ক্যামেরায় যদি এই জীবনটার একটা ফটো তুলে রাখতে পারা যায় তাহলে বোধহয় একটা সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়। কারণ জীবনের ছবিই তো দেখি সাহিত্যে। শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রার মধ্যে—বা রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার মধ্যে কী শুধুই আমরা জীবনের ঘটনাগুলিকে পাই—আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন—তবে বলতে হয় এইখানেই সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ।

বর্তমানের এই অত্যুন্নত বিজ্ঞানই একদিন মানুষকে প্রথমে পাথর তারপর আগুনের ব্যবহার শিখিয়েছিল। অর্থাৎ কি না মানুষের এ যাত্রা হল জয়যাত্রা, কারণ সে এগোচ্ছে towards purification যতই বাধা বিপত্তি সাময়িক ভাবে পথে এসে পড়ুক না কেন। সাহিত্যকে শিল্পের এক দিক বলা হয়। সৃষ্টির মূল দাবি স্বীকারেই সম্ভব হয় সাহিত্য সৃষ্টি। কবি রবীন্দ্রনাথ বৃষ্টি চাইতেন—সোনার বাংলা নাম সার্থক হোক বলে; কিন্তু আরো বেশি করে চাইতেন কল্পিত মানসীকে। মানে সাধারণ লোকে বৃষ্টি চায় বাঁচবার জন্য; সাহিত্যিক চান মনের অন্তর অনুভব মেটাবার জন্য। একজন শক্তিশালী লেখকের কাজ হল যে শক্তি জীবনে মুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন সে শক্তিকেই মুক্ত করতে সাহায্য করা। জমিতে ফসল ফলানোর জন্যে যেমন দরকার উৎকৃষ্ট সার তেমনি, সাহিত্যরচনার জন্য দরকার উৎকৃষ্ট ভাষা। ভাষাই ভাবের একান্ত সহচর। আর সাহিত্যের বিষয় বস্তু হলো ভাবের আদান প্রদান। সে বর্হিজগতের সাথেই হোক আর অন্তর্লোকের সাথেই হোক। কিন্তু ভাষা থাকলেই হবে না,—চাই রূপ, চাই objectification, বিজ্ঞান সম্মতভাবে বলতে গেলে বলতে হয়—ছিল জীবন অব্যক্ত ভাবে বীজের মধ্যে; সে জীবন পরিচর্যার মাধ্যমে হোল প্রস্ফুটিত পরিব্যক্ত ফসলের মধ্যে। তেমনি সাহিত্য রচনার মধ্যেও থাকে এক সৃষ্টির প্রচেষ্টা। সাহিত্যের শেষ কথা প্রচারের মধ্যে নয়—প্রকাশের মধ্যে। প্রকাশ মানে নিজেকে প্রকাশ—নিজের ভাবধারাকে প্রকাশ। আবার এখানেই এসে পড়ে নিজেকে চেনার প্রশ্ন। যে যত নিজেকে চেনে তার পক্ষে নিজেকে প্রকাশ করা যত সম্ভব—অপরজনের পক্ষে ততটা সম্ভব নয়। শাস্ত্রে বলে: 'আত্মানাং বিদ্ধি'। এবং বৃদ্ধ পেলোনিয়াসও বলেছেন—'Know thyself,—above all to thy own self be sure! কালের পরিবর্তনে এই নিজেকে চেনার রীতি সাহিত্যের ষ্টাইলও পাল্টায়। সেজন্য অ্যারি ব্রিমোঁ pure poetry বলেন

প্রার্থনার মতো কবিতাকে, আর পল্ ভ্যালেরি বলেন গানের মতো কবিতাকে। দুইই সত্য, অথচ দুইই মিথ্যা। সাহিত্যে কবিতার নিজস্ব এলাকা আছে; কিন্তু কবিতা ছাড়াও সাহিত্য চলে, সাহিত্যের মুখে ভাষা ফোটে। সাহিত্য স্থির নয়, তার গতি আছে সেজন্য একদিন যে সাহিত্যকে আঁকড়ে মানুষ বাঁচতে পেরেছিল, রসাস্বাদন করতে পেরেছিল, তার মূল্য আজ সীমাহীন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সেজন্য আজকে ক্লাসিক।

সাহিত্য রস ও রুচির পৃথক ও নিজস্ব এলাকা আছে। রসবোধ জন্মগত ভাবে কিছুটা আসে। রুচি পরিবেশ সাপেক্ষ। তবে রুচি স্বচ্ছ হলে রসবোধও স্বচ্ছ হয়। লেখাপড়ার মাপকাঠি দিয়ে রসবোধকে মাপতে গেলে বোধহয় ভুল হবে। এটা তাই জাতিভেদে বুদ্ধির তারতম্যের উপর নির্ভর করে না। বরং জ্ঞানবুদ্ধির বেড়া জাল টপকে মুক্ত ভাবে এর চলাফেরা। যদি দেখা যায় যে বঙ্কিমের 'রজনী' পড়ে মনিবের চেয়ে চাকর বেশি পরিমাণে উপভোগ করে তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মানে রসের রাজত্বে সম্পর্কগুলো ব্যবহারিক জীবনের সকল সম্বন্ধের উর্দ্ধে। রিয়ালিষ্টিক সাহিত্যের মধ্যে অনেক সময়ই কেবল কতকগুলো সমস্যাকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়। সমাজের প্রতি সাহিত্যের যে কর্তব্য তা এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টার মধ্যেই। তাই আফিমের ডেলা পাকিয়ে বর্তমান কমলাকান্তদের নেশার রসদ জোগান যে সাহিত্য তথা Escapist-এর সাহিত্য—তার প্রকৃত মূল্য খুব কম।

কালের হাওয়া যে সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে—তা অনস্বীকার্য। তবে দেশ-কাল-পাত্র পেরিয়ে যে সাহিত্য—তা হল অমর চিরন্তন। যে সাহিত্য সর্ব সময় ও কালের অতীত। তবে এটা হল 'আইডিয়াল কেস'। তাই আজকের দিনে যদি পাঠক সমাজের চাহিদার একটা পরিসংখ্যান নেওয়া হয় তবে দেখা যাবে অনেকেই পছন্দ করেন কিছু 'হট' জিনিস। চায় হিট্ করা ফিল্ম, thrilling গল্প, আর tinned food মানে যেটা সহজলভ্য, যার জন্য কম পরিশ্রমের প্রয়োজন। গভীরতা কমতে থাকা মানেই tinned সাহিত্যের অধিক প্রচলন—ফর্মুলায় ফেলা গল্প আর লেখা।

শঙ্করকুমার বসু

ঠাকুরবাড়ির কথা ॥ শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সাহিত্য সংসদ ॥ কলিকাতা ॥ মূল্য বার টাকা।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মতো এমন বাড়ি সারা ভারতে আর দুটি নেই। প্রায় দেড়শ বছর ধরে ভারতবর্ষের জীবনে তার অপরিসীম দানের তালিকার খসড়া করাও সহজ নয়। অসাধারণ পুরুষদের আবির্ভাবে তার ইতিহাস উজ্জল। সেই বাড়ির অধিবাসীদের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অভাব ছিল। রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করেছেন এই গ্রন্থে।

ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস বহু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে এগিয়েছে। তার প্রথম ভাগে রামমোহনের সঙ্গে সহযোগিতা, ব্যবসায়িক উন্নতির বিপুল সম্ভাবনা, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের আন্দোলনের নেতৃত্ব। দ্বিতীয় ভাগে বাংলার ধর্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং তৃতীয় ভাগে বাংলাদেশের সমাজ সংস্কার ও ধর্ম আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সাহিত্য ও অন্যান্য সকলপ্রকার ললিতকলায় অভাবনীয় সৃষ্টি প্রাচুর্য। তিন পুরুষের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের এক যুক্তিনিষ্ঠ অথচ ভাবগম্ভীর প্রাণোচ্ছল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সূচনা।

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিবিশেষের শিরোনামে তাঁর অধ্যায়গুলিকে ভাগ করেছেন। এক একটি মানুষকে কেন্দ্র করে তাঁর কৃতকর্ম ও তৎকালীন সামাজিক পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ধরণের আলোচনার সুফল এই যে, যে মানুষের আলোচনা হয় তাঁকে ইতিহাসের পটভূমিকায় বিভিন্ন চিন্তা ও কর্মের আন্দোলনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। তাতে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব উদ্ঘাটিত হয়, একটি ধারার সমগ্রতা থেকে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে হয় না।

সুতরাং উৎসাহী পাঠক একই গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সামাজিক ইতিহাসের রস আস্বাদন করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে অবশ্য বলতে হবে যে কতকগুলি বস্তুকে লেখক যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালা বা সঙ্গীতচর্চার ধারা ইত্যাদির আরও বিস্তৃত আলোচনা এই জাতীয় গ্রন্থে থাকা উচিত ছিল।

যাঁরা একটি গ্রন্থে রবীন্দ্র পরিবেশ ও ঠাকুরবাড়িকে জানতে চাইবেন তাঁরা এই গ্রন্থের মধ্যে মনের তৃপ্তি পাবেন। এ গ্রন্থ সরস ভঙ্গীতে লেখা, হিরণ্ময়বাবুর ভাষায় কোথাও অনাবশ্যক মারপ্যাঁচ নেই, বিষয়বস্তুকে জটিল করে তোলার পণ্ডিতীয়ানা নেই।

দু একটি বিষয়ে হয়তো অসতর্কতার কিছু ভুল থেকে গেছে। সেগুলির উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করতে হয়।

১০৪ পৃষ্ঠায় লেখক মহর্ষির নীচের তলায় বাহির মহলের ঘর তৈরী সম্পর্কে যে ঘটনাটি ভবসিন্ধু দত্তের জীবনী থেকে নিয়েছেন সে ঘটনার সত্যতা নেই একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লেখা তাঁর চিঠিতে তিনি ভবসিন্ধু দত্ত বর্ণিত এই ঘর নির্মাণের কাহিনীটিকে কল্পনাজাত বলেছেন। কবির নিজের এই জাতীয় স্পষ্ট স্বীকারোক্তির পর ঐ বিষয়ের উল্লেখ আলোচ্য গ্রন্থে না থাকলেই ভাল ছিল।

অবশ্য এই জাতীয় ঘটনা বেশি নেই। হিরণ্ময়বাবু ঠাকুর পরিবার সম্বন্ধে নানারকম জ্ঞাতব্য তথ্য সঞ্চয় করেছেন এবং সুবিন্যস্ত সমালোচনার ভঙ্গীতে সেগুলিকে সাজিয়ে পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। 'পূর্বপুরুষ' অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত হলেও ক্ষতি ছিল না। আদিশূরের কাহিনী তো অনৈতিহাসিক বলে প্রমাণ হয়ে গেছে, অন্ততঃ তা যে ঐতিহাসিক এমন কোন প্রমাণ তো নেই। সেই কাহিনী এই পূর্বপুরুষ পর্যায়ে না জুড়লেও চলতো। দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথ পর্যায়ে নতুন কথা কিছু না থাকলেও দুটি অধ্যায়ই সুলিখিত। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার যে ধারাটি হিরণ্ময়বাবু বিবৃত করেছেন তা চিত্তাকর্ষক। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাকী অধ্যায়গুলিতে আছে 'মহর্ষির পরিবার' 'পরিবারের উত্তরপুরুষ' এবং 'বাংলার সমাজ-জীবনে ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা।' উত্তর-পুরুষদের মধ্যে কয়েকজনের আলোচনা আছে যাঁদের সম্পর্কে অন্যত্র বেশি কিছু পাওয়া যায় না, যেমন সুধীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। এই অধ্যায়টি যদি আর একটু বিস্তৃত ও তথ্যবহুল হতো তাহলে গ্রন্থটির মূল্য আরও বাড়তো।

সমাজ জীবনে ঠাকুর বাড়ির ভূমিকা অংশটিতে বহু বিষয়ের উল্লেখ আছে কিন্তু বড় সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। ঠাকুর পরিবারের হিন্দু মেলার সংগঠনে মহৎ ভূমিকা, বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা (যা অত্যন্ত সংক্ষেপে সারা হয়েছে) স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে উৎসাহ সর্বোপরি ধর্ম ও সমাজসেবায় যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার প্রয়োগ করে যথোপযুক্ত গভীরতা ও বিস্তৃতি দিয়ে আলোচিত হয়নি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই সুখপাঠ্য রচনায় ঠাকুরবাড়ির ছবিটি উজ্জ্বল হয়েছে—বিশেষজ্ঞের জন্য না হোক সাধারণ পাঠকদের জন্য এই বইয়ের প্রয়োজন ছিল।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

চতুর্দশ বর্ষ ॥ ১৩৭৩

মে ১৯৬৬—এপ্রিল ১৯৬৭

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্রিকা

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

বৈশাখ

আষাঢ়

শ্রাবণ

ভাদ্র

আশ্বিন

কার্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ

ফাল্গুন

চৈত্র

Regd No. C-315 Phone : 23-5155 April'67 (0'50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN